**Published with the Financial Assistance of Sangeet Natak Academy, New Delhi**

# ত্রিপুরা থিয়েটার

সপ্তদশ বর্ষ
(২০০৬ থেকে নিয়মিত)

**Tripura Theatre is indexed in UGC Care List**
**ত্রিপুরা থিয়েটার ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভূক্ত**

**TRIPURA THEATRE**
**Since 2006**
**Vol - 17, Issue - 1**

# ত্রিপুরা থিয়েটার-২০২২

থিয়েটার বিষয়ক নাট্যগ্রন্থ

**নাট্যদল ত্রিপুরা থিয়েটার** কর্তৃক উপস্থাপিত

সপ্তদশ বর্ষ
সেপ্টেম্বর- ২০২২

প্রচ্ছদ
প্রণবশ্রী হাজরা

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ
মাইক্রো গ্রাফিক্স, আগরতলা

**ত্রিপুরা থিয়েটার কর্তৃক প্রকাশিত**

**TRIPURA THEATRE**

A Journal on Theatre and Performing Arts

A Publication of Tripura Theatre (Drama Group) Agartala
$17^{th}$ Year, September - 2022

UGC Care List Sl. No. 1, Discipline - Art & Humanities
Sub-Arts & Humanities (All), Focus Subject - Visual Arts & Performing Arts

Cover Design - Pranabsree Hazra

Type Setting and Printed at :
MICRO GRAPHICS, Mantribari Road, Agartala.

**Published by Tripura Theatre**

**Price ₹. 400.00**

(সন্তোষ মার্কেট, ৩৭, আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১,
মার্কেটের শেষ প্রান্তে, ডান দিকে)

**সম্পাদক**- বিভু ভট্টাচার্য

**সহকারী সম্পাদক** - বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য

**সম্পাদকমন্ডলী-সদস্য**

শেখর সি দত্ত, মিহিরকান্তি ভট্টাচার্য ও কমল মজুমদার

**দপ্তর**

হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা - ৭৯৯০০১ ত্রিপুরা।

ফোন : ৯৪৩৬১২৬৮৪৬/৯৪৩৬৪৫০১৯৩/৯৪৩৬১৩৭৭২৯/৭০০৫১২২৯২৪

mail - bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com

**Website : www.tripuratheatre.com**

**প্রাপ্তিস্থান**

ত্রিপুরা থিয়েটার দপ্তর, অক্ষর, বইঘর, জ্ঞান বিচিত্রা - আগরতলা,
ধ্যানবিন্দু, পাতিরাম - কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা

## TRIPURA THEATRE

( Santosh Market, 37, Akhaura Road, Agartala - 799001, Tripura,
at the end of the Market and then right side).

**Editor** - Bibhu Bhattacharjee
**Asstt. Editor** - Biprajit Bhattacharjee
**Editorial Board**
Sekhar C Datta, Mihir Kanti Bhattacharjee, Kamal Majumder

**Office**
Hospital Road Extension Gandhighat, Agartala - 799001, Tripura
Ph. : 09436126846 / 9436450193, 9436137729, 7005122924
Mail - bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com
**Website : www.tripuratheatre.com**

**Available at**
TT's Office, Akshar, Boi-Ghar, Jnan Bichitra - Agartala,
Dhyanbindu, Patiram - College Street, Kolkata

# ত্রিপুরা থিয়েটারের সদস্য সদস্যাগণ

শুভ্রাংশু চক্রবর্তী - উপদেষ্টা

বিভু ভট্টাচার্য- সভাপতি

শেখর সি দত্ত - সহ সভাপতি

গায়ত্রী চৌধুরী- সহ সভানেত্রী

কমল মজুমদার- সম্পাদক

শ্যামল কান্তি দে- সহ সম্পাদক

বিপ্রজিৎ ভট্টাচার্য- সহ- সম্পাদক

অপূর্ব সাহা- অফিস সম্পাদক

শ্যামলিমা দে- সহ অফিস সম্পাদিকা

মিহির ভট্টাচার্য- কোষাধ্যক্ষ

দেবব্রত মুখার্জী- কার্যকরী সদস্য

শুভঙ্কর ভট্টাচার্য- কার্যকরী সদস্য

মৃণাল কান্তি চ্যাটার্জী- সদস্য

শিল্পী ভট্টাচার্য- সদস্যা

সবিতা ভট্টাচার্য- সদস্যা

মণিদীপা রায়- সদস্যা

কণকনা মজুমদার - সদস্যা

সুপ্রিয়া চৌধুরী- সদস্যা

সাগরিমা দে- সদস্যা

অভিজিৎ ভট্টাচার্য- সদস্য

দিবাকর ভৌমিক- সদস্য

গঙ্গোত্রী মুখোপাধ্যায়- সদস্যা

# সূচিপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| সম্পাদকীয় | | ৯ |
| স্মরণে মননে : পিটার ব্রুক | প্রতিবেদক | ১০ |
| স্মরণে মননে : সরোজ চৌধুরী | প্রতিবেদক | ১১ |
| উৎপল দত্ত'র দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার | পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় | ১২ - ২৩ |
| ভাষা ও মেয়েরা | পবিত্র সরকার | ২৪ - ২৮ |
| বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা | রথীন চক্রবর্তী | ২৯ - ৪১ |
| ব্যারিকেড-৫০ বছর | কুন্তল মুখোপাধ্যায় | ৪২ - ৪৯ |
| অভিনয় নাট্য পত্রিকা : ৭০ দশকের দলিল | অপূর্ব দে | ৫০ - ৫৭ |
| ঘরে বাইরে | দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫৮ - ৬১ |
| বড় লোকের দেশের থিয়েটার | আশিস গোস্বামী | ৬২ - ৬৪ |
| দৃষ্টিহীনদের নাটক | মনুজেন্দ্র কুন্ডু | ৬৫ - ৬৮ |
| দিল্লির নাট্যকার বারীন চক্রবর্তীর মুখোমুখি | আদিত্য সেন | ৬৯ - ৭৫ |
| টিনের তলোয়ার : নিপীড়িত মানুষের গান | রমা দাস | ৭৬ - ৮৩ |
| শুক্রাচার্য রাভার নাট্যচিন্তা ও অভিনবত্ব : একটি অধ্যয়ন | বরুণ কুমার সাহা | ৮৪ - ৯২ |
| কাশীর নাট্যচর্চায় ললিত চক্রের দান: একটি সমীক্ষা | সুবীর ঘোষ | ৯৩ - ১০২ |
| প্রযোজনা বিন্যাস ও মঞ্চ স্থাপত্যের ভাবনা প্রয়োগে - বিসর্জন | শান্তনু দাস | ১০৩ - ১১৪ |
| মফঃস্বলে'র নাট্যশিখা:মন্মথকুমার ও বিনোদবিহারী | প্রসূন বর্মণ | ১১৫ - ১২৩ |
| নবান্ন নাটক : সমকালীন প্রেক্ষিত | রেণুকা অধিকারী | ১২৪ - ১৩২ |
| নাট্যব্যক্তিত্ব অজিত কুমার মজুমদার: একটি পর্যালোচনা | মলয় দেব | ১৩৩ - ১৪১ |
| অরুণ চাকমার নাটক : একটি অবলোকন | পদ্ম কুমারী চাকমা | ১৪২ - ১৪৮ |
| রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনার অভিনবত্ব | রিন্টু দাস | ১৪৯ - ১৫৫ |
| জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশভাবনা : একটি নিজস্ব পাঠ | সঞ্জয় ভট্টাচার্য | ১৫৬ - ১৬৫ |
| জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার অসমিয়া নাটক : প্রসঙ্গ নারীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই | জাহ্নবী দাস | ১৬৬ - ১৭১ |
| রবীন্দ্র নাটকের গানে জনচেতনা | সায়ক মুখার্জী, দেবযানী ঘোষ | ১৭২ - ১৮৩ |
| জরুরি অবস্থার প্রেক্ষিতে রচিত বাংলা নাটক | অমর ভাণ্ডারী | ১৮৪ - ১৯২ |
| আলকাপের সেকাল - একাল | অহীনা দে | ১৯৩ - ২০৪ |
| পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চায় 'স্পেস-থিয়েটার' | অন্তরা দাস | ২০৫ - ২১২ |

| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ✦ নতুন ইহুদী : উদ্বাস্তু জীবনের কথকতা | কৌশিক কর্মকার | ২১৩ - ২১৮ |
| ✦ রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যে প্রেমের উত্তরণ ও তার পর্যালোচনা | শ্রেয়সী চ্যাটার্জী | ২১৯ - ২২৫ |
| ✦ শ্রী চৈতন্য ও শঙ্করদেবের ধর্মীয় চেতনা উন্মেষে নাটকের ভূমিকা | মাম্পি গুপ্ত | ২২৬ - ২৩০ |
| ✦ মহুয়া গীতিকার আধুনিক রূপান্তর : নাটক ও যাত্রার সীমায় | হিমাদ্রি মণ্ডল | ২৩১ - ২৪২ |
| ✦ চিত্রাঙ্গাদার প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব : রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গাদা’-র আঙ্গিকে একটি আলোচনা | সুমনা ভট্টাচার্য | ২৪৩ - ২৪৮ |
| ✦ প্রবহমান নাট্যচর্চায় দক্ষিণ দিনাজপুর | দোয়েল চক্রবর্তী | ২৪৯ - ২৫৫ |
| ✦ অসমিয়া ‘ভাওনা’র ভিন্নরূপ প্রসঙ্গ নগাঁও জেলায় প্রচলিত ‘হাজারি ভাওনা’ | অজিত কুমার সিংহ | ২৫৬ - ২৫৮ |
| ✦ গত এক বছরে ত্রিপুরায় নাট্যচর্চার খণ্ডচিত্র | শেখর সি দত্ত | ২৫৯ - ২৬৪ |
| ✦ বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদপত্রে নাট্য মন্তব্য | | ২৬৫ - ২৬৭ |
| ✦ ত্রিপুরা থিয়েটারের নিবেদন ‘কাক চরিত্র’ নিয়ে কিছু কথা | রাকা চক্রবর্তী | ২৬৭ - ২৬৮ |


## বাংলা নাটক / English Play


| | | |
|---|---|---|
| ✦ নক্সী কাঁথার মাঠ | অজিত মজুমদার | ২৭০ - ৩১৬ |
| ✦ ত্রিপুর রাজার উপাখ্যান | কমল রায় চৌধুরী | ৩১৭ - ৩৫১ |
| ✦ একক কথানাট্য : পাবলিক | দেবেশ ঠাকুর | ৩৫২ - ৩৫৬ |
| ✦ স্ট্রাইক : মূল নাটক ঃ ক্লিফোর্ড ওডেট্স- এর Waiting For Lefty | নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য | ৩৫৭ - ৩৮৯ |
| ✦ ভারতবর্ষ | শ্যামল ভট্টাচার্য | ৩৯০ - ৪০২ |
| ✦ ঝড়া সময়ের রূপকথারা | শিবংকর চক্রবর্তী | ৪০৩ - ৪২৪ |
| ✦ প্রজাপতি, মূলকাহিনী - অ্যান্টন চেকভ | মৈনাক সেনগুপ্ত | ৪২৫ - ৪৪৬ |
| ✦ এক অনন্তের খোঁজ | সঞ্জয় কর | ৪৪৭ - ৪৭২ |
| ✦ বাঘা যতীন এখনো বেঁচে | গৌরাঙ্গা দন্ডপাট | ৪৭৩ - ৫০০ |
| ✦ আলোয় ঢাকা অন্ধকার | অনির্বাণ সেন | ৫০১ - ৫১১ |
| ✦ আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্য-নাট্য-গীতি আলেখ্য ‘অন্বেষণ’ | পার্থ মজুমদার | ৫১২ - ৫১৫ |
| ✦ সত্যজিৎ রায়ের গল্প অবলম্বনে ‘খগম’ | সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় | ৫১৬ - ৫৪১ |
| ✦ সেই হত্যাকারী | সঞ্জয় আচার্য | ৫৪২ - ৫৫৫ |
| ✦ The Last 6 Days of Dasharath | Shomik Ray | 556 - 575 |

## English Article


- Reinscribing culture in performance: Refugee sensibility and the rise of experimental Tripura Bangla Theatre of the 60s and 70s.
**Ashes Gupta** 577 - 584
- BengaliTranslations and Adaptations of Girish Karnad's Plays: A Survey of Performances in Kolkata
**Jolly Das** 585 - 593
- Pan - Indian Reception of Badal Sircar A Brief Study
**Tapu Biswas** 594 - 602
- Ritualling and Storytelling in Heishnam Kanhailal's Play Tamnalai
**Kshetrimayum Premchandra** 603 - 610
- Rasa' in Classical Sanskrit Theatre An Analytical Introspection
**Sib Sankar Majumder** 611 - 619
- The connectivity and relevance of Brecht's aesthetics in Bengali Theatre
**Bratin Roy** 620 - 630
- Propaganda, Crisis, and Catastrophe in Dawn King's Dystopian Play "Foxfinder"
**Anik Sarkar** 631 - 637
- Anger of a Partisan: Reading Sarah Kahn's Political Practice as a Counterpoint to Jimmy Porter's 'Apolitical' Tirades
**Srutayu Bhattacharya** 638 - 645
- Lighting design and its importance in a creative stage performance A Designer's Process
**Murali Basa** 646 - 653
- Classical Reception and Derek Walcott: The Odyssey: A Stage Version
**Sourav Singha** 654 - 662

ত্রিপুরা থিয়েটার

(সন্তোষ মার্কেট, ৩৭, আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯০০১,
মার্কেটের শেষ প্রান্তে, ডান দিকে)
দপ্তর : হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা-৭৯৯০০১, ত্রিপুরা

**ত্রিপুরা থিয়েটারের অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা**

বছরে ন্যূনতম একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক, সঙ্গে পুরনো, দু'বছরে একবার আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব, বছরে একবার মহালয়ায় নাটকের বই (ত্রিপুরা থিয়েটার) প্রকাশ, সঙ্গে সেমিনার, ওয়ার্কশপ; এই নিয়ে ত্রিপুরা থিয়েটারের পথ চলা,

**২০০৬ থেকে নিয়মিত।**

**আমাদের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রযোজনা**

**রচনা ও নির্দেশনা - বিভু ভট্টাচার্য**

**ধরতী আবা, নয়া আন্দাজ, স্বামী বিবেকানন্দ** ( ২০১৪ সালে এন এস ডি আয়োজিত ডিব্রুগড়ে পূর্বোত্তর নাট্যোৎসবে যোগদান), **পাণিপথের ৪র্থ যুব, চক্রব্যূহ, কাবুলিওয়ালা** (এনইজেডসিসি আয়োজিত গৌহাটিতে শিল্পগ্রাম উৎসবে যোগদান) **ও কঙ্কাল** (রবীন্দ্র গল্পের নাট্যরূপ), ছোট নাটক **অল্পমধুর** প্রভৃতি।

**- চলতি প্রযোজনা -**

**'বাপুজী'** (এনএসডি আয়োজিত প্রাগয্যোতিষ নাট্যোৎসবে-২০২০, ইটানগরে যোগদান)
সঙ্গে **'অলকা'**, **'মতিজানের মেয়েরা'**, **'কাক চরিত্র'** প্রভৃতি।

**নাট্যোৎসব**

প্রতি দু বছরে একবার 'বামাপদ মুখোপাধ্যায়' আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব
২০১২ থেকে নিয়মিত (করোনার জন্য ২০২০তে হয়নি)

**নাট্যগ্রন্থ প্রকাশনা**

বছরে একবার, ২০০৬ থেকে নিয়মিত।

**২০২০ সাল থেকে বইটি ইউজিসি কেয়ার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়।**

——— যো গা যো গ ———

হসপিটাল রোড এক্সটেনশন, গান্ধীঘাট, আগরতলা - ৭৯৯০০১, ত্রিপুরা
ফোন ঃ ০৯৪৩৬১২৬৮৪৬ / ০৯৪৩৬৪৫০১৯৩
Email-bibhubhattacharjee@rediffmail.com / kamal.majumder111@gmail.com

**website : www.tripuratheatre.com**

# সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা শব্দটি বড়ই স্পর্শকাতর। তাই বহু আলোচিত। তবু জীর্ন হয়ে যায়নি। বরং অনতিক্রম্য এক উচ্চতার শিখরে পৌঁছেছে। স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম আর অহিংস সত্যাগ্রহ মিলিত স্রোতধারার মত যেন সাগরে গিয়ে মিশেছে। কবিগুরু যাকে বলেছেন মহামানবের সাগরতীরে। সংগে দেশমাতৃকার মহামন্ত্র বন্দেমাতরম এই চেতনারই অঙ্গীভূত কিন্তু নির্মম হলেও সত্যি যে দুবেলা একটুখানি খাবার, লজ্জা নিবারণের জন্য এক ফালি বস্ত্র, মাথা গোঁজার একটু ঠাঁই এর জন্য সন্ধানরত এখনও দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ। শিক্ষা আর স্বাস্থ্যের কথা না হয় বাদই রইল। স্বদেশ ভাবনা আর বৈষয়িক উন্নতির প্রশস্তির পচাত্তরতম বছরেও এই অস্বস্তি যাবার নয়।

আজ কি আমরা ভারতবাসীরা সময়ের এক সন্ধিকালে দাঁড়িয়ে রয়েছি? দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ দীর্ঘদিনের লালিত এই আপ্তবাক্য আজ প্রায় অপস্রিয়মান। কারণ রাজনীতির মেরুকরণ প্রায় সম্পূর্ণ, সমাজে এর ছাপ স্পস্ট। প্রতিটি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য সত্যি সত্যিই অধিকাংশ নাগরিকের হাতের নাগালের বাইরে, দারুণ মুদ্রাস্ফীতি। কিছু ধনাঢ্য ভারতীয় দেশীয় সম্পদ নানাভাবে লুন্ঠন করে দেশের আইন ফাঁকি দিয়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছেন যা অকল্পনীয়। দেশের অভ্যন্তরে এত বেকারত্ব আর কখনও দেখা যায়নি। নূতন আর্থিক নীতিতে তৈরি হচ্ছে "মালিক আর মজুর"। কিছু মানুষ ব্যতীত সাধারণের শিক্ষায় দারুণ সংকট। সরকারী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রায় বন্ধ, গবেষণা বলা চলে প্রায় স্তব্ধ। সর্বক্ষেত্রে এই অস্থিরতা কি নূতন উচ্চতায় পৌছানোর সূচনাপর্ব নাকি পতনের আভাস?

তবু আমাদের অহংকার আমাদের গণতন্ত্র। দীর্ঘ সময়ে ভারতের গণতন্ত্র বিশ্বময় যে আনুষ্ঠানিক সম্মান ও পরিচয় অর্জন করেছে তাও কম নয়। আর এই গৌরবগাঁথার কথা বলতে যা না বললেই নয় তা হলো আমাদের দেশের সংবিধানের কথা। এ যে আমাদের রক্ষাকবচ। নানা ধারণা আর চেতনার বৈচিত্র্য নিয়ে তৈরি আমাদের পূর্বসুরীদের দক্ষতা আর কৃতিত্ব। এখানেই ভারত এগিয়ে। আমরা উত্তরসুরীরা পারব তো এর পবিত্রতা রক্ষা করতে? কারণ যেভাবে সাংবিধানিক পরিকাঠামোর পবিত্রতা দিন দিন লুণ্ঠিত হচ্ছে, ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, মানুষের অধিকার সংকুচিত হচ্ছে তাতে এ আশংকা অমূলক নয়।

তবে যতই আসুক ঝড় আর তুফান নাট্যকর্মীদের একমাত্র দায় হলো ভারতীয় গণতন্ত্রের মহিমাকে উজ্জ্বল করতে নূতন নূতন নাটক প্রযোজনা করে দেশময় ছড়িয়ে দেয়া। যে ধর্মই আমরা পালন করি না কেন মনে রাখতে হবে ধর্ম যার যার দেশ সবার। আমাদের প্রয়াস যত ক্ষুদ্রই হোক, সগর্বে ঘোষণা করতে হবে "ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

দেশের নানা প্রান্ত থেকে যে সকল নাট্যব্যক্তিত্ব, গবেষকদের লেখায় ত্রিপুরা থিয়েটার ২০২২ ঋদ্ধ হয়েছে তাঁদের সকলের প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি আর বিজ্ঞাপন দাতা এবং পাঠকদের প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা।

**বিভু ভট্টাচার্য**

# স্মরণে মননে

(In Memory of Peter Brook)

## পিটার ব্রুক

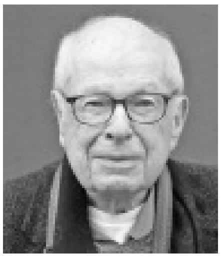

পিটার ব্রুক 'দ্য গ্রেটেস্ট ইনোভেটর অব হিজ জেনারেশন" ৯৭ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। বিশ্ব থিয়েটার জগতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী The Empty Space বইতে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, যে কোন খালি জায়গাতেই নাটক করা সম্ভব।

লন্ডনে এক অভিবাসী ইহুদী পরিবারে ১৯২৫ সালে তাঁর জন্ম। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংলিশ এন্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে পড়াশুনা করে ফ্রান্সে পাড়ি দিয়ে পাকাপাকি ভাবে সেখানেই থেকে যান। ১৯৬৫ সালে পিটার বিশ্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালকের পুরস্কার লাভ করেন। শেক্সপিয়রের 'আ মিড সামার নাইটস ড্রিম' কিংবা আর্থার মিলারের " আ ভিউ ফ্রম দ্য ব্রিড" এর মতো প্রযোজনা পিটারকে বিশ্বের নাট্য মানচিত্রে পাকাপাকি স্থান তৈরী করে দিয়েছিল ।

এমি, লরেন্স অলিভিয়ের অ্যাওয়ার্ডস সহ একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত পিটারকে গত বছর ভারত সরকার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে পিটার ব্রুকের যোগ অবশ্য এরও আগের। তিনি ১৯৮৫ সালে " মহাভারত" এর নয় ঘন্টার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রায় চার বছর ধরে এর মঞ্চায়ন চলেছিল। বলা হতো আটলান্টিকের এপার-ওপারে অবাধে বিস্তৃত ছিল তাঁর নাট্য পরিধি। নব্বুইয়ের কোঠায় এসেও নিজের কাজের মাধ্যমে একইভাবে প্রাণিত করে গিয়েছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের নাট্যকর্মী ও পরিচালকদের। ৩ জুলাই ২০২২ তাঁর প্রয়াণে বিশ্ব থিয়েটারের ইতিহাসে এক চলমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল।

**পিটার ব্রুকের স্মৃতির প্রতি ত্রিপুরা থিয়েটার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।**

# স্মরণে মননে

(In Memory of Soroj Chowdhury)

**সরোজ চৌধুরী**

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, রাজ্যের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সরোজ চৌধুরী ৮৪ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি বিশেষ করে নাট্যজগতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রথম জীবনে আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করলেও পরবর্তীতে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ত্রিপুরায় নাটক, সিনেমা এবং অনুবাদ সাহিত্যে তিনি দিকপালের ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমীর উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় মৌখিক সাহিত্য কেন্দ্রের একজন কর্মকর্তা হিসেবে ককবরক, চাকমা, বোমচেং, ডিমাছা প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্য রচনা ও প্রকাশে তাঁর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

২০১২ সালে ত্রিপুরা থিয়েটারের উপদেস্টা বামাপদ মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হওয়ার পর থেকে অধ্যাপক সরোজ চৌধুরী আজীবন ত্রিপুরা থিয়েটারের উপদেস্টা ছিলেন। প্রতি বছর ত্রিপুরা থিয়েটার বই প্রকাশ কালে, দু বছর অন্তর বামাপদ মুখোপাধ্যায় নাট্য উৎসবে, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে এবং বিভিন্ন মঞ্চ নাটকের গুণগত মান উন্নয়নে উনার পরামর্শ আজও আমাদের পাথেয়। আক্ষরিক অর্থেই আমরা একজন প্রকৃত স্বজনকে হারালাম।

**অধ্যাপক সরোজ চৌধুরীর স্মৃতির প্রতি ত্রিপুরা থিয়েটার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে।**

# উৎপল দত্তর দীর্ঘতম সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন -
**পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায়** (দুজনই প্রয়াত)

*(আগরতলার বিশিষ্ট নাট্যপ্রেমী শ্রী ঝলক মুখার্জী ২০১৫ সালের গোড়ায় কথায় কথায় আমাকে একটি " শিল্প সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক" এর কথা বলেন। নাম পর্বান্তর। জানুয়ারী ১৯৯৫-এ প্রকাশিত। দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় । কলকাতা, হাজরা রোড থেকে প্রকাশিত সাময়িকীটি পড়ে আমি অবাক হয়ে যাই। ১১২ পৃষ্ঠার (এ-ফোর) বই জুড়ে প্রবাদপ্রতিম নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্তের সাক্ষাৎকার রয়েছে। ৮৮-র সেপ্টেম্বর থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারী ৮৯ পর্যন্ত ৩৩০ মিনিটের সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন শ্রী পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুবীর মুখোপাধ্যায়। দীর্ঘতম এই সাক্ষাৎকারে রয়েছে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট, নাট্যকার ও নির্দেশক উৎপল দত্তের প্রায় ৪৫ বছরের বিশাল থিয়েটারী কর্মকাণ্ডের বিপুল অভিজ্ঞতা-মথিত উপলব্ধি সম্পর্কে অন্তরঙ্গ ও অকপট কথোপকথন। বর্তমান সময়ে নাট্যকর্মীদের উপকারে আসবে ভেবে, 'পর্বান্তর' সাময়িকীর প্রতি ঋণ স্বীকার ও শ্রী ঝলক মুখার্জীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা ত্রিপুরা থিয়েটারে সাক্ষাৎকারটি পর্যায়ক্রমে ছাপার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। **এবার শেষ কিস্তি** - সম্পাদক)।*

পা.ব. - শিশির কুমার ভাদুড়িও তো টোটাল থিয়েটার মানে পরিচালকের থিয়েটার করার চেস্টা করেছেন।— এ সম্পর্কে আপনার অভিমত?

উ. দ. - মাঝে মাঝে অসাধারণ। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড অসতর্ক। তাই বলি, আমার সব সময় মনে হয়েছে যে গিরিশবাবুরা যে রকম শৃঙ্খলাপরায়ণ ছিলেন খুব সম্ভব ভাদুড়িমশায় সে রকম ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব মুডের ওপর অনক কিছু নির্ভর করত। খুব মুডি ছিলেন। তারপর আমার মনে হয়, একটা সামান্য কথা, গিরিশবাবু তাঁর সঙ্গে যারা অভিনয় করেছেন, তার পূর্বে যারা অভিনয় করেছেন, প্রত্যেকের সম্পর্কে ডিটেলে লিখতেন। শিশিরবাবু লেখেননি। খুব কম। শিশিরবাবু লেখা লিখবেন— এইটুকু লিখবেন। কারণ কি? কারণ আলস্য। সেই তাগিদ নেই, যে আমি একটা নাট্যশালার কাজ করছি– সেই যে নাট্যশালার সমস্যা, আমরা কিভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করছি— সেটা ভবিষ্যতকে জানানোর প্রয়োজন। এই নাট্যশালার ইতিহাসটা থাকা দরকার। এই বোধ ছিল না। অথচ ইনি ছিলেন অধ্যাপক মানুষ। ওঁরই লেখার কথা ছিল। গিরিশবাবু তো কেলাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলেন। উনি তো স্কুলে ড্রপ-আউট। অথচ উনি অসাধারণ বাঙলা শিক্ষা করে নিজে নিজে, নিজেকে শিখিয়ে উনি সব্বাইয়ের সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন। বিনোদিনী তো বটেই, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী সম্পর্কে অত

সুন্দুর লেখা তো আর পাওয়া যাবে না।এবং প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তৎকালীন থিয়েটার সম্পর্কে সব লিখে গেছেন। কিন্তু ভাদুড়িমশাই লেখেন নি। ভাদুড়িমশাই-এর সময় কারা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী— উদার প্রতিদ্বন্দ্বী অহীন্দ্র চৌধুরী মশাই সম্পর্কে একটা লেখা থাকা উচিৎ ছিল। কখনই লিখলেন না, আমার ধারণা আলস্য। আমার ধারণা শৃঙ্খলার দীনতা। সামান্য কতগুলি জিনিস। মেক-আপে অনীহা। বড়বাবু স্পিরিটগাম লাগাবেন না। সাজাহানের পার্ট করেন,– দাড়িটা স্পিরিট গাম দিয়ে সাঁটবেন না। দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকবে। স্পষ্ট দেখা যাবে। অতো অমার্জনীয় অন্যায় নাট্যশালায়। আর তার থেকে বহু পূর্বে গিরিশবাবুরা, তাঁদের সময় এরকম স্পিরিটগামও ছিল না। তাঁরা আঠা, দিশি আঠা, গঁদ দিয়ে জুড়তেন। কিন্তু কখনও কেউ ভাবেনি— ওদের সময় এটা ভাবা অসম্ভব ছিল যে কেউ দড়ি দিয়ে বাঁধা দাড়ি পরে নেমে যাবে। গিরিশবাবু মারবেন তাকে স্টেজে। পদাঘাতে ফেলে দেবেন স্টেজ থেকে। তাই এসব পড়ে-টড়ে আমার ধারণা হয়েছে যে গিরিশবাবুর একটা বিরাট দখল ছিল নাটক সম্বন্ধে। আমি বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সাল থেকে নাটক দেখছি। গিরিশবাবুদের থিয়েটার সম্পর্কে পড়েছি। কিন্তু যে অমার্জনীয় রিগ্রেট— থিয়েটারের সেটে, লাইটে— একটা প্রচণ্ড ঔদাসীন্য মানে হতাশা ধীরে ধীরে গিরিশবাবুকে গ্রাস করে ফেলেছিল। ছেঁড়া সিন ঝুলছে—ময়লা এবং সে লাইটের কোন কিচ্ছু ঠিক নেই। কখনও জ্বলে, কখনও জ্বালাতে ভুলে যায়। কথা বলে ব্যাক স্টেজে। হট্টগোল হয়। এইসব নিয়ে কোনমতে নাটকটা হয়ে যাচ্ছে। কোনমতে লাস্টে ট্যাকল করছে। দাড়ি খুলে যায় অ্যাকটরের। গোঁফ খুলে যায়। সেটা আবার ওঁর জীবনীতে খুব গর্বের সঙ্গে লেখা হয়, যে একদিন বড়বাবুর দাড়ি খুলে গেল। বড়বাবুর দাড়িটা— খানিকটা খুলে ঝুলছিল—তিনি সবটা খুলে ফেললেন তারপর অভিনয় করলেন। এতো অমার্জনীয় অপরাধ অভিনেতার। দাড়ির অর্ধেকটা খুলে ঝোলে কেন? ঝোলার তো কথা নয়। বড়বাবুর উপস্থিত বুদ্ধি এমন উনি বাকিটা খুলে ফেলে অভিনয় করলেন। না, না, এসব অপেশাদার একটা মনোভাব। এইটা ছিল বড়বাবুর একটা মস্ত বড় দোষ। তবু মাঝে মাঝে এক একটা নাটকে এক একটা জায়গায় এমন অসাধারণ পরিচালনার দক্ষতা দেখিয়েছেন যা অকল্পনীয়। যেমন— অলকা যখন চলে যাচ্ছে—এটা বিখ্যাত হয়ে আছে, গরুর গাড়ীর শব্দ– ষোড়শীতে—গরুর গাড়ীর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দটা ক্রমশঃ মিলিয়ে যায়। আর স্টেজটা অন্ধকার হতে হতে শুধু একটা ডিম স্পটে জীবনানন্দ দাঁড়িয়ে আছে। আর তারপর সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাইটা জ্বালাচ্ছে। শুধু দেশলাইয়ের আলো আর কোন কিছু নেই। ততক্ষণে আলোটা অফ হয়ে গেছে, আর উনি দাঁড়িয়ে, টোটাল ডার্ক। অলকা চলে গেল সারাজীবনের মত, ওর জীবন থেকেও একটা অদ্ভুত কাব্যময় অনুভূতি।

এরকম মাঝে মাঝে টাচ, তবে আমার ধারণায় শুধু টাচ দিয়েই তো আর পরিচালকের থিয়েটার গড়ে ওঠে না। সেটা একটা সামগ্রিক ব্যাপার। তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি, ভাদুড়ি মশাইয়ের কাজ প্যাচি ছিল, ব্রিলিয়ান্ট মাঝে মাঝে, একেক সময়, কিন্তু অনেক সময়ই অত্যন্ত অমার্জনীয়ভাবে অসতর্ক এবং খারাপ। সামগ্রিক চেতনার অভাব। এবং শুনছি তারও কারণ হচ্ছে ভেতরের বিশৃঙ্খলা। নাট্যশালাকে সংগঠিত করতে হবে আগে। সুসংগঠিত নাট্যশালা না থাকলে কোন পরিচালক দাঁড়াতে পারবে না। ইউরোপের পরিচালকদের আবির্ভাবের মূলে হচ্ছে থিয়েটারের সংগঠন। বড়বাবুর থিয়েটারে ছিল সবচেয়ে বিশৃঙ্খল। বড়বাবুর সময় পাশেই অন্য থিয়েটারগুলো খুব ভালো চলছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থিয়েটারগুলোর সব একেবারে পয়মন্ত অবস্থা। একেবারে পয়মন্ত অবস্থা। সব থিয়েটারে সব প্লে হিট। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে শিশিরবাবু যেটা করেছেন সেটা পরিচালক হিসেবে নন। সেটা নাটক নির্বাচনের ক্ষেত্রে। অন্য সব জায়গায় যেখানে অত্যন্ত সস্তা নাটক অভিনীত হচ্ছে তখন শিশিরবাবুর থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে মাইকেল, অভিনীত হচ্ছে শরৎচন্দ্র, অভিনীত হচ্ছে খুব সিরিয়াস নাটক, সধবার একাদশী, ষোড়শী ইত্যাদি। অবশ্য শিশিরবাবুর যুগেই শ্রেষ্ঠ পরিচালক ছিলেন মহেন্দ্রগুপ্ত মহাশয়— স্টার থিয়েটারে, পরিচালক হিসেবে। এতে অনেকে দ্বিমত হবেন— জানি। কেননা ওদের কাছে মহারাজা নন্দকুমার, টিপু সুলতান এসব নাটকের নাটক হিসেবে কোন মূল্য নেই। আমার মতে নাটক হিসেবে এদের কোন নূল্য নেই সেকথা ঠিক নয়। নাটক হিসেবে মূল্য আছে। এরা একটা দেশপ্রেমিক সংগ্রামে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে গেছেন। এরা মেলোড্রামাট্রিক ছিলেন— এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। সব নাটক যে প্রচন্ড ইন্টেলেকচুয়াল স্তরে উঠে ডিককাসনের প্লে হবে - তার তো কোন মানে নেই। নানা ধরনের নাটক থাকে এক একটা দেশে। এটা একটা বিশেষ ধরনের নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এবং 'শতবর্ষ আগে' নাটকে মহেন্দ্রবাবু— রীতিমত ইন্টেলেকচুয়াল নাটক। আমি বলছি পরিচালক হিসেবে সেই সময় স্টার থিয়েটারে মহেন্দ্রবাবুর এক্সপেরিমেন্টগুলোই হলো শ্রেষ্ঠ। তার নাটকের পরিচালনায় সামগ্রিক — সেটা প্রত্যেকের অভিনয়ে লক্ষ্য করার মতো, তার কস্টিউম, তার সেট, লাইটিং সব কিছুর দিকে পরিচালক নজর দিয়েছেন। বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, পরিচালক হাউসে বসে নাটক দেখে দেখে রিহার্সাল দিয়েছেন— স্পষ্ট বোঝা যায়। অনেক সময় দিয়েছেন এটাও বোঝা যায়। দিনরাত রিহার্সাল দিয়েছেন তখন। বড়বাবুর অভিনয় দেখলে মনে হোত আদৌ পরিচালক এ নাটকটা অভিনীত হতে দেখেছেন কি? এর কোন ড্রেস রিহার্সাল হয়েছে কি? মনে হোত না যে এটা বড়বাবু বসে দেখেছেন হাউস থেকে? তাহলে কি করে এই সব অভিনেতাকে তিনি এ্যালাউ করেছেন। ওঁর পাশে অভিনয় করছে? আমাদের শ্রেষ্ঠ যিনি অভিনেতা- শিশির কুমার ভাদুড়ি মহাশয়

তাঁর পাশে এইসব কারা ? একেবারে, মানে বাঙলা নাট্যশালার কোন রঙ্গমঞ্চে ওদের কোথাও স্থান হয়নি। তারা গিয়েছে আমাদের বড়বাবুর সঙ্গে । আর কোনো থিয়েটারের দলে এরকম নয়।

উনি এদের সব পালন পোষণ করতেন। তো ন্যাচারালি অভিনয়ের স্টান্ডার্ড সবচেয়ে খারাপ হোত। আলটিমেটলি গিয়ে কি দাঁড়াত যে, শুধু শিশিরবাবুকে দেখতে যেত লোকে। আর বাকি সবাই যখন অভিনয় করত লোকে বলত এ কতক্ষণে যাবে। নাটকটা তো আর থাকত না। নাটক কাটা হোত এইভাবে। চন্দ্রগুপ্ততে-চন্দ্রগুপ্ত নাটক দেখতে গিয়ে যদি আমি দেখি যে সিকান্দার নেই,— আলেকজান্ডার নেই, যেটা দিয়ে নাটকটা শুরু এবং বিশেষ উদ্দেশ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমে সিকান্দারের সিন আনেন-সে জায়গা বাদ যেত। কারণ উদ্দেশ্যতো কোনরকমে চাণক্যতে গিয়ে পড়া। বড়বাবু অভিনয় করবেন। আর যারা এসেছে তারাও চাণক্যকে দেখতেই এসেছে। জানে যে আলেকজান্ডার -ফালেকজান্ডার করবার জন্যে যারা এসেছে তাদের অভিনয়ের খুব দরকার হবে না। এই তো অবস্থা ছিল। সুতরাং পরিচালক হিসেবে খুব তিনি ইম্পর্টট্যান্ট নন। অভিনেতা হিসেবে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

পা. ব.- টোটাল থিয়েটার মানে যেখানে আমরা দেখাই মঞ্চকলা, আলোকসম্পাত, সঙ্গীত, মেকআপ মানে সমস্ত কিছুর কম্বিনেশন। অ্যাকটিং ছাড়াও এদের যে নির্দিষ্ট ভুমিকা যেমন ধরুন পারস্পরিক সম্পর্ক, যার ওপরে টোটাল থিয়েটার গড়ে ওঠে এইটে সম্বন্ধে বলুন।

উ. দ. - অনেকগুলো একসঙ্গে এলিমেন্ট....

পা.ব. - আপনি একটা একটা করে বলুন।

উ. দ. - একটি সম্পর্কে বললেই বাকি সবগুলো সম্পর্কে বলা হবে। ধরা যাক সঙ্গীত। থিয়েটারের সঙ্গীত। থিয়েটারের সঙ্গীত, বিশুদ্ধ সঙ্গীত নয়। বিশুদ্ধ সঙ্গীতে সঙ্গীত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং থিয়েটারের প্রয়োজনেই সীমিত, থিয়েটারে নিজের চেহারা নিয়ে যত কম আত্মপ্রকাশ করে ততই ভালো। ইনফ্যাক্ট যতো সে তার স্বধর্ম ত্যাগ করবে ততো ভালো। থিয়েটারের সঙ্গীত, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ থিয়েটারের সঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন বোধহয় ফিলিপস মেন্ডলসন। মিডসামার নাইটস ড্রীম নাটকের অভিনয় হচ্ছিল ড্রেসডেনে। সেই ১৮৪২। সে যা আবহসঙ্গীত সৃষ্টি করেছিলেন তা ইমর্টাল মিউজিক হয়ে আছে। এখন সে সঙ্গীত ইমর্টাল মিউজিক হয়ে গেছে বটে কিন্তু আমি এটা খুব দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি নাটকটা বাদ দিয়ে যদি কেউ এই মিউজিকটা শোনে, তার মাথায় যদি নাটকটা না থাকে, তাহলে সে পুরো মিউজিকটা উপভোগ করতে পারবে না। একান্তভাবেই

নাটকটার ওপর নির্ভরশীল। নাটকটা আর ঐ মিউজিকটা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এটাকে বাদ দিয়ে ওটা হয়না। ওটাকে বাদ দিয়ে এটা হয় না। অনেকে ভান করেন যারা দূরে আছেন— শুনছেন। যারা শেক্সপীয়রের নাটকটার কথা ভাবছেন না। আমার মতে, হয় তারা ভান করছেন আর না হয় তারা সঙ্গীত বোঝেন না। দুটো এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে শেক্সপীয়রের নাটকটা ভালভাবে পড়া না থাকলে — চোখের সামনে না ভাসলেও মিউজিকটা পুরোপুরি বুঝতেই পারবে না কেউ। এটা হচ্ছে আদর্শ থিয়েটারের মিউজিক। অর্থাৎ কিনা চিরকালের জন্য ঐ সঙ্গীত এবং ঐ নাটক একত্রে চলবে। ওই নাটক থেকে ঐ মিউজিক আলাদা করলে অর্থহীন হয়ে পড়বে। এমনকি এমনও বলা যেতে পারে যে ঐ মিউজিক ছাড়া ঐ নাটক অভিনয় করতে গেলে নাটকটা ন্যাড়া লাগবে। এখন শেক্সপীয়র যখন ঐ নাটকটা লিখেছিলেন তখন তো মেন্ডলসনের জন্মও হয় নি। মেন্ডলসনের পিতামাতাও জন্মাননি। ওটা ১৮৪২ সালে- ড্রেসডেনে একটা অভিনয়ের জন্য মেন্ডেলসনকে ভার দেয়া হয় মিউজিকটার জন্য। কিন্তু তারপর থেকে আজ পর্যন্ত মিডসামার নাইটস ড্রীম কোথাও অভিনীত হয়নি ওই মিউজিক ছাড়া। পিটার ব্রুক বাদ দিয়েছেন। উনি সব ব্যাপারেই নতুন নতুন জিনিস করার চেস্টা করেন। তা উনি বাহুল্যজ্ঞানে বাদ দিয়েছেন। পিটার ব্রুকের নাটক যে এত খারাপ হয়েছে তার অন্যতম কারণ হচ্ছে মেন্ডলসনের সেই অসাধারণ স্বপ্নময় সঙ্গীতকে বাদ দিলেন। যাই হোক, সঙ্গীত, নাটকের সঙ্গীত— নিজেকে মিলিয়ে দেবে নাটকের সঙ্গে। আত্মসমর্পণ করবে নাটকের কাছে। নাটক সেখানে সুপ্রীম। এখন সঙ্গীত যদি নিজের কেরামতি দেখাতে থাকে তাহলে পরে সেখানে সে ব্যর্থ হচ্ছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে ভিভিড মিউজিক বলে একটা কথা আছে। ভিভিড মিউজিক মানে হচ্ছে, কি বলব, বাস্তব ধ্বনিকে অনুকরণ করা। যেমন আমরা শুনতে পাই বেঠোফেনের ষষ্ঠ সিম্ফনি, প্যাস্টোরাল সিম্ফনি এসব। একটা মুভমেন্ট আছে —স্টর্ম। সেটাতে সঙ্গীতের ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে ঝড় সৃষ্টি করা হয়েছে। অবিকল ঝড়। সাঙ্গীতিক ঝড়। হঠাৎ মনে হবে ঝড়। বাতাস বইছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাজ পড়ছে। একে বলা হয় ভিভিড মিউজিক। বা ধরা যাক ওভারচার, এইটিন হান্ড্রেড এ্যান্ড টুয়েলভ, -চাইকোভস্কি। নেপোলিয়নের রিট্রিট ফ্রম মস্কো হচ্ছে এর সাবজেক্ট। আমরা নেপোলিয়নের বাহিনীর রিট্রিট, তাদের ক্লান্ত পদক্ষেপ রাশিয়ার বরফের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়। ক্লান্ত, তারা চলেছে - তারা চলেছে। একে বলা হয় ভিভিড মিউজিক। অ্যান্ড ইয়োরোপীয়ান সঙ্গীতে ভিভিড মিউজিক বলে একটা বস্তু থাকার জন্যে ইউরোপীয়ান সঙ্গীত থিয়েটারে ব্যবহার করা অনেক সহজ আমাদের মিউজিকের থেকে। কেননা থিয়েটারে ভিভিড মিউজিক ভীষণ কাজে লাগে। আমাকে যদি দেখাতে হয় যে একটা দাঙ্গা হচ্ছে, প্রচুর লোক, ক্রাউড সিন

— মারামারি করছে। ঠিক তার প্যারালাল সঙ্গীত তক্ষুণি সৃষ্টি করা সম্ভব। ওয়েস্টার্ন মিউজিক ফলো করে, ভিভিড মিউজিকের প্রিন্সিপল্‌স ফলো করলে। যে কোনো কম্পোজার তখুনি কম্পোজ করে দিতে পারবে, মুহূর্তের মধ্যে। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে ভিভিড মিউজিক বস্তুটি নেই। যদিও চেষ্টা করলে পাখির ডাক-টাক করা যায় না তা নয়। মোটামুটি পাখির ডাক-কোকিল ডাকছে— এই অ্যাটমোসফিয়ারটা এনে দেওয়া যায়। ভিভিড হিসেবে ইমিটেট করা যায় না বা করা হয় না। ওটা রেওয়াজ নয়- ট্র্যাডিশনের বিচ্যুতি। তবে আমাদের সঙ্গীতে হচ্ছে সময়। প্রাতঃ গেয় রাগ। সান্ধ্যগেয় রাগ। এগুলো আমাদের প্রচণ্ড সাহায্য করে। যেগুলো ওদের নেই। যেমন ধরুন— ভৈঁরো। ভৈঁরোর একটু সুর দিলেই এটা যে ভোর সেটা বুঝিয়ে দেয়। আর কিছু লাগে না তো। এটা হচ্ছে ভারতীয় সঙ্গীতের ট্রেন্ড, থিয়েটারে। বা একটা দরবারের সিনে দরবারী কানাড়ায় জাস্ট একটু মুখটা কোন ইনস্ট্রুমেন্টে বাজালেই পরিষ্কার — আর কিছুর দরকার হয় না। এইখানে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের স্ট্রেংথ। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের অ্যাডভান্টেজ থিয়েটারের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু থিয়েটারে আরও মজা আছে। থিয়েটারে উল্টোপথে গেলে আরও মজা। থিয়েটারে ঠিক যে মিউজিকটা এখন প্রয়োজন তার উল্টো মিউজিকটা দিলে পরে অনেক সময় দেখেছি— আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে যে, অনেক বেশী এফেক্ট হয়। যেখানে খুব করুণ একটা ঘটনা ঘটছে তখন সঙ্গীত যদি আনন্দের সঙ্গীত হয় তাহলে পরে এফেক্টটা দশগুণ বৃদ্ধি পায়। ডায়ালেক্টিসের আইনেই বোধহয় এটা হয়। ব্যারিকেডে বার বার ইউজ করেছিলাম। ব্যারিকেড নাটকে একজন মা খবর পান যে ছেলে মারা গেছে। ছেলেকে মেরেছে নাৎসীরা। তখন একদম আনন্দের মিউজিক। স্প্যানিশ মিউজিক। তার আগে পর্যন্ত চলছিল জার্মান ক্ল্যাসিকাল। ওখানে অবশ্য স্প্যানিশ ক্ল্যাসিক্যাল, ওদের, শুধু ভায়োলিনে। সবই তো আমরা ব্যবহার করেছি। একদম ওদের ফেস্টিভ মিউজিক— ট্রাম্পেট। কিন্তু এফেক্ট হয়েছে সাংঘাতিক। অনেক সময় এরকম হয়। যেটা আমরা ব্যর্থ হয়েছি - খুব সাংঘাতিক ভাবে ব্যর্থ হয়েছি— কি নাম নাটকটার... 'দাঁড়াও পথিকবর'। যখন মাইকেল মামাবাড়িতে গেছে তারপরে সৎমা বার করে দিচ্ছে বাড়ি থেকে তখন ইউজ করা উচিত ছিল কোন একটা আনন্দের মিউজিক— এইটে ভেবেছিলাম। ইউজও করেছিলাম, দর্শকের ভাল লাগে নি। ভারতীয় সঙ্গীত ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য ছিলাম। কারণ ইউরোপীয় সঙ্গীত তো ঐ নাটকে আসতে পারে না। তাও এসেছে। ফ্রান্সের সিনে এসেছে। কিন্তু ভারতীয় আনন্দের সঙ্গীত এত কম। ভারতীয় আনন্দ সঙ্গীত খুব কম। বাহার রাগ ছাড়া ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে আনন্দে হেসে উঠেছে মানে পৃথিবী হেসে উঠেছে— এরকম এফেক্টটা দেয়া খুব কঠিন। তাই আমরা বাদ দিয়ে আলটিমেটলি ওখানে একটা স্যাড ইয়ে দিলাম। সেটা আমার খুব খারাপ

লাগল। দর্শকের ভালো লেগেছিল! সেখানে আমার আর হেনরিয়েটা হেঁটে পুরো স্টেজটা অতিক্রম করে বেরিয়ে যাওয়া আছে। হাঁটতে হাঁটতে আমার লজ্জা করত ঐ মিউজিক শুনে। ক-রু-ণ , সে একেবারে কুৎসিত।
যাই হোক, দর্শককে তবু কাঁদতে দেখেছি জায়গা বিশেষে। কাঁদছেন, কাঁদুন। কিন্তু হওয়া ওরকম উচিত নয়। যেটা আগেকার থিয়েটারে হোত। করুণ ইয়ে এলেই ঐ বেহালার ছড় টেনে দেয়। আর খুব ড্রামাটিক কিছু এলেই ঝাঁঝের ঝাঁ-আঁ-আঁ—। এটা যাত্রায় খুব শোনা যায়। কিন্তু এরকম আক্ষরিক নিবুর্দ্ধিতা থিয়েটারের সঙ্গীতে তো অ্যাভয়েড করা উচিত। কাউন্টারপয়েন্টস দেওয়া উচিত। ঠিক যা ঘটছে তার উল্টোদিকে চলবে। এবং জগাখিচুড়ি করতে আমার বিন্দুমাত্র আটকায় না। একই নাটকে ইন্ডিয়ান মিউজিক, ওয়েস্টার্ন মিউজিক সব মিশিয়ে ফেলতে আমার একটুও বাধে না এবং ওয়েস্টার্ন মিউজিকের মধ্যেও- যেমন আমরা স্তালিন নাইনটিন থারটিফোর বলে একটা প্লে করেছিলাম। তাতে আমরা ক্ল্যাসিকাল মিউজিক দিয়ে শুরু করে অবলীলাক্রমে স্যাটারডে নাইট ফিভারে ফিরে গেছলাম। আবার ফিরে গেছি ক্ল্যাসিকেলে। তা হয় না। আবার ফিরে এসেছি স্যাটারডে নাইট ফিভারে এবং রক, রক মিউজিক ইউজ করেছি। এতে কোন কোন ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন - চিঠি লিখে, কানে ভীষণ খারাপ লেগেছে। এসব সস্তা সঙ্গীত। সস্তা সঙ্গীত— কনসার্ট হলে এটা সস্তা। থিয়েটারে সস্তা। থিয়েটারে আমাদের দেখতে হবে জাস্ট কি এফেক্ট হচ্ছে, নাটকটার অর্থাৎ দৃশ্যের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক। আমরা স্যাটারডে নাইট ফিভার ইউজ করেছিলাম চার্চিলদের সঙ্গে । চার্চিল হাঁটছে — তার সঙ্গে স্যাটারডে নাইট ফিভারের রক মিউজিক। চার্চিল হাতে চুরুট নিয়ে বীরদর্পে বেরিয়ে যাচ্ছে নানাবিধ সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা করে। সে হেঁটে চলে গেল। তার বক্তব্য হচ্ছে যে সোভিয়েট ইউনিয়ন আর ছ'মাসের মধ্যে কোলাপস করছে। তখন তাকে নিউজ পেপারম্যান বলছে— ছ'মাসের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়ন কোলাপস করবে আপনি তো এই একটা কথা বলে আসছেন মশাই উনিশশো সতেরো সাল থেকে। এতো উনিশশো চৌত্রিশ। তাই তো বলে— ভদ্রলোকেরা এক কথা। এই বলে সে রওনা হয়। তখন স্যাটারডে নাইট ফিভারের মিউজিকই তো বাজবে নাকি বেঠোফেন বাজবে। যাইহোক, তা এইরকম ভাবে জগাখিচুড়ি করে একটা বেশ, পুরো নাটকের বক্তব্যটা নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীতের ধারাটা এসেছে থিয়েটারে। তারপর আসছে প্রক্ষেপণের কথা- রেকর্ডিংয়ের কথা। সব মিউজিক যে রেকর্ড করে তারপর প্রক্ষেপণ করতে হবে — এর কোন মানে নেই তো। অলরেডি রেকর্ডেড রয়েছে। ওয়ার্ল্ডস গ্রেটেস্ট মিউজিক আর রেকর্ডেড, অ্যান্ড রেকর্ডেড ব্রিলিয়ান্টলি, আমরা সেখান থেকে নেব। তবে মুশকিল হচ্ছে ওয়েস্টার্ন মিউজিক যেভাবে রেকর্ডেড হয় আমাদের

দেশের সঙ্গীত সেভাবে রেকর্ডেড হয় না। আমাদের দেশের তো সোলা ইনস্ট্রুমেন্ট। সেইগুলোই রেকর্ডেড হয়। সেগুলো ব্যবহার করে কোন থিয়েট্রিক্যাল এফেক্টস সৃষ্টি করা যায় বলে আমি মনে করি না। বিলায়েত খাঁ সাহেবের সেতার বা রবিশঙ্করের সেতার দিয়ে। সোলো সেতারের এফেক্ট ইউজ করে থিয়েটারের সিনে খুব বেশী এফেক্ট দেবে গভীরতর বা চমক দেয়া সম্ভব হয় বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু এই যে সব জিনিসটার সম্পাদনা করে তাকে সাজিয়ে তার প্রক্ষেপণটা হচ্ছে ইমপরট্যান্ট। সঙ্গীত প্রক্ষেপণ— যেটা আমাদের অনেক দলের দেখেছি— একেবারে শোচনীয়ভাবে নেগলেক্টেড। কোথাকার ক্যাসেট নিয়ে এসে সেটা ক্যাসেট প্লেয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে কি বাজায়- ঘর ঘর সব শব্দ হয় আর ক্যাসেটগুলো যে কি করে করে— কিউ তো ধরতে পারবে না। কোত্থেকে বাজছে তাই তো বুঝতে পারছি না। না কি ? স্পুলের টেপ ছাড়া— আমি তো ঠিক করতে পারছি না কোত্থেকে বাজাবো ? ক্যাসেটের মধ্যে তো অদৃশ্য। তবুও বাজায় এ সমস্ত। তো প্রশ্নটা ছিল — এসব মিলে একজায়গায় এসে থিয়েটার হয়। এখন এ সম্পর্কে পৃথিবীতে থিয়েটার সম্পর্কে যত বই, আজকাল যত বই লেখা হচ্ছে, সবগুলোতেই এই একটা কথাই বলা হয় যে সবগুলো মিলে একটাই জিনিস হয়। এটা কথার কথা না, এটা সত্যিই হয়। সেটা মুখে বলে কিছু বোঝা যায় না। নাটক দেখে তবে বুঝতে হয়। অনেকে আছেন সঙ্গীতের একেবারে বিরোধী। সঙ্গীত ব্যবহারই করতে দেবে না। পৃথিবী বিখ্যাত পরিচালকদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন। যাদের থিয়েটারে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীত থাকেনা। সেটা এক ধরনের গোঁড়ামি। আবার আর এক ধরনের আছেন যারা সঙ্গীত খুব বেশি ব্যবহার করেন। সেটা আর এক ধরণের গোঁড়ামি। কোনটাই কিছু না। যেটা আমার নাটকের জন্য দরকার তাই নেয়া হবে। যা দরকার নয় তা নির্মমভাবে ছাঁটাই করতে হবে। নাটকটি সুপ্রীম। অন্য সবগুলো আদৌ আসলে মেলে কি না — এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। খুব বড় পরিচালকের কাজ দেখলে মনে হয় — নিশ্চয় সব গুলো এসে মেলে, এক জায়গায় মেলে। হঠাৎ মনে হয় আমি এই যে রঙের সেটটা করেছে না, মিউজিকেরও তো রঙ আছে— সঙ্গীতেরও রঙ আছে। কোন সঙ্গীত লাল। কোন সঙ্গীত হলদে। কোন সঙ্গীত সাদা। আমাদের সমস্ত রাগসঙ্গীতের রঙ আছে। তাদের রাগরূপগুলো যদি দেখেন তো দেখবেন প্রত্যেক রাগের একটা রঙ আছে এবং সেটা কোন আন্দাজে নয়। তার সায়েন্টিফিক বেসিস আছে। মালকোষ লাল। হঠাৎ মনে হবে এই যে মিউজিকটা দিয়েছে এই মিউজিকের রঙের সঙ্গে সেটের রঙ, কস্টিউমের রঙ সব মিলে গেছে। ইট ইজ এগজ্যাক্ট এ্যান্ড কারেক্ট — মনে হয়। তেমনি সেই দিন মনে হচ্ছিল — চেকভ করছিলেন লেনিনগ্রাদ ম্যাক্সিম গোর্কি থিয়েটার। তারা খুব সফট্‌লি রিমস্কি কোর্সাকভের মিউজিক ইউজ করেছিলেন। আর কস্টিউম ছিল সব এইটিনথ্

সেঞ্চুরী, নাইনটিনথ্ সেঞ্চুরীর কস্টিউম। গ্রীনিস্ গ্রে। রিমস্কি কোর্সাকভের Dubinushka আশ্চর্যজনকভাবে রঙের সঙ্গে মিউজিক মিলে গেছে। বিশেষ করে যখন বাইরে বরফ থেকে ঢুকে এসে বরফগুলো ঝাড়ছে এমন করে। আশ্চর্য- সে মানে কি বলব! পাবলিকের প্রত্যেকেরই যে সেটা হবেই এমন কোন মানে নেই। কিন্তু সমস্ত দর্শকের মধ্যে যদি দুজনের হয় দ্যাট ইজ ওয়ার্থ ইট। সঙ্গীতের সমঝদার যে সবাই হবেন এমন কোন মানে নেই। সাধারণত: সাধারণ মানুষ অনেক সময়ই সঙ্গীতের সমঝদার নয়- কান তৈরী থাকে না। বিশেষ করে ভারতবর্ষ। বিশেষ করে আমাদের দেশে তো সঙ্গীতের পথ বুদ্ধ হয়ে আছে। বিশেষ করে বাঙালী মধ্যবিত্ত তো রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপরে তো আর যায় না। হুঁ— রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পারাটাই হচ্ছে হাইয়েস্ট অ্যাচিভমেন্ট ইন মিউজিক। হ্যাঁ— এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত এসে গেছে বলে আর ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের দিকে পা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। এইটেই ওদের কাছে সাবস্টিটিউট— ভেরি চীপ এ্যান্ড ইজিলি অ্যাভেইলেবল সাবস্টিটিউট ফর ইন্ডিয়ান ক্ল্যাসিকাল মিউজিক। সুতরাং ওরা মিউজিক্যালি ক্রমশ: আনট্রেইনড হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের নাইন্টিনথ্ সঞ্চুরী বা আরলি টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরীর থিয়েটারের যে সব দর্শক ছিলেন তারা গানের ব্যাপারে প্রচন্ড সমঝদার ছিলেন। যারা থিয়েটারের রেগুলার দর্শক ছিলেন তারা গানেরও মস্তবড় সমঝদার ছিলেন । স্টেজে দাঁড়িয়ে গাইত তো। এবং গানের একটা তাল ভুল হলে, একটা সুরের সামান্যতম এদিক ওদিক হলে চিৎকার হত হাউস থেকে। সেজন্য গিরিশবাবুদের থিয়েটারে অত ভাল গানের ট্রেনিঙ হতে হোত, অত ভাল করে গাইতে হোত। আমাদের এখন হচ্ছে কি— থিয়েটারে দর্শকদের দাবী -দাওয়া ক্রমশ নিচে নামছে। সেইজন্য নাটক খারাপ হচ্ছে— থিয়েটারও খারাপ হচ্ছে। যদি দর্শক ওয়েল ইনফর্মড এবং হাইলি আর্টিস্টিক হয় তবে থিয়েটারও অনেক উঁচুতে উঠতে প্রচন্ড বাধ্য হবে। চাবকে ওকে ওপরে রাখবে। কিন্তু আনক্রিটিকাল ম্যাস যদি হয় তাহলে পরে থিয়েটারের স্ট্যান্ডার্ড ক্রমশ নিচে নামবে। এখন এই যে নানা এলিমেট মিলে একটা আস্ত এলিমেন্ট তৈরী হচ্ছে কিনা এটা তো খুব কম পরিচালকের কাজেই হয়। এটা সব পরিচালকের কাজে হতে পারে না । কেননা ইট ইজ দা লাষ্ট ওয়ার্ড ইন থিয়েটার। এটা যে করতে পারছে, সেই, মানে থিয়েটারের শেষ পর্যায়ে পৌঁছোচ্ছে। এইটে জাজ করে তারপরে নাটক সম্পর্কে বিচার করা - এটা দর্শক করতে পারবে না। সাধারণ দর্শক করতে পারবে না। ক্রমশ তার সেই বিচারবুদ্ধি হারিয়ে যাবে। রঙ, সেট-ডিজাইন। মানে হচ্ছে নাট্য পরিচালকের রঙের সেন্স থাকতে হবে। শুধু রঙের সেন্স কেন- তার পিকাসোর ছবি দেখে থাকা উচিত। তার পিকাসো, অরি মাতিস, দেগা, ম্যনে, ম্যানে, তার সমস্ত জানা থাকা উচিত। এবং সে তার সেট ডিজাইনারের সঙ্গে

যখন কাজ করবে, সে বিখ্যাত পেইটিংসের ছবি দিয়ে, প্রিন্ট দিয়ে বুঝিয়ে দেবে যে আমি এই জিনিসটা চাই। সে তার সেট ডিজাইনারকে উদ্বুদ্ধ করবে, নিজের পেন্সিলের স্কেচ এঁকে নয়। এরকম একটা কিছু করে দাও তো- যেমন করে অনেকে। তা না করে তাকে পড়তে হবে পিকাসোর পেন্টিঙের বই। এবং তার ইমাজিনেসনের নিয়ারেস্ট পিকাসোর কি ছবি আছে সেইটেকে দেখাতে হবে। এইরকম জিনিস চাই। যাতে যে সিন পেইন্ট করবে, যে সিন ডিজাইন করবে সে যেন পিকাসোর ছবিতে ইন্টারেস্টেড হয়। সে পিকাসো দেখতে অভ্যস্ত হয়। পিকাসো, মাতিস, দেগা। তাই এই যে প্রশ্নটা করেছেন এটার কোন উত্তর হয় না। এটা হাতে কলমে করা যায়। [চতুর্থ ক্যাসেট এইখানে শেষ]

পা.ব. - পথ নাটিকা লেখা খুব সহজ, এরকম একটা ধারণা চালু আছে। যদি এ প্রসঙ্গে কিছু বলেন, ভালো হয়।

উ. দ. - তোমরা যে কিছু খেলে না।

পা.ব. - খাবো।

উ. দ.- পথ নাটিকা অত্যন্ত ঠান্ডা মাথার একটা ব্যাপার। আলোচনার ব্যাপার — খুব ব্রেখটিয়ান হয়ে উঠেছে। এর সঙ্গে বাহান্ন তেপ্পান্ন সালে আমরা যখন করতাম— তার, সেই পথনাটিকার কোন সাদৃশ্যই নেই। তখন প্রচণ্ড ইমোশোনাল একটা ব্যাপার ছিল। জাস্ট নাড়া দেওয়া, একটা স্লোগান তোলা। এখনও শেষের দিকে এসে স্লোগানের আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু মূলে প্লেটা খুব ঠান্ডা মাথায় ডিসকাসনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই তো পথনাটিকা।

পা.ব. - এমনি, মানে নাটকে যেমন এক একটা চরিত্রকে নানান ডাইমেনশন থেকে দেখতে পাই, পথ নাটিকায় তো ....

উ. দ.- ওয়ান ডাইমেনশনাল। এবং ওরা সবই নানা রাজনৈতিক মতবাদের প্রতীক মাত্র। কংগ্রেসের রাজনৈতিক মতবাদটা তুলে ধরবার জন্য একটা লোক আসছে। কমিউনিষ্ট পার্টির মতবাদটা তুলে ধরবার জন্য একটা লোক আসছে। শ্রমিক শ্রেণীর মতবাদকে তুলে ধরবার জন্য একজন লোক আসছে। এই রকম আর কি। তারা শুধু প্রতীকমাত্র। তারা কথা কইছে শুধু মতবাদগুলোকে পৌঁছে দেবার জন্য। মতবাদগুলির, মতাদর্শগুলির সংঘর্ষকে তুলে ধরবার জন্য। ইয়ে, তাদের নিজস্ব কোন চরিত্র-টরিত্র নেই। অবশ্যই ভাঁড়ামি করে হাসানোর চেয়ে উইট - অ্যাকচুয়াল কংগ্রেসীদের কথাবার্তায় যদি লোক হাসে তাহলে সেটা এফেকটিভ হাসি হয়, এটা আমরা বিশ্বাস করি। কোন রকম ভাঁড়ামি না করে ওদেরই কথা থেকে ওদেরকে হাস্যাস্পদ করে তোলা, ওরা যে পেপার টাইগার এইটা প্রতিপন্ন করা। এটা আমাদের অন্যতম টাস্ক বলে আমরা মনে করি। অনেক সময় আমাদের কমরেডরাই আমাদের সমালোচনা করে বলেছেন যে শত্রুকে এথ দূর্বল করে দেখানো উচিত নয়। শত্রুরা

আসলে দূর্বল নয়। শত্রুরা আসলে খুব শক্ত। আমি বলেছিলাম যে চিয়াং কাই শেকও খুব শক্ত ছিল। তাকে পেপার টাইগার বলতেন মাও সে তুং। স্ট্রাটেজিক্যালি আমরা তাদের যত শক্তই দেখি না কেন ট্যাকনিক্যালি তাদেরকে দূর্বলই মনে করতে হবে। নইলে তাদের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। যাই হোক চরিত্র বিশ্লেষণ-টিশ্লেষণ করবার জায়গা পথনাটিকা নয়। এটা রাজনৈতিক ডিসকাসনের জায়গা।

পা. ব. - ফলে রচনার দিক থেকে এর অন্য নাটকের সঙ্গে সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে।

উ. দ.- অনেক তফাৎ।

পা.ব. - প্রযোজনার দিক থেকে হচ্ছে। অভিনয়ের দিক থেকেও কি খুব তফাৎ হয়?

উ. দ.- হ্যাঁ, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। কেননা প্রথমত যেখানে আমরা অভিনয় করব সেখানকার কমরেডরা কয়েকটা মাউথপিস, কটা মাউথপিস দিতে পারলেন তার ওপর নাটকটার সব কিছু নির্ভর করছে। আমাদের হয়তো পাঁচটা চরিত্র আছে। কিন্তু দিতে পারলেন মাত্র দুটো মাউথপিস। তো দু'টো মাউথপিসই ব্যবহার করতে হবে। আর এগুলো ওপর থেকে ঝোলানোর কোন স্কোপ নেই, দাঁড়িয়ে - ষ্ট্যান্ডে। আর মাইক নিয়ে নিয়ে কথা বলতে হবে। সুতরাং অভিনয় বলতে যে সব জিনিস বোঝায় সে সব একদম ছাঁটাই হয়ে গেল। পর পর বক্তৃতা বলা যেতে পারে। কো-অর্ডিনেটেড বক্তৃতা এমনভাবে, যাতে কেউ কারোর বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু লোকের ভালো লাগে। লোকে খুব এনজয় করে। পথনাটিকা লেখা খুব কঠিন। আমি দেখেছি। অন্যদের পথনাটিকাও কিছু কিছু দেখেছি। আমাদের গুলোতে অভিনয় করেছি। খুব কঠিন পথনাটিকা লেখা। বসে গেলেই হলো না। দর্শককে হাসানো চাই। হাসির মত অস্ত্র আর নেই। এই প্রচন্ড অস্ত্রটাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা চাই। হাসাতে না পারলে পুরো জিনিসটা এতই গোমড়ামুখো একটা আলোচনার পর্যায়ে চলে যাবে যে তার চেয়ে বক্তৃতা দিলেই হয়, মিটিং করলেই হয়, পথনাটিকা না করে। এবং যিনি পথনাটিকা লিখবেন তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে প্রচন্ড শিক্ষিত হতে হবে, এবং লেটেস্ট রাজনৈতিক খবরাদি তাকে এমন রাখতে হবে, খবরের কাগজটাগজের কাটিং থেকে শুরু করে সব তাকে ভালো করে পড়ে এবং সংগে নিয়ে রাখতে হবে— কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারে মিটিংয়ে, তখন তাকে প্রমাণ দেখাতে হবে, বোকা বনে গেলে তো চলবে না। ইত্যাকার সব সমস্যা— হুঁ। দিন বদলের পালায় একবার চ্যালেঞ্জ করেছিল আমাদের। তা, সুখের বিষয় আমাদের সব কাগজপত্রই ছিল, কংগ্রেসেরই পাবলিকেশন থেকে খুলে দেখিয়ে দিতে পেরেছিলাম। ওরাই বলছে।

পা. ব. - একটা কথা, আপনি বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেছেন এবং লেখালিখিও করেছেন, সেইটা একটু সুনির্দিষ্টভাবে জানতে চাইছি— মানস গঠন বলুন, দিক্‌দর্শন বলুন

যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অধ্যয়ণ করা অবশ্য প্রয়োজন নাট্যকর্মীদের, সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক কর্মীদের। এখন, মার্কসবাদতো বিশাল, ব্যাপক— তার তিনটে দিক আছে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক। কোন দিকটার প্রতি বিশেষভবে আমাদের নাট্যকর্মীদের বা সাংস্কৃতিক কর্মীদের নজর দেওয়া উচিত, যেটা তাদের নাট্যচর্চাকে বা সংস্কৃতি চর্চাকে real senseএ পথ দেখাবে?

উ. দ. - দার্শনিক। মানে ডায়লেক্টিকাল মেটিরিয়ালিজম, হিস্টোরিকাল মেটিরিয়ালিজম।

পা. ব. - আমাদের দেশের নাট্য কর্মীদের আপনি দীর্ঘদিন ধরে দেখছেন, এবং আপনার গ্রুপে তো দেখছেনই বটে— আপনার কি মনে হয় এ ব্যাপারে তারা সত্যিই খুব ভাবনাচিন্তা করেছে, বা তাদের চেতনা অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে, যার প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছি নাটকে?

উ. দ. - কি— মার্কসবাদ- লেনিনবাদ সম্বন্ধে?

পা. ব. - মানে দার্শনিক দিক থেকে তারা ধরতে পেরেছেন কিনা? মার্কসবাদ- লেনিনবাদ মানে ওই গোদা গোদা স্লোগান নয়—

উ. দ. - না, না। মার্কসবাদ লেনিনবাদ তারা একেবারেই আয়ত্ব করতে পারেন নি। না - না। প্রশ্নই ওঠেনা। মার্কসবাদ- লেনিনবাদ পড়ানোই হচ্ছে না - অধ্যয়নই হচ্ছে না। আয়ত্ব করবে কি করে। এই যে দিনরাত নাটক নিয়ে খাটছে, এর সংগে যদি মার্কসবাদ, লেনিনবাদ অধ্যয়ন করতো তাহলে এতদিনে অনেক এগিয়ে যেতো। ওরা নাটক নিয়ে যে পরিশ্রমটা করে সেটার পেছনে এসে যদি দাঁড়াতো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের থিয়োরি, তাহলে পরে ওরা বহুদূর অগ্রসর হয়ে যেতে পারতো— ওরা পড়াশোনা করে না। খুব কম করে— যারা করে তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগে— তারা এমনিই পড়ুয়া লোক। তাদেরকে কেউ আটকাতেই পারবে না— তাঁরা পড়বেনই। তাদের কেউ যদি infact নিষেধ করে, তবুও তারা পড়বেন। কিন্তু সংগঠিত ভাবে — সুসংগঠিত ভাবে যে ক্লাস করা উচিত, সবাই এক সংগে বসে যে পড়া উচিত— collectively, সেটা হয় না।

পা. ব.- আজকের মত এইখানেই শেষ।

উ. দ. - বেশ। (হাসি)।

— শেষ —

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যকর্মী **পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়** ও **সুবীর মুখোপাধ্যায়**, (দু'জনই প্রয়াত)

# ভাষা ও মেয়েরা

**পবিত্র সরকার**

মেয়েরা কোন ভাষা বলবে, এ প্রশ্নটা অনেকের কানে অদ্ভুত ঠেকতে পারে প্রথমে। কেন? যে ভাষায় তারা স্বচ্ছন্দ সেই ভাষাই বলবে, বলবেন অনেকে। জন্মের ভাষা, শিক্ষার মান্য ভাষা (আমাদের কথায় 'শি-মাতৃভাষা'), যে (যে) বিদেশি ভাষা সে বলতে পারে- উপযুক্ত ক্ষেত্রে সে সবই বলবে! অনেকে পুরোযোচিত বিজ্ঞতার দাবি নিয়ে ব্যঙ্গ করবেন, মেয়েরা মুখ খুললে আটকায় কে। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সেই 'হিং টিং ছট' মেয়েদের কথা বলা আর নৈঃশব্দ্য নিয়ে বেশ ঠাট্টা করেছেন— 'মেয়েরা করেছে চুপ এমনই বিভ্রাট', 'একদন্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ'।

না, আমরা ওই পুরুষলালিত সংস্কার বা রসরসিকতার মনোভাব নিয়ে এ লেখা লিখতে বসিনি। গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস গেল, সেই সূত্রে, ভাষার দোকানদারি করি বলে একটু ভাবছিলাম বিষয়টা নিয়ে। এমন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা বিজ্ঞানের স্নেহাস্পদা অধ্যাপক ফিরোজা ইয়াসমিন তাঁর একটি লেখার লিংক পাঠালেন, যা ৮ মার্চ 'প্রথম আলো' দৈনিকে ছাপা হয়েছিল। তা পড়েই এই লেখাটার কথা মনে এল, ফিরোজাকে ধন্যবাদ।

একটা ভাষা যারা বলে তারা সবাই যে এক রকম ভাষা বলে না তা আমরা জানি। আমরা নানা জায়গায় বলেছি যে, ওই 'একটা' ভাষা কথাটা খুব সরল ধারণা নয়, একটা ভাষা আসলে অনেকগুলি ভাষা রূপের একটা গুচ্ছ। আমাদের বাংলা ভাষায় অঞ্চলে অঞ্চলে ভেদ আছে যেমন, যেগুলিকে আমরা বলি শ্রেণিভাষা। সাধারণভাবে ইংরেজি dialect আর sociolect এ দুয়ের প্রতিশব্দ। আমরা জন্মের পর বাড়িতে মা আর অন্যান্যদের কাছ থেকে যে প্রথম ভাষাটা শিখি, তা আসলে ওই স্থানীয় উপভাষা আর আমার শ্রেণিভাষার মিশ্রণ। এ সবের উপরে আধিপত্য করে একটা মান্য ভাষা বা Standard dia-sociolect, যা উপভাষা আর শ্রেণিভাষার সকলেই নানা আচারিক বা ফর্ম্যাল উপলক্ষ্যে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। কারণ লেখাপড়া চলে মূলত ওই মান্য বা প্রমিত ভাষায়।

সমাজে মেয়েদের একটা শ্রেণি হিসেবে যে সেই প্রাচীন যুগ থেকে দেখা হয়েছে তার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কারণ আছে, সেগুলির বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই--- সমাজবিজ্ঞানীরা সে কাজ করেছেন। আর শ্রেণি হিসেবে আলাদা হলেই তাদের ভাষাতেও যে ওই শ্রেণিবৈশিষ্ট্য অল্পবিস্তর দেখা দেবে তাতে কোনও বিস্ময় নেই। সংস্কৃত নাটকে উঁচু ঘরের মেয়েরা শৌরসেনী প্রাকৃতে কথা বলত। আধুনিক গল্পে-উপন্যাসে-নাটকে লেখকেরা অনেকদিন

আগে থেকেই তা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন। গত শতাব্দীতে অটো ইয়েসপার্সন এ নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁর ‘ল্যাঙ্গুয়েজ’ বইয়ে, বাংলায় সুকুমার সেনও এ বিষয়ে প্রারম্ভিক গবেষণা করেছিলেন। আমার প্রয়াত ছাত্রী শর্মিলা বসু-দত্তও এ বিষয়ে আমার তত্ত্বাবধানে মূল্যবান গবেষণা করেছিল। সেই সব আলোচনায় বিস্তারিত গিয়ে কাজ নেই।

২.

বিষয়টার একাধিক অভিমুখ আছে। সেগুলিকে এই ভাবে সাজাই। মূলত বাংলা আর ইংরেজি ভাষাকে অবলম্বন করে আমাদের আলোচনা আবর্তিত হবে।

ক. নারীর কথা বলার অধিকার;

খ. নারীর ভাষার বৈশিষ্ট্য

গ. ভাষায় ও সমাজে নারীর গুরুত্ব ও ভূমিকার অস্বীকৃতি, নেতিমূলক বিচার এবং বহিষ্করণ;

ঘ. নারীবাদী আন্দোলন, নারীর সমানাধিকারের বিবেচনায় সেগুলির সংশোধন এবং আরও নানা সম্ভাবনা।

**ক. নারীর কথা বলার অধিকার**

নারীবাদী আন্দোলনের ফলে এই কথাটি আমাদের বোধে একটু বেশি করে সঞ্চারিত হয়েছে। মানুষেরই শুধু ভাষা আছে আমরা সেটা জানি, কিন্তু প্রথাগত সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু পুরুষপ্রাধান্য ছিল, কাজেই ভাষা ব্যবহারে বা কথাবার্তায় নারীর সমান অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না, কোনও কোনও সমাজে হয়তো এখনও নেই। নারীদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা নয়। সেটা তাদের যৌথ কাজ বা অবকাশে হতেই পারে। রান্নাঘরে, ঢেঁকিশালে, পুকুর বা নদীর ঘাটে, বা নারী কর্মীরা যেখানে একসঙ্গে কাজ করেন সেখানে তাদের কথা বলার অবকাশ কম বেশি আছে বা ছিল নিশ্চয়ই। কোথাও কর্মক্ষেত্রের শৃঙ্খলা রক্ষার শর্ত মানতে হত, সে বলা বাহুল্য। এ নিয়ে পুরুষদের কটাক্ষও তারা শুনেছে। এই অধিকারের নানা দিক আছে। এক হলে দৈনন্দিন জীবনে পুরুষের সাংসারিক আধিপত্যে যেহেতু নারী কিছু অবদমিত থাকে বা ছিল, তাই তাদের কথা বলার অধিকার কম ছিল।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। নারীর ভাষায় শ্রেণিবৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়, ফলে মধ্যবিত্ত আর তথাকথিত ভদ্রঘরের নারীর ভাষায় যে স্বরগ্রাম থাকে, নিরক্ষর গ্রামীণ বা বস্তিবাসিনীর তা নাও থাকতে পারে। গ্রামাঞ্চলে দূর থেকে ডাকাডাকির প্রয়োজনে গ্রামীণ নারীর কণ্ঠস্বরও তীব্র হতে পারে। স্বাভাবিক কথাবার্তার সঙ্গে ঝগড়ার কণ্ঠস্বর সব ক্ষেত্রেই আলাদা হতে পারে। তবে মধ্যবিত্ত আর ‘ভদ্র’ পরিবারে নারীদের নিম্নস্বরে কথা বলাকে শালীন বলে মনে করা হয়। মেয়েদের উচ্চকণ্ঠে কথা বলাটা সব সময়েই সমালোচনার নজরে দেখা হত। পারিবারিক সিদ্ধান্তে মেয়েদের অংশগ্রহণ খুব বেশি ছিল না বেশিরভাগ

পরিবারে, 'যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো না'— এ কথাটা পুরুষের মুখে বহুবার উচ্চারিত হয়েছে, জীবনে আর গল্প-উপন্যাসে-নাটকে। বাঙালির নারীদের কথায় 'ওগো', 'হ্যাগো' ইত্যাদির ব্যবহার, সুরের আধিক্য ইত্যাদি লক্ষণীয়। গালাগালের ভাষায় নারীদের উদ্ভাবনেও নিজস্বতা আছে, যেমন 'ভাতারখাকি', 'চোখখাকি', 'ঘরজ্বালানি' ইত্যাদি পুরুষের ভাষায় না থাকাই সম্ভব। ছড়াকাটা, প্রবাদপ্রবচন ইত্যাদিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ বেশি। যেমন এই প্রবাদটি — 'খাইয়াদাইয়া মনে পরসে, ননাইসের মায় মরসে' (খেয়েদেয়ে মনে পড়েছে শাশুড়ি মারা গেছে)— মেয়েদের সৃষ্টি বলে মনে করা হয়।

**খ. অস্বীকৃতি, নেতিবাচক বিচার**

এবার পুরুষের তৈরি সামাজিক শ্রেণি ও জীবিকাতে নারীর অবস্থান নির্দেশ করে কিছু শব্দ সব ভাষাতেই তৈরি হয়েছে, যেগুলির নেতিবাচক অর্থ দাঁড়িয়ে গেছে, কখনও গালাগালের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। যেমন ইংরেজিতে whore, slut ইত্যাদি, বাংলায় 'মাগী' (গ্রামাঞ্চলে এর অর্থ নেতিবাচক না হলেও), এবং মান্য ভাষায় তৎসম 'বেশ্যা', 'বারাঙ্গনা', 'বারবনিতা', 'বারযোষিৎ' ইত্যাদি শব্দ। এগুলির কোনও পুংলিঙ্গ হয় না, যদিও নানা সমাজে বারাঙ্গনাদের পুরুষ সংস্করণ ছিল না তা নয়। তবু সমাজে জীবিকা হিসেবে তাকে বেশি স্বীকার করা হয়নি, শুধু নারীদের ক্ষেত্রেই তা চিহ্নিত হয়েছে বেশি করে। কারণ এই জীবিকা তৈরি হয়েছে পুরুষেরই প্রয়োজন ও আয়োজনে। ভারতীয় হিন্দুদের সামাজিক ভাষায় 'সতী' কথাটারও কোনও পুং সংস্করণ নেই, কারণ পুরুষশাসিত সমাজ সতীত্বরক্ষা শুধু মেয়েদের দায় বলে চাপিয়ে দিয়েছে, তাই তারা 'অসতী' হতে পারে। 'অসৎ' কথাটায় সেই নৈতিক ধিক্কার নেই, এর সঙ্গেই যুক্ত নারীদের সতীত্ব বা নৈতিকতা সম্বন্ধে পুরুষশাসিত সমাজের কট্টর ধারণা, নানা ধর্মে যার উচ্চারণ দেখা গেছে। রোমান ক্যাথলিক ধর্মে নারীকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে, ইসলামও তার সম্বন্ধে খুব ভক্তি নেই— তা তার পোশাকসংক্রান্ত বিধিনিষেধের মধ্যে দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মে জাতকের ইত্থীবগ্গে তাকে প্রবল কামতাড়নার শিকার বলে বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে (বৌদ্ধধর্মের শেষদিকেও) নারীকে দেবী হিসেবে মানলেও বিধবাদের উপর নানা বিধিনিষেধ (পোষাক, খাদ্য, বিবাহ বা অন্যান্য শুভ অনুষ্ঠানে উপস্থিতি), এবং 'বারো হাত কাপড়ে কাছা নেই' ইত্যাদি লোকপ্রবাদ তাদের সামাজিক আর পারিবারিক ক্ষেত্রে খুব শ্রদ্ধার আসনে বসায়নি। বাঙালি ছেলে বিয়ে করতে যাওয়ার সময় মাকে যে বলত, 'মা তোমার জন্যে দাসী আনতে যাচ্ছি' সেটা এখন চালু আছে কিনা জানি না। সতীদাহের কথা ছেড়েই দিলাম।

কিন্তু ভাষাতেও কিছু লক্ষণ থেকে গেছে যা নিয়ে নারীবাদীরা আপত্তি করেছেন। যেমন ভষার অভিধানে উপরের শব্দাবলি কিছুটা ইঙ্গিত দেয় যে, সমাজে অনেক ভূমিকাও

নারীদের জন্য ছিল না। যেমন ইংরেজি chairman, batsman, ombudsman, spokesman, cameraman ইত্যাদি। বাংলাতে 'রাষ্ট্রপতি', 'সভাপতি' , 'বিচারক' ইত্যাদি কথায় নারীদের বহিষ্করণের ব্যাপার ছিল।

ব্যাকরণে স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ করেও সমস্যা হয়েছে। নারীরা প্রশ্ন তুলেছেন, লিঙ্গপ্রকরণের তালিকায় যেন মনে হয় পুরুষই আগে, তার পরে নারী। ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা আমাদের মুখের কথায় যে সব 'জোড় শব্দ' দেখা যায়, যেমন 'নর-নারী', 'সাদা-কালো', 'আলো-অন্ধকার' ইত্যাদি — তাই নিয়ে একটা দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছেন, যে ইউরোপের সংস্কৃতিতে প্রথমটার প্রতি একটু পক্ষপাত কাজ করেছে, প্রথমটাই যেন প্রধান (privileged) এবং ভালো। এটাকে দেরিদার প্রদর্শিত পথে দুভাবে সমালোচনা করা যায়। এক, দ্বিতীয়টা তুচ্ছ কোনও ভাবেই নয়। নারী ছাড়া পুরুষের অস্তিত্ব বৃথা, অন্ধকার ছাড়া আলোকে চিনব কি করে? অর্থাৎ একটি আর একটিকে সংজ্ঞায়িত (define) করে, একটির পরিচয়েই আর একটির পরিচয়। আর সেহেতু প্রথমটি ভালো, দ্বিতীয়টি তুলনায় নিরেস, এই সিদ্ধান্তও ভুল। বাইবেলেও পুরুষের বুকের বাঁ-দিকের হাড় থেকে নারীকে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন বলে বলা হয়েছে। তাতে সকলে যে সন্তুষ্ট হন তা নয়। সব ধর্মেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তিনি পুরুষ—এ ব্যাপারটাও নারীবাদীদের আলোচনায় উঠে এসেছে। ব্যাকরণে লিঙ্গান্তরে সব সময় পুরুষবাচক শব্দটি আগে, নারীবাচক শব্দটি পরে, এ বিষয়টিও নারীবাদীদের নজরে এসেছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, এতে মানুষের মনে একটা ভুল বার্তা যেতে পারে যে, পুরুষেরাই প্রাথমিক এবং সেহেতু প্রধান অস্তিত্ব।

**গ. সংশোধন**

নারীর অধিকারের পুনপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিবিধানের আলোচনায় না গিয়ে বলি, ভাষাগত সংশোধন যা হয়েছে সেগুলির কথা। ইংরেজিতে আপনারা অনেকেই জানেন যে, man সরিয়ে দিয়ে person করা হয়েছে, chairperson, ombudsperson, cameraperson, spokesperson, বা সম্প্রতি batsman কে উৎখাত করে batter. Draughtsman- এর বেলায় কিছু করা হয়েছে কি না জানি না। অন্যদিকে যে শব্দগুলির স্ত্রীলিঙ্গ ছিল, যেমন জীবিকাসংক্রান্ত নানা শব্দে, actress, mistress- এ যেমন , সেগুলির ক্ষেত্রে স্ত্রীলিঙ্গরূপ বাদ দিয়ে পুংলিঙ্গ শব্দটিকেই নরনারী উভয়কে বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, actor, doctor, master বা teacher. এর তালিকা বাড়ানোই যায়।

এই ভাষাগত পরিবর্তনেই নারীজাতির প্রতি অবহেলা ও পুরুষপক্ষপাতের দর্শন থেকে মানবসমাজ মুক্ত হবে কি না তা বলা মুশকিল। তাই এর পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলনও চলছে। ভারতের মতো দেশে কন্যাভ্রুণহত্যা, নারীধর্ষণ, বাড়ির অমতে বিয়ে করলে 'সম্মানহত্যা'

বা 'খাপ' পঞ্চায়েতের যেমন রমরমা আছে, সেখানে শুধু ভাষা সংশোধন যথেষ্ট নয়। মেয়েদের লেখাপড়া ও সামাজিকভাগে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ, অর্থনৈতিক অধিকার, বিধবাদের প্রতি অমানবিক অবিচার এবং অন্যান্য অধিকার না দিলে ভাষা-সংশোধন নিছক বাইরের পালিশ হয়ে থাকবে। এখনও বহু স্বামীর মুখে স্ত্রীকে ' যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বল কেন?' এ তিরস্কার শোনা যায়। সরকারি খাতা পত্রে 'মুচি', 'চামার', 'নাপিত' ইত্যাদি শব্দের বদলে 'চর্মকার', 'সুন্দর', বা দলিতদের 'হরিজন' নাম দেওয়ার ফলে তাঁদের অবস্থা সামান্যই বদলেছে। হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথাও ভারতের নানা জায়গায় যেমন ছিল তেমনই আছে। লজ্জার কথা হল, সাধারণভাবে পুরুষের তুলনায় মেয়েরা একটু তুচ্ছ 'জাত', এই বিশ্বাস ভারতের নানা জায়গায় এখনও বদ্ধমূল।

তাই যথার্থ শিক্ষা যতদিন না সমাজের সর্বস্তরে বিস্তারিত হবে, সকলের মধ্যে এই জ্ঞান আর উপলব্ধি পৌঁছাবে যে সব মানুষ সমান, জাতিভেদ একটা কুৎসিত কুসংস্কার,পুরুষ আর নারীর মধ্যে শারীরিক সংগঠনের তফাত থাকলেও পারিবারিক , সামাজিক আর মানবিক অধিকারের দিক থেকে যেমন কোনও পার্থক্য করা উচিত নয় তেমনই তাদের বর্ণনা করার ভাষা বা কথা বলার অধিকারের মধ্যেও কোনও ভেদ থাকা উচিত নয়, ততদিন ভাষায় হোক, সামাজিক অবস্থানে হোক, নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ভিত্তি আর উপরিকাঠামোর সম্পর্কের মধ্যেই মার্কস ও এঙ্গেলস এই সার কথাটি বলে গেছেন। সমস্যা এই যে, তা থেকে আমরা এখনও শিক্ষা নিতে পারিনি।

---

লেখক ঃ **পবিত্র সরকার,** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

# বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা

রথীন চক্রবর্তী

প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই স্টুপিড হয়ে উঠেছে। ওপরতলার ভাবনাগুলিকে নীচের তলার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। অথচ ভাবনা-চিন্তা উঠে আসা উচিত নীচের তলা থেকেই। আজ থেকে ২০ বা ৩০ বছর পরে বামদলগুলি আজ যা আছে তা আর থাকবে না। এমনও হতে পারে যে তাদের দু-একটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। তখন নতুন কিছু বেরিয়ে আসবে... সবিশেষ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য গণ-আন্দোলন হবে।'

১৯৮০ সালের মার্চ মাসে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ জাঁ পল সার্ত্র একথা বলছেন তাঁর প্রয়াণের ঠিক কিছু সময় আগে, বিছানায় শোয়া অবস্থায় তাঁর দেওয়া শেষ সাক্ষাৎকারে। আমরা, পৃথিবীর মানুষ ঠিক এমনই এক প্রান্তিক অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। ১৯৭০-এর দশকে বিখ্যাত ফরাসি লেখক ও সাংবাদিক মিশেল রিবাকা এক বক্তৃতায় জাঁ পল সার্ত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, সার্ত্রের চিন্তার জগৎ বিস্তৃত হয়েছে তিনটি পর্যায়ে, তিনটি ভিত্তিতে।—স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী- ফরাসি বিপ্লবের যা ছিল মূল স্তোত্র। এই তিনটি স্লোগানেরই পৃথক তিনটি ধারণান্তর রয়েছে, তিনটি পৃথক দার্শনিক মনন। সার্ত্রের জীবনে দেখি তারই ছায়া। ১৯৩০-এর দশকে সার্ত্র একজিস্টেন্সিয়ালিজমের প্রবক্তা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকাল থেকে তিনি মার্ক্সবাদী, এবং তারপর থেকে মৃত্যু অবধি তিনি অ্যানার্কিজমকেই আশ্রয় করেছেন। অন্যদিকে রিবাকের এই কথার মধ্যে যুক্তি যতটা আছে, অযুক্তির বিস্তার, স্টিফেন প্রিস্ট এরকম একটা অভিমত ব্যক্ত করেই বলেছেন, এই ব্যাখ্যা এতই সরলীকৃত যে সাধারণভাবে অধিকাংশ মানুষ এবং রাজনীতির উপরিমহল এমনই এক অভিমত সাব্যস্ত করেন। সার্ত্রের ভাবনাবোধের জীবনে মার্ক্সবাদের একটি অধ্যায় এসেছে, কিন্তু তার প্রসার একজিস্টেন্সিয়ালিজমের ছাতার তলায়। তাঁর জীবনে অ্যানার্কিস্ট ভাবনাও এসেছে, মার্ক্সবাদের একটি অধ্যায় এসেছে, কিন্তু সেটাও একজিস্টেন্সিয়ালিজমের অভিভাবকত্বকে দূরে সরিয়ে রেখে নয়। এবং এটাও মনে রাখতে হবে, সার্ত্রের একজিস্টেন্সিয়ালিজম অষ্টাদশ শতকের একজিস্টেন্সিয়ালিজম থেকে বহু দূরে প্রভাবিত। চিন্তার এই যে নবতর উত্তরণ, তাকে আজও পুরোনো বলে শনাক্ত করা যায়নি, তাকে অচল বলে ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না। এই কারণেই সার্ত্র হয়ে ওঠেন, প্রিস্টের ভাষায়, ফ্রান্সের মহান চিন্তাবিদদের একজন।

জাঁ পল শার্ল আয়মার সার্ত্রের জন্ম প্যারিসে, ১৯০৫ সালের ২১ জুন। বাবা জাঁ বাপ্তিস্ত ছিলেন নৌ বাহিনীর অফিসার। একবছর বয়সের সময় সার্ত্র হারান তাঁর বাবাকে, জাহাজে করে চীনে যাওয়ার সময় ক্রান্তীয় রোগ এস্টারোকোলাইটিসে যাঁর বেদনাদায়ক মৃত্যু। সুতরাং বাবাকে চেনা হল না, মা হয়ে উঠলেন তাঁর ঈশ্বর। কিন্তু তাঁর থেকে অনেক

বেশি সান্নিধ্য পেলেন সার্ত্র তাঁর মায়ের বাবা, অর্থাৎ দাদামশায় শার্ল শ্‌ভেইৎজারের। তিনি ছিলেন জার্মান ভাষার অধ্যাপক। প্রচুর বই পড়তেন তিনি। কয়েকটি বই লিখেওছিলেন। শার্ল তাঁর নাতির সঙ্গে আচরণ করতেন বন্ধুর মতো, সমবয়সীর মতো। ফলে মায়ের প্রভাব অনেকটাই প্রান্তিক অবস্থান গ্রহণ করল। এবং যেহেতু দাদামশায়ের আগলে রাখা ব্যাপারটা একটু অতিরিক্ত মাত্রা নেয়, সেহেতু, স্বাভাবিকভাবেই সার্ত্র ছোটবেলা থেকেই চূড়ান্ত বন্ধুহীন। দাদামশায়ের ব্যক্তিগত লাইব্রেরিই হয়ে উঠল তাঁর নিজস্ব ভুবন। সেখানে শুধু অক্ষর আর অক্ষর, শব্দ আর শব্দ। হয়তো এই কারণেই তাঁর আত্মজীবনী 'শব্দ' নামে অঙ্কিত হতে চেয়েছিল। এই আত্মজীবনীতেই লিখেছেন সার্ত্র: " আমি বড় হয়েছি নি:সঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে, প্রাপ্ত বয়সে আমি একেবারে একা, যার বাবা নেই, মা নেই, বাড়ি নেই, গৃহসুখ নেই, প্রায় একটা নামও নেই যার।' আবার এই আত্মজীবনীতেই লিখেছেন সার্ত্র যে, পিতার মৃত্যু ছিল তাঁর কাছে আশীর্বাদের মতো, কারণ জীবনে স্বাধীন হওয়ার প্রথম সুযোগ আসে সেখান থেকেই।

১৯২৫ সালে সার্ত্র ভর্তি হন ইলোকে নরমেল সুপিরিয়রে। তাঁর সহপাঠী ছিলেন পল নিজান, পরে যিনি বিখ্যাত বামপন্থী সাংবাদিক হিসাবে পরিচিত হন। মরিস মার্লোপন্তি, পরবর্তী কালে বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং সিমঁ দ্য বোভোয়া, যিনি সার্ত্রের আজীবনের সঙ্গিনী হয়েছিলেন, বিবাহ না করেও যিনি স্ত্রীর থেকে কোনও অংশে কম ছিলেন না, এবং পরবর্তীকালে যিনি সবিশেষ আলোচিত হন নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে।

১৯২৯ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩১ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত সেনাবাহিনির আবহাওয়া বিভাগে চাকরি করেন সার্ত্র। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন লা হাভ্‌র-এ। ১৯৩৩-৩৪ সালে তিনি অধ্যাপনা করেন বার্লিনের একটি ফরাসি প্রতিষ্ঠানে। এখানেই তিনি গভীরভাবে যুক্ত হন নানা দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য গড়ে ওঠে হেগেল এবং হুসার্লের মৌলিক চিন্তা-ভাবনার সাথে। আর এরই গতিধারায় জন্ম নেয় "Imigination' , ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত সার্ত্রের প্রথম প্রবন্ধের বই। এর তিনবছর পরে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় গ্রন্থ 'Sketch for a theory of Emotions', এবং এর একবছর পর বেরয় 'The Psychology of Imagination'. এই তিনটি গ্রন্থ সম্মিলিতভাবে সার্ত্রকে টেনে নিয়ে গেল সারা বিশ্বজুড়ে প্রবহমান দার্শনিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা কেন্দ্রে, বলা যেতে পারে বিতর্কেরও, যা সার্ত্রের জীবনে উত্তরোত্তর বেড়েছে, মৃত্যু পর্যন্ত। এই বিতর্কই তাঁকে দিয়েছে ঔজ্জ্বল্য এবং দ্যুতি।

এই সময়কাল বড় সাধারণ ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নে ট্রটস্কি- বিতর্ক চূড়ান্ত চেহারা নেয়, এবং ১৯২৯ সালে ট্রটস্কি সেখান থেকে বিতাড়িত হলেন। ফ্রান্সের রাজনীতিতে দেখা দিল বড় রকমের গোলমাল। বামপন্থী ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে শুরু হল সংঘাত, প্রতিটি ক্ষেত্রে যার ফায়দা তুলেছে দক্ষিণপন্থীরা। ১৯৩৬ সালে শুরু হল স্পেনে গৃহযুদ্ধ। ফ্যাসিবাদী

ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল ইউরোপ জুড়ে। যে দর্শনের বৃত্তকে হাতে নিয়ে গর্ব করত ইউরোপ, সেই ইউরোপের কাঁধে নেমে এল দর্শনের সংকট। এই সময়ে সার্ত্র বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করেন, গল্প লেখেন, যেগুলি প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে এবং ১৯৩১ সালে শুরু করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ল নোজে' লেখার কাজ , যা বাংলায় অনুবাদ করেছেন মৃণালকান্তি ভদ্র 'বিবমিষা' নামে। এই সময়ে তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ, ১৯৩৭ সালে দর্শন বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা ' Recherche Philosophic' প্রকাশ, যা বেশিদিন ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ অবশ্যই ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতা, যার অন্যতম প্রকাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তার আগে, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় সার্ত্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'Nausia', যার মধ্যে আমরা পেলাম সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে উচ্চকিত কণ্ঠস্বর।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। সার্ত্রকে যোগ দিতে হল সেনাবাহিনীতে। ১৯৪০ সালের ১৪ জুন ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ঢুকল জার্মান সেনাদল। সার্ত্র বন্দি হলেন এবং তাঁকে চালান করে দেওয়া হল বন্দিশিবিরে। সার্ত্রের জীবনে এ-ও এক বিরাট অভিজ্ঞতা। এখানেই সার্ত্রের প্রথম নাটকের জন্ম এবং সেই নাটকের অভিনয়।

১৯৪১ সালে সার্ত্র মুক্তি পান, কলেজে শিক্ষকতা করতে থাকেন এবং গোপনে প্রতিরোধ -সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থেকে রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়, প্যারিস থেকে সরে যায় জার্মান সেনাদল। এরপর সার্ত্র আমৃত্যু লেখাকেই তাঁর পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু , ইতিপূর্বেই, ১৯৪৩ সালে, প্রকাশিত হয়েছে, 'Being and Nothingness', সেখান থেকে শুরু হল আধুনিক অস্তিত্ববাদের তাত্ত্বিক অভিযান, যা সার্ত্রেরই দার্শনিক প্রবন্ধন। এই দর্শনগ্রন্থ রচনার পাশাপাশি সার্ত্রকে নিযুক্ত দেখি, 'The Flies' (১৯৪৩) এবং 'No Exit' (১৯৪৪) নাটক রচনায়। প্রায় এই সময়ই তিনি তিন খন্ডের উপন্যাস লেখায় হাত দেন, যার মূল শিরোনাম 'Roads to Freedom'। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তিনটি পৃথক উপনামে : 'No Exit' (১৯৪৪) নাটক রচনায়। প্রায় এই সময়ই তিনি তিন খন্ডের উপন্যাস লেখায় হাত দেন, যার মূল শিরোনাম 'Roads to Freedom'। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয় তিনটি পৃথক উপনামে : 'The age of Reason', ' The Reprieve' এবং ' Iron in the Soul'। এই সৃজনমূলক সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে তাঁর দর্শনচিন্তারই প্রতিচ্ছবি হয়ে। অন্যদিকে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার নানা প্রশ্ন, নানা উত্তরহীন জিজ্ঞাসা জায়গা নিয়েছে তাঁর নাটকে— ১৯৪৮ সালে ' Dirty Hands', ১৯৫১ সালে ' Lucifer and the Lord', ১৯৫৪ সালে ' Nejrasov', ১৯৬০ সালে 'Looser Wins' প্রকাশিত হয়েছে। এবং সার্ত্রে চলে যান সেই মূল প্রশ্নে, ' What is Literature?'এ যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়ে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে, এই গ্রন্থকে 'Being and Nothingness' -এর আর একটি 'মর্ডারেট' প্রকাশ বলা যায়, যার বিষয় হয়ে ওঠে সাহিত্যের দর্শন। লেখক সৃষ্টি করেন সাহিত্য। পাঠক

তাকে লালন করে। লেখক চলে যাওয়ার পরেও সেই সাহিত্য থেকে যায়, বিচরণ করে নতুনতর পাঠকের মধ্যে। এই যে সাহিত্য, তার প্রকৃত রং তাহলে কী? এই ভাবনা চলতে চলতেই সার্ত্র অনুভব করেন, পৃথিবী এক নতুন যুগে পা দিয়েছে। এই যুগের সব থেকে বড় আতঙ্ক সাম্রাজ্যবাদ। যে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রশ্ন তিনি তুলেছিলেন তারুণ্যে, যাকে তিনি স্পর্ধার চূড়ায় নিয়ে গেছেন যৌবনের উচ্ছ্বলতর পর্বে, রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘাতের পর সংঘাত রচনা করে, সেই স্বাধীনতাকে দেখলেন নতুনভাবে বিপন্ন হতে। তাঁর এই অবলোকন ধরা পড়ে ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সময়কালে 'Les Tempers Modernes' পত্রিকায় লেখা তাঁর রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধসমূহের মধ্যে। ১৯৭২ সালে এই প্রবন্ধসমূহের যে সংকলন প্রকাশিত হয়, সার্ত্র তার নাম দেন 'Situations'। কার্যত একে সমকালের গতিধারা-চিহ্নিত 'দর্পণ' নামে অভিহিত করলেও বাহুল্য কিছু হয় না।

আত্মজীবনী 'Words'-এ ধরা ছিল সার্ত্রের জীবনের স্মৃতিগ্রথিত একেবারে গোড়ার দিকের দশ বারো বছরের কথা। এরপর সার্ত্র লেখেন ' The Prime of Life", ছাত্রাবস্থা থেকে প্রায় ষাট বছর বয়সী সার্ত্রকে এখানে জানা যায়। এই গ্রন্থেই অকপটে তিনি বলেছেন সঙ্গিনী বোভোয়ার কথা, প্রেম সম্পর্কে তাঁর অনুভব, পুরুষ ও নারীর সামাজিক সম্পর্কের তাৎপর্য । ১৯৬২ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এবং খুবই বিস্ময় লাগে, ১৯৬৪ সালে তাঁকে সাহিত্য নোবেল পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষিত হয়, কিন্তু তা তাঁর আত্মজীবনীর প্রথম পর্বের জন্য, সমগ্রতার জন্য নয়। সার্ত্র এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন, কারণ আলজিরিয়ার মানুষের ওপর তখন চলছে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের নির্মম নিপীড়ন। আলজিরিয়ার মানুষ কঠিন মুক্তিসংগ্রামে রত। সার্ত্র প্রকাশ্যেই সেই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছেন, প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে, নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান কার্যত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি সক্রিয় প্রতিবাদ হয়ে উঠবে, এবং আগামী দিনেও এই প্রতিবাদ তার কণ্ঠস্বরকে হারাবে না। লিখিত ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে যদি এই পুরস্কার দেওয়া হত তাহলে আমি অবশ্যই বিবেচনা করতাম। সেক্ষেত্রে সম্মানটা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে নয়, একটি জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের জন্য জানানো হত। কিন্তু বাস্তবে আলজিরিয়ার স্বাধীনতার সমর্থনে সোচ্চার হওয়ার ফলে আমার ফ্ল্যাটে দু-দু'বার বোমার আক্রমণ ঘটে গিয়েছে। সুইডিশ আকাদেমির মতে, আমার 'কল্পনাসমৃদ্ধ রচনাসমূহ স্বাধীনতা কামনা ও সত্যান্বেষণের মহিমায় ভাস্বর। বর্তমান যুগের ওপর তো সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে।' আর এই কারণেই আমাকে নোবেলের মতো 'বিরল সম্মানে ' ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু এটা কোনও ঢঙের স্বাধীনতা? পশ্চিমি স্বাধীনতা? তার মানেই তো একজোড়ার জায়গায় দু'জোড়া জুতো পরা, আর অন্যকে ভুখা রেখে নিজে পেটপুরে খাওয়া-দাওয়া করা! এই ধরনের স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী নই। তাই নোবেল পুরস্কার কোনওভাবেই আমার কাম্য হতে পারে না।'

সামরিক আদালত যখন জাঁ পল সার্ত্রকে ডেকে পাঠাল আলজিরিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে

সমর্থন এবং ফরাসি সরকারের সমালোচনা করার কারণে, তখন সার্ত্র সেই তলবকে প্রত্যাখ্যান করলেন এবং এক চিঠিতে বললেন, ‘ আমি আবার বলি, এই স্বাধীনতা নিশ্চিত। যা নিশ্চিত নয় তা হল ফ্রান্সের গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। কারণ আলজিরিয়ার যুদ্ধ এই দেশকে পচিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ক্রমবর্ধমান সংকোচন, রাজনৈতিক জীবনের বিলাপ, দৈহিক নিপীড়নের সর্বব্যাপকতা, অসামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তির স্থায়ী বিদ্রোহ যে বিবর্তন সূচিত করেছে, তাকে বিনা অতিরঞ্জনে ফ্যাসিস্ট বলে অভিহিত করা যায়। এই বিবর্তনের সামনে বামপন্থীর অসহায় এবং তারা অসহায়ই থাকবে যদি না তারা তাদের প্রচেষ্টাকে যুক্ত করে সেই একমাত্র শক্তির সঙ্গে যা আজ কার্যত আলজিরিয়ান স্বাধীনতার এবং ফরাসি স্বাধীনতার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সে শক্তি আজ কার্যত আলজিরিয়ান স্বাধীনতার এবং ফরাসি স্বাধীনতার সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করছে। সে শক্তি হল এফ. এল. এন।’

এই দুই ঘটনার মধ্যেই যে প্রতিবাদ এবং বিদ্রোহ উদ্বেল হয়ে ওঠে, তার উৎস স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানুষের, স্বাধীনতা ব্যক্তির, স্বাধীনতা চিন্তার, বুদ্ধির ও মননের। এই দাবিই সার্ত্রকে নিয়ে মানুষের তথা ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রশ্নে, এবং এই জিজ্ঞাসাই পরিবর্ধিত হয়ে উঠেছিল এখটি দর্শনের ধারায়, যাকে বলা হয়েছে একজিস্টেন্সিয়ালিজ বা অস্তিবাদ।

২.

একজিস্টেন্সিয়ালিজমকে খুঁজতে হবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রকোষ্ঠে। ক্যাথেরিনা আইয়ারম্যান লিখছেন, একজিস্টেন্সিয়ালিজমের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি এত প্রসারিত, এত বহুমুখী যে এর কোনও সুষ্ঠু সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এই ভাবনার কেন্দ্রে প্রতীয়মান হয় ব্যক্তির অস্তিত্ব, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তার স্বাধীনতা এবং পছন্দ ও নির্বাচন। দীর্ঘকাল ধরে, কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের মধ্যে প্লেটোর এই ব্যাখ্যা নির্ণায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে যে ‘Heighest ethical good is universal’। এর বিরোধীতা করলেন ডেনমার্কের অগ্রণী চিন্তাবিদ সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫)। সেই সময়ে, বলা যেতে পারে, সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর কিয়ের্কেগার্ড সেভাবে আলোচিত হয়নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকেই গোটা বিশ্ব জুড়ে যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট জাল ছড়াতে থাকে তাতে বিপন্ন হয়ে পড়ে মানুষের অস্তিত্ব। আশঙ্কা বা উদ্বেগ, আতঙ্ক বা ভীতি, তটস্থ বা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকা, নিরাপত্তাহীনতার ভয়াল বাতাবরণ— সমস্ত কিছুরই কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। তার অস্তিত্বের বিপন্নতা নিয়েই রচিত হয় সমাজ -ক্রিয়ার পরবর্তী বিভিন্ন ধাপ। সুতরাং একটু একটু করে জোরালো আলোচনায় আসতে শুরু করল একজিস্টেন্সিয়ালিজম, আসতে শুরু করলেন কিয়ের্কেগার্ড এবং তাঁর অনুসারীরা। পাশাপাশি ‘ism’ - এর শতাব্দীর নানা খেলা তখন শুরু হয়ে গেছে।

প্লেটোর বিপরীতে, বা ট্রাডিশনাল ধারণাকে অগ্রাহ্য করে, ক্যাথেরিনা লিখছেন : ‘Kierkegard reacted against this tradition, insisting that the individual’s

heighest good is to find his or her own unique vocation. Interms of moral choice, existentialists have argued that there is not objective, rational basis of decisions, they stress the importance of individualism in deciding question of morality and truth. Most existentialists have held that rational clarity is desireable , wherever possible, but that life's most important questions are not accessible to reason or science.'

মৃণালকান্তি ভদ্র তাঁর 'অস্তিত্বদা: জাঁ পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য' গ্রন্থে এই জায়গাটা নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন: 'তবে দর্শনের ইতিহাসে দেখা যায়, দার্শনিকরা তত্ত্ব জিজ্ঞাসার আগ্রহী এবং তাঁরা মনে করেন, জগতের একটি মূল তত্ত্ব আছে। সেই তত্ত্বের রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করা এবং তাকে বিশ্লেষণ করাই অনেকের মতে দর্শনের প্রধান কাজ। জগতের বেলায় যেমন, মানুষের বেলায়ও তাঁরা সেইরকম মনে করেন, একটি আত্মস্বরূপ আছে এবং মানুষকে সেই স্বরূপ জানতে হবে। মানুষ যদি সেই তত্ত্বকে জানতে পারে, তাহলে মানুষ পৃথিবীর দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে বলেও অনেকে মনে করেন। অস্তিবাদীরা মানুষ বা জগৎ সম্বন্ধে এরকম কোনও পরমতত্ত্ব স্বীকার করেন না। দর্শনের ইতিহাসে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দর্শনে যাঁরা যুক্তিবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত তাঁরা, যেমন প্লেটো, দেকার্তে, হেগেল প্রমুখ মনে করেন, মানুষের একটি সারধর্ম (essence) আছে এবং এই সারধর্মই তার অস্তিত্বকে নির্ধারিত করে। অর্থাৎ মানুষের সারধর্ম যদি হয় যুক্তিবত্তা ও প্রাণধর্ম, তাহলে মানুষ কী ধরনের জীবনযাপন করবে তা এই বিশেষ ধর্মের ওপর নির্ভর করবে। প্লেটোর মতে, আমরা জগতে যে বস্তুগুলি প্রত্যক্ষ করি, সেগুলি নশ্বর। একমাত্র যুক্তিই চিরন্তন, মানুষের জন্মের আগে ও পরে এই যুক্তি থাকে। কারণ প্লেটোর মতে, আত্মার মৃত্যু হয় না এবং আত্মার, যা মানুষের সত্যকার রূপ, সারধর্ম হল যুক্তি। সুতরাং এই যুক্তি, যা নিত্য ও ধ্বংসহীন তা মানুষের অস্তিত্বকে গঠিত করে। যুক্তিস্বরূপই মানুষের প্রকৃত রূপ এবং প্রাণীধর্ম থাকলেও, যুক্তিকে জীবনের প্রতিষ্ঠার মধ্যেই মানুষের সার্থকতা। প্লেটোর চিন্তার প্রতিফলন দেকার্তে ও হেগেলের মধ্যে পাওয়া যায়। দেকার্তে যুক্তির আলোকে কতকগুলি জন্ম-লব্ধ ধারণার কথা বলেন, যেগুলির দ্বারা মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়াই তার কাছে মানুষের অস্তিত্ব। হেগেল শুধু মানুষের জীবন নয়, সমগ্র জগতেই যুক্তির বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন, যার ফলে তিনি বলেছিলেন, যা যুক্তিগত তাই বাস্তব এবং যা বাস্তব তাই যুক্তিগত।'

কিয়ের্কেগার্ড বললেন, (১) মানুষ নিজের জীবনের মধ্য দিয়েই তার অস্তিত্ব গড়ে তোলে, মানুষের সারধর্ম আগে থেকে ঈশ্বর বা জন্মসূত্রে ঠিক হয়ে আছে, একথা বলার অর্থ হল, এটা প্রতিষ্ঠা করা যে, মানুষের স্বাধীনতা নেই এবং অচেতন বস্তুর মতো কতগুলি প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা সে চালিত হয়।

কিয়ের্কেগার্ডের মতে, (২) দেকার্তে বলেছেন, আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি— অস্তিত্বের এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল। কথাটা হবে , আমি আছি, সেই কারণেই আমি চিন্তা করি।

এবং হেগেলর বিরোধিতা করে কিয়ের্কেগার্ডের অবতরণ: (৩) (ক) ব্যক্তির অস্তিত্ব এমন এক প্রশ্ন, যুক্তি যার দ্যোতক নয়। (খ) অস্তিত্ব আবেগের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। (গ) সিদ্ধান্ত নেওয়া, কর্মপন্থা বাছাই এবং তার সঙ্গে জড়িত উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মাধ্যমে অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা যায়। (ঘ) মানুষের কর্মপন্থা একটি স্বাধীন নির্বাচন, তাই অস্তিত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা গভীরভাবে যুক্ত।

এখান থেকেই সমাজতত্ত্বের পাশাপাশি বিষয়টি , সামান্য হলেও, শিল্পরূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল। ক্যাথরিনা আইয়ারম্যান বলছেন: ‘ Freedom of choice, through which each human being creates his or her own nature is a primary theme. Because individuals are free to choice their own path, existentialists have argued, they must accept the risk and responsibility of their actions. Kierkegard held thet a feeling of general apprehension, which he called dread, is God’s way of calling each individual to commit a personally valid way of life. Relatedly, 20th century German philosopher Martin Hidegger felt that anxity leads to the individual’s confrontation with the imposibility of finding ultimate justification of his or her choice.’

দুটি বিষয়ের নিষ্পত্তি এখানে করে নেওয়া দরকার। যুক্তিবাদী দার্শনিকরা বলেছিলেন: ‘Essence precedes existence, or essence determines existence.’ অন্যদিকে কিয়ের্কেগার্ডের প্রতিবাদের সূত্র ধরে জাঁ পল সার্ত্রের ভাবনায় এসে অস্তিবাদ বলল: ‘Existence precedes essence, or Existence determines essence.’

দ্বিতীয়ত, অস্তিত্ববাদের শিবিরেও দ্বিমত দেখা দিল, এবং সেটা উনবিংশ শতাব্দিতেই। এই বিভাজনের মূলে দাঁড়িয়ে আছে ‘ঈশ্বর’। ঈশ্বর -বিশ্বাস নিয়ে মতপার্থক্যের জেরে একটি শিবির হল আস্তিক অস্তিবাদী, যেখানে আছেন সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩-১৮৫৫), কার্ল ইয়াসপার্ক(১৮৮৩-১৯৭১), এবং গ্যাব্রিয়েল মার্সেল (১৮৮৯-১৯৭৫)। অন্য শিবির হল নাস্তিক অস্তিবাদী, যেখানে আছেন ফ্রিডরিশ নিৎসে (১৮৪৪-১৯০০), মার্টিন ইয়েডেগার (১৮৮৯-১৯৭৫), জাঁ পল সার্ত্র (১৯০৫-১৯৮০)।

অর্থাৎ নাস্তিক অস্তিবাদ, কিয়ের্কেগার্ড কথিত প্রথম অস্তিবাদের সংজ্ঞা ধারণা থেকে অনেকটাই সরে গেল। এবং বর্তমানকালে অস্তিবাদ নিয়ে যে আলোচনা হয়, যে মত ও পথ প্রব্যক্ত করা হয় তা মূলত জাঁ পল সার্ত্রের ভাবনা, যা প্রথম পর্বের অস্তিবাদ থেকে আরও দূরে সরে যায়। এইভাবে একজিস্টেন্সিয়ালিজম সময়ের সঙ্গে প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে পরিমার্জিত করেছে এবং সমকালীন সমস্যাগুলিকে সামনে রেখেই তার নবতর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছে। যেমন —

কিয়ের্কেগার্ড বলছেন: অস্তিত্ব মানে মানব-অস্তিত্ব। বিশেষ করে ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্ব। মানুষ দু’ভাবে জীবনযাপন করে, গোষ্ঠীর নিয়ম অনুযায়ী কিছু কাজ করে, আবার

তার সঙ্গে জড়িত এমন কিছু কাজ করে। প্রথমটি শুধু বেঁচে থাকা, অস্তিত্ব নয়। দ্বিতীয়টিতে সে তার স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করে। এই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যই তাকে বোঝায় যে সে ব্যক্তি।

হাইডেগার বলছেন : ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে বাস্তব জগতের বিচ্ছিন্নতা নেই। প্রতিদিনকার জীবনে মানুষহীন নামহীন একজন, জনতার অন্তর্গত, কিন্তু সে স্বতন্ত্র ব্যক্তি নয়। তাই প্রাত্যহিক জীবন অযথার্থ অস্তিত্ব। মানুষ যখন নিজের চরম সম্ভাবনাকে সফল করার জন্য এগিয়ে যায় তখনই সে তার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয় একাকিত্ব বুঝতে পারে। এই চরম সম্ভাবনা হল ব্যক্তির মৃত্যু, কারণ মৃত্যুই ব্যক্তির জীবনকে পূর্ণতর রূপ দিতে পারে।

ইয়াসপার্স বলছেন: অস্তিত্ব তিন ধরনের। স্বঅস্তিত্ব বা being there. অস্তিত্ব-স্বরূপ বা being in itself. সাধারণ জীবনে মানুষ জগৎ-অস্তিত্ব বা বস্তু জগতের দ্বারা জড়িত। দৈনন্দিন জীবনের রুটিন-বাঁধা কাজের বাস্তব জগৎ আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এ থেকে মুক্তি পেতে আমাদের স্বঅস্তিত্বের দিকে নজর দিতে হবে। আমার কর্ম বাস্তব জগৎ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে আমার নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার নামই অস্তিত্ব। এইভাবে আত্মমুখীনতার মধ্যে স্বীয় অস্তিত্বের উপলব্ধি করা যায়। অবাধ আত্মস্বাধীনতার মধ্যে আমরা নিজের সম্যক পরিচয় লাভ করি। কিন্তু এই স্বঅস্তিত্বে আমরা থেকে যাই না। কারণ বাস্তব জগতে যেমন একটা সন্তোষজনক ঐক্য আমরা খুঁজে পাই না, তেমনই স্বঅস্তিত্বে নিজের মধ্যে সমস্ত জিনিসের ঐক্য খুঁজে পেতে গিয়ে বাস্তব জগতের বাধার সম্মুখীন হয়। তখন নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, অথচ বিপরীত অস্তিত্বের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। বাস্তব জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করা, আবার সেই অস্তিত্বের মূল ঐক্য অনুভব করার প্রয়াসে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়াই হল মানুষের জীবনের আদর্শ। এবং বাস্তব জগৎ ও স্বঅস্তিত্বকে অতিক্রম করে অস্তিত্ব -স্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব হয় না বলেই জীবন হতাশায় বিড়ম্বিত হয়।

গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের মতে: গোটা পৃথিবীতে বিংশ শতাব্দীর যন্ত্র-শাসিত যুগে আগে একটা ছন্দ ছিল। একটা সুষম ঐক্য ছিল। কিন্তু যুদ্ধ, যন্ত্র, সভ্যতার নানা উপকরণ, পেশাগত বিভাগ মানুষকে একে অন্যের কাছ থেকে সমগ্র পৃথিবীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। মানুষ আজ একটি ছেঁড়া তার, এবং সে তার জীবনে যখনই কোনও সুর বাজাতে যায় তা দীর্ঘশ্বাস বা বেদনার চিৎকারের মত শোনায়। এই হতাশা, বেদনা, লাঞ্ছনা মিলিয়ে মানুষের অস্তিত্বের প্রকাশ। স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা টিকিট-চেকার বা সংখ্যা-লাগানো নিহত সৈনিক। এ থেকে উদ্ধারের মুক্তির পথ হল স্বাধীনতা, এবং জগতের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টা।

এবং সার্ত্র বলছেন : বস্তু একটি অনড় অচলায়তন, এবং তার নিজের কোনও সম্ভাবনা নেই। বস্তু কোনও কিছু হতে চায়, একথা আমরা বলতে পারি না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা কোনও কিছুর শূন্যতা অনুভব করি এবং কোনও কিছু ধ্বংস হয়ে গেলে,

আগে কী ছিল তার সঙ্গে তুলনায় কোনও কিছু নেই এটা বুঝতে পারি। কিন্তু এই যে শূন্যতা, অনুপস্থিতি, ধ্বংস, এগুলি তো বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারে না, কারণ বস্তু হল শুদ্ধ অভিন্নতা (pure identity). অতএব, শূন্যতা বা কোনও কিছুই নেই, তার ব্যাখ্যা এমন কোনও সত্তাই করতে পারে, অস্তিত্বহীনতাই যার অস্তিত্ব, অর্থাৎ যার অস্তিত্ব কোনও কিছু না থাকার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। সেই সত্তাই হল পরিবর্তনের মধ্যেই তার জীবন। চেতনাই শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে, চেতনা পৃথিবীকে সে অর্থময় করে তুলতে চায়, যদিও তার অর্থ হয়তো জগতের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

মৃণালকান্তি ভদ্র ও অন্যান্যদের উদ্ধৃত করে এই যে পাঁচ চিন্তাবিদকে পর পর সাজানো হল তাতে একজিস্টেন্সিয়ালিজমের ধারাবাহিকতাকে এবং এক বিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে এগিয়ে যাওয়ার ক্রমকে স্পষ্টতর ধরা যেতে পারে। সংযোজন এই, সার্ত্র বলছেন, স্বাধীনতার অর্থ হল কোনও কিছুর পরিবর্তন করা বা নতুন করে গড়া। সুতরাং বাস্তব কোনও কিছু যদি না থাকে, তাহলে স্বাধীনতার প্রয়োগ হবে কী করে? সুতরাং চেতনা হল বাস্তব জগৎ-সাপেক্ষ।

এখানেই সে অ্যাবসার্ড হয়েও অ্যাবসার্ড থেকে পৃথক, এবং বাস্তব হয়েও বাস্তব নয়। যুক্তিবাদের অসম্ভবতা থেকে সে দূরে, কিন্তু চেতনা ও চিন্তার কঠোরতা তথা স্বাধীনতায় অসম্ভব বিশ্বাসী। এই পর্যন্ত এসে আমরা কিছু সাহায্য নিতে পারি টি. জেড় লাভিনের। তিনি একজিস্টেন্সিয়ালিজমের 'basic theme' সম্পর্কে বলছেন:

First, there is the basic existentialist standpoint, that existence precedes essencem has mrimacy over essence... It says, I am nothing else but my own concious existence.

Second is that of anxiety, or the sense of anguish, a generalised uneasiness, I am my own existence, but this existence is absurd. To exist as a human being is inexplicable, and wholly absurd.

The fourth theme is that of nothingness of the void. If no existence define me, and if, then as an existentialist, I reject all of my philosophies, sciences, political theories and religion which fail to reflect my existence as concious being and attempt to impose specific existentialist structure upon me and my world, then there is nothing that structures my world.

Fifth, related to the theme of nothingness is the existentialist theme of death. Nothingness is the form of death hangs over me like a sword of Democles at each moment of my life .

Alienation or estrangment is a sixth theme which characterises existentialism.

৩.

জার্মান বন্দিশিবিরে থাকাকালীন, ১৯৪০ সালে,সার্ত্র তাঁর প্রথম যে নাটক লেখেন, ‘Bareona’ তার বিষয় ছিল যিশুর জন্ম ইত্যাদির আড়ালে প্যালেস্টাইনে রোমানদের অত্যাচার। ঘুরিয়ে অন্য অর্থ করা যেতে পারে, ফ্রান্সে জার্মানির আধিপত্য। এই নাটকের প্রচ্ছন্ন আহ্বান অবশ্যই স্বাধীনতা। দ্বিতীয় নাটক ; ‘The Flies’ (১৯৪৩) সেফোক্লেসের ‘আন্তিগোনে’ অবলম্বনে, এবং সেখানেও বক্তব্য, ‘মানুষ যদি স্বাধীনতাকে ঠিকমতো উপলব্ধি করতে পারে তাহলে সমস্ত অত্যাচারের অবসান হবে।’ ‘No Exit’ ‘১৯৪৫’ নাটকে সার্ত্র বোঝাতে চেয়েছেন, ‘প্রচলিত অর্থে নরক বলতে যা বোঝায়, নরক তা নয়। মানুষই মানুষের বিচার করে এবং অপরাধীকে যে মানুষের দৃষ্টির সামনে বিচারের জন্য হাজির হতে হয়, অপরের দৃষ্টিশাসন মেনে নিতে হয়, সেটাই আসল নরক। মানুষ তার কাজের জন্য নিজেই দায়ী। যা সে করে তার অপরাধের গ্লানি তাকেই বহন করতে হবে। এবং আত্মপ্রবঞ্চনায় যদি সে নিজেকে আবৃত করে রাখতে চায়, তাহলে তার সঙ্গে স্বাধীনতা-রহিত অচেতন বস্তুর কোনও পার্থক্য থাকবে না। ‘Men Without Shaows’ নাটকের বিষয় জার্মানি অধিকৃত ফ্রান্সে ফরাসি জনগণের প্রতিরোধ- যুদ্ধ। প্রচন্ড অত্যাচরের মধ্যেও অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকা। এটাও স্বাধীনতার লড়াই। আত্মসমর্পণ না করা। নিজেদের স্বার্থ ভুলে গিয়ে রাজনৈতিক আদর্শের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া। সার্ত্র বলছেন ‘মৌনতার প্রজাতন্ত্র’ বা Republic of Silence.’ পরের নাটক ‘ The Respectable Prostitute’ - এ (১৯৪৬) পুঁজিবাদী আদর্শের ফাঁকা বুলি, মোহবিস্তার, সাধারণ মানুষের ‘স্বাধীনতা রক্ষার সংকট বিধৃত হয়েছে। ‘Dirty Hands’ নাটকটিতে অধিকাংশ পাঠক ও সমালোচক সার্ত্রের শ্রেষ্ঠ নাটক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা এক চিরকালীন রাজনৈতিক আদর্শগত সংকটকে তুলে ধরেছে। এক বামপন্থী দলের হার্ডলাইনাররা তাদেরই এক নেতাকে দক্ষিণপন্থী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কারণে গুলি করে মারার সিদ্ধান্ত নেয়, মেরেও ফেলে। ওদিকে কিন্তু পার্টির সর্বোচ্চ মহল দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সমঝোতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাহলে এই মৃত্যুর পরিচয় কী হবে? যে মারল তার অবস্থান কী হবে? আদর্শের স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে কতটুকু স্বাধীন? ‘ Lucifer and the Lord’ নাটকটি ষোড়শ শতাব্দীর জার্মানীর পটভূমিকায় রচিত, যার সম্পর্কে সার্ত্র বলেছিলেন: ‘মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ককে একান্তভাবে এই নাটকে আলোচনা করা হয়েছে, অথবা বলা যায়, মানুষের সঙ্গে সার্বিক সত্তার সম্বন্ধ এখানে নির্ণয়ের চেস্টা করা হয়েছে।’ এর ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এই, সাক্ষাৎকারে সার্ত্রের কথায়, খ্রিষ্টীয় দয়া মানুষকে অপমানিত করে, তার সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং সামাজিক কর্মপন্থার বিরোধিতা ঘটায়। আরও পরিষ্কারভাবে, ধর্মই সামাজিক অন্যায় অত্যাচারকে জিইয়ে রাখে। এখানেও স্বাধীনতার কাহিনি। এবং ‘Nekrasov’নাটকে (১৯৫৫) সার্ত্র দেখান পশ্চিমি দেশগুলি কীভাবে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে। এবং সার্ত্র মনে করেন, এই কট্টর কমিউনিজম-বিরোধীতাই একদিন পৃথিবীকে ঘোর বিপদে ফেলবে, এবং মানুষের স্বাধীনতা হরণ করবে।

সার্ত্রের মধ্যেও যে দ্বন্দ্ব নেই তা নয়। 'Dirty Hands' নাটক সম্পর্কে বিতর্ক উঠেছিল, এই নাটকে সার্ত্র বামপন্থী তথা কমিউনিস্টদের সমালোচনা করেছেন। সার্ত্র একথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই কি তা নয়? ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির সেদিনের দেউলিয়া চরিত্রই কি সার্ত্রকে এই নাটক লিখতে 'প্ররোচিত' করেনি? জোসেফ স্তালিন ও সেই সময় সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে ঘোরতর সংশয়ই কি সার্ত্রকে মস্কো থেকে দূরে ঠেলে দেয়নি? এবং বুলগানিন-ক্রুশ্চেভের সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতাই কি জন্ম দেয়নি 'Nekrasov'-এর ? চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের প্রেক্ষিতেই কি তিনি মস্কো থেকে ফের নিজেকে সরিয়ে নেননি? এবং এতকিছুর পরে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়, বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন যে ম্রিয়মান ভূমিকা নিতে থাকে তাতে সার্ত্র কখনই প্রীত ও সন্তুষ্ট হতে পারেননি। আর এই কারণেই তিনি আরও বেশি করে পা মিলিয়েছেন ছাত্র-যুব ও শ্রমিক আন্দোলনে, রাস্তায় নেমেছেন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে, এবং আরও বেশি করে জোর দিয়েছেন স্বাধীনতার ওপর। কীসের স্বাধীনতা? শুধু নির্দেশ নয়, মানুষ যাতে সেই নির্দেশকে নিজের বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে পারে, এবং প্রতিটি আন্দোলনে বুদ্ধিকে সঙ্গে নিয়ে অংশ নিতে পারে। স্বাধীনতা মানে অন্ন-বস্ত্র- বাসস্থানের 'স্বাধীনতা' নিশ্চয়ই, কিন্তু স্বাধীনতা মানে বুদ্ধির স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতাও। এবং সেটা অন্যগুলির থেকে ওজনে কিছুমাত্র কম নয়।

৪.

'বিশ শতকের যে কোনও লেখক বা বুদ্ধিজীবী মার্ক্সবাদের ধাক্কা না খাওয়া পর্যন্ত নিজেকে স্বপ্রমাণ করতে পারেন না,' এমন অভিমত প্রকাশ করতে দেখা গেছে সার্ত্রকে। আবার আরও তীব্রতার সঙ্গে 'existential Marxism: The Critique of Dialectical Reason' গ্রন্থে সার্ত্র বলছেন: 'বিশ শতকের একমাত্র দর্শন হল মার্ক্সবাদ, বিশ শতকে আর কোনও দর্শনের স্থান নেই। সাম্যবাদই শেষ কথা, এবং সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রব্যবস্থা হল 'কমিউনিস্ট সেল্ফ-অ্যাডমিনিস্ট্রেশন'। সাম্যবাদ পরিচালিত স্বত:স্ফূর্ত স্বশাসন পদ্ধতি। তথাপি সার্ত্রকে মার্ক্সবাদ -বিরোধী এবং তাঁর মতবাদ এক্সজিস্টেন্সিয়ালিজমকে মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধ-তত্ত্ব হিসেবে প্রচার করা হয়েছে সমগ্র ১৯৫০ থেকে ৭০-এর দশক পর্যন্ত। বামপন্থী মহল থেকে সার্ত্রকে কখনও বলা হয়েছে 'রেনিগেড', কখনও বলা হয়েছে 'সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবী'। এই অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে যে সার্ত্রও উদ্ধৃত উক্তি করেছিলেন তা নয়, সার্ত্র একথাও একাধিকবার বলেছেন, প্রায়োগিক মার্ক্সবাদের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, একটা ঘাটতি আছে, আমি সেটা সংশোধন করেছি মাত্র। একজিস্টেন্সিয়ালিজম সেই সংশোধনপত্র।

সিমঁ দ্য বোভ্যয়া 'Force of Circumstances' গ্রন্থে বলছেন: ' ১৯৪৯ সালে, যখন থেকে সার্ত্র 'জঁ জেনে' লেখা আরম্ভ করেন, তখন থেকেই তিনি ক্রমশ মার্ক্সবাদের ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করেন। মার্ক্সের দর্শনের দিকে সার্ত্রের ঝোঁক বাড়তে থাকে। তখন থেকেই তিনি বিশ্বাস করেন যে, 'মানুষ যে যে -অবস্থায় থাকে তার স্বাধীনতাও সেই অবস্থার মধ্যেও

কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ। আবার, তার মধ্যে এমন মানুষও থাকে যার স্বাধীনতা মূর্ত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র থাকে না।' ১৯৫২ সালে মার্লোপন্তি সম্পর্কে এক নিবন্ধে সার্ত্র মন্তব্য করেন: 'একজন কমিউনিস্ট-বিরোধী আসলে একটা ছুঁচো। আমিও সেই ছুঁচোরই একজন। তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না এবং কোনদিনই আসব না। ... বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতি আমার এমন ঘৃণা ধরে গেছে যে আমি স্থির করেছি, আমি মৃত্যুকাল অবধি এই ঘৃণা বহন করে নিয়ে যাব। ' সিমঁ এখানে বলছেন : সার্ত্র দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং তাঁর মৌলিক প্রাতিস্বিক দর্শনের সঙ্গে মার্ক্সবাদের সমন্বয় ঘটাতে উদ্যোগী হলেন।' এখান থেকেই সার্ত্রের তাত্ত্বিক অবতরণ ঘটল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে প্রাতিস্বিক স্বাধীনতাকেও স্বীকার করে নিতে হবে, না হলে ধনতন্ত্রের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেও কমিউনিস্ট পার্টির শাসনে ব্যক্তির অবহেলিত হওয়ার স্বাধীনতা থাকে।' এমন বক্তব্যকে স্তালিন-বিরোধীতা হিসেবে সুচিহ্নিত করে কিছু বিদ্বজ্জন সার্ত্রকে তুলোধোনা করলেন বটে, কিন্তু সার্ত্র আবার বললেন : ব্যক্তি মানুষকে তার প্রকৃত জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সে তার পরিবারে, তার শিক্ষাজীবনে, তার কর্মজীবনে, তার সহকর্মীদের মধ্যে ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ব্যক্তি যাতে সংখ্যায় পরিণত হয়, সে যাতে স্বনামের পরিচয়ে ব্যক্তি হিসেবে বর্তমান থাকে, তার হয়ে ওঠার ক্রমাগত সম্ভাবনা বজায় থাকে।'

এককথায়, এটাই হল 'আইডেনটিটি ক্রাইসিস', কি ধনতন্ত্রে, কি কমিউনিজমে। এই 'আইডেনটিটি' রক্ষা করতে না পারলে সমাজ সজীব থাকবে না, সমাজের সৃজনশক্তি মুছে যাবে, লুপ্ত হবে চিন্তাধারা, নিশ্চিহ্ন হবে জীবনের সমস্ত রং।

এক নিবন্ধে লিখছেন যজ্ঞেশ্বর রায়: 'সার্ত্র মনে করেন, এ-কাজটি করতে পারে মার্ক্সবাদের হয়ে অস্তিত্ববাদ তথা প্রাতিস্বিক দর্শন। কিন্তু মার্ক্সবাদ যদি তার পর্বেকার সেই ব্যক্তি-অস্তিত্ব বিষয়ে ফিরে যায় তো প্রাতিস্বিক দর্শনের আর প্রয়োজন থাকে না। অবশ্য সার্ত্র মনে করেন না যে মার্ক্সবদই দর্শনের শেষ কথা। তবু যদি মার্ক্সবাদের প্রকৃত উদ্দিস্ট কখনও পূর্ণ হয় তো তাতে করেই মার্ক্সবাদ তার সাফল্যের শিখরে পৌঁছে যাবে। ... সার্ত্রের অনুসন্ধান তাই যেন একটা পদ্ধতি যা মার্ক্সিজমে পুনরায় প্রাণশক্তি সঞ্চার করবে, ফিরিয়ে আনবে ব্যক্তি-মানুষকে তার যথার্থ স্থানে, যেখানে সে সুস্থ হয়ে বাস করবে নিজের বাড়িতে, কর্মস্থলে বা নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, সমাজতন্ত্রের সতর্ক দৃষ্টির কেন্দ্রে। সার্ত্র বিশ্বাস করেন যে প্রাতিস্বিক দর্শনই এখন একমাত্র মার্ক্সবাদের অঙ্গীভূত হতে পারে। মার্ক্সবাদের দুটি সংশোধন ও অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করে দিতে অত:পর আর প্রাতিস্বিক দর্শনের দরকার থাকবে না। এ-দর্শন বাতিল হয়ে যাবে।

এমন কথা সার্ত্রের মতো লোকই বলতে পারেন, যিনি নিজের স্বাধীনতা ও অপরের স্বাধীনতাকে পৃথক করে দেখান না। যিনি ব্যক্তিকে সমষ্টির উর্ধ্বে স্থান দেন না, আবার ব্যক্তিকে সমষ্টির পরাধীন রাখতেও নারাজ। যিনি মনে করেন, বিপ্লব অবশ্যই মেহনতি মানুষের

মুক্তির পথ, কিন্তু সেই বিপ্লবোত্তর কাল যেন মুক্ত মানুষকে নতুন কোনও খাঁচায় বন্দি না করে। যিনি মনে করেন, বুদ্ধির স্বাধীনতা কখনই অবাধ স্বাধীনতা, ধ্বংসোন্মুখ স্বাধীনতা হতে পারে না, কিন্তু সেই বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা সব থেকে অমানবিক ও পাশবিক কাজ। এর বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই চলবে। হয়তো অনন্তকাল।

৫.

১৯৮০ সালের ১৬ এপ্রিল বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই চিন্তাবিদের প্রয়াণ ঘটে। মার্চ মাসে বিছানায় শোয়া অবস্থায় তাঁর জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে নিবন্ধ শেষ করছি। সেই সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেন: 'পৃথিবীকে আজ মনে হচ্ছে কুৎসিত, খারাপ আর আশাহীন। ... কিন্তু আমি প্রতিরোধ করছি এবং আমি জানি, আমি আশা নিয়েই মরব। কিন্তু এই আশাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

এই আশা স্বাধীনতারই ছায়া। এবং স্বাধীনতা মানেই দায়বদ্ধতা। সার্ত্র বলেছিলেন: 'যে মতাবলম্বীই হও না কেন, যা-ই হোক তোমার মতামত, কলম তোমাকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে পাঠিয়ে ছাড়বে। লেখক হওয়ার মানেই এক ধরনের স্বাধীনতা চাওয়া। একদিন লিখতে শুরু করলে তুমি পরের দিন থেকেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলে, প্রতিরোধের দায় কাঁধে নিলে।' মৃত্যুর দিন পর্যন্ত এই দায়ের বৃত্ত থেকে সার্ত্র কখনও সরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেননি। বুদ্ধি, বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতার এক অগ্নিস্বাক্ষর ।

---

লেখক ঃ **রথীন চক্রবর্তী,** পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব, থিয়েটার ও পারফর্মিং আর্ট বিষয়ক গবেষণাপত্র 'নাট্যচিন্তা'র সম্পাদক।

# ব্যারিকেড ৫০ বছর

**কুন্তল মুখোপাধ্যায়**

"শাসক শ্রেণীর ভাবনা যখন জনগণকে নপুংসকে পরিণত করার উপায় খোঁজে, তাকে ভেড়ার মত কসাইখানার দিকে ঠেলে দিতে চায়; তখন রাজনৈতিক থিয়েটার তার চেতনাকে, তার জাগরিত অস্তিত্বকে, তার সামরিক সত্ত্বাকে খোঁজে।" (উৎপল দত্ত - হোয়াট ইজ টু বি ডান)

ব্যারিকেডের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কলম ধরতে বসে প্রথমেই দ্রোণাচার্য উৎপল দত্তের এই কথাটি স্মরণ করে তাঁকে প্রণাম জানাই। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকের প্রথম ভাগে বাংলায় আধা ফ্যাসিস্ট শাসন ও শাসকের উন্মত্ততার নাটকীয় প্রতিবাদ 'ব্যারিকেড'। ব্যারিকেড এর নাট্য কাহিনী ইয়ান পেটার্সেন রচিত ১৯৩৩ সালের বার্লিনের রোজনামচা, 'উনসেরস্টাসে' অর্থাৎ আমাদের রাস্তা অবলম্বনে রচিত। এছাড়াও - (ক) শিরারের রাইজ এন্ড ফল অব দ্য থার্ড রাইখ- বার্লিন ডায়েরী; (খ) রাউসনিং সম্পাদিত-হিটলার স্পীকস্; (গ) নাৎসি সন্ত্রাস- সম্পাদিত তথ্যের জন্য বুলক- এস্টাডিইন টিরানি; (ঘ) ট্রেভার রোপার- লাস্ট ডেজ অফ্ হিটলার্স জার্মানী; (ঙ) হিটলার-মাইন কামগফ; (চ) ম্যানডেল ও ফ্রংকেলের লেখা 'গোয়েবলস্ এবং গোয়েরিং- এর জীবনী গ্রন্থ; (ছ) ৩০ এর দশকের প্রথম দিকে প্রকাশিত জার্মান পুস্তক ও পত্রিকাদি; প্রভৃতি (দর্শন চৌধুরী)। নাটকটির সময়কাল ১৯৩১-৩৩ এর জার্মানী- রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান। প্রশ্ন জাগে, কেমন ছিল সেই সময়ের জার্মানী- ফ্যাসিস্ট বা নাজী মতাদর্শ। রজনী পাম দত্ত খুব সহজ ভাষায় বলেছেন, " ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র হল ফিন্যান্স ক্যাপিটেলের মালিকদের নিষ্ঠুরতম সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্র; যে রাষ্ট্র (১) উৎপাদনের অগ্রগতির কৌশল এবং শ্রেণীদ্বন্দ্ব সঞ্জাত আসন্ন বিপ্লবের মোকাবিলা করে ধনতন্ত্রকে রক্ষা করতে চায়; (২) শ্রমিক আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ ও দমন করতে চায়; (৩) সংসদীয় গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল করে সংসদীয় গণতন্ত্রকে অস্বীকার করতে চায়; (৪) পুঁজির ক্রম বিস্তারের জন্য সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তার ও যুদ্ধের পথকে প্রশস্ত করতে চায়। ডাভে রেনটন, ফ্যাসিজমকে, " স্পেসিফিক ফর্ম অফ রিঐাকশনারী মাস মুভমেন্ট" বলে উল্লেখ করেছেন। আবার পালমিরো তোগলিয়াত্তি এক কথায় ফ্যাসিজমকে চিহ্নিত করেছেন, "দি ওপেন ডিক্টেটরশীপ অফ্ দি মোস্ট রি-এ্যাকশনারী সেকশন অফ মনোপলি ক্যাপিটাল", ইতিহাস সাক্ষী, পুঁজিবাদ বড় হতে হতে তার নিজের প্রয়োজনে তার খিদে মেটাতে নিজের নিয়মেই পরিণত হয় সাম্রাজ্যবাদে। জার্মানীতে যে জার্মানীর কথা উনসেরস্তাসে বা ব্যারিকেডে বর্ণিত হয়েছে, সেই জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের জন্মবৃদ্ধি ও ক্ষমতা

দখলের পেছনে সে দেশের জাতীয় পুঁজির ও তদ্‌জনিত সমস্যার এক বড় ভূমিকা আছে। ১৯৩০'এর দশকে বিশেষ করে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৮-র মধ্যে জার্মানীতে সরকারী হিসেব মতেই মজুরী তিন শতাংশ বেড়েছিল, খাদ্যদ্রব্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল১৯.৫ শতাংশ। নাজী শাসনের প্রতিশ্রুতি সত্বেও সাধারণ মধ্যবিত্তের জীবনযাপনে নেমে এসেছিল দুর্বিষহ কষ্ট ও হতাশা। বেকারীর হার ১৯৩৩ সালের জানুয়ারীতে সরকারী হিসাব মতে ছিল ৩, ৭১৫,০০০ যা নভেম্বর ১৯৩৩ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ৬,০১৪,০০০। এদিকে সরকারী স্বাস্থ্য বীমার পরিসর থেকে প্রাপ্ত তথ্য জানাচ্ছে ১৯৩৩'র নভেম্বরে মোট কর্মনিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা হচ্ছে ১৪,০২০,০০০ অর্থাৎ ১৯৩৩'র নভেম্বরে কর্মনিযুক্ত আর বেকার শ্রমিকের যোগ সংখ্যা হচ্ছে ১৭,৭৩,৫০০০ জন শ্রমিক। কিন্তু এই সময়ের ম্যাঞ্চেস্টার গার্জিয়ান সাপ্তাহিকে জানানো হচ্ছে, যে অদৃশ্য বেকারের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১,৫০০,০০০। এই অব্যবহৃত শ্রমশক্তির চাপ পুঁজির পক্ষে সামলানো বেশ কঠিন হয়ে দাঁড়াল, ফ্যাসিবাদী শক্তির সর্বৈব উত্থান এই আর্থিক প্রেক্ষাপটেই। এই ফ্যাসিবাদী উত্থানের বিরোধীতায় সেই সময়ের সর্বাধিক নিপীড়িত ও সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতি প্রাপ্ত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

এই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখে ব্যারিকেড নাটক এবং এই নাটকের কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে ক্লারা জেটকিন বর্ণিত "ফাইটিং ফ্যাসিজম্" এর মূল দুটি সূত্র-

(ক) ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর আত্মপ্রতিরক্ষা (এ্যাট প্রেজেন্ট দি প্রোলাতারিয়েত হ্যাজ আরজেন্ট নীড্ ফর সেল্ফ ডিফেন্স এ্যাগেইনস্ট ফ্যাসিজম্) (খ) ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করতে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন করা, যে ফ্রন্টে রাজনৈতিক ভিন্নতা ভুলে সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলা (প্রোলেটারিয়েন স্ট্রাগল্ এন্ড সেল্ফ ডিফেন্স এ্যাগেইনস্ট ফ্যাসিজম রিকয়ারস দি প্রোলেতারিয়েন ইউনাইটেড ফ্রন্ট) নাটকটিতে উল্লিখিত সময় ১৯৩১-৩৩-র জার্মানী। জার্মানীতে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা, ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান এবং তারই সঙ্গী হিসাবে হিটলার ও তার বাহিনীর জার্মান নাগরিকদের উপর শুরু হয়েছে অত্যাচার। নাৎসিদের উত্থান, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের হতাশা, শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ এই ছিল, ' উইসেরস্টাসে" নাটকটির বিষয়। জানা যায়, ইয়ান পের্টাসেন তাঁর জার্মান পাণ্ডুলিপি সমতে লুকিয়ে পালিয়ে আসেন জার্মানী থেকে, তারপরই এই নাটকটির প্রকাশ ও বিশ্বজুড়ে তার প্রচার। তিরিশের দশকের সময়পর্বে জার্মানির বাস্তব ছবিকে পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কঠিন এই কাজটি করেছিলেন ইয়ান পোর্টাসেন তাঁর " উনসেরস্টাস" নাটকে। খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে নাৎসিদের সঙ্গে অসম দ্বন্দ্বে একবুক সাহস নিয়ে প্রতিরোধে নেমেছিল কমিউনিস্টরা। আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটচিত্রও প্রায় এমনই ছিল। ১৯৩১-৩৩-র জার্মানীর সঙ্গে ১৮৭২-র পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পটচিত্র এর সাদৃশ্য ছিল লক্ষণীয়। এই প্রেক্ষাপটেই উৎপল দত্ত (যিনি বিশ্বাস করতেন, থিয়েটার

কোনও বুদ্ধিজীবী দলের কাছে আটকে পড়তে পারে না, মানুষ যদি তার কাছে জড়ো না হয়, তাহলে তাঁর অস্তিত্বের আদৌ কোনও প্রয়োজন নেই) লিখলেন এবং প্রযোজনা করলেন ব্যারিকেড। ১৯৩১-৩৩ জার্মানীতে বার বার হয়ে চলেছে নির্বাচন, যতদিন না "জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক শ্রমিকদল (নাসিওপুলল সোৎসিয়ালিস্টিশ আরবাইটার পার্টাই) ওরফে নাৎসী বাহিনী নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসতে পারছে। ব্যারিকেড নাটকে সাংবাদিক অটোর সংলাপে যে সত্য তথ্যচিত্র উঠে আসে তা এইরকম " এ বড়ো বিচিত্র দেশ। এখানে অনবরত নির্বাচন হয়। তিন বছরে জার্মানীতে পাঁচবার নির্বাচন হয়ে গেল। ১৯৩০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর নির্বাচন হল। তাতে আইনসভার ৬০৮টা আসনের মধ্যে হিটলারের নাৎসি পার্টি পেল ১০৭টা, আর শ্রমিক পার্টিগুলি পেল ৩৫০। ৩৫০থেকে ১০৭ স্বভাবতই বেশি! তাই রাষ্ট্রপতি হিটলারকেই ডেকে পাঠালেন মন্ত্রিসভা গড়বার জন্য। কিন্তু লোকে অঙ্কশাস্ত্র বোঝে না, তারা খেপে উঠে গন্ডগোল লাগাতে আইনসভা ভেঙে দিয়ে আবার নির্বাচন ১৯৩২ সালের মার্চে। আবার হিটলার হারলেন। তাই ফের আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচন ১০ এপ্রিল, ১৯৩২, এবং তাতে ফের হিটলার হেরে গেলেন। তখন ফের আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচন ৩১ জুলাই ১৯৩২। এবার নাৎসি পার্টি পেল ২৩০টি আসন, শ্রমিক পার্টিগুলি ২২২। কিন্তু গোল বাধাল ছোটো ছোটো দলগুলো, সব গিয়ে জুটল কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায়। ফলে আইনসভার ২৩০ জন নাৎসির বিরুদ্ধে দাঁড়াল ৩৭৮ জন নানা পার্টির সদস্য। সুতরাং আবার গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জরুরি প্রয়োজন দেখা দিল! ৩০ আগস্ট আইনসভার প্রথম অধিবেশনেই আইনসভা বাতিল করে দিয়ে ফের নির্বাচন- ৬ নভেম্বর ১৯৩২। এবার নাৎসিরা পেল ১৯৬টা আসন, শ্রমিক পার্টিগুলি ২২১। আর অন্যান্য দলগুলো কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করতে আইনসভার শক্তি দাঁড়াল- নাৎসি ১৯৬, নাৎসি বিরোধী ৪১২। এখন, একথা ইস্কুলের শিশুও জানে ৪১২ র চেয়ে ১৯৬ বেশি!! তাই সকাল সোয়া দশটায় ওই ১৯৬ এর নেতা হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে, এবং আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের পুনরায় আবার নির্বাচন ধার্য হয়েছে, আগামী ৫ মার্চ। এবার হিটলার প্রধানমন্ত্রী থেকে নির্বাচনটা, দেখাশোনা করবেন— (প্রবল বিস্ফোরণ)— ওই যে করছেন! আসল কথা গণতন্ত্র বলে চেঁচালেই হয় না। গণতন্ত্র কাকে বলে বুঝতে হয়। যতক্ষণ না কমিউনিস্টরা আইনসভা থেকে সমূলে উচ্ছেদ হচ্ছে, ততক্ষণ আইনসভা ভেঙে দেওয়া হবে, নির্বাচনের পর নির্বাচন হবে ব্যস। (মদ্যপান) এখন এদেশের বোকা মানুষ যদি কমিউনিস্টদের ভোট দিয়েই চলে তাহলে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতির মতন নির্বাচনও একটি স্থায়ী বাৎসরিক আচারে পরিণত হবে। গণতন্ত্র শুধু তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে জানবেন যখন আইনসভার ৬০৮ টা আসনের ৬০৮টাই নাৎসি পার্টি দখল করবে— অন্যথায় নয়।" পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৭, ১৯৬৯ নির্বাচনে পরাজিত হয়েও কংগ্রেস দল সন্ত্রাস, গণহত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জয়ী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে পর্যুদস্ত করে ১৯৭২ এ ক্ষমতায় আসে, পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৭ সালে কমিউনিস্ট তথা বাম প্রগতিশীল শক্তির উত্থান এবং নির্বাচনে প্রাচীনপন্থীদের সংগঠনমুক্ত

হয়ে নব কংগ্রেস (কংগ্রেস -আর) রূপে আবির্ভূত হয়, এবং রাষ্ট্রীয় নীতিতে সামগ্রিকতাবাদী বা টোটালি টেরিয়ানিজম্-এর ছোঁয়া লাগে, ব্যাংক জাতীয়করণ, রাজন্য ভাতা বিলোপ প্রভৃতি পদক্ষেপ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি প্রয়োগেও প্রভাব খাটিয়ে এক নেত্রীর মান্যতা আদায়ের কাজও শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গেও রাষ্ট্র শক্তির সমস্ত ক্ষমতা নিয়ে কংগ্রেস গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ ও কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন কর্মী ও মানুষদের কণ্ঠরোধ করে, সন্ত্রাস ও দমনের পথে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। ফলে, গুণগত দিক থেকে ১৯৩১-৩৩-র জার্মানীর সঙ্গে ১৯৭১-৭২-পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থানের বেশ কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই সময়ে প্রবীণ ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু আততায়ীর গুলিতে মারা যান, এবং তাঁর হত্যাকান্ডের দায় কমিউনিস্ট পার্টির উপর চাপিয়ে দেওয়ার অপপ্রচেষ্টা শুরু হয়। জার্মানীতেও এই সময় (১৯৩০-৩১) পাঁচটি সাধারণ নির্বাচন হয়েছিল এবং প্রত্যেকটিতেই হিটলারের জাতীয়তাবাদী দল পরাজিত হচ্ছিল, আর পার্লামেন্ট (রাইখস্টাগ) ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন হচ্ছিল, যতক্ষণ না হিটলার পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গেও ৬৭-৬৯-৭১ সালে পর পর নির্বাচন হচ্ছিল যতক্ষণ না সিদ্ধার্থ রায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস দল বঙ্গের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করছে। নির্বাচন জেতার জন্য জার্মানীতে , নাৎসীরা সুপরিকল্পিত উপায়ে কমিউনিস্টদের শেষ করতে চাইছিলো, তারই একটি কৌশল ছিল দিনের আলোয় বিকেল তিনটের সময় জার্মানীর সর্বশ্রদ্ধেয় নেতা সত্তর বছর বয়সী বৃদ্ধ জোসেফ সাউরিৎসকে হত্যা ও সেই হত্যার দায় কমিউনিস্টদের উপর চালিয়ে দেওয়া। চল্লিশ বছর পর হেমন্ত বসুর হত্যাকান্ড যেন যোশেফ সাউরিৎস হত্যাকান্ডের পুনরাবৃত্তি। বৃদ্ধ নেতা সাউরিৎস যদিও কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুক্ত ছিলেন না। তবুও তিনি দেশের মধ্যে শ্রদ্ধেয় নেতা হিসাবে বিবেচিত হতেন। হেমন্ত বসুও সুভাষচন্দ্র বসুর ফরওয়ার্ড ব্লক দলের নেতা, কাঠামোগত ভাবে না হলেও গুণগত কারণে পশ্চিমবঙ্গের শ্রদ্ধেয় এবং জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। ব্যারিকেড নাটকে জার্মানীর বৃদ্ধ নেতা সাউরিৎসের পালিত পুত্র পাউল শালকে এই হত্যাকান্ডে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগসূত্রের কারণে। হেমন্ত বসু হত্যাকান্ডেও পশ্চিবঙ্গের প্রধান কমিউনিস্ট পার্টি সি পি আই এমকে অভিযুক্ত করা হয়। রাজনৈতিক ঘটনার এমনতর মিলকে ‘ব্যারিকেড’ নাট্যের মাধ্যমে উৎপল দত্ত সন্ত্রাস এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক রাজনৈতিক নাট্যভাষ্য তৈরি করলেন। তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের শাসক শ্রেণীর কাছে কেমন হয়েছিল এই নাটকের প্রতিক্রিয়া? ১৯৭৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনফরমেশন এ বিজয় টেন্ডুলকার ও কুমুদ মেহতাকে একটি সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত বলেছিলেন, “ এই নাটক দেখে তদানিন্তন কংগ্রেস দলের সদস্যরা খুবই অপমানিত বোধ করেছিলেন, নাটকের শো বন্ধও করতে চেয়েছিলেন তারা। আমি তাদের পাল্টা প্রশ্ন করি, তোমরা কি নির্বাচনে রিগিং করেছ? তাদের অতি সত্বর উত্তর ছিল , কখনই না। আমি বলি, তাহলে তোমরা এত ক্রুদ্ধ বিচলিত হচ্ছো কেন? আমরা তো নাজীরা কিভাবে নির্বাচনে কারচুপি করতো, তা দেখিয়েছি।” এইভাবে ব্যারিকেডের “জার্মানত্ব”

উপস্থাপিত করে উৎপল দত্ত, প্রতিক্রিয়ার দুর্গে সঠিক কামানটি দেগে ছিলেন।

১৯৭১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী হেমন্ত বসুকে হত্যা করা হয়, ঠিক তারপরেই হেমন্ত বসুর হত্যার নিন্দা করে কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের শোক বিবৃতিকে কটাক্ষ করে, তৎকালীন কংগ্রেস নেতা সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের বক্তব্য ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল, আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রথম পাতায় সিদ্ধার্থ রায় তাঁর বক্তব্য সি পি আই (এম) এর প্রতি বিষোদগার করতে গিয়ে মন্তব্য করলেন- পিতাকে হত্যা করে পুত্রের মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ করলে যেমন হয় শ্রী দাসগুপ্তের দুঃখ প্রকাশের বিবৃতিটাও সেরূপ। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৭১ সালের ৩রা এপ্রিল ভারত সরকারের SIB তাঁদের C-4/C 71(18) নম্বরের এক গোপন সার্কুলরে বিভিন্ন হত্যাকান্ডের সঙ্গে সি পি আই এম এর নাম জড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিল (রবীন দেব/ সেই মিথ্যাচার আজও চলছে এন বি এ) লক্ষণীয়, ব্যারিকেড নাটকেও হিটলার ভাষণ দেন একই কায়দায়-

হিটলার : " কমিউনিস্টদের স্ব রূপ উদ্ঘাটিত হয়ে গেছে ওরা মানুষ নয়, পশু- নইলে কুপিয়ে কুপিয়ে বৃদ্ধ দেশ প্রেমিক সাউরিৎসকে হত্যা করতো না। "

আবার হেমন্ত বসুকে হত্যা করার সময় যেমন তিনি খুব সরলভাবে আততায়ীদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, " আমায় মারছ কেন?" ঠিক তেমনই ব্যারিকেড নাটকে উৎপল দত্ত একটি প্রতি তুলনা করলেন, মৃত্যুকালে ৎসাউরিৎস খুবই আশ্চর্য হয়ে আততায়ীকে প্রশ্ন করলেন, 'আখ ভারুম শ্লাখটেন জী মিশ? (একি আপনি আমায় মারছেন কেন?)। ১৯৩১-৩৩ এর নাজী সন্ত্রাস ১৯৭২-র পশ্চিমবঙ্গের সন্ত্রাসের সঙ্গে এক মাত্রায় পংক্তিভুক্ত হয়ে যায়।ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মুখে মানুষের কোনো অভিমত থাকেনা, স্বাধীন মুক্ত চিন্তার পথ সেখানে রুদ্ধ। জার্মানী, স্পেন, ইতালি এবং বিশ্বের যেকোন রাষ্ট্রেই আধিপত্যবাদী শাসন ব্যবস্থায় মুক্ত চিন্তার স্থান নেই, ভারতে, পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন সময় এমনটি দেখা গেছে। এই বিষয়টিই ব্যারিকেড নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ডাক্তার, স্টুবেল সাংবাদিক অটো'র প্রশ্নের উত্তরে বলছেন- স্টুবেল- " বার্লিনে বাস করে কি করে বলেন, বুদ্ধিমান লোকেদের সর্ব বিষয়ে অভিমত থাকে। ঠিক উল্টো। বার্লিনের সব বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থির করে নিয়েছে, অভিমত বস্তুটিই বিপজ্জনক... .. কোন মত নেই কোনো মত নেই, মতামতের ধারে কাছে আমি নেই। বার্লিনে বাস করতে হবে না?" জীবনের যে মানবিক মূল্যবোধ, তা রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চাপে রুদ্ধ ঘরে চাপা পড়ে থাকে, বুদ্ধিমান মানবিক ডঃ স্টুবেল তাই সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে মদ্যপান করেন বেঠোফেন শোনেন, সাহিত্য পড়েন- কিন্তু অভিমত প্রকাশ করেন না। ফ্যাসিবাদি শক্তির সন্ত্রাস বা শ্বেত সন্ত্রাস যাই হোক না কেন, গোটা বিশ্বজুড়ে তার চরিত্র কিন্তু এক, বারিকেড তাই বার্লিনের রাস্তা আর কলকাতার রাস্তা এক হয়ে যায়। নাটকের শুরুতে সূত্রধার লালফৌজের গান, আন্তর্জাতিক গাইতে শুরু করলে, কলকাতার শ্রমিক বলে, " বিদেশী গান কেন? ... দেশী বিপ্লবের গান?" সূত্রধার বলে, 'লাল ফৌজের গান গাইবো না

কেন? বিপ্লবের গানে দেশী বিদেশী কি?" এবং ক্রমেই শ্রমিক বুঝতে পারে যে শ্রমজীবী মানুষের, নিপীড়িত মানুষের কোনো নির্দিষ্ট দেশ নেই- বুঝতে পারে দেশী- বিদেশী নির্বিশেষে অরাজনৈতিক মানুষ বলে কিছু হয় না। ফলে কলকাতার মঞ্চেও বার্লিনের রাস্তার ব্যারিকেড প্রথমে দুর্বোধ্য থাকলেও শ্রমজীবী মানুষের চেতনায় তা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে ওঠে ব্যারিকেড।

ফ্যাসিবাদী জমানায়- গণমাধ্যমের ভূমিকা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে ব্যারিকেডে। ১৯৩৩'র যুগে গণমাধ্যম , তা সংবাদপত্র -কেতাব-যাই হোক না কেন শাসক শ্রেণীর পক্ষে "সম্মতি আদায়ে"র কাজে ব্যবহৃত হত। সম্মতি আদায় মানে, প্রচারের এই নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে সাধারণ লোকে যা চায় না, সে ব্যাপারেও তাদের ক্রমশ: এক জায়গায় আনা। শাসক শ্রেণী,তা ফ্যাসিবাদী বা উদার গণতান্ত্রিক যাই হোক না কেন মনে করে, সাধারণ স্বার্থের বিষয়টা সব সময়ে জনমতে ঠিক প্রতিফলিত হয় না। বিষয়গুলি বোঝার মত যথেষ্ট চটপটে আর দায়িত্বশীল লোকেদের একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষ ছোট একটা গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবী কিছু লোক থাকে যারা সকলের মঙ্গল কিসে তা বুঝতে পারে। যদি এর ব্যত্যয় হয়, তবে নেমে আসে শাসক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ । ১৯৯৩'র জার্মানীতে (১৯৭২'র পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছুটা) বল প্রয়োগের সাথে সাথে নিখুঁত প্রচার চালিয়ে এমন পরিবেশ তৈরি করা হল যাতে কমিউনিস্টরা, ধর্মঘটীরা সাধারণ মানুষের সমর্থন হারায়। জার্মানীতে ফ্যাসিবাদের উত্থান পর্বে যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তা হল সেই সময়কার সংবাদপত্র ও বেতার যন্ত্র (জনসংযোগের মাধ্যমগুলি) রাষ্ট্র শক্তির দমন নীতি ও জবরদস্তি ক্ষমতা দখলকে মেনে নিয়ে তার স্বপক্ষে প্রচার চালায়, আর নিরীহ জনগণের কাপুরষতাকে রাজনৈতিক অবস্থানের মর্যাদা দেয়। প্রস্তাবনার পর ব্যারিকেডের প্রথম দৃশ্যেই তাই " ফ্রাইয়ে সোইটুং" পত্রিকার সম্পাদক লান্ট বৃদ্ধ নেতা য়োসেফ ৎসাউিরৎস এর হত্যাকান্ড তার কাগজের হেড লাইন লিখতে বলে, " কালকের হেডলাইন কি হবে শোনো- পাঁচ কলামব্যাপী ব্যানার- 'আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য ' - লিখে নিয়েছো- বেশ"। এরপর তিনি সাংবাদিক অটোকে নির্দেশ দেন " দ্বিতীয় হেডিং, ৩৬ পয়েন্টের কম যেন না হয়, "স্বামীর উষ্ণ রক্ত স্ত্রীর গায়ে লেপন" সংবাদ তৈরি করতে। শাসক শ্রেণির প্রতি পক্ষপাত পূর্ণ কমিউনিস্ট বিরোধী পত্রিকার সম্পাদক নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন, "সত্য কথা বলতে, যে ভয় পায় না " এই ভাবে। উৎপল দত্ত নিজে বলেছেন, ফ্যাসিবাদী জার্মানীতেই প্রথম দেখা দিয়েছিল সংবাদপত্র ও বেতার ব্যবস্থা অর্থাৎ মিডিয়া বা জনসংযোগের বাহন সমুদায় কীভাবে প্রবল মিথ্যা প্রচারে রাষ্ট্রশক্তির দমন নীতির স্বপক্ষে জনমত নির্মাণে সহায় হতে পারে। তার সঙ্গে রাস্তায় যখন তখন হত্যার ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভীরু সাধারণ মানুষ তার কাপুরুষতারই সমর্থনে মিথ্যা সংবাদের মধ্যে যুক্তি খোঁজে, কাপুরুষতাকেই রাজনৈতিক অবস্থানের মর্যাদা দেবার চেস্টা করে। মিডিয়ার মিথ্যা প্রচার ও ত্রাস যে মায়াজাল ছড়ায় তাই হয় ফ্যসিবাগের দুর্গ তাকে ছিন্ন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সেই সত্যকে অনুসরণ করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার বৈপ্লবিক রোমান্টিকতাই ব্যারিকেড নাটকে অটো বিরখোলৎস

ও ইংগেবর ৎসউরিৎস মত পরিবর্তনে মূর্ত হয়। বাস্তবে যা ঘটে, বা বস্তুত যা ঘটেছিল তা থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বা তাকে পালটে দিয়ে যা ঘটতে পারে বা ঘটা উচিৎ ছিল তাই উপস্থাপিত হয়, "ব্যারিকেড" এই বৈপ্লবিক রোম্যান্টিকতাই উৎপল দত্তের লক্ষ্য ছিল। শুধু যা দেখছ, যা ঘটছে, তাই দেখাও বুর্জোয়া বাস্তববাদের এই দাবি অস্বীকার করে গোর্কী ও ব্রেখটের মত উৎপল দত্তও ভাবতেন শুধু যা ঘটেছে সেটাই দেখাবে না, যা ভবিষ্যতে ঘটবে, ঘটা উচিৎ তাও আমরা দেখাব, কমিউনিস্ট; শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের কাছে বিভিন্ন মাত্রায় " আদর্শগত পদ্ধতির সঙ্গে আক্রমণের পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটানোর শ্রেণী সংগ্রামের মৌলিক রূপ। ১৯৩১-৩৩ এর জার্মানী বা সত্তর দশকের কংগ্রেসী জার্মানীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই ভাবনাটিই ছিল মূল ভাবনা। প্রকৃত বিপ্লবী পার্টির বিরুদ্ধে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল বাস্তবকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা তাই ইঙ্গোবর যখন পালিত পুত্র পাউলকে জিজ্ঞাসা করেন ইঙ্গো- তোমরা বুঝি জীবনকে পবিত্র বল না?

পাউল বলিষ্ঠ ভাবে উত্তর দেয়,

পাউল : পরম বা চরম বলে কিছু নেই, পৃথিবীর সংঘর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পবিত্রতা নেই, জীবনকে শ্রেণী সংগ্রাম থেকে আলাদা করে আমরা দেখি না। একটা যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে মালিক যখন শ্রমিককে খুন করায় সেটা অপরাধ। কিন্তু শ্রমিক যখন তিনশো বছরের শোষণের জবাবে মালিকের পোষা গুন্ডাকে হত্যা করে সেটা আত্মরক্ষা, সেটা ন্যায় বিচার। জীবন পবিত্র কিনা, তার চেয়ে বড় প্রশ্ন হল কে কার জীবন নিচ্ছে এইভাবেই ব্যারিকেডে বাস্তবকে ব্যাখ্যা করা হয়, যা একান্তই শ্রমিকশ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গিজাত বাস্তব। এইভাবেই ব্যারিকেড নাটকের শেষ লগ্নে এসে ইঙ্গোবর যখন বললেন- (দৃপ্তকণ্ঠে) আমি শান্তি বিলাইতে আসি নাই, আসিয়াছি তরবারি দিতে। (সলজ্জ হেসে) বাইবেল পড়োনা কেন, বাবা? আমি এখন এও বিশ্বাস করি বন্দুকের গুলি দিয়েই হবে শেষ ফয়সালা। বন্দুকের নলে আগুন হেনে যা বলার আছে সব বলতে হবে। আর কোনো ভাষা ওরা (নাৎসীরা) বুঝবে না। বোঝা যায় নাৎসী অধ্যুষিত জার্মানীতে একজন সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়া যিনি আপাতঃ রাজনীতি নিরপেক্ষ কথা বলতেই ব্যারিকেডে সামিল হতে। ব্যারিকেড নাটকে ব্যক্তিবর্গ কিভাবে অসভ্য, হিংস্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার শিকার হয়ে পড়ছে তাই দেখানো হয়েছে। সামগ্রিক ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির মনের গভীরতায় নয় , রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বৃত্তায়ন, শঠতা, প্রতারণা এবং সন্ত্রাস কিভাবে ব্যক্তিকে মূক-বধির-ভীতু এক নাগরিকে পরিণত করে। তাই ডাক্তার স্টুবেল বলে- "কোনো মত নেই, কোনো মত নেই, মতামতের ধারে কাছে আমি নেই। বার্লিনে বাস করতে হবে না।"। কেননা, বার্লিনের সব বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থির করে নিয়েছেন, অভিমত বস্তুটিই বিপজ্জনক।" আবার নাৎসীরা কিভাবে অত্যাচার চালায় সেই বর্ণনায় পাউল যখন বলে,

পাউল : তিন দফায় মার হবে। প্রথমে নাৎসি ঝটিকা বাহিনী, তারপর থানার পুলিশ, তারপর জেলের ওয়ার্ডার।

অটো : এটা কি বলছেন? দেশে আইন নেই, বন্দীর অধিকার নেই?

ব্রুনো : আপনি কোথায় থাকেন বলুন দেখি? বার্লিনের নাগরিক তো?

অটো : ডাক্তার স্টুবেলও আমাকে এই প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নটা বার বার শুনে মনে হচ্ছে আমি জীবন থেকে শোচনীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন।" এই বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত হতে চেয়ে ডাক্তার স্টুবেল, সাংবাদিক অটো, সম্ভ্রান্ত প্রৌঢ়া ইঙ্গোবর বিচারপতি আলবের্ট প্রত্যেকেই তাঁদের সভ্য সম্ভ্রান্ত নাগরিক জীবন থেকে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যে নাৎসী শাসনে কেউই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না, তাকে পক্ষ নিতেই হবে, মানবতার স্বপক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে তাদেরকেও ব্যারিকেডে এসে দাঁড়াতে হবে। তাই, ইয়ান পেটার্সন উনসেরে স্ট্রাসে - আমাদের রাস্তা লেখার ভূমিকায় বলেন, 'ফ্যাসিবাদ কি? কিভাবে ধাপে ধাপে ফ্যাসিস্তরা ঝোড়ো মেঘের মতন আচ্ছন্ন করে ফেলে দেশের আকাশ? ডাক্তার, বিচারপতি, গৃহস্থবধূ, ধর্মযাজক, সাংবাদিক, সর্বপ্রকারের বুদ্ধিজীবী কি ঘরের দরজা বন্ধ করে রাজপথের কোলাহল থেকে দূরে থাকতে পারেন? ফ্যাসিবাদ কি রেহাই দেবে কাউকে? জার্মানিতে নাৎসি অভ্যুত্থানের অভিজ্ঞতা বলে শেষ পর্যন্ত ব্যারিকেডে এসে দাঁড়াতে হবে সবাইকে, যদি না বড় বেশী দেরী হয়ে যায়।" প্রস্তাবনা দৃশ্যে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক তাই বলে, " ভুল করছেন আপনারা, কালমার্কস- এর দেশে জন্মে কখনো বলতে আছে, আমার কোনো রাজনীতি নেই। " এই অরাজনৈতিক রাজনীতির বিরুদ্ধেই শ্রমিকশ্রেণীর দায়বদ্ধ রাজনীতির প্রচারে ব্যারিকেডের মঞ্চায়ন হয়েছিল। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, পাঠক নাট্যজন মনে রাখবেন ফ্যাসিবাদী শক্তি এখনও নিঃশেষ হয়নি।

পঞ্চাশ বছর পরেও , এখনও তার পদধ্বনি শোনা যায়, ব্যারিকেডকে বাঁচিয়ে রাখুন,কে না জানে, হাঁটু গেড়ে বাঁচার চেয়ে- ব্যারিকেডে এসে দাঁড়ানো ভালো।

লেখক ঃ **কুন্তল মুখোপাধ্যায়,** কলকাতার প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব।

# অভিনয় নাট্য পত্রিকা : সত্তর দশকের দলিল

## অপূর্ব দে

সত্তরের দশক এক উত্তাল সময়ের দশক; রাজনৈতিক অস্থিরতার দশক। সময়টা ছিল অগ্নিগর্ভ। নকশাল আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টিতে শোচনীয় সংকট ও ভাঙ্গান, চীন-ভারত যুদ্ধ, খাদ্য আন্দোলন, দু'একটি যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন এবং ভেঙে দেওয়া, শ্রমিক আন্দোলন, জাতি দাঙ্গা, ভূমি সংস্কার, শাসক শ্রেণী সৃষ্ট ব্যক্তি হত্যার রাজনীতি, সর্বব্যাপী সন্ত্রাস সব মিলিয়ে এক ভয়ানক দশক। বিগত শতকের এই দশক যেন স্বপ্ন ও স্বপ্ন ভঙ্গের দশক। রাজনৈতিক হিংসা, খুনোখুনিতে রক্তস্নাত হয়েছিল বাংলা। কলকাতা তখন দুঃস্বপ্নের নগরী। মানুষের কণ্ঠ হয়েছিল রুদ্ধ। তরতাজা, শিক্ষিত, মেধাবী যুবকদের রক্তে ভিজে উঠেছিল কলকাতার রাজপথ। গণতন্ত্রকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছিল। বাতাসে বারুদের গন্ধ, মাটিতে সারি সারি মৃতদেহ। নাটক তথা সাংস্কৃতিক জগতে নেমে এসেছিল কালো যবনিকা। পুলিশের ভারি বুটের দাপটে নাট্যাঙ্গান কলুষিত হয়েছিল। প্রবীর দত্ত, সত্যেন মিত্রের মতো বহু থিয়েটার কর্মী নিহত হলেন, হলেন আক্রান্ত। অসংখ্য নাট্যকর্মী কারাগারের অন্ধকার প্রাচীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। নাটকের মঞ্চে নিজেদের কথা নিজেদের মতো করে বলার স্বাধীনতাটুকুও ছিল না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অত্যাচার যখন শেষ সীমানায় পৌঁছায় তখন আন্দোলনও দানা বাঁধে। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে তা প্রামানিক সত্য। সত্তর দশকেও আমাদের দেশে, বিশেষ করে এই বাংলায় তার ব্যতিক্রম হয়নি। উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল বাংলার বুকে। শিক্ষিত মার্জিত যুবসমাজ সেই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে তাঁরা ছিনিয়ে আনতে চাইলো ফুটন্ত সকাল। ছিঁড়ে ফেলতে চাইলো গহন, গভীর অন্ধকারের কুৎসিত, কদর্য জাল। অনেক মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে, অনেক মায়ের বুক খালি করে, অনেক নারীর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে অবশেষে বাংলায় এক রাজনৈতিক পালা বদল ঘটলো। নাট্যাঙ্গানে এলো নাটকের জোয়ার। কেটে গেল শ্বাসরুদ্ধকারী অবস্থা। সাংস্কৃতিক জগতের বুক থেকে সরে গেল কালো পর্দা। নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় মেতে উঠলো নাট্য তথা শিল্পীজগৎ।

সত্তর দশকের বিষাক্ত পরিবেশও গ্রুপ থিয়েটারগুলি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নাট্য-আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে নাট্যপত্রিকাগুলি তাদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছিল। স্বৈরতন্ত্রী শাসকের বিরুদ্ধে তারাও গর্জে উঠেছিল। নাট্য-আন্দোলনকেও সংগঠিত করতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ফলে হামলা হয়েছিল পত্রিকা দপ্তরে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলি কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। সত্তর দশকের উত্তাল সময়ের

নাট্য আন্দোলনের অন্যতম শরিক 'অভিনয় পত্রিকা' । নাট্য পত্রিকার ইতিহাসে অভিনয় সম্পর্কে লিখতে হলে অবশ্যই 'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকার কথা বলতেই হবে। সেই অর্থে 'অভিনয়' এর যাত্রা শুরু হয়েছিল 'অভিনয় দর্পণ' নামে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের সম্পাদনায় ১৯৬৮ সালে 'অভিনয় দর্পণ' দ্বিমাসিক নাট্যপত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ করেছিলেন খালেদ চৌধুরী। মূল পত্রিকা সংগঠক ছিলেন দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। পত্রিকার স্বচ্ছন্দ প্রকাশে ঋত্বিক ঘটকের উদ্দেশ্য ছিল, একটা টিম বা সংগঠন গড়ে তোলা। যাঁরা এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাঁদের অবশ্যই নাট্য-সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধ থাকতে হবে। নাট্য পত্রিকার বিষয় নির্বাচনে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অবশ্যই সহযোগীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলোচনা করেই সম্পাদক সিদ্ধান্ত নেবেন। আসলে পত্রিকাটি যাতে গুণমানে সমৃদ্ধ হয় সে বিষয়ে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন সম্পাদক ঋত্বিক ঘটক। 'অভিনয় দর্পণ' প্রথম থেকেই নাট্য আন্দোলনে বা নাট্যচর্চায় মফ:স্বলের নাট্য-সংবাদ পরিবেশনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল নাট্যকার রতনকুমার ঘোষকে। তিনি লিখেছেন :

> ' ঋত্বিক ঘটকের অভিমত ছিল মফস্বলের অখ্যাত অজ্ঞাত নাট্যদলের নাট্যচর্চার কথা শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নথিবদ্ধ করা। যা হবে - সাধারণ মানুষের প্রকৃত বাংলা নাট্য-চর্চার ইতিহাস। এখানে উল্লেখযোগ্য 'অভিনয় দর্পণ' এর এই বিভাগের প্রেরণায় আকাশবাণীর (কলকাতা) নাট্যবিভাগে পাঁচ মিনিটের নাট্য সমীক্ষায় মফ:স্বল নাট্যবার্তার সমীক্ষাপ্রচারিত হত। '

'অভিনয় দর্পণ' পত্রিকার মোট আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের জুলাই আগস্ট সংখ্যার পর অভিনয় দর্পণ-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

'অভিনয় দর্পণ'- এর দর্পণ বাদ দিয়ে দিলীপ বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'অভিনয়' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী। ১৩১ হরিশ মুখার্জি রোডে ছিল অভিনয় নাট্যপত্রিকার অফিস। অর্থাৎ অভিনয় দর্পণ নাট্যপত্রিকার উত্তরসূরি হিসেবে অভিনয় পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঋত্বিক ঘটকের অসমাপ্ত কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্রত গ্রহণ করেন সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদকমণ্ডলী। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সুধাংশু দাশগুপ্ত, অনিল দে, রতনকুমার ঘোষ, প্রলয় শুর, সোমেন ঘোষ প্রমুখ। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল ঃ

> ' .... বাংলাদেশের মঞ্চে বর্তমানে যে ক্লিন্ন ও দূষিত আবহাওয়া সকল সৎ-প্রচেষ্টার কণ্ঠরোধ করিতে সমুদ্যত তাহাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন প্রতিবাদ করিবার জন্যই আমাদের এই পত্রিকার জন্ম এবং যতদিন এই আবহাওয়ার পরিবর্তন না ঘটিবে ততদিন আমরা অসি কোষবদ্ধ করিব না।'

বোঝা যায়, সত্তর দশকের ওই অস্থির সময়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'অভিনয়' পত্রিকা জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে। সমাজ বদলের স্বপ্নে, সমাজকে ভালো কিছু দেবার লক্ষ্যে, নাট্যাঙ্গনে নতুন নতুন ফুল ফোটাতে 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকার জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল।

'অভিনয়' পত্রিকা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন নাট্যজগতে জ্বল জ্বল করছে 'বহুরূপী', 'গান্ধর্ব', 'এপিক থিয়েটার','গণনাট্য' নাট্যপত্রিকাগুলি। এই নাট্যপত্রিকাগুলি থিয়েটারকর্মীদের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। ফলে 'অভিনয়' পত্রিকার সামনে ছিল বিরাট এক চ্যালেঞ্জ। পাঠক তথা নাট্যকর্মীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা গড়ে তোলা। নাট্যজনের প্রকৃত মুখপত্র হিসেবে 'অভিনয়' পত্রিকায় নাটক ও চলচ্চিত্র উভয় বিষয়েই রচনা প্রকাশিত হতো। ১৯৭৩ থেকে শুধুমাত্র নাটকের বিষয়ই ছাপা হতে থাকে। প্রথম সংখ্যা থেকেই সমসাময়িক রাজনীতি ও নাট্যজগতের নানা তথ্য এবং বাংলা নাটকের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান ছিল 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী প্রথম সভাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে 'অভিনয় দর্পণ' যেখানে পৌঁছাতে পারেনি, সেই ব্রাত্য পল্লী থেকে পথ পরিক্রমা শুরু করবেন 'অভিনয়' । স্বভাবতই গ্রাম-বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্তের, শহর ও শহর তলীর আনাচে-কানাচের এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নাট্যসংস্থার অভিনয় সংবাদ প্রকাশ করতে থাকে। মফ:স্বল বাংলার, গ্রাম বাংলার নাটক ও নাট্য-আন্দোলনের ধারাকে মর্যাদা দেওয়া এবং গ্রাম -বাংলার নাট্যপ্রেমী মানুষের মধ্যে সুস্থ নাট্যবোধ জাগিয়ে তোলা, নাট্যকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা গড়ে তোলার প্রমাণ 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকার পাতায় পাতায় প্রকাশিত। পত্রিকার বিভাগগুলির শিরোনামে দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যাবে, কত বিষয় আলোড়িত হতো প্রথম ভাগে-'নাটক', 'নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ', 'মঞ্চ দেশে দেশে', 'মঞ্চ প্রতিভা', 'বিলুপ্ত নাট্যশালা', প্রাচীন নাট্যশালা', 'যাত্রা চিন্তা', দ্বিতীয় ভাগে- 'অভিনয়' পত্রিকায়, 'মফস্সল সংবাদ/সতীর্থ সংবাদ/ অভিনয় সংবাদ', 'আলোচনা/'পর্যালোচনা', 'এদেশ/অন্যপ্রদেশ/বিদেশ', 'গ্রন্থ পরিচয়', 'নাট্যসংস্থার তালিকা, ঠিকানা'। তৃতীয় ভাগে- 'নাট্যক্ষেত্রে নৈরাজ্যের চিত্র', ' স্বৈরাচারের বিরুদ্ধাচারণ', 'বিভ্রান্তির নিরসন', 'সাক্ষাৎকার', 'সমীপেষু', 'চিঠিপত্র', 'কার্টুন', 'স্মৃতিচারণ বিভাগ', 'পুনর্মুদ্রণ বিভাগ', 'চলচ্চিত্র বিভাগ' ইত্যাদি। একটা দায়বদ্ধতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নাট্যচর্চ্চাকে সতেজ রাখতেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল 'অভিনয়'। নাট্যমহলের বহুমাত্রিক ভাবনাকে উস্‌কে দিয়েছিল 'অভিনয়'।

'অভিনয়' নাট্যপত্রিকার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- এই পত্রিকায় প্রকাশিত নাট্য-সমালোচনাগুলিতে সমালোচকের নাম থাকতো না। যদিও নাট্যসমালোচনার অধিকাংশটাই লিখতেন নির্মল সাহা যিনি ছিলেন 'অভিনয়' এর বার্তা সম্পাদক। অনেক অখ্যাত নাট্যদলকে পাদপ্রদীপে তুলে আনার দায়িত্ব নিয়েছিল 'অভিনয়।' এই পত্রিকা নতুন নতুন নাটককারদের নাটক ছাপানোর ঝুঁকি নিয়েছিল। অনামী নাটককারদের আবিষ্কার ও

তাঁদের চিন্তাভাবনা, সৃজনী শক্তিকে মান্যতা অমল রায়, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, রতনকুমার ঘোষ, চন্দন সেন, নটরাজ দাস, সমীরণ আচার্য, রাধারমণ ঘোষ, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সাগর চক্রবর্তী, স্বরূপ বক্সী, স্বরূপ ব্রহ্ম, অমিতাভ রায়, সুনীত ঘোষ, অনিল দে প্রমুখ নাটককাররা। 'অভিনয়' নাট্য পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন সুধী প্রধান, ঋত্বিক ঘটক, দেবনারায়ণ গুপ্ত, শিশির বসু, শঙ্কর ভট্টাচার্য, রথীশ সাহা, তাপস দে, গণেশ মুখোপাধ্যায়, কল্পতরু সেনগুপ্ত, কৃষ্ণ ধর, মন্মথ রায় প্রমুখ। 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা হলেও 'যাত্রা' শিল্পকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছিল। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য যাত্রাশিল্প নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেছিল 'অভিনয়' । পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার ছেপে (সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর , ১৯৭৫) তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে এই পত্রিকা। তাঁকে 'লোকনাট্যগুরু' সম্মান জানিয়েছে। আজকের নাট্যপত্রিকাগুলিতেও যাত্রার সংবাদ সেভাবে প্রকাশিত হয় না। বলা যেতে পারে, গ্রামীণ সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকনাট্য যাত্রাপালা সম্পর্কে বর্তমানের নাটকের ব্যতিক্রমী পত্রিকা। যাত্রাকে নাট্যপত্রিকার পাতায় স্থান করে দেওয়ার ক্ষেত্রে 'অভিনয়' নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ।

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা শুধু প্রতিবাদই করতো না, প্রতিবাদ সংগঠিতও করতো। 'নাট্যক্ষেত্রে 'নৈরাজ্য' নামে কলমে নাট্যক্ষেত্রে নানাধরনের অত্যাচার, অবিচার, সরকারি ফতোয়া, অনিয়মের সংবাদ প্রকাশিত হতো। সদ্য নির্মিত 'রবীন্দ্রসদন' মঞ্চের কর্তৃপক্ষ সে সময় রবীন্দ্রসদনের পরিচালন সমিতি থেকে চারজন সদস্যকে অগণতান্ত্রিকভাবে বহিস্কার করেন। এই চারজন সদস্য হলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, সুধী প্রধান, প্রণব চক্রবর্তী ও চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় । এর প্রতিবাদে 'অভিনয়' তখনকার রাজ্যপাল এ.এল.ডায়াসকে চিঠি লিখেছিল সেই চিঠি ছাপা হয় ১৯৭২ সালের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যায়। রবীন্দ্রসদনকে স্বয়ং শাসিত সংস্থার হাতে তুলে দেবার দাবি জানিয়েছিলেন অভিনয়ের সম্পাদকমণ্ডলী। রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় নাট্যশালা করার দাবির সমর্থনে আন্দোলন সংগঠিত করেছিল 'অভিনয়' পত্রিকা। কলকাতার কর্পোরেশন অস্বাভাবিক প্রমোদ কর বৃদ্ধি করলে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁরা। সারাদিন কর্পোরেশনের লাল বাড়ির সামনে শতরঞ্জি বিছিয়ে অবস্থান করে বিনোদন কর বাড়ানোর চক্রান্ত ব্যর্থ করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে গোপনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের পুত্র ও অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মহাশয়ও ছিলেন। তাঁদের দেখাশুনার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকার পরিচালনমণ্ডলী। কার্জন পার্কে পুলিশের গুলিতে মৃত নাট্যকর্মী প্রবীর দত্তের জন্য হাজরা পার্কে স্মরণসভার আয়োজন করেছিল 'অভিনয়' পত্রিকা। পুলিশের হামলার বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। মনে রাখতে হবে যে, সত্তর দশকের ওই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ সভা করা সহজ কাজ ছিল না। অথচ এই দু:সাহসিক কাজগুলি করেছে 'অভিনয়' পত্রিকা। নাটক ও যাত্রার মঞ্চে

অশ্লীল নাচ, নারীর নগ্ন দেহ প্রদর্শন, অত্যন্ত কুরুচিকর সংলাপ ইত্যাদির বিরুদ্ধেও গর্জে উঠেছিল 'অভিনয়'। স্বাভাবিক কারণেই ১৯৭২ সালের ২২ জুলাই 'অভিনয়' দপ্তরে পুলিশের হামলা হয়। কিন্তু তাতেও অভিনয় থেমে থাকেনি। ১৩১ হরিশ মুখার্জি রোডের রেজিনা প্রেস থেকে বের হয়েছে একের পর এক 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা।

নাট্যকার মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' (১৯২৩) নাটকটিকে প্রথম বাংলা একাঙ্ক নাটকের স্বীকৃতি দিয়ে ১৯৭৩ সালে নাটকটির পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি পালনের আয়োজন করা হয়। 'অভিনয়' এই বিষয়টিকে ইতিহাস বিকৃতি বলে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় কেননা, মুক্তির ডাক'-এর আগে অনেকগুলি একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। উপযুক্ত তথ্য দিয়ে এবং 'মুক্তির ডাক' প্রথম একাঙ্কের দাবিকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করে সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল (নভেম্বর- ডিসেম্বর, ১৯৭৩)। লিখেছিলেন অমিত্রসূদন চক্রবর্তীর পত্র নামে সুদাম রায়। 'অভিনয়' -এর সম্পাদকীয় লেখা হতো সাধু ভাষায় কিন্তু এই সম্পাদকীয়টি লেখা হয় চলিত ভাষায় । সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদকীয় লেখার কপিটি পাঠিয়ে দিলেন উৎসব উদ্যাপন কমিটির সকলের কাছে। তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে উৎসব বন্ধ করে দিলেন এবং 'অভিনয়' পত্রিকা দপ্তরে চিঠি লিখে দু:খপ্রকাশ করলেন।

বাংলা নাটক ও নাট্য-আন্দোলনের ধারাকে বেগবান ও সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'অভিনয়' নাট্য পত্রিকা বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছিল। কয়েকটি পুরনো নাটককে পুনর্মুদ্রণ করেছিল 'অভিনয়' পত্রিকা। যেমন - কামিনী রায়ের 'একলব্য', কিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা', অমরেন্দ্রনাথ দত্তের 'নেপোলিয়ন বোনাপার্ট', উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ' দি পারসি কিউটেড', এবং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসন। 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকার ' অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি', 'অমরেন্দ্রনাথ দত্ত', 'সাধনকুমার ভট্টাচার্য', সম্পর্কিত বিশেষ সংখ্যা পাঠকদের মন জয় করে নিয়েছিল। পত্রিকার তরফ থেকে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল ব্রজেন্দ্র কুমার দে, হারীণ দত্ত, শঙ্কর ভট্টাচার্য, শিশির বসু, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ গুণীজনদের। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষ উৎসব পালন করা হয় এই পত্রিকার উদ্যোগে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নাট্যতত্ত্ববিদ সাধন কুমার ভট্টাচার্য, পরিচালক বীরেশ চট্টোপাধ্যায়, অভিনেত্রী নিবেদিতা দাস প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বদের স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়েছিল। বাংলা নাট্যচর্চার প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে নাট্যকর্মীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য অভিনয়, মঞ্চ, আলো এবং শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হতো। 'অভিনয় পুরস্কার' সেই সময় নাট্যজগতে অন্যতম স্বীকৃতি হিসাবে বিবেচিত হতো।

বাংলা নাট্যচর্চায় 'অভিনয়' নাট্য পত্রিকার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান 'গণমঞ্চ'। প্রতি শনিবার বিকালে হাজরা পার্কের চৌকো চাতালটিকে মঞ্চের অনুরূপ তৈরি করা হয়েছিল।

সেখানে অভিনীত হতো নাটক, কবিতা পাঠ ও গণসঙ্গীত গাওয়া হতো। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ বিনা দর্শনীতে নাটক দেখতে হাজির হতো হাজরা পার্কে= রিষড়ার 'সংলাপ' নাট্যসংস্থার কর্ণধার ভূদেব চক্রবর্তী চট ধার দিয়েছিলেন যাতে দর্শকরা মাটিতে বসতে পারেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই 'গণমঞ্চ' নাট্যমোদী দর্শকদের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠলো। দেড়-দুই হাজার দর্শক নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন গণমঞ্চের অনুষ্ঠান দেখতে। এই গণ অনুষ্ঠানের আয়োজন বাংলা নাট্য পত্রিকার ইতিহাসে এক বিরল দৃষ্টান্ত। গণমঞ্চের প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিলঃ

> ' অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লৌহদৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। কলকাতা ও মফস্‌সল বাংলার প্রগতিশীল নাট্য প্রযোজনাকে ব্যাপকতম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। শিল্পের জন্য জনগণ নয়, জনগণের জন্য শিল্প। '

সাধারণ নাট্যমোদী দর্শক তথা জনগণের নিজস্ব মঞ্চ হয়ে উঠেছিল 'গণমঞ্চ'। অপসংস্কৃতির বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে সুস্থ গণচেতনার নাটক মঞ্চস্থ হতো গণমঞ্চে। গ্রাম থেকে প্রত্যন্ত গ্রামের নাট্যসংস্থাগুলি ভীড় করতো নাটক দেখতে এবং তাদের নাটককে দেখাতে জরুরি অবস্থার সময় গণমঞ্চ'ই হয়ে উঠেছিল নাট্যকর্মীদের প্রতিবাদের চারণভূমি। এক সময় 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা ও 'গণমঞ্চ' একসাথে উচ্চারিত হতো।

'অভিনয়' নাট্যপত্রিকার 'শনিঠাকুরের নাট্যদর্শন' নামে কার্টুন চিত্র আলাদা একটি মাত্রা দিয়েছিল পত্রিকাটিতে। এই বিভাগের পরিকল্পনা ও রূপদান করতেন স্বয়ং সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকের দায়বদ্ধতার প্রশ্নে নাট্যব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, তাপস সেন প্রমুখদের গঠনমূলক সমালোচনায় নির্ভীক ছিলো 'অভিনয়' পত্রিকা। তবে কখনই সেই সমস্ত সমালোচনামূলক লেখায় গালমন্দ থাকতো না কিংবা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত না। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় জার্মান নাট্যপত্র "The drama review" -এর ১৯৭০ সালের সংখ্যায় উৎপল দত্তের সাক্ষাৎকারের অনুবাদ ছাপা হয়। অনুবাদ করেছিলেন সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়। সুশান্তবাবু ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর সংখ্যায় কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনী অবলম্বনে ' নতুন ছাড়পত্র' নামে একটি একাঙ্ক নাটক লেখেন।

আলোচ্য নাট্যপত্রিকাটির জনপ্রিয়তার পারদ ভীষণ উর্দ্ধমুখি ছিলো। 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিলো পাঁচশো কপি। কয়েককদিনের মধ্যেই সব কপি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় পরের সংখ্যা ছাপা হয়েছিলো এগারশো কপি। ১৯৭১ সালে 'অভিনয়' -এর প্রথম বর্ষপূর্তির বিশেষ সংখ্যা ছাপা হলো দু'হাজার দুশো কপি। সংখ্যাটি বাড়তে বাড়তে তেত্রিশশো কপিতে দাঁড়ায়, আজকের দিনে অনেক নাট্যপত্রিকা এত কপি ছাপার

কথা ভাবতেই পারে না। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে 'অভিনয়' দিল্লি, বম্বে (আজকের মুম্বাই) শিলং, লক্ষ্ণৌ, গৌহাটি, ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রদেশে পৌঁছে গিয়েছিল। পাশের দেশ বাংলাদেশেও 'অভিনয়' এর চাহিদা ছিল ভালোই (চারশো কপি)। বিভিন্ন প্রদেশ ও বাংলাদেশ থেকে প্রচুর চিঠিপত্র আসতো 'অভিনয়' দপ্তরে। সেখানে বাছাই করে প্রতি সংখ্যায় চিঠি ছাপানো হতো 'সমীপেষু' বিভাগে। এপার-ওপার বাংলার নাট্যপত্রিকা ও দেশ-বিদেশের নাট্য প্রযোজনার ছবি নিয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন করতো 'অভিনয়' পত্রিকা। বাংলাদেশের রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত 'থিয়েটার' পত্রিকা এবং 'অভিনয়' পত্রিকার মধ্যে ভাব বিনিময় হতো।

'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা গুণে-মানে দর্শকের দরবারে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলো। আমরা যে সময়ের 'অভিনয়' নাট্যপত্র নিয়ে আলোচনা করছি তা হলো ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত। এই এগার বছরে মোট একচল্লিশটি সংখ্যা বের হয়েছিলো 'অভিনয়' -এর। ১৯৮১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সম্পাদক দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে শ্রীমতী গীতা ভট্টাচার্য পত্রিকার মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান কর্মসচিব হন বিজয় ভট্টাচার্য। কিন্তু সম্পাদক হলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য। আর পত্রিকার মূল পরিচালক হলেন অমল রায়। এর ইতিহাস পরে আলোচনা করা যাবে। কিন্তু দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা(১৯৭০-৮০) নাট্য পত্রিকার জগতে হীরক দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। সত্তর দশকের নাট্যবিষয়ে কিংবা নাট্যপত্রিকা নিয়ে আলোচনা করতে হলে 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকার কথা বলতেই হবে। নাট্যদল, নাট্যকর্মী ও নাট্যদর্শকের এক সম্মিলন মঞ্চ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলো এই পত্রিকা। সত্তর দশকের অগ্নিগর্ভ সময়কালের রক্তাক্ত যন্ত্রণা, ক্ষোভ, দীর্ঘশ্বাস এবং উন্মত্ত ক্রোধ এই নাট্যপত্রিকার পাতায় পাতায় উচ্চারিত হয়েছে। শুধুমাত্র নাটক নয়, এমন কি প্রবন্ধ -নিবন্ধ, নাট্য সমালোচনা ও সম্পাদকীয় গুলিতেও সরাসরি ও প্রত্যক্ষ আক্রমণ করা হতো শাসক গোষ্ঠী ও তাদের দালালদের। সেই রক্তাক্ত অতীতের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় জন্মেজয় মল্লিক লিখেছেন ঃ

> 'প্রত্যক্ষ বাস্তবের রুক্ষ-রূঢ় প্রেক্ষাপটে লেখা নাটকই বেশি ছাপা হয়েছে। অত্যাচারিত গ্রামের কৃষক , শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট কারখানার শ্রমিক ও নিঃস্ব রিক্ত মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রাম এবং যূথবদ্ধ সংগ্রাম তথা শ্রেণী সংগ্রামেই সাধারণত প্রতিফলিত হত 'অভিনয়' - এ মুদ্রিত নাটকগুলিতে। তদুপরি নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের রাজনীতির অনুসারী সরাসরি শ্রেণী- ঘৃণা ও শ্রেণী হিংসার, বিশেষত নকশালপন্থী বীর যুবকদের আত্মত্যাগের মহিমা প্রচারকারী যত নাটক 'অভিনয়' সেই পর্বে ছেপেছে, তত নাটক নকশালপন্থী রাজনীতির ঘোষিত মুখপত্র 'নাট্যপ্রসঙ্গ ও ছাপেনি।'

দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে শিরদাঁড়া কারো কাছে বন্ধক না দিয়ে

দক্ষতার সঙ্গেই 'অভিনয় ' নাট্যপত্রিকা চালিয়ে গেছেন। সরাসরি নাটকের লোক না হয়েও এক বুক স্বপ্ন নিয়ে, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা রেখে তিনি 'অভিনয়' পত্রিকা প্রকাশ করে গেছেন। পত্রিকার স্বার্থে কখনও আপোষের রাস্তায় হাঁটেন নি। জরুরি অবস্থার সময় নাটকের উপর সেন্সরশিপের কালো যবনিকা নেমে এসেছিলো। কিন্তু 'অভিনয়' -এর সম্পাদক ও সম্পাদকমন্ডলী সেই সময়ে এক দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁরা সেন্সরশিপকে অগ্রাহ্য করেই পত্রিকা চালিয়ে গেছেন। 'অভিনয়' - এর সম্পাদক পত্রিকায় প্রকাশিতব্য কোনও লেখাই সেন্সরের জন্য পাঠাননি। চূড়ান্ত ঝুঁকি নিয়ে সমস্ত প্রতিবাদী লেখা ছেপে গিয়েছেন। ১৯৮০ সালে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অভিনয়'-এর শেষ শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হতো। সম্পাদকীয়তে নাট্যকর্মীদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছিলঃ

> 'অভিনয়' যখন আপনাদেরই নিজস্ব পত্রিকা, তখন আপনারাই ঠিক করুন- কি করে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবেন। আমরা আপনাদের রায় নত মস্তকে মেনে নেব। '

- সেই অর্থে 'অভিনয়'কে বাঁচিয়ে রাখা যায়নি। কিন্তু বাংলা নাট্যচর্চার ধারায়, নাট্যপত্রিকার ইতিহাসে স্বমহিমায় বেঁচে আছে 'অভিনয়' নাট্যপত্রিকা। গৌরবময় ঐতিহ্যে ও সুনামে এই নাট্যপত্রিকা নিঃসন্দেহে অতুলনীয়।

**ঋণস্বীকার ঃ**
'নাট্যকথা' পত্রিকা, সম্পাদক- সৌমিত্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, দশম বর্ষ, সংখ্যা চৌদ্দ, 'অভিনয়' বিশেষ সংখ্যা।

লেখক ঃ **ড. অপূর্ব দে**, পশ্চিম বাংলার বিশিষ্ট নাট্যকার ও নাট্য গবেষক।

# ঘরে বাইরে

## দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছোট ছোট ব্যাথা, ছোট ছোট অশ্রুকণার থাকে বিশাল প্রেক্ষাপট। বাংলা থিয়েটারের অভিনেত্রীদের নিয়ে কিছু কালির আঁচড় টানার শুরুতেই কথাটি মনে এল। বাংলা থিয়েটারের জন্ম যেমন লড়াইয়ের গর্ভে, ঠিক তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শখের থিয়েটার বা বাবু থিয়েটার চর্চার কাল থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে সংযুক্ত অভিনেত্রীদের সময় বিশেষে বিভিন্ন ধরণের লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছে। এ বিষয়ে একটি প্রবাদ মনে পড়ে— নারী মাথা নীচু করে থাকলে সেটাই শৃঙ্খলাপরায়ণতা, আর নারী মাথা উঁচু করে থাকলে সেটা চরম অপরাধ। বিংশ শতাব্দীরও একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অভিনেত্রীদের সম্মান ও মর্যাদার প্রশ্নে শিক্ষিত সমাজ ভীষণ রকম কটাক্ষ এবং অবহেলা সহ্য করতে হয়।

১৮৭৩ সালে বেঙ্গাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই যে চারজন অভিনেত্রী মঞ্চালোকে উপস্থিত হয়েছিলেন তারা এসেছিলেন বিভিন্ন নিষিদ্ধপল্লী থেকে। নাট্যানুরাগী পুরুষ উদ্যোক্তাদের তৎকালীন তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ তীব্র ধীক্কারে জর্জরিত করেছিল। অভিনেত্রীদের বহু ধরণের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার শিকার হতে হয়েছিল।নিজেদের সেই আদিম পেশায় থাকলে তাদের রোজগার হয়তো থিয়েটারের রোজগারের থেকে বেশি হতো, কিন্তু যেভাবেই হোক বা যে কারণেই হোক মঞ্চকে তারা বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন। এর ফলে নিজ পরিবারে বা পেশাগত জায়গায় লোভি অভিভাবিকার চরম অত্যাচার তাদের সহ্য করতে হয়েছিল। সময়ান্তরে অমন অনেক তৎকালীন বাবুদের দেবদাসীরা বহু প্রতিকূলতা, বহু শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার বোঝা কাঁধে নিয়েও মঞ্চমায়ার হাতছানি এড়াতে পারেন নি।

থিয়েটারের জন্য নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েও পুরুষ শাসিত থিয়েটারে চরম অপমান বঞ্চনার জ্বলন্ত উদাহরণ তো বিনোদিনী। উত্তরপর্বে আরও অনেক অভিনেত্রীদের একই পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭৩ সালে 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় লেখা হলো 'সিমলার কতকগুলি ভদ্র সন্তান বেঙ্গাল থিয়েটার নাম দিয়া আরেক থিয়েটার খুলিতেছে। .... যে যে স্থানে পুরুষদিগকে মেয়ে সাজাইয়া অভিনয় করিতে হইত সেইস্থানে আসল একেবারে সত্যিকারের মেয়েমানুষ আনিয়া নাটক করিলে অনেক টাকা হবে এই লোভে পড়িয়া তাহারা কতকগুলি নটীর সন্ধানে আছেন। .... মেয়ে নটী আনিতে গেলে মন্দ স্ত্রীলোক আনিতে হইবে, সুতরাং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে। কিন্তু দেশের পক্ষে তাহা অনিষ্টের হেতু হইবে।' এই সকল তথাকথিত অচ্যুত শ্রেণির মহিলারা অভিনেত্রী জীবনের লড়াইয়ের যে ভিত রচনা করে গেছেন বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস আজও তা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করে, বাস্তব জীবনে তাদের বহুপ্রকার ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, অপমান সহ্য করতে হলেও মঞ্চে তাদের

চরিত্র রূপায়ণ ছিল অসম্ভব সুন্দর। এই বৈপরীত্য যথেষ্ট প্রসংশার দাবি রাখে।

শোনা যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও মঞ্চে উক্ত নটীদের সমাগমকে সমর্থন করেন নি। কিন্ত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন নারী শিল্পীদের নেওয়ার স্বপক্ষে আন্দোলন শুরু করেন। মনমোহন বসুর 'মধ্যস্থ' পত্রিকা মাইকেলকে তীব্র আক্রমণ করলেও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' মধুসূদনের সমর্থনে লেখা প্রকাশ করেছিল, কালান্তরে সেই লড়াই আজও টিকে আছে, তবে অন্যভাবে, অন্য মাত্রায়।

পূর্বে বর্ণিত অভিনেত্রীদের যন্ত্রণা অনুভব করে একসময় মহাকবি গিরিশচন্দ্র লিখলেন:

'তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার।
তবু ও পথে পদ করে অর্পণ।।
রঙ্গাভূমি ভালোবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।।"

কালে কালে পরিস্থিতির বদল হয়েছে। অভিনেত্রীদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা হলেও বদলে গেছে। অভিনেত্রীরা আজ আর সমাজে একেবারেই অপাঙক্তেয় নন একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির জটাজালে আজও একটা লড়াই জারি রয়েছে ঘরে বাইরে।

ঘরে বাইরে আজকের শ্রেণি বিভাজিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বাধীনতার বিষয়টি বহুবিধ প্রশ্নের মুখোমুখি। যদিও আদিম সাম্য অবস্থার উত্তরপর্বে স্বার্থান্বেষী সমাজপতিরা নারীকে বহুবিধ নিয়মতান্ত্রিকতার শৃঙ্খলে বেঁধেছিলেন। কিন্তু আজ শৃঙ্খলিত নারীর শৃঙ্খল ধীরে ধীরে খসে পড়েছে অনেকাংশে। এবং সেটাও ঘটেছে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়ে। অবশ্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জীবনবোধের পার্থক্য এখনও বিদ্যমান। এমনই এক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের বিশেষভাবে আলোকিত করেছেন। 'রক্তকরবী'-র মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রতিবাদ। 'সৌন্দর্য ও কল্যাণের আধার নন্দিনী। শোষণমুক্তিতে সকলের আগে থাকে সে, মরণকে বরণ করে নিয়ে তার উপর জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই তার আভরণ রক্তকরবী।'

দুর্ভিক্ষ, দেশবিভাগ-এর মত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ডামাডোলের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বাংলার নারীদের উপর পড়ে। নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় তাদের। থিয়েটার জগতের প্রেক্ষাপটেও আসে বহু পরিবর্তন। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে জন্ম হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের।

গণনাট্য সংঘের হাত ধরেই প্রায় শুরু হয় গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন। আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক নারী থিয়েটার চর্চায় নিজেদের যুক্ত করেছেন। সেই সময়কালে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন অর্থাৎ কিছু ইতিবাচক দিক লক্ষ্য করা যায়। মেয়েদের

শিক্ষার হার, বিবাহের বয়স কিংবা বাইরের কাজে মেয়েদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সামাজিক উদারতার বিষয়ও নজরে পড়ে। দিন যত এগুতে থাকে গ্রুপ থিয়েটার গুলি তাদের প্রযোজনার মধ্য দিয়ে মানুষের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়। প্রতিবাদের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে মঞ্চ থেকে মঞ্চে। তৎকালীন দক্ষিণপন্থী শাসন ব্যবস্থার ভিত আলগা করে দিতে উক্ত বার্তা যথেষ্ট অর্থবহ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। কিন্তু সে এক অন্য প্রসঙ্গ। যেটা বলার তা হলো পাবলিক থিয়েটার তখনও অনেকাংশে সজীব থাকলেও সামাজিকভাবে যাঁরা বিতর্কিত ছিলেন তারা নন, কিন্তু বেশ কিছু অভিনেত্রী তখন বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। পাবলিক থিয়েটারের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা প্রায় সকলেই ছিলেন পেশাদার। এই পেশাদার অভিনেত্রীদের অধিকাংশেরই জীবনযুদ্ধের লড়াইটা ছিল ভয়ঙ্কর। বহুপ্রকার অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত এই সকল অভিনেত্রীরা পেশাদার ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তাদের অভিনয় সৌকর্যে কোনও খামতি ছিল না। উত্তরকালের এই সকল অভিনেত্রীদের হয়তো পূর্বকালের মতো থিয়েটারের বাবুদের নৈশসঙ্গী হতে হতো না। তবে উত্তরকালে পুরুষদের পৌরষত্ব জাহিরের বিরুদ্ধে লড়াইটা ছিল নানা প্রকার। এছাড়াও অভিনেত্রীদের পরিবারের সঙ্গে থিয়েটারের একটা ভারসাম্য রক্ষার লড়াই করে যেতে হয়েছে এবং আজও তা জারি আছে। ফলে ঘরে বাইরে সর্বত্রই তাদের লড়াই।

গত শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে গ্রুপ থিয়েটার আন্দালন পুরুষশাসিত শিল্পকলা হলেও প্রায় সব দলেই ২/৩ জন করে অভিনেত্রী যুক্ত হলেন। তাদের একাংশ পেশাদার হলেও দলে কাজ করতে করতেই গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনের আদর্শকে আত্মস্থ করেছিলেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। এখনকার মতো তখন তো অভিনয় শিক্ষার সরকারি বা বেসরকারি স্তরে এত প্রতিষ্ঠান ছিল না, ফলে নিজ নিজ দলের নির্দেশকই ছিলেন শিক্ষাগুরু, দীর্ঘ দুই তিন দশকের উত্তাল রাজনৈতিক আন্দোলন পর্বে তৎকালীন সময়ের অভিনেত্রীরাও থিয়েটার নামক আয়ুধ সঙ্গে নিয়েই লড়াই চালিয়েছিলেন। সেই লড়াইও ছিল ঘরে বাইরে। মধবিত্ত পারিবারিক মানসিকতার অনেক জটিল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও তাদের দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁদের অনেকেই আবার মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন—'পরিবার পাশে না দাঁড়ালে কি থিয়েটার করতে পারতাম।' আসলে যে কোন প্রযোজনার প্রস্তুতিপর্বে দীর্ঘ মহলায় যে সময় দিতে হয় বা মঞ্চায়নের দিনে যেভাবে 'একান্ত নিজস্ব' বা 'একান্ত পারিবারিক' বিষয়গুলিকে পাশে সরিয়ে রাখতে হয় তাতে তো পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের স্যাক্রিফাইস করতেই হয়। চরিত্রানুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করতে তো একান্ত নিজস্ব কিছু সময়েরও প্রয়োজন। সেই সময়টায় পরিবারের সদস্যরা পরিবারে তাঁর ভূমিকা থেকে বঞ্চিত হয়। অতিরিক্ত আবেগ না থাকলে এই লড়াইটা কখনও জেতা যায় না। আদর্শবোধ এবং মানসিক জেদ না থাকলে কোনও অভিনেত্রী বা অভিনেত্রীরা পারবেন না 'সিঁদুর লালিত শৃঙ্খলিত সতীত্বের বন্ধন, হাতের নোয়ার বন্ধন, হেঁসেলের বন্ধন, আঁতুর ঘরের প্রাচীর ভাঙতে।' গত ১৫/২০ বছরে একটা বিষয় নজরে এসেছে, সেটা শহর কলকাতাই হোক বা জেলার থিয়েটারই হোক—খুব

ছোটবেলা (নাকি মেয়েবেলা) থেকে পরিবারের কোন না কোন সদস্যের গ্রুপ থিয়েটার বা গাঁ ঘরে কিংবা পাড়া ঘরের শখের থিয়েটারে অভিনয় দেখে দেখে থিয়েটার বিশেষ করে অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছে। সেই পরবর্তী প্রজন্মের অনেক মেয়েই ধীরে ধীরে থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সেক্ষেত্রে অভিনয় করার অদম্য ইচ্ছা এবং থিয়েটার নামক কর্মকান্ডের প্রতি ভালোবাসাটাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেরই একাংশ অস্বচ্ছল পরিবারের সদস্য হবার কারণেই থিয়েটার থেকে কিছু উপার্জনের চেষ্টা করেছে। কারণ অস্বচ্ছলতাজনিত যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার বন্ধন কাটিয়েই তারা থিয়েটারে এসেছে। আবার অন্য একটা অংশ স্বচ্ছল পরিবারের প্রতিনিধি হলেও নারীর স্বাধিকার অর্জনের প্রশ্নে যথেষ্ট সচেতন। কম হোক বা বেশি হোক নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টি খুব সূক্ষ্ম এবং সচেতনভাবেই কাজ করছে।

এছাড়াও আরও একটি শ্রেণির নারী যারা স্বেচ্ছায় থিয়েটারে আসেন থিয়েটারকে ‘লঞ্চিং প্যাড’ হিসাবে ব্যবহার করতে। তাদের নিবিড় লক্ষ্য হলো থিয়েটারে যুক্ত হয়ে ‘অভিনয়ের টুকিটাকি’ শিখে নিয়ে টিভি সিরিয়াল বা ফিল্মের দরজায় কড়া নাড়া। মূলতঃ স্বচ্ছল পরিবারের এই প্রতিনিধিরা আর যাই করুন সামগ্রিকভাবে থিয়েটারকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে তেমন কোন ভূমিকা পালন করেন না।

অন্য একটি বিষয় এই সময়কালে বিশেষভাবে নজর কাড়ে। তা হলো, অদূর অতীত থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ে যে অভিনেত্রীরা কাজ করে চলেছেন তাঁদের প্রায় সকলেই শিক্ষিত বা শিক্ষার আলোয় আলোকিত থাকার কারণে ঘরে বাইরে আজও বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হলেও তাঁরা ‘নারীসুলভ দুর্বলতায় যে কম্প্রোমাইজ’ তাকে হেলায় পরিহার করতে পারেন এবং পারছেন।

এদের একটা বড়ো অংশই বহুধরণের প্রতিকূলতা থাকলেও থিয়েটারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছেন। অভিনেত্রী হিসাবেই হোক বা নির্দেশিকা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশ্নাতীত দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে চলেছেন প্রতিনিয়ত। তাদের দক্ষতা অর্জনের পথেও কটাক্ষ বা কূটনাতি কম ক্রিয়াশীল ছিল না। অনেক বন্ধুরতা অতিক্রম করে, অনেক লড়াই করেই আজকের সাফল্য এসেছে।

একটা দিন আসবেই এই শ্রেণি বিভাজিত সমাজব্যবস্থায়, যেদিন সমাজের অর্ধেক আকাশ যে নারী, সমস্ত রকম ঘরে বাইরের লড়াই-এর ঊর্ধ্বে মাথা উঁচু করে মুক্তির গান গাইবে।

নারীমুক্তির আন্দোলন সেদিনই সার্থক হয়ে উঠবে।

---

লেখক ঃ **দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়,** সম্পাদক, গ্রুপ থিয়েটার, কলকাতা।

# বড় লোকের দেশের থিয়েটার

আশিস গোস্বামী

অবশেষে পৌঁছনো গেলো বড়লোকের দেশে। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, করোনা ভ্যাকসিনের গেড়ো পেরিয়ে অবশেষে নামতে পারলাম ডালাস বিমানবন্দরে। সেই কোন ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি আমেরিকা নামের একদেশে নাকি টাকা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। তাই আমাদের সবার মনে একটা আমেরিকা থাকে। সে দেশ না জানি কেমন এক দেশ। রূপে-গুণে কেমন সে রূপবতী সেটা দেখতেই আসা। ভৌগলিক ভাবে আমাদের ভারতবর্ষের ছয়গুণ বড় এক দেশ। অথচ আমাদের দেশে ১৩০ কোটি মানুষ আর এই দেশে লোকের বসবাস মাত্র ৩৫ কোটি হবে। ৩০ কোটি নাগরিক আর ৫ কোটি বাইরে থেকে আসা ছাত্র-শিক্ষক- চাকুরিজীবী - অধ্যাপক- গবেষক। ফলে কোনোমতেই আমার দেশের সাথে মিলজুল হতেই পারে না। এই দেশটা সেই ১৭৭৫ থেকে অনবরত যুদ্ধ করে গেছে অসংখ্য, যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে তার চেয়েও বেশি। তবু মাত্র ২৫০ বছরে পৃথিবীর সব সেরা জিনিষে ভরিয়ে রেখেছে দেশ। সেরা মানুষ, সেরা গবেষণাগার, সেরা কলেজ, সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, সেরা চাকরী, সেরা প্রলোভন- সব সেরা আর সেরা। আসলে ওসব নয়, এই দেশ হলো সেরা ব্যবসায়ীদের দেশ, তারা চেয়েছিলেন সেরা বুদ্ধিমানদের নিয়ে আসতে। এই দুই মিলে এরা সামান্যকে অসামান্য বলে বেচতে ওস্তাদ। তাই ডলারের জোরে সারা পৃথিবী থেকে সেরা বুদ্ধিমানেরা সব হাজির হন এখানে। এমন সব কৌশল বানিয়ে রেখেছে যে, আমরা ভাবি এখানে এলে জীবন সিদ্ধ। তাই সিদ্ধিলাভের নেশায় ছুটিয়ে মারে আমাদের। তবে কেউ পারে কেউ পারে না, তাতে দৌড় থামেনি। বরং বিভিন্ন দেশে যত অস্থিরতা বেড়েছে, দেশ ছাড়াদের ভিড় তত বেড়েছে, আর তাদের বেশিরভাগ এসে পৌঁছেছে এই দেশে। আর কয়েকদিনের মধ্যে বুঝতে পারি, এখানে টাকা উড়ে বেড়ায় দূরন্ত, এ বড় কঠিন ঠাঁই। টাকার গল্প একভাবে ছড়িয়ে যে কৃচ্ছসাধনার চেহারা দেখলাম তাতে মনে হল, এই ভালো আছি। অপরিসীম পরিশ্রম এবং কঠোর নিয়মের মধ্যে জীবন বাজি রেখে চলতে হয়। এ দেশ সকলের জন্য নয়- এটা মেনে নিতে হবেই। এই দেশে যেমন হাজার সেরা আছে আবার লাখো খারাপ রয়েছে। সেসবের অনেক কিছু জানি আবার জানি না। কিন্তু এখানে পৌঁছে গেলে জীবনের গ্যারান্টি অনেক সহজ সাধারণের কাছে। তবে সেটা কালো মানুষদের কতটা জীবন নিশ্চিত করেছে সেটা হলফ করে বলা যাবে না।

সারা জীবনে একজন নেতা বা মন্ত্রী বা পুলিশ না চিনলেও সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার গ্যারান্টি আছে, প্রতিদিনের মানুষের এই সামাজিক ব্যবস্থাটাই আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। যার অভাব বোধ করি আমরা। দূর থেকে এই দেশের জৌলুস দেখেই

মুগ্ধ, ভিতরে প্রবেশ করলে সমাজজীবনের নানা স্তর, বেঁচে থাকার নানা গল্পকথা শোনা খুব বিরল নয়। এদেশে ধর্ম নিয়ে ঝামেলা আছে, সাদা-কালো নিয়ে অমানবিকতার চূড়ান্ত রূপ আছে এদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে । একইভাবে এমন দেশের থিয়েটার নিয়ে যা শুনে এসেছি এতকাল সেটা যে সব নয়, তা বুঝলাম এখানে এসে। এখানেও যে থিয়েটার নিয়ে মরণ-বাঁচন সমস্যা রয়েছে সেটা বুঝতে গোটা চার-পাঁচেক থিয়েটার দর্শন করতে হল। করোনার পর থিয়েটার নতুন করে শুরু করা যে রীতিমত কঠিন এক কাজ তা মেনে নিয়েছে আপামর পৃথিবী। আমেরিকা তার বাইরে নয়। দূর থেকে আমরা এদেশের থিয়েটার বলতে বুঝতাম শুধু ব্রডওয়ে থিয়েটার, অফ ব্রডওয়ে আর অফ অফ ব্রডওয়ে থিয়েটার। এসব নিয়ে আমাদের যত গালগল্প। তার বাইরে যে ৫০টা রাজ্যে আরো হাজার খানেক থিয়েটার এবং থিয়েটার দলের যুদ্ধ রয়েছে তা নিয়ে বাইরে থেকে আমাদের কোন উৎসাহ বা আলোচনা নেই, আলোচনা করি না আমরা, নাকি করতে দেয়া হয় না , বলতে পারবো না সে কথা। কিন্তু সমগ্র আমেরিকায় এই থিয়েটারটাই মূলত থিয়েটার হিসেবে কাজ করছে। এটা সবার আগে বুঝতে হবে।

এই থিয়েটার চলে মূলত ব্যক্তিগত দানে। এখানে প্রায় সব থিয়েটার হল বানিয়ে দিয়েছেন কোন না কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বা এককভাবে কোন একজন দাতা। আর আছে বিভিন্ন চার্চ এবং স্কুল কলেজের থিয়েটার হল। আমি মাস দুয়েক যেখানে ছিলাম সেখান থেকে হাঁটা পথ দূরত্বে মেরিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির Clarice Smith Performing Arts Center দেখলে বিস্মিত হতে হয়, ব্যক্তিগত দানে এমন একটা সেন্টার হতে পারে দেখে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সেন্টার দেখে চক্ষু চড়ক গাছে। আমাদের মত দেশে কি এমন টাকাওয়ালা মানুষ নেই? আছেন, কিন্তু এই চর্চাটাই গড়ে ওঠেনি। ওই যে লিখলাম, এই দেশ বানিয়েছে ব্যবসায়ীরা আর ডেকে নিয়ে এসেছে বুদ্ধিমান লোকদের। ফলে কি করে সেরা জিনিষ বানাতে হবে সেটা ভেবেছ আগে। এই যে সেন্টার তার প্রতিষ্ঠাতা Clarice Smith গত ১১ ডিসেম্বর ২০১১ সকালে ৯২ বছর বয়সে চলে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যার Symphony Orchestra-তে আমি উপস্থিত থেকে দেখলাম তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। পুরো সেন্টার ঘুরে অবাক হয়ে গেছি তার ব্যবস্থাপনা দেখে। গোটা চারেক অডিটোরিয়াম, নানা সাইজের ।দু'পাশে অনেকগুলি রিহার্সাল রুম, বিশাল লাইব্রেরি-ডিজিটাল এবং বইয়ের জন্য আলাদা জায়গা রয়েছে। আর আছে নাটক -নাচ-মিউজিকের জন্য ক্লাশরুম। মনে রাখতে হবে এখানে শুধু থিয়েটারের জন্য আলাদা করে কিছু থাকে না। সমস্ত পারফরমেন্সের জন্য এক ছাদের তলায় একটা পারফরমেন্স সেন্টার হিসেবে ব্যবস্থা করা হয়। এখানেও Dekelboum Concert Hall, Kay Theatre, Kogod Theatre এমন সব পাশাপাশি রয়েছে, যেখানে একসাথে কোথাও কনসার্ট, কোথাও থিয়েটার হচ্ছে। আর সেসব হলে লাইট-সাউন্ডের যা আয়োজন দেখি তা দেখে বিভ্রম হয় মনে -চোখে। সব ঠিক

দেখছি তো! একটা ইউনিভার্সিটির মধ্যে এমন অডিটোরিয়াম! এ সব তো আমাদের গরীব দেশে হবে না কোনোকালে। সেই না হবার আফশোষ হতো না যদি ব্যক্তি মানুষের এই সহযোগিতার কথা না জানতাম। আমাদের দেশে কি এমন মানুষ নেই যিনি এমন সব কাজে এগিয়ে আসতে পারেন। হয়ত এত কিছু হত না, কিছু ত হোতো। সেসব হয়নি, তবু আমাদের গরীব এক থিয়েটার আছে, যা নিয়ে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে বাঁচে, যা নিয়ে আমি গর্বিত।

গত ২০ ডিসেম্বর থেকে আবার থিয়েটার বন্ধ হতে শুরু করল করোনার বাড়াবাড়ির জন্য। প্রথমে জানলাম, আলাদীন হবে না ২৩ জানুয়ারী থেকে, তাদের তিনজন শিল্পী করোনা আক্রান্ত। এরপর দেখলাম এক এক করে প্রায় ৩০টি নাটক বন্ধ হয়ে গেল কয়েকদিনের জন্য। গত ১৮ মাসের ক্ষত শুকিয়ে যাবার আগেই আবার এই বন্ধ হয়ে যাওয়াকে একেবারে লকডাউনের ধাক্কায় পৌঁছে দিতে চাইছে না বলে এটা আপাত বন্ধ ঘোষণা করা হল। চেষ্টা করছেন বিকল্প শিল্পী দিয়ে সামলে নেবার, সেটাও না হলে বন্ধ রাখতে হচ্ছে থিয়েটার। প্রায় ৩২টা হলের হাউসফুল টিকিট ফেরত দিয়ে দেয়া যে সাংঘাতিক আর্থিক ক্ষতি সেটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না । সরাসরি ব্রডওয়ে নয়, এমন থিয়েটার দেখলাম কোথাও বিকল্প শিল্পী নিয়ে বা দু-তিনটে চরিত্র নিয়ে, কম খরচে হচ্ছে। দর্শক তেমন নেই। একমাত্র সিয়াটেল রেপার্টরি থিয়েটারের ‘দ্য উইন্টার’স টেল’ মিউজিক্যাল ডিজিটাল ভার্সান দেখলাম প্রচুর চরিত্র নিয়ে। শেক্সপিয়রের এই নাটক আগে দেখিনি এমন কি মিউজিক্যাল হিসেবে শেক্সপিয়রের কোনো নাটক দেখিনি। তাই এই প্রযোজনা নিয়ে আগ্রহ ছিল। সত্যি ভালো লাগলো কাজটি। এরজন্য আরতি তেওয়ারিকে ধন্যবাদ। ওর জন্য দেখা হলো। আরো ভালো লাগলো ওকে দেখে, গুরুত্বপূর্ণ এক চরিত্রে সে অভিনয় করছে। সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে দেখাল। না হলে দেখা হত না এমন একটা কাজ। আরতিকে দেখে অনেকের শেখা উচিত, কিভাবে নিজেকে পৌঁছে দেয়া যায় বড় জায়গায়। একেবারে একক চেষ্টায় আজ সে সিয়াটেল রেপার্টরি থিয়েটারের মত পেশাদার দলে নির্ভর যোগ্য অভিনত্রী হিসেবে জায়গা করে নিতে পেরেছে। আর একটা কথা বলা দরকার, থিয়েটার ডিজিটাল মাধ্যমে কোন জায়গায় যেতে পারে তার এক বড় উদাহরণ আমার কাছে হয়ে থাকলো। নিশ্চয় এটা থিয়েটার নয়, তবে একটা থিয়েটার কিভাবে ধারণ করা সম্ভব সেটা দেখলাম এই কাজটায়। অনেকদিক থেকে শিক্ষণীয় হয়ে থাকল এই প্রযোজনা।

---

লেখক ঃ **আশিস গোস্বামী**, কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব।

# 'অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে'
# কলকাতায় দৃষ্টিহীনদের থিয়েটারের পঁচিশ বছর

মনুজেন্দ্র কুনডু

**গোড়ার কথা**

দু'হাজার বাইশে পঁচিশ বছর সম্পূর্ণ হল কলকাতায় দৃষ্টিহীনদের থিয়েটারের। কলকাতার আর পাঁচটা নাটকের দলের কলাকুশলীদের মতোই নানা চড়াই-উতড়াই এবং ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে তাঁদের পথ চলতে হয়েছে। কিন্তু একটি প্রান্তিক দৃষ্টিহীন দল হিসেবে তাদের পথ অবশ্যই তুলনামূলক ভাবে বেশি বন্ধুর।

শুরুটা হয়েছিল জনা ত্রিশ দৃষ্টিহীন কলাকুশলীদের সঙ্গে। ১৯৯৬ সালে থিয়েটার মডিউল তৈরী করার উদ্দেশ্যে নাট্যদল নান্দীকার একটি প্রকল্প বা প্রজেক্ট গ্রহণ করে। এই যৌথ প্রয়াসের ফলে *অর্কেস্ট্রা* (১৯৯৬) নামে একটি প্রযোজনাও করা হয়। নান্দীকারের পক্ষ থেকে এই কর্মকান্ডের হোতা ছিলেন শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। প্রজেক্টটি শেষ হয়ে যাবার পর আপ্লুত দৃষ্টিহীন কলাকুশলীদের থিয়েটারি কাজ চালিয়ে যাবার অনুরোধে নান্দীকার থেকে বেরিয়ে আসেন শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এবং গড়ে তোলা হয় ব্লাইন্ড অপেরা নামে দলটি। এঁদের সঙ্গে যোগ দেন অশোক প্রামাণিক এবং প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়।

*মনসামঙ্গল*-এর (২০০০) সাড়া জাগানো প্রযোজনা ব্লাইন্ড অপেরাকে প্রথম প্রচারের আলোয় নিয়ে আসে। এরপর রবীন্দ্রনাথের রাজা-র প্রযোজনা (২০০২) এনে দিল বৌদ্ধিক-সমালোচকের প্রশস্তি-সমর্থন। শঙ্খ ঘোষ সহ কলকাতার বিশিষ্ট নাট্যামোদীর অকুণ্ঠ প্রশংসাধন্য *রাজা* নিয়ে বেশ আলোচনা হল। বহু গুণিজনের আলোচনা লিপিবদ্ধ করে তখন একটি বইও প্রকাশিত হয়েছিল। এরপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ছিল রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী (২০০৫)। চণ্ডালিকার অভিযোজন ঘটে যখন অন্ধপ্রকৃতি চণ্ডালিকা-য় (২০০৬)

**ভাঙন পর্ব**

কিন্তু এরপরই আসে কলকাতার গ্রুপ থিয়েটারের অবধারিত মনোমালিন্য এবং দল বিভাজনের পর্ব। মতাদর্শগত বিরোধ এবং শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই এই বিভাজনের সূত্রপাত। দৃষ্টিহীন কলাকুশলীরা এই পর্বে চাইছিলেন আরও বেশি করে প্রশাসনিক কাজকর্ম শিখতে এবং সেগুলোর সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে। তাছাড়া, তাঁরা তাঁদের প্রোসেনিয়াম থিয়েটারে কাজ করার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রাম-মফস্বলে প্রোসেনিয়ামের বাইরের স্পেস/স্থানকে ব্যবহার করে কাজ করার কথাও বলতে শুরু করেন। এ সব বিষয়কে কেন্দ্র করেই মতবিরোধ দানা বাঁধতে শুরু করে।

এরপর ব্লাইন্ড অপেরা থেকে বেরিয়ে এসে ২০০৬ নাগাদ শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় তৈরী করলেন *শ্যামবাজার অন্যদল* নামে একটি দল। অল্প কিছু দৃষ্টিহীন কলাকুশলীদের নিয়ে তাঁর অন্য সঙ্গীরা থেকে যান ব্লাইন্ড অপেরাতেই। আর ব্লাইন্ড অপেরার সিংহভাগ কলাকুশলীই চলে যান শ্যামবাজার অন্যদেশে।

বন্ধ জলাশয়ের মতো কলকাতায় এই ধরণের একটা কাজ চালিয়ে যাওয়া যে খুবই কঠিন ব্যাপার, এ কথা যাঁরা এই শহরে নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত, তাঁরাই সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। অর্থাভাব কলকাতার নাটকের দলগুলোর একটা চিরকেলে সমস্যা। তার উপরে দলাদলি, আত্মদর্প, ক্ষমতা ও খ্যাতির লোভ, রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য, লিঙ্গ বৈষম্য/উচ্চাবচ- এই ধরণের নানা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ঘূর্ণিপাকে কলকাতায় 'গ্রুপ থিয়েটার' নামক আদর্শের প্রলেপ লাগানো কর্মকান্ডের এখন এমনই অবস্থা যে সম্ভবত তা স্মৃতির মহাফেজখানায় ঠাঁই পেতে চলেছে।

**জীয়নকাঠি**

এই রকম পরিস্থিতিতে সমাজের প্রান্তিকবর্তী মানুষদের নিয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া দুরূহ বৈ কি! তবে আমার মনে হয়, চালিকাশক্তির ইন্ধনটা এই প্রান্তিকবর্তী মানুষদের কাছ থেকে আসে বলেই  হয়তো নানা বাধাবিঘ্নও শ্যামবাজার অন্যদেশের মতো একটি দলকে দমিয়ে দিতে পারেনি। বছর দুয়েক কাজ করার পর থেকেই, ২০০৮ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের নাট্য-অনুদান পেতে শুরু করে শ্যামবাজার অন্যদেশ।

ভাঙনপর্বের পর প্রোসেনিয়ামের তুলনায় তাঁরা বেশি ঝুঁকলেন প্রোসেনিয়াম বহির্ভূত স্থান ব্যবহারের দিকে। তাছাড়া, যে নিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নে ২০০৬-এ ভাঙন দেখা দিয়েছিল, সেই অধিকারের প্রশ্ন বেশ খানিকটা অপনোদিত হওয়াটাই সম্ভবত এই ইতিবাচক ফলাফলের সূত্র। শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম থেকেই মূলত নাট্য-নির্দেশনার কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। আর প্রাতিষ্ঠানিক  পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে দৃষ্টিহীন কলাকুশলীদের উপরে প্রথম থেকেই। এই মুহূর্তে যেমন দলের কার্যনির্বাহী কমিটিতে রয়েছেন ৫ জন দৃষ্টিহীন এবং ৩ জন চক্ষুষ্মান্ব্যক্তি। (তিনি খোলও বাজান) নবকুমার কর্মকার। এঁরা সকলেই দৃষ্টিহীন। দলের দৈনন্দিন কাজকর্মে তাঁদের সাহায্য করেন চক্ষুষ্মানেরা।

চক্ষুষ্মান লোকজনের মতো অত খ্যাতি ও খেয়োখেয়ির মধ্যে নিজেদের জৈবিক কারণেই হয়তো ঢুকতে পারেননি। তাঁদের শারীরিক উনতাই তাঁদের আরো পাঁচটা সর্বাঙ্গ-সুস্থ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান নীচতা থেকে আলাদা করেছে, তাই হয়তো যাঁরা তথাকথিত শক্তসমর্থ, সুস্থ-সবল, তাঁদের প্রতিযোগিতা, রেষারেষি, অনাচারের থেকে তাঁরা বেশ অনেকটা দূরে থেকেছেন বা থাকতে পেরেছেন। তার মানে কিন্তু আমি একথা কখনোই বলতে চাইছি না যে যাঁদের শারীরিক উনতা আছে তাঁদের মধ্যে মানবীয় অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলো থাকে না। বলার

বক্তব্য হল, যাঁরা সব দিক দিয়ে 'স্বাভাবিকতার' সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের মতো কুম্ভীপাক ঘাঁটার প্রবণতা হয়তো এই ধরণের মানুষদের কমই থাকে।

দ্বিতীয়ত, এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ কলাকুশলীর অর্থনৈতিক সঙ্কট বা বিকল্প আয়ের সুযোগ না থাকাটাও বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে এই থিয়েটারের টিকে থাকার একটা কারণ। এই থিয়েটারে যে দৃষ্টিহীনরা কাজ করেন, তাঁদের প্রায় সবারই রয়েছে ব্যক্তিগত জীবনে প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কট। কোভিড পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে অনুদানের টাকা না আসায় স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা খুব সমস্যায় পড়েছেন। সুতরাং, থিয়েটার করার জন্য সরকারি অনুদানের সামান্য ক'টা টাকা না পেলে অনেকেরই আর কোনো আয়ের সঙ্গতি নেই। অর্থনৈতিকভাবে একমাত্র নির্ভরশীলতার ক্ষেত্র হয়ে ওঠার ফলে তাঁদের অনেকের কাছেই শ্যামবাজার অন্যদেশ কিছুটা মাত্রায় যেন নিবিড় শ্রমদানের একমাত্র লক্ষ্যকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

শারীরিক ও আর্থিক অভাববোধ কাটিয়ে ওঠার এই স্থান তাই অনেকের কাছেই হয়ে উঠতে পারে আরো অন্য কোনো কাজের স্বপ্ন দেখার বিচরণভূমিও। ৪ঠা জুন কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের তিন তলায় শ্যামবাজার অন্যদেশের এক কর্মশালায় যেমন প্রসূন সাহা বললেন, তিনি দৃষ্টিহীনদের নাট্যচর্চার পাশাপাশি ভবিষ্যতে পিএইচডি-ও করতে চান।

বার বার অন্ধত্বের উপর হয়তো বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এটাই বাস্তব। তবু চোখ না থাকার সুবিধার কথা বলতে গিয়ে সেই কর্মশালায় সুরজিৎ মন্ডল বললেন, একটা ইন্দ্রিয়ের অনুপস্থিতির জন্য তাঁর অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো আরও বেশি সক্রিয়, সজাগ হয়ে ওঠে। হয়তো তাঁর বা তাঁর মতো মানুষদের মধ্যে এই বোধগুলো সহজাত ভাবেই থাকে, কিন্তু তা নির্দিষ্টভাবে উচ্চারণ করতে সাহয্য করে নাটুকে অভ্যাস। (আমাদের সবার মধ্যেই বিদ্যমান) জড়তা কাটিয়ে উঠতে, প্রকাশ করতে শেখায় নাট্যক্রিয়ার কলাকৌশল।

এমনই বহুবিধ কারণে, শত বাধার মধ্যেও, শ্যামবাজার অন্যদেশ নিজেদের কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পেরেছে বলেই আমার মনে হয়। যেখানে কলকাতায় সর্বাঙ্গ-সুস্থ মানুষদের অন্যান্য গ্রুপ থিয়েটারগুলোর অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন। তাঁদের দৈন্য, অক্ষমতা, অভাবই তাঁদের এতবড় শক্তি যে আশপাশের অনেক দীনতা, দুর্বলতা তাঁরা কাটিয়ে উঠে এতদূর পর্যন্ত আসতে পেরেছেন। এটা নিশ্চয়ই কৃতিত্বের কথা।

যেমনটা আগেই বলেছি, এতকিছুর পরেও তাঁদের প্রাপ্তির ভাঁড়ার প্রায় শূন্যই। তবু যে কোন দর্শক-শ্রোতা যদি তাঁদের কোনো উপস্থাপনা দেখেন, কর্মশালায় যাবার সুযোগ পান, তিনিই অনুভব করবেন কী অসম্ভব জীবনীশক্তির দ্বারা তাঁরা পরিচালিত। সেটা যে শুধু তাঁদের নাট্যক্রিয়াতেই প্রতিফলিত তা-ই নয়, তাঁদের ভাবীকাল গড়ে তোলারও বাসনার মধ্যেও তা প্রকাশিত। এখানেই অনেকে কাজ করতে এসে প্রেমে পড়েছেন। বিয়ে হয়েছে। তাঁদের অনেকের সুস্থ-সবল সন্তানও এখন এই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত।

শ্যামবাজার অন্যদেশের এই টানাপোড়েন আর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরের ফসল প্রায় আঠারোটি নাটক। ব্লাইন্ড অপেরার মতোই শ্যামবাজার অন্যদেশও রক্তকরবী-র প্রযোজনা করেছে (২০০৭)। প্রযোজিত হয়েছে শিশির কুমার দাস বিরচিত তিন অন্ধ (২০০৮), ডাকঘরের অভিযোজন নির্বাসিতের জার্নাল (২০২১); ওস্তাদজি (২০২১), প্রতিমা পুড়ছে (২০২২) প্রমুখ। সময়ের হিসেবে সংখ্যাটা হয়তো উল্লেখযোগ্য নয়, তবে সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে এই বা কম কী! সরকারী অনুদানের পাশাপাশি অন্যান্য বেসরকারি সংস্থা থেকে অর্থ জোগাড়ের চেষ্টাও শুরু হয়েছে সম্প্রতি। কিছুদিন হল দলে যোগ দিয়েছেন নবীন নাট্যগবেষক রাজদীপ কোনার। তিনি দলের কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্যও। মূলত তাঁরই উদ্যোগে দেশের অন্যান্য প্রান্তে এবং বিদেশে এই নাট্যক্রিয়ার খবরাখবর পৌঁছে দেবার কাজ চলছে। অর্থাগমের ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এখনো তেমন আসেনি। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে কিছু হলেও হতে পারে।

রাজদীপের মতে, আজ থেকে ২৫ বছর আগে দৃষ্টিহীন মানুষদের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল থিয়েটার। আর এই ২৫ বছরের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় দৃষ্টিহীদের থিয়েটার শুধু দৃষ্টিহীদেরই নয়, রাজদীপ বা তাঁর মতো অনেক দৃষ্টিবানেরও আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পেরেছে। তাঁর মতে, এটাই এই থিয়েটারের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

শুধু প্রশংসা-প্রশস্তির বাইরে গবেষণামূলক কাজকর্ম আমাদের ভাবনাকে ঋদ্ধ করে। শ্যামবাজার অন্যদেশের পরিচালন পদ্ধতি, কলাকুশলীদের আন্তঃ-শ্রম সম্পর্ক, নির্দেশকের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সেই ধরণের কাজকর্মের প্রয়োজন রয়েছে। আগামী দিনে কেউ সে কাজ করবেন, এই থিয়েটার নিয়ে আরো আলোচনা হবে, পরিশেষে এই প্রত্যাশাই রইল।

*এই রচনায় সমস্ত তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন শ্যামবাজার অন্যদেশের সদস্য রাজদীপ কোনার।

লেখকঃ **মনুজেন্দ্র কুন্ডু** Springer Nature-এর Performance Studies & Cultural Discourse in South Asia নামক গ্রন্থমালার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর সম্পাদিত বই Women performers in Bengal and Bangladesh : Caught up in the culture of South Asia (1795 - 2010s) প্রকাশিত হবে Oxford University Press থেকে।

# দিল্লির নাট্যকার বারীন চক্রবর্তীর মুখোমুখি

## আদিত্য সেন

দিল্লির নাট্যকার ও হিন্দি রঙ্গমঞ্চের বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বারীন চক্রবর্তী ইদানীংকালে দুটি নাট্যসংকলন লিখে কলকাতা ও দিল্লির নাট্যমহলে আলোড়ন তুলেছেন। তাঁর প্রথম বাংলা নাটক, 'বনলতার গল্পকথা ও অন্যান্য নাটক ২০২০' সালে নভেম্বর মাসে বের হয়। তার ঠিক আট মাস পরে দ্বিতীয় বাংলা নাট্য সংকলন প্রকাশিত হয় ১২ই জুলাই, ২০২১ সালে। প্রথম নাট্যসংকলনের একটি নাটক 'মুক্তিবোধ' মঞ্চস্থ করেছেন হুগলির ব্যান্ডেল দিশারির নাট্যকর্মীরা। দ্বিতীয় নাট্য সংকলনে যেসব নাট্যকার, নাট্যকর্মী ও নাট্য পরিচালকদের মতামত প্রকাশিত হয়েছে তা উল্লেখযোগ্য। কেউ বলেছেন টানটান সংলাপের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক নাট্য ঘটনার সাবলীল মেলবন্ধন বারীন তাঁর নাটকে ঘটিয়েছেন। তাই আমরা বারীন চক্রবর্তীর মুখোমুখি হয়েছি শুধু যে তাঁকে উৎসাহ ও উদ্দীপিত করতে তাই নয়, নতুন কোনো নাট্যকার যখন নাট্যমঞ্চে উঠে আসেন, তাঁকে স্বাগত জানাতেও অনেকটা।

**আদিত্য সেন ঃ** আমরা জানি বারীনবাবু দিল্লির মধ্যে আপনি অন্যতম নাট্যকার যিনি শুধু হিন্দি নাটক লিখে সারা ভারতে তা দেখিয়ে বেরিয়েছেন। তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নাটক করানোর মধ্যে অসামান্য এক নাট্য-দূরদর্শিতা ও দায়বদ্ধতার পরিচয় বহন করছে। বাংলা নাটকের সম্পর্কে কিছু বলবার আগে আপনি আগে এইসব হিন্দি নাটকের কথা কিছু বলুন।

**বারীন চক্রবর্তী ঃ** আদিত্যবাবু, হিন্দি নাটক সম্পর্কে কিছু বলার আগে সংক্ষিপ্তভাবে আমার এবং আমাদের দলের অতীত সম্পর্কে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করছি। তাহলে হয়তো আমার এবং দলের ব্যাপারে আপনার কাছে প্রশ্নের উত্তরগুলি খোলসা হবে।

সত্তর দশকের শুরুতে পাড়ার পূজা মন্ডপের মঞ্চে 'বারোভূত', 'কার দোষ', গ্রহের ফের' নাটকে প্রথম অভিনয় করি। তখন অবশ্য স্কুলে এবং পুজো মন্ডপ ছাড়া অন্য কোনো বড় দলে অভিনয় করার সুযোগ পাইনি। ১৯৭৮ সাল নাগাদ পাড়ার দাদা মন্টু মুখার্জির হাত ধরে প্রথম বড় দলে অভিনয় করার সুযোগ পেলাম। দলের নাম 'শনিচক্র'। নাটক ছিল উৎপল দত্তের 'দু:স্বপ্নের নগরী'। পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় অমর হোড়। চরিত্রের নাম 'কিঙ্কর' (ফটোগ্রাফার)। প্রেক্ষাগৃহ ছিল দিল্লির এবং ভারতবর্ষের বহু পরিচিত 'আইফ্যাক্স হল'। তারপর থেকে আমাকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। উৎপল দত্তের 'সূর্যশিকার', 'অঙ্গার', 'তুরুপের তাস' থেকে শুরু করে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগরের নৌকা' এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন', 'রাজা', দেবাশীষ মজুমদারের 'অমিতাক্ষর' নাটকে তখন চুটিয়ে অভিনয় করছি। এছাড়া একেকটি নাটকে কতগুলো শো করেছি, কতগুলো নাটকে অভিনয় করেছি,

কি কি নাটক করেছি, কোন কোন দলে অভিনয় করেছি এবং নাটক নিয়ে দলগুলো উত্তর ভারতে কোথায় কোথায় গেছে তার ইতিহাস বলতে গেলে আপনার শোনার ধৈর্য থাকবে না। তবে উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে নাটকে অভিনয় করতে করতে বুঝতে পেরেছি, উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত হতে গেলে শুধু বাংলা নাটক করলে চলবে না, বিশেষ করে হিন্দি নাটক না করলে বেশি শো করা যাবে না এবং সেই সময়, অগ্নিগর্ভ সত্তর দশকে, মানে জরুরি অবস্থা চলাকালীন, অভিনয় করতে করতে প্রথিতযশা বাঙালি শিল্পীদের চোখে যে আগুন দেখেছিলাম এবং আইডিওলজি সম্পর্কে যতটা আশাবাদী হয়েছিলাম, আশির দশকের পর তা যেন দিন দিন ধোঁয়ায় পরিণত হতে থাকল।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে বুঝতে পারলাম, এবার শৌখিন থিয়েটার ছেড়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজ করতে হবে। উদ্দেশ্য শুধু একটাই, গণতান্ত্রিক দেশের রাজনৈতিক এবং আর্থ সামাজিক বৈষম্যগুলোকে নাটকের মাধ্যমে জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে। সেই চিন্তা মাথায় রেখে ১৯৯৮ সালে কয়েকজন হিতাকাঙ্খী বন্ধুবান্ধবদের সাথে আলোচনা করে 'প্রস্তুতি' নামে একটি দল তৈরি করলাম। উদ্দেশ্য হিন্দি নাটক করব। প্রথম হিন্দি ভাষায় নৃত্যনাট্যকে অবলম্বন করে চল্লিশ মিনিটের একটি নাটক লিখলাম। নাম দিলাম 'অপরাজিত'। কিন্তু আমার লেখা এই নাটকে অভিনয় করব কাদের নিয়ে? আমি এবং আমার স্ত্রী রাখী (মৌ) চক্রবর্তী সারাদিন বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে ছেলেমেয়ে জোগাড় করতে শুরু করলাম। কিন্তু সেরকম আশার আলো দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম, উত্তর ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করে অবাঙালিদের মধ্যে পারফর্মিং আর্ট, অথবা শিল্প সংস্কৃতিতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে অতটা আগ্রহ নেই। তাঁদের ধারণা ট্যালেন্ট না থাকলে পারফর্মিং আর্টের মধ্যে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। রোজগার হওয়ার আশা ক্ষীণ। অযথা সময় নষ্ট না করে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবলে কাজে দেবে।

এই প্রতিকূলতার মধ্যে আমার স্ত্রী মধ্যবিত্ত এলাকা ছেড়ে বস্তি এলাকায় ঢুকে গেলেন। কিছুদিনের মধ্যে ওই বস্তি এলাকা থেকে অতি দরিদ্র শ্রেণীর চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশজন ছেলেমেয়ে এসে আমাদের দলে যোগ দিল। দিল্লির বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে পুজোমণ্ডপে, লাগাতার দু-তিন বছর 'অপরাজিত' নাটক শো করার পর এবার আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। সুতরাং বলে রাখি, আজ এই 'আমি' হয়ে ওঠার পিছনে আমার স্ত্রীর অবদান অনস্বীকার্য।

সংক্ষেপে বলি, আমার স্ত্রী, গুরু 'শঙ্কু মহারাজ'- জীর কাছে লক্ষ্ণৌ ঘরানায় কথক শিখেন এবং নিজের একটি নাচের সংস্থা অছে। সেই সংস্থা থেকে যেসব ছাত্রী বেরিয়েছেন তাঁরা এখন দেশে বিদেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন।

**আ. সেঃ** প্রসেনিয়াম ও স্ট্রীট প্লে-র এই মঞ্চেই শুনেছিলাম আপনার আনাগোনা ছিল।

তার কারণ আপনার কোনো নাটক বা প্রযোজনা ব্যয়বহুল ছিল না, বিশেষ করে বড় স্টেজ নিয়ে কাজ করার আকাঙ্খা আপনার ছিল না। এর কারণ কি এটা যদি বুঝিয়ে বলেন।

**বা. চ. ঃ** পথনাটক আমি কখনোই করিনি। তবে সফদার হাশমির দলের রিহার্সাল চলাকালীন মাঝেমধ্যে আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম। মালাও হাশমির সঙ্গে নাটকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। আমি পথনাটকে কেন অংশগ্রহণ করছি না, তা দেখে সফদার আমাকে মাঝে মাঝে বকাঝকা দিত। মৃত্যুর আগের দিন দুপুরবেলা পার্লামেন্ট স্ট্রিটে শেষ দেখা। আমার হাতে তখন নতুন বছরের একটি ডায়রি ছিল। হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, 'তু ডায়রি লেকর ক্যায়া করেগা। পড়তা লিখতা তো হ্যায় নেহি! হামারে সাথ নাটক কর লে, বহুত কুছ শিখেগা!' সেদিন দুজনে চা খেতে খেতে নাটকে রাজনীতির ভূমিকা নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়েছিল। সেদিন কি আমি বুঝেছিলাম, আজ আমাদের শেষ দেখা? তার পরের ঘটনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে। আজও তাঁর সম্পর্কে জানার যাদের আগ্রহ, একমাত্র তাঁরাই আমার কাছে খোঁজ খবর নিতে আসেন।

আবার অন্যদিকে সফদার হাশমি এবং বাদল সরকারের নাটক দেখে বুঝেছিলাম, দলের ভিতরে এতগুলো ছেলেমেয়েকে নিয়ে অভিনয় করাতে হলে প্রযোজনার ক্ষেত্রে ব্যয়ভার কমাতে হবে। তার সাথে সাথে ব্যয়বহুল প্রসেনিয়াম মঞ্চ নিয়ে ভাবলে চলবে না। এমনকি ওপন বা ইন্টিমেট স্পেসে কোন সংস্থা নাটক করতে বললে নিজেদের সেইভাবে গড়ে তুলতে হবে। কারণ, নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে শ্রেণীগত ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। তবেই মানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে।

আ. সে.ঃ কোথায় কোথায় হিন্দি নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়েছে, কি তার বিষয়বস্তু এবং দর্শকরা কে, কী বলছেন। এই ব্যাপারে আপনাদের নাট্য সংস্থা 'প্রস্তুতি'র সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

বা. চ. ঃ আমার লেখা নাটকের বিষয়বস্তু, বর্তমান সমাজব্যবস্থা এবং নৈতিক চরিত্রের অধ:পতন। অবশ্যই তা রাজনৈতিক। ২০০৩ সালে আমার লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ হিন্দি নাটক 'ছোটু- The Story of a Ragpicker' (Non-verbal) প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ন্যাশনাল স্কুল অভ ড্রামা-র (NSD) 'অভিমঞ্চ' প্রেক্ষাগৃহে। দুদিনে পর পর চারটি শো হয়েছিল। এবং আমাদের নাটক দেখে আমার দলের নাট্যকর্মীদের নিয়ে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার উচ্চ-আধিকারিকেরা প্রেসমিটের ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর থেকে আমার দলকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। তবে মজার ব্যাপার হল, 'ছোটু- The Story of Ragpicker' সংলাপহীন নাটকটি লেখার পর কোথায় শো করব তা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিলাম। কারণ স্ক্রিপ্ট যেভাবে তৈরি করেছিলাম, দলের কোনো নাট্যকর্মীর কাছে সহজবোধ্য ছিল না, যতক্ষণ না আমি বুঝিয়ে বলছি।

একদিন মনে সাহস সঞ্চয় করে সেক্রেটারির অনুমতি না নিয়ে ন্যাশনাল স্কুল অব

ড্রামার ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে পড়লাম। ডিরেক্টর ছিলেন দেবেন্দ্ররাজ অঙ্কুর। উনি আমাকে দেখে হতবাক। অনুমতি ছাড়া ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকতে দেখে সেক্রেটারী ভার্গিজজী দৌড়ে আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়ে গেলেন। দেবেন্দ্ররাজ অঙ্কুর ইশারায় ওনাকে শান্ত করলেন এবং আমার আগমন সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বললাম- 'স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার প্রেক্ষাগৃহ অভিমঞ্চে আমার লেখা নাটক 'ছোটু- The Story of Ragpicker' মঞ্চস্থ করতে চাই।' ওঁকে দেখে বুঝতে পারলাম, আমার কথা শুনে তিনি কি বলবেন বা করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। বললেন, তুমি কোথায় দাড়িয়ে আছ জান? এটা একটা সরকারী প্রতিষ্ঠান। এখানে নিয়ম ছাড়া কোনো কাজ হয়না! দেখি, তোমার স্ক্রিপ্ট, কি লিখেছ? ' আমি বললাম, 'স্যার, আমার এই নাটকের কোনো স্ক্রিপ্ট নেই। চরিত্রগুলো কিভাবে অভিনয় করবে, সেই সম্পর্কে আপনাকে মৌখিক বর্ণনা করতে পারি! আসলে চারটি গান ছাড়া সম্পূর্ণ নাটকটাই নন-ভারবাল! সঙ্গীত নির্ভর!' উনি এই কথা শুনে অরো হতবাক! সব কিছু ভেবে কিছুক্ষণ পর উনি আমাকে চলে যেতে বললেন। আমি কয়েকবার অনুরোধ করার পর, তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না। মনের দুঃখে যখন আমি ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার বাইরে বড় রাস্তায় পড়ব, সেই সময় সেক্রেটারী ভার্গিজজী দৌড়ে এসে আমাকে আবার ডিরেক্টরের রুমে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। ডিরেক্টর হাসতে হাসতে বললেন, 'আগামীকাল তোমার লেখা নাটকের synopsis লিখে নিয়ে আসবে। যদি ভালো লাগে, তখন ভাবা যাবে এখানে করানো যায় কি না!' পরের দিন synopsis তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়ার পনেরো দিন পর তিনি আমাদের পর পর দুদিনে চারটি শো করার অনুমতি দিয়েছিলেন । রেমুনারেশন হিসেবে ষাট হাজার টাকা আমরা পেয়েছিলাম। তবে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামাতে নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর ভারতবর্ষের ফিল্ম এবং নাট্যজগতের প্রথিতযশা শিল্পীদের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছি এবং আমাদের দল 'প্রস্তুতি' সম্পর্কে এবং নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সারা ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের মাধ্যমে কৌতূহল সৃষ্টি করতে পেরেছি। এরপর ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা আমাদের দলকে আরো দুটো নাটকে আর্থিক সাহায্য করেছিল।

দিল্লি ছাড়া তারপর সেই নাটক গত বারো বছরে ভারতবর্ষের বিভিন্ন মেট্রোপলিটন শহরে (পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, রাজস্থান, হরিয়াণা, উত্তরপ্রদেশ বিহার) মোট ১৫৭টি শো হয়েছিল।

আ. সে.ঃ আগে যদিও বলেছেন, তবু জিজ্ঞাসা করি, দিল্লিতে কোনো নাট্যদলের সঙ্গো আপনি কি কখনও অভিনয় করেছেন, না প্রথম থেকেই নাট্যকার ও পরিচালকের আসনে বসে কাজ করেছেন?

বা.চ.ঃ দিল্লিতে আমি মোটামুটি চারটি দলের সাথে বেশ কয়েকটি যাত্রা ও নাটকে অভিনয় করেছি। পরিচালক হিসেবে অমর হোড় ছিলেন আমার গুরু। তাছাড়া সুবিমল ব্যানার্জী, রমণী সমজদার, বাদল ধর, শান্তনু রায়চৌধুরী এবং আরো কয়েকজনের কাছে দীর্ঘ কুড়ি

বছর ধরে বিভিন্ন নাটকে ও যাত্রায় অভিনয় করতে করতে এবং শিখতে শিখতে আমার Performing Art সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে যায়। অভিনয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে আমার কৌতূহল বাড়তে থাকে। যেমন, নাটকের বিষয়বস্তু, মঞ্চ স্থাপত্য, আলো, পোষাক, মেকআপ, যেগুলো ছাড়া নাটকের নান্দনিকতা বজায় রাখা যায় না। অবশ্য ওই উপকরণ ছাড়াও আমি চেষ্টা করি নাটক কিভাবে আরো সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করা যায়। অবশ্য নিজের দল তৈরি হওয়ার পর পরিচালক হিসেবে আমার প্রথম কাজ হল 'অপরাজিত'।

আ. সে.ঃ আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন চিরকাল হিন্দিতে নাটক লিখে বাংলায় নাটক লেখা আপনার দ্বারা সম্ভব হবে কি না সে বিষয়ে আপনার খুব সংশয় ছিল। কোভিড-এর কারণে বাংলা নাটকে হাত দেন এবং নাটক বেরুবার পরে বহু মানুষের উৎসাহ আপনাকে, উজ্জীবিত করে তোলে। বিশেষ করে আপনার মাতৃদেবী কমলা চক্রবর্তীর সর্বদা উৎসাহ আপনাকে চিরকাল অনুপ্রেরণা দিয়েছে। আপনার মায়ের কথা আমরা যেমন শুনতে আগ্রহী তেমনি অন্যান্য নাট্যকর্মী ও পরিচালকদের কথাও।

**বা. চ. ঃ** আমার মা কমলা চক্রবর্তী ছিলেন বামপন্থী মনোভাবাপন্ন। বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পড়াশুনা করতে ভালোবাসতেন। বাড়িতে কেউ মিষ্টি নিয়ে এলে বলতেন, 'মিষ্টি না এনে বই নিয়ে আসতে পারতেন।' আমিও যদি কখনও বাইরে যেতাম, ফেরার সময় মা আমাকে বই কিনে নিয়ে আসতে বলতেন।

আমাদের বাড়ির বেশ কিছু আত্মীয়স্বজন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর আমাদের বাড়ির অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময় বেশ কিছু বামপন্থী নেতা সেজকাকার সাথে আমাদের বাড়িতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিশ্বনাথ চৌধুরী, গীতা মুখার্জি, বিনয় চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ কোঙার এবং সুভাষ চক্রবর্তী। ওঁরা আমার মায়ের হাতের রান্না পর্যন্ত খেয়েছেন। বাড়িতে অভিভাবকদের রাজনৈতিক কর্মকান্ড দেখতে দেখতে আমি বড় হয়েছি। এইসব অভিজ্ঞতা হয়েছে, দিল্লি থেকে দেশের বাড়ি বর্ধমানে গরমের ছুটিতে যখন যেতাম। ১৯৯৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত আমি হিন্দিতে দশটি নাটক লিখতে পেরেছি। প্রত্যেকটি নাটক দিল্লি ছাড়াও ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে মঞ্চস্থ হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে অর্থাৎ প্যানডেমিকের সময় আমি বাংলা নাটক লেখার চেষ্টা করতে থাকি। বলতে দ্বিধা নেই, সাবলীলভাবে বাংলা ভাষায় নাটক লেখা আমার কাছে ভীষণ কঠিন কাজ বলে মনে হয়েছিল। পড়াশুনা করেছি হিন্দি এবং ইংরেজিতে। সুতরাং বাংলা ভাষায় লেখালেখি করা যতটুকু শিখেছি সব মা বাবার কাছে। মা এবং স্ত্রীর অনুপ্রেরণা ছিল বলেই হয়তো সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া হিন্দি নাটক লেখা এবং মঞ্চস্থ করার সময় কয়েকজন প্রথিতযশা ব্যক্তি আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং প্রতি মুহূর্তে আমি কি করছি, সেই ব্যাপারে খোঁজখবর দিনতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, আলোর রাজা তাপস সেন, দিল্লির বেঙ্গাল

এসোসিয়েশনের তদানীন্তন সম্পাদক অমরেশ গাঙ্গুলী এব আমার জীবনের সর্বপ্রথম মহান পরিচালক অমর হোড়। এখানে বলা প্রয়োজন, আমার লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ হিন্দি নাটকের 'ছোটু - The Story of a Ragpicker' লাইটের স্কিমিং করেছিলেন আলোর রাজা তাপস সেন। কারণ তাপসদার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে এবং কাজের ব্যাপারে আমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল।

বাংলা নাটকে অভিনয় করার সময় যাঁরা আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মায়া হোড়, উমা বিট, উৎপল চ্যাটার্জি, বাবলু গোস্বামী, সুশীল পোদ্দার, অলক চ্যাটার্জির নাম আমার চিরদিন মনে থাকবে। কারণ তাঁরা অভিনয়ের খুঁটিনাটি আমাকে অবসর সময়ে বোঝাতেন।

**আ.সে. ঃ** আপনার নাটক - 'বুকের ভেতর বৃষ্টি ভেজা আকাশ' ও 'অনুচ্চারিত'নাটকটি ব্যতিক্রমী নাটক বলে হয়েছে কারণ গভীর অরণ্যে এসে থাকা এবং গাছগাছারা কেটে ফেলা ও বিশ্ব উন্নায়নের ফলে সারা পৃথিবীতে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে— এই বৈজ্ঞানিক ও গুরুতর বিষয় বলে নাটক লেখার পেছনের ইতিহাসটা জানতে চাই, যদি বলেন।

**বা.চ. ঃ** ২০২০ সালে বাংলা ভাষায় আমার প্রথম নাট্যসংকলন (বনলতার গল্পকথা ও অন্যান্য নাটক ) বেরিয়েছিল। দ্বিতীয় নাট্যসংকলন (বুকের ভিতর বৃষ্টি ভেজা আকাশ ও একগুচ্ছ ছোটবড় নাটক) বেরিয়েছিল ২০২১ সালে। দুটি নাট্যসংকলনের সঙ্গে একগুচ্ছ অণুনাটক যোগ করা হয়েছিল। ২০২০ সালের পুজোর সময় প্রথম নাট্যসংকলনটি মা উন্মোচন করেছিলেন। তারপর নভেম্বর থেকে মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওই সময় দ্বিতীয় সংকলন ছাপানোর কাজ চলছে। মা নার্সিং হোমের কেবিনে শুয়ে প্রত্যেকটি নাটক মন দিয়ে পড়েছেন এবং প্রুফ রিডিং করেছেন। দ্বিতীয় নাট্যসংকলনটি উন্মোচন করার সময় পেলেন না। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের সাত তারিখে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। জুলাই মাসে রথযাত্রার দিন মায়ের প্রিয় বন্ধু এসে বইটি উন্মোচন করেছিলেন।

সংকলন দুটি পাঠকদের গ্রহণযোগ্যতা দেখে আমার এক পরিচিত দাদা (নলীনাক্ষ ভট্টাচার্য) তিনটি নাটক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এতে শুধু যে ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার ডিরেক্টরের আমার নাটক সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে তাই নয়, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ জাগাবার একটা সম্ভাবনা থাকবে। তাছাড়া আমি আমার লেখায় শুধুমাত্র বাঙালিদের টানাপোড়েনের চালচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করিনি। নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মানুষের আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনার জ্বলন্ত সমস্যাগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছি, যে বিষয়বস্তু নিয়ে সচরাচর নাটকে লেখার সময় খুব একটা তুলে ধরা যায় না। তবে সবচেয়ে আক্ষেপের কথা হল, আমার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, ভারতবর্ষের নাট্যকর্মীরা মঞ্চে অভিনয় করার জন্য যতটা আগ্রহ প্রকাশ করেন, নাটকের বই বা সংকলন কিনে পড়ার ক্ষেত্রে ততটা যেন আগ্রহ নেই। কারণ ওইসব নাট্যকর্মীরা ভাবেন,

পরিচালক নাটক নির্বাচন করবেন, সেই নাটকে আমরা শুধু অভিনয় করব। পয়সা খরচ করে নাটকের সংকলন কিনব না। শুধু নাটকের বই কেন, এমনকি ভারবর্ষের এবং বিদেশের মহান নাট্যবক্তিত্বদের লেখা নাট্যসংক্রান্ত বিষয়ে বই পড়ার মতো মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। এমনকি দিল্লির বাঙালি নাট্যকর্মীদের মধ্যে সেই মানসিকতা লক্ষ্য করা গেছে। দিল্লির কথা এইজন্য বললাম, একজন নাট্যকর্মী হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে যাঁদের সঙ্গে পরিচয় তাঁরা হয়তো আমাকে 'ঘরকা মুরকী ডাল বরাবর' ভেবেই নাট্যসংকলন দুটি সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাননি। অতি পরিচিত বয়োজ্যেষ্ঠরা ছাড়াও আজকের প্রজন্ম পর্যন্ত, অর্থাৎ যারা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন। হতে পারে তাঁরা অরো বেশি মননশীল বলেই স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে কুণ্ঠাবোধ করছেন। তবে যে কথাটা বলা প্রয়োজন, দিল্লি পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের যাঁরা আমার প্রথম সংকলনটি নিয়েছিলেন, তারাই দ্বিতীয় সংকলনটির গ্রাহক হয়েছেন। বিদেশে (ইউ এস এ, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া) কিছু বাঙালি গ্রাহক আগ্রহ দেখিয়েছেন। মোটামুটিভাবে আমার লেখাদুটি সংকলনের গ্রাহক সংখ্যা দেখে আমি ভীষণ আশান্বিত। এই বছর পুজোর সময় আরেকটি নাট্য সংকলন আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারব আশা করি।

**আ. সে. ঃ** আপনি হিন্দি নাটক লিখে ও পরিচালনা করে এবং ভারতের নানা জায়গায় সেইসব নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ পেয়েছেন। তবে বাংলায় নাটক লিখতে গেলেন কেন? বাংলা নাটক লিখে কি বেশি পরিতৃপ্তি পাচ্ছেন- এই দুই ভাষার মধ্যে যে ব্যবধান সে সম্পর্কে আপনি কি ওয়াকিবহাল ছিলেন? বাংলা নাট্যকর্মী ও দর্শকদের প্রশংসা পেয়ে আপনি কি অন্য এক ধরনের আত্মতৃপ্তি পাচ্ছেন — সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।

**বা. চ ঃ** দুটি ভাষায় নাটক লেখার ব্যাপারে কোনো ব্যবধান অছে কিনা আমি জানি না। তবে বাংলা নাটক লিখে আমি খুব পরিতৃপ্তি পেয়েছি। স্মরণ করতে ভালো লাগছে বাংলা নাটক লেখার ব্যাপারে মা-ই আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আগেই বলেছি ২০২০ সালে মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আমাকে দেখলেই জিজ্ঞেস করতেন, নাটক লেখা হয়ে গেলে আমাকে দেখাস। কখনও হাসপাতালের কেবিনে মায়ের পাশে বসে লেখালেখি করতাম। লেখা শেষ হয়ে গেলে পড়ে শুনিয়েছি। নানা পরিচালক ও নাট্যকর্মীর প্রশংসা পেয়ে আমি বাংলা নাটক লিখতে উদ্দীপিত হয়েছি। ভাবছি দেখাই যাক না কোনখানে গিয়ে দাঁড়াই। আমার নাট্যপ্রচেস্টা সম্পর্কে আপনার আগ্রহ দেখে আমি উচ্ছ্বসিত। আপনাকে ও ত্রিপুরা থিয়েটার - এর সম্পাদককে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

---

লেখক ঃ **আদিত্য সেন**। দিল্লীর বিশিস্ট সাহিত্য পত্রিকা উন্মুক্ত উচ্ছাসের সম্পাদক।

# টিনের তলোয়ার: নিপীড়িত মানুষের গান

রমা দাস

বাংলা নাট্য জগতের একজন শক্তিশালী নাট্য ব্যক্তিত্ব উৎপল দত্ত। তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি নাটক লিখেছেন। বিশ্বনাট্যবোধ ও দেশি-বিদেশি থিয়েটারী অভিজ্ঞতা নিয়ে উৎপল দত্ত নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকের মূলে রয়েছে গভীর ইতিহাসবোধ ও রাজনৈতিক চেতনা। তিনি শতাধিক নাটক, যাত্রা, পথনাটক রচনা ও প্রয়োজনা করেছেন। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত। তিনি আজীবন এমন এক থিয়েটারের জন্য সাধনা করে গেছেন, যেখানে পুরনো ঐতিহ্যের ইতিবাচক শক্তির ওপর নির্ভর করে অনায়াসেই দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। এক প্রকার সর্বহারা বৈপ্লবিক সমাজ বৈপ্লবিক থিয়েটারের স্বার্থেই তিনি নাটক রচনা করেছেন। তিনি একজন রাজনৈতিক কর্মী ও শিল্পী হিসেবে বলতেন, " আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোনও আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগান্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়" [১] উৎপল দত্তের একটি শ্রেষ্ঠ নাটক 'টিনের তলোয়ার' (১৯৭১)। নাটকটি পিপল্‌স্ লিটল থিয়েটার থেকে প্রথম অভিনীত হয় (রবীন্দ্রসদন, ১২ই আগষ্ট, ১৯৭১ সালে)। 'টিনের তলোয়ার' নাটকের ভূমিকাংশে তিনি নিজেই বলেছেন "বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবার্ষিকীতে প্রণাম করি সেই আশ্চর্য মানুষগুলিকে - যাঁহারা কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের কোনো নিয়ম মানেন নাই, সমাজও যাহাদের দিয়াছিল অপমান ও লাঞ্ছনা। যাঁহারা মুৎসুদ্দিদের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকিয়াও ধনীর মুখোশ টানিয়া খুলিয়া দিতে ছাড়েন নাই। "[২] এই নাটকের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণই এই আলোচনার মূল বিষয়।

১

নাটকের প্রথমেই মেথরের প্রসঙ্গ এনে নাট্যকার একেবারে সমাজের নিচু তলায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। একটি অন্যতম চরিত্র মেথর। যার নির্দিষ্ট কোনো নাম নেই। সমাজে যে বা যারা মেথর বলেই বিবেচিত অথবা অবহেলিত, শোষিত, বঞ্চিত। নাটকের প্রথম ও চতুর্থ পর্বে মেথরের প্রসঙ্গ এসেছে। নাটকটির মোট সাতটি পর্ব । প্রথম পর্বে নটবর ও মদ্যপ বেণীমাধব ওরফে ক্যাপ্টেনবাবুর 'ময়ূরবাহন' নাটকের পোস্টার সাঁটার দৃশ্য দিয়ে নাটক শুরু। বেণীমাধব ও মেথরের সংলাপে নাটক আরম্ভ। নাটকের প্রথম বর্ণনা শুরুই হচ্ছে এভাবে, "বেণীর পায়ের কাছেই ম্যানহোল থেকে মাথা বার করে বালতি ভর্তি ময়লা তুলছে একজন মেথর।" [৩] অসাবধানতায় এক বালতি ময়লা মেথর ব্রাহ্মণ বেণীর প্রায় পায়ে ঢেলে দেয়। মেথর অশিক্ষিত শোষিত বাঙালি। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। যার অবস্থান

কলকাতার নিচু তলায়। নাটকে তাঁর সংলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বেণী বামুন জেনে তার মুখে প্রতিবাদের সুর লাগে। মেথর বলে, "কলকাতার গরীবদের বিষ্ঠা বাবুর গায়ে দিলাম।"[৪] আবার নাটক দেখার কথা উঠলে মেথর বলে, আমি মেথর বলে, " আমি কলকাতার তলায় থাকি।"[৫] বামুন ও বাবুদের কটাক্ষ করেও সে বলে "বামুন ও বাবু দুই ভাঙা মঙ্গলচণ্ডী।"[৬] মেথর সুযোগ পেয়ে বেণীর পায়ে গরীবদের বিষ্ঠা ঢেলে প্রতিশোধ নিতে চায়। মেথর চরিত্রটি নাটকের একেবারে শুরুতে স্থান দিয়ে লেখক যেন সামাজিক অমর্যাদায় অপমানিত সর্বহারা সমস্ত মানুষদের হয়ে কলম ধরেছেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি অবজ্ঞা, লাঞ্ছনা ও অপমানের দৃশ্য অঙ্কন করে তাদের মুখে প্রতিবাদের অস্ত্র বসিয়েছেন।

উনিশ শতকের রঙ্গামঞ্চে সেদিন যে ধরনের নাটক অভিনয় হত সবটাই বীরকৃষ্ণ দাঁর মতো অসৎ ইংরেজপ্রিয় মুৎসুদ্দিরা ঠিক করতেন। নাটক, রঙ্গামঞ্চ, অভিনেতা, অভিনেত্রী নাট্য নির্দেশক সবটাই ছিল তাদের অধীন। এককথায় তারা নাটককে তাদের বিনোদনের বিষয় ভাবতেন। ফলে 'ময়ূরবাহন' নাটকে রাজারাজরার কাহিনিবেষ্টিত নাটকের কিছুই বোঝে না মেথর কিংবা বুঝতেও চায় না। তাই মেথর বলে' ধেত্তেরি যুবরাজ! মুখে রং মেখে চক্রবেড় ধূতি পরে লাল-নীল জোড়া আর ছত্রি পরে রাজা উজির সাজো কেন? ... যা আছো তাই সাজো না ! ... কই যুবরাজ ছেড়ে আমাকে লিয়ে লাটক ফাঁদতে পারবে? হে চাটুজ্যে বামুনের জাত যাবে তাতে।"[৭]

গ্রেট বেঙ্গল অপেরার প্রধান অভিনেত্রী ময়না। এই দলে যোগ দেওয়ার আগে ময়না কলকাতায় সবজি বিক্রি করত। বিভিন্ন সময় বাংলার গ্রামে গ্রামে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ হয়। তাই কাতারে কাতারে মানুষ শহরে উঠে আসে পেটের দায়ে। আশ্রয় খোঁজে শহর কলকাতায়। ময়নাও গরিব চাষার মেয়ে ছিল। সেও পেটের দায়ে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল বাঁচার তাগিদে। দুবেলা দুমুটো ভাতের জন্য বদ্দিবাটির আলু, হাসনানের বেগুন, বেঁচে তার পেট চলত। তাতেও জীবন চলত না। সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ হলে ময়না কলকাতা ছাড়ার কথা ভাবে। ময়নার মুখের গান থেকে তা বোঝা যায়। একদিকে নিদারুণ অভাব অন্যদিকে গরিব হওয়ার দরুন বাবুদের বাড়ি ঘরের মেয়েদের থেকে পাওয়া চরম অপমান সব মিলিয়ে কীভাবে একেবারে নিচু তলার মানুষগুলির জীবনকান্নার দলিল হয়ে ওঠে টিনের তলোয়ার তা ময়নার মুখের গান শুনলেই বোঝা যায়।

" আলু নিয়ে যাই বাড়ি বাড়ি
ছুঁড়ি ধাড়ি বেরিয়ে বলে এই ঝাঁটা বাড়ি" [৮]

নাটকে গানগুলি উল্লেখযোগ্য। ময়নার একাকী, নিঃসঙ্গ খেটে খাওয়ার জীবন আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায় যখন ময়নার গানসূত্রে জানা যায় বাবুদের বাড়ির

গিন্নীদের অবস্থান্তর হওয়ার সংবাদ,

"গিন্নীরা সব গাউন পরে ছেড়েছে শাড়ি।
তখন গিন্নীরা সব যেতেন থিয়েটার
হাতে পায়ে আলতা দিয়ে হত কি বাহার
এখন মেম হয়ে আর দেখে না বাংলা থিয়েটার।"[৯]

পেটের দায়ে ময়না বেণীর থিয়েটারে যোগদান করার পর বাবুদের আদরের বুলবুলি হয়ে উঠে এবং প্রহসনে পরিণত হয় প্রিয়নাথ ও মেথরের সঙ্গে বাক্যালাপ থেকে তা বোঝা যায়। মেথর তাকে বলে "তুমি তো মুচির কুকুরের মতন ফুলে উঠেছ দেখছি।"[১০] আবার ' নুনচুপড়ি বেদেবুড়ি"[১১] বলে। সমাজে দারিদ্র যে কত বড় অভিশাপ ময়না তা ভালো করেই বোঝে। দরিদ্র মানেই না খেতে পাওয়া, অপমান, অবজ্ঞা। তাই সেইজন্য ময়না সকল দরিদ্র, অভাবী মানুষের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়। ময়নার এই আচরণ থেকে নাট্যকার সমাজের ধনী-দরিদ্র বিভাজনের কাঠিন্যকেই তুলে ধরেছেন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের প্রতি অবহেলা, লাঞ্ছনা, ঘৃণা কতটা তীব্র ময়না তা নিজেই প্রত্যক্ষ করে।

নাটকে ময়নার একটা উঠা-পরা আছে। এতদিন ময়না পেটের দায়ে শহর কলকাতায় স্বাধীনভাবে আলু পটল বেঁচেছে। তার একটা স্বাধীন পরিচয় ছিল। ময়না অশিক্ষিত, সুন্দরী যুবতী। সে ভেবেছিল, 'থেটার মানে ভেবেছিলেন অং মাখ্‌বো, সুন্দর সাজবো, একটু হাঁটবো ফিরবো।"[১২] থিয়েটারে যোগ দেওয়ার পর ময়নার পরিচয় বদলে যায়। ময়না থেকে শিক্ষিতা, ভদ্রঘরের শঙ্করী হয়। থিয়েটার রক্ষা করতে বীরকৃষ্ণ দাঁর কাছে ময়নাকে বিক্রি করে বেণী। ময়নার মুখে শোনা যায়, " (চেঁচিয়ে) যখন রাস্তায় আলু বেচতাম, তখন কারুর সাহস হয়নি আমাকে জিগ্যেস পর্যন্ত না করে আমাকে দোকানের পসরা করে দেবে। কারুর সাহস হয়নি... সাহস হয়নি পুতুলের মতন আমায় হাটে নিয়ে গিয়ে এমন বেচাকেনা করবে।"

নাটকে কুষ্ঠগ্রস্ত সমাজের আসল চেহারা প্রতিফলিত। বীরকৃষ্ণ দাঁর প্রিয় রক্ষিতা হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ময়নার স্ট্যাটাস বদলে যায়। যে বাচস্পতি ময়নাকে 'মাগী' বলে গাল দেয়, সেই আবার বীরকৃষ্ণ দাঁর রক্ষিতা ময়নাকে 'মা ঠাকুরানী' বলে সম্মান করে। ময়নার ভাষায়, "দেখলে মা, তোমাদের মেয়ের ক্ষ্যামতাটা, দেখলে? এই বামুন একদিন লোক নিয়ে ঠেঙাতে এয়েছিল এখন ঠাকুরানী বলছো।"[১৪] বীরকৃষ্ণ দাঁর কেনা রক্ষিতা হলেও তার বাইরের সাজ পোশাকের বাহার দেখে পালকি-বেহারাও বলে "হুম্ হুম্ - ও মাঠাকরুন সরি যিয়, সরি যিয়"[১৫] পথের ভিক্ষুক সেও ময়নাকে বলে, "রাণীমা, পাই পয়সা ফেলে দিন মা, পরিবারসুদ্ধ না খেয়ে মরি। আকালে চব্বিশ -পরগণা শ্মশান হয়ে গেল মা!"[১৬] ময়না যখন গরীব চাষার মেয়ে হয়ে শহরে বাড়ি বাড়ি আলু পটল বিক্রি করত তখন ভদ্র বাড়ির গিন্নীরা সব ঝাঁটার

বাড়ি দেখিয়ে ময়নাকে অপমান করেছে। তার অন্তর্ভেদী যন্ত্রণার ছবি ময়নার গাওয়া গানে আমরা প্রত্যক্ষ করি। তাই ময়নার অবস্থান্তর হলে সে দরিদ্রকে ভয় করে, ঘৃণা করে। ময়না বলে, "দারিদ্রকে আমি ঘৃণা করি। সোপান পেয়ে ধীরে ধঙ্গিরে উঠেছি এখানে, গায়ে উঠেছে গয়না, পায়ের কাছে হাতজোড় করে ধন্না দিয়ে পড়ে আছে কলকেতার বড়লোকের দল। আবার ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে গেরস্ত ঘরে ঝি-গিরি আমি করতে পারবো না।"[১৭] ময়নার এইরূপ উক্তি ময়না চরিত্রের স্থলন নয় বরং আমাদেরই অধ:পতিত সমাজের আসল চেহারা। সে আরো বলে, "আমি কলকেতাকে পেয়েছি হাতের মুঠোয়। আমি ঐ বাবুদের পেয়েছি পায়ের তলায়। আর অভিনয় করে আমি কখনো হয়েছি রাজকুমারী, কখনো নবীনা তপস্বিনী, কখনো বা রুদ্ররোষ সম্রাজী রিজিয়া। সেসব আমি ছাড়ব না। "[১৮] ময়নার এই লড়াই তার অস্তিত্বের লড়াই। উনিশ শতকের থিয়েটারের প্রেক্ষাপটে লেখা এই নাটক বিশ শতকের জটিল জীবন যন্ত্রণার ছবি হয়ে উঠেছে এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। ময়নার জীবনচিত্র তুলে ধরে লেখক বঙ্গ সমাজের কুষ্ঠগ্রস্ত ও ঘুণধরা প্রবৃত্তিকেই স্পষ্ট সরল ভাষায় অঙ্কন করেছেন। বীরকৃষ্মের রক্ষিতা হয়ে থাকলেও ময়না কিন্তু একেবারে জীবনের পাঁকে ডুবে যায় না, সে বীরকৃষ্ণের হাতে মার খায়। বীরকৃষ্ণ ময়নার শরীর পেলেও মন পায় না। ময়না বসুন্ধরা কে যখন বলে "ঐ শয়তান বীরকেস্ট তোমাদের মেয়েকে মারে, জানো? প্রিয়নাথের নাম করলেই মারে! তাই আমি চব্বিশ ঘন্টা প্রিয়নাথবাবুর নাম করি।"[১৯] ময়না সাহসী তাই বীরকৃষ্ণের মুখের উপর প্রিয়নাথের নাম করতে পারে।

৩

বসুন্ধরাও অসহায়। সমাজের কাছে ঘৃণ্যনীয় । সে বারে বারে অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়েছে। চিৎপুরের বেঙ্গাল অপেরার ঘরে পাওনাদার মুদিওয়ালা প্রবেশ করেই বসুন্ধরাকে অপমান করে, "(বসুন্ধরাকে দেখে) এই যে মাগী, বাজারের বেশ্যা, তুমি কি চাও আমি থানাদার ডাকি?"[২০] সে বসুন্ধরার পরিচয় দিয়ে বলে, "ওর নাম আঙুর। ও কসবী"[২১] বসুন্ধরা মুখ বুজে সব সহ্য করেছে। সময় মতো সেও প্রতিবাদ করেছে। ময়নার বদলে বীরকৃষ্ণ দাঁর কবল থেকে বেঙ্গাল অপেরা মুক্ত হলে বসুন্ধরাই বীরকৃষ্ণ দাঁকে স্মরণ করিয়েছে নিজ কর্তব্য, "আমাদের জামাইবাবুর স্বভাবটা রয়ে গেছে নবাবের মতন, বুঝলেন কাপ্তেনবাবু? কয়লা না ছাড়ে ময়লা। আমাদের পেয়েছেন নীলকরের প্রজা। মুলোর ক্ষেত। যখন ইচ্ছে এসে মূলো খেয়ে যান। এ দলটাকে যে লিখে পড়ে দিয়ে গেলেন কাপ্তেনবাবুকে সেটা ভুলে গেছেন? আমরা কোন পালা গাইব না গাইব সো যে আর বাবুর হাতে নেই, এটা বাবু ভুলে যাচ্ছেন?[২২]

ময়না ও বসুন্ধরা চরিত্র দুটি তুলনা করলে আমরা দেখব দুজনই অভাবী। পেটের দায়ে থিয়েটারের সঙ্গো যুক্ত হয়েছে। দুজনই সমাজের নিচু তলার মানুষ। উভয়ের জীবনের

একটি পূর্ব পরিচয় আছে। ময়না গরীব চাষার মেয়ে । আকালের সময় কলকাতায় এসে বাড়ি বাড়ি সবজি বেচে। তারপরও তার পেট চালানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে কলকাতা ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবে। (ছেড়ে কলকেতা বোন - হবো পগার পার)। ময়না তার সতীত্ব বজায় রেখে পরিশ্রম করে পেট চালাতে হয়েছে। অন্যদিকে বসুন্ধরার জীবনচিত্র ভিন্ন আরো করুণ। বসুন্ধরা নিজের পরিচয়ে জানিয়েছে, "পনেরো বছর বয়সে এক রাজা বাহাদুর, আর নাম বলবো না, আমাকে চুরি করে নিয়ে যান। তাঁর শখ মিটে গেল শিগগিরই। তারপর দেহ বেচে পেট চালিয়েছি বহু বছর। আর একাকিত্বের একটা দিগ্বিদিকহীন প্রান্তরে ঘুরে বেরিয়েছি নিরাপত্তা আর আশ্রয়ের খোঁজে।"[২৩] বসুন্ধরার স্বপ্ন ছিল আর পাঁচটা মেয়ের মতোই। একটা আশ্রয়, একটা নিরাপত্তার সন্ধানে বসুন্ধরা ঘুরে বেড়িয়েছে। শরীর বিক্রি করে কিছুদিন পেট চালিয়েছে। অবশেষে থিয়েটার যুক্ত হয়েছে। এখানেও বাচস্পতি, পাওনাদার প্রমুখরা প্রতিনিয়ত অপমান করেছে। তবু রাতের পর রাত জেগে পালা, অভিনয়, থিয়েটার, দলের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে বসুন্ধরা। বেণীর একাকীত্বের সঙ্গী হয়েছে। দলের প্রত্যেক জনের যত্ন নিয়েছে। মায়ের মতো সেবা দিয়েছে। তবু এই জীবনেই বসুন্ধরা স্বপ্নও দেখেছে। যা নিজে পায় নি ময়না ও প্রিয়নাথের মধ্য দিয়ে পেতে চেয়েছে। উভয়কে মিলিয়ে দিয়ে নিজে নারীর সংসার-সুখ পেতে চলেছে। ময়নাকে মেয়ের মতো ভালোবেসেছে। ময়নাও বসুন্ধরাকে 'মা' বলে ডেকেছে। ময়নাকে বলেছে, "ঘর বাঁধো ময়না। আমি ঘর বাঁধতে পারিনি। ...তুমি আমার সেই অসম্পূর্ণ স্বপ্ন, ময়না, তোমার সংসার হোক, কোলে রাঙা ছেলে আসুক, তোমার মধ্যে আমি পূর্ণ হই।"[২৪] ময়নার প্রতি বসুন্ধরার এইরূপ উক্তি অত্যন্ত যন্ত্রণার। আমাদের সমাজ কীভাবে নিরন্ন, গরীব মেয়েদের সুযোগ নিয়ে তাদের জীবন নষ্ট করে তার দৃষ্টান্ত বসুন্ধরা। বসুন্ধরা অভিনয় ভালোবাসে। কিন্তু অভিনয়ের থেকেও বড় দায় পেট চালানো। তাই বেণীকে তার উপায়হীনতার কথা জানায়, "না খেয়ে পথে পথে ঘোরার সাহস নেই।"[২৫]

৪

বেণীমাধব চাটুয্যে ওরফে কাপ্তেনবাবু ব্রাহ্মণ। তবে তার জাত থিয়েটারওয়ালা। মেথরকে সে নিজেই তার পরিচয় দিয়ে বলেছে " আমার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা, অভিনয় বেঁচে খাই।"[২৬] পেটের জন্যই তার লড়াই। থিয়েটারে আসার আগে প্রতিটি চরিত্রের একটা পূর্ব পরিচয় আছে। অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকে নিরন্ন, অভাবী, পেটের দায়ে গায়ে গতরে খেটে খাওয়ার দৃশ্য নাটকে স্পস্ট। কেউ সখ করে থিয়েটার করে না। প্রথমত বাঁচার জন্য অভিনয়ের পথ বেছে নেয়। পরে প্রত্যেকেই নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তি খোঁজে। সামাজিক পরিচয় পেতে চায়। টিনের তলোয়ার হাতে নিয়ে সমাজের সমস্ত দ্বিচারিতা, অত্যাচার, অপরাধ, হিংসা, অমানবিকতার প্রতিশোধ নিতে চায়। বেণীও একজন থিয়েটারওয়ালা হয়ে অশিক্ষিত মেথরকে মদ্যপাবস্থায় নিজের পূর্ব জীবনের বিলাপ গায়, "হ্যাঁ বাবুভেয়েরা অমনি।

আমি আগে যাত্রায় গাইতাম, বুঝলেন? তা শ্যমবাজারের চক্কোত্তিবাবুদের বাড়ি বিদ্যাসুন্দর পালা হচ্ছিল। মেজোবাবু পাঁচ ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেছেন। ... বছর ষোলো বয়সের দুটো ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খ্যামটা নাচছে আর ওদিকে বাবুদের হাতে রূপোর গেলাসে ব্রান্ডি চলছে, বাড়ির শালগ্রাম ঠাকুর পর্যন্ত নেশায় চুরচুরে। ... মালিনী কাঁদতে কাঁদতে আসর সরগরম করে তুললো, বাবুর চমকা ভেঙে গেল, দেখলেন কোটাল মালিনীকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এতে বাবু বড় রাগত হলেন। কোন ব্যাটার সাধ্যি আমার কাছ থেকে মালিনীকে নিয়ে যায়- এই বলে রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। "বাপ" বলে কোটাল বসে পড়ল, আসর ভেঙে গেল। আমি সেজেছিলাম কোটাল। এই এইখনে লেগেছিল গেলাসটা।"[২৭] বেণীর পেটের দায়ে সখী সেজে বাবুদের বাড়িতে যাত্রা করার দৃশ্য অতি মর্মান্তিক। মেথর ও বেণী কোথাও যেন এক ফ্রেমে বাঁধা। উভয়ই সমাজের উপরওয়ালাদের দ্বারা শোষিত, অত্যাচারিত, অবহেলিত। নাটকে উভয়েই সর্বহারা, খেটে খাওয়া, সাধারণ মানুষ। বেঙ্গাল অপেরার কাপ্তেনবাবু হয়েও সে নিরূপায়। বীরকৃষ্ণ হঠাৎ থিয়েটারী ব্যবসা ছাড়ার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বেণী বিষম খেয়ে বলে, "ছেড়ে দেবেন? থিয়েটার? এই মরেছে। আমি.. মানে আমরা ... কোথায় যাবো? এক কাজ করলে হয়না? অতগুলো মেয়েছেলে রেখে কি হবে বাবু?... এক একটা মেয়েছেলের পেছনে যা ঢালেন তাতে দশটা থিয়েটার প্রতিপালিত হতে পারে, বাবু। আমাদের ব্যবসা রম রম করে চলছে। গত তিন মাসে আটত্রিশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছি আপনাকে। ... এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? আমাদের পুতুলনাচ করিয়ে টাকা তুলে নিয়েছেন। এখন গাছতলায় বসিয়ে দিলেন"[২৮] এ যেন অসহায়, অভাবী নাট্য অভিনেতার বিলাপ।

বেঙ্গাল অপেরার কর্ণধার বেণীমাধব একজন শিল্পী মাত্র। দলের অভিনয় মাত্র দেখেন। দলটিকে চালানোর মতো অর্থ অথবা স্থান কোনোটাই তার নেই। বেণী ও তার দল বীরকৃষ্ণের মতো মুৎসুদ্দির কাছে বাঁধা। তাই সে বলে, " আসলে আমি বড় একা। কেউই কখনো পাশে নেই। দেবতার মতন একা। অভিশাপের মতন, অবজ্ঞার মতন একা। "[২৯] এখানেই বেণীর শিল্পীসত্তা অন্য এক মাত্রা লাভ করে।

৫

প্রিয়নাথ মল্লিকও পেটের জন্য সিঁদুরেপট্টির ঘোড়ার আস্তাবালে কাজ নেয়। প্রিয়নাথ শিক্ষিত যুবক। হিন্দু কলেজের ছাত্র। দেশপ্রেমিক। প্রিয়নাথ নিজের পরিচয় দিয়ে বলে , আমি বিয়ে করিনি। বাপ মা আমায় দেখতে পারে না। বাপ বলে গদিতে বসে বসে ওর লোহার ব্যবসা দেখতে হবে। "[৩০] প্রিয়নাথ ধনী ঘরের ছেলে হলেও সে সাধারণ " আমি বাবু নই। এই পোশাকগুলো রয়ে গেছে, ছাড়তে পারছি না। কিন্তু পকেট শূন্যি। আমার বাপ মদ খায়, চারটে মেয়েমানুষ পোষে আর মাকে মারে-"[৩১] প্রিয়নাথ ইংরেজদের মুখোশ খুলে

দিতে নাটক লেখে। বাবার সুখ -ঐশ্বর্য ছেড়ে সর্বহারা নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়াতে চায়। ময়নাকে নিয়ে ঘর করতে চায়। বীরকৃষ্ণ দাঁর হাত থেকে ময়নাকে রক্ষা করতে চায় "চলো ময়না, আমরা চলে যাই! (ছায়ার মতন দুদূরে দাঁড়িয়ে) একটা অশিক্ষিত রুচহীন ব্যাধিগ্রস্ত মুৎসুদ্দির শয্যায় গেলে কোথায় থাকবে তোমার স্বাধীনতা? ... ময়না, চলো যাই, বেড়াতে যাই।"[৩২]

৬

নামহীন একটি চরিত্র। চব্বিশ পরগণার কৃত্রিম আকালের সময় শহর কলকাতার প্রচন্ড দাঙ্গায় যুবকের কপাল থেকে রক্ত ঝরে। তার মুখে ধ্বনিত হয় নিপীড়িত মানুষের হাহাকার, "ইন্দ্র সাহার চালের আড়ৎ ঐ দিকে । সে চাল যাচ্ছিল জাহাজঘাটায়। আর ঐ কপালপোড়া ভিখিরির দল সে চালে খাবলা মারতে গেছে! আর ল্যাম্বো সাহেব এসে বেধড়ক বগি-হুইপ চালাচ্ছে।"[৩৩]

নাটকে সমাজের দুটি রূপ স্পষ্ট। এখদিকে ইংরেজ সরকারের বর্বর শাসন ও তাদের মদত দেওয়া হিন্দুয়ানি বাবু ও ধনী ব্যবসায়ী অন্যদিকে নিপীড়িত, খেটে খাওয়া নিরন্ন, গরিব অভাববী মানুষের ছবি বারবার উঠে এসেছে। বেঙ্গাল অপেরার দল বারবার অপমানিত হয়। পাওনাদার মুদিওয়ালা, নদেরচাঁদ বাচস্পতি প্রত্যেকেই জঘন্যভাবে অপমান করে। বেঙ্গাল অপেরার ঘরে ইট পাটকেল ছোঁরে। বাচস্পতি অপমান করে বলে " এই এই কক্ষে বাস করে নরাধমের দল। ... এই নরাধমের নাম বেণীমাধব চাটুয্যে। আর ঐ বেশ্যার নাম আঙুর। .. ভদ্রলোকের পাড়া থেকে তোদের বাস উঠাবো তবে আমার নাম নদেরচাঁদ বাচস্পতি। এ কক্ষ পরিত্যাগ করে আজই চলে যেতে হবে। থেটারি এক্টো ছাড়ো। মদ খেয়ে পতিতা লইয়া বাগড়াবাগড়ি করিয়া তোমরা চিৎপুরকে নরকপঙ্কে নিমজ্জিত করেছ?"[৩৪] এই বাচস্পতিই আবার ধনী ঘরের ইংরেজি জানা সাহেবী পোশাক পরিহিত প্রিয়নাথের মুখে ইংরেজি বুলি শুনে গিরগিটির মতো নিজের রং বদল করে এবং বলে "(বিব্রত হাসি সহ) মহাশয় যে এ স্থানে উপস্থিত তাহা পূর্বাহ্নে জানিতে পারি নাই বলিয়াই -"[৩৫] এইরূপ দৃশ্যের মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমাজের মেরুদন্ডহীন অমানবিক ভদ্রবেশী মুখোশধারী বাঙালির স্বরূপটিই তুলে ধরেছেন। সেদিন উনিশ শতকের রঙ্গমঞ্চকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা মানুষগুলি দিনের পর দিন নানা অপমান, গঞ্জনা, আঘাত মাথায় নিয়ে মঞ্চসফল নাটক অভিনয় করেছেন। পেটের দায়ে অভিনয়ে যুক্ত হলেও অভিনয়কে ভালোবেসেছেন। আধুনিক নাট্যমঞ্চের পথ প্রশস্ত করেছেন। উনিশ শতকের থিয়েটার ও অভিনেতাদের জীবন ইতিহাসকে ফিরে দেখতে হলে উৎপল দত্তের টিনের তলোয়ার একটি আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

**তথ্যসূত্র:**

১। পশ্চিমবঙ্গ, উৎপল দত্তের স্মরণ সংখ্যা, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ. ৭।

২। উৎপল দত্ত, টিনের তলোয়ার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৪১২, দ্বাদশ মুদ্রণ ১৪২৬, পৃ. ২।

৩। তদেব, পৃ. ৫, ৪। তদেব, পৃ. ৫, ৫। তদেব, পৃ. ৬, ৬। তদেব, পৃ. ৬, ৭। তদেব, পৃ. ৮, ৮। তদেব, পৃ. ৮, ৯। তদেব, পৃ. ৫, ১০। তদেব, পৃ. ৪৭, ১১। তদেব, পৃ. ৪৭, ১২। তদেব, পৃ. ৩৩, ১৩। তদেব, পৃ. ৫৮, ১৪। তদেব, পৃ. ৬৮, ১৫। তদেব, পৃ. ৪৮, ১৬। তদেব, পৃ. ৪৮, ১৭। তদেব, পৃ. ৬০, ১৮। তদেব, পৃ. ৬১, ১৯। তদেব, পৃ. ৬৭, ২০। তদেব, পৃ. ১৩, ২১। তদেব, পৃ. ১৩, ২২। তদেব, পৃ. ৬৫, ২৩। তদেব, পৃ. ৬১, ২৪। তদেব, পৃ. ৬১, ২৫। তদেব, পৃ. ৬৯, ২৬। তদেব, পৃ. ৭, ২৭। তদেব, পৃ. ৭, ২৮। তদেব, পৃ. ৭৪, ২৯। তদেব, পৃ. ৭১, ৩০। তদেব, পৃ. ২২, ৩১। তদেব, পৃ. ২৭-২৮, ৩২। তদেব, পৃ. ৬০-৬১, ৩৩। তদেব, পৃ. ৫১, ৩৪। তদেব, পৃ. ২৬, ৩৫। তদেব, পৃ. ২৭।

লেখক ঃ **রমা দাস,** সহকারী, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, আসাম।

# শুক্রাচার্য রাভার নাট্যচিন্তা ও অভিনবত্ব একটি অধ্যয়ন

বরুণ কুমার সাহা

**ভূমিকা :**

শ্রীমন্তশঙ্করদেব বিরচিত নাটক থেকে শুরু করে ভাওনা, যাত্রা কিংবা ভ্রাম্যমান থিয়েটারের যে নাট্যধারা অসমের নাট্যজগতকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে সেখানে শুক্রাচার্য রাভার নাট্যচিন্তা একটি নতুন গতিপথের সন্ধান দিয়েছে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে শরীরী ভাষায় সর্বজনীনতাকে আশ্রয় করে তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরের শেকড়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। নাট্যচর্চার জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষকে শুধু প্রশিক্ষিত করাই নয়, বরং নাটক দেখার জন্য দর্শকও সৃষ্টি করেছেন,যাকে আলংকারিক ভাষায় আমরা বলে থাকি 'সহৃদয় -সমাজ'[১]। আর সেই সহৃদয় -সমাজের তালিকায় রয়েছেন উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত থেকে শুরু করে লেখাপড়া না জানা সাধারণ মানুষ, বোদ্ধা থেকে শুরু করে শিশু-কিশোর, বিদেশি থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ জনজাতিয় গৃহবধূটি। লোকজীবনই ছিল তাঁর মূল আশ্রয়, আর নতুন আঙ্গিকে, নতুন পরিবেশে, নতুন কৌশলে, নতুন কিছু বলার মধ্য দিয়ে নিখাদ শিল্পচর্চা করাই ছিল তাঁর নাট্যাদর্শের মূল ভিত। কিন্তু সেই নাট্যশিল্পের রসবোধ শুধু আত্মতৃপ্তির মধ্যে থেমে থাকেনি, আত্মজাগরণের পথও দেখিয়েছে। ১৯৭৭ সালের ১০ এপ্রিল অসমের গোয়াল পাড়া জেলার রামপুর গ্রামে শুক্রাচার্য রাভার জন্ম হয়। অসম আন্দোলনের অগ্নিগর্ভকালে তাঁর শৈশব কেটেছে। যৌবন কেটেছে সন্ত্রাস-জর্জর উত্তপ্ত অসমে। কিন্তু প্রকৃতির টানে আত্মমগ্ন রাভা নিজের জীবনের গতিপথটা শুরু থেকেই যেন ঠিক করে নিয়েছিলেন। ফলে অভিনয়-জগতটাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে স্থির হয়েছিল, যা সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল শালবনের নাট্যাঙ্গানে। কিন্তু ৮ জুন ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর অকালপ্রয়াণ শালবনের সুদূর সম্ভাবনাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তবুও একথা স্বীকার করতে হয় যে মাত্র বিয়াল্লিশ বছরের এই জীবৎকালে তিনি দেশের নাট্যজগতে যে নতুন নাট্যধারা প্রতিষ্ঠিত করলেন তা আজও রামপুর গ্রামের শালবনকে সজীব করে রেখেছে। একবিংশ শতকের এই বিশ্বায়নের যুগেও যে কোনো এক অখ্যাত গ্রামের শালবনে, দেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সুহৃদ-সমাজ নাটক দেখতে ছুটে আসতে পারেন, এবং প্রকৃতির অকৃত্রিম পরিবেশে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারেন, সে কথা প্রমাণ করে গেছেন বিস্ময়কর নাট্যব্যক্তিত্ব ভারতের শুক্রাচার্য রাভা। স্বল্পায়ুর প্রায় গোটা সময়টাই শুক্রাচার্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জীবনটাকে খুঁজতে চেয়েছিলেন নাটকের মধ্য দিয়ে। তিনি সফল হয়েছেন এবং অন্যকেও পথ দেখিয়েছেন।

নাট্যক্ষেত্রে শুক্রাচার্যের উন্মেষ পর্ব (২০০২ পর্যন্ত) : টেলিভিশন প্রচলনের প্রারম্ভিক যুগেও উৎসব মানেই ছিল নাটক, আর নাটক মানেই ছিল উৎসব। সে-সময় রয়েল নাটকে[২] ব্যবহৃত রঙিন লাইট অথবা মণিমুক্তাখচিত চরিত্রগুলোর পোশাক দেখে শিশু শুক্র পরম বিস্ময় অনুভব করতেন। নাট্যদলে 'অস্তার'[৩]-এর ভূমিকা শুক্রাচার্যকে প্রভাবিত করত খুব। এক্ষেত্রে তিনি রাভাসমাজের এক সম্মানীয় নাট্য-ব্যক্তিত্ব চকা অস্তারকে (চকা রাভা) খুব স্মরণে রেখেছেন কারণ সে-সময় রয়েল নাটকের যুদ্ধ বিগ্রহ, অলৌকিকতা, ভক্তি-নির্ভরশীলতা, সংলাপ-নির্ভরশীলতা, সংগীতময়তা তথা সংলাপে নির্দিষ্ট সুর বা ঝোঁক ইত্যাদি থেকে মানুষ বেরোতে পারছিলেন না। চকা অস্তার কিন্তু সেই ধারাকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুক্রাচার্যের ভাষায়-- 'রয়েল নাটকের ধারাটি ভেঙে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো বিষয়গুলোকে তিনি নাটকে তুলে আনতেন। রয়েল আবেশটা ভেঙে ফেলতে পারাটাই আসলে একটি বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। তার জন্য অত্যন্ত সাহসের দরকার যা চকা অস্তারের আছে।'[৪] বলা যায়, চকা অস্তারের এই ব্যতিক্রমী চিন্তা পরিণত শুক্রাচার্যকে নাটকের নতুন ধারা প্রবর্তনে সাহস জুগিয়েছিল। রামপুরে কয়েকজন উদ্যমী ব্যক্তি মিলে 'রূপজ্যোতি মিনি থিয়েটার' চালু করেছিলেন যা চলে ১৯৯৪ পর্যন্ত।[৫] তবে শৈশবে নাটকের প্রতি আকর্ষিত হওয়ার নেপথ্যে যাঁরা শুক্রাচার্যকে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রকাশ রাভা। তিনি ১৯৯৪-৯৫ নাগাদ 'সোনাজুলি থিয়েটার' নামে প্রথম রাভা ভ্রাম্যমান থিয়েটার শুরু করেছিলেন। আগ্রহী শুক্রাচার্য প্রায়ই তাঁর সংস্পর্শে থাকার চেষ্টা করতেন। একদিন মূল অভিনেতার অনুপস্থিতিতে 'শঙ্কর গুন্ডা' চরিত্রে প্রক্সি দেওয়ার সুযোগ পান তিনি, আর সেখান থেকেই শুরু। তাঁর অভিনয় দেখে পরিচালক এতই মুগ্ধ হলেন যে মূল অভিনেতাকে বিদায় দিয়ে শুক্রাচার্যকে নির্বাচন করলেন সেই চরিত্রটির জন্য। এই সুবর্ণ সুযোগ শুক্রাচার্য এতই মন দিয়ে পালন করেছিলেন যে দর্শকরা মঞ্চে এসে তাঁকে পুরস্কৃত করতে বাধ্য হন। সেই কৃতিত্ব প্রকাশ করতে গিয়ে শুক্রাচার্য বলেন- 'শঙ্কর গুন্ডার ভাবে আপ্লুত হয়ে অমুক এত টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। মঞ্চে উঠে যাই। পুরস্কারদাতা আলপিন দিয়ে জামায় নোট গেঁথে দেন। আনন্দে বুকটা ফুলে ওঠে।'[৬]

এরপর প্রায়ই স্কুল মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় মেতে উঠে আসে নাটকের প্রসঙ্গ। ১৯৯৮ সালে সেই আড্ডারই ফসল 'বাদুংদুপ্পা'।[৭] সেই আড্ডাতেই মোম জ্বালিয়ে চলে অভিনয় চর্চা, নাটক পরিকল্পনা, কাহিনি রচনা, ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা। গজা পাড়ায় অনুষ্ঠিত রাভা কৃষ্টি সম্মেলনে এই প্রথম তিনি নাটক করার সুযোগ পান। খেলার মাঠের আড্ডায় পরিকল্পিত ছোটো নাটক 'নাঙা পাতা আঙা গাতা' প্রদর্শিত হয় সেখানে এবং খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শুক্রাচার্যের নেতৃত্বে নাটকটি আরও অনেক জায়গায় মঞ্চস্থ হয়, যদিও পরবর্তীকালে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'তখনকার চিন্তাগুলো খুব বেশি পুরট ছিল না।'[৮]

নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে শুক্রাচার্য যখনই সুযোগ পেয়েছেন নাট্য-কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে গেছেন। এরপর ২০০১ সালে গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রে National School of Drama আয়োজিত প্রায় দেড় মাসের এক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের পথ আরও প্রশস্ত করেন তিনি।

২০০৩ সালে শুক্রাচার্য একটি বড় কাজে হাত দিলেন। রূপকোঁয়র জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার বিখ্যাত অসমিয়া নাটক 'রূপালীম'-এর নাট্য প্রযোজনা এবং তাও আবার রাভা ভাষায়। আগিয়া নাট্য মন্দিরে সেই নাটকের রাভা সংস্করণের সফল মঞ্চায়ন সকলকে বিস্মিত করেছিল কারণ অসমিয়ার এক শ্রেষ্ঠ নাটককে রাভা পরিবেশের ছাঁচেও যে ঢালা যেতে পারে সেই ধারণটা কারো ছিল না। সম্ভবত এখান থেকেই তিনি এই অভিনব প্রচেষ্টার শক্তি সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন যার এক ঐতিহাসিক পরিণাম ২০১৬ সালের ১৫ ডিসেম্বরে 'আন্ডার দ্য শাল ট্রি' নাট্যোৎসবে প্রদর্শিত 'Nukhar Rengchakayani Gopchani'। এটি হচ্ছে আসলে শেক্সপিয়রের বিখ্যাত 'ম্যাকবেথ' নাটকের রাভা সংস্করণ। তবে শুধু এটাই নয়, তিনি প্রায় সমস্ত নাটকগুলোকেই নিজের মতো করে সাজিয়েছেন, সেটা রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি'ই হোক কিংবা এইচ এস শিবপ্রকাশের 'মাদাইয়া মুচি'।

'২০০৩ সালে ওই স্থানেই শুক্রাচার্য হেইসনাম কানহাইলালের সাক্ষাৎ পান যা তাঁর নাট্যজীবনে পরিস্ফুটনে এক বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নাট্যগুরু কানহাইলালের সংস্পর্শে আসার আগের সময়টিকে (শৈশব থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত) তাই আমরা শুক্রাচার্যের নাট্যজীবনের 'উন্মেষ পর্ব' হিসেবে চিহ্নিত করলাম।

নাট্যক্ষেত্রে শুক্রাচার্যের প্রস্ফুটন পর্ব (২০০৩-২০০৮): হেইসনাম কানহাইলালের সঙ্গে শুক্রাচার্যের সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে 'আন্ডার দ্য শাল ট্রি' নাট্যোৎসবের সূচনার প্রাক্-মুহূর্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ ২০০৩-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ , এই সময়কালকে আমরা শুক্রাচার্যের নাট্যজীবনের 'প্রস্ফুটন পর্ব' হিসেবে চিহ্নিত করেছি। গুরু কানহাইলালের ছত্রছায়ায় শুক্রাচার্য প্রায় দুবছর মণিপুরে নাট্যশিক্ষা গ্রহণ করেন এবং কানহাইলালের নাট্যাদর্শ, শৈলী, বিনির্মাণ, শারীরিক কৌশল থেকে শুরু করে আধুনিক নাটকের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। বটবৃক্ষ-স্বরূপ গুরু কানহাইলাল তাঁর কাছে যেন একটা হাতুড়ি। শুক্রাচার্যের বিশ্বাস যে মণিপুর, কলাক্ষেত্র তাঁর কাছে 'কঠীয়াতলী'[৯], যেখানে চলতে থাকে জীবনের রূপান্তর, এবং তিনিও সেইরূপ থেকে রূপান্তরের সহযাত্রী।

রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ে (National School of Drama) অধ্যয়নের খুব ইচ্ছে ছিল শুক্রাচার্যের । কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন সফল হয়নি। কিন্তু গুরু কানহাইলালের NSD-র প্রতি বিরাগ ও NSD ত্যাগ তাঁকে বিস্মিত করেছিল। নাট্য জগতে কিছু অভিনব কাজ

করতে হলে NSD-র তকমা  যে জরুরি নয় সে কথা উপলব্ধি করে শুক্রাচার্য কানহাইলালের ছত্রছায়ায় নিজের ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে সচেষ্ট হলেন।

কানহাইলালের কাছে শুক্রাচার্য ‘কমিউনিটি কালচার’[১০]-এর গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। লোকজীবন, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকগাথা, লোকগীত, লোকবাদ্য, লোককাহিনি, লোকচরিত্র এবং এগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজীবনের স্পন্দন শিশুকাল থেকেই শুক্রাচার্য দেখে এসেছিলেন। এগুলেকে কীভাবে নাটকে তুলে আনা যেতে পারে এই বিষয়টি ধীরে ধীরে তাঁর মনে উঁকি দিতে লাগল। কিন্তু বিষয়টা যে খুব একটা সহজ ব্যাপার নয় তা নিয়ে কানাইলালের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনাতেও মিলিত হতেন তিনি। বিশেষ করে লোককলাকে বস্তুবাদী নতুন প্রজন্মের চাহিদায় রূপান্তরিত করাটাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পথপ্রদর্শক কানহাইলাল তাঁকে বলেছিলেন যে দমনাত্মক বস্তুবাদী দর্শন পিস্ট করতে চাইলে লোকসংস্কৃতি তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। আর সেটাই লোকজীবনের বিশ্বাসকে অটুট রাখে। বলাবাহুল্য, কানহাইলালের এই অভয়বাণী শুক্রাচার্যের মনে অনেক শক্তি জুগিয়েছিল। একবিংশ শতকের আন্তর্জালিক আগ্রাসন ও নবপ্রজন্মের তথাকথিত আধুনিকতার মোহচ্ছায়ায় আত্মমগ্ন হওয়ার দুর্বার আগ্রহের বিরুদ্ধে গিয়ে লোকভাবনানির্ভর নবনাট্য চেতনা জাগিয়ে তোলার যে কঠিন চ্যালেঞ্জ শুক্রাচার্যকে সামলাতে হয়েছে তা ছিল একটি অগ্নিপরীক্ষা। আত্মবিশ্বাস, দূরদৃষ্টি, কর্মস্পৃহা তথা ত্যাগ এসব না থাকলে কেউ সেই অগ্নিপরীক্ষায় সফল হতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ডাকঘর’ নাটকটিতে ভাব অক্ষুন্ন রেখে, বৃদ্ধা সাবিত্রী দেবীকে দিয়ে অমলের চরিত্র রূপায়নের কানহাইলালের যে সাহসিকতা ও অভিনবত্ব সেটা অবশ্যই শুক্রাচার্যকে নবচিন্তা  উন্মেষে সাহায্য করেছিল এবং সেজন্যই রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’ নাটকটিকে  রাভা-সাংস্কৃতিক পরিবেশে তুলে ধরতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়াও, কানহ্বাইলালের ছত্রছায়ায় শুক্রাচার্য শরীরী ভাষার গুরুত্বের বিষয়টি খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তা নিজের নাটকে প্রয়োগ করেছিলেন। তবে  কানহাইলাল যেভাবে মণিপুরের আঞ্চলিক মানুষদের বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশের কথা মাথায় রেখে শারীরিক অভ্যাসগুলো পরিকল্পনা করেছিলেন, শুক্রাচার্য তাঁর বাড়ুংডুপ্পার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য তা কিন্তু হুবহু গ্রহণ করেননি। বরং গোয়ালপাড়ার রামপুরের পরিবেশ, মানুষের স্বভাব, সংস্কার ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে তা নতুন করে সংযোজন করেছেন এবং নাট্যধারায় সংলাপের  প্রাধান্যকে কম করে শারীরী ভাষার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার চেস্টা করেছেন। শুক্রাচার্য ভাষার সীমাবদ্ধতার গন্ডী পেরিয়ে এমন একটি সার্বজনীন ভাষার খোঁজে নেমে গিয়েছিলেন যা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠী কিংবা নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে হয়ে উঠেছিল সকলের বোধগম্য ভাষা।  শুক্রাচার্যের ভাষায়- ‘মগজটিকে বিরাম না

দিয়ে নাটকের পান্ডুলিপিগুলো ক্রমশ শব্দহীন করে নিতে শুরু করলাম। যত পারি নিঃশেষ। অথচ শব্দহীন নীরবতা।'[১১] কিন্তু তাই বলে সংলাপ প্রাধান্যহীন এই নাট্যধারাকে মূকাভিনয় অর্থাৎ মাইম বলেও চিহ্নিত করা যাবে না। কারণ মূকাভিনয়ে অভিনেতা সম্পূর্ণ মূক থাকতে বাধ্য। কিন্তু শুক্রাচার্যের নাট্যধারায় সংলাপের মিতব্যয়িতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে শরীরী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই 'সশব্দ নীরবতা'কে প্রতিষ্ঠিত করাটা যে খুব একটা সহজ কথা নয় সে কথা শুক্রাচার্য ভালো করেই জানতেন এবং তাই গ্রামের সাধারণ মানুষকে শিল্পী হিসেবে গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার অনুশীলনকেই সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

শুক্রাচার্য রাভার নাট্য-চেতনার প্রস্ফুটন পর্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে Elasticity বা স্থিতিস্থাপকতা। অর্থাৎ কোনো প্রতিষ্ঠিত কাহিনি বা চরিত্রকে তিনি রক্ষণশীলতার বশবর্তী হয়ে কৃত্রিমভাবে হুবহু তুলে ধরার পক্ষপাতী ছিলেন না। পরিবেশানুকূল্য নাট্য-প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে তিনি প্রায়ই বিষয় ও চরিত্রের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা বজায় রেখেছেন। তবে ভাবের ক্ষেত্রে কোনো আপস করেননি, কারণ একটি নাটকের অভিকেন্দ্র বা Core হচ্ছে এর ভাব। সেই ভাবটা অটুট না থাকলে মূল নাটকটাকে পাল্টে দেওয়া হয়। অবশ্য আধুনিক যুগে বিনির্মাণবাদীরা কোনো একটি প্রকরণের ভাববস্তুকে পাল্টে দেওয়ার স্বাধীনতাও গ্রহণ করেন। কিন্তু শুক্রাচার্য প্রতিষ্ঠিত নাটকের অন্তরঙ্গ ভাবকে অক্ষুন্ন রেখে বহিরঙ্গ দিকটি পাল্টে নিজের আশপাশের পরিবেশের সঙ্গে একাকার করে দিয়েছেন। ফলে উঠে এসেছে নিজেদের লোকজীবন, লোকাচার, লোকাভ্যাস, লোকপরিবেশ ও লোকচেতনা এবং এর ফলে চরিত্ররা 'ম্যাকবেথ' কিংবা 'রথের রশি' নাটকে নিজেদের প্রতিচ্ছবিই খুঁজে পেয়েছেন এবং দর্শকরাও খুব সহজে পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছেন।

গুরু কানহাইলালের পর আরেকজন ব্যক্তিত্ব, যিনি শুক্রাচার্যের জীবনে দারুণ প্রভাব পেলেছিলেন তিনি হলেন কানাড়া সাহিত্যের একজন বলিষ্ঠ সাহিত্যিক এইচ এস শিবপ্রকাশ। ২০০৪ সালে শিবপ্রকাশের 'Madaiah the Cobbler'-র রাভা সংস্করণ 'মাদাইয়া মুচি'র প্রযোজনা করে এবং ২০০৬ সালে শিবপ্রকাশেরই অন্য একটি জনপ্রিয় নাটক 'সতী' প্রযোজনা করে শুক্রাচার্য নিজের আত্মবিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য আগের বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালে তিনি কানহাইলালের সঙ্গে 'Theatre in Nature Lore' প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। বলা যেতে পারে, এই ধারণারই বৃহৎ পরিণামস্বরূপ ২০০৮ সালে থেকে প্রচলতি 'Under The Sal Tree' নাট্য উৎসব যা এই নাট্যধারাকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিয়েছে।

২০০৬ সালে শুক্রাচার্য-পরিকল্পিত, পরিচালিত ও প্রযোজিত একটি অন্যতম নাটক হল 'ট' পয়দম'। রাভা সমাজে প্রচলিত লোককাহিনি-নির্ভর এই নাটকটিকে বাস্তব রূপ দেওয়ার

ক্ষেত্রে শুক্রাচার্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।একদিকে কানহাইলালের সংস্পর্শে এসে নতুন কৌশল প্রয়োগের তাগিদ অন্যদিকে কর্মস্পৃহা তাঁকে প্রতিটি পদক্ষেপে উৎসাহিত করেছিল। মাতৃ, পাঁচ সন্তান ও পয়দম[১২] পাখির এই অলৌকিক গল্পটি লোকসমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদের স্বার্থপরতা, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃর উদারতা ও পয়দম পাখির বিশালত্ব ও চারভাইকে ভক্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন অলৌকিক বিষয় নাটকটিতে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু নিছক লোককাহিনি পরিবেশন এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং অসমের তৎকালীন পরিস্থিতি রূপকাশ্রয়ে পরিবেশিত হয়েছে। শুক্রাচার্য নিজেই বলেছেন- 'অসমের ভ্রাতৃঘাতি কুচকাওয়াজ, সহোদরদের অসূয়া, অপ্রীতি ইত্যাদি প্রকাশের জন্য লোককাহিনিটি অত্যন্ত সার্থক ছিল। সন্তানদের মধ্যে অসূয়া মাতৃকে কীভাবে ভারাক্রান্ত করতে পারে ও তার ফলে সৃষ্টি হওয়া Pathosটি আমি আমার মাতৃভূমির ক্ষেত্রে দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম। [১৩]

২০০৭ সালে রাভা লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নমূলক একটি কর্মশালা আয়োজনে তিনি বিশেষ ভূমিকা নেন এবং সেবছরই নেদারল্যান্ডের নাট্যকর্মী ইভলিন পুলেন্সের সহযোগিতায় একমাসের পাপেট্রি কর্মশালার[১৪] আয়োজন করেন। ইভলিনের হাত ধরেই শুক্রাচার্য নেদারল্যান্ডের থিয়েটার অ্যাম্বেসির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পান এবং সেই অ্যাম্বেসির ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত হন। শুধু তাই নয়, সেই অ্যাম্বেসি Under the Sal Tree' নাট্যোৎসবের জন্য অর্থ-সাহায্যও প্রদান করেছিল।

২০০৮ সালটা যেন শুক্রাচার্য রাভার জীবনে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করছিল। কারণ ইভলিন পুলেন্সের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটা সম্পর্ক তৈরি হলেও শুক্রাচার্যের নিজস্ব কৃতিত্ব তখনও বিশ্ব-দরবারে সেভাবে ফুটে ওঠেনি। 'Under the Sal Tree' নাট্যোৎসব আসলে শুক্রাচার্য রাভার জীবনের সমৃদ্ধি পর্বের সূচনা-লগ্ন যা তাঁকে রাজ্য তথা দেশের বাইরেও পরিচিতি প্রদান করে। নাট্যক্ষেত্রে শুক্রাচার্যের সমৃদ্ধি (২০০৮-২০১৮): ২০০৮ সালের ২২ ও ২৩ নভেম্বর রামপুরে, কলাক্ষেত্র মণিপুর ও বাদুংদুপ্পার যৌথ প্রয়াসে এবং সংগীত নাটক একাডেমির সহযোগিতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয় 'Under the Sal Tree'। এই উৎসবের বিশেষণ হিসেবে বলা হয়েছে 'Festival of Folk Tales and Performances'। আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে- ' a festival of five folk tales in a performance in a way of re-telling the tale in response to the paradox we are facing now'[15]। বোঝাই যাচ্ছে যে কেবলমাত্র রসাস্বাদনই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। বরং জাতীয় জীবনে শেকড়ের সন্ধান, লোকজীবনকে উদ্ভাসিত করার চেতনা এবং শালবনের নীচে গোটা প্রাকৃতিক পরিবেশে ও উপায়ে অভিনব নাট্য-অন্দোলন গড়ে তোলার স্বপ্ন, এসব ভেবেই তাঁরা এই পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। প্রথম বছরের সফল সমাপন শুক্রাচার্যের পাশাপাশি বুদুংদুপ্পার সকল কর্মকর্তাদের এমনভাবে উৎসাহিত করলো যে তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহে

পরের বছরের প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন এবং তাঁদের একনিষ্ঠতায় আকর্ষিত হয়ে নেদারল্যান্ডের থিয়েটার অ্যাম্বেসিও এগিয়ে এল। এবারের থিম 'Celebrating Rituslals through Theatre'। বিশ্বায়ন, তথাকথিত আধুনিকতা ও নগর-মানসিকতার দ্রুত আগ্রাসন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে ভূমিপুত্রদের ঐতিহ্যকে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের সমৃদ্ধ লোকজীবনের মাহাত্ম্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরে তাদের উজ্জীবিত করাই ছিল এই থিমের মূল উৎসবের নাম 'Under the Sal Tree International Theatre Festival (Theatre in/of nature), আর এখানে প্রদর্শিত হল সাউথ কোরিয়ার Theatre Company Mindulle গোষ্ঠীর Wojciech Mareck Kozak পরিচালিত নাটক Black Hen; শ্রীলংকার Theatre of People গোষ্ঠীর S. Leelawathy & R. Chamalee পরিচালিত নাটক 'Payanibal'; ব্রাজিলের Oposto Teatro Labaoratorio গোষ্ঠীর Julia Varlay পরিচালিত নাটক 'Estrelas' ইত্যাদি। পরের বছরগুলোতে বাংলাদেশ থেকেও অনেক নাট্যদল রামপুরের ম্যাকবেথ বনে নাটক করতে ছুটে এসেছিল, যাদের মধ্যে অন্যতম হল - বাংলাদেশের মৌলভি বাজারের মণিপুরি থিয়েটার গোষ্ঠী। তারা শুভাশিস সিনহা পরিচালিত 'ইঙাল আধার পালা' প্রদর্শন করেন। সমালোচক উৎপল বরপূজারি তাই খুব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন- 'Within 20 years, Badungduppa Kalakendra has become the reason why people from far way countries visit Rampur, and within nine years, the Under the Sal Tree Festival has become a unique theatre destination in the world.'।[১৬]

শুক্রাচার্য রাভার 'দর্শক নির্মাণ'-এর পরিকল্পিত প্রচেস্টাও এই সাফল্যের অন্যতম কারণ। জাঁকজমকতা ও স্থূলরুচিসম্পন্ন মনোরঞ্জনমূলক পরিবেশনে আক্রান্ত সার্কাসমুখী জনসাধারণের মনে বিশুদ্ধ শিল্পবোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি এবং কোনো কোনো সময় নিজেই বিস্মিত হয়ে বলেছেন- " ...যদি দর্শক রুচিশীল, রসজ্ঞ ও আইডিয়েল না হয়, নাটকের কোনো অর্থই থাকবে না ... টু-শব্দহীন একজন অশিক্ষিত রাভা মহিলা দেড় ঘন্টার একটি ফরাসি নাটক দেখাটা খুব সহজ কথা নয়... একটি কিশোর, দাড়িগোঁফ গজায়নি। স্থির ভাবে জাপানি ভাষার একটি নাটকের দর্শক হয়ে পড়েছে। হাসছে, গম্ভীর হচ্ছে, কখনো বা উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। সেখানে ভাষা কোনো সমস্যাই না। একটি সার্বজনীন ভাষা মঞ্চ থেকে ট্র্যান্সফর্ম, ট্র্যান্সফিউজ ও ট্রান্সমিউট হচ্ছে...।"[১৭]

এভাবেই ক্রমাগত-সাফল্য 'বাদুংদুপ্পা'কে অনেক উঁচুতে পৌঁছে দিয়েছিল। নতুন প্রজন্মকে নাটকের মহত্ব উপলব্ধি করানোর জন্য তিনি অসংখ্য কর্মশালার আয়োজন করেছিলেন। এছাড়াও শিশু নাটক সমারোহ ও কর্মশালা, প্রাপ্তবয়স্কের নাটক কর্মশালা, নতুন শিল্পীদের জন্য কর্মশালা, মুক্ত পরিসরে স্বরসম্বলিত অভিনয় কর্মশালা, পাপেট্রি কর্মশালা, বেরিথ ডান্সের তত্ত্বাবধানে ডাইরেক্টর কর্মশালা, রাভা লোকসংস্কৃতির ওপর অধ্যয়নমূলক

কর্মশালা, ভারতীয় নাট্য ইতিহাসের ওপর কর্মশালা ইত্যাদির অয়োজন নাট্যজগতে তাঁর যুগান্তকারী অবদান। আরও নতুন নতুন পরিল্পনাও নিশ্চয় ছিল শুকরাচার্যের মাথায়। কিন্তু সেই দুর্বার সম্ভাবনা স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে 'বাদুংদুপ্পা কলাকেন্দ্র' যেভাবে শুক্রাচার্যের নাট্যাদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সংকল্পবদ্ধ তা শুক্রাচার্যের সার্থক অনুশাসন ও প্রশিক্ষণেরই ফল। এখনো সেই শাল বনে নাটক হয়, তা দেখতে ছুটে আসেন দেশ-বিদেশের হাজার হাজার মানুষ। এখনো বাদুংদুপ্পার শিল্পীরা নাটকের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন, সময় মেনে চলেন, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে নাটক পরিবেশন করেন। প্রকৃতির সঙ্গে হেসে খেলে একাত্ম হয়ে নিজের শেকড়কে আঁকড়ে ধরে রাখেন। সেই নাটক আয়োজনে এখনো কোনও গাছ কাটা হয় না, পরিবেশ বিনষ্ট হতে পারে বলে কোনো মেলা হয় না, ব্যবসা হয় না, হুলস্থূল হয় না, নাগরদোলা আসে না, কোনো উঁচু মঞ্চ নির্মাণ হয় না, কৃত্রিম আলোর ব্যবহার হয় না, কোনো মাইক ব্যবহার হয় না। অথচ হাজার হাজার সহৃদয় -সমাজ রসাস্বাদনের পর পরম তৃপ্তিতে বাড়ি ফিরে যান।

শুক্রাচার্য প্রবর্তিত বাদুংদুপ্পার এই প্রয়াস তাই বিশ্বায়নের যুগের এক বিস্ময়কর পরিঘটনা যা চোখে আঙুল দিয়ে সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। রামপুরের রাভা জনজাতীয় নাট্যগোষ্ঠীর নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে বাদুংদুপ্পার সুর বেজে ওঠে, যেখানে ধ্বনিত হয় ক্লান্ত ধরিত্রীকে বাঁচিয়ে তোলার এক মায়াবী আকুলতা। শুক্রাচার্য একবার শৈশবের কথা স্মরণ করে বলেছিলেন- ' একদিন শালগাছের কান্না শুনলাম হঠাৎ .. বন্ধুরা হাসত। ধ্যা..ৎ। বাতাসে পাতা নড়ছে... বোকা...। দূরের অজগর পাহাড় থেকে আসা দক্ষিণা বাতাস ও সারি সারি শালগাছ গুলি মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে থাকি। অনন্তকাল। কান্না শোনার জন্য। "[১৮] এখানে 'অনন্তকাল' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থাৎ শৈশবে শালবনের কান্নার মধ্যে দিয়ে শুক্রাচার্যের যে প্রকৃতি-চেতনা জেগেছিল তা পরিণত শুক্রাচার্যকে কোনো না কোনো ভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টির নেপথ্যে যে একটা অলৌকিক শক্তি কাজ করে- যাকে রবীন্দ্রনাথ 'জীবনদেবতা' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন কিংবা টি এশ এলিয়টের ভাষায় যা 'ইন্সপিরেশন' -সেই নেপথ্য শক্তির অস্তিত্ব যেন তিনি খুঁজে পেতেন সেই শালবনে অর্থাৎ 'মেকবেথ জঙ্গালে।"[১৯] শুক্রাচার্য তাঁর উত্তরসূরিদের মনের মধ্যেও সেই শালবনের অনন্ত-আহ্বান জাগাতে সক্ষম হয়েছেন। রামপুরের কম্পমান প্রতিটি পাতায় তাই প্রতিমুহূর্তে মুখরিত হয়ে ওঠে শুক্রাচার্যধ্বনি।

**সূত্র নির্দেশ**

১. 'হৃদয় আছে যাঁহার , অর্থাৎ শিক্ষার সৌকুমার্য ও সুরুচি এবং তাহা হইতে জাত কাব্যের সুনিপুণ বাসনা আছে যাঁহার, তিনি সহৃদয় ।সমাজচিত্তের সহিত সুনিবিড় যোগ আছে যাঁহার, তিনি সামাজিক।'

সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, কাব্যালোক, দে'জ, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১২, কলকাতা, পৃষ্ঠা:৩

২. রামায়ণ-মহাভারত বা পুরাণকেন্দ্রিক নাটক।

৩. 'অস্তার' হলেন একটি নাট্যদলের প্রধান যিনি একাধারে নাট্যকার, পরিচালক, প্রশিক্ষক, মালিক সমস্ত কিছু।

৪. নীলোৎপল বরুয়া (সম্পা:), শুক্রাচার্য রাভা: যাত্রা আরু মাত্রা, বাদুংদুপ্পা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা: ৩৪

৫. তাঁদের একটি জনপ্রিয় নাটক হল 'অভিশপ্ত প্রেম'।

৬. নীলোৎপল বরুয়া (সম্পা:), শুক্রাচার্য রাভা: যাত্রা আরু মাত্রা, বাদুংদুপ্পা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা:৩৫

৭. শুক্রাচার্য প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। বাদুংদুপ্পা মূলত রাভাদের একটি লোকবাদ্য।

৮. নীলোৎপল বরুয়া (সম্পা:), শুক্রাচার্য রাভা: যাত্রা আরু মাত্রা, বাদুংদুপ্পা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা:১৮০

৯. কৃষিক্ষেত্র-স্বরূপ।

১০. Community Culture, sometimes called 'folklore' or 'folklife', is the living expression of culture in everyday life- anyone's culture-learned and passed on informally from person to person.
<https://www.loc.gov/folklife/poster/panel1.html#:

১১. নীলোৎপল বরুয়া (সম্পা:), শুক্রাচার্য রাভা: যাত্রা আরু মাত্রা, বাদুংদুপ্পা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা:৮১

১২. রাভা লোককাহিনিতে প্রচলিত একপ্রকার বিশালকায় পাখি।

১৩. নীলোৎপল বরুয়া (সম্পা:), শুক্রাচার্য রাভা: যাত্রা আরু মাত্রা, বাদুংদুপ্পা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা:১১৯

১৪. ভারতের তাঁর কাজকর্মের সবিশেষ এই ওয়েব-লিংকে দেওয়া রয়েছে—
<https://www.evelienpullens.nl/International.htm.

১৫. Brochure, Under the Sal Tree 2008

১৬. নয়ন রাভা (সম্পা:) বাদুংদুপ্পা(স্মরণিকা), গণআদ্যশ্রাদ্ধ পরিচালনা সমিতি, ২০১৮, গোয়ালপাড়া, পৃষ্ঠা:৩০

১৭. নীলোৎপল বরুয়া (সম্পা:), শুক্রাচার্য রাভা: যাত্রা আরু মাত্রা, বাদুংদুপ্পা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা:১৪৯

১৮. নীলোৎপল বরুয়া (সম্পা:), শুক্রাচার্য রাভা: যাত্রা আরু মাত্রা, বাদুংদুপ্পা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, গুয়াহাটি, পৃষ্ঠা:১৬

১৯. শালবনের নামকরণটি করেছিলেন এইচ এস শিবপ্রকাশ।

---

লেখক ঃ **ড. বরুণ কুমার সাহা**, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়। গুয়াহাটি।

# কাশীর নাট্যচর্চায় ললিত চক্রের দান : একটি সমীক্ষা

**সুবীর ঘোষ**

ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন নগরগুলির অন্যতম হল কাশী তথা বারাণসী। যদিও ষোড়শ -সপ্তদশ শতক পর্যন্ত কাশী ভারতবর্ষের অন্যতম একটি প্রাচীন রাজ্য এবং বারাণসী সেই প্রাচীন রাজ্যের রাজধানী হিসাবেই জনমানসে অধিক পরিচিত ছিল। অবশ্য কালক্রমে কাশী ও বারাণসী নাম দু'টি এক হয়ে যায়। বারাণসী নামকরণের বিবিধ যুক্তি আছে। তবে বরুণা ও অসি নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ, সেই অর্থে বারাণসী নামকরণ- এই যুক্তিই সর্বাধিক সমর্থনযোগ্য। কাশীর আরও দুটি নাম আছে। একটি ঔরঙ্গজেব প্রদত্ত মহম্মদাবাদ এবং অন্যটি হিন্দি ভাষী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বানারস। মহম্মদাবাদ নামটির সেই অর্থে কোনো প্রচার ও প্রচলন পূর্বেও ছিল না, এখনও নেই। কিন্তু বানারস নামটি ১৬৫৬ এর আগে পর্যন্ত সরকারি ভাবে প্রচলন না থাকলেও, হিন্দিভাষী জনমানসের সত্তার সঙ্গে জুড়ে যাওয়ায় আজও সেই নাম অবলুপ্ত হয়নি। সম্প্রতি ২০২১ সালে কাশীর অন্যতম একটি রেলস্টেশন মন্ডুয়াডিহির নাম পরিবর্তন করে বানারস স্টেশন করা হয়।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই কাশী সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষজনের কাছে অত্যন্ত পবিত্র তীর্থভূমি হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। পঞ্চোপাসক হিন্দুধর্মের (শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব) প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের কাছেই কাশী খুব পবিত্র তীর্থভূমি। শুধু তাই নয়, জৈন, বৌদ্ধ এবং কবীরপন্থীদের কাছেও কাশীর মতো পবিত্র তীর্থক্ষেত্র দ্বিতীয়টি নেই। পার্শ্বনাথ সহ চারজন জৈন তীর্থঙ্করের জন্ম কাশী নগরীতে। কাশী নগরীর সন্নিকটস্থ সারনাথেই সর্বপ্রথম গৌতম বুদ্ধ পঞ্চভিক্ষুকে তাঁর ধর্মমত প্রদান করেন। সেই সঙ্গে পূর্ণ লাভের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ যে চারটি তীর্থস্থানে গমন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে সারনাথ (বাকিগুলি হল লুম্বিনী, বুদ্ধ গয়া ও কুশীনগর)। ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ সন্ত কবীরের জন্মভূমি ও কর্মভূমিও এই কাশী। আর সেই কারণে কবীরপন্থীদের কাছেও কাশী অত্যন্ত পবিত্র ভূমি। বৈষ্ণবীয় ভক্তি আন্দোলনের অন্য আর একজন মহান সন্ত রবিদাস জী'র জন্মও কাশীতে। সেই সূত্রেও শত শত বৈষ্ণবীয় ভক্তমণ্ডলীর সমাগম হয় কাশীতে। তাঁদের এখটা অংশ অবশ্যই বাঙালী। হিন্দি বলয়ের মানুষজনের কাছে প্রাণের বস্তু 'রামচরিত মানস' কাব্যের রচয়িতা তুলসীদাসের সাধনক্ষেত্রও কাশী নগরী।

বাঙালীর সঙ্গে কাশীর সম্পর্ক বহু পুরনো। কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দির 'দুধে-ভাতে বাঙালীর কাছে পরম ঈপ্সিত তীর্থস্থান। মার্কেণ্ডেয় পুরাণের কাশীখন্ড- এ এবং অর্বাচীন গ্রন্থ 'কাশী পরিক্রমা'য় দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে, রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্র অবশ্য অন্নদার গুণকীর্তনের ক্ষেত্রে লৌকিক উপাদানের উপর আশ্রয় করেছেন অনেক বেশি। 'মোক্ষধাম' কাশীতে দেবী অন্নপূর্ণা এবং দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম জ্যোতির্লিঙ্গ বিশ্বনাথ ধামে এসে শেষ জীবন অতিবাহিত করা অভিজাত বাঙালীর এক সময়ের পারিবারিক ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল। ফলে কাশী নগরী হয়ে উঠেছিল সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত বাঙালি পরিবারের 'দ্বিতীয় বাসগৃহ'। গঙ্গা তীরবর্তী প্রাচীন অট্টালিকার অনেকগুলিই যে সম্পন্ন বাঙালি পরিবারের দ্বারা নির্মিত, তা কাশী সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। কিংবদন্তি আছে, নাটোরের রানি ভবানী ৩৬০ জন ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে একখানা বাড়ি ও এক হাজার টাকা দান করেন। সেই সমস্ত বাঙালিদের দ্বারাই তৈরি হয় সম্পূর্ণ বাঙালি জনপদ বাঙালিটোলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়ায় প্রায় চারলক্ষে। ১৯৮৯ সালে তা আবার কমে দাঁড়ায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজারে। এই মুহূর্তে বারাণসীতে বাঙালির সংখ্যা এক লক্ষের কাছাকাছি।[১] তার প্রভাব পড়ে স্থানীয় নির্বাচনেও। দক্ষিণ বারাণসী আসনে টানা সাতটি বিধানসভা নির্বাচন জিতেছেন শ্যামদেব রায় চৌধুরী। তুমুল জনপ্রিয় এই মানুষটিকে এলাকার বাসিন্দারা চেনেন দাদা নামেই। বারাণসী ক্যান্টনমেন্ট আসনেও গত বিধানসভা আসনে জিতেছেন আর এক বাঙালি, জ্যোৎস্না শ্রীবাস্তব। বাঙালির দ্বারা নির্মিত একাধিক বাংলা মাধ্যম স্কুল তো ছিলই, বাঙালীর নামে কাশীর একাধিক রাস্তার নাম আজও নিশ্চিহ্ন হয়নি। শ্যামাচরণ লাহিড়ি স্ট্রিট, চারুচন্দ্র মিত্র লেন, কাশীনাথ বিশ্বাস রোড প্রভৃতি নামগুলিই প্রমাণ করে কাশীতে বাঙালির গুরুত্ব কতখানি ছিল।

খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ির মহারাজা বাহাদুর জয়নারায়ণ ঘোষাল ১৭৯১ সালে অসুস্থতার কারণে কাশীবাসী হন। সংস্কৃত, বাংলা আর ফারসির পাশাপাশি দেশের মানুষের ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি ১৮১৪ সালে কাশীর গরুড়েশ্বর মহল্লায় নিজের বাড়িতে তৈরি করেন ভারতীয় উপমহাদশের প্রথম ইংরেজি বিদ্যালয়। সেখানে ইংরেজি, হিন্দি, বাংলা, সংস্কৃত, ফারসি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, সমস্ত কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, এই বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন নিজের ব্যক্তিগত চিকিৎসক জি হুইটনি'র উপর। পরে ১৮১৭ সালে তিনি তৈরি করেন চুনা পাথর নির্মিত চারতলা স্কুলবাড়ি। অবৈতনিক এই বিদ্যালয়ে তখনকার দিনেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়েছিল। দুর্গাকুন্ড রোডের উপরই আছে জয়নারায়ণ ঘোষালের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত অনন্য স্থাপত্য 'গুরুধাম'। যার অস্তিত্ব এখনও কাশীতে বিদ্যমন। কাশীতে বাঙালি সংস্কৃত পন্ডিতদের পান্ডিত্যের কথা সর্বজনবিদিত। কাশীর আর এক ঐতিহ্য বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন যদুনাথ সরকার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্বনামধন্য বাঙালিরা। ভারত কলা ভবনের আজীবন সাম্মানিক সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রমথ চৌধুরীর বইয়ের সংগ্রহ এখনও আছে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে।

কাশীর বাংলা নাট্যচর্চার কথা বলতে গেলে হিন্দি ও বাঙালি সংস্কৃতির সংমিশ্রণের কথা সবার আগে বলে নিতে হয়। দশাশ্বমেধ ঘাটে বাঙালির নাট্যচর্চা এক সময় রীতিমত আলোড়ন তুলেছিল কাশীর মহল্লায়। এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথাও বলে নেওয়া প্রয়োজন। দশাশ্বমেধ ঘাটে তুমুল তর্কে বসেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। টানা কয়েকদিন বিতর্কের পর হার মেনেছিলেন আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের রূপকার ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র। সাফ জানিয়েছিলেন, বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে মডেল করেই এগোবে হিন্দি সাহিত্য। এরপরই শুরু হয় আধুনিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে হিন্দি ভাষাকে ব্যবহার করতে ভারতেন্দুর লড়াই। কাশীর বাংলা নাট্যচর্চার কথা বলতে গেলে সবার আগে আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের প্রবাদপুরুষ ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র জী'র কথা অবশ্য বলে নেওয়া প্রয়োজন। কেননা বাংলা ভাষা সাহিত্যও নাট্যধারার সঙ্গে ভরতেন্দু জী'র সম্পর্ক অত্যন্ত আত্মিক ও ঘনিষ্ঠ। কাশীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ শেঠ আমিনচন্দের বংশজাত ভারতেন্দু জী'র পিতা ছিলেন কাশীর স্বনামধন্য কবি ও নাট্যকার বাবু গোপালচন্দ্র (ছদ্মনাম 'গিরিধরদাস') । ১৮৫০ সালে কাশীতেই ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের জন্ম। ভরতেন্দু ছিলেন প্রধানত কবি যদিও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় তার পদচারণা ছিল স্বচ্ছন্দ। তার রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় সত্তর। শুধু তাই নয়, আধুনিক হিন্দি নাটক ও প্রবন্ধ রচনা ভরতেন্দুর হাত ধরেই শুরু হয়েছিল। প্রাক ভরতেন্দু যুগে, রঙ্গমঞ্চ বা নাট্যধারার বিকাশ ঘটেনি তেমনভাবে। অত্যন্ত নিম্নমানের কয়েকটি ভ্রাম্যমান পার্সী থিয়েটারের দল কাশীতে থাকলেও যুগোপযোগী চিন্তাশৈলীর এবং সামাজিক পটভূমিকার যথার্থ রূপায়নের কোনও প্রকাশ তৎকালে দেখা যায়নি। ভরতেন্দু যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, নাটকই একমাত্র শাখা যার মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা, চিত্তবিনোদন এবং ভাব বিনিময়ের সুযোগ সবচেয়ে বেশি। তাই এই সাহিত্য শাখাটির যথার্থ বিকাশের প্রয়োজনেই তিনি নাটক রচনায় প্রয়াসী হন। তাঁর রচিত মৌলিক নাটকের সংখ্যা পনেরোটির মতো।

ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের সাহিত্য চেতনার বিকাশ ও পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে যে ঘটনাটি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছিল তা হল বঙ্গীয় নবজাগরণ। ভরতেন্দু যখন ১৫ বছরের কিশোর, সেই সময় থেকেই বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রবল অভিঘাত ভরতেন্দুর চেতনাকে আন্দোলিত করে তোলে। আসলে ভরতেন্দু জী'র পূর্বপুরুষদের নিবাস ছিল কলকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে। মোটামুটি ষোড়শ শতকের শেষ দিকে কলকাতার কুমারটুলির মিত্র পরিবারের সঙ্গে ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের প্রপিতামহ কাশী নগরীতে চলে আসেন। কাশীর থঠেরি বাজারে মিত্র পরিবার এবং ভরতেন্দু হিরশ্চন্দ্র জী'র পরিবারের পাশাপাশি বাস ছিল। যা বর্তমানে বাঙ্গালি দেউরি নামে পরিচিত। অর্থাৎ বাঙালি পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রেই ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রর বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ গড়ে উঠেছিলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র জী'র অনুরাগের আর একটা বড় কারণ, মল্লিকা নামী

এক বিদুষী বাঙালি বিধবা রমণীর সঙ্গে তার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মনীষা কুলশ্রেষ্ঠ নামে এক লেখিকা এই দুজনের প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে 'মল্লিকা' নামে একটি উপন্যাসও লিখেছেন। মনে করা হয়,এই মল্লিকা নামে বাঙালি বিধবা নারীর সাহচর্যেই ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র জী নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। কলকাতার কোনো এক সখের থিয়েটারে 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের নাট্যরূপের অভিনয় দেখে তিনি ১৮৬৮ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সেই হিন্দিতে 'বিদ্যাসুন্দর' - এর নাট্য রূপান্তর করে ফেলেন। [২] বাঙালি ও অবাঙালি অভিনেতাদের দ্বারা নাটকটি দশাশ্বমেঠ ঘাটে সাড়ম্বরে অভিনীতও হয়। পরবর্তী সময়ে ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্র অনুবাদ ও মৌলিক নাটক মিলিয়ে প্রায় ২৩ নাটক এবং একটি নাট্যবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ লেখেন।

১৮৮১ সালে ভরতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের লেখা 'অন্ধের নগরী' নাটকটির অভিনয়ের সূত্র ধরেই কাশীতে বাঙালি সমাজের ধারাবাহিক নাট্যচর্চার সূত্রপাত। নাটকটির সম্পাদক পরমানন্দ শ্রীবাস্তব দাবি করেছেন যে, বাঙালি নাট্যসংস্থা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' দ্বারাই নাটকটি দশাশ্বমেধ ঘাটের অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত হয়। কিন্তু এই ন্যাশনাল থিয়েটার কলকাতার ন্যাশনাল থিয়েটার, নাকি কাশীরই কোনো নাট্যসংস্থা সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। তবে কাশীর সবচেয়ে পুরনো নাট্যসংস্থাগুলির অন্যতম যে 'হরিহর সমিতি' সে বিষয়ে নি:সংশয় হওয়া যায়। কেননা কাশীর গোদৌলিয়া কাছে দুধ সট্টির ঠিক পাশেই একটি পুরনো মহলের দরজায় এখনো 'হরিহর সমিতি'র বোর্ড ঝোলানো আছে। প্রতিষ্ঠার সালটি স্পষ্ট না হলেও, কাশীর পুরনো নাট্যব্যক্তিত্বদের কথানুযায়ী এই নাট্যসংস্থাটি যে উনিশ শতকের শেষ দিকের তাতে প্রায় প্রত্যেকেই একমত।[৩] উনিশ শতকেরই আর একটি পুরনো নাট্যদল 'বান্ধব সমিতি'র বিষয়েও খুব একটা তথ্য পাওয়া যায় না। কাশীর ঐতিহ্যবাহী মিত্র পরিবারেরও একটি পারিবারিক নাট্যদল ছিল এবং পারিবারিক অনুষ্ঠানে নিয়ম করে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ হত, সে খবর পাওয়া যাচ্ছে। [৪] ১৯৩৪ সালে বান্ধব সমিতি এবং মিত্র সমিতি দুটি নাট্যদল মিলে গিয়ে 'তরুণ সংসদ নামে নতুন উদ্যমে নাটক অভিনয় করতে থাকে। মূলত পৌরাণিক নাটক এবং গল্প উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয় করার প্রবণতা ছিল এই নাট্যসংস্থার। এক বছরের মধ্যে এই নাট্য সংস্থা 'তরুণ -মিত্র বান্ধব সম্মিলনী' নামে একটি বড় নাট্য সংস্থায় পরিনত হয়, যার সঙ্গে তৎকালীন বঙ্গদেশের গুণী মানুষজনেরও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের তৎকালীন উপাচার্য ক্ষিতিমোহন সেন এই নাট্যসংস্থার উপদেষ্টা ছিলেন বলেও শোনা যায়। কাশী নরেশের নিজস্ব সচিব ললিতবিহারী সেন এই নাট্যসংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। কাশী নরেশের নিজস্ব সচিব ললিতবিহারী সেনই নাট্যসংস্থার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। দশ বছরের গৌরবময় নাট্য-অভিনয়ের পর ক্ষিতিমোহন সেনের উপদেশ ও প্রস্তাবে এই নাট্যদল নাম পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্যোগী হয়। ১৯৪৮ সালে এই নাট্যসংস্থার নতুন নামকরণ হয় 'ললিত চক্র'।

১৯৪৮ সালে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয়ের সূত্রধরেই ললিতচক্রের পথ চলা শুরু। কাশীর বাঙ্গালীটোলা হাইস্কুলে অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে এই অভিনয় হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে থাকার কথা ছিল উত্তর প্রদেশের তৎকালীন রাজ্যপাল সরোজিনী নাইডুর। হঠাৎ অসুস্থতাজনিত কারণে তিনি উপস্থিত থাকতে না পারলেও কাশীর বিখ্যাত মানুষজনের উপস্থিতিতে অত্যন্ত সাড়ম্বরে অভিনীত এই নাটকটি কাশীর নাট্যমোদী মানুষজনের হৃদয় অধিকার করে নেয়। এই অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ললিত চক্র এক বছরের মধ্যে 'চন্দ্রগুপ্ত', 'গোলাম হোসেন', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'শিবু ডাক্তার', 'আবুল হাসান', 'দুই পুরুষ', 'বিংশ শতাব্দী' প্রভৃতি নাটক ললিত চক্রের ব্যানারে কাশীর বিভিন্ন রঙ্গামঞ্চে অভিনয় করায়। ললিত চক্রের নিজস্ব কোনো রঙ্গামঞ্চ ছিল না, এখনও নেই। মূলত সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা এবং বিভিন্ন অনুদান নিয়ে ললিত চক্র দশকের পর দশক সাফল্যের সঙ্গে নাটক অভিনয় করে চলেছে। ললিত বিহারী সেন, সুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চৌখাম্বার মিত্র পরিবার, রায়বাহাদুর অধর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অধ্যাপক ফণীন্দ্রচন্দ্র রায়, বলরাম মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চৌধুরী, সুনীল মুখোপাধ্যায়, সুকুমার চক্রবর্তী, সুধীর চক্রবর্তী, ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ঘটক, অনিল ব্যানার্জি প্রমুখ সদস্যরা বিশ শতকের ছ'য়ের দশক পর্যন্ত ললিত চক্রকে সক্রিয় রেখেছিলেন। চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের পর ললিত চক্রের নাটক অভিনয়ের মধ্যে প্রবল পেশাদারিত্ব আসে। ললিত চক্রের সক্রিয় সদস্য নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা সুকুমার চক্রবর্তীর অপূর্ব নাট্যাভিনয় কাশীর নাট্য পিপাসু মানুষজনের আগ্রহ ও অনুরাগের অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছিল। ললিত চক্রের অভিনেতাদের মধ্যে সুধীর চক্রবর্তীর নাম না করলেই নয়। শুরুতে 'তরুণ মিত্র বান্ধব সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। ১৯৩৪ সালে 'মানময়ী গার্লস স্কুল' দিয়ে তাঁর নাট্যজীবনের যাত্রা শুরু। তারপর ললিত চক্রের পথচলার প্রাথমিক পর্ব থেকেই যুক্ত ছিলেন তিনি। ললিত চক্রের নাট্য অভিনয়ের বিশেষ প্রবণতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পগুলির নাট্যরূপ অভিনয়ের একটা চল আগেও ছিল, এখনও আছে। সুধীর চক্রবর্তী এই নাট্যরূপ দেওয়ার বিষয়ে কুশলী ব্যক্তি। কাশীর অন্য আর একটি প্রাচীন নাট্যসংস্থা 'নাগরী নাট্যমণ্ডলী' ছ'য়ের দশকে একটি একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন, যেখানে চৌদ্দটি ভাষার চৌদ্দটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়েছিল বাঙ্গালিটোলার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। এই প্রতিযোগিতায় ললিত চক্রের 'ক্ষুধিত পাষাণ' এবং 'মহেশ' - এই দু'টি গল্পের নাট্যরূপ অভিনীত হয়, যা দর্শক এবং বিচারকদের দ্বারা সেরার সেরা নির্বাচিত হয়। দু'টি নাটকের অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলো ও আবহসঙ্গীত- ভিন্ন ভাষাভাষী দর্শকদেরও হৃদয় অধিকার করে নেয়। গফুর চরিত্রে সুধীর চক্রবর্তীর অনবদ্য অভিনয় তাঁকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার এনে দেয়।

কথিত আছে যে বাঙালির সেকেন্ড হোম কাশী। বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাশীতে কয়েক লক্ষ বাঙালির বাস ছিল। সেই বাঙালিদের একটা বড় অংশের সঙ্গো ছিল কলকাতা সংযোগ। ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার শিল্পী সম্প্রদায় যে কাশীর সঙ্গো বিশেষ অন্তরঙ্গা ছিলেন, সে প্রমাণ সত্যজিতের চলচ্চিত্র দেখলেই টের পাওয়া যায়। কাশীর বিবিধ নাট্যসংস্থা, বিশেষ করে ললিত চক্রের আমন্ত্রণে কলকাতার চলচ্চিত্র জগতের ও নাট্যজগতের একাধিক খ্যাতিমান অভিনেতা-অভিনেত্রী বহুবার কাশীতে এসে যৌথ অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন। বিশেষ করে শিশির কুমার ভাদুড়ি, তিনকড়ি চক্রবর্তী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ছবি বিশ্বাস, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, সাধন সরকার, তুলসী লাহিড়ি, শ্যামা লাহা, পদ্মশ্রী সরযূবালা দেবী, শমিতা বিশ্বাস, অহিন্দ্র চৌধুরী, পিনাকী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্ব ও চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা ললিত চক্রের ডাকে সাড়া দিয়ে বহুবার নাট্যবিষয়ক কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন এবং অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন। ললিত চক্রের ব্যানারে 'রত্নদীপ', 'সিরাজদৌল্লা', 'প্রফুল্ল', 'সাজাহান' প্রভৃতি ঐতিহাসিক নাটকের সফল অভিনয় কাশীর বাঙালি নাট্যচর্চার ইতিহাসে স্মরণীয় সংযোজন। শিশির কুমার ভাদুড়ির নির্দেশনায় 'গৈরিক পতাকা', 'ষোড়শী', 'দুই পুরুষ', 'আবুল হাসান' প্রভৃতির অভিনয় ললিত চক্রকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। ললিত চক্রের প্রযোজনায় তুলসী লাহিড়ির নির্দেশনায় তাঁর লেখা 'পথিক' নাটকের অভিনয়ের সূত্রধরেই থিয়েটার বিষয়ক প্রগতিশীলতার পথে ললিত চক্রের প্রথম অগ্রগমন। একথা বলতেও দ্বিধা নেই কাশীর বাঙালীদের তেমন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ছিল না, যে স্থায়ী মঞ্চে ধারাবাহিক নাট্যাভিনয়ের বন্দোবস্ত করতে পারে। সেক্ষেত্রে ললিত চক্র বা অন্যান্য ছোট বাঙালি নাট্যসংস্থাগুলি কোনো সাহিত্যিক বা মনীষীদের জন্মজয়ন্তী বা কোনো স্মরণীয় দিনেই নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করতেন। সেই নাট্যাভিনয়ে নারী চরিত্র পুরুষদেরই অভিনয় করতে দেখা যেত। আর এক্ষেত্রে ললিত চক্রেরই পরেশচন্দ্র গোস্বামীর নাম না করলেই নয়। মহিলা চরিত্রে তাঁর অভিনয় ছিল হৃদয় কাড়া। ১৯৬২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকে অপর্ণা চরিত্রে অনিমা ভট্টাচার্যের অভিনয়ের মাধ্যমে ললিত চক্র প্রথম নারী চরিত্রে নারীকে দিয়ে অভিনয় করান। পরবর্তী সময়ে একাধিক মহিলা অভিনেত্রীকে দিয়ে ললিত চক্র অভিনয় করিয়েছে। সুতপা চট্টোপাধ্যায় ললিত চক্রের সুদক্ষ মহিলা অভিনেত্রীদের অন্যতম ছিলেন।

ললিত চক্র ছাড়াও কাশীতে বাঙালিদের আর একটি প্রাচীন সংগঠন 'বারাণসী দুর্গোৎসব সম্মিলনী' পৃথকভাবে এবং ললিত চক্রের সঙ্গো যুক্ত হয়ে বেশ কিছু নাট্যাভিনয় করিয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল দু:স্থ পরিবারকে বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনকে অর্থ সাহায্য দান করা। ১৯৭৫ সালে এই বিশেষ উদ্দেশ্যে বনফুলের 'প্রচ্ছন্ন মহিমা' নাটকটির অভিনয় বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল বলে শোনা যায়। ললিত চক্রের নাট্যাভিনয়ের স্বাভাবিক

গতি ১৯৬৭ সালে থেকে ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। কেননা ললিত চক্রের সক্রিয় সদস্যরা বয়:বৃদ্ধিজনিত কারণে প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। এই সময় কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বিশ্বাস প্রমুখ নাট্যকর্মীরা ১৯৭৫ পর্যন্ত কোনোক্রমে ললিত চক্রের নাট্যাভিনয়ের ধারাটিকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। এই পর্বে 'ক্ষুধা', 'সংক্রান্তি', 'পরিণীতা', 'পান্থশালা', 'দৃস্টি', 'অন্ধকারের নীচে সূর্য' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়। ১৯৭৪ সালে কেদার বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'নাম নেই' নামে একটি অভিনয় ললিত চক্রের সদস্যদের মনে নতুন প্রাণের স্পন্দন এনে দেয়। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের ভাবনায়  উদ্বুদ্ধ সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকের এই অভিনয়ে দেবব্রত ভট্টাচার্য, প্রলয় ভট্টাচার্য, ভোলানাথ মুখার্জি, গৌতম মুখার্জি, বিজয় মুখার্জি, শৈল ভাদুড়ি, অমিতাভ চক্রবর্তী প্রমুখের নাট্যাভিনয় কেবল বাঙালি দর্শকদেরই নয়, পাশাপাশি অবাঙালি দর্শকদেরও অভিভূত করে তুলেছিল। কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় মঞ্চ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাশাপাশি সিরিয়াস নাটকে যেমন অভিনীত হচ্ছিল, তেমনি বেশ কিছু মজার কমেডি নাটকের অভিনয় কাশীর নাট্যামোদী দর্শকদের অভিভূত করেছিল। এ ক্ষেত্রে 'বড় পিসিমা' নাটকটির অভিনয়ের কথা অবশ্যই বলতে হয়। এই সময় দিবা রায়চৌধুরী, অপলা চ্যাটার্জি, আরতি মুখার্জি, শমিতা বিশ্বাস প্রমুখ অভিনেত্রীরা ললিত চক্রের গৌরবময় যাত্রার সহযাত্রী হিসাবে দর্শকদের থেকে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছিলেন। সাতের দশকের  শেষের দিকে প্রখ্যাত নট অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ললিত চক্রে এসে যোগ দেন। তিনি পূর্বে কাশীর অন্য আর একটি নাট্যসংস্থা 'নাগরী নাট্যমন্ডলী'র সদস্য ছিলেন।  শরৎ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ললিত চক্রের তৎকালীন সভাপতি ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির বৃহৎ আঙিনায় পর পর দু'দিন ধরে 'বিপ্রদাস' ও 'বিন্দুর ছেলে' - এর নাট্যরূপ অভিনীত হয়। দু'টি উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দেন অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। তাঁরই নির্দেশনায় এবং সহ-অভিনেত্রী হিসাবে এই নাটক দুটিতে অভিনয় করেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সরযু দেবী, শমিতা বিশ্বাসের মতো ব্যক্তিরা। ১৯৭৮ সালে ধ্রুবজ্যোতি বাবুর প্রয়াণে ললিত চক্র প্রাথমিকভাবে অভিভাবক শূন্য হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রাথমিক ধাক্কা সামলে মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার' নাটকের অভিনয়ের সূত্রধরে ললিত চক্র আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এই নাট্যাভিনয়ে মনে রাখার মতো বিষয় হল পূর্ণেন্দু ভট্টাচার্যের অপূর্ব আবহ সংগীত সংযোজনা।

১৯৭৯ সালে ললিত চক্রে যুক্ত হন কানু চৌধুরী। তাঁরই নির্দেশনায় ঐ বছর ললিত চক্র মঞ্চস্থ করে 'জীবন কাহিনী' নাটক। যেখানে অভিনয় করেন প্রলয় ভট্টাচার্য, সুধীন চ্যাটার্জি, কানু চৌধুরী এবং ললিত চক্রের অন্যান্য সদস্যরা। ঐ বছরই রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা' নাটকেরও সফল অভিনয় হয়। ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ১৯৭৯ সালেই ললিত চক্রের ব্যানারে আর একটি নাট্য প্রযোজনা 'গেটম্যান' অভিনীত হয়,

যার অভিনয় নিঃসন্দেহে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯৭৯ সালে বারাণসী দুর্গোৎসব সম্মিলনীর মঞ্চে মহানবমীর রাতে অভিনীত হয় ‘বায়েন’ নাটকটি। এই নাটকে ভবেন ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় অরুণ বোস, অমিতাভ ভট্টাচার্য এবং দীপালি বিশ্বাসের অভিনয় ছিল অত্যন্ত বাস্তবানুগ এবং স্বত:স্ফূর্ত। ১৯৮২ সালে ‘গেটম্যান’ নাটকটি ললিত চক্র পুনরায় অভিনয় করায় বাঙালিটোলা ইন্টার কলেজের প্রেক্ষাগৃহে। বাঙালিটোলা ইন্টার কলেজের প্রেক্ষাগৃহে ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত অন্তত দশটির বেশী একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয় ললিত চক্রের প্রযোজনায়। সেগুলির মধ্যে ‘হালদার গোষ্ঠী,’ ‘তাহার নামটি রঞ্জনা’, ‘চোখে আঙুল দাদা’, ‘চন্দ্রবিন্দু’, ‘পাখি’ নাটকগুলির অভিনয় বিশেষভাবে মনে রাখার মতো। এই ললিত চক্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ইরা চ্যাটার্জি, ছায়া রক্ষিত, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায় , তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, সুলগ্না ভট্টাচার্য, পবিত্র ব্যানার্জি, অরুণ বোস, ভানুভূষণ ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম না করলেই নয়। দুর্গাচরণ গার্লস্ ইন্টার কলেজের ‘সুপর্ণা মঞ্চে’ ললিত চক্র একাধিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের অভিনয় করিয়েছে। বিশেষ করে বিমল করের হাসির নাটক ‘ঘুঘু’র অভিনয় বহুদিন পর্যন্ত কাশীর দর্শকরা মনে রেখেছিল। এছাড়া ‘তেঁতুলগাছ’ নাটকটিও এই মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়, যেখানে দেবব্রত দাস এবং সমীর সুরের অভিনয় ছিল নিঃসন্দেহে অনবদ্য।

১৯৯৪ থেকে দক্ষ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভাবে ললিত চক্রে আবার একবার ভাঁটার টান শুরু হল। অবশ্য ১৯৯৭-এ তরুণ নট সঞ্জয় বিশ্বাসের ললিত চক্রে যোগদানের পর থেকেই ললিত চক্র আবারও পূর্ণ উদ্যম ফিরে পায়। ১৯৯৮ সালে ললিত চক্রের পঞ্চাশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় বাঙালিটোলা সংলগ্ন ময়দানে। যেখানে প্রথম দিন মনোজ মিত্রের একাঙ্ক নাটক ‘সত্যিভূতের গপ্পো’ অভিনীত হয় দীপক গুণের নির্দেশনায়। অন্যান্য অভিনেতাদের মধ্যে দেবব্রত দাস, অমর ভট্টাচার্য, সুজিৎ ঘোষ প্রমুখের অভিনয় ছিল স্মরণীয়। এই নাটকটি অভিনয়ের পরই ‘রূপকথার খোঁজে’ নামে আর একটি নৃত্যনাট্য অভিনীত হয় একই মঞ্চে। ঝুমুর সেনগুপ্তের রচনায় ও নির্দেশনায় এই নৃত্যনাট্য শ্যামার অভিনয়ও ছিল চমকপ্রদ। ডঃ গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনাও প্রবালমণি চট্টোপাধ্যায়ের সংগীত সংযোজনা ছিল এই নাটকের অনবদ্য আকর্ষণ। ২০০০ সালে ললিত চক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ডিসেম্বর মাসে বাঙালিটোলা ইন্টার কলেজের মাঠে অস্থায়ী মঞ্চে মনোজ মিত্রের একাঙ্ক ‘বাবুদের ডাল পুকুরে’ অভিনীত হয় দীপক গুণের নির্দেশনায়। এই নাটকটির মঞ্চায়নের পূর্বে অবশ্য অবনীন্দ্রনাথের ‘ক্ষীরের পুতুল’ নৃত্যনাট্যটি রূপা বাগচী ও বহ্নিকণা বিশ্বাসের পরিচালনায় অভিনীত হয়। ২০০১ সালে ললিত চক্র একাধিক নাটক মঞ্চস্থ করলেও, বার্ষিক অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত‘ একটি অবাস্তব গল্প’ নাটকটি অমর ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত

হয়। যেখানে অভিনয় করেন কেশবরঞ্জন মজুমদার, সীমান্ত চক্রবর্তী, সুদীপ ভট্টাচার্য, প্রলয় ভট্টচার্য, অরুনাভ বোস প্রমুখ। ২০০২ সালে গ্রীষ্মকালীন উৎসবে ললিত চক্র দুটি নাটক অভিনয় করায়— একটি নৃত্যনাট্য 'বুদ্ধুভূতম' এবং অন্যটি একাঙ্ক নাটক 'নবনাটক'। ২০০৩ সালের গ্রীষ্মকালীন উৎসব উপলক্ষে 'লাল-কমল নীলকমল ' নাটকটি এবং 'লাঠি' একাঙ্কটি অভিনীত হয়। তার আগের বছর শীতকালীন উৎসবে ললিত চক্রের প্রযোজনায় 'কাবুলিওয়ালা'র নাট্যরূপ অভিনীত হয়, যেখানে মুখ্য চরিত্রে প্রলয় ভট্টাচার্যের অভিনয় দর্শকদের বিমোহিত করে রেখেছিল। এটি ছিল নট ও নাট্যনির্দেশক প্রলয় ভট্টাচার্যের ২৩তম নাট্য - অভিনয়। এরপর আর সেই অর্থে তিনি অভিনয়ে অংশ নেননি। ২০০৩ সালে ললিত চক্রের সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন শ্রীমতি চন্দ্রা চক্রবর্তী। তিনিই ললিত চক্রের প্রথম মহিলা সভাপতি। দায়িত্ব নিয়েই তিনি সারা বছর একাধিক নাটকের অভিনয়ের বন্দোবস্ত করেন। তার মধ্যে অমর ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় বাদল সরকারের "বল্লভপুরের রূপকথা'র নাটকটির মঞ্চায়ন উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। নাটকটিতে অভিনয় করেছিলেন জয়দেব দাস, সত্যজিৎ ঘোষ, জহর সেনগুপ্ত, কেশবরঞ্জন মজুমদার, সুদীপ্তা ব্যানার্জি, কল্পনা ভট্টাচার্য প্রমুখ কুশলী অভিনেতারা। এ নাটকের মঞ্চায়নের পরই বহ্নিকণা বিশ্বাসের নির্দেশনায় 'রাঙামাটির পথে লো' নৃত্যনাট্যটির অভিনয়ও দর্শক মনে দাগ কেটে যায়।

২০০৪-২০১০ পর্যন্ত প্রত্যেক বছর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপলক্ষে ললিত চক্র কমপক্ষে ত্রিশটির বেশি নাটক মঞ্চায়ন করে। সেগুলির মধ্যে 'বশীকরণ', 'পূজারিণী', 'নিষ্কৃতি', 'চিত্রাঙ্গদা', 'ভিন্ন নারী ভিন্ন রূপ', 'সাজানো বাগান', 'দেবদাস' প্রভৃতি। 'দেবদাস' নাটকের মুখ্য চরিত্রে জয়দেব দাসের অভিনয় ছিল মনে রাখার মতো। এই সময় ললিত চক্রে কিছুটা অচলাবস্থা তৈরি হলেও তৎকালীন সম্পাদক সুলগ্না চ্যাটার্জির নিপুণ নেতৃত্বে ললিত চক্র আবারও ঘুরে দাঁড়ায়। তাঁরই সময়পর্বে শিশির কুমার ঘোষের 'খেলা' নাটকটির অভিনয় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। সুলগ্না চক্রবর্তী কাশীর বাঙালি তবুণদের মনে নাট্য উদ্দীপনা গড়ে তোলার প্রয়োজনে ২০০৭ থেকে ললিত চক্রে নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করলেন। এক মাসের প্রশিক্ষণ শেষে হিন্দি নাট্যকার ভরতেন্দু হরিশচন্দ্রের 'অন্ধের নগরী' নাটক অভিনয় করে নতুন শিল্পীরা দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়। এই নতুন নাট্যশিল্পীদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে ললিত চক্রের সক্রিয় সদস্য হয়ে যায়। মূলত এই নবীন নাট্যমোদী সদস্যদের দ্বারাই ২০০৮ সালে হীরকজয়ন্তী বর্ষে একাধিক নাটক অভিনীত হয় ললিত চক্রের ব্যানারে। সেগুলির মধ্যে 'আমিই কেন?' নাটকটির কথা অবশ্যই বলতে হয়। নাটকটি একটি হিন্দি নাটকের বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ করেন ললিত চক্রের তৎকালীন সাংস্কৃতিক সম্পাদক কল্পনা ভট্টাচার্য। কল্পনা ভট্টাচার্য বর্তমানে ললিত চক্রের সম্পাদক এবং উজ্জ্বল কুমার ব্যানার্জি সভাপতির পদে আসীন আছেন।

কোভিড পরবর্তী সময়ে ললিত চক্রের সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা ছিল একশোর কাছাকাছি। কিন্তু কোভিডকালে অনেক সদস্যদের মৃত্যু হলেও ললিত চক্র নিজস্ব ধারাবাহিকতায় কোনো ব্যাঘাত হানতে দেয়নি। লকডাউনের সময় সমস্ত কিছু বন্ধ থাকলেও ললিত চক্র অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছে সাবলীলভাবে। ভার্চুয়াল মাধ্যমে ললিত চক্রের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সারা বিশ্বের মানুষকে আনন্দ দিয়েছে। করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ২০১৯ সালে ১৫ ডিসেম্বর 'বিন্দুর ছেলে' এবং 'তবু মনে রেখো' নাটক দুটির অভিনয় নিঃসন্দেহে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা। ললিতচক্রের সক্রিয় সদস্য দেবনারায়ণ গুপ্তের দেওয়া 'বিন্দুর ছেলে' পূর্ণাঙ্গ নাটকটি শুভময় মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় একটি অনবদ্য নাট্যসন্ধ্যা উপহার দিয়েছিল কাশীর নাট্যমোদী মানুষজনকে। ১৯৪৮ থেকে ২০২২ সুদীর্ঘ ৭৪ বছরের নিরবচ্ছিন্ন পথচলা ললিত চক্রের জন্য খুব মসৃণ ভাবে হয়েছিল, এমনটা নয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা ললিতচক্রের পথচলার গতিকে শ্লথ করে দিয়েছিল। কিন্তু তারপরও ললিত চক্র যেভাবে তাঁর অগ্রগতিকে এখনও রক্ষা করে চলেছে, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বর্তমানে ললিত চক্র কেবল একটি নাট্যসংস্থা নয়। নাটকের অভিনয়ের পাশাপাশি বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ, বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কাশীর প্রবাসী বাঙালি সমাজের চেতনা ও মননকে ধারণ করে চলেছে। বর্তমানে কাশী নগরীতে এক লক্ষের অধিক বাঙালির বাস। বাঙালিদের একাধিক সংগঠনও আছে। কিন্তু ললিত চক্রের সংযোগ আগে যেমন ছিল, আজও সমানভাবেই বহমান। প্রবাসে থেকে বিভিন্ন প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করেও ললিত চক্র যেভাবে বাংলা নাটকের চর্চা এবং নাটক ও মঞ্চ নিয়ে পরীক্ষা -নিরীক্ষা করে চলেছে, তার ভূয়সী প্রশংসা না করলেই নয়।

*তথ্যসূত্র*

১) https://www/anandabazar.com/rabibashoriyo/%E0%A6%AC-%E0%A6%99-%E0%A6%B2-%E0%A6%9F-%E0A6%B2-1.84642
২) https://www.iloveindia.com/indian-heroes/bharatendu-harishchadra.html
৩) 'স্মরণিকা', ললিত চক্র হীরক জয়ন্তী বর্ষ, ২০০৮, সম্পাদক দেবাশিষ দাস, বারাণসি-১০
৪) ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, জুন ২০২২, জয়দেব দাস, নাট্যকর্মী, ললিত চক্র, বারাণসী

লেখক ঃ **ড. সুবীর ঘোষ,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী (BHU)

## প্রযোজনা বিন্যাস ও
# মঞ্চ স্থাপত্যের ভাবনা প্রয়োগে - বিসর্জন
### শান্তনু দাস

'বিসর্জন' নাটকটিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে একাধিকবার অভিনয় করেছেন। রবীন্দ্রজীবনীকারের মতে এই নাটকটি অভিনীত হয় সত্যেন্দ্রনাথের বাড়িতে অক্টোবর ১৮৯০ সালে। আবার প্রভাত গুপ্ত 'রবিচ্ছবি' বইয়ে এই নাটকের প্রথম অভিনয় লিখছেন ১৮৯০, জোড়াসাঁকো। অন্যদিকে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ' প্রবন্ধে ১৮৯০ সালে দুবার এই নাটকের অভিনয়ের কথা বলেছেন।প্রথম অভিনয় পার্কস্ট্রিট ও দ্বিতীয় অভিনয় জোড়াসাঁকো। কিন্তু ওই সময়ের কোনো পত্রপত্রিকাতে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়ের সংবাদ আমরা পাচ্ছি না। ফলত এই নাটকের সঠিক তারিখ ও স্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিসর্জন' অভিনয়ের স্মৃতিচারণায় বলেছিলেন, " এই বাড়িতেই (পার্ক স্ট্রীট) ত্রিপুরার রাজা বীরচন্দ্র মানিক্যকে 'বিসর্জন' নাটক দেখানো হয়; পুরনো সিন তৈরী ছিল সেই সব খাটিয়েই। আমাদেরও পার্ট মুখস্থ ছিল। রবিকাকা পার্ট নিয়েছিলেন রঘুপতির, অরুণদা জয়সিংহর, দাদা (গগনেন্দ্রনাথ) রাজার।" এই লেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল "পুরনো সিন তৈরী ছিল" এবং "আমাদেরও পার্ট মুখস্থ ছিল"। এই দুটি বাক্যে আমরা অনুমান করতে পারি যে, এর আগেও 'বিসর্জন' অভিনীত হয়েছে। নানান পত্রপত্রিকা ও রবীন্দ্রগবেষকদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারছি, 'বিসর্জন' নাটকটি কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে একাধিকবার মঞ্চস্থ হয়েছে। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজে রঘুপতির ভূমিকায় ও আরেকবার জয়সিংহের ভূমিকায়। মজার বিষয়, কম বয়সে তিনি রঘুপতির অভিনয় করলেন আর বেশি বয়সে এসে করলেন জয়সিংহের অভিনয়। দুবারই তাঁর অভিনয়ের প্রশংসার কথা আমরা জানতে পারি।

এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্যেও সময় অনুসারে পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি। ১৩০৯ সালে বঙ্গদর্শন(নবপর্যায়) পত্রিকায় প্রকাশিত 'রঙ্গমঞ্চ' নামক প্রবন্ধ থেকে মঞ্চশিল্প একটি বিশেষ ধারণা রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। যদিও সঙ্গীত সমাজ প্রযোজিত 'বিসর্জন' নাটকেও রবীন্দ্রনাথ মঞ্চসজ্জায় বিদেশি অনুকরণ রীতি বর্জন করতে পারেননি। এর কারণ হল সঙ্গীত সমাজে রবীন্দ্রনাথ কর্মকর্তাদের একজন মাত্র ছিলেন। তাই সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ ছিল না।

সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে 'বিসর্জন' (১৯০০) অভিনয়ের পর রবীন্দ্রনাথের পরিচালনায় ১৯২৩ -এ বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে এম্পায়ার মঞ্চে এই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন হয়। এইবারই তিনি জয়সিংহের অভিনয়ে মঞ্চে এলেন।

এইবার রবীন্দ্রনাথ তার নিজের মতো করে মঞ্চ স্থাপত্যের কাজ করলেন। সেই সময়ে'প্রবর্ত্তক' বলে একটি মাসিক পত্রিকাতে 'বিসর্জন' নাটকের মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে আমরা উল্লেখ পাই, " ... দৃশ্য একটি — ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির দ্বারের সম্মুখস্থিত চত্বর ও মর্ম্মর সোপানাবলি; তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থানের চিত্র নাই, back cloth ঘন নীলবর্ণ দিগন্ত বিস্তারী আকাশের মত। মন্দির বা মন্দির মধ্যস্থিত দেবীর মূর্ত্তি দর্শকের দৃষ্টির বাহিরে। কিন্তু তাঁরা কল্পনা-চক্ষুর বাহিরে নহে। দৃশ্য অত্যন্ত অনাড়ম্বর, কিন্তু অত্যন্ত suggestive এই অনাড়ম্বর দৃশ্যপটের মধ্যে সমস্ত নাটকখানির অভিনয় দেখিয়া অবনীন্দ্রবাবুর 'আলমগীর' ছবিখানির কথা মনে পড়ল...। এই অনাড়ম্বর দৃশ্যপটের সমক্ষে, তিনটি দিনের সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে , এক অপূর্ব রসে মূর্ত্ত হইয়া অবিরাম গতিতে বহিয়া গেল—।"

২৫ অগস্ট ১৯২৩ সালে 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ'—এ 'বিসর্জন' অভিনয়ের সংবাদে বলা হয়েছে— "The stage fittings and decorations as well as the costumes are announced to be quite novel. The execution of the idea of the brothers Gaganendranath and Abonindranath in these matters is in the hands of two of their worthy pupils- messrs Nandalal Bose and Surendranath Kar."
'বিসর্জন' -এর এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ মঞ্চস্থাপত্যের বিষয়ে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সহযোগিতা ভীষণভাবে পেয়েছিলেন। এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্যের যে বর্ণনা আমরা পাচ্ছি তাতে গগনেন্দ্রনাথের ভাবনাই স্পস্ট হয়ে ওঠে।— " পিছন দিকে ক্রমিক গাঢ় নীল রঙের কাপড় দিয়ে মঞ্চ সাজানো হয়, দৃশ্যান্তর বর্জন করা হয়। কিউবিস্ট রীতিতে বিন্যস্ত রক্ত লাঞ্ছিত মন্দির সোপানের আভাস আর উইংসের আড়ালে একটি উজ্জ্বল লাল আলো দিয়ে মন্দিরের আভাস তৈরী করা হয়েছিল।" এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে, এই মঞ্চস্থাপত্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের মঞ্চভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। The staging of Rabindranath's Visarjan' — এই শিরোনামে বিশ্বভারতী কোয়ার্টারর্লিতে প্রকাশিত এক আলোচনাতেও আমরা মঞ্চস্থাপত্যের বর্ণনা পাচ্ছি— "The stage was draped throughout in different shades of dark blue, deepening as they receded into the background There was no changing of scene; the blood-stained temple steps, designed in Cubist fashion, dominated the stage throughout, a lurid red light marked the entrance to the Temple itself, invisible in the darkness beyond the wings; ... The other stage accessories, requisitioned to assist in the in-

terpretation, were in colour schemes of the costumes in combination with changing light effects against the dark blue of the hanging symbolic of the play of samsara on the continum of Mahakala.”

‘বিসর্জন’-এর মঞ্চস্থাপত্য, আলোর ব্যবহার ও সাজসজ্জা নিয়ে রাণু মুখোপাধ্যায় লিখছেন, “রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সকল কিছুর কান্ডারী, কাজেই রূপ বিন্যাস, মঞ্চ কেমন হবে সে বিষয়ে প্রাথমিক রঙিন স্কেচ করে অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন নিতে হত। ঠিক পাত্র পাত্রীর বেশভূষা, মেক-আপ, মঞ্চ কেমন হবে তেমনটির character sketch সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত মতামত নিয়ে আসল কাজ আরম্ভ হত। ... এর ফলে এক জাতীয় নাট্য উপাদান সম্বলিত চিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সমস্ত চিত্র নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাট্য রূপায়নে নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে। ১৯২৩ সালে অভিনয় উপলক্ষে কমপক্ষে ছয় ডজন এ জাতীয় খসড়া প্রস্তুত হয়েছিল।”

১৯২৩ সালের ২৫ অগস্ট বিখ্যাত নট, পরিচালক ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু ‘বিসর্জন’-এর অভিনয় দেখে ‘ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজ’-এ একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। ওই পত্রের অধিকাংশটাই অভিনয় নিয়ে লেখা, কিন্তু তার মধ্যে মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে দুটি লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখছেন— “ The play succeeded without any external aid. It was one continuous current of acting without division into scenes or acts, no display of colour in wings, borders or back scene. One looked on the nautrallinted cloth before one’s eyes, and imagination did the rest.” এই দুটি লাইনের মধ্যে দিয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথের ‘রঙ্গমঞ্চ’ প্রবন্ধ স্মরণে চলে অসে। যেখানে তিনি বার বার দৃশ্যপটের বাহুল্য বর্জন করতে বলেছেন এবং তার পাশাপাশি ‘মঞ্চমায়া’ -র মোহও ত্যাগ করতে বলছেন। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন দর্শক তার নিজের কল্পনাশক্তির দ্বারা দৃশ্যপটের অভাব পূরণ করুক। রবীন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় পর্বের ‘বিসর্জন’-এর মঞ্চায়নের মধ্যে দিয়ে তার নিজের লেখা ‘রঙ্গমঞ্চ’ প্রবন্ধের সারকর্মের হাতেকলমে প্রয়োগ করলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই ‘বিসর্জন’ নাটকটির একটা বিশেষ আকর্ষণী ক্ষমতা আছে, সেটা যেমন পাঠকদের আকর্ষণ করে আবার নাট্য নির্দেশকদেরও আকর্ষণ করে। সেই কারণেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকা অবস্থাতেই বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়েও এই নাটক অভিনীত হয়েছে। ২৬ জুন ১৯২৯ তারিখে নাট্যমন্দিরে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় ‘বিসর্জন’ নাটকের সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম মঞ্চায়ন হয়। দর্শকসাধারণ ও সমালোচকদের কাছেও এই নাটক প্রভূত প্রশংসা পেয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রথম ‘বিসর্জন’ নাটকের খবর আমরা পাচ্ছি ১৯৫১ সালে। গণনাট্য সংঘ নাটকটি প্রযোজনা করে

উৎপল দত্তের পরিচালনায়। মঞ্চস্থাপত্য , পোশাক পরিকল্পনা ইত্যাদির দায়িত্বে ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। এই নাটকটি কেমন হয়েছিল সেই সম্পর্কে পরিচালক উৎপল দত্ত বলেন, "রিচার্ড দ্য থার্ড ছাড়া এরকম জঘন্য প্রযোজনা আমি জীবনে আর করিনি। " এরপর শম্ভু মিত্র থেকে বিভাস চক্রবর্তী, সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায়, অশোক মুখোপাধ্যায় ও সুমন মুখোপাধ্যায় অনেকেই 'বিসর্জন' নাটকের পরিচালনা করেছিলেন। প্রতিটি প্রযোজনাই খুব যে দর্শকদের মন পেয়েছিল, এমনটা নয়। তবে প্রতিটি প্রযোজনাতেই কিছু -না-কিছু উল্লেখযোগ্য দিক ছিল।

১৯৫১ সালের গণনাট্যের 'বিসর্জন' সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারি না। এরপর ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মোৎসব বছরে বহুরূপী নাট্যদল প্রযোজিত ও শম্ভু মিত্র পরিচালিত 'বিসর্জন' নাটকের মঞ্চায়ন হয়। এই নাটকের প্রথম মঞ্চায়ন হয় দিল্লীর আইফ্যাক্স মঞ্চে। এই নাটক প্রসঙ্গে কুমার রায় লিখছেন— "বিসর্জন আগের লেখা এবং কাব্যে লেখা। বহুরূপী প্রথমাবধি কবিতা আবৃত্তির ওপর জোর দিয়েছিল শ্রী শম্ভুমিত্রের নির্দেশনায়। সেখানে, ছন্দবোধ, কণ্ঠস্বরের পরিমার্জনা, উচ্চারণ এবং অর্থপ্রকাশের ওপর যে চর্চার মূল উদ্দেশ্য নিরুপিত হয়েছিল। সেই চর্চার ফসল উঠল বিসর্জনের অভিনয়ের মধ্যে। প্রত্যেক নাটক মঞ্চে উপস্থাপনার সময় সে নাটকের আমাদের ব্যাখ্যা কী সেটা পরিষ্কার করা হয়েছে। তবু শম্ভু মিত্রের ভাষায় প্রত্যেকবার মরা, আবার বেঁচে ওঠা। আগেরবারের অভিজ্ঞতায় দাগা বুলোনো নয়। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার শম্ভু মিত্র তাঁর আগের করা রবীন্দ্র প্রযোজনা থেকে 'বিসর্জন'কে ভিন্নতর করে তুলতে চাইছিলেন।" দিল্লীর অভিনয়ের পর স্টেটসম্যান পত্রিকা লিখল " But it is not in individual performance that Visarjan deserves the highest praise. Its claim to wider recognition is that Sambhu Mitra is doing the same kind of work on Bengali stage as Satyajit Ray is doing on the Bengali screen; .... is not praising Sambhu Mitra too much, ... The importance of dialogue in most plays limits some what the appeal of Bohurupee production to the non-Bengali audience. " এই আলোচনার শেষের দুটি লাইন থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার শম্ভু মিত্র এই প্রযোজনায় সংলাপের ওপর ভীষণ জোর দিয়েছিলেন। অনুমান করা যায়, 'রক্তকরবী' বা 'মুক্তধারা'র মতো ইলাবোরেট মঞ্চস্থাপত্য এই নাটকে তিনি বর্জন করেছিলেন। ফলত দর্শকদের সাথে নাটকের যোগসূত্রসাধনের মূল হাতিয়ার ছিল সংলাপ।

এরপরের 'বিসর্জন' নাটকের প্রযোজনা আমরা পাই বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায়। ১৯৮৪ সালে থিয়েটার ওয়ার্কশপ এই নাটকের প্রযোজনা করে। নাটকটি দর্শক ও সমালোচকদের কাছে একেবারেই গ্রহণীয় হয়নি। তবুও এই প্রযোজনায় 'বিসর্জন'কে এক

নতুনভাবে দেখবার চেষ্টা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী লিখেছেন, "আমি মনে করি একজন শিল্পী বা শিল্পী গোষ্ঠীর কাজই হচ্ছে নিজেকে একই ধারা বা বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সেই সীমাটাকে বাড়িয়ে তোলা।... আমরা বিশেষ করে পরীক্ষামূলক নাট্যগোষ্ঠীগুলো— আমরাতো ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে তাকিয়ে থিয়েটার করি না। আমরা থিয়েটারের মাধ্যমে কিছু বলতে চাই এবং যে মাধ্যমটা অবলম্বন করে সেটা বলতে চাই, সেই মাধ্যমটাকেও সমৃদ্ধ করে তোলাটা আমাদের একটা কাজ বলে মনে করি।" ফলত পরিচালকের কথার মধ্যে দিয়ে এটা পরিষ্কার যে, তিনি নাটক প্রযোজনা করার সময় বিষয়বস্তু ও শৈলীকে জোর দিতে চান এবং প্রতিবারই নতুন বিষয়বস্তু ও শৈলীতে কাজ করতে উৎসাহিত বোধ করেন। এর ফলে একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। কিন্তু তিনি এই গ্রুপে থিয়েটারি আদর্শের মধ্যে দাঁড়িয়ে এই নতুন শৈলীর সন্ধান করতে চান। বাজারকে তিনি অস্বীকার করছেন।

বিভাস চক্রবর্তী তার নাটক 'বিসর্জন' -এর নাট্যপাঠ প্রস্তুত করেছেন তিনটি রবীন্দ্রনাটককে নিয়ে, যথা— 'স্যাক্রিফাইস', 'বিসর্জন' এবং 'রাজর্ষি'। তিনটি নাটকের ধরণ তিন রকম। এই তিনটিকে মিলিয়ে নাম হল 'বিসর্জন'। কেন এই নামকরণ এই বিষয়ে বিভাস চক্রবর্তী বলেন, " আমরা 'রাজর্ষি' এবং 'স্যাক্রিফাইস ' থেকে নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের স্ট্রাকচার, যেটা মাথায় ছিল এবং যেটা অনুসরণ করছি, সেটা 'বিসর্জন'।" এই প্রযোজনার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তিনি লিখেছেন— " ধর্ম কেন, কেন তার বিভিন্ন rituals, জীব বলি যার একটি প্রধান অঙ্গ— তার সঙ্গত ব্যাখ্যা রঘুপতির কাজের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিছু কিছু যুক্তি দেয়; কিন্তু তা আধুনিক মানুষের যুক্তিবোধকে ছুঁয়ে যায় না। এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে, যাকে বলা যায় religious bureaucracy অর্থাৎ সে মনে করে, যে ধর্ম থেকে সে তার শক্তি পেয়েছে এবং এই ধর্মকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যস্ত আছে। ধর্মের মূল কথা কী, কেন এই আচার-বিচার, কেন ধর্মের সৃষ্টি কী সে রক্ষা করছে— এগুলোর থেকে তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায় সেই ধর্ম, যা তাকে ক্ষমতা দিয়েছে, সেটা রক্ষা করা। তাই আমরা 'বিসর্জন'-এ দেখি রঘুপতি নিজেকে দেবতার প্রতিভূ ভেবেই ধরে নিয়েছে যে, সে যা বলবে, সেটা দেবতারই মুখ নিঃসৃত বাণী, এবং সেই অনুযায়ী কাজ করাই হচ্ছে বিধিসম্মত। ধর্মীয় তত্ত্ব— যা প্রচার করার জন্যে সে জন্মেছে বলে মনে করে — তার চেয়েও সে এইখানে নিজে বড় হয়ে দাঁড়ায়।" পরিচালক বিভাস চক্রবর্তীর কথায়, এই নাটকটিকে পূর্ববর্তী কোনো পরিচালকই দর্শকদের মনোগ্রাহী করে তুলতে পারেনি। তার মূল কারণ এই নাটকের কাব্য। তিনি লিখছেন— " নাটকের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা থিয়েটারের ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এক এক সময়ে মনে হয়েছে, নাটকটার কাব্যই কি এর জন্য দায়ী? মূল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি না গিয়ে তার কাব্যিক সংলাপে কি সম্পর্কের বোধ আচ্ছন্ন হয়ে যায়?" — ফলত বিভাস চক্রবর্তী এই নাটকের কাব্য সংলাপটা গদ্যনাট্য করে পরিবেশন করেন। ওঁর বিশ্বাস

ছিল গদ্যে হয়ত এই সংলাপের তীক্ষ্ণতা বাড়বে। নাটকীয় সংঘর্ষগুলো বেশ জমে উঠবে এবং লোকের কাছে পৌঁছাতে পারে।

এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন— "পরিচালক হিসাবে তাঁর প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল কালী মন্দিরটা মঞ্চের কোথায় রাখবেন? যদি কালীমূর্তি' তথা মন্দিরটি মঞ্চের পেছনে অর্থাৎ আপ স্টেজে রাখেন তাহলে অধিকাংশ সময়ই সব অভিনেতা ব্যাক টু দ্যা অডিয়েন্স হয়ে যাবে। কারণ এই পাঠকের বহু দৃশ্য আছে মন্দিরে কালী মায়ের সাথে চরিত্রের কথা বলছে। তাহলে উপায় মঞ্চের ডান বা বাঁ দিকে রাখা। " বিভাসবাবুর কথায়, "অদ্যবধি যত 'বিসর্জন' হয়েছে তাতে কালী মন্দিরকে মঞ্চের ডান বা বাঁদিকে রাখা হয়েছে। এখানেও অভিনেতা প্রোফাইল। আমরা তাদের ফ্রন্ট পাচ্ছি না। " এই ভাবনা থেকে উনি কালী মন্দিরকে কল্পনা করলেন দর্শকদের দিকে বা দর্শকের মধ্যে। মঞ্চের সেন্টার ডাউনে একটি ছোটো প্লাটফর্ম ব্যবহার করলেন, যাকে মনে করা হল মন্দিরের বেদি। ফলত অভিনেতারা মা কালীর দিকে তাকিয়ে কথা বললেই সেটা দর্শকদের দিকে তাকানো হয়। এই ভাবে অভিনেতারা কখনোই 'ব্যাক টু দ্যা অডিয়েন্স' বা 'প্রোফাইল' হবার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হল। বিভাস চক্রবর্তী গোটা মঞ্চটাই ফাঁকা রেখেছিলেন। শুধু ওই ছোট্টো প্লাটফর্মটি ছাড়া আর সেভাবে কিছুই ছিল না। শুধু প্রয়োজন অনুসারে কিছু মঞ্চ উপকরণ আসত আবার চলে যেত। এই পরিকল্পনাতে পরিচালক বিভাস চক্রবর্তীর শিল্পীমন পুরোপুরি সায় দিচ্ছিল না। উনি কিছু একটা খুঁজছিলেন। তাই তিনি এই সময় খালেদ চৌধুরীর স্মরণাপন্ন হন। এই প্রসঙ্গে অশোক মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "খালেদদাকে প্রথম কাছ থেকে দেখি উনিশশো চুরাশিতে। আমরা তখন 'বিসর্জন' করছি। বা বলা ভালো, বিসর্জন নিয়ে এক বিচিত্র পরীক্ষায় মত্ত হয়েছি। প্রযোজনা প্রস্তুতি যখন শেষপর্বে, একদিন সকালে একাডেমিতে স্টেজ রিহার্সলে খালেদদা এলেন নির্দেশক বিভাসের আমন্ত্রণে। তখন উনি খুব অসুস্থ। রিহার্সাল দেখে শুধু বলে গেলেন পশ্চাদমঞ্চে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত লম্বা তিনটি পর্দা ঝুলিয়ে দিতে — তিন রঙের তিনটি পর্দা— তিনটি বিশাল থামের মতো— যাতে বিসর্জন নাটকের তিনটি মূল সত্যের প্রতীক আঁকা থাকবে। তাই করা হয়েছিল। আমাদের প্রযোজনাটি , তার নানা ইন্টারেস্টিং নিরীক্ষা সত্বেও তেমন উতরোয়নি। কিন্তু ওই প্রযোজনার যে দু-একটি ব্যাপার দারুণ হয়েছিল তার মধ্যে একটি ওই তিনটি পর্দা। যাকে বলে মাস্টারলি স্ট্রোক। গোটা মঞ্চসজ্জা ওই শেষ মুহূর্তের ছোঁয়ায় প্রাণ পেয়েছিল, ভাষা পেয়েছিল। হাতে কলমে বুঝেছিলাম, কতো বড়ো শিল্পী তিনি, কী বিরাট ও বিচিত্র তাঁর কল্পনা।"

অশোক মুখোপাধ্যায়ের এই লেখা থেকে আমরা এই প্রযোজনার একটা পরিষ্কার মঞ্চস্থাপত্যের চিত্র পাই। বিভাস চক্রবর্তী শুধু হরাইজেন্টাল স্পেসটাকেই দেখছিলেন। ওঁর ভাবনাতে ভার্টিক্যাল স্পেসের কোনো প্রকাশ আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না। খালেদ চৌধুরী

এই অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করে দিলেন, যা কিনা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল। খালেদ চৌধুরী শুধু রেখাই নয়, সাথে রংও যোগ করেছিলেন। আর এখানেই 'বিসর্জনে'র মঞ্চস্থাপত্য অসামান্য হয়ে ওঠে।

এর পরবর্তী 'বিসর্জন' প্রযোজনাগুলি সম্পর্কে আমাদের কাছে বিশেষ তথ্য নেই। এরপর রবীন্দ্রজন্ম-সার্ধশতবর্ষে তৃতীয় সূত্রের প্রযোজনায় এবং সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'বিসর্জন'। এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্যের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সঞ্চয়ন ঘোষ। প্রযোজনাটি দর্শকসাধারণের মধ্যে খুব সারা ফেলেছিল। তার অন্যতম কারণ তৎকালীন কিছু নামকরা অভিনেতা একসাথে একই মঞ্চে অভিনয় করেন এবং সেইসঙ্গে এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য।

এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে সঞ্চয়ন ঘোষ লিখলেন, "বিসর্জন নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার শুরুতে প্রসেনিয়ামের ডেপথ্—এর যে ইলিউশন পারস্পেকটিভ মেনে ভাবা আছে তাকে অস্বীকার করা হয়। প্রসেনিয়ামের ডেপথ্কে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়— মন্দিরের ভিতর ও বাহির। মন্দিরের ভিতরে বিশ্বাস ও বাইরে রাজতন্ত্র। এইরকম একটি স্থান-বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে বিসর্জনের মূল সংঘাতকে ধরা হয়েছিল। আর এই দুই স্থানের অন্তবর্তী স্থল হিসাবে চিহ্নিত ছিল একটি অতিমাত্রায় দেশীয় ডায়াগোনালি প্লে পায়ের অংশ যা জমির থেকে উর্ধ্বমুখী হয়ে থেকে গেছে। যেন এই বুঝি পদপিষ্ট করবে কাউকে আর মন্দিরের বিশাল দরজার ফ্রেমের সামনে থেকে প্রায় প্রসেনিয়াম মঞ্চের প্রস্থ অনুযায়ী নেমে গেছে একটি বিশাল ঢালু অংশ যেখানে কেউ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সেই ঢালের এক পাশে মায়ের পাশের বিপরীতে রাখা অছে একটি ভাঙা পিলার, অনেকটা ভেঙে যাওয়া রাজস্তম্ভের মতো। মন্দিরের দরজা থেকে গড়িয়ে পড়া এই বিশাল ঢাল জমিতে মেশার আগে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এমনভাবে, দূর থেকে দেখলে এই ঢালটি মনে হবে যেন একটি ওল্টানো হাঁড়িকাঠি।"

অন্যদিকে এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে দেবেশ চট্টোপাধ্যায় লিখলেন— " পর্দা খুললে মঞ্চের যে ভিস্যুয়াল 'পিক শিফট' সুমন ঘটিয়েছে তা শুরুতেই হিউম্যান ব্রেনে ইমপ্যাক্ট তৈরী করে। ... যে নত তলটি দর্শকের দিকে নেমে আসে এবং যে বিশাল পা টি উল্টোদিকে অর্থাৎ উপরে উঠে যাওয়ায় আপনি তার নীচের অংশ দেখতে পান এই দুটিই প্রযোজনায় ভিস্যুয়াল ইউ.এস.পি.। পাশ থেকে দেখলে এরকম একটা লাইন ড্রয়িং করা যায়।

" ফলে অনবরত স্পেসের একটা চাপ আপনাকে গিলে খাবে। ফলে স্লোপে যখন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা হাঁটবেন, বসবেন, শুয়ে থাকবেন, দাঁড়াবেন— তখন ইমেজগুলোর পিকশিফট্ ঘটবেই কারণ আপনার মগজে ঐ স্পেসের একটা আনসার্টেনইটি তৈরী হবে।

অভিনেতারা এই স্পেসে আনস্টেবল, ফলে এই আনস্টেবিলিটি বাড়িয়ে তুলবে, যেটা এই নাটকের মূল বিষয়কে একটা অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেবে। বিষয়টি হলো— হিংসা।"

এই দুটি আলোচনার মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস খুব পরিষ্কার: পরিচালক ও মঞ্চ পরিকল্পক চেয়েছিলেন মঞ্চস্থাপত্যের মধ্যে দিয়ে শুরুতে একটা ধাক্কা দিতে। সেই ব্যাপারটিতে ওঁরা যে সফল, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে তা পরিষ্কার। মঞ্চের ডানদিকে ওইরকম একটি বিশাল পা, যেটা আবার কৌণিকভাবে রাখা আছে আর গোটা মঞ্চটির মূল অভিনয়ের জায়গাটা একটা স্লোপ বানানো হয়েছিল। ফলত পর্দা খুলতেই দর্শক একটা ধাক্কা খায় বটে। তবে এই নাটকে যেহেতু কোনো দৃশ্য ভাগ বা অঙ্ক ভাগ নেই কিংবা পরিচালকও রাখেননি এবং মঞ্চ পরিকল্পকও তার স্পেসকে ওইভাবে ভাগ করেননি। ফলত নাটকের সেটটি কিছুক্ষণ বাদে স্ট্যাটিক আকারে থেকে যায়। নাটকের প্রয়োজন অনুসারে যে বিভিন্ন স্পেস তাকে আমরা হারাতে শুরু করি। বা এই মঞ্চ পরিকল্পনাটি beyond কালীবাড়ি হয়ে ওঠে না। চরিত্রদের সাথে মঞ্চস্থাপত্যের সম্পর্ক তৈরি না হবার ফলে খানিক বাদে এই সেটটি ভারী লাগে আমাদের কাছে; অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। শুরুর ভিস্যুয়াল ইমপ্যাক্টের ধাক্কায় নাটকটা হারিয়ে যায় অনেকটা। খানিক বাদে এই ভিস্যুয়াল যখন অর্থহীন হয়ে পড়ে, তখন আমাদের মন নাটকে ঢুকতে চায়। ততক্ষণে নাটক অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ফলত এই মঞ্চস্থাপত্য দেখতে খুব ভালো লাগলেও খানিক বাদে তা অচল হয়ে পড়ে।

এই নাটকে মঞ্চস্থাপত্যে কিছু এলিমেন্ট বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে সঞ্চয়ন ঘোষ লিখেছেন, " সুমনদার সঙ্গে আলোচনার সময় কয়েকটি এলিমেন্ট বারবারই আলোচিত হয়েছিল — রক্তাক্ত বলির বেদী, গড়িয়ে পড়ছে রক্ত আর মৃত্যুর বীভৎসতা এই প্রযোজনার একটা বিশেষ অংশ হিসাবে নির্দেশিত হবে। সেই সূত্রে মন্দিরের দেওয়ালের মতো যে ব্যাকড্রপটা করা হয়েছিল সেটা সেমিট্রান্সপারেন্ট এ্যাক্রাইলিক কাপড় টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছিল দরজার লাইন বরাবর এবং তাতে চাপা গাঢ় লাল রঙ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যা ঝরে পড়া রক্তের মতো নেমে এসেছিল চকমকে এ্যাক্রাইলিক কাপড়ের গা বেয়ে। দরজার ধার ধরে দেবীর পায়ের যে বিশাল অংশ ঢালের উপর আছড়ে থাকত তাতে গাঢ় নীল রঙ করা ছিল আর গায়ে জড়ানো ছিল অজস্র লাল দড়ি মানতের মতো। নাটকের মাঝে মাঝেই পুরোহিত ওই পায়ের সামনে বসে নিজের মনে স্বগতোক্তি করত। মঞ্চের একদম পিছনে কোনাকুনি বরাবর থান কাপড় দিয়ে একটা ডায়াগনাল ক্রুশ করা থাকত যার ফলে একভাবে রিচ্যুয়াল ও অন্ধবিশ্বাসের বীভৎসতাকে নির্দেশ করা হয়েছিল।"

এই নাটকের মঞ্চস্থাপত্য নিয়ে বিভাস চক্রবর্তী লিখলেন, " সঞ্চয়ন ঘোষের মঞ্চপরিকল্পনায় মন্দিরগাত্রে এবং চত্বরে রক্তের আবছা ছোপছিটে গোটা নাট্যের পটভূমি নির্মাণ করে অমোঘভাবে। মঞ্চে পূর্ণাবয়ব দেবীমূর্তির পরিবর্তে চাতালের ডানপাশে একটি

বিশালাকৃতি অসিতবর্ণ পা এবং রক্তসিক্ত পদতল স্থাপনা করে সঞ্চয়ন রঘুপতির সেই হিংস্র উচ্চারণ যেন মূর্ত করে তোলেন;'মহাকালী কালিস্বরুপিনী, রয়েছেন দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি— বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা ফেটে পড়িতেছে, নিস্পেষিত দ্রাক্ষা হতে রসের মতন , অনন্ত খপ্পরে তাঁর —।' আমাদের মাথার ওপরে যেন এক অদৃশ্য খাঁড়া ঝুলছে, হিংসা বা হিংস্রতা যেন আমাদের মানবিক বোধসমূহকে পদতলে পিস্ট করছে এবং অসহায় আমরা তার কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছি— এরকম একটা অনুভূতি সর্বক্ষণ তাড়া করতে থাকে। নাট্যঘটনা যা কিছু ঘটে মঞ্চতল থেকে খানিকটা উঁচুতে তৈরী দর্শকের দিকে ঢালু চত্বরের ওপর। দর্শকের জন্য কি একটা সিনেমাটিক অ্যাঙ্গোল তৈরী করে দিলেন সুমন সঞ্চয়ন ?"

এখানেও মঞ্চপরিকল্পক সঞ্চয়ন ঘোষের লেখা ও বিভাস চক্রবর্তীর লেখার মধ্যে নাটকের এলিমেন্টগুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। খুবই সংগত কারণেই রক্তাক্ত বলির বেদি, গড়িয়ে পড়া রক্ত আর মৃত্যুর বীভৎসতা। এই তিনটি বিষয়ই খুব ভালোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে চাই, রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার যখন 'বিসর্জন' প্রযোজনা করছেন তখন তিনি পিছনে অঙ্কিত দৃশ্যপট বাতিল করে সাজেস্টিভ ভাবনায় মঞ্চপরিকল্পনা করেছেন। সেই মঞ্চস্থাপত্যের বর্ণনাতে আমরা পাচ্ছি— " কিউবিস্ট রীতিতে বিন্যস্ত রক্তলাঞ্ছিত মন্দির সোপানের আভাস আর উইংসের আড়ালে একটি উজ্জ্বল লাল আলো দিয়ে মন্দিরের আভাস তৈরী করা হয়েছিল।" অর্থাৎ গগনেন্দ্রনাথের মঞ্চভাবনাতেও এলিমেন্ট হিসাবে রক্তাক্ত মন্দির চত্বর ও মন্দিরের আভাস একটি লাল আলোর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

সঞ্চয়নের মঞ্চস্থাপত্যের প্রশংসাসূচক লেখার মধ্যে ও বিভাস চক্রবর্তী নাটকের একটি মূল স্পেস সেটাকে অনেকটা উঁচুতে এবং একটা খাড়া ঢাল তৈরি করা হয়েছিল যেটা আমাদের নাটকটা দেখতে বা অভিনেতাদের চলাফেরাতে নানা অসুবিধা তৈরি করেছিল— সেটাকে বিভাসবাবু 'সিনেমাটিক অ্যাঙ্গোল' বলে প্রশ্ন করলেন। ফলত আমরা বুঝতে পারি, এই স্পেসটার কেন এইভাবে তৈরি হল সেটা বিভাসবাবুর মতন দর্শকের কাছেও পরিষ্কার হয় না। অর্থাৎ সঞ্চয়নের ভাবনায় এই ঢালটি যে একটি ওলটানো হাঁড়িকাঠ তা আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে না।

রবীন্দ্রনাটকের এই ধরনের ভিন্ন পাঠ যে সব সময় আমাদের নাট্য আলোচকদের প্রশংসা পেয়েছে এমনটা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই বিরূপ মন্তব্যও পাওয়া গেছে। The Telegraph পত্রিকাতে আনন্দলাল Unfaithful Interpretations নামক প্রবন্ধে বিসর্জন নিয়ে লিখেছেন— " Sanchayan Ghosh's symbolic set of the goddess's gigantic foot renders the mise in scene too static, and the steep gradient placed on the

floor has ridiculous results because the actors taks turns to roll down its slope like kids. They also never miss an opportunity to ring the temple bell dangling from the top.এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি, মঞ্চপরিকল্পক ও পরিচালক নাটকের স্পেসটাকে যেভাবে দেখতে চাইছেন যা তারা 'বিসর্জনে'র যে ভিন্ন পাঠ তৈরি করেছেন সেটা রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

এই প্রসঙ্গে সৌমিত্র বসু লিখেছেন— " যে কোনো পাঠকে কেমন চোখে দেখবেন একজন নির্দেশক, মঞ্চপাঠ তৈরী করার সময় কতখানি আনুগত্য মানবেন মূল লিখিত পাঠের, তাই নিয়ে মতভেদ আছে প্রয়োগ শিল্পীদের মধ্যেই। ... রবীন্দ্রনাথের মূলপাঠকে আগের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনভাবে ব্যবহার করবার প্রবণতা শুরু হয়েছে । যে কোনো স্বাধীনতার মতের যেমন ভালো দিক আছে, রবীন্দ্রনাথকে অসাধারণ সব দৃষ্টিকোণ দিয়ে বুঝে নেবার অবকাশ পাওয়া যাচ্ছে না। তেমনি আবার তা যে কখনো কখনো স্বেচ্ছাচারের রূপ নিচ্ছে না এমনটা বলা যাবে না। বেশ কিছুদিন আগে লেখা শঙ্খ ঘোষের একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে যায়... ' আরোপ নয়, উদ্ভাবন'। মনে হচ্ছে উদ্ভাবনের পরিশ্রম স্বীকার না করে রবীন্দ্রনাথের নাটকে নিজের ভাবনাকে আরোপ করে দেবার প্রবণতা বেশ বড় আকার নিয়েছে। লেখাটির মধ্যে সেই ভাবনাকে বহন করার পরিসর আদৌ আছে কিনা তা না ভেবেই এর পেছনে নানা কারণের কথা মনে হয়; ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসার, যেমন আছে, তেমনি হয়তো আছে খানিকটা দেখানেপনা, হয়তো পোষ্ট মর্ডানিস্ট ভাবনার প্রভাবও না থাকার কারণ নেই। তার সঙ্গে নিশ্চয় অনেকটাই মিশে গেছে পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, যে কোনো রবীন্দ্রনাটকের সঙ্গেই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম বা জঙ্গালমহলকে জুড়ে দেবার আকূল এবং অনেক ক্ষেত্রে অসহিষ্ণু আগ্রহ প্রকাশ পায় এখন।"

এই আলোচনা সারা পৃথিবীর সমস্ত ক্লাসিক প্রযোজনার পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। তবে এর মধ্যে দিয়েই তো অসাধারণ সব প্রযোজনা হয়ে চলেছে। সেটা পিটার ব্রুকের 'মিডসামার নাইটস্ ড্রিম' বা 'মহাভারত' বা বি.ভি.. করন্থের 'ম্যাকবেথ' কিংবা এইচ. কানাইয়ালালের 'ডাকঘর' প্রতিটি প্রযোজনাই কালকে অতিক্রম করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের মঞ্চস্থাপত্য কখনও কোনো একটি বিশেষ আঙ্গিক দিয়ে ধরা সম্ভব নয়। তাঁর প্রতিটি নাটক একে অন্যের থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা তার লেখায়; স্ট্রাকচারে বা তার স্পেস ভিজুয়াল এর ক্ষেত্রে আমরা পাই। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে 'রক্তকরবী'তে খনির দৃশ্য বা ধান কাটার দৃশ্যে এক ধরনের ওয়াইড হরাইজেন্টাল স্পেসের কথা আছে আবার এখানেই অন্তরঙ্গ দৃশ্যও আছে। যেখানে নন্দিনী রাজার সাথে বা বিশু পাগলের সাথে কথা বলে। যেটাকে সিনেমার ভাষায় ক্লোজআপ মুহূর্ত বলা হয়। ফলত

রবীন্দ্রনাটকের ক্ষেত্রে এক ধরনের বহুমাত্রিক স্পেস ও মাধ্যমের ব্যবহার করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও একটি বিশেষ ভাবধারাতে আবদ্ধ করেননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা নাটকের মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে এক ভিন্ন ধারার খোঁজ প্রতি মুহূর্তে করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে শোভন সোম লিখেছেন— " উনিশ শ দুই পর্যন্ত কলকাতায় 'বিসর্জনে'র পুনরাভিনয় হলেও উনিশ শ এক থেকে রবীন্দ্রনাথের মূল কর্মক্ষেত্র বা সৃষ্টির প্রয়োগশালা জোড়াসাঁকো থেকে সরে যায় শান্তিনিকেতনে। অবিচল সংকল্প, নিত্যকৃচ্ছতা, বিশ্বের ভাবনা ইত্যাদিতে ভাবিত রবীন্দ্রনাথ কয়েক বছর জোড়াসাঁকোয় নাট্যোদ্যমে যোগ দিতে পারেন নি। উনিশ শ পনেরোতে জোড়াসাঁকোয় 'বিচিত্রসভা' স্থাপনের পর নতুন করে নাট্যোদ্যম দেখা দেয়। এই 'বিচিত্রসভা' পর্বই প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চসজ্জার ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগার হয়ে ওঠে। এই পর্বেই গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনায় পূর্বতন স্বভাবানুকরণ-ধর্মিতার পরিবর্তে ভাবধর্মী মঞ্চসজ্জার সূচনা হয়। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরবর্তী প্রজন্মের রবীন্দ্রনাট্য মঞ্চসজ্জার রূপকার নন্দলাল, সুরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার হালদার প্রমুখ চিত্রকরের শিক্ষানবীশ হয়।" প্রতি সময়েই রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পরিবর্তন করেছেন। ফলে তাঁর নাটকগুলি কোনো একটি সরলরেখায় বাঁধা যায় না। তাঁর নাটক একটি আঁকাবাঁকা যাত্রাপথ। সেটা শুধু বিশ্লেষণ, সোশ্যাল রিয়ালিটি বা সিম্বলিজম ইত্যাদি দিয়ে ধরা যাবে না। কোন স্পেসিফিক রিয়্যালিজম দিয়েও এই প্রযোজনাকে বেঁধে ফেললে একটা অসম্পূর্ণতা তৈরি হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন বিশেষ ভাবে তৈরি প্রেক্ষাগৃহ, সেট, আলো, ধ্বনি, ভিডিও ইমেজ ও অন্যান্য মাধ্যমের সঠিক সংমিশ্রণের সাথে অভিনয়কে যুক্ত করে একটি টোটাল থিয়েটার গড়ে তোলা। স্বাধীনতা উত্তরকালে বিভিন্ন রবীন্দ্রপ্রযোজনাগুলির মঞ্চস্থাপত্যে এই সবগুলি অনেকটাই সঠিকভাবে ধরা পড়েছে। আশা করা যায় আগামীদিনে আরও অনেক রবীন্দ্রপ্রযোজনা তৈরি হবে যেখানে আঙ্গিকের সাথে বিষয়বস্তু মেলবন্ধনে নানান খোঁজ তৈরি হবে। সেই সব রবীন্দ্রনাটকের প্রযোজনায় ভিন্নপাঠ আমাদের আরেকবার নতুন করে রবীন্দ্রনাথের আরও কাছে নিয়ে যাবে।

**তথ্যসূত্র: বই ও পত্র-পত্রিকা**

১। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, ঘরোয়া, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫০

২। রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ সমকালীন প্রতিক্রিয়া, সংগ্রাহক: রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স, জুন ১৯৯৬

৩। থিয়েটার যা দেখা তা নিয়ে লেখা, সংগ্রাহক: বিভাস চক্রবর্তী, প্রতিভাস, ২০১৫

৪। 'The Statesman'(English daily) , Editor: Ravindra Kumar, 23 July 1999

৫। অনুষ্টুপ পত্রিকা, সম্পাদক : অনিল আচার্য, শারদীয়া ১৩৯৫

৬। Visva-Bharati Quarterly, Editor: Surendranath Tagore, Visva - Bharati Press, October 1923
৭। তথ্যকেন্দ্র, সম্পাদক: মঞ্জুশ্রী তালুকদার, মে ১৯৯৮
৮। বিসর্জন স্মারক পুস্তিকা, সম্পাদক: সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়, থিয়েট্রন, ১৯৯০
৯। মুখোপাধ্যায়, অশোক, খালেদ চৌধুরী, সংগ্রাহক : দেবশিস রায়চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, জুন ২০০৫
১০। নব রবি কিরণে, সম্পাদক : জয়ন্তী সাহা রায়, জানুয়ারি ২০১৪
১১। আননায়ুধ , সম্পাদক: স্বপন রায়, ১৫ অক্টোবর ২০১০
১২। The Telegraph, Editor: R. Rajagopal, 22 January 2011
১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও একুশ শতকের বাঙালী, সম্পাদক : সঞ্জীব চক্রবর্তী, শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার, দেবদত্ত তা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৯ মে ২০১১

লেখক ঃ **ড. শান্তনু দাস,** অধ্যাপক, নাটক বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

# মফঃস্বলে'র নাট্যশিখা
# মন্মথকুমার ও বিনোদবিহারী

প্রসূন বর্মণ

**সংক্ষিপ্তসার:**

মন্মথকুমার চৌধুরী ও বিনোদবিহারী চক্রবর্তী --- দুজনেই ছিলেন মফঃস্বলের লোক। কেন্দ্র নয়, প্রান্তেই বিকশিত হয়েছেন তাঁরা। যে সময় সমগ্র বিশ্ব আন্দোলিত হয়েছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, যে সময় প্রগতি আন্দোলনে লেখক-শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সংঘবদ্ধ হয়েছেন, সেই উত্তাল পর্বেই এই দুই নাট্যকারের আবির্ভাব। দক্ষিণ অসমের শ্রীহট্টে তাঁরা সূচনা করেছিলেন নাট্য-আন্দোলনের। গড়ে তুলেছিলেন জাতীয় রঙ্গমঞ্চ (National Theatre) 'নাট্যশ্রী'র মাধ্যমে নব-নাট্যচক্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। পুরাণ ও ইতিহাস নয়, নাটকের প্রধানতম বিষয় হয়ে উঠেছিল মানুষ। বৈশ্বিক সংকটের পাশাপাশি প্রান্তিক মানুষের কথা প্রকাশ করেছিলেন নাট্যকারেরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতার লড়াই ও মন্বন্তর কিভাবে নাটকে উঠে এসেছে প্রান্তীয় লেখকের কলমে, কোন সাহিত্যাদর্শে তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন--- তারই অধ্যয়ন এই প্রবন্ধের মূলে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ত্রিপুরা ও অসমে আধুনিক বাংলা নাটক মঞ্চায়নের সংবাদ পাওয়া যায়। সেকালে মূলত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হত। গোলাঘাট অ্যামেচার থিয়েটার সোসাইটি (১৮৯৫), যোরহাট থিয়েটার(১৮৯৫), গুয়াহাটির আর্য নাট্য সমাজ (১৮৯৬), নগাঁও নাট্য সমিতি (১৮৯৬), শিবসাগর নাট্য সমাজে (১৮৯৯) গোড়ায় মূলত দুর্গাপূজা উপলক্ষে নাটক অভিনীত হত। বাঙালি ও অসমিয়া সমাজের যৌথ প্রয়াস ছিল এসব অনুষ্ঠানের মূলে। আগরতলাতেও ত্রিপুরী, মণিপুরি ও বাঙালির উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়েছে 'ত্রিপুরা গৌরব', 'ভীষ্ম', 'জয়াবতী বা 'ত্রিপুরাসতী' প্রভৃতি নাটক। ক্রমশ বাংলা উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর দেখা দিল। এল ইংরেজি নাটকের অনুবাদও। কিছুকালের মধ্যেই নাট্যচর্চার প্রবাহ উত্তরপূর্ব ভারতের বিভিন্ন শহরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল।

বিশ শতকের তিরিশের দশক থেকেই সমগ্র বিশ্বে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। স্পেনে ফ্যাসিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে রোমা রোঁল্যার (১৮৬৬-১৯৪৪) প্রতিবাদ সর্বজনবিদিত। মনুষ্যত্ব বিপন্ন, এ বিশ্বাসেই তিনি পথে নেমেছিলেন। সর্বভারতীয় পর্যায়েও জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ সম্মেলনে গড়ে ওঠে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (১৯৩৬)। প্রকৃতার্থে এ সময় থেকেই ফ্যাসিবাদ -বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে। দেখা দেয় প্রগতি ও গণনাট্যের ধারা।

বোমাতঙ্ক , নিষ্প্রদীপ, কালোবাজারি, মজুতদারি, মূল্যবৃদ্ধি , মন্বন্তরে জর্জরিত সমগ্র

দেশের ভয়াবহ ছবিই যেন তুলে ধরেছেন শিল্পী-সাহিত্যিকেরা। বাস্তব থেকে কেউ-ই সরে আসতে পারেননি। এই উত্তাল পর্বেই গণনাট্য সংঘের (১৯৪৩) জন্ম। ফ্যাসিবাদ বিরোধী মতবাদ ও গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে নাটকে রাজনৈতিক প্রতিবাদ মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও স্বাধীনতা আন্দোলন---- উত্তরপূর্ব ভারতকেও ছুঁয়ে গেছে। নাটকে উঠে এসেছে রাজনীতি ও সমকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত। শ্রীহট্টে স্থাপিত হয়েছিল প্রগতি লেখক ও গণনাট্যের শাখা সংগঠন। এই আদর্শেই অবিভক্ত অসমে মন্মথকুমার চৌধুরী , বিনোদবিহারী চক্রবর্তী, মৃণালকান্তি দাশ, বিমল সেনগুপ্ত প্রমুখ নাট্যরচনায় এগিয়ে এসেছেন। জাতীয় অঞ্চলে নাট্যচর্চা এই আবহেই আলোকিত, উদ্‌ভাসিত।

২

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় থেকে এ অঞ্চলের নাট্যচর্চার গতিধারায় পরিবর্তন দেখা দেয়। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের প্রসঙ্গ প্রাধান্য লাভ করে। প্রগতি সাহিত্যের মতাদর্শে শুরু হয় নাটক লেখা। 'নবান্ন' প্রকাশের সময়ই শ্রীহট্ট থেকে বেরিয়েছে মন্মথকুমার চৌধুরীর 'হে বীর পূর্ণ করো' (১৯৪৪)। পরবর্তীতে গণনাট্যের আদর্শে তিনি লিখেছেন 'শব ও স্বপ্ন' (১৯৪৬)। নাটক দুটির প্রকাশক শ্রীহট্টের বাণীচক্র ভবন ও মডার্ণ বুক ডিপো। হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মৃণালকান্তি দাশ, অশোকবিজয় রাহা, অমিয়াংশু এন্দ, নলিনীকুমার ভদ্র প্রমুখ শ্রীহট্টের বাণীচক্র ভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গত শতাব্দীর তিরিশের দশকের বাণীচক্র ভবনের যৌথ প্রয়াস এ অঞ্চলের সাহিত্য চর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

মন্বন্তর ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রান্তীয় বাঙালি জীবনকে কীভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে, তার সার্থক নিদর্শন এ দুটি নাটক। মন্মথকুমার চৌধুরীর প্রথম নাটক 'হে বীর পূর্ণ করো।' নাটকটি প্রগতি সাহিত্যের 'সার্থক অগ্রদূত'। রাজনৈতিক দলের একাংশ সুযোগসন্ধানী ও স্বার্থপর মানুষের মুখোশ খুলে দিয়েছেন নাট্যকার;

> লোকে টাকা দিয়েও চাল কিনতে পাচ্ছে না। দেশ জুড়ে হাহাকার উঠেছে...
> পথে ঘাটে টাকার ছড়াছড়ি, নেই শুধু মানুষের সবচেয়ে যা বড় প্রয়োজন...
> সেই চা'ল। দুর্ভিক্ষ আর পাপ পুণ্য বিচার করছে না ঘোষাল কাকা।[১]

নেই, দেশ জুড়ে হাহাকার। এরই মধ্যে থিয়েটার- পাগল জমিদার শিবধন রায় 'মীরকাশিম' করছেন 'দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের সাহায্য কল্পে'।[২]

কুবেরের মতো ঐশ্বর্যশালী সম্পদ ছিল হিরণগড়ের জমিদারের। আজকে দু'মুঠো অন্নের জন্য তাদের ভাবতে হচ্ছে। এরই সমান্তরাল একনিষ্ঠ প্রেমের প্রকাশে উঠেছে অনন্য। কমিউনিস্টকর্মী শঙ্কর দাশগুপ্তকে কেন্দ্র করে জমিদার-কন্যা মণিকা ও রায়বাহাদুর গণপতি চৌধুরীর মেয়ে কুন্তলার ভালোবাসা নাটকটির প্রধানতম উপকাহিনি। 'বাঙালীর মেয়ের কোন স্বতন্ত্র মত থাকতে নেই'[৩] ... তাই হয়তো হিরণগড়ের কন্যা মণিকা শেষে রাজি হয়েছে

হীরালালপ্রসাদ মিত্র ওরফে পল্টু কনট্রাকটরকে বিয়ে করতে । আর কুন্তলা শিবধন রায়ের ছোটো ছেলে রাজনৈতিক কর্মী অশোককে।

স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতির প্রসঙ্গ নাটকে এসেছে। হিন্দু মহাসভাপন্থী এম এল এ রায়বাহাদুর গণপতি চৌধুরী। আধুনিকতার সঙ্গে ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধা রয়েছে তাঁর। এই বিশ্বাসেই কলেজ-ছাত্রী 'কমরেড' মেয়ে কুন্তলাকে বলছেন

এটা রাশিয়া নয়, ভারতবর্ষ। সাতাশ কোটি হিন্দুর দেশ এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, অথচ তাদের মধ্যে সাতাশ' খুঁটিনাটি নিয়ে মতভেদ। এদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে না পারলে তোমরা কমরেডরা সবাই মিলে চেঁচালেও দেশকে জাগাতে পারবে না মা।[৪]

ক্ষয়িষ্ণু জমিদার, বাড়িতে চাল পর্যন্ত নেই। তবু নিজের থিয়েটার নিয়েই মেতে রয়েছেন হিরণগড়ের জমিদার। ধর্মভ্রষ্টতা, কন্যাদায়, থিয়েটার-পাগল জমিদারের দুর্দশা যেমন এ নাটকে চিত্রিত হয়েছে, তেমনই লিপিবদ্ধ হয়েছে 'দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর প্লাবনের তাণ্ডব।'[৫] তবে এখানেই শেষ নয়, গভীর প্রত্যয়ে জমিদার পত্নী সুকুমারী বলে উঠেছেঃ 'অতল সমুদ্রে ডুবতে ডুবতেও আবার আমরা ভেসে উঠব।'[৬]

দুঃখ ও দারিদ্র্য, আকাঙ্খা ও আদর্শ, হৃদয়ের বেদনা ও সুখেচ্ছার কথায় উজ্জ্বল 'হে বীর পূর্ণ করো' নাটকটি। প্রগতি সাহিত্যের ভিত্তি বাস্তবের উপরে। বাস্তব জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি করে, তার বর্ণনা দিয়েছেন মন্মথকুমার।

'শব ও স্বপ্ন' নাটকটির পটভূমি মন্বন্তর। মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনি। কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী অকর্মণ্য ও সংসারধর্মে উদাসীন। সে নিজেই বলেছেঃ

আমি মত্ত, মাতাল, উচ্ছৃঙ্খল, অকর্ম্মণ্য, অপদার্থ। অপবাদের সবগুলো
বিশেষণের তালিকা জড়ো করে যা হয় - আমি তাই।[৭]

মাতাল হলে কৃষ্ণগোবিন্দ শেক্সপীয়র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের রচনা আওড়াতে অভ্যস্ত। এক উচ্চশিক্ষিত অথচ দিশেহারা মানুষের মুখোমুখি হতে হয় পাঠককে। ডিগ্রি ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, সম্পদ ছিল...তবু জীবনযুদ্ধে হেরে গেছেন কৃষ্ণগোবিন্দ।

স্ত্রী নয়নতারাই সংসারের হাল ধরেছেন। নানা অপমানের পর তার বিশ্বাসঃ

তবু আমার মন বলে আমাদের ভরা নৌকো ডুবতে ডুবতেও আবার ভেসে উঠবে।[৮]

রত্না আর অরুন্ধতী--দুই বোন। অরুর বিয়ে হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামী ইন্দ্রজিৎ সেনের সঙ্গে। ন্যাশনাল স্কুল, কমিউনিস্ট ইন্দ্রজিৎ বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই জেলে বন্দি। তাই অরুন্ধতী চলে এসেছে বাবা কৃষ্ণগোবিন্দের কাছে।

লটারির টাকায় মনসাপুরের জমিদারি কিনেছে কৃষ্ণগোবিন্দ। দত্তক নিয়েছে পুত্রসন্তান হিমাদ্রিকে। জুলুমবাজি শুরু হয়েছে। গ্রামের লোকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। নয়নতারা প্রশ্ন করেছেঃ

আমি স্পষ্টভাবে জানতে চাই এই অবাধ জুলুমবাজী বন্ধ হবে, না বিদ্রোহীদের শাসনের নামে এই নিষ্ঠুর অত্যাচার চলতে থাকবে।[৯]

উজ্জ্বলা গ্রামেই থাকে। পুরোপুরি গান্ধিবাদী। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে উজ্জ্বলা ও ইন্দ্রজিৎ সেনের মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। এ নাটকে উঠে এসেছে সমকালীন বিশ্বরাজনীতির তাত্ত্বিক কথাও। চিত্রিত হয়েছে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকের প্রতিবাদও।[১০]

নাটকটির তিনটি অঙ্ক। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। আর সমাপ্ত হয়েছে-- উন্মোচন দৃশ্য, শেষ দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরে। তিন অঙ্কের নাটকটির মোট দৃশ্য সংখ্যা আট।

নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে গণসংগীত। লিখেছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মৃণালকান্তি দাশ প্রমুখ। প্রগতি, গণসংগীত- সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশে মন্মথকুমার চৌধুরী সচেস্ট ছিলেন। তবে তিনি এ-ও জানিয়েছেনঃ

> সর্বসংস্কারমুক্ত রসরসিকের অনন্য-দুর্লভ নিরাসক্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের আদর্শ। সাহিত্যিক কোন বিশেষ দল, মতবাদ বা জীবন দর্শনের প্রতিভূ ন'ন- প্রচারক ত ননই। সমগ্রভাবে অখন্ড জীবনপূজাই সাহিত্য -শিল্পীর চরম রস-সাধনা।[১১]

নাটকটি রাজনৈতিক। পরাধীন দেশে সাধারণ কৃষকের দুর্বিষহ অবস্থা এবং তা থেকে পরিত্রাণের প্রয়াসই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অহিংস ও সহিংস পন্থার পাশাপাশি গান্ধিবাদ ও মার্কসবাদের দ্বন্দ্বও নাটকে উদভাসিত হয়েছে। মুকুন্দলাল ও সূর্যশঙ্কর কিংবা ইন্দ্রজিৎ ও উজ্জ্বলার কথোপকথনে তা সুস্পস্ট। এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুব্ধের পরিস্থিতিও নাট্যঘটনায় চিত্রিত হয়েছে।

নাটকে খানিকটা রিলিফ দিয়েছে রত্না ও ট্যুরিস্ট কুণালের কথোপকথন । তৈরি করেছে প্রেমের আবহ।

উন্মোচন দৃশ্যে স্পষ্ট হয়েছে জমিদারের পালিত পুত্র হিমাদ্রি সমস্ত নৃশংসতা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এবং ছেলেবেলার ভালোবাসা দুলু অর্থাৎ উজ্জ্বলাকে বলেছে ঃ

> তাইত তোমার হাত ধরে নীচে নেমে যেতে চাই, নীচে— খুব নীচে, শক্ত জমিতে— যেখান থেকে খেয়ালী বিধাতা আমাকে দুদিনের জন্যে তাদের প্রাসাদের

কল্পলোকে টেনে তুলেছিলেন, কিন্তু মাটিতেই আমার জন্ম, মাটির লোকদের সঙ্গেই আমার ছোটবেলা থেকে আমার মিতালি, যৌবনে তাদেরই জন্যে নতুন পৃথিবীর পথ কাটাবার ব্রত নিয়েছিলাম আমি। আমাকে নিয়ে চলো- ঐ দূরের, ঐ নীচে জনতার মাঝখানে।[১২]

এরপরে নাটক পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়েছে। জমিদারের পাইক বাহিনীর হাতে কৃষকের বাড়ি-ঘর ধ্বংস হয়েছে। কৃষকদের আশ্রয় দিয়েছেন 'রাণী মা' নয়নতারা। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জমিদারের তহবিল থেকে প্রজাসাধারণের বাড়ি ঘর তৈরি করার। জমিদার কৃষ্ণগোবিন্দ শুধুই হাহাকার করেছে।

কিন্তু আমি কারো কিছু নই, জমিদার নই, পিতা নই, স্বামী নই, প্রতিপালক নই...

আমি শুধু সৃষ্টিছাড়া ভবঘুরে কৃষ্ণগোবিন্দ চৌধুরী...[১৩]

'আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা'র সন্ধানে রত্না কুনালের সঙ্গে বাড়ি ত্যাগ করেছে।

সেকালের অসমে, বিশেষ করে সুরমা-বরাক উপত্যকায় নাটককে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসা সম্ভবত এই প্রথম। কারণ দুটি নাটকেই সমকালীন রাজনীতি, রাজনৈতিক মতভেদ, গ্রামীণ ও শহুরে জীবনের আবহে মানবতার মহিমাই চিত্রিত করেছেন মন্মথকুমার।

৩

সাপ্তাহিক 'জনশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বিনোদবিহারী চক্রবর্তী (১৯০১-৭৪)। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে নাট্যকার হিসেবে তাঁর আবির্ভাব। লিখেছেন 'রাজমাতা'(১৯৩৫), 'পরিচয়', 'বিক্ষোভ', 'সংঘাত' (১৯৪৭) প্রভৃতি নাটক। 'রাজমাতা' পৌরাণিক নাটক, বাকি নাটকগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে সামাজিক বাস্তবতা।

'রাজমাতা' রামায়ণের আধারে রচিত। প্রকাশক, শ্রীহট্ট জনশক্তি কার্যালয়ের নিস্তারণ গুপ্ত। পঞ্চাঙ্ক নাটকটির মর্মকেন্দ্রে রয়েছেন কৈকেয়ী। রাজসিংহাসনের অধিকার নিয়ে কৈকেয়ীর কৌশল, সত্যনিষ্ঠ রাজা দশরথের মৃত্যুতে অনুশোচনা ও রামের কাছে অযোধ্যায় ফিরে আসার আহ্বান--নাটকটি মূলত এই ত্রিবিন্দুতে দাঁড়িয়ে। শেক্সপিয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) পঞ্চাঙ্ক নাটকের অনুসরণে প্রত্যেক অঙ্কে বিনোদবিহারী বেশ কিছু দৃশ্যের অবতারণা করেছেন।

'ভোগ-লালসার দ্বন্দ্বে আত্মহারা' কৈকেয়ী কৌশলে রাজমাতা হয়েছেন। কিন্তু নাটকের শেষে গভীর অনুশোচনায় দগ্ধ তিনিঃ

সত্য আমি -- হে রাঘব!
সত্য যে কৈকেয়ী রাজমাতা।

তব ব্রত পূর্ণ হোক তবে।
চতুর্দ্দশ বর্ষকাল অন্তরে তোমার,
শুনিবে আমারি কণ্ঠে মর্ম্মভাঙ্গা ডাক-
" ফিরে আয়-- আয় বৎস ফিরে!" [১৪]

রাঘবের 'ফিরে আসা'র অপেক্ষায় রাজমাতা কৈকেয়ীর প্রার্থনা।

পৌরাণিক নাটকে মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার যে ছবি চিত্রিত করেছেন, তা এখানে অনুপস্থিত। এমনকী পৌরাণিক নাটকের সংগীত -প্রাধান্যও নেই। বিনোদবিহারী কৈকেয়ী চরিত্রের অর্ন্তদ্বন্দ্ব প্রকাশের যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিরল নিদর্শন।

'মফঃস্বলের লোক' বিনোদবিহারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে 'পরিচয়', 'বিক্ষোভ', ও 'সংঘাত' নাটকে। সারা পৃথিবী তখন উত্তাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো ছায়া এ দেশেও পৌঁছেছে। আবার বিয়াল্লিশের 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন। এই রাজনৈতিক আলোড়নের মধ্যেই বঙ্গদেশে পঞ্চাশের মন্বন্তর ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছিল। বিনোদবিহারী সমকালকে তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে। 'সংঘাতে'র সময়কাল ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ সাল। পটভূমিঃ কাজলদীঘি, মধুখালি, রতনপুর এবং কলকাতা।

চিকিৎসক সুজিৎ রায় ও ব্যবসায়ী -নেতা কিশোরীপতি মজুমদার দুই মেরুর বাসিন্দা। সুজিৎ দেশসেবী। আর কিশোরীপতি 'অর্থ, বিচক্ষণতা এবং নিজের জোরে' সব কিছু জয় করতে চায়। নাট্যঘটনায় দুজনের দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। অচলা, অনিতা, মহামায়া, বিমল, সত্যজিৎ প্রমুখের সক্রিয়তায় নাট্যবৃত্ত বিবর্তিত হয়েছে। ঘটনার সূচনা, নাট্য সংকটের প্রকাশ ও তাকে চূড়ান্ত অবস্থা থেকে উপসংহারে পৌঁছনোয় বিনোদবিহারী সচেস্ট থেকেছেন।

নাট্যকাহিনীর প্রস্তাবনায় 'আঁধার আর আঁধার', কিন্তু তবু আলোর পথযাত্রী সকলেই। মানবজাতির সংকটে সকলকে আহ্বান করা হয়েছেঃ ' জাগো, জাগো,জেগে ওঠ বন্ধু।'[১৫]

প্রথম অঙ্কের গোড়া থেকেই সংকট। সংকট ব্যক্তিজীবনে, দেশসেবী সুজিৎ রায়ের। আশ্রিত অচলাকে কেন্দ্র করে অনিতা-সুজিতের মতবিরোধ হয়েছে। অনিতা স্বাধীন সত্তাকে বিসর্জন দিতে চায়নি। সে সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে মনের জোরে চলতে পারে। বেঁচে থাকতে চায় আপন গৌরবে, আপন পরিচয়ে। আর সুজিৎ বেঁচে থাকতে চায় দেশের, সমাজের , পরিবারের পরিচয় নিয়ে। নিজেকে এর মধ্যেই বিলীন করে দিতে চায়, এই তার মন্ত্র।

প্রথম অঙ্কেই অনিতার সংসার-ত্যাগ। বিনোদবিহারী সুকৌশলে কিশোরীপতিকে নাট্য ঘটনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছেন। সৌজন্যে রমলা-- অনিতার বান্ধবী। কিশোরীপতির পৃষ্ঠপোষকতায় আর অনিতার নেতৃত্বে 'জাগরণী সংঘ' নারীজাতির উন্নতিকল্পে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। সুজিৎকে সাবধান করেছে কিশোরীপতির স্ত্রী অচলা।

অন্যদিকে, সংকট ঘনিয়ে এসেছে সর্বত্রঃ

কিন্তু এই দেশ? -- দেখছ না চারদিকে চেয়ে, দলে দলে মরছে লোক দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে,শুনছ না তাদের ক্রন্দন? বুঝছ না অর্থলোভে মানুষ কি অমানুষ হয়ে উঠেছে? আজ দেশের জীবন ফিরিয়ে আনতে হবে বিমল। যারা মরেছে, মরছে তাদেরে বাঁচাতে হবে, তবে না সার্থক হবে আমাদের ভাবী বিপ্লব।[১৬]

কর্তব্যবোধে অটল সুজিৎ গ্রামের লোকদের বাঁচাতে মরিয়া, তার কাছে ব্যক্তি নয়, ব্যষ্টিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তখন। এখানেই সুজিৎ অনেকটা টাইপ চরিত্রের আদর্শে চিত্রিত হয়েছে।

অনিতা কিশোরীপতির 'মোহজালে' আবদ্ধ ছিল। বিজিতার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নাটকের চূড়ান্ত পর্বে সে মোহ কেটে যায়। কিশোরীপতির আশ্রিত সংবাদপত্রে অপবাদ প্রকাশের হুমকি পেয়েও অনিতা কলকাতার মোহ ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে মধুখালি অঞ্চলে-- মহামারি, দুর্ভিক্ষে কাতর গ্রামবাসীর কাছে। অজান্তেই অনিতা আবার মুখোমুখি হবে সুজিতের সঙ্গে।

কিশোরীপতি চক্রান্ত ও সর্বনাশের নেশায় মেতে উঠেছে। অর্থ ও আভিজাত্যে সে রতনপুরে আগুন জ্বালানোর কুটিল চক্রান্ত করেছিল। একদা 'ভীরু , সহায়হীনা' অচলা প্রতিবাদ করেছে। সকলের সামনেই কিশোরীপতির মুখোশ খুলে দিয়েছে। 'নারী-মাংস-লোলুপ চরিত্রহীন' কিশোরীপতিকে বাক্যবাণে জর্জরিত করেছে।

পলাতক কিশোরীপতিকে বাধা দিতে গিয়ে নাট্যঘটনার চূড়ান্তপর্ব গুলিতে আহত হয়েছে সে। 'সর্বহারা' অচলা সকলের কাছে জীবন চেয়েছিল, কিন্তু কারো কাছেই তা পেয়ে ওঠেনি সে, এই আক্ষেপ নিয়েই চলে যেতে হয়েছে তাকে।

কিশোরীপতির মর্মন্তুদ আর্তনাদ, ভয়ার্ত চিৎকারের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি। কিন্তু তার পূর্বে নাট্যকার কিশোরীপতির মধ্য দিয়ে শুনিয়েছেনঃ

মনে রাখবেন এখনো কিশোরীপতিদের পৃথিবীই চলছে। কিশোরীপতি বেঁচে থাকতে চায়, থাকবেই। তার অর্থ আছে, সম্পদের তার প্রাচুর্য্য, বুদ্ধি বিচক্ষণতার তার অভাব নেই- সে জীবনও দিতে পারে, মৃত্যুও। সে অন্নও দেয়, দুর্ভিক্ষও ডেকে আনে। এখনো এদেশে, বহুদেশে কিশোরীপতিরাই দেশ শাসন করছে, সমাজ শাসন করছে, ভবিষ্যতেও--[১৭]

অচলার সন্তান মানিককে তুলে নিয়েছে অনিতা, সুজিতের স্ত্রী।

সমাজ ও ব্যক্তি-সংকট একই সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে এ নাটকে। জমিদার স্বরূপ চৌধুরীর মর্যাদা, কুলগৌরবের অহং মুছে গিয়েছে নাটকের শেষে এসে। তার উপলব্ধি হয়েছেঃ

ওই যে নতুন সূর্য উঠছেন, তিনি এখানে অভ্যর্থনা জানাবেন তোমাদেরই, আমাকে

নয়। তার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাব। চৌধুরী বংশের দ্বাদশ পুরুষকে, তার অতীতকে আজ আমি নিজ হাতে মুছে দিচ্ছি। ত্রয়োদশ পুরুষে তুমি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করো---[১৮]

অসহায় সুজিৎ চৌধুরী কাশি চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সঙ্গে চৌধুরীবাড়ীর কুলদেবতা।

বিমল আর রমলা কঠিন সময়েও নাট্যকাহিনিতে হাস্যরসের উদ্রেক করেছে। বিমল 'স্বপ্ন বিলাসী'। সেই প্রত্যয়েই সে বলে উঠেছে ঃ

দেখ্‌লাম যেন উড়ে যাচ্ছি আকাশে। বগলে চারটে আগুনে বোমা। একটা ফেললাম ক্রেমলীনে ষ্ট্যালিনের গোঁফে, একটা হিটলারের টাকে, আর একটা মুসোলিনীর টুপিতে। চার্চিল কিন্তু, তাকে যেটা লক্ষ্য করে ছুঁড়েছিলাম, সেটা থেকে সিগারে আগুন ধরিয়ে জগতকে ধূমায়িত করে ভ্রুকুটি -কুটীল-কুঞ্চিত মুখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। ... একসঙ্গে সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ- এক আঘাতে খৃস্টও বুদ্ধ সব সাবাড়।[১৯]

কিন্তু তবু বিমল আস্থা রেখেছে সাধারণ মানুষের প্রতিঃ

এই আশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকি, রায় পরিবারের অপমানের শোধ তুলবে একদিন নিতাই, কালীচরণ, তিনু, হারু .... ওরা। সে স্বপ্নই দেখি। [২০]

তাই নাটকের শেষ দৃশ্যে রমলা ও বিমলের নেতৃত্বে সকলেই 'শয়তান' কিশোরীপতির শাস্তি চেয়েছে। তারা বিশ্বাস রেখেছে 'সমস্ত সেবাদল.. রতনপুরের কর্মীরা আজ কিশোরীপতিকে শাস্তি দেবে।'[২১]

চার অঙ্কের নাটকটি মোট ঊনিশটি দৃশ্য ও দৃশ্যান্তরে চিত্রিত হয়েছে। বিনোদ বিহারী শুনিয়েছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সংঘবদ্ধতার কাহিনি। মঞ্চসফল নাটকটি সেকালে নতুন চেতনার সঞ্চার করেছিল, এ বলা বাহুল্য।

৪

মন্মথকুমার ও বিনোদবিহারীর নাটক প্রগতিশীল চেতনায়, গণনাট্যের আদর্শে রচিত। নাটকগুলির মধ্য দিয়ে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রেণি-সংগ্রামের ভাবধারায় নাটকগুলি রচিত । সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধীতার পাশাপাশি দেশীয় জোতদার, জমিদার ও পুঁজিপতিদের বিরোধীতায় সরব ' হে বীর পূর্ণ করো,' 'শব ও স্বপ্ন', 'বিক্ষোভ', 'সংঘাত' প্রভৃতি নাটক। প্রকৃতার্থে, প্রগতিশীল সাহিত্যাদর্শ ও গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকেই এই দুই 'মফঃস্বলে'র নাট্যকার পল্লবিত হয়েছেন,আলোকিত করেছেন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারাকে।

**সূত্র নির্দেশ**

১। মন্মথকুমার চৌধুরীর, ' হে বীর পূর্ণ করো', শ্রীহট্ট, ১৯৪৪, পৃ.৪৪
২। তদেব, পৃ.৩
৩। তদেব, পৃ.১৩০
৪। তদেব, পৃ. ২৯
৫। তদেব, পৃ. ২০
৬। তদেব, পৃ. ৯৮
৭। মন্মথ কুমার চৌধুরী, 'শব ও স্বপ্ন', শ্রী হট্ট, ১৯৪৬ পৃ. ৪
৮। তদেব, পৃ. ১১
৯। তদেব, পৃ. ৬৩
১০। তদেব, পৃ. ৮৬
১১। তদেব,কৃতজ্ঞতা স্বীকার পৃ. ৩
১২। তদেব, পৃ. ১২৪-১২৫
১৩। তদেব, পৃ. ১৩২
১৪। বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী, 'রাজমাতা', শ্রীহট্ট, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৬৮
১৫। তদেব, পৃ. ১
১৬। বিনোদ বিহারী চক্রবর্তী, 'সংঘাত', 'সাহিত্য নিকেতন', শ্রীহট্ট, ১৯৪৭, পৃ. ৬৯
১৭। তদেব, পৃ. ১৪৩ -১৪৪
১৮। তদেব, পৃ. ১০৭
১৯। তদেব, পৃ. ১৩-১৪
২০। তদেব, পৃ. ৬৪
২১। তদেব, পৃ. ১৩৯

লেখক : **প্রসূন বর্মণ,** সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি , অসম।
সম্পাদক- 'নাইনথ্ কলাম'

# নবান্ন নাটক : সমকালীন প্রেক্ষিত

রেণুকা অধিকারী

বাংলা নাটক রচনার ধারায় চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের জীবন সমস্যার কথা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্য নিয়ে নাটক রচনায় যারা ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন বিজন ভট্টাচার্য। শুধু নাটক রচনা নয়, অভিনয়, নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রশংসনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর বর্তমান। সুগভীর সমাজচেতনা এবং প্রগতিমূলক চিন্তাধারা প্রসারের প্রচেষ্টা তাঁর রচিত সবকটি নাটকে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচিত নাটকে অকৃত্রিম ও সহানুভূতি সমাজবোধেরও পরিচয় পাই। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যসত্তার জন্ম দেশকালের এক সংকটময় রাজনৈতিক অস্থিরতায়, গণনাট্য সঙ্ঘের প্রয়োজনে, সাধারণ শোষিত মানুষের কথা সাহিত্যের দরবারে তুলে আনার প্রয়োজনে, নিরন্ন মানুষের ভুখা মিছিলকে মঞ্চায়নের দাবীতে। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি রচিত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রথম প্রকাশিত হয় ঐ বছরে 'অরণি' পত্রিকায়। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় 'নবান্ন' প্রথম মঞ্চস্থ হয় ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৪ সালে 'শ্রীরঙ্গমে'। এই নাটকটি রচনার আগে নাট্যকার রচনা করেন দুটি একাঙ্ক নাটক 'আগুন' ও 'জবানবন্দী'। নাটক দুটিও গণনাট্য সঙ্ঘের প্রযোজনায় যথাক্রমে 'নাট্যভারতী' এবং 'স্টার' থিয়েটার মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়। 'নবান্ন' নাট্যকারের তৃতীয় এবং পূর্ণাঙ্গ নাটক। বিজন ভট্টাচার্য যে সময় নাটক রচনায় উদ্যোগী হন, সেই সময় বিশ্বজুড়ে চলছিল অর্থিক মন্দা, সাম্রাজ্যাদী শক্তির আস্ফালন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতবর্ষের বুকে আগস্ট আন্দোলন, জাপানী বোমার আতঙ্ক, পোড়ামাটি নীতি, সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও মহামারী। অসহায় নিরন্ন মানুষের হাহাকার ধ্বনি শহরের ফুটপাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। সামগ্রিক নাট্যকর্ম নয়, সমকালের এইসব ঘটনাবলী 'নবান্ন' নাটককে কতখানি স্পর্শ করেছে তা তুলে ধরাই আমার আলোচ্য প্রবন্ধের অবতারণা।

**সূচক শব্দ :** আগস্ট আন্দোলন, পোড়ামাটি নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, জোতদার ও ব্যবসাদার শ্রেণীর শোষণ,

'নবান্ন' নাটকে সমকালীন ঘটনা বা প্রেক্ষিত কতখানি স্পর্শ করেছে তা জানার আগে আমরা নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত জীবন ও তাঁর নাট্যভাবনা সম্পর্কে জেনে নিতে পারি। নাট্যকারের জন্ম ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই জুলাই বর্তমান বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলার খান খানাপুর গ্রামে। আড়বেলিয়া জে ডি হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার আশুতোষ ও রিপন কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন। পড়াশুনা চলাকালীন

ছাত্র আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ায়, লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ হারান এবং লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় চাকুরি সূত্রে কাজে যোগদান করেন। এই সময় প্রগতিপন্থী বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এঁদের সাহচর্যে তিনি মার্কসীয় দর্শনের প্রতি আকৃস্ট হন। এদেশের সমকালীন, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার আগ্রাসন, ফ্যাসিবাদের উত্থান এবং তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের লড়াই বিজন ভট্টাচার্যকে মার্কসীয় দর্শনর প্রতি বিশেষভাবে আকৃস্ট করেছিল। পরবর্তী সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন । ১৯৪২ সালে 'ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হন। এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই বিজন ভট্টাচার্যের নাট্য জীবনের যথার্থ বিকাশ শুরু হয়। তিনি এই মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন যে, 'শিল্প হবে মানুষের জন্য।' নাটকের মধ্য দিয়ে শ্রেণিসচেতন সমাজ বিশ্লেষণ এবং শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রামের জেহাদ ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ করতে চেয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্য সেই ভাবনার দ্বারা অনেকাংশে উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটক রচনায় লেখনি ধারণ করেন। বাংলাদেশের বুকে মহামন্বন্তরের ভয়াবহ দুর্যোগের দিনে তিনি বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, মানুষের কথা, তাদের ব্যথা বেদনাকে আত্মস্থ করেছেন সহানুভূতিশীল মন দিয়ে। একদিকে সীমাহীন শোষণ ও বঞ্চনা, অন্যদিকে সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও নিষ্পেষণে সাধারণ মানুষের দু:সহ জীবনযাত্রার সম্যক পরিচয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এসব অভিজ্ঞতাগুলিকেই তিনি নাটকে রূপ দিতে আগ্রহী হলেন মানবতাবাদী দৃস্টিভঙ্গি দিয়ে, সাম্যবাদী আদর্শের অনুপ্রেরণার দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে। শুধু অভিজ্ঞতা বা সহানুভূতি নয় এক বিশেষ জীবনদর্শনও তাঁকে জীবনভাবনায় বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলেছিল।

নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের বিভিন্ন নাটকে সমকালের নানা ঘটনার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে সম্যকভাবে। যেমন নাট্যকারের প্রথম নাটক 'আগুন' এ দেখা যায় খাদ্যাভাব জনিত সংকটের ছবি। গ্রামের মানুষ শহরে এসেছে একমুঠো খাবারের আশায়, কিন্তু শহরে এসে তারা ভিখারীতে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতি, কালোবাজারী, কৃত্রিম অভাব তৈরীর ষড়যন্ত্র, রেশনিং ব্যবস্থার অপ্রতুলতা মানুষকে কীভাবে দিশেহারা করে তুলেছিল তারই বাস্তবচিত্র নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনভাবে তুলে ধরেছেন। দুর্ভিক্ষের কারণে গ্রামে গ্রামে অন্নাভাব দেখা দিয়েছে সেই চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে 'জবানবন্দী' নাটকে। ব্রিটিশ সরকারের প্রয়োজনে আগত বিপুল সংখ্যক সৈন্যের খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সরকার প্রচুর খাদ্যশস্য ক্রয় করার ব্যবস্থা করে। কালোবাজারী মুনাফালোভীর দল বাজার থেকে খাদ্যশস্য তুলে নিয়ে মজুত করে রাখে নিজেদের গুদামে বেশী দামে বিক্রি করে মুনাফা লাভের আশায়। কৃত্রিম অভাবের শিকার হয় সাধারণ মানুষ। গ্রামের অভুক্ত মানুষ বৃদ্ধ পরাণ মন্ডল ও তার পরিবার সহ আরো কয়েকটি

হিন্দু ও মুসলমান পরিবার খাদ্যের আশায় এসে হাজির হয় কলকাতা শহরে। অভাব, অনাহার ও আশ্রয়হীনতায় এদের মধ্যেকার মানবিক সম্পর্ক ধসে যায়। সংগৃহীত খাবার নিয়ে পরস্পর কাড়াকাড়ি করে পথে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। কলকাতার ফুটপাতে বহু ক্ষুধার্ত মানুষ মারা যায়। সমকালের এই বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'জবানবন্দী' নাটকে । 'নবান্ন' নাটকও সমকলের নানা ঘটনার বাস্তব দলিল। নাটকের শুরুতে আছে আগস্ট আন্দোলনের প্রসঙ্গ, এর পাশাপাশি জাপানি বোমার পড়ার আতঙ্ক, বোমা হানার পরিপ্রেক্ষিতে সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার 'পোড়ামাটি নীতি'র আশ্রয় নেয়। জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যাবতীয় যানবাহন ব্যবস্থা অচল ও বাজেয়াপ্ত করে। সেই সঙ্গো সঞ্চিত খাদ্যশস্য পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুর সহ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় প্রবল ঘূর্নিঝড় ও বন্যার তান্ডবে প্রচুর মানুষের প্রাণনাশ হয়, ঘর-বাড়ি ভেঙে পড়ে, গবাদিপশু বন্যার তোড়ে ভেসে যায়, প্রচুর ফসল নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। সমাজে কালোবাজারী , মুনাফালোভী শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে।গ্রাম ছেড়ে দলে দলে নরনারী, শিশুবৃন্দ একমুঠো ভাতের আশায় কলকাতার ফুটপাতে আশ্রয় নেয়। প্রচুর লোক মারা যায়। সরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রহসন মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে। সমকালের এইসব ঘটনা বা বিষয় 'নবান্ন' নাটকে কতখানি প্রতিফলিত হয়েছে, নাটকটির কাহিনী বিশ্লেষণ করলে সে সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা পেতে পারি।

**আগস্ট আন্দোলন:** ১৯৪২ সালে ১২ জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, যেন তেন প্রকারেণ ইংরেজ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করতে হবে। সারা ভারতজুড়ে আন্দোলন শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরে আন্দোলনের প্রভাব ছিল অতি তীব্র ফলে এই এলাকা ব্রিটিশ রাজরোষে পতিত হয়। আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ সরকার বেপরোয়া গুলি চালায়, তাতে প্রাণ যায় স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অসংখ্য নিরীহ মানুষের। অমানবিক নৃশংসতার উগ্রতা, নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ্যে ঘটতে লাগল এই সময়। 'নবান্ন' নাটকের সমকালের এই সব ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেছে। প্রথম দৃশ্যে আছে আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট। প্রধান সমাদ্দারের দুই পুত্র শ্রীপতি ও ভূপতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে শেষপর্যন্ত পুলিশের গুলিতে মৃত্য বরণ করেছে। প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননী দুই ছেলেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহৎ যজ্ঞে আহুতি দিয়েও ভেঙে পড়েনি। বরং দেবরপুত্র কুঞ্জর ভীরুতা ও দুর্বলতায় বীতস্পৃহ হয়ে তিনি বিদেশী শাসকের আক্রমণ, সন্ত্রাস, লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অমানবিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এবং তার প্রতিকারের কাজে নেতৃত্ব দেন। তিনি বিদেশী শাসনের সন্ত্রাসের বিহিত করার জন্য সবাইকে সমবেত হওয়ার ডাক দেন। ডাক দেন নারীদের ইজ্জত রক্ষার জন্য সচেস্ট হতে। যারা বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছে তাদের পৌরুষ ও বিবেক

জাগ্রত করার জন্য তীব্র ভাষায় ব্যঞ্জা করেছেন, -'মেয়েমানুষ লজ্জা শরম খুইয়ে বনে-জঙ্গালে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহর। কেন, বিত্তান্তটা কী? দেশে পুরুষ নাই।"[১/১] ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায় বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাতে মেদিনীপুর জেলার তমলুকে আগস্ট আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ব্রিটিশ সৈনিকের গুলিতে লুটিয়ে পড়েন মাতঙ্গিনী হাজরা। নির্ভীক, সাহসী মাতঙ্গিনী মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা বুকের উপর ধরে রেখেছিলেন। নাটকে পঞ্চাননী আমিনপুরের জনশক্তিকে সংঘবদ্ধ করে অত্যাচারিত শাসকের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দেন। অবশেষে পুলিশের গুলিতে লুটিয়ে পড়েন। নাট্যকার অত্যন্ত সচেতনভাবে মাতঙ্গিনী হাজরার চরিত্রের আদলে পঞ্চাননী নির্মাণ করেছে এ বিষয়ে সংশয় নেই। এই অঙ্কে দেখা পাই স্বাধীনতা সংগ্রামী যুধিষ্ঠিরের সে সবাইকে আন্দোলনে আহ্বান জানায়, তার উৎসাহে প্রধান উদ্দীপিত হয়ে কুঞ্জকে বলে-" এগিয়ে চল বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের।" বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ শুনে প্রধান কুঞ্জকে বলে-'কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব প্রাণ দেব প্রাণ দেব! "১/১ এই বলে প্রধান দ্রুত এগিয়ে যায়। আগস্ট আন্দোলন সমাজের সাধারণ মানুষের উপর কতখানি প্রভাব ফেলেছিল তার প্রতিফলন দেখা যায় 'নবান্ন' নাটকে।

**পোড়ামাটি নীতি:** জাপানী বোমার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উদ্বিগ্ন ব্রিটিশ সরকার 'পোড়ামাটি নীতি' অনুসরণ করে মেদিনীপুর ও অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা গুলিতে। শাসক শক্তির পরিকল্পনা ছিল জাপানী সৈন্যরা এ দেশে এলে যেন খাদ্য সংকটের মুখে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার এই অঞ্চলের সমস্ত ধান পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। সাধারণ কৃষিজীবী মানুষ ইংরেজদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে নিজেরাই নিজের ধানের গোলায় আগুন দেয়। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে কুঞ্জ প্রধানকে বলেছে-" নিজে তো করেইছে, আর পাঁচজনারে পর্যন্ত বাধ্য করেছে ধান নষ্ট করে ফেলতে।"[১/২] এতে তাঁর মধ্যে কোন অনুতাপ নেই। তিনি জানিয়েছেন যে নিজ আচরণ দ্বারা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন অন্য চাষীদেরও নিজ হাতে ধান নষ্ট করে ফেলতে। জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্রিটিশ সরকার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার যাত্রী বহনের উপযোগী সমস্ত নৌকা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ জারি করে। বহু নৌকা জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। প্রধান কুঞ্জ এবং নিরঞ্জনকে রাগত ভাবে বলে- 'য্যা নৌকা ছিল আমি আটকে রেখেছি। চব্বিশ ঘন্টার নোটিশ দিয়ে আমি মানষিরি সব দেশান্তরি করিছি। সব আমি করিছি। কর্ তোরা আমারে যা করবার কর্।"[(১/২)] এর ফলে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য মালপত্র চালানের কাজ বিশেষভাবে বাধা পায় ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নৌকাগুলির মালিক ও মাঝিদের প্রচুর ক্ষতি হয়। এলাকার মানুষদের চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করে। সমস্ত ধান পুড়িয়ে ফেলার ফলে প্রধানের সংসারে নেমে আসে অন্নকষ্ট, দারিদ্র্য। সেই সঙ্গো বিশ্বাস ও ভালোবাসা ধ্বসে পড়তে থাকে পরিবারের মানুষগুলির মধ্যে। অভাবের সংসারে সকলের জন্য অন্ন সংস্থানের জন্য কুঞ্জ বাসনপত্র বিক্রি করে। রাধিকা স্বামী নিরঞ্জনের ব্যবহারে অত্যন্ত কস্ট পেয়ে কাঁদতে শুরু করে। কুঞ্জ বিনোদিনীর কান্না দেখে নিরঞ্জনকে দায়ী

ভাবে এবং কোন কিছু বিবেচনা না করে চ্যালাকাঠ দিয়ে নিরঞ্জনের মাথায় আঘাত করে। পোড়া মাটি নীতির ফলে প্রধানের পরিবারের বিধ্বস্ত ছবি এইভাবে নাট্যকার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

**১৯৪২ এর সাইক্লোন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস :** পোড়া মাটি নীতি অনুসরণের ফলে বিনষ্ট হয়ে যাওয়া শস্যের অবশিষ্টাংশ নিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষেরা অতিকষ্টে দিনযাপন করছিলেন। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে তাঁদের অতিকষ্টের সংসারকে রক্ষা করার শেষ চেষ্টাকে গুঁড়িয়ে দিল ভয়ংকর সাইক্লোন আর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এই জলোচ্ছ্বাসের তান্ডবে মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী বিশাল অঞ্চল সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায় অসংখ্য মানুষ, গবাদি পশু প্রাণ বিনষ্ট হয়- ঘরবাড়ির ক্ষতি হয়। অসহায় মুমূর্ষু চাষীর চোখের সামনে লবনাক্ত জলে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় ক্ষেতের ফসল। 'নবান্ন' নাটকে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ধ্বনিত হয় কুঞ্জর ছেলে মাখনের সতর্ক বার্তায়-"তোমরা সব চালের ওপর ওঠো, চালার ওপর ওঠো! সাত-আট হাত উঁচু হয়ে বান আসছে। ভীষণ বান, হুই-ই-ই-।"[১/৩] প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত্ত তান্ডবের মর্মান্তিক চিত্র দেখতে পাই তৃতীয় দৃশ্যের শেষাংশে, যেখানে রাধিকা আর কুঞ্জ ঘরের চালার নীচে চাপা পড়ে যায়। ভয়ে বিনোদিনী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। গ্রামের চাষী দয়ালের ঘরবাড়ি এমনকি রাঙার মাকেও নিশ্চিহ্ন করে নিয়ে যায়। প্রধানের বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখে " ... সমুদ্দুর, চারিদিকে সমুদ্দুর- জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল -সমুদ্দুর উঠে এসেছে গ্রামে।" [১/৩] এক মুহূর্তে দয়ালের আশা-আনন্দের রেশটুকু বিলীন হয়ে যায়। হতচকিত দয়ালের সেই সর্বস্বান্ত হবার মুহূর্তে তার সংলাপ সত্যই মর্মস্পর্শী। কুঞ্জের ডাকে স্বপ্নোত্থিতের মতো দয়াল বলে-"য়্যাঁ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল? আমার কি কিছু ছিল না!"[১/৩] এই সর্বনাশা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দৈবক্রমে রক্ষা পেলেন যারা তাদের দৈন্য ও দুরাবস্থা চরমে পৌঁছল। গৃহহীন, অন্নবস্ত্রহীন এই মানুষগুলো ঘর-বাড়ি ছেড়ে পথে এসে দাঁড়াল।

**পঞ্চাশের মন্বন্তর :** আগস্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরের যে মানুষেরা শুদ্ধ আদর্শ এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য অবহেলায় জীবন দিয়েছে তারাই পথে নেমে এসেছে খিদের তাড়নায়। প্রথমে গরু-বাছুর, থালা -বাসন পরে জমি-জায়গা এবং শেষে বসতভিটে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে অন্ন কষ্ট দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে সংগৃহীত অর্থ কয়েকদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। দেশে খাদ্যদ্রব্যের অভাব ছিল এমনটা নয়, আসলে সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রচুর খাদ্য মজুত করে রাখা হয়েছিল, তার পাশে স্বদেশীয় অর্থলোলুপ মজুতদার ও চোরাকারবারীর লোকেরা অধিক মুনাফা লাভের আশায় প্রচুর খাদ্য মজুত করে রাখায় সারা দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল এক তীব্র কৃত্রিম খাদ্য সংকট। ইতিহাসের পাতা থেকে

জানা যায়, ক্ষুধার তাড়নায় পিতা বিক্রি করেছে কন্যাকে, মাতা পুত্রের মুখের গ্রাস কেড়ে খায় খিদের তাড়নায়। খাদ্যের অভাবে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে কলেরায় এবং নানানবিধ অসুখে গ্রামাঞ্চলগুলি উজাড় হয়ে যেতে থাকে। সবচেয়ে যে বড় অসুখে অসুস্থ হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষেরা তা হল অনাহার। অনাহারজনিত মহামড়কে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। আমিনপুর গ্রামের মোড়ল প্রধান সমাদ্দার যার বাড়িতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা থাকতেন, সেই বাড়ির ভাইপো কুঞ্জ শেষ সম্বল বাসনপত্র বিক্রি করে দেয় দুমুঠো খাদ্য যোগানের জন্যে। খাদ্যের অভাবে অপুষ্টিতে ভুগে তার সন্তান মাখন। অতি কষ্টে কুঞ্জ অসুস্থ ছেলের কাউনের চাল যোগাড় করে অনে। প্রধানও অসুস্থ মাখনের মুখে রুচি বাড়ানোর জন্য কাঁকড়া সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। এতে কুঞ্জ রুষ্ট হয়ে চাল কোচা থেকে ফেলে দেয়। অভিমানে দুঃখে প্রধান নিজের মাথায় নিজে কাঠ দিয়ে আঘাত করে বসেন। এই আঘাতের ভিতরে যে কী যন্ত্রণা, কী অসহায়তা লুকিয়ে আছে তা প্রধানের উক্তিতেই ব্যক্ত হয়েছে-" কুঞ্জ আমি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারব না, যে শুধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে।" ক্ষুধার্ত মাখনের হাহাকার, চরিত্রগুলোর কিছু করে উঠতে না পারার অসহায়তা ও বেদনায় ভার চতুর্থ দৃশ্য গভীর সহানুভূতির সঞ্চার ঘটায়। 'নবান্ন' নাটকের ১ম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে দেখা যায় মাখনের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। বিনোদিনী তার বিনিদ্র চোখে তার পাশে বসে থাকে। ঘরে খাবার নেই, পয়সা নেই একটাও। মড়ক দেখা দিয়েছে সর্বত্র রাধিকার মুখে শুনতে পাই-" উত্তর পাড়ায় তো সে একেবারে, থাক আর নাম করব না, একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, একবিন্দু জল যে গালে দেবে তার পর্যন্ত কেউ নেই। ... এমন আকালও দেখিনি, এমন মৃত্যুরও দেখিনি কোনোদিন।"[২/৩] নিরুপায়, সর্বস্ব হারিয়ে দুমুঠো খাদ্যের আশায় আমিনপুর গ্রামের মানুষ পা বাড়ায় শহর কলকাতায়। কলকাতায় এসে ভিখারিতে পরিণত হয়। ক্ষুধার্ত মানুষের দুমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার ধ্বনি শুনতে পাই প্রধানের কন্ঠে-'[২] আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্য। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু-কিছু কানে শোন না? অন্তর কি তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ..."[২/৩] অনাহারক্লিষ্ট প্রধানের হাহাকার ধ্বনি সেদিন কলকাতা শহরের পথে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষের আর্ত ক্রন্দনধ্বনি।

**জোতদার, কালোবাজারী শ্রেণীর উদ্ভব ও শোষণ:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমাজে একদল স্বার্থান্বেষী জোতদার, মহাজন, কালোবাজারীর শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। এরা নানাভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ করে। হারু দত্ত এমনই একজন মানুষ, যে আমিনপুর গ্রামের জোতদার। একদিকে লম্পট অন্যদিকে ভূসম্পত্তি ও অর্থলোলুপ হারু দত্ত আকালের সুযোগে গরীব সাধারণ মানুষের জমি জোরজবরদস্ত কেড়ে নিজের নামে করে নেয় নামমাত্র পয়সায়। বন্ধুর ছদ্মবেশে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে তবে ছাড়ে সে। কুঞ্জ তাই তাকে বলেছে - " টাকার

লোবানি দিয়ে দেশসুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এসেছে।” [১/৫] এছাড়াও হারু দত্ত মহাজনী কারবার, সুদী কারবার নারীচালান কারবার প্রভৃতি ব্যবসার সঙ্গো যুক্ত। খুকীর মা হারু দত্তের রক্ষিতা, সে তার সমস্ত অসৎ কাজের সহযোগী, যেমন ‘নীলদর্পণ’ নাটকের পদীময়রানী। খুকীর মার কথার প্যাঁচে , অভাবের দায়ে চন্দ্র এসেছে তার দুই কন্যাকে বিক্রি করতে। মন্বন্তরে পিস্ট মানুষদের হারু দত্ত ছদ্ম আশ্বাস দেয়-“ এই যে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের সব, এ কেন! কেন কী দরকার আমার নিয়ে যাবার উদ্যোগ করে! - দু’চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো! না হলে এতে আমার কী স্বার্থ আছে বল, য়্যাঁ!”[২/৪] হারু দত্ত অত্যন্ত ধুরন্ধর এবং চালাক ব্যবসায়ী তাই কাগজে টিপ সই নিয়ে সে চন্দরের মেয়েদের কিনে নেয়। চন্দর প্রথমে এই টিপ সই নেওয়ার ব্যাপারে হারু দত্তকে প্রশ্ন করলেও পরে অভাবের কথা ভেবে টিপ সই দিয়ে দেয়। এভাবে মন্বন্তরের সুযোগে নিয়ে গ্রামের মেয়েদের শহরে পাচার করে দেয় হারু দত্ত। কালীধন ধারা আড়তদার। চোরাই মালের কারবার-ব্ল্যাক মার্কেটের আখড়া কালীধন ধারার গুদাম। নিরঞ্জন কাজ করে কালীধন ধারার গুদামে। হারু দত্তের সঙ্গো কালীধনের ব্যবসাসূত্রে যোগ অতি নিবিড়। তাছাড়া নারীচালান কারবারও রয়েছে তাদের। কালীধনের কারবার সাধারণ মানুষের জন্য নয়। চতুর কালীধন জানে কিভাবে ব্ল্যাক মার্কেটে পণ্যের দাম বাড়াতে হয়। গুদামে প্রচুর চাল মজুত থাকলেও সুযোগ বুঝে খদ্দেরের কাছে চালের দাম হাঁকে। মজুতদারের যোগ্য সহযোগী রাজীলোচন গোমস্তা। খদ্দেরের অপমান করতে তার জুড়ি নাই। গেরস্ত ভদ্রলোক চালের জন্য এলে দাম নিয়ে কথাবার্তার সময় রাজীব বলে -“ অনর্থক তুমি কথা বাড়াও কালীধন। খ্যাদাইয়া দাও না, হুঁ।’ .. চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।” অপমানিত ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ ডাকার কথা বললে, উপহাসের হাসি হেসে ওঠে রাজীব।” ... আরে এগুলা কি পাগল না দ্যাখছ কালীধন, কয় বলে পুলিশ ডাকুম। বলে পুলিশ ডাকুম। আরে কত জজ ম্যাজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাকে রাইখপ্যার পারে তা নি জানো। ...” [২/১] একথা সত্য যে পুলিশের অর্থকাঙাল মনোবৃত্তি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে কালোবাজারী ব্যবসাকে ফুলে ফেঁপে উঠতে সাহায্য করেছিল। মানুষের মনুষ্যত্ব বোধের অবক্ষয় ঘটে এই সময়ে। জেগে ওঠে অর্থলোলুপতা। অন্যান্য কারবারের সঙ্গো সঙ্গো নারী চালানের মতো কারবারও শুরু হয় কালোবাজারে। নাটকে দেখা যায় খাবার খুঁজতে গিয়ে টাউটের ফাঁদে পড়ে নিরঞ্জনের স্ত্রী বিনোদিনী। তাকে নিয়ে আসা হয় কালীধনের সেবাশ্রমে। সেবাশ্রমের অন্তরালে চলে নারী চালানকারী কারবার। সেবাশ্রমের নাম করে সেখানে ধরে নিয়ে আসা হয় গ্রামের অসহায় বাবা-মায়ের কন্যা সন্তানদের। নিরঞ্জন রাখহরি নাম নিয়ে কালীধনের গুদামে কাজ করে এবং বিনোদিনীর সঙ্গো দেখা হয়। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ক্রোধে, ক্ষোভে ফেটে পড়ে নিরঞ্জন। নিরঞ্জন বিনোদিনী ও

অন্যান্য মেয়েদের উদ্ধারের জন্য ও চাল কিনতে আসা অপমানিত ভদ্রলোক পুলিশ নিয়ে প্রবেশ করে কালীধনের গুদামে। চালের মজুতদারী ও চোরাকারবারীর অভিযোগ এবং নারী চালানের অভিযোগে কালীধন, হারু দত্ত ও রাজীবকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে গ্রেপ্তার করা হলেও তাদের নির্বিকার নিশ্চিন্ত ভঙ্গী থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, অসাধু ব্যবসায়ী এবং পুলিশ ও প্রশাসনের অশুভ আর্থিক আঁতাতের ফলে বেশীদিন তারা শ্রীঘরে থাকবে না।

**ব্ল্যাক-আউট :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাপানী বোমাবর্ষণের হাত থেকে বড় বড় শহরগুলিকে রক্ষা করার জন্য ইংরেজরা নিজ অধিকৃত এলাকায় রাত্রিকালে 'ব্ল্যাক-আউট' বা নিষ্প্রদীপ আইন চালু করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষজনিত খাদ্যসংকটের মোকাবিলায় প্রণীত হয়েছিল ভারতরক্ষা বিধান। এই বিধান অনুযায়ী, উৎসব বাড়িতে নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা হবে পঞ্চাশ। তার উর্ধে হলে তা দন্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু সমাজের বিলাসী ও সুযোগ সন্ধানী ধনীশ্রেণীর মানুষ এই বিধানকে (আইন) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে তৎপর।[২/৩] দৃশ্যে দেখা যায় উৎসব বাড়িতে চেয়ারের গা বেয়ে বিজলিবাতির আলোর রোশনাইয়ের বিপুল আয়োজন। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা নিয়ে উপস্থিত ব্যক্তির পরস্পরের কথাবার্তার মধ্যদিয়ে উঠে এসেছে।

" তৃতীয় ভদ্রলোক। পুরোপুরি এক হাজার। হল কী হে, পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষা -বিধানে লটকে যাবে যে বাবা।

বড় কর্তা। হ্যাঁ, ও বিধান আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে .. (হাসি) আর কী করেই বা কম করি বলো? এই তো ফ্রেন্ডস এন্ড রিলেশন যা এখানে রয়ে গেছে, তাঁদের সংখ্যাই তো তোমার শ' পাঁচেকের কম নয়।[২/৩]

শুধু আইনের অবমাননা নয় ২য়, ৩য় ভদ্রলোক ও বাড়ির বড়কর্তা সবাই ব্ল্যাক-মার্কেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওই বাড়ির প্রান্তিক কোণে অবস্থিত ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট ঘিরে তখন চলছিল মানুষ আর কুকুরের লড়াই। মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ কুকুরের গোঙানির শব্দ ভেসে আসছিল। ক্ষুব্ধ কুকুরটি একসময় কুঞ্জর হাতে কামড়ে দেয় বীভৎস ভাবে। রাধিকা ক্ষিপ্ত হয়ে কুকুরটিকে গালি দেয়-" ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা। (কুকুরকে ) দূর হারামজাদা লক্ষীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো । ছাই খা, ছাই খা।" [২/৩] এই দৃশ্য মন্বন্তরের যে নারকীয় বিভীষিকা ক্ষুধার্ত মানব ও পশুকে একাসনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে সেই ছবি ধরা পড়ে। কালোবাজারীর পৃষ্টপোষক ও আশ্রয়দাতা শ্রেনির বিবেকহীনতা দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠা শ্রেণির নির্মমতা যেমন এই দৃশ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি কুকুরের দংশক্ষতে কুঞ্জের স্ত্রী রাধিকা তার পরনের একমাত্র শাড়ীখানি ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। কুঞ্জর হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে রাধিকার চোখে জল আসে। শত অভাব অনটনের

মধ্যেও স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক প্রেম সহানুভূতির সম্পর্কটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে- মানুষের শাশ্বত সম্পর্কের এই দিকটি বাইরের ঝড় ঝাপটায় আজও অক্ষত। ভালোবাসার অমল আশ্রয় যে এখনো এই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত সর্বহারা মানুষের মধ্যে বেঁচে আছে সেই সত্য আলোকিত করতে চেয়েছেন নাট্যকার।

এছাড়া তৃতীয় অঙ্কের প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখতে পাই চিকিৎসাকেন্দ্র ও লঙ্গারখানার ছবি। এ সময় দুঃস্থ মানুষদের চিকিৎসার নামে এবং লঙ্গারখানায় খাদ্যের অপ্রতুলতা নিয়ে যে প্রহসন চলেছিল তারই জীবন্ত ছবি এই দৃশ্য গুলিতে নাট্যকার উপস্থাপিত করেছেন অত্যন্ত নিপুণভাবে। সমকালের নানা ঘটনার বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণ শক্তির নিপুণ দক্ষতায় নাট্যকার 'নবান্ন' নাটকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখক ঃ **রেণুকা অধিকারী,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দুর্গাপুর সরকারি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ।

# নাট্যব্যক্তিত্ব অজিত কুমার মজুমদার একটি পর্যালোচনা

**মলয় দেব**

ত্রিপুরায় বাংলা নাট্যচর্চার সূত্রপাত ঘটে মাণিক্যযুগে। মাণিক্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উনিশ শতকের নব্বই-এর দশক রাজসভার অন্দরমহলে, রাজকীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করা হতো। কিন্তু এতে অন্ত:পুরের নাট্যমোদীদের পিপাসা নিবৃত্তি হলেও সাধারণ মানুষের নাট্যরস আস্বাদনের কোন সুযোগ ছিল না। এমতাবস্থায় ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ত্রিপুরেশ মজুমদার রাজদরবারের গণ্ডী থেকে নাটককে মুক্ত করার লক্ষ্যে গড়ে তুলেন 'ত্রিপুর শিল্পায়তন' নামক প্রতিষ্ঠান। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ বিভিন্ন ধারার নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত হলেন।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষের পার্টিশন ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতভুক্তির মধ্য দিয়ে রাজতন্ত্র থেকে ত্রিপুরার গণতন্ত্রেও উত্তরণ ঘটে। পার্টিশনের ফলে জেলা ত্রিপুরা ও পূর্বপাকিস্তানের অন্যান্য জেলা থেকেও উদ্বাস্তু মানুষের ঢল নামে ত্রিপুরায়। ফলত প্রচলিত জীবনবোধের সঙ্গে পরিবর্তিত সমাজ মানসের, চিন্তা-চেতনার বিস্তর পার্থক্য সৃজিত হয়। রাজন্য আমলের অন্তিম পর্বে সুধাংশু দত্ত, অনিল সেন, নগেন্দ্র দেববর্মা, নীলরতন গাঙ্গুলি, স্মরজিৎ চক্রবর্তী, ত্রিপুরেশ মজুমদার প্রমুখ নাট্যমোদীদের চিত্তভূমিতে গণনাট্য আন্দোলনের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে ত্রিপুরার জনমানসকে ও নান্দনিক মূল্যবোধকে উদ্দীপ্ত করে। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের তুলনায় জীবনমুখী নাট্যরচনার বিস্তার ঘটে। পরিচালনা, মঞ্চায়ন, রূপসজ্জা, আলোকসজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও ঘটে ব্যাপক পরিবর্তন। এই প্রেক্ষাপটে নট-নাট্যকার-পরিচালক অজিত মজুমদারের আত্মপ্রকাশ (জন্ম ১০ জুন, ১৯৪০ মৃত্যু ২০১৭)।

অজিত মজুমদারের পিতৃদত্ত নাম অজিত রঞ্জন মজুমদার। অধিকাংশ সময়ই তিনি তাঁর মধ্য নাম 'রঞ্জন' ব্যবহার করতেন না। কৈশোরকাল থেকেই গল্প-কবিতা পাঠে তাঁর নেশা ছিল। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি গল্প - কবিতা রচনায় হাত দেন। তৎকালীন সময়ে আগরতলা থেকে প্রকাশিত বীরেশ্বর ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর 'কবরের কান্না' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' গল্প দুটি প্রকাশিত হয়।[১] ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্রেণীতে তিনি যখন পড়তেন তখন বিয়েবাড়ির এক বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে 'বিয়েবাড়ি' নামে একটি একাঙ্কিকা রচনা করেন। এটিই অজিত মজুমদারের প্রথম নাট্যসৃষ্টি। বিয়েবাড়িতে

পাত্রীপক্ষের বড়কুটুম্ব হলেন বরযাত্রীরা। বরপক্ষের লোকজনের যাতে কোন ব্যাপারে মনে আঘাত না পায় সেদিকেই কন্যাপক্ষের লোকজনের নজর থাকে। কন্যাপক্ষের সেই অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বরযাত্রীরা খাওয়া-দাওয়া নিয়ে তাদেরকে কীভাবে হেনস্থা করেছিল সেই ঘটনাটি কিশোর নাট্যকারের মনোভূমিতে যে প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিয়েছিল তারই বহি:প্রকাশ 'বিয়েবাড়ি' নামক একাঙ্কিকা। ক্ষুদ্রাকৃতির এই একাঙ্কিকা উমাকান্ত একাডেমির ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। ১৯৫৫-৫৬ খ্রিষ্টাব্দে একাঙ্কিকাটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।[২] ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পর তিনি 'পরিণীতা' নামে একটি নাটক রচনা করেন এবং এর কিছুদিন পর 'শিল্পশ্রী' নামে একটি নাট্য সংস্থা গঠন করেন। তাঁর নির্দেশনায় তুলসীবতী স্কুলের হলে এই সংস্থা মঞ্চস্থ করে 'পরিণীতা' (১৩ জুন, ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দ)। নাট্যকার নাটকের একটি চরিত্রেও অভিনয় করেন। আর এভাবেই তাঁর অভিনয়ে হাতে খড়ি।[৩] নাট্যপ্রাণ ওই একই বছর ১৫ জুলাই 'শিল্পশ্রী' কৃষ্টিভবন, বড়দোয়ালি স্কুল হলে 'কালোমেঘ' নামেও মঞ্চস্থ হয়েছিল।[৪] নাট্যপ্রাণ ওই মানুষটি তাঁর দীর্ঘ জীবনে একাধিক নাটকের নির্দেশনা যেমন করেছেন তেমনি বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ও করেছেন। পূর্ণাঙ্গ ও একাঙ্ক নাটক মিলিয়ে তিনি ৪৫টি নাটক রচনা করেছেন। প্রস্তাবিত নাট্যকারের কয়েকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নাটক বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে আলোচিত হবে।

২

বাংলা নাট্য সাহিত্যের দুটি সমৃদ্ধ ধারা হল পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটকের ধারা। অজিত মজুমদারও এই দুই ধারার কয়েকটি নাটক পরিচালনা করেছেন। পৌরাণিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা থেকে সরে এসে তিনি পুরাণ কাহিনিকে সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নবনির্মাণে প্রয়াসী থেকেছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের 'তরণীসেন বধ' আখ্যানটি কবির নিজস্ব সংযোজন। এই আখ্যানে কৃত্তিবাস দেখিয়েছেন, বিভীষণ রামশিবিরে যোগ দেওয়ায় তার প্রতিশোধ নেবার জন্য কিভাবে বিভীষণ পুত্র দ্বাদশ বর্ষীয় বালক তরণীসেনকে যুদ্ধযাত্রার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। রাজ বাক্য শিরোধার্য করে সমস্ত শরীরে রামনাম লিখে তরণীর যুদ্ধযাত্রা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পিতার সম্মুখে রামের হাতে তার মৃত্যু ও বিভীষণের অন্তর্যন্ত্রণা এই আখ্যানে বর্ণিত হয়েছে। অজিত মজুমদার তাঁর বেতার নাটক 'তরণীসেন বধ' (আগরতলা বেতার থেকে সম্প্রচারিত, ১৯মে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ-) কৃত্তিবাসী আখ্যানকে প্রায় অবিকৃত রেখে তরণীসেনের চরিত্রে দেশপ্রেমী সত্তা আরোপ করেছেন। বক্তব্যের সমর্থনে বিভীষণের প্রতি তরণীসেনের একটি উক্তি নীচে দেওয়া হল- "দেশ!! দেশ!! দেশ!! দেশের কথাই যদি তুমি ভাববে তবে দেশের ভেতরে থেকে তুমি ভাবলে না কেন? দেশের শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখন তুমি ধর্মের দোহাই দিচ্ছ! স্বধর্ম রক্ষার প্রতি তোমার যে কর্তব্য ছিল, কোথায় তুমি তা রক্ষা করেছ?"[৫] মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রী চণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের মহিষাসুর বধ অবলম্বনে তিনি 'মাহিষাসুরমর্দিনী' চিত্রধর্মী নাটকটি

রচনা করেন। এটি আগরতলা দূরদর্শন থেকে মহালয়া উপলক্ষ্যে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ অক্টোবর ভোরের বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে প্রচারিত হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি নাটকটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন ' যে যুদ্ধ আজো'। পুরাণের আধারে এই নাটকের বিভিন্ন নাট্যমুহূর্ত ও সংলাপ রচনায় নাট্যকারের বাস্তব জীবনবোধ দীপ্র হয়ে উঠেছে এবং বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী যে অশুভ শক্তি জেগে উঠেছে তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রয়াসে শুভ শক্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী আসুরিক শক্তির বিরুদ্ধে মানবসভ্যতার কল্যাণে গণমানুষের অভ্যুত্থান কতোটা জরুরী সেই কথাই মানবিচেতনার আলোকে বলতে চেয়েছেন নাট্যকার এই নাটকের মধ্য দিয়ে। এই একই বিষয় অবলম্বনে পূজা প্যান্ডেলের উপযোগী করে তিনি 'দুর্গতিনাশিনী' (৪।৯।২০০৮) নামক একাঙ্কিকা রচন করেন। ঐতিহাসিক নাটকে তথ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তিনি কাহিনি নির্মাণ করেছেন। তাঁর 'স্বর্গাদপী গরিয়সী' (১৯৭৯) নাটকে ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ সিংহতুঙ্গোর রাজত্বকালে গৌড়ের নবাব বাহিনী কর্তৃক ত্রিপুরা আক্রান্ত হলে মহারানি মহাদেবী কিভাবে সৈন্যদলের মনোবল বৃদ্ধি করে নিজে সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিলেন তাই নাট্যায়িত হয়েছে। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হলে তিনি তাঁর '১৯৬৫' নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটি একাধিকবার 'মায়ের ডাক' নামেও মঞ্চস্থ হয়েছে।[৬] নাট্যশিল্পী সংসদ কর্তৃক ১৭ এপ্রিল১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে নাটকটি প্রথম মঞ্চায়িত হয়।[৭] নাটকে তৎকালীন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্র লাল সিংহও অভিনয় করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তি যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তিনি দুটি নাটক রচনা করেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শেলিং-এর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তখন নাট্যকার অধিকাংশ সময় বাংকারে কাটিয়েছেন। বাংকারে বসেই তিনি 'জয়বাংলা' ও 'বাদশা' নাটক দুটি রচনা করেন। জয়বাংলা নাটকটি ঘরোয়া শিল্পী সংসদ তুলসীবতী ক্যাম্পাস হলে ২৪ এপ্রিল ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মঞ্চস্থ করে। পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে নাটকটি প্রদর্শিত হয়েছিল।[৮] তাঁর 'ভারত নাট্যম ' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় শিক্ষা অধিকার বিনোদন সংস্থা কর্তৃক ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে। এই নাটকে নাট্যকার ভারতের ঐতিহাসিক কালের সূচনা লগ্ন থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক কাল পর্যন্ত ভারতমাতা বারংবার কেন বিদেশীর হাতে লাঞ্ছিত হলেন তার কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি দৃষ্টান্তসহ দেখিয়েছেন ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের জন্য কতিপয় লোক দেশকে কিভাবে শৃঙ্খলিত করেছে সেই সত্যটিকেও । ত্রিপুরার ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিসর্জন নাটকটি রচনা করেন। হিংসাজয়ী এই নাটকের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে অজিত মজুমদার বিশ্বজোড়া ধর্মীয় মৌলবাদের মুখোস উন্মোচনের লক্ষ্যে ধাপ্পাবাজ রঘুপতির সমস্ত রকমের প্ররোচনা ফাঁস করার নিমিত্তে যে তদন্ত অভিযান চালিয়েছিলেন তারই ফল পরিনাম 'ময়না তদন্ত' (১৯৯১-৯২) নাটকটি।

৩

গণনাট্য আন্দোলনের ভাবাদর্শ অজিত মজুমদারের চিত্তভূমিকে গভীরভাবে

আন্দোলিত করে। তাঁর নাট্যচিন্তার মর্মমূলে তাই গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে গণমানুষের কল্যাণ। কোনরকমের চমক, চটক নয়; বাস্তবতা ও জীবনমুখীনতার বলিষ্ঠ রূপায়নই তাঁর অধিকাংশ নাটকের প্রাণভোমরা। 'গণজীবনের বিরাট এক গোষ্ঠী নিয়ে' বিজন ভট্টাচার্য যেমন তাঁর 'নবান্ন' পরিকল্পনা করেছিলেন তেমনি অজিত মজুমদারও তাঁর একাধিক নাটকে স্বীয় অভিজ্ঞতাশ্রয়ী বাস্তবতাকে মানবিক দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। ফলত ত্রিপুরার আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে রচিত 'যুগান্তর' (১৯৬২), 'ঝংকার(১৯৬৯), 'অগ্নিবন্যা'(১৯৮৪) প্রভৃতি নাটকে 'জনগণমন'- এর কথাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'যুগান্তর' নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করে 'সুরমন্দির' মহারানি তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে ৮ জুন, ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। ১০ এই নাটকের প্রেক্ষাপটে রয়েছে ত্রিপুরার পাহাড়ি জনপদের সার্বিক উন্নতি ও নির্মীয়মান ৪৪নং আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে সড়কটি পূর্বে কুর্তী সড়ক নামে পরিচিত ছিল। ক্ষিতিশ ও নগেনের সঙ্গে সরকারী কর্মচারী সুব্রত-র সংলাপে উপর্যুক্ত বিষয়গুলি স্পষ্ট হয়ে উঠে-

"সুব্রত : নগেন তোমার ছেলেটাকে স্কুলে দিচ্ছ না কেন?
নগেন : কাজকর্মের একটু অসুবিধা হচ্ছিল তাই...
সুব্রত : এ তো বড় অন্যায় কথা। কাল থেকে পাঠিয়ে দেবে। আচ্ছা ক্ষিতিশ তোমার বাড়ী থেকে আসার রাস্তাটা বোধহয় তৈরি হয়ে গেছে তাই না।
ক্ষিতিশ : আজ্ঞে বাবু।
সুব্রত : হুঁ! পাশের বাগানটার কাজ কি শেষ হয়েছে?
ক্ষিতিশ : হ্যাঁ বাবু।
সুব্রত : সারা ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল খনিজ সম্পদ। এই কাজের জন্য বনপথ হয়েছে ১০৪ মাইল।
নগেন : বনপথের কাজে ভয়ও বেশী, কষ্টও বেশী বাবু।
ক্ষিতিশ : হ্যাঁ বাবু, বড্ড কষ্ট।
সুব্রত : কষ্টের সঙ্গেই যে আমাদের লড়াই।
নগেন : বাবু শুনেছি ত্রিপুরায় নাকি কমলালেবুর বাগান করা হয়েছে।
সুব্রত : হ্যাঁ, ৪১০ একর জমিতে শুধু কমলালেবু আর কাজুবাদাম।" [১১]

তাছাড়া এই নাটকটিতে সরকারের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আত্মীয় পরিজন ছেড়ে শহর থেকে সুব্রতর পাহাড়ি অঞ্চলে যাবার পর তা তার মনের টানাপোড়েন, গ্রামীণ সমাজে মোড়লের শোষণ ও চক্রান্ত, মনোহরের মতো সহজ-সরল গ্রামবাসীকে সুব্রতর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়া, সুব্রতকে কেষ্ট বুড়োর আগাম সতর্কতা, মনোহরের ভুল সংশোধন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

১৭ অক্টোবর ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে তুলসীবতী ক্যাম্পাস হলে প্রথম অভিনীত হয় তার

'ঝংকার' নাটকটি। গণনাট্যের আদর্শকে ধারণ করে দেশভাগের ফলে বিপন্ন হয়ে আসা ছিন্নমূল মানুষদের আর্থ-সামাজিক সংকট ও শোষক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, প্রতিবাদ-প্রতিরোধই এই নাটকের মূল বিষয়। ত্রিপুরার মেলাঘরের রুদ্রসাগর অঞ্চলের উদ্বাস্তু মানুষেরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও শিক্ষিত ও সচেতন গোপালের নেতৃত্বে প্রতাপশালী নারায়ণের কূট চক্রান্তকে প্রতিহত করে 'গঙ্গাসাগর সমবায় সমিতি' গঠন করে এবং বিল ও বিলের পাড়ের জমি তাদের অধিকারে নিতে সক্ষম হয়। ধনের অসম বন্টন নয়, সমবন্টনই আর্থ - সামাজিক স্থিতি ফিরিয়ে আনতে পারে এই দীপ্ত বোধই নাটকের সমবায় গঠন ও ধর্মগোলা স্থাপনের মধ্য দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে। বাস্তব জীবন থেকে আহোরিত এই নটাকটি সম্পর্কে মন্মথ রায় যথার্থই বলেছেন।- " যুগ যুগান্তের শোষণ নির্যাতন পীড়নের বিরুদ্ধে জাতি আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই বিদ্রোহের সাফল্যের উপরই নির্ভর করছে ধনবৈষম্য-বিদূরিত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই সমাজতন্ত্রের জমি তৈরী করার মহাসাধনাই আজ আমাদের নাটকের পরম ব্রত। দেখে আনন্দিত হয়েছি অজিত মজুমদারের 'ঝংকার' এই সাধনাতে উজ্জ্বল। ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র চিত্রণ, নাটকীয় সঙ্ঘর্ষরচনা এবং অভিনেয়তা-- উৎকৃষ্ট নাটকের গুণগুলি এই নাটকে ঝঙ্কৃত।"[১২]

ছিন্নমূল মানুষদের জীবন যন্ত্রণা নিয়ে অজিত মুজমদার 'ভাঙা হাট' (১৯৬২) নামে আরেকটি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে উদ্বাস্তুদের অনিচ্ছাসত্বেও বলপূর্বক দন্ডকারণ্যে প্রেরণের জন্য গাড়িতে তুলে দেওয়া এবং সেখান থেকে তাদের পালিয়ে যাওয়ার চিত্র কলেজ পড়ুয়া নাট্যকারের মনকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। আর সেই মর্মযন্ত্রণা থেকে জন্ম নেয় 'ভাঙা হাট' নাটকটি। এম বি বি কলেজের 'ফ্রেসার্স ওয়েলকাম' অনুষ্ঠানে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় এবং দর্শকদের প্রভূত প্রশংসা কুড়িয়ে নেয়।[১৩] ত্রিপুরার আর্থ -সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের দ্বন্দ্বময়তা এবং প্রকৃতির নানা প্রতিকূলতাকে অবলম্বন করে অজিত মজুমদার রচনা করেন তাঁর 'অগ্নিবন্যা' (জুন, ১৯৮৪) একাঙ্কিকা। ৮০'র দাঙ্গা পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতিকে নাটকে নিয়ে এসে নাট্যকার সম্প্রীতির বার্তা দিতে চেয়েছেন। নাটকে ব্যবহৃত ঘোষক চরিত্রের সংলাপগুলি অতি দীর্ঘ। যা নাটকটির একটি বড় ত্রুটি।

৪

সমাজ সমস্যামূলক তাঁর দুটি বিখ্যাত নাটক হল- 'বৃহন্নলাপালা' ও 'পুতুল খেলা'। বৃহন্নলাদের উপর নির্যাতন শুরু হয় তাদের পরিবার থেকে। প্রচলিত সামাজিক কাঠামোতে হিজড়েদের কোন স্থান নেই। কোন সন্তান তার বয়:সন্ধিকালে যখন নিজের লিঙ্গ নিয়ে সমস্যায় পড়ে তখন তার পরিবারের সদস্যরা ভয়ে তার পাশে দাঁড়ানো দূরে থাক, উল্টে সেই সন্তানের উপর শুরু করে দেয় মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। সতীর্থরাও তাকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকেও তারা পাশে পায় না। ন্যূনতম

মানুষ হিসেবে বাঁচার আশায় তখন তারা হিজড়ে সমাজের দ্বারস্থ হতে চায়। কিন্তু সেই সমাজেও বেঁচে থাকা সহজ কথা নয়। দিনাতিপাতের জন্য কখনো তারা ভিক্ষাবৃত্তি আবার কখনো দেহ ব্যবসা বা অন্য কোন পেশাও গ্রহণ করে। মা-বাবারা তাদের হিজড়ে সন্তানকে সন্তান হিসেবে যেমন পরিচয় দিতে চায় না, তেমনি সম্পত্তি থেকেও করে বঞ্চিত। সামাজিক ও পারিবারিক অবহেলা,অনাদরই তাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করে।

ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে যারা জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাদের লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা রয়েছে তাদেরকেই ভারতীয় উপমহাদেশে হিজড়ে বলে অভিহিত করা হয়। অসহায় দরিদ্র এই হিজড়েরা পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত। ট্রেনে, বাসে নিত্য যাতায়াতকালে নারীবেশধারী যে হিজড়েদের সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের অনেকটা মিশ্রিত কণ্ঠস্বর; না নারীর, না পুরুষের। দুহাতে তালি বাজিয়ে, কোমর দুলিয়ে বিশেষ অঙ্গাভঙ্গিতে তারা কথা বলে এবং ভিক্ষা করে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হিজড়ে ও রূপান্তরিত লিঙ্গের ব্যক্তিদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে আইনি স্বীকৃতি প্রদান করে। "In 2014 Indian Supreme Court in NALSAV India ruled that transgender people should be recognized as a third gender and enjoy employment. Justice K. S. Radhakrishnan writing for the bench, ordered that "Transgender Persons' right to decided their self identified gender" should be recognized by state and federal authorities. The Court made clear that 'any insistence for [sex reassignment surgery] for declaring one's gender is immoral and illegal."[১৪] প্রতিটি হিজড়ে সমাজের আর পাঁচজনের মতো 'মানুষ' হিসেবে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে চায়। অথচ সমাজ তাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। বর্তমানে ভারত রাষ্ট্র হিজড়েদের স্বীকৃতি জানালেও তাদের প্রতি সমাজ মানসিকতার তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যয় না।

হিজড়েদের এই সমস্যাবহুল জীবন যন্ত্রণা শিল্পীত রূপ পেয়েছে অজিত মজুমদারের নন্দনে। তাঁর সমাজবীক্ষা, উদার মানবিকতা ও বিজ্ঞান চেতনার ফসল 'বৃহন্নলা পালা' নাটকটি। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী বৎসর উপলক্ষে নাটকটি রচিত হয় এবং ১৯ ডিসেম্বর ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে 'ডি . এম'স রিক্রিয়েশন ক্লাবের' ব্যবস্থাপনায় ত্রয়োদশ আন্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

পণের অভিশাপে আমাদের সমাজে কত মেয়েরা যে অকালে ঝরে পড়ে তার মর্মন্তুদ আখ্যান নাট্যকারের 'পুতুল খেলা' নাটকটি। এই নাটকে তিনি অত্যন্ত সহল-সরল, ঋজু সংলাপে কয়েকটি পুতুলের মধ্য দিয়ে একদিকে কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকদের অসহায়তা আর অন্যদিকে বধূ নির্যাতনের বহুমাত্রিক রূপকে চিত্রায়িত করেছেন। নাটকটি পড়লে মনে হয় প্রতিটি সংলাপ যেন আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে নেওয়া। এই নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ

হয় ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রাচ্যভারতী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

বাংলা নাটকের হাজার বছরের ঋদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেখা যায় লেখ্য রীতির নাট্য আঙ্গিকের পাশাপাশি মৌখিক রীতির লোকনাট্য রীতিও বহমান রয়েছে। উপযুক্ত পরিচর্যার অভাবে সেই মৌখিক রীতির নাট্য ঐতিহ্য ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে। গ্রামে-গঞ্জে দু'একজন শিল্পী এখনও সেই ধারাকে সযত্নে পরিচর্যা করে চলেছেন। তাঁদের আন্তরিক প্রয়াসের মধ্যে বাংলার নাট্যাভিনয় রীতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য পরিবর্তন, পরিমার্জনের হাত ধরে এখনও টিকে আছে। বাংলার লোকনাট্যের গায়েন একই সঙ্গে কথক বা বর্ণনাকারীর ভূমিকায় আসীন থাকেন। চরিত্রাভিনেতাও গায়েনের মধ্যে বিলীন হয়ে যান। 'বেহুলার ভাসান গান' 'অষ্টক গান ' বা গাজির গানে এই বৈশিষ্টগুলি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। আধুনিক বাংলা নাটকে পাশচাত্যের নাট্যরীতির যে প্রভাব রয়েছে তা কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বাংলার নিজস্ব লোকনাট্য ও তার পরিবেশনরীতি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে। অজিত মজুমদার বাংলার আধুনিক নাট্যচর্চা ও পরিবেশনরীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর বেশিরভাগ নাটকে গায়েন, সূত্রধর প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করে সেই চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করতে চেয়েছেন। কোন কোন নাটকে একই চরিত্র পোশাক পরিবর্তন করে একাধিক চরিত্রেও অভিনয় করেছে। নাট্য নির্দেশনায় স্বয়ং নাট্যকারও কখনো দ্বৈতাভিনয়, আবার কখনো অদ্বৈত অভিনয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, বাংলার ঐতিহ্যবাহী গীতিকাগুলির মধ্যে চন্দ্রাবতী ও মহুয়া গীতিকা; মনসা মঙ্গল ও লোককথাশ্রয়ী জসীমউদ্দিনের 'নক্সীকাঁথার মাঠ' কাব্যের নাট্যরূপ দিয়েছেন। বাংলার মধ্যযুগের সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম উপাদান মনসামঙ্গল অবলম্বনে তাঁর রচিত গীতিনৃত্যনাট্য 'চাঁদ মনসার পালা'য় তিনি ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নৃত্য ও গীতের ব্যবহার করে বিবিধের মাঝে ঐক্যের সুরকে ফুটিয়ে তুলতে সচেস্ট হয়েছেন।[১৫] 'নক্সীকাঁথার মাঠ' নাটকে সমস্ত সংকীর্ণতার উর্দ্ধে মানবিকতা, ত্যাগ, প্রেম ও শোষণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা কৃষক জীবনের প্রেক্ষাপটে চিত্রিত হয়েছে। নাট্যকারের নির্দেশনায় ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে 'লোকশ্রী' নাটকটির প্রথম মঞ্চায়ন করে।[১৬] এই নাটকটির প্রকাশকের কথা'য় শুভব্রত দেব যথার্থই লিখেছেন- "নক্সীকাঁথার মাঠ শুধু ত্রিপুরা নয় ভারতবর্ষের নাট্যজগতে একটি বিরল সৃষ্টি। নাট্যকার অজিত মজুমদার আমার অগ্রজ প্রতীম; যেমন লেখনশৈলীর দিক থেকে তেমনি মঞ্চসফলতার প্রশ্নে অনন্য হয়ে আছে ইতিমধ্যে। নক্সীকাঁথার মাঠ যেগুলোর মধ্যে অন্যতম। "[১৭] আবার বাংলার চিরায়ত প্রেমভাবনা ঋদ্ধ মহুয়া ও নদের চাঁদের বেদনাবিধুর কাহিনি 'চাঁদ-মহুয়ার পালা'য় (২৯।০৩।১৯৯৩) নাট্যায়িত হয়েছে। নাটকের অন্তিমে গায়েন ও কোরাসের মুখে এই কথাই ধ্বনিত হয়েছে। ময়মনসিংহ গীতিকার চন্দ্রাবতী-জয়চন্দ্রের বিয়োগান্তক প্রেম কাহিনি অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন তাঁর 'ঢেউ ভাঙ্গা ঢেউ' নাটকটি। নাটকটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন, আগরতলায় ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকে প্রেমের সর্বনাশা ও কল্যাণময় রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কাম ও রূপাসক্তি জয়ানন্দ্রে প্রেমকে করে তুলেছে সর্বনাশা আর কামনা বাসনা বিযুক্ত চন্দ্রাবতীর প্রেম হয়ে উঠেছে কল্যাণময়ী। এই সমস্ত দিক বিবেচনায় বলা যায়, নট-নাট্যকার অজিত মজুমদার বাংলা লোকনাট্যের ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করেই নাটক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

এছাড়া তিনি আরও অনেক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। যুদ্ধের মতো রাজনৈতিক বিষয়কে নিয়ে তিনি রচনা করেছেন তাঁর 'সভ্যতার সংলাপ' (১৯৮২) নাটকটি। এই নাটকে যুদ্ধবাজদের যুদ্ধোন্মত্ততার বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। ১৯৮২-৮৩ খ্রিষ্টাব্দে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ করে সমবায় দপ্তর কর্মচারী বিনোদন সংস্থা। তাঁর রচিত 'ব্যাধ সমাচার'(বেতারে প্রচারিত ১৯৯৪) প্রচলিত ব্রতকথা অবলম্বনে রচিত। শ্রমিক জীবনের সমস্যা নিয়ে তিনি লিখেছেন 'আরো একবার' (বেতারে প্রচারিত ১৯৯৪) ও জন হেনরি (পুতুল নাটক)। তাঁর হাল্কা রসাশ্রিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'সাজার বাহার', (১৯৮০), 'মধুরেণু সমাপয়েত' (১৯৮৩),'মরুবিজয়'(১৯৮৪), 'গুপ্তধন'(১৯৮৮), 'নাককাটা রাজা'(১৯৯৩), 'উপহার' (১৯৯৭), 'সাবরুটিন' (২০০৪), 'অকাল বোধন'(১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫)। আবার তাঁর রচিত দুটি বিজ্ঞান নাটক হল- শপথ'(১৯৮৯) ও 'মঙ্গালদীপ'(২০০৬)।

তিনি আবার রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার', 'তোতাকাহিনী', Oscar Wilde এর 'Selfish Giant', প্রেমচন্দের 'কফিন', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'একটি মোরগের কাহিনী' প্রভৃতি গল্প ও কবিতার নাট্যরূপ দিয়েছেন। সেবাব্রতে বিশ্বাসী মাদার টেরেসাকে নিয়ে লিখেছেন জীবনীনাটক 'মাদার টেরেসা'(২০০৩)। সেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকটির বাংলায় অনুবাদও করেছেন।

৬

অজিত মজুমদার নাটকের বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাংলার লোকজীবন ও সংস্কৃতি, ত্রিপুরার স্থানীয় পটভূমি, জাতীয় সংহতি, যুদ্ধ ও দাঙ্গা বিরোধী মনোভাব, বিশেষভাবে সক্ষম, সাম্যবাদী চিন্তাভাবনা, বিবিধ সংস্কার, অশিক্ষা প্রভৃতির বিরোধিতা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির দিকেই অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। কোনো কোনো নাটকের রঙ্গাব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে তিনি মানব জীবনের গূঢ় সত্যকে পরিস্ফুট করেছেন। আবার জীবনের অন্তিমপর্বে তিনি সমগ্র গীতার নাট্যরূপও দিয়েছেন। 'গীতার বাস্তবোচিত জীবনধর্মী নানা বিষয়'ই তাঁকে গীতার নাট্যরূপান্তরে প্রাণিত করেছিল। আর এভাবেই তাঁর নাটকে এসেছে বৈচিত্র্য। মঞ্চের বাস্তবতা ও শিল্পবোধ সম্পর্কে সচেতনা তাঁর নাটকগুলিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। অধিকাংশ নাটকে কথ্যভাষা সংলাপে ঠাঁই পেয়েছে। যা চরিত্রের বাস্তবতাকে আরো বেশী স্পষ্ট করে তুলেছে। তাঁর নাটকে বিচিত্রতর বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে নিরপেক্ষভাবে। শোষণ, বঞ্চনা, সংস্কারের আঁধিতে আক্রান্ত লোকায়ত সমাজবৃত্তের গণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও মানবিকতা বৃদ্ধি

তাঁর নাটকের অন্বিষ্ট। নাটকের সাহিত্যগত ও প্রয়োগগত এই দুটো দিকের প্রতি সচেতন থেকেই তিনি তাঁর নাট্যচর্চা করে গেছেন এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিস্তার ঘটিয়েছেন।

**তথ্যসূত্র**

১। ঝুমি বণিক, 'এতদিন কলমের ভাষায় লিখেছেন, এখন ক্যামেরার ভাষায় বলতে চান অজিতবাবু', দৈনিক আরোহণ, সোমবার, ২৪ এপ্রিল, ২০০৬, আগরতলা।
২। হরিপদ সাহা, 'বহুরূপে রূপকার অজিত মজুমদার', দৈনিক সংবাদ, সংবাদ বিনোদন, রবিবার, ১৪ আগস্ট, ২০০৫, আগরতলা।
৩। তদেব; নারায়ণ দেব, ২০২২, ৪৬
৪। ঝুমি বণিক, পূর্বোক্ত, নারায়ণ দেব, ২০২২, ৪৬।
৫। অজিত মজুমদার, তরণীসেন বধ, অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি
৬। হরিহর সাহা, পূর্বোক্ত
৭। নারায়ণ দেব, ২০২২, ৭২
৮। তদেব, পৃ১২২
৯। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০, 'নবান্ন' প্রসঙ্গে, বিজন ভট্টাচার্য, ১৯৯০,১
১০। নারায়ণ দেব, পৃ ৪৬।
১১। অজিত মজুমদার, যুগান্তরে, অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি, ২য় দৃশ্য
১২। মন্মথ রায়, ১৯৬৯ , 'নাটক সম্পর্কে অভিমত,' অজিত মজুমদার, ১৯৯৮, পৃ১০
১৩। হরিপদ সাহা, পূর্বোক্ত
১৪। https//:www.hrw.org, Knight, Kyle., India's Transgender Rights Law Isn't Worth Celebrating, December.5,2019,1;30pm EST
১৫। হরিদাস সাহা, পূর্বোক্ত
১৬। নারায়ণ দেব, ২০২২, পৃ ১১৮
১৭। অজিত মজুমদার, ১:৯৯৭, প্রকাশকের কথা'

**গ্রন্থপঞ্জি**

অজিত মজুমদার (১৯৯৭), নক্সীকাঁথার মাঠ, অক্ষর পাবলিকেশান্স, আগরতলা।
অজিত মজুমদার (১৯৯৮), নাট্য সংগ্রহ, পৌণমী প্রকাশন, আগরতলা।
অজিত মজুমদার (২০০০), নাট্যসংকলন, তিনসঙ্গী, আগরতলা।
. অজিত মজুমদার (২০০৫), নাট্যগুচ্ছ, অক্ষর পাবলিকেশান্স, আগরতলা।
অজিত মজুমদার (২০১৭), একের ভিতরে দুই বিজ্ঞান নাট্য, অনুভা প্রকাশনী, আগরতলা
অজিত মজুমদার (২০২২), ত্রিপুরার নাট্য প্রযোজনার ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশান্স, আগরতলা।
বিজন ভট্টাচার্য (১৯৯০), নবান্ন, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা।

লেখকঃ **মলয় দেব,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

# অরুণ চাকমার নাটক : একটি অবলোকন

পদ্ম কুমারী চাকমা

অরুণ চাকমা (জন্ম: ২৯মে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দ) চাকমা ভাষার নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক বিশিষ্ট। তাঁর জন্মস্থান বর্তমান কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত দশদা রবিদাস কার্বারি পাড়ায়। পিতা সুরেন্দ্র চাকমা, পেশায় কৃষক। মাতা চিকনমালা চাকমা। পাঁচ বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতাকে হারান। তারপর থেকে শুরু হয় বেঁচে থাকার জন্য কঠিন জীবন সংগ্রাম। এমতাবস্থায় স্বপ্রদ্রষ্টা বালক অরুণ চাকমা সমস্ত রকমের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে দশদা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। পরবর্তী সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক যথাক্রমে কাঞ্চনপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয় ও ধর্মনগর পদ্মপুর দ্বাদশমান বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে পেশায় শিক্ষক অরুণ চাকমা লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন সেবামূলক কাজের সঙ্গেও যুক্ত। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে নিজ গ্রামে Social Reform Student Association (S.R.S.A) নাামে একটি ছাত্র সংগঠন তৈরি করেন। এছাড়াও বিভ্নি শ্রেণীর গরীব ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চাও প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছেন। তাঁর সাহিত্য চর্চার যাত্রারম্ভ হয় দশদা 'অগ্রগামী ক্লাব' -এর সাহিত্য পত্র 'মিতালি'তে 'চিঠি' নামক একটি কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে। তাঁর বাংলা ও চাকমা ভাষায় একাধিক কাব্যগ্রন্থ যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি চাকমা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্ষমান প্রবন্ধ এ ব্যাপারে অলোচনার উপযুক্ত পরিসর নয়। তাই আলোচ্য প্রবন্ধে তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত এবং অনালোচিত চাকমা নাটক বিশ্লেষণাত্মক রীতিতে আলোচিত হয়েছে।

নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা এই ত্রয়ীর সমন্বয় ঘটছে অরুণ চাকমার মধ্যে। তাঁর রচিত নাটকগুলি হলো 'সোনার সংসার গেল ভাঝি' (১৯৯০), 'অঙ্গুলিমাল দস্যুর নোঅ জনম', (১৯৯৪), 'লোওলোয় বুড়েইয়া আমবাগান' (১৯৯৬), ' জবাব দ্যুও কাহর অপরাধ' (১৯৯৮), 'বৌ' (১৯৯৩), ' একপাবা মদ'(১৯৯৪), ' দুস্য অঙ্গুলীমাল' (১৯৯৫), 'ভাগ্য মোহনর লেগাপড়া'(১৯৯৫) প্রভৃতি। 'উদন্দি যাত্রা দল' এই নাটকগুলি বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করে। উল্লেখ্য যে তাঁর এই নাটকগুলি অপ্রকাশিত এবং পান্ডুলিপি আকারে রক্ষিত রয়েছে।

চাকমা ভাষায় নাট্যচর্চার শুরু হয় পূর্ববঙ্গে (বর্তমান বাংলাদেশ) । বিশ শতকে কলকাতা, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের যাত্রাদলের অনুকরণে চাকমাদের মধ্যেও অপেরা

বা যাত্রাদল গঠনের হিড়িক পড়ে যায়। এসব যাত্রাদল চাকমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে 'দলি' নামে পরিচিত। এই দলিরাই ধীরে ধীরে আধুনিক চাকমা নাটক মঞ্চায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। চাকমা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে পুলিন বিহারী চাকমা ও অশোক কুমার চাকমা দক্ষ অভিনেতা হিসেবে বিশেষভাবে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন দলি বা নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত কয়েকজনের বিশিষ্ট ব্যক্তি হলেন- ভূপতি রঞ্জন তালুকদার, মুরতি মোহন খীসা, পূর্ণ কুমার চাকমা, বিজয় কুমার চাকমা, আলোক বিকাশ চাকমা প্রমুখ। লোকনাট্যের আঙ্গিকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে 'যাত্রা পুদিমা' নামে চাকমা নাটকের মঞ্চায়ন চাকমা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক মাইলফলক ঘটনা। তারপর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রমোদ কারবারীর 'জাগি উদ' নামে মাড়া জাগানো চাকমা সামাজিক নাটকটি বাঘাইছড়ি উপজেলার তুলবান -এ মঞ্চস্থ হয়। বিগত শতকের সত্তরের দশক থেকে বিজু উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বছর যে চাকমা নাটকগুলি রচিত হচ্ছে তাতে নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হচ্ছে- যা চাকমা নাটককে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে তুলেছে। আর এভাবে চাকমা ভাষায় নাট্যচর্চা হতে থাকলে আগামী দিনে চাকমা নাটকের পরিধি বিস্তৃতি পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ত্রিপুরায় চাকমা ভাষায় নাটকচর্চা শুরু হয় সত্তরের দশকে। এই দশকের গোড়ার দিকে চাকমা ভাষায় প্রথম নাটক করেন মোহিনী মোহন চাকমা। রাধামন-ধনপুদি পালাকে কেন্দ্র করে 'শেষ রান্যে বেড়া' নামক নাটকটি তিনি রচনা করেন। নাটকটি পালাধর্মী হলেও নাট্যকার নাট্যকাহিনি নির্মাণে, উপস্থাপনায় আধুনিক চিন্তা-চেতনার দ্বারা চালিত হয়েছেন। এই নাটকটি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এর ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে আগরতলায় অনুষ্ঠিত প্রথম 'নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন' এ আদিবাসী ভাষায় একমাত্র নাটক হিসেবে নাটকটি সফল মঞ্চায়ন করা হয়। এই নাটকটি চাকমা সমাজে গণজাগরণের সৃষ্টি করেছিল। এই নাটকটির সাফল্য ত্রিপুরার চাকমা ভাষার লেখক সাহিত্যিকদের অনুপ্রাণিত করে নাটক রচনায়। ফলত রজ্যে চাকমা ভাষায় নাটক রচনার একটি সক্রিয় ধারা গড়ে ওঠে। তবে নাটকটি প্রায় দুই দশক পর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় অনিল চাকমার 'আওজোর বিঝু ফিরি আয়' নামক নাটকটি। এটি একটি সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। তাঁর আরেকটি পঞ্চাঙ্ক নাটক 'দানবীর বিশ্বান্তর'। নাটকটি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি (আগরতলার বইমেলায়) প্রকশিত হয়। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। মোহিনী মোহন চাকমা আরও কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। এগুলো এখনো অপ্রকাশিত। তাঁর অপ্রকাশিত নাটকগুলোর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হলো- 'গৌতম বুদ্ধ', 'সুদত্তুবী রাণ', 'আদেই ধন', 'শাক্য সিংহ' ইত্যাদি। এছাড়াও বিমল মমেন চাকমা নাটক রচনায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর লেখা প্রথম নাটকটি হলো 'কয়েক ফুদো চঘো পানি' (১৯৯৯)। এটি একটি সামাজিক নাটক।

পরবর্তী সময়ে তিনি লেখেন ‘যমছাবা’ ও ‘আন্ধার পার অইন্যায়’ নামে দুটি ঐতিহাসিক নাটক। চাকমা অসীম রায়ের লেখা ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর নাটক ‘ধুল্যা ফুরি লো উধে’(২০০০)। স্বর্ণকমল চাকমা রচিত নাটকটি হল ‘বন হে আঘে দিল কেনা’। উল্লেখ্য যে বিমল মমেন চাকমা, চাকমা অসীম রায় এবং স্বর্ণকমল চাকমার নাটকগুলি এখনো পান্ডুলিপি আকারেই রয়ে গেছে।

ত্রিপুরায় চাকমা নাট্যচর্চার ধারায় বিশ শতকের আশির দশকের একেবারে অন্তিম লগ্নে অরুণ চাকমার আত্মপ্রকাশ ঘটে ‘ সোনার সংসার গেল ভাঝি’ (সোনার সংসার গেল ভেসে) নামক নাটক রচনার মধ্যে দিয়ে। নাটকটির পান্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। নাট্যকার এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন নাটকটি সামাজিক সমস্যাকে আধার করে ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। তাঁর জবাব দ্যাও কাহর অপরাধ’ (জবাব দাও কার অপরাধ) নাটকটিও সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটকটি ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দে রচিত হলেও এখনো প্রকাশের আলোয় আসে নি। নাটকটিতে কাঞ্চননগরের রাজপরিবারের সিংহাসন নিয়ে বৈমাত্রেয় ভাইয়েদের মধ্যে সংঘর্ষ, আত্মীয় স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অবশেষে ন্যায়ের জয় দেখিয়েছেন নাট্যকার। নাটকের আখ্যান রাজপরিবারের কাহিনিতে আবর্তিত হলেও সমকালীন সমাজকে অস্বীকার করেন নি নাট্যকার। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী নাট্যকারের চিত্তকে আন্দোলিত করেছিল তাই তিনি সমাজকে সচেতন করার মানসে বিবিধ পারিবারিক সমস্যাকে নাটকের কাহিনিতে সন্নিবেশিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,সংসারে যে ব্যক্তির দুই বা তিনটে স্ত্রী থাকবে সেই সংসারে অন্তহীন অশান্তি। আত্মীয়দের মধ্যে অনবরত চলে নানা অভিসন্ধি, কুযুক্তি, কুমন্ত্রণা। কে কাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে তার প্রতিযোগিতা। ভাইয়ে ভাইয়ে মনোমালিন্য এসব বুকের ভেতর তুষের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলে। মানুষ বয়ে বেড়ায় অবর্ণনীয় মনোকস্ট। তাই মানুষ যাতে পারিবারিক জীবনে সুস্থ-সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে এই অভিপ্রায়েই তিনি নাটকখানি রচনা করেছেন। পাঁচটি অঙ্কে আর পঁচিশটি দৃশ্যে বিভক্ত এই নাটকের নাট্যকাহিনি নিম্নরূপ- কাঞ্চননগরের রাজা কাঞ্চনের দুই রানি এবং দুই রানির দুই পুত্র। ছোট রানির ইচ্ছা তার পুত্রই যেন রাজা হয়। অথচ বংশ পরম্পরায় বড় পুত্র রাজা হয়। সামন্ততান্ত্রিক এই প্রথা ছোট রানি মানতে নারাজ। যেনতেন প্রকারেন তিনি নিজ পুত্রকে রাজা করতে চান। নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তাই তিনি কূট চক্রান্তের আশ্রয় নেন। নিজের ভাই কুটিলচন্দ্রের (কাঞ্চননগরের মন্ত্রী) সহায়তায় তিনি বড়ো রানির পুত্র যুবরাজ শঙ্করকে বনভোজনের নাম করে অপহরণ করিয়ে নিজের ছেলের রাজা হওয়ার পথ নিষ্কন্টক করেন। এই ঘটনার প্রায় একবছর পর প্রতিবেশি রাজ্য রূপনগরের রাজা রূপসেনের সহায়তায় শঙ্কর ছদ্মবেশে নিজ রাজ্যে ফিরে আসে। কিন্তু রাজার সামনে সত্য উদ্ঘাটনের আগেই মন্ত্রী কুটিলচন্দ্রের হাতে রাজা কাঞ্চনের মৃত্যু হয়। রাজার মৃত্যুতে ছোট

রানি মঙ্গলা নিজের ভুল বুঝতে পেরে বিলাপ করে বলেন- " আঁ ভগবান পুয়াবুয়র সুখর আশায় হি ভেজাল থাঙেলুনং হিজেনী"।[১] (হায় ভগবান! পুত্রের সুখের জন্য কি সমস্যা বাঁধালাম।) নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় শেষ পর্যন্ত ছোট রানি মঙ্গলা বিষপান করে আত্মহত্যা করেন। মন্ত্রী কুটিলচন্দ্র পলায়ন করেন আর ছোট যুবরাজ চক্রধরকে বন্দী করে কারাগারে রাখা হয়। রাজা রূপসেনের কন্যা চন্দ্রাবতীর সঙ্গে যুবরাজ শঙ্করের বিবাহ এবং রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার মধ্যে দিয়ে নাটকটির যবনিকা পতন ঘটে। নাটকের চরিত্রানুযায়ী সংলাপ ব্যবহারে, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে, নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে সর্বোপরি ঘটনানুযায়ী গানের ব্যবহারে নাট্যকারের শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আরেকটি নাটক 'অঙ্গুলিমাল দস্যুর নোঅ জনম' (অঙ্গুলিমাল দুস্যের নতুন জন্ম)। এটি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত। নাটকটি পাঁচটি অঙ্ক এবং একুশটি দৃশ্যে বিভক্ত। এটিও পঞ্চাঙ্ক নাটক। পূর্বোক্ত নাটকের মতো এই নাটকেও গান যুক্ত করেছেন নাট্যকার। নাটকটি ১৫ই এপ্রিল ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখি পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে সর্বপ্রথম দশদা জগতজ্যোতি বৌদ্ধ বিহারে অভিনীত হয়। এই একই বছরে অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের ৫ নভেম্বর উক্ত বিহারে নাটকটি দ্বিতীয়বার অভিনীত হয়। নাটকটি বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। জাতকের কাহিনিকে অক্ষুন্ন রাখলেও স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন নাট্যকার। শাক্যসিংহ গৌতম বুদ্ধ, রাজা প্রসেনজিৎ, অজাতশত্রু, ভার্গব ব্রাহ্মণ- জাতকের এই চরিত্রগুলি ছাড়াও নাট্যকাহিনীর প্রয়োজনে নাট্যকার কয়েকটি চরিত্রও সংযুক্ত করেছেন। যেমন কালা মিলে বাব, গদা ঠেঙা, রং সান প্রমুখ। জাতকের কাহিনিটি আমাদের সবারই জানা, তাই এখানে আর পুনরাবৃত্তি না করাই ভালো।

তাঁর একটি একাঙ্ক নাটক 'এক পাবা মদ' (একপো মদ)। এটি ১৯৯৪ সালে রচিত। এই নাটকে হাস্যকৌতুকেরচ্ছলে সমাজের রূঢ় সত্যকে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। নাটকের মাতাল চরিত্রটির নাম নেই। কিন্তু তার এই মাতলামি, হাসির উদ্রেকের পাশাপাশি সামাজিক জীবনে ও পারিবারিক জীবনে কী ভয়ঙ্কর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে সেই দিকটির প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। তাঁর আরেকটি একাঙ্ক নাটক 'দুস্য অঙ্গুলিমাল'। এটি ১৯৯৫ সালে রচিত। বৌদ্ধ জাতকের কাহিনি অবলম্বনে নাটকটি রচিত। অঙ্গুলিমাল দুস্যবৃত্তি ত্যাগ করে কীভাবে বুদ্ধের শরণাপন্ন হলো সেই কাহিনি বিবৃত হয়েছে নাটকটিতে। 'ভাগ্য মোহনর লেগা-পড়া' (ভাগ্যমোহনের লেখাপড়া) তাঁর রচিত আরেকটি একাঙ্ক নাটক। রচনাকাল ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ। নাটকটিতে পাঁচটি দৃশ্য রয়েছে। নাটকটি দশদা ও আনন্দবাজার জোনে স্বাক্ষরতা অভিযান উপলক্ষ্যে এক নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম অভিনীত হয় ও পুরস্কার লাভ করে। অভিনয় স্থান ও তারিখ- দশদা ত্রিদ্বীপ রাজ ক্লাব, ১১ই মার্চ, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। নাটকের চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন তাদের নাম - পুরুষ চরিত্রে

নাগরচান (হৃদয় চাকমা), আলেয়্যা (গোলাপভার চাকমা), ভাগ্যমোহন (শান্তিদেবী চাকমা), কালারাম (সুবলকৃষ্ণ চাকমা), হেঙত্যে (বিষ্ণু চরণ চাকমা) , দুল দিয়ে (লক্ষী কুমার চাকমা), চিগোন পোও (মায়ারানি চাকমা), নারী চরিত্রে - পরানবী (মীনা রানি চাকমা), চিগোন মিলে দ্বিজন (মায়ারানি চাকমা, মন্টি চাকমা)।

সমাজ জীবনে নিরক্ষরতা বড় অভিশাপ। বৈষম্য পীড়িত আমাদের সমাজে যারা দরিদ্রদের অপেক্ষাকৃত আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল লোকেরা অবজ্ঞার চোখে দেখে এবং সবসময় হেয় প্রতিপন্ন করার চেস্টা করে। তেমনি এক দরিদ্র নিরক্ষর পরিবারের ছেলে অসীমের বঞ্চনার কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে এই নাটকে। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নাগরচান নিরক্ষর। অভাবের তাড়নায় জর্জরিত হয়ে তিনশ টাকা দিয়ে গ্রামের কার্বারি আলেয়ার কাছে জমি বন্ধক দেন। কাগজে লেখা হয় জমিটি তিন হাজার টাকা দিয়ে নাগরচান বিক্রি করেছেন। নিরক্ষর নাগরচান এ ব্যাপারে কিছুই জানলেন না। তার অজ্ঞাতেই জমিটি চিরতরে হাতছাড়া হয়ে গেল। ধূর্ত কার্বারি আলেয়্যার কাছে টাকা দিয়ে জমি ফেরত চাইতে গেলে কার্বারি বলে 'লেগা পরা গস্যে ভুইও হাগোস? হা...হা...হা...। তর জনম্বো এক হানি গরি ভুই ন্যনে। সিয়েন দ্য এস্যে দ্বি-কিন বজর অলঅ তিন হাজার ঠেঙা দিনে তত্তুন হিনি লইওঙ্গো। তত্তুন আরও হুদু ভুই? না পাগলে ধস্যে তরে?"[২] (লিখিত জমির কাগজ? হা..হা..হা...। জীবনভর তোমার ছিল এককাঠা জমি। সেটা তো দু-তিন বছর আগে তোমার কাছ থেকে তিন হাজার টাকা দিয়ে কিনেছিলাম। তোমার আর জমি কোথায়? তোমাকে কি পাগলে পেয়েছে।) এভাবে কত নাগরচান ভূমিহারা কৃষকে পরিণত হয় তার ইয়ত্তা নেই। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজেছেন নাট্যকার। তাই তিনি নাটকের শেষে নাগরচানের মাধ্যমে সমাজকে বার্তা দিয়েছেন এভাবে " ও মা লক, বাব লক মর অবস্থাগান এক্ষা রিনি চঅ। মর অশিক্ষার সুযোগ নিনে বেমান আলেয়্যা কার্ব্বারি মরে হি গল্য। সেনত্তেই আমার এত্তনে গোত্তি গোধরিগুণ মঅ ধক্ষেণ অশিক্ষার আন্ধার হাদা বনত আর ন ফেল্য। এস্যেত্তুন ধরি প্রতিজ্ঞে গরঅ, সজাগ অ, জদা গরি ঠিয়েই উদঅ, ঘরে ঘরে শিক্ষের চেরাগ জ্বালেই স্যা চেরাগই পুড়ি ফেলেই অশিক্ষার আন্ধার হাদাবন। আন্ধার হাদা বন।"[৩] (ও আমার মা বাবা সকল একটু দেখো। আমার নিরক্ষরতার সুযোগে বেইমান আলেয়্যা আমার সাথে কি করল। আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে এই অন্ধকার কাঁটাবন থেকে উদ্ধার করতে হবে। আজ থেকে শপথ নাও, সচেতন হও, সবাই উঠে দাঁড়াও, ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দাও। সেই আলোয় অন্ধকার কাঁটাবন জ্বলমলে হয়েউঠুক, হয়ে উঠুক)। 'বৌ'ও (১৯৯৩ ) তাঁর আরেকটি একাঙ্ক নাটক। নাটকটি পাঁচটি দৃশ্যে বিভক্ত। নারী প্রগতির কথা উঠে এসেছে এই নাটকে। বর্তমান সময়ের নারীরা শুধু লেখাপড়া শিখছে তা নয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করারও সাহস দেখাচ্ছে। নাটকের অপর্ণা এই রকমের এক প্রগতিপন্থী চরিত্র। কোন এক বিশেষ কারণে

কলেজে ক্লাশ বন্ধ রাখার ঘোষণা করা হলে সে প্রতিবাদ করেছে। তাতে ছাত্র সংগঠনের নেতা গোছের ছেলেরা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তার সমালোচনা করে " মুই দ্য কল্পনাও গরি নবারং মিলে গরি এত্তমান সাহস মোর জীবনত নদেগং। ইদুক্ষুণ ছাত্রছাত্রী মুজুঙে তুই যখন মাইক্ষোদী দাগি হলে এস্যে কলেজ স্ট্রাইক, কনজন কলেজত নো যেইও, ক্লাস নো গস্য, মিলে গরি দাবা দাবা এইনে তত্তুন মাইক্ষো হারি নিনে হইদে স্ট্রাইক ন মান্য। কলেজত এওজ, ক্লাস গরিবং"।[৪] (আমি কল্পনাও করতে পারছি না, আমার জীবনে মেয়ের এত সাহস দেখিনি। কেউ ক্লাসে আসবে না, কেউ ক্লাস করবে না বলে তুমি যখন ছাত্র ছাত্রীদের ভিড়ে মাইকিং করছিলে ... তখন দৌড়ে এসে তোমার হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে বলে স্ট্রাইক মানবে না, কলেজে এসো, ক্লাশ করবো।) তার সাহসিকতায় কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে সবাই খুশি হয় এবং বাহবা দেয়। এভাবেই অপর্ণা এগিয়ে যায়। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কলেজের সেই ছেলেটি (চন্দন) তার পথ আটকালে তাকে কষিয়ে চড় মারে। এভাবে সে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়। বাবার বন্ধুর ছেলে শুভঙ্করের বাগদত্তা সে। তাদের বিয়ের কথাবার্তা চলে। শুভঙ্করও অপর্ণার পাশে এসে দাঁড়ায়, সাহস যোগায় লড়াইয়ের। সমকালীন সমাজ ও নারীর অবস্থানের পরিবর্তনের স্বরূপটি নাটকে স্পষ্টতা পেয়েছে।

অরুণ চাকমার অরেকটি পঞ্চাঙ্ক নাটক 'লোওলোয় বুড়েইয়া আমবাগান' (রক্তে ভরা আমবাগান)। নাটকটি ১৯৯৬ সালে রচিত। নাটকটিতে পাঁচটি অঙ্ক ও ঊনিশটি দৃশ্য রয়েছে। এই নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ২৫শে নভেম্বর, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে মহা কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে, দশদা বৌদ্ধ বিহারে। একটি ভক্তিরসাশ্রিত গান দিয়ে নাটকটির শুরু হয়েছে। নাটকের চরিত্রে যারা অভিনয় করেছেন তাদের নামের তালিকা- ত্রিদ্বীপ রায় (গোপাল চাকমা), সন্দীপ রায় (জনার্দন চাকমা), বিরল্যে (বিষ্ণুচরণ চাকমা), চিগন্যে (শঙ্কর চাকমা), কিনেধন(লক্ষী চাকমা), রক্ষীর ভূমিকায় চিকনচান চাকমা, লালন গিরি (সুনীল চাকমা), স্ববন (জনার্দন চাকমা), গঙ্গাসুর (শান্তিময় চাকমা), ভানু (তপন চাকমা), লাম্বা (সাধন চাকমা), যম (হৃদয় চাকমা), ভৃগু (সুবল কৃষ্ণ চাকমা), পদ্মারানী (মীনারানী চাকমা), সোনাবী (মন্টি চাকমা), মালা (মায়ারশ্মী চাকমা) ইত্যাদি। চাকমা রাজপরিবারের কাল্পনিক কাহিনি নিয়ে নাটকটি রচিত। বাগান বাড়ির মহারাজা ত্রিদ্বীপ রায়ের রাজ অন্দরের কাহিনি, রাজপরিবারের ক্ষমতার জন্য কূট ষড়যন্ত্র, সিংহাসন দখলের, যুদ্ধ, মৃত্যু আর চারদিকে রক্তের বন্যা মানুষের জীবনকে কিভাবে বিপন্ন করে তুলেছে চাই বর্ণিত হয়েছে নাটকের আখ্যানে। যুবরাজ সন্দীপের কথায়ও এই বিষয়গুলি প্রতিধ্বনিত হয়েছে - "বা, একজন একজন গরি শত্তুর মারি- শত্তুরোর লোলোই ভুড়েই দ্যুওং এ আমবাগান, শত্তুরোর দলরে গস্যং বংশ উভত।" [৫] (বাবা, একে একে সব শত্রু বিনাশ করে শত্রুর রক্তে আমবাগান ভাসিয়ে দিয়েছি। শত্রু দলের বংশ বিনাশ করছি। ) কয়েকজন ক্ষমতাবানের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সাধারণ

মানুষের ধন-প্রাণ কীভাবে বিপন্ন হয় সেই সত্যকে নাট্যকার মানবিক দৃষ্টিতে শিল্পিত করেছেন আলোচ্য নাটকে।

উপযুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্পষ্টতা পায় যে অরুণ চাকমা একজন সমাজ সচেতন নাট্যকার। তাঁর নাটকগুলিতে চাকমা জনজাতির শিক্ষা, সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিষয়ই প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজ সম্পর্কে তার গভীর দৃষ্টি ও দায়বদ্ধতা প্রশংসনীয়। এর পাশাপাশি নাটকগুলিতে আধুনিক জীবনচেতনা, ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, নানাবিধ জটিলতার বহি:প্রকাশ যেমন ঘটেছে, তেমনি কাহিনি ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায়, নাট্যঘটনার গতিশীলতায় নাট্যকারের মুন্সিয়ানা পরিলক্ষিত হয় যা নাট্যোৎকর্ষের পরিচয়বাহী। এ নিয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

**তথ্যসূত্র**

১। অরুণ চাকমা, ১৯৯৮, পৃ: ১০৪
২। অরুণ চাকমা, ১৯৯৭, পৃ: ২২
৩। তদেব, পৃ: ২৬
৪। অরুণ চাকমা, ১৯৯৩, পৃ: ৬
৫। অরুণ চাকমা, ১৯৯৬ পৃ: ১৫৫

**গ্রন্থপঞ্জি**

অরুণ চাকমা (১৯৯৩), বৌও, নাট্যকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত, অপ্রকাশিত।

অরুণ চাকমা (১৯৯৪), অঙ্গুলিমাল দস্যুর নোঅ জনম, নাট্যকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত, অপ্রকাশিত।

অরুণ চাকমা (১৯৯৪), এক পাবা মদ, নাট্যকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত, অপ্রকাশিত।

অরুণ চাকমা (১৯৯৬), লোওলোয় বুড়েইয়া আমবাগান, নাট্যকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত, অপ্রকাশিত।

অরুণ চাকমা (১৯৯৭), ভাগ্য মোহনর লেগা-পড়া, নাট্যকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত, অপ্রকাশিত।

অরুণ চাকমা (১৯৯৮), জবাব দ্যুও কাহর অপরাধ, নাট্যকারের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত, অপ্রকাশিত।

অম্লান চাকমা (সম্পা ২০১৬), আমার ভাষায় আমার সাহিত্য দ্বিতীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক সম্মেলন ২০১৬, স্মারক সংকলন, পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক ফোরাম, রাঙ্গামাটি

শুভ্রজ্যোতি চাকমা (সম্পা ২০১৩), সাংগ্রাই, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ, রাঙ্গামাটি

---

লেখক ঃ **ড. পদ্মকুমারী চাকমা**, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

# রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনার অভিনবত্ব

রিন্টু দাস

সাহিত্যের যে কোনো ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ও অভিনব চিন্তা একজন লেখককে সেই বিশেষ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য দান করে। নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূববর্তী ও সমসাময়িকদের থেকে কোথায় স্বতন্ত্র ছিলেন সেটাই আমাদের আলোচনার মূল লক্ষ্য। নাটকের বিষয়, কলাকৌশল প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি নতুনত্ব দেখাতে চেয়েছেন। কবি শঙ্খ ঘোষ নাটক রচনায় রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পর্যালোচনা করে মন্তব্য করেছেন,

"একমাত্র রবীন্দ্রনাথই জেনেছিলেন বাংলা নাটকের সম্পূর্ণ নাটকীয় স্বকীয় নাট্যবিন্যাস, তার লোকজীবনের সঙ্গে ঘন সম্পর্কে যোজিত এক নাট্যরূপ। সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে এই ভঙ্গিই আবার স্পর্শ করে আছে প্রতীচ্যের আধুনিক পর্বে, এখনো পর্যন্ত তাঁকেই হয়তো বলা যায় আমাদের দেশের আধুনিকতম নাট্যকার।"[১]

বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারাকে গ্রহণ না করলেও বাঙালি ঐতিহ্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পাশ্চাত্যের নাট্যভাবনাকে যুক্ত করে নাটক রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। পারিবারিক ঐতিহ্য, বিলেতের নাট্য ও সংগীতের অভিজ্ঞতা এবং বহুল পঠন-পাঠনের দ্বারা স্বতন্ত্র ধারার নাটক রচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। তবে নাটক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কবিসত্তার প্রাবল্য একান্তভাবে ধরা পড়েছে। সমালোচকের মতে, " তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিরিক কবি বা গীতিকবি এবং তাঁহার প্রতিভার স্বরূপই হইতেছে লিরিক্যাল বা গীতিধর্মী। আত্মস্বভাবমূলক গীতিকবিতা বা গান তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত স্থল বিকাশস্থল। তাঁহার কবি মানস একান্তভাবে স্বতন্ত্রধর্মী। একটা নিবিড় subjectivity বা মন্ময়তাই তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।... রবীন্দ্রনাথের এই একান্ত আত্মভাব- কল্পনা প্রধান গীতিধর্মী কবি-মানস তাঁহার প্রায় সমস্ত সাহিত্যসৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে।"[২] তাঁর কবি মানসে ভাবানুভূতির সুর ও সুক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় অনুভূতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই কবি সত্তার জন্যই তাঁর নাটকে নিজস্ব অনুভূতি, কল্পনা ও আবেগের প্রাবল্য তত্ত্বের বাহন হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নাটক বাস্তব জগৎ ও প্রত্যক্ষ জীবনের দাবি এড়িয়ে কাব্যসমৃদ্ধ ও ভাব সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সুসংবদ্ধ আখ্যান থাকলেও কাব্য ও ভাবের ইঙ্গিতই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। কাব্য ও তত্ত্বই তাঁর নাটককে বিশিষ্টতা দান করে রোম্যান্টিক কবি-মনের সুক্ষ্ম অনুভবগুলিকে সংগীতের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছে। তাঁর প্রথম নাট্যপ্রচেস্টা একমাত্র সংগীতকে অবলম্বন করেই আত্মপ্রকাশ করেছে। বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১)-তে রবীন্দ্রনাথ দেশি ও বিলিতি সুরের সম্মিলন ঘটিয়ে নাটক রচনায় নিমগ্ন হয়েছেন। এই একই ধারায় তিনি রচনা করেছেন 'রূদ্রচন্ড' (১৮৮১), 'কালমৃগয়া'(১৮৮২) ও 'মায়ার

খেলা'(১৮৮৮)। সমালোচকের মতে, 'গীতিনাট্যের মধ্যে গীতি হইল উপায় আর নাটক হইল উহার উদ্দেশ্য।"[৩] রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিতে গীতির উচ্ছ্বাস কখনো উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে যায়নি। মায়ার খেলা নাটককে নাট্যের সূত্রে গানের মালা বলে অভিহিত করলেও বাকিগুলি রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,

"যাঁহারা এই গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা, আশা করি, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, সংগীতকে এইরূপ নিযুক্ত করা অসংগত বা নিষ্ফল হয় নাই।" [৪]

কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য ধারায় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪), 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন'(১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪)। 'মালিনী' (১৮৯৬), 'গান্ধারীর আবেদন'(১৯০০), 'সতী' (১৯০০), 'নরকবাস' (১৯০০), কর্ণ-কুন্তি-সংবাদ' (১৯০০) প্রভৃতিতে নাট্যবিষয় কবি-মনের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। এই নাটকগুলিতে আমরা একটা বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে ভাবের দ্বন্দ্ব মুখ্য হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকে রূপজ মোহের সঙ্গে প্রকৃত প্রেমের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যসাধন দেখতে পাই। 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ' প্রভৃতি নাটকে মানবধর্মের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। 'রাজাও রানী', 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' নাটকে শেক্সপিয়রিয় রীতি অনুসৃত হলেও সেগুলোতে তত্ত্বকথা ও লিরিক গুণের সমন্বয় ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আদর্শ, প্রেম, ধর্মবোধ, প্রবৃত্তি, প্রতাপ, নীতি প্রভৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাত এই নাটকগুলিকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। এই পর্বে উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজের মন ও মানবধর্মের আদর্শকে গ্রহণ করে তার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তিনি। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে নতুন দৃষ্টি নিয়ে নাট্যরূপান্তরের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্র-নাটকে ব্যাপক রূপান্তর ঘটে। স্বদেশি আন্দোলন এবং অন্যান্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ রবীন্দ্রচেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। একই সঙ্গে ভারতবর্ষের আচারসর্বস্ব সংকীর্ণতাকে আধুনিক চেতনার দ্বারা আঘাত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পর্বে 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১১), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'অচলায়তন' (১৯১২), 'ফাল্গুনী'(১৯১৬), 'মুক্তধারা'(১৯২২), 'রক্তকরবী' (১৯২৩), 'কালের যাত্রা'(১৯২৩), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩) প্রভৃতি নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় বিশিষ্টতার দাবি রাখে। এধরনের নাটক রচনার সময় পাশ্চাত্য নাটকের টেকনিকের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তিনি। তবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারায় এসব নাটকের মাধ্যমে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন। সীমার মাঝে অসীমের মিলনসাধনের তত্ত্ব, মানবাত্মার সঙ্গে ভগবানের বিচিত্র সম্পর্কের রহস্য, মানবাত্মার সর্বপ্রকার বন্ধনমুক্তি এই নাটকগুলির মূল ভাববস্তু। তাছাড়া পাঁচালি, পালাগান, যাত্রা গান, ব্রতকথা ও রূপকথার আঙ্গিক আত্মস্থ করে সেগুলোরও প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এই নাটকগুলিতে। আর এখানেই বাংলা নাটকের ধারায় রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে যায়।

'শারদোৎসব' থেকেই রবীন্দ্রনাটকের রূপ ও রীতির পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের নাটকে আপাত কাহিনির আড়ালে একটি তত্ত্ব বা ভাব মুখ্য হয়ে উঠেছে। 'শারদোৎসব' নাটকে বর্ণিত হয়েছে মানুষের সঙ্গো প্রকৃতির সম্পর্ক। প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রে নাটকে প্রকৃতির ভূমিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

" অন্য দেশের সাহিত্যে দেখতে পাই বিশ্ব প্রকৃতিকে নাটকে কেবল আভাসে রক্ষা করা হয় মাত্র; তার মধ্যে তাকে বেশি জায়গা দেবার অবকাশ থাকে না। আমাদের দেশের প্রাচীন যে নাটকগুলি আজ পর্যন্ত খ্যাতি রক্ষা করে আসছে তাতে দেখতে পাই প্রকৃতিও নাটকের মধ্যে নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয় না। "[৫]

অন্যদিকে 'রাজা' ও 'ডাকঘর' নাটকে মানুষের সঙ্গো ঈশ্বরের সম্বন্ধকে দেখাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। 'অচলায়তন' নাটকে মানুষের সঙ্গো মানুষের সম্পর্কের বিচার-বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়েছে। আবহমান কাল ধরে দিকে দিকে যৌবনেরই জয় ঘোষিত হয়েছে। এই যৌবনের জয়ের কথাই 'ফাল্গুনী' গীতিনাট্যের বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটকে যান্ত্রিক সভ্যতার সংকট ও তা থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শিত হয়েছে। যন্ত্র নয়, প্রাণের পথেই মুক্তি সম্ভব— এই দর্শন নাটকগুলিতে অভিনব করে তুলেছে।

পাঁচালির আঙ্গিক অনুসরণ করে 'শারদোৎসব' নাটকে দেখানো হয়েছে ঠাকুরদা ও ছেলের দলের নৃত্য। 'অচলায়তন' নাটকে দর্ভকপল্লীতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গাণে দাদাঠাকুরকে নিয়ে মাতামাতির দৃশ্য আমাদের পাঁচালির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের দেশের পাঁচালি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সম্যক ধারণা ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিচারণায় আমরা পাঁচালির উল্লেখ পাচ্ছি,

" ব্রজেশ্বরের কাছে সন্ধ্যেবেলায় দিনে দিনে শুনেছি কৃত্তিবাসের সাতকাণ্ড রামায়ণটা। সেই পড়ার মাঝে মাঝে এসে পড়ত কিশোরী চাটুজ্জে। সমস্ত রামায়ণের পাঁচালি ছিল সুর-সমেত তার মুখস্থ। ... কিশোরী চাটুজ্জের সবচেয়ে বড়ো আপসোস ছিল এই যে, দাদাভাই অর্থাৎ কিনা আমি, এমন গলা নিয়ে পাঁচালির দলে ভর্তি হতে পারলুম না। পারলে দেশে যা হয় একটা নাম থাকত।"[৬]

রবীন্দ্রনাটকে পালাগানের প্রভাবও দুর্লক্ষ নয়। গানের মাধ্যমে অভিনয়ের বিষয়কে মধ্যযুগে পালা বলা হতো 'শারদোৎসব'কে রবীন্দ্রনাথ ঋতু-উৎসবের একটি নাটকের পালা বলেছেন। 'রক্তকরবী'কে তিনি পালা বলে উল্লেখ করেছেন,

" আমার রক্তকরবী পালাটিও রূপকনাট্য নয়। ... রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি নন্দিনী বলে একটি মানবীর ছবি।"[৭]

যাত্রার আদর্শকেও রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন। যাত্রার দৃশ্যপটহীনতা

দর্শক-অভিনেতার সম্পর্ক, গান, বিবেক চরিত্র প্রভৃতি বিষয়গুলোকে তিনি নিজের মতো করে প্রয়োগ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর যাত্রা সম্পর্কিত স্মৃতিচারণার সামান্য অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে,

" আমাদের সময়কার কিছু পূর্বে ধনী ঘরে ছিল শখের যাত্রার চলন। ... আমার মেজকাকা ছিলেন এইরকম একটি শখের দলের দলপতি। পালা রচনা করবার শক্তি ছিল তাঁর, ছেলেদের তৈরি করে তোলবার উৎসাহ ছিল। ধনীদের ঘরপোষা এই যেমন শখের যাত্রা তেমনি ব্যবসাদারী যাত্রা নিয়েও বাংলাদেশের ছিল ভারি নেশা। এপাড়ায় ওপাড়ায় এক-একজন নামজাদা অধিকারীর অধীনে যাত্রার দল গজিয়ে উঠত। ... আমাদের বাড়িতে যাত্রাগান হয়েছে মাঝে মাঝে। কিন্তু রাস্তা নেই; ছিলুম ছেলেমানুষ। আমি দেখতে পেয়েছি তার গোড়াকার জোগারযন্তর।"[৮]

ছেলেবেলা থেকেই যাত্রা তাঁর মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। পরবর্তীকালে তাই তিনি বাংলাদেশের প্রচলিত মঞ্চরীতিকে বর্জন করেছেন এবং জাতীয় নাট্য ইতিহাসের কথা স্বীকার করে লিখেছেন,

" আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যহই মিথ্যাসাক্ষীর সেই গলদঘর্ম ব্যায়াম দেখা যায়। কিন্তু এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম বিলাতে ... আর্ট জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি। কারণ সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার।"[৯]

যাত্রার সুর ও যাত্রার বিশেষত্ব তাঁর নাটকে গৃহীত হয়েছে। 'শারদোৎসব' , 'রাজা', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী'র গানগুলো যাত্রার অনুপ্রেরণা থেকেই তিনি নিজের মতো করে নাটকের অঙ্গীভূত করেছেন। তাঁর নাটকে আমরা মাঝে মাঝেই লোকায়ত জীবনের ছবি নানারূপে উপস্থাপিত হতে দেখি। তাছাড়া ব্রতের রীতিকেও তিনি নাট্যগঠনে অনেকসময় ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জানতেন লোকজীবনকে স্পর্শ করার যোগ্য মাধ্যম হলো এই যাত্রা- পাঁচালি ব্রত। 'শারদোৎসব' নাটকে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বৃষ্টির পর বীজ বোনার আগে রাজ্যে অনুষ্ঠিত মহোৎসবের প্রসঙ্গ ; 'অচলায়তন' নাটকে লোকেশ্বর ব্রত পালন; 'রক্তকরবী'তে নবান্নের সময় গ্রামে গ্রামে তাঁর জোগাড় করার প্রসঙ্গ প্রভৃতি ব্রত অনুষঙ্গ রবীন্দ্রনাটকের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করে।

রবীন্দ্রনাথ মঞ্চ সম্পর্কেও তাঁর ব্যতিক্রমী চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন। পাশ্চাত্য মঞ্চে বাস্তবতাকে প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ের তিনি কঠোর সমালোচনা করেছেন। 'তপতী' নাটকের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য করেছেন,

" আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রপরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা সাহিত্য ও নাট্যকলার মাঝখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্ষিপ্ত।" [১০]

'শারদোৎসব' নাটকে পথ-ঘাট, 'রাজা' নাটকে প্রাসাদ-বাতায়ন, 'ডাকঘর' নাটকে জানালার ধার, 'অচলায়তন' নাটকের সুকঠিন প্রাচীর, 'মুক্তধারা' নাটকে ভৈরূ মন্দিরের ত্রিশূল ও যন্ত্রের সুউচ্চ মাথা, 'রক্তকরবী' নাটকের জটিল জালের বাতাবরণ প্রভৃতি মঞ্চ পরিকল্পনা নাটকের ভাবের সঙ্গো যুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। রবীন্দ্রনাথ নাটকে উন্মুক্ত মঞ্চ পরিকল্পনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন সবসময়।

'গীতাঞ্জলি ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্বে রবীন্দ্রনাথ কতগুলো নাটক রচনা করেন, যেগুলোর বিষয়বস্তু সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশ থেকে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'প্রায়শ্চিত্ত'(১৯০৯), 'গৃহপ্রবেশ'(১৯২৫), 'শোধবোধ'(১৯২৬), 'নটীর পূজা' (১৯২৬), 'পরিত্রাণ'(১৯২৯), 'চন্ডালিকা'(১৯৩৩), 'বাঁশরী'(১৯৩৩), 'মুক্তির উপায়'(১৯৩৮)। এই নাটকগুলির বিষয়বস্তু মোটামুটিভাবে পরিবারের বা নির্দিষ্ট সমাজের কিছুসংখ্যক নরনারীর ব্যক্তিগত ঘটনা। 'প্রায়শ্চিত্ত', 'বৌঠাকুরানীর হাট' উপন্যাস অবলম্বনে রচিত ঐতিহাসিক নাটক। 'পরিত্রাণ' নাটকেরও বিষয়বস্তু 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' থেকে গৃহীত। 'বাঁশরী'র বিষয়বস্তু মৌলিক। অন্যান্য নাটকগুলো গল্প, কবিতা ও কাহিনির নাট্যরূপ।

রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভার একটি উল্লেখযোগ্য দিক তাঁর প্রহসন ও রঙ্গনাটিকা। কৌতুকনাট্যের মধ্যে 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), 'বৈকুণ্ঠের খাতা'(১৮৯৭), 'হাস্যকৌতুক'(১৯০৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৬) উল্লেখযোগ্য। প্রহসন রচনার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। হাস্যকৌতুকের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ইউরোপের 'শারাড' নামক নাটকের অনুকরণের কথা স্বীকার করেছেন। এইসব নাটকে বাকচাতুর্য ও কৌতুকরস সৃষ্টিতে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যথার্থ রসিক ছাড়া তাঁর হাস্যরস উপভোগ করা সম্ভব নয়। সমালোচকের মতে,

"রবীন্দ্রনাথের প্রহসনের প্রধান গুণ— ইহার সুতীক্ষ, সুস্নিগ্ধ ব্যঞ্জনাময় সংলাপ। ইহা অপরূপ আলো অন্ধকারময়, শত ঝংকার মুখরিত অভিনয়—আসরের ন্যায় আমাদিগকে আবিষ্ট, বিভ্রান্ত করিয়া রাখে, ক্ষণে ক্ষণে অচিন্তনীয়, অভাবনীয় শব্দের অভিনয় আমাদিগকে মুগ্ধ, চমৎকৃত করিয়া তোলে, কিন্তু এই অভিনয়ে বেরসিক ও অর্বাচীনের প্রবেশাধিকার নাই।" [১১]

রবীন্দ্র-নাট্যভাবনায় এক অভাবনীয় চিন্তার ফসল হিসেবে আমরা পাচ্ছি ঋতুনাট্যগুলিকে। ঋতুর অন্তর্নিহিত ভাবকে সংগীতের সূত্রে বেঁধে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় এই জাতীয় নাটকে। ঋতুর লীলাবৈচিত্র্যকে মানবচিত্তে প্রতিফলিত করে বাইরের ও অন্তরের সমন্বয় এবং প্রকৃতি ও মানবের মিলনের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব ভাব সঞ্চারিত হয়েছে 'বসন্ত'(১৯২৩), 'শেষ বর্ষণ'(১৯২৫), 'নবীন'(১৯৩১), 'নটরাজ'(১৯৩১), 'ঋতুরঙ্গশালা'(১৯৩১), 'শ্রাবণগাঁথা'(১৯৩৪) প্রভৃতি নাটকে। মানুষ ও প্রকৃতি এসব নাটকের মূল বিষয়। সঙ্গীত এই নাটকগুলিতে মূলভাব প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ঋতুনাট্যের মতো নৃত্যনাট্যও বাংলা নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টি। ঋতুনাট্যে ছিল গানের প্রাধান্য। নৃত্যনাট্যে গানের প্রত্যেক পঙক্তিকে নৃত্যাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করে সমগ্র গানের ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে গানকে অবলম্বন করে নৃত্যের শৈলী নির্মিত হয়েছে। এই শ্রেণির নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহু দূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য-আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়।" [১২]

'চিত্রাঙ্গদা'(১৯৩৬), 'চন্ডালিকা'(১৯৩৮), 'শ্যামা'(১৯৩৯) প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে রবীন্দ্রনাথ নৃত্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের উৎকৃষ্ট অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এসব নাটকে নাচের মধ্য দিয়ে ভাবের যে সুন্দর রূপ প্রকাশিত হতে পারে তা উপলব্ধি করে নাচের নানা সম্ভাবনা ও পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছেন তিনি। এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন,

"এদেশে উৎসবের প্রধান অঙ্গ নাচ।... এক-একটি জাতির আত্মপ্রকাশের এক-একটি বিশেষ পথ থাকে। বাংলাদেশের হৃদয় যেদিন আন্দোলিত হয়েছিল সেদিন সহজেই কীর্তন গানে সে আপন আবেগ সঞ্চারের পথ পেয়েছে। এখনও সেটা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি। এখানে এঁদের প্রাণ যখন কথা কইতে চায় তখন সে নাচিয়ে তোলে। ... আমাদের দেশে একদিন নাট্য অভিনয়ে সর্বপ্রধান অঙ্গই ছিল নাচ। নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশ তাদের বলে অডিয়েনস্ অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য; অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যেই অভিনয়।"[১৩]

মূলত গীতিনাট্যকে বিচিত্র ভঙ্গির নৃত্যের সাহায্যে অধিক হৃদয়গ্রাহী ও রসসমৃদ্ধ করার একান্ত আগ্রহ ও উৎসাহ থেকেই রবীন্দ্রনাথ নৃত্যনাট্যের সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী ও সমকালীন অন্যান্য নাট্যকারেরা গতানুগতিক ধারায় নাটক রচনা করেছেন অথবা সমকালীন সামাজিক সমস্যা, জাতীয় উদ্দীপনা ও ঐতিহাসিক বিষয়কে অবলম্বন করে নাটক রচনার মধ্য দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয়তার সহজ রাস্তায় না হেঁটে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য রীতিনীতিকে আত্মস্থ করে অভিনব নাটক রচনার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকের বিষয় নির্বাচনে, জীবনদর্শন প্রতিফলনে, মঞ্চ প্রকৌশলে এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথ বাংলা নাটকে স্বতন্ত্র ধারার নাট্যকার । তিনি তাঁর নাটকে প্রচলিত চরিত্র ও প্লট গঠনের ধারণা বর্জন করেছিলেন। স্থান-কালের বিন্যাসকে নিবিড় ঐক্যের মধ্যে ধরে তাকে আবার ছড়িয়ে দিয়েছেন। গতানুগতিক রীতির বাইরে এসে নাটককে সংযুক্ত করেছেন নাচ-গানের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবনার অভিনবত্ব এবং বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষাই তাঁকে একই সঙ্গে স্বতন্ত্র ও আধুনিক করে তুলেছে।

### সূত্রনির্দেশ


১. শঙ্খ ঘোষ, 'কালের মাত্রা ও রবীন্দ্র নাটক', ৩য় সংস্করণ ১৯৮৫, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ১৮

২. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা , ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, পৃষ্ঠা ২৭-২৮।

৩. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', ১ম সংস্করণ ২০০৫, দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ২৫৪ ।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জীবনস্মৃতি', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ৯ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃষ্ঠা ৪৮২।

৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তপোবন'  'রবীন্দ্র রচনাবলী' ৭ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃষ্ঠা ৪৮২।

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১৩শ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ , বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃষ্ঠা ৭১৬।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রক্তকরবী', নতুন সংস্করণ, ১৪১০ বঙ্গাব্দ , বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃষ্ঠা ১১৮।

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেবেলা', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭১৭ - ৭১৮ ।

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অন্তর বাহির', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৫৬ ।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'তপতী', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১১শ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃষ্ঠা ১৫৭।

১১. অজিত কুমার ঘোষ, 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৯।

১২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র ভূমিকা', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১৩শ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৩ ।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'জাভা যাত্রীর পত্র', 'রবীন্দ্র রচনাবলী' ১০ম খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, পৃষ্ঠা ৫২৫-৫২৬।


---

লেখক - **ড. রিন্টু দাস,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

# জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশভাবনা একটি নিজস্ব পাঠ

**সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য**

আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা মূলত পাশ্চাত্য রীতির হাত ধরে। উনিশ শতকে যখন এই নাটকগুলো রচিত হয়েছিল,সেই সময় ভারতবর্ষ পরাধীন, ইংরেজদের অধিকারে। পরাধীনতার নাগপাশে বেষ্টিত জাতির নাটকে তাই দেখা যায় যে, অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে স্বদেশ তথা স্বজাতি ভাবনা বাংলা নাটকের একটি অন্যতম চর্চিত বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমাপ্তি হয়। তার ঠিক একশো বছর পর সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তীকালে ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১ নভেম্বর ভারতবর্ষে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং এই শাসনভার চলে যায় বৃটেনের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্থাৎ সরকারীভাবে ভারতবর্ষ ইংরেজদের হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল। আর তখন থেকেই পরাধীনতার যন্ত্রণায় পুড়তে লাগল এদেশের মানুষ। দেশবাসীর হৃদয়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভীমসিংহ চরিত্রে কিংবা 'মেঘনাদবধকাব্যের' রাবণের উক্তিতে এই যন্ত্রণা লক্ষ করা যায়। সেই বিশেষ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে লেখা নাটকগুলিতে দেশভাবনা বা দেশপ্রেম দুইভাবে আলোচিত হয়েছে— প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলে বাংলা স্বদেশপ্রেমমূলক নাটককে তিনটি ধারায় ভাগ করতে পারি।

(ক) হিন্দুমেলা পরবর্তী নাটক, (খ) হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ পূর্ববর্তী নাটক (গ) বঙ্গভঙ্গ প্রভাবিত নাটক।[১]

এরকম সময়ে চিহ্নিত নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন- (ক) এই সময়ের দেশপ্রেম ভাবনামূলক নাটকগুলি প্রধানত ইতিহাস ভিত্তিক, (খ) এসব নাটকের কোন না কোন চরিত্রে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রকাশিত, (গ) ইতিহাস প্রসিদ্ধ কাহিনিগুলিকে সমকালীন পাশ্চাত্য ভাবনায় জারিত দেশপ্রেম ভাবনার রঙে পরিবেশন করা হয়েছে। গোলাম মুরশিদ তাঁর 'সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক' গ্রন্থে বলেছেন-

" বাংলা 'ঐতিহাসিক বা স্বদেশ প্রেমমূলক নাটকের সংখ্যা বাড়তে থাকে উনিশ শতকের সত্তরের দশক থেকে। ১৮৭৫ সালে এরকম নাটক লেখা হয় সবচেয়ে বেশি, তেইশটি।"[২]

হিন্দুমেলা পূর্ববর্তী বাংলা দেশভাবনামূলক নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ ও মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল বলেছেন-

"নীলদর্পণ বিপ্লবাত্মক নাটক। ... ইহা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী

গ্রন্থ।"[৩]

মধুসূদনের ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী'-তে দেখি ভীম সিংহের স্বদেশ চেতনায় ভারতের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছাড়াও রয়েছে নারীমুক্তি প্রসঙ্গ। এরা ছাড়াও উনিশ শতকের প্রধান প্রধান প্রায় সব নাট্যকার যেমন, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, হরলাল রায়, মনমোহন বসু, জোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি প্রত্যেক নাট্যকারের নাটকেই স্বদেশ প্রেম তথা জাতীয়তাবোধ উল্লেখযোগ্য বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছে। আমরা আমাদের গবেষণা পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি ঐতিহাসিক নাটক ক্রমে, 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' ও 'অশ্রুমতী'-তে প্রতিফলিত দেশপ্রেম প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা, প্রখ্যাত নাট্যকার এবং হিন্দুমেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪৯-১৯২৫) কর্মকান্ড ও মানসিক প্রবণতার এক স্বাধীনচেতা মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'পুরুবিক্রম' নাটকে খ্রিস্ট পূর্ব যুগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এখানে আছে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে রাজা পুরুর লড়াইয়ের শৌর্যবীর্যের ঘটনা। তাঁর পরবর্তী তিনটি নাটক ক্রমে 'সরোজিনী', "অশ্রুমতী', 'স্বপ্নময়ী'-তে রয়েছে মুঘল-পাঠান যুগের কাহিনি। কোনও নাটকেরই ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস সরাসরি গৃহীত হয়নি। 'সরোজিনী'তে মেবারের রাজপুত সম্রাট লক্ষ্মণ সিংহের দিল্লির খিলজি শাসক আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই, 'অশ্রুমতী'তে মুঘল সম্রাট আকবরের সঙ্গে রাণা প্রতাপসিংহের যুদ্ধ ও 'স্বপ্নময়ী'তে শুভ সিংহের মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকগুলিতে মধ্যযুগীয় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের বর্ণনা আমরা দেখতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের নতুন দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রকাশ করেছেন তেমনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথও বঙ্কিমের পূর্বেই তাঁর নাটকে এই বিষয়বস্তু নিয়ে আলোকপাত করেছেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অখন্ড ভারত অবলম্বন করে দেশাত্মবোধের যে নবজাগরণ বঙ্গদেশে উদ্ভব হয়েছিল তাঁর পরিচয় প্রকাশ করবার জন্য তিনি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের কাহিনি অবলম্বন করেছেন তাঁর 'পুরুবিক্রম' নাটকে। এই নাটকে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচক যথার্থই বলেছেন- " একমাত্র আদর্শকেই জয়মাল্য দিয়া বরণ করিয়া লইবার আগ্রহে বাস্তবতার দায়িত্বকে যে কতদূর অস্বীকার করা যাইতে পারে, ইহা তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।"[৪]

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু অবলম্বন করে অখন্ড ভারতীয় দেশাত্মবোধমূলক যে কয়েকটি নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচনা করেছেন তারমধ্যে 'পুরুবিক্রম' নাটক অন্যতম। এই নাটক রচনার নেপথ্যের কারণ হিসেবে তিনি বলেছেন "হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত- কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে।

শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্ত্তন করিলে , হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি 'পুরু-বিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।"[৫]

গ্রিক বীর সেকেন্দর শাহের ভারত আক্রমণ এবং পাঞ্জাবের রাজা পুরুর সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে এই নাটক রচিত। মহারাজ পুরুর প্রবল পরাক্রম এই নাটকের মধ্যে দেখানো হয়েছে। এছাড়াও এরমধ্যে কুল্লু প্রদেশের রাণী ঐলবিলার সঙ্গে পুরুর প্রেম, ঐলবিলার প্রণয়াকাঙ্খী পাঞ্জাবের অন্য প্রদেশের রাজা তক্ষশীলের সেকেন্দর শাহের কাছে আত্মসমর্পণ, তক্ষশীলার বোন অম্বালিকার সঙ্গে সেকেন্দর শাহের প্রেম ইত্যাদির কাহিনিও এখানে বর্ণিত হয়েছে। মূলত দেশাত্মবোধ ও নাটকের উপজীব্য হলেও নাটকে প্রেমেরই প্রাধান্য লক্ষণীয়, এজন্য নাট্যকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ লাভ করতে পারেনি। যদিও সেকেন্দর শাহের ভারত আক্রমণের সময় অখন্ড ভারতের জাতীয়তাবোধের কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তবু একে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাগ্রত ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বাহন করা হয়েছে। বক্তৃতায় ও গানে এই ভাবটি প্রকাশিত হয়েছে-

" মিলে সব ভারত সন্তান এক তান মন প্রাণ, গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান কোন আদ্রি হিমাদ্রি সমান।।"[৬]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকেই সর্বপ্রথম এই আধুনিক দেশপ্রেমের বাণী স্পস্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই দেশপ্রেমের মধ্যে কালনৌচিত্য দোষ রয়েছে। রাজা পুরুর মধ্যে যে স্বদেশ প্রীতির পরিচয় দেখানো হয়েছে তার ভেতর দিয়ে মূলত ইংরেজ শাসনে পীড়িত ভারতীয়ের মুক্তির বার্তাই ঘোষিত হয়েছে। সেকেন্দর শাহের প্রশ্নের উত্তরে পুরুর বক্তব্যে সেটাই সূচীত করে। সেকেন্দর যখন বলেন-

" এই অন্তিমকালে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কত্তে হবে বলো?
পুরু। ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেইরূপ মৃত্যু ও রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কত্তে হয়, সেইরূপ ব্যবহার।"[৭]

তবে যেহেতু দেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধক চেতনা তখনও একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল তাই নাটকটিতে দেশপ্রেম সেভাবে ডানা বিস্তার করতে পারেনি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন 'পত্রে এর সমালোচনা -প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

"গ্রন্থখানি বীররসপ্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যে বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়।"[৮]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর রচিত ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে তথ্য অবিকৃত রাখেন নি এবং সুস্পস্টভাবে তা স্বীকার করেছেন পরবর্তীকালে। কলকাতার বড়বাজার লাইব্রেরীর অবৈতনিক সম্পাদক কেশবপ্রসাদ মিত্রকে লিখিত এক পত্রে তিনি তাঁর ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন-

"ইহা বুঝা উচিত, নাটক ও ইতিহাস এক জিনিস নহে। কোনও দেশের কোনও নাটকেই ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে রচিত হয় না।"[৯]

-অর্থাৎ এ কথা বললে অন্যায় হবে না যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সজ্ঞানে ইতিহাসভিত্তিক তথ্য কিছুটা বিকৃত করেছেন। নাটকের প্রয়োজনে তিনি প্রায়ই কাল্পনিক ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লিখিত নাটকগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে হিন্দু রাজাদের বীর্যবত্তা। আর এই বীর্যবত্তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় ইতিহাস লঙ্ঘন করেছেন। মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে কিছু বিদ্বেষও যে এক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে এই বিদ্বেষ শুধু শাসকদের বিরুদ্ধেই, সাধারণ মুসলমান জনসমাজের বিরুদ্ধে নয়। তবে এটা বলা যায় যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত নাটকগুলোতে যে জাতীয়তাবোধ রয়েছে তার মধ্যে হিন্দু ভাবনা প্রকট।

মুসলমান আমলের বিষয়বস্তু নিয়ে লিখিত নাটকেরও মূল উদ্দেশ্য হিন্দু সম্রাটদের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন। ফলে এই নাটকগুলিতে যে দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তাবোধ ফুটে উঠবে তাতে আর আশ্চর্য কী। সমসাময়িক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অবশ্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নিঃসংশয় ছিলেন না। সম্ভবত তাই 'ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন-

"প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান তাহার অন্তর্ভূক্ত হয় কি না?।"[১০]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, হিন্দু-জাগরণের মাধ্যমেই জনগণের হৃদয়ে দেশপ্রেম জাগ্রত হবে, প্রতিষ্ঠিত হবে জাতীয়তাবাদ। 'সরোজিনী' হচ্ছে লেখকের সেই নাটক যেখানে হিন্দু মুসলিম প্রসঙ্গ প্রথম উল্লিখিত হয়েছে। তবে এই নাটকের মূল দ্বন্দ্ব হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব নয়, মূল দ্বন্দ্ব অনেকটাই ব্যক্তিগত। এই দ্বন্দ্ব জাগ্রত হয়েছে রাজার হৃদয়ে। উনিশ শতকের শেষভাগের জনপ্রিয় এই নাটকের সংলাপ—

"সরোজিনী।। মা চতুর্ভূজা! যাদের জন্য পিতার আজ এরূপ বিষম ভাবনা হয়েছে, সেই দুষ্ট মুসলমানদের শীঘ্র নিপাত কর।

লক্ষ্মণ।। বৎসে! মুসলমানদের নিপাত সহজে হবার নয়। তার পূর্বে অশ্রুপাত করতে হবে।"[১১]

সেই সময়ের হিন্দুদের মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য তাঁকে করেছিল বিচলিত। তিনি লিখেছিলেন-

"সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে এখন একতা নাই- .. এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি এবং পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একতার অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে।"[১২]

মধ্যযুগে মুসলমান আমলে হিন্দু শৌর্যের কাহিনি অতয়েব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে বিষয়বস্তু হিসাবে সহজেই গ্রহণযোগ্য হলো। এক্ষেত্রে তিনি নির্বাচন করলেন টড-প্রণীত

'এন্যালস এন্ড এন্টিকুইটিজ অফ রাজস্থান' গ্রন্থকে। এই বইয়েরই একটি কাহিনি গ্রহণ করে তিনি রচনা করেন 'সরোজিনী ' নাটক (১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) । যদিও সমালোচক এখানে গ্রিক 'ইফিজিনিয়া' নাটকের ছায়া দেখেছেন। তাঁর মতে-

"সরোজিনী আদৌ মৌলিক নাটক নয়।"[১৩]

সরোজিনী নাটকে হিন্দু জাতীয়তাবোধ চেতনা থেকেই নাটকটিতে রাজপুতদের ধর্মাচরণের অন্ধবিশ্বাস এবং নিজস্ব মতানৈক্যের কথা চিত্রিত। চিতোরে আক্রমণ করতে আলাউদ্দীন (আলাউদ্দিন খিলজি) উপস্থিত, এমন আসন্ন সঙ্কটকালে মেবারের রাজা মন্দিরে কল্পিত দৈব ভরসায় কর্মবিমুখ- লেখক এখানে তার বিস্তারিত চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। নাটকটিতে ঐতিহাসিক তথ্য সবসময় নির্ভুলভাবে অনুসরণ না হ'লেও সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের বোধ এখানে অক্ষুন্ন। রাজপুত জাতির গৃহযুদ্ধ বা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার কথা মধ্যযুগের এক ঐতিহাসিক সত্য। সঙ্গে একথাও আমাদের মেনে নিতে হয় যে নাট্যকারের সমসাময়িক যুগের প্রভাবও এখানে কিছুটা আছে। নাটকটির বিজয়সিংহ চরিত্রের কথাবার্তা ও কর্মকান্ডে নাট্যকারের যুগের কথাই প্রতিধ্বনিত। যেমন-

"মহারাজা!.. যখন মাতৃভূমি আমাদিগকে কার্য্য কত্তে বলচেন, তখন তাই যথেস্ট, আর কোনোদিকে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন নাই। মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী।"[১৪]

-'মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের দৈববাণী'— এমন বাক্য উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলশ্রুতি। রাজার হৃদয়ে দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাহিনীতে যে জটিলতার সৃষ্টি করেছেন, অসামান্য তার নাট্যমূল্য। দেবীর মন্দিরে দৈববাণীর ব্যাখ্যায় ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্য্য (মহম্মদ আলি) যখন রাণা লক্ষ্মণ সিংহকে জানালো যে, রাজকন্যা সরোজিনীর রক্তই রাজপুত জাতির বিজয়লক্ষ্মী গ্রহণ করবেন, সেই মুহূর্ত থেকেই রাণার চরিত্রে সন্তান বাৎসল্য ও দেশপ্রেমের সংঘাত শুরু হল। অবশ্য 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহের মধ্যেও এমন দ্বন্দ্বের চিত্র দেখা যায়। তবে সেই নাটকে ভীমসিহের হৃদয় সঙ্কট যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়নি। 'সরোজিনী' নাটকের পিতৃস্নেহ ও রাজকর্তব্যবোধের দ্বন্দ্বে লক্ষ্মণ সিংহের চিত্ত শেষ অবধি রক্তাক্ত।

মহম্মদ আলি ওরফে ছদ্মবেশী ভৈরবাচার্য চরিত্রের পরিণতি এই কাহিনির আর একটি নাটকীয় দিক। তার নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রে এক ধর্মভীরু পিতা তার নিরপরাধ কন্যাকে হত্যা করতে অগ্রসর হয়েছিল। শেষে সেই ষড়যন্ত্র শুধু যে ব্যর্থ হ'ল তা-ই নয়, সেই ষড়যন্ত্রেরই সূত্র বেয়ে তার নিরপরাধ হারানো মেয়ের মাথায় মৃত্যুদন্ড নেমে এল— নিজেরই হাতে। অতীব যন্ত্রণাদায়ক হলেও ঘটনাটি নাটকীয় শ্লেষের (Dramatic Irony) চমৎকার দৃষ্টান্ত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে মুসলমান চরিত্রে জাতীয়তাবাদী মনোভাব খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। 'সরোজিনী' নাটকে অন্তত একটিও অকলঙ্কিত

ইসলাম ধর্মীয় চরিত্র নেই। নাটকটির কুটিল ষড়যন্ত্রকারী 'ভিলেন'-মহম্মদ আলির আপাত নিরীহ গ্রাম্য অনুচর ফতে উল্লাও ঘোর সাম্প্রদায়িক। তার উক্তি-

"মোরা বাদশার জাত, পরোয়া কি? সব নসিবির কাম। মুই বাদশা হ'লি ত আগে এই হ্যাঁদু ব্যাটাদের কুটি কুটি করে জবাই করি"... ইত্যাদি।[১৫]

-বলাবাহুল্য, পরিহাস ছলে নাট্যকার এখানে সাধারণ মুসলমানের উগ্র সাম্প্রদায়িকতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এমন কি, পরাক্রান্ত যোদ্ধা আলাউদ্দীনও এখানে নারীলোলুপ হিসাবে চিত্রিত-

"এবার দেখব, পদ্মিনী বেগম কেমন তার সতীত্ব রক্ষা করতে পারে।"[১৬]

সঙ্গীতের মাধ্যমে উনিশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'সরোজিনী'তেও রবীন্দ্রনাথের লেখা 'জ্বল জ্বল দ্বিগুণ দ্বিগুণ' — গানটি এককালে সমগ্র বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'জ্বলজ্বল্ চিতা'— গানটিতে প্রকাশিত আত্মদহনের ভস্মাবশেষই গানটির মর্মার্থ নয়, সেই দহনের মধ্যেও আছে নবাগত সম্ভাবনার ভবিষ্যৎবার্তা-

"শোন্ রে যবন,

শোন্ রে তোরা, যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালাবি সবে, সাক্ষী রলেন দেবতা তার, এর প্রতিফল ভুগিতে হবে।"[১৭]

এই আখাঙ্খারই পরিচয় পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে, ভৃত্য রামদাসের কণ্ঠে-

"স্বাধীনতা-রত্নহারা, অসহায়া, অভাগা জননি।"[১৮] ইত্যাদি অংশে।

সরোজিনী নাটক সম্বন্ধে উপসংহারে এ-মন্তব্য করা চলে যে, আদর্শ প্রচার তীব্র নয় এখানে, কিছুটা চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াসও আছে; তবু নাট্যকার এখানে অনেক সময় স্বজাতীয় আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষকে প্রকাশ করে ফেলেছেন।

'অশ্রুমতী' নাটকেও জেমস টড- এর 'রাজস্থান' থেকে কাহিনি অবলম্বন করা হয়েছে। নাটকের প্রারম্ভে নাট্যকার ইশারা করেছেন তার বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে—

" There is not a pass in the alpine Aravalli that is not Sanctified by some deed of Protap, some brilliant victory or often more glorious defeat. Haldighat is the Thermopoylee of Mewar, the field of Dewer her Marathan."[১৯]

রাণা প্রতাপ সিংহের দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগে প্রত্যেক দেশবাসী দেশের জন্য আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হবে, নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ছিল একান্ত ইচ্ছা।

উনিশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে সেই যুগের অনেক ঐতিহাসিক নাটকেরই প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। 'অশ্রুমতী' নাটকও তার ব্যতিক্রম নয়। টডের গ্রন্থ থেকে

কাহিনি গ্রহণ করলেও এখানে একাধিক কল্পিত ঘটনা বা চরিত্র রয়েছে। অশ্রুমতী এরকমই একটি কাল্পনিক চরিত্র। নাটকে সে রাণা প্রতাপসিংহের কন্যা। শাহজাদা সেলিমের প্রতি তার অনুরাগ এই নাটকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই প্রসঙ্গটি সে যুগের হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা ভালো ভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। বরং নাটকটি অভিনয়ের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে অনেক সমালোচনার মুখে পড়তে হয়, বিশেষ করে 'হিন্দুস্থানী সমাজে কিছুদিন প্রবল আন্দোলন চলে।'[২০] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তার কিছু কিছু উত্তরও দেন। সেই উত্তর প্রত্যুত্তরে এই সত্য ধরা পড়ে যে, সেই যুগের ঐতিহাসিক নাটকের সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অত্যন্ত নিবিড় ছিল।

এই নাটকে প্রতাপসিংহ চরিত্রের মূল ভাবনা দেশভাবনার বোধ থেকে জাত। প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টায় নব্য জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ স্বদেশী আন্দোলনের অদম্য স্বাধীনতা স্পৃহাই প্রস্ফুটিত। এই প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি স্মরণযোগ্য-

".. যতদিন না চিতোরের অস্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি— ততদিন, আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাসসামগ্রী ব্যবহার করব না"[২১]... ইত্যাদি।

এই নাটকে কল্পিত সেলিম-অশ্রুমতী প্রেম কাহিনির প্রতি নাট্যকারের অধিক পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। সম্ভবত তাই প্রতাপসিংহের প্রতি নাট্যকার পুরোপুরি মনোযোগ দেবার অবকাশ পাননি। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে, এই প্রেমকে তিনি স্বদেশবোধের সংস্কারমুক্ত মন নিয়েই অঙ্কন করতে চেয়েছেন। 'অশ্রুমতী'র বিজাতীয় প্রেম নিয়ে তৎকালীন হিন্দুসমাজে তুমুল বিক্ষোভ ঘনিয়ে উঠেছিল। একটি দৃষ্টান্ত, যেমন ড. হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন যে, এই নাটকের অভিনয় ছেড়ে গিরিশ ঘোষ বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন-

"আগে যদি ঘুণাক্ষরে জানতাম যে, প্রতাপ সিংহের কন্যা সেলিমের অনুরাগিনী তবে কি এ অভিনয়ে সম্মতি দিই?"[২২]

-কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ জাতীয়তাবোধ -নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ শিল্পমূল্যের নিরিখেই চরিত্রটি বিচার করেছেন। তিনি কেশবপ্রসাদকে একটি পত্রে লিখেছেন-

" যদি কেহ বলেন, প্রতাপ সিংহের দুহিতা একজন মুসলমানকে ভালবাসিবে? — দেখুন কিরূপ অবস্থঅয় অশ্রমতী মানুষ হইয়াছিল। .. যে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল তাকেই সে ভালবাসিবে তাহাতে আশ্চর্য কি?" [২৩]

এমন কি রাজপুত-মুসলমানের জাতি-পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পরও প্রেমের জাতি নিরপেক্ষ শাশ্বত মূল্যের কথা শোনা যায় অশ্রুমতীর একটি উক্তিতে। সেলিম সম্বন্ধে শক্তসিংহের সতর্কীকরণের পর অশ্রুমতীর এই উক্তি স্মরণযোগ্য-

"আমি রাজপুতও জানিনে, মুসলমানও জানিনে- আমার হৃদয় যাকে চায়, আমি তাকেই জানি।"[২৪]

অবশ্য সমসাময়িক যুগ -তাড়নায় অশ্রুমতী চরিত্রের শেষ রক্ষা সম্ভব হয় নি, তাকে যোগিনীত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু এতো কিছু সত্ত্বেও, চরিত্রটির এই সম্ভাবনার স্বীকৃতি সেই যুগের হিন্দুত্ববাদী উগ্র জাতীয়তাবোধের সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্র-মানসের কুণ্ঠিত সংশয়ের পরিচয় বহন করে।

এখন অশ্রুমতীর প্রণয় প্রসঙ্গ সরিয়ে রেখে যদি প্রতাপসিংহের কেন্দ্রীয় কাহিনির বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখা যায় এখানে তিনি রাজপুত জাতির ইতিহাসের যথার্থ বিচার করে প্রতাপ সিংহের ব্যক্তিগত শৌর্য এবং বংশ গৌরবের প্রেরণার কথাই ব্যক্ত করেছেন। "বাপ্পারাওর বীররক্ত এবং সর্বলোকপূজনীয় রামচন্দ্রের 'অকলঙ্কিত' রক্তের উত্তরাধিকারের" ঘোষণায় বারবার প্রতাপসিংহের বংশ গৌরবের দিকটাই বড় হয়ে উঠেছে। এই গৌরবই কখনও তীব্র হিন্দু জাতীয় গৌরবে পরিণত হতে চেয়েছে। ফলে, 'ঘৃণ্য মুসলমান', 'পামর যবন' ইত্যাদি উক্তির প্রয়োগ অধিক পরিমাণে ঘটেছে। রাজপুত বিকানিরের রাজকুমার পৃথ্বিরাজের দেশোদ্দীপনা মূলক বাক্যও একান্তভাবে হিন্দু গৌরবের কথাই ব্যক্ত করে। তার সূচনা হয়েছে এরকম-

"হিন্দুর ভরসা আশা হিন্দুর উপর"[২৫]

নাটকটিতে স্বদেশপ্রেমের আরও দু'একটি গান থাকলেও তারা "গাও ভারতের জয়" বা "জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ", প্রভৃতি সঙ্গীতের মতো উদ্দীপনাময় নয়। এই নাটকটিতে তিনি প্রেম সঙ্গীতের প্রতি বেশী মনোযোগী। স্বরচিত প্রেম সঙ্গীত ছাড়াও এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে" সঙ্গীতটি ব্যবহার করেছেন। ফলে একথা বলা যেতে পারে যে, 'অশ্রুমতী' নাটক দেশপ্রেমের পটভূমিকায় লেখা হলেও কাল্পনিক প্রেমের গল্পই এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক এই যে দেশাত্মবোধের নব-জাগরণ, নিরপেক্ষ ভাবে বলতে গেলে, এ -জাগরণকে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বলা চলে। কারণ 'হিন্দুমেলা'র মূল লক্ষ্য জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেম প্রচার হলেও হিন্দুদের শৌর্য-বীর্যের পুনরুত্থানই এর আসল উদ্দেশ্য ছিল। শুধু এখানেই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ' ইত্যাদির মধ্যেও ওই একই ভাবনার প্রাধান্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেক সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলোকেও একই উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়। তবে এ-কথা ঠিক যে, হিন্দুজাগৃতির কথা সেদিন ভারতীয় জনগণের জাগৃতি অর্থেই তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন। প্রকাশ্যে ইংরেজ রাজ-সরকারকে বিরুদ্ধ পক্ষে নির্বাচন করে দেশপ্রেম প্রচারের মতো মনোবল সেদিনের অধিকাংশ বাঙালিরই ছিল না বলেই তারা মুসলমানকে প্রতিপক্ষরূপে গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এই নাটকের অভিনয় পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতে যে প্রতিবাদ হয়েছিল, তার থেকে আমরা এ-সত্যে উপনীত হই যে,'অশ্রুমতী' নাটকের কাহিনী পরিকল্পনা হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের ভাবানুভূতিকে আঘাত করেছিল। 'অশ্রুমতী'র অবাস্তব আদর্শচ্যুত পরিকল্পনা জাতীয়তা ও ধর্মীয়বোধকে কিছু পরিমাণে হলেও ক্ষুন্ন করেছে।

এই নাটকে রাণা প্রতাপের মুখ থেকে নাট্যকার দেশপ্রেম প্রচার করেছেন—

" কি মানসিংহ তুমি, তুমি আমার অহঙ্কার চুর্ণ করবে? বাপ্পা রাওর বীর রক্ত, সর্বলোকপূজনীয় রামচন্দ্রের অকলঙ্কিত রক্ত যে ধমনীতে বহমান, তার অহঙ্কার চুর্ণ করা কি দাসব্রতে রত পতিত মানভ্রষ্ট মানসিংহের কর্ম।"[২৬] অন্যত্র যুদ্ধক্ষেত্রে ঝালাপাতি মান্নাকে বলেছেন-

" না ঝালা, ছত্র উদ্যত থাক— আমি চাই যে, এই চিহ্ন দেখে মানসিংহ আমার কাছে আসে— যদি সে কাপুরুষ না হয়, অবশ্যই আসবে- চল, চল- যেখানে মানসিংহ সেখানে চল।"[২৭]

এখানে প্রতাপ চরিত্রে সমগ্র রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট্য আরোপ করে নাট্যকার শিল্প-রুচির পরিচয় দিয়েছেন।

চিতোরের রাণা প্রতাপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন-

"মহারানা প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। ... যখন প্রতাপ সিংহ আসন্ন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া শক্ত সিংহের নিকট শুনিলেন যে সেলিম পাপ-হস্তে অশ্রুমতীকে স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই, তখন তিনি তাহার প্রাণনাশ করিতে ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু অশ্রুমতীর মনেও পাছে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ হইয়া থাকে- এই আশঙ্কায় তিনি তাঁকে চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। ইহা অপেক্ষা অটল কর্তব্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?"[২৮]

তাঁর পরবর্তী নাটক 'স্বপ্নময়ী'-তে দেশভাবনার বার্তা থাকলেও সীমিত পরিসরের দিকে খেয়াল রেখে আমরা সে আলোচনা এখানে করছি না, পরে সময় নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।

আলোচনার শেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনামূলক যে মতাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর মূল কথা হল-

ক) তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শ উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত স্বদেশ ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

খ) তাঁর দেশ চেতনা যতটা আবেগিক, ততটা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

গ) দেশভাবনা বিষয়ক চিন্তাচর্চায় তিনি অনেকটা সমকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অনুগামী।

ঘ) 'পুরুবিক্রম' - ছাড়া তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে হিন্দু-মুসলমান ভাবনার সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। যদিও শাসক ও শাসিতের সম্পর্কের আড়ালে ইংরেজ বিরোধিতাই উদ্দেশ্য, তবুও কিছু জায়গায় সম্প্রদায় -বিদ্বেষ বেশি করে চোখে পড়ে।

ঙ) অবশ্য প্রেমের সম্পর্কে তিনি জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ে বিশ্বাসী নন। এক্ষেত্রে তিনি সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে হৃদয়কে আটকে রাখেন নি। সেলিম-অশ্রুমতী এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

তথ্যসূত্র ঃ

১) মিশ্র, অশোককুমার, 'বাংলা নাটকে-স্বদেশ চেতনা', সত্যবতী গিরি ও সমরেশ মজুমদার

(সম্পাঃ), 'প্রবন্ধ সঞ্চয়ন', ২য় সংস্করণ, ২০০৬, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ, ৬৮১।
২) মুরশিদ, গোলাম, সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক (১৮৫৪-১৮৭৬), ২য় সংস্করণ, ১৯৮০, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ, ৪৪৬।
৩) শীল, বৈদ্যনাথ, বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা, পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, পৃ, ১৪১।
৪) ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ( প্রথম খন্ড), ৫ম সংস্করণ, ২০০২, এ. মুখার্জী এন্ড কোং, কলকাতা, পৃ, ৩৬৪।
৫) চট্টোপাধ্যায়, বসন্তকুমার, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, প্রথম সং, ফাল্গুন ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, শিশির পাবলিশিংহাউস, কলকাতা, পৃ, ১৪১।
৬) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর , 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ' ১ম প্রকাশ , অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫, বিশ্বভারতী গ্রন্থ প্রকাশ, কলকাতা, পৃ, ৩৯। ৭) তদেব, পৃ,৯৮।
৮) রায়, সুশীল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৭, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ, ১৪৫।
৯) তদেব, পরিশিষ্ট, অশ্রুমতী প্রসঙ্গ, পৃ, ২১৬।
১০) ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা', প্রবন্ধ -মঞ্জরী, ১৩১২ বঙ্গাব্দ, সান্যাল এন্ড কোম্পানি, কলকাতা, পৃ,৬১।
১১) ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৭৬, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৃ,১৫০।
১২) 'ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা', পূর্বোক্ত, পৃ,৬২।
১৩) দাস, পুলিন, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক ১ম খন্ড, দ্বিতীয় সং, আশ্বিন ১৪০৩, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স, কলকাতা, পৃ, ১২১।
১৪) ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃ,১৩৫।
১৫) তদেব, পৃ,১৫৯। ১৬) তদেব, পৃ,১৪১। ১৭) তদেব, পৃ, ২২৫। ১৮) তদেব, পৃ,২২৭-২২৮।
১৯) ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অশ্রুমতী নাটক, দ্বিতীয় সং, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ, আদি ব্রাহ্মসমাজ, কলকাতা, নাম পৃষ্ঠা।
২০) ঘোষ, অজিতকুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, ৮ম সং, জুন, ১৯৯৯, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা, পৃ,১৩৮।
২১) ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্য সংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ২৯৪।
২২) দাশগুপ্ত, হেমেন্দ্রনাথ, বাঙ্গালা নাটকের ইতিবৃত্ত, দোল পূর্ণিমা ১৩৫৪, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ,১২০।
২৩) রায়, সুশীল, পূর্বোক্ত, অশ্রুমতী প্রসঙ্গ, পৃ, ২১৬।
২৪) ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃ, ৩৬৯।
২৫) তদেব, পৃ,৩২৭। ২৬) তদেব, পৃ,২৯৩। ২৭) তদেব, পৃ,৩০৬।
২৮) রায়, সুশীল, পূর্বোক্ত, পরিশিষ্ট,পৃ, ২১৩।

লেখক ঃ **ড. সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য**। এসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়।

# জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার অসমিয়া নাটক কারেঙর লিগিরি প্রসঙ্গ : নারীর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

জাহ্নবী দাশ

গঠনমুখী ও প্রগতিশীল বিপ্লবে বিশ্বাসী জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা ফিল্ম প্রযোজনা ও পরিচালনা সম্পর্কে ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক হিমাংশু রায়ের সাহায্যে জার্মানীতে প্রশিক্ষণ নিয়ে ১৯৩০ সালে যখন ভারতবর্ষে ফিরে আসেন, তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশজুড়ে চলছিল অসহযোগ আন্দোলন। সাতাশ বছরের যুবক জ্যোতিপ্রসাদ সেই আন্দোলনে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে যোগ দেন। এর কিছুদিনের মধ্যে সাক্ষরিত হয় গান্ধী-আরউইন চুক্তি (৫ মার্চ, ১৯৩১) । স্বেচ্ছাসেবক দের অধিনায়ক হিসেবে কাজ করার জন্য ১৯৩২ সালে পনেরো মাসের সশ্রম কারাদন্ড হয় আগরওয়ালার। কারাগারের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরপরই অসমিয়া চলচ্চিত্র শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি কলংপুর ভোলাগুরি চা বাগানে প্রতিষ্ঠা করেন 'চিত্রলেখা মুভিটোন। ১৯৩৫ সালে এই 'চিত্রলেখা মুভিটোন'- এ নির্মিত হয় লক্ষীনাথ বেজবরুয়ার কাহিনি অবলম্বনে প্রথম অসমিয়া চলচ্চিত্র 'জয়মতী'। যেখানে জয়মতীকে প্রথম মহিলা সত্যাগ্রহী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন পরিচালক। এ নির্মাণের বছর খানেকের মধ্যেই বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার সহযোগিতায় জয়মতী' ও শোণিত কুঁওরী' নাটকের গ্রামোফোন রেকর্ডে তিনি নাট্য প্রযোজনা করেন। তেজপুরের বাণ স্টেজে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে এক অভিনব অর্কেস্ট্রার সৃষ্টি করে অসমিয়া রঙ্গামঞ্চ তথা সঙ্গীতজগতে খুলে দেন এক নতুন পথ। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯৩৭ সালে তেজপুরে নির্মিত হয় 'জোনাকি' সিনেমা হল। অসমিয়া ভাষায় দ্বিতীয় চলচ্চিত্র 'ইন্দ্রমালতী, জ্যোতিপ্রসাদের পরিচালনায় ১৯৩৯ সালে মুক্তি লাভ করে।

অসমের সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক জীবনে অনস্বীকার্য ভূমিকা রয়েছে জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালার। চিন্তনের স্বচ্ছতা, বিষয়ের নতুনত্ব ও অননুকরণীয় সঙ্গীত তথা সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে রূপকোঁওর আজও সমান প্রাসঙ্গিক। সঙ্গীত, নাটক, অভিনয়, চলচ্চিত্র, কবিতা, শিশুসাহিত্য, স্থাপত্যশিল্প, কলাবিচার- জ্যোতিপ্রসাদের সৃজনীশক্তির সর্বত্রই রয়েছে সুক্ষ্ম বিচারবোধ ও নিজস্বতার ছাপ। ছেলেবেলা থেকেই রঙ্গামঞ্চের সঙ্গো তাঁর যোগাযোগ ছিল। নিজে ভালো অভিনয় করতেন। ভারতীয় ও পাশ্চাত্য রঙ্গামঞ্চে সঙ্গীতের ব্যবহারে যে ভিন্নতা রয়েছে, এ বিষয়েও ছিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। পূর্বসূরী ও সমসাময়িক নাট্যকারদের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ। নাট্যঘটনায় টানটান উত্তেজনা

বজায় রাখার জন্য তিনি sub plot-এর ব্যবহার করতেই চাননি। অঙ্ক ও দৃশ্য পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও তিনি শুরু থেকেই সচেতন ছিলেন। উপেক্ষিতা নারীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র। কাব্যগুণ সম্পন্ন হলেও রূপকোঁওরের নাটকগুলির মঞ্চসাফল্য ছিল ঈর্ষণীয়। চোদ্দ বছর বয়সে লেখা 'শোণিতকুঁওরী' থেকে শুরু করে 'কারেঙর লিগিরি'(১৯৩০), 'রূপালীম'(১৯৩৮), 'লভিতা' (১৯৪৮), 'নিমাতী কইনা' (১৯৬৪), 'খনিকর'(১৯৭৭)-সমস্ত নাটকেই এই বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান।

বিশ শতকের চারের দশকের শুরু থেকে অসমিয়া সমাজের নারী জেগে উঠতে শুরু করে। ঘরোয়া কাজকর্মে উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকা মেয়েরা চারদেয়ালের বাইরে বৌদ্ধিক জীবনে পা রাখে। মেয়েদের একঘেয়ে দিনযাপনের প্রতিবাদে ১৯৪৬ সালে তেজপুর মহিলা সমিতি একটি প্রস্তাব পেশ করে। প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে আসেন জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, " এই প্রস্তাবর মাজেদি ওলোয়া মহান বাতরিটোর অর্থ জগতে নুবুজি হাঁহিলেও মই শিল্পীয়ে অসমর সমবেত শিল্পীর কেন্দ্রস্থানর পরা আজি সেই তেজপুরর আইদেউসকলক সকলো শিল্পীর হৈ প্রণিপাত জনাওঁ।"[১] প্রচলিত অর্থে আমরা যাকে নারীবাদ বলি, নারীদরদি জ্যোতিপ্রসাদের নারীভাবনা তার থেকে অনেকটাই আলাদা। পুরুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিলেই নারীদের সমান অধিকার চলে আসবে এ-কথা তিনি কখনো বলেননি। নারী মুক্তির অর্থ শুধু পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা নয়, নারীর নিজের অন্তরের অবরোধ থেকেও মুক্তি। তিনি মনে করেন ব্যক্তিস্বরূপের উপলব্ধিতেই লুকিয়ে আছে নারীমুক্তির চেতনা। আমাদের আলোচ্য গবেষণাপত্রে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

ভারতবর্ষের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে সর্বংসহা রূপে দেখতেই অভ্যস্ত। সীতা, সাবিত্রী, শকুন্তলা থেকে শুরু করে ভারতীয় সাহিত্যে এই রূপ নতুন নয়। সমাজ ও বহুকাল ধরে চলে আসা সংস্কারকে অস্বীকার করে নিজের অস্তিত্বকে বড় করে দেখতে শেখেনি আমাদের তথাকথিত মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েরা। গৃহলক্ষ্মী হয়ে ওঠার সাধনাই নারীত্বের চরম সিদ্ধি-- এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে আমাদের সমাজে। নিমগাছ যেমন আবর্জনার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাতাসে অক্সিজেন সরবরাহ করে, তেমনি বাড়ির প্রত্যেকের জীবনকে মসৃণ করে তোলার দায়িত্ব মেয়েদের একার। কাকভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত সে খেটে চলে, "বাড়ির বিজ্ঞরা খুশি হন।"[২] কিন্তু তার প্রাপ্তির ভাঁড়ারে জমা হয় শুধু যন্ত্রণা, হতাশা আর অন্ধকার।" বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তূপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে "[৩] থাকতে হয় তাদের। যাবেই বা কোথায়? আর কার কাছে? আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তো মেয়েরা নিরাপদ নয় আজও। মা-বাবা উপযুক্ত মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ধর্ম রক্ষায় ব্যস্ত। বিবাহিত জীবনে অসুখী মেয়েটা ফিরে এলে কতজন অভিভাবক তার পাশে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখেন? এইজন্যই ফিরতে পারেনি 'কারেঙর লিগিরি'র কাঞ্চন। প্রেমিক অনঙ্গের কাপুরুষতা এবং স্বামী সুন্দরের

উপেক্ষা তাকে ঠেলে দিয়েছে কষ্টকর দিনযাপনের দিকে। ‘ The second sex’ গ্রন্থে সিমোন দা বোভোয়া বলেছেন, “ One is not born, but rather become a woman, it is civilization as a whole that produces this creature, intermediate between male and eunach, which is described as femine!”[৪]

যতই প্রগতিশীল হোক না কেন কাঞ্চনও কিন্তু সমাজের এই গন্ডীকে অতিক্রম করতে পারেনি। তার অসহায় স্বীকারোক্তি আজও অনেকটাই প্রাসঙ্গিক, “ আমার দেশর ছোয়ালীয়ে যাকে ইচ্ছা অবশ্যে তাকে ভাল পাব পারে। কিন্তু যাকে ইচ্ছা তাকে বিয়া করাব নোয়ারে। চরুক শুধি চাউল নবহায়।”[৫] আসলে শিশুকাল থেকেই নারীর জগত ধমক দিয়ে ঠাসা। তাকে প্রতিপদে জানিয়ে দেয় সমাজ, পুরুষ যা করতে পারে স্বচ্ছন্দে, সে তা করতে পারে না। বিনা প্রশ্নে মেনে নিতে শেখে পিতৃতান্ত্রিক বিধিনিয়ম ও সংস্কারকে । এককথায় “সমস্ত যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে”[৬]। ‘ A Room of One’s Own’ গ্রন্থে ভার্জিনিয়া উলফ এই প্রসঙ্গেই জানাচ্ছেন, “পুরুষতন্ত্রের সহজ শিকার হওয়ার জন্য নারীর দায়িত্ব কম নয়। গার্হস্থ্য এবং জীবিকার ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় শিকারির সঙ্গে সহযোগিতা করে।”[৭] আহোম রাজ্যের নিয়ম, রাজমাতার আদেশ, স্বর্গদেউয়ের বার্দ্ধক্য- এই সবকিছুর চাপে পরে বাধ্য হয়ে সুন্দর কোঁওর কাঞ্চনকে বিয়ে করে। স্বপ্নে আর বাস্তবে, আশা আর প্রাপ্তিতে চরম অসামঞ্জস্য নিয়েও কাঞ্চন নিরন্তর বোঝাপড়া করার চেষ্টা করেছে তার জীবনে। নিজের স্বপ্ন আর ইচ্ছেগুলিতে দাঁড়ি টেনে চেষ্টা করেছে স্বামীকে সুখে রাখার। আসলে মধ্যবিত্ত মানসিকতায় শতকরা নব্বইজন মেয়ের কাছে বিয়েটাই জীবনের চরম প্রাপ্তি। কাঞ্চনের আবাল্য সংস্কার তাকে শিখিয়েছে যে মেনে নেওয়াটাই মেয়েদের ধর্ম। মনের মতো করে জীবনসঙ্গী না পেলেও, স্বপ্নগুলো চুরমার হয়ে গেলেও বিদ্রোহ সে করেনি। এই প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি উক্তি আমাদের ভীষণ মনে পড়ে। প্রতিমাভঙ্গা’ (তারুণ্য) প্রবন্ধে তিনি বলেছন, “আমাদের মেয়েরা জন্মাবধি স্বামী নামক একটি আইডিয়াকে পুতুলের মতো লালন করতে শেখে। যখন স্বামীপদপ্রাপ্ত মানুষটিকে পায় তখন সেই মানুষটিকে মানুষ ভাবতে পারে না। ভাবে সে একটি বিগ্রহ। সেই বিগ্রহটিকে অবলম্বন করে তাকে আইডিয়ার সাধনা করতে হবে। মাটির ঢেলাকেও তারা পুরুষ শ্রেষ্ঠের মতো ভালোবেসে পূজা করবে।”[৮] “ কাঞ্চন বা শেফালি তাই নিজেদের ইচ্ছেকে প্রতিষ্ঠিত করার সাহসই পায়নি। সুবর্ণলতার মুক্তকেশীরা ছোট থেকেই আমাদের মেয়েদের শিখিয়েছে, ‘বেটাছেলেদের আবার কিছুতে দোষ আছে নাকি। মেয়েমানুষকেই সবকিছু মেনেশুনে চলতে হয়।[৯]

দাম্পত্য জীবনকে মসৃণভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার যত চেষ্টাই মেয়েরা করুক না কেন, তাদের নিজেদের অবস্থান কিন্তু খুব একটা নিরাপদ নয়। তাই অনঙ্গের প্রতি ভালোবাসার কথা গোপন না করে কাঞ্চন সততার পরিচয় দিলেও পৌরুষে ঘা লাগে সুন্দরের।

সে একরোখা হয়ে উঠে স্ত্রীর মনকে নিজের বশে নিয়ে আসার জন্য। আর ঠিক তখনই প্রতিবাদ জানায় কাঞ্চন, "আপুনি মোক মাত্র সমাজরে সন্তুষ্টির কারণেহে বিবাহ করাইছিল।... আন পক্ষর মনকো তাত বিচরাটো যুক্তিযুক্ত কথা হৈছেনে?"[১০] উত্তেজিত সুন্দর সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নেয় কাঞ্চনকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার । সামন্ততান্ত্রিক মায়ের চাপে পড়ে সে যে এই বিয়ে করেছে তা কিছুতেই মেনে নিয়ে চায়নি। শেফালির অকৃত্রিম ভালোবাসাকে সে সন্দেহ করেছে,"ভাল পাও? এনেয়ে? মই মই তোর তিরোতার লুইতমান ফেনে-ফোটোকারে বোয়া আকাঙ্খার ভালকৈ সোণ-রূপ, মণি-মুকুতারে যোগান ধরিব পারিম বুলি। সেই কারণে ভাল পাও? তিরোতা-তিরোতাই ভালপোয়া দিব? স্বাৰ্থর অগ্নিত ভালপোয়া পুরি ভসম কির ছাইসোপা আনি আগত ধরি কৈছে, হোয়া এয়া ভালপোয়া ; আরু আমি পুরুষে সেই ছাইখিনিক গাত সানি সকলো পাহরি প্রণয়র ধূনি জ্বলাই তিরোতার প্রেমর বরাগী।"[১১] পৌরুষের এই অহংকারে মদমত্ত সুন্দর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কাঞ্চনকে বিয়ের বাঁধন থেকে মুক্ত করে অনঙ্গের হাতে ফিরিয়ে দেবার। কিন্তু তার জন্য যে কাঞ্চনের সম্মতিরও প্রয়োজন থাকতে পারে, একথা চিন্তা করার দরকারই মনে করেনি সে। স্ত্রীকে লুকিয়ে কাজিরাঙ্গার গভীর জঙ্গলে অনঙ্গাকে সে ডেকে পাঠায়। নিজে উপস্থিত হয় কাঞ্চনকে নিয়ে। পুরো ব্যাপারটা প্রকাশ্যে এলে ভীষণ অপমানিত বোধ করে কাঞ্চন। সমাজের দোহাই দিয়ে অনঙ্গাও রাজি হয় না কাঞ্চনকে আপন করে নিতে। ক্ষিপ্ত সুন্দর তখন রাজদন্ডাদেশ জারি করে "অনঙ্গারাম, এই মুহূর্তরেপরা তুমি মোর বন্ধু নহোয়া। মই রজা আরু তুমি মোর প্রজা। মই ন্যায়দন্ডধারী বিচারক, তুমি দোষী। মূর পাতি মোর দন্ড গ্রহণ করিবলে বাধ্য।"[১২] নারীত্বের চরম অপমান কাঞ্চনকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করে।

রাজপ্রসাদের রূপবতী পরিচারিকা শেফালির প্রতি প্রথম থেকেই দূর্বল ছিল সুন্দর। তাই বলে শেফালিকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে সে কখনোই চায়নি। বন্ধু সুদর্শনকে সে সরাসরি জানিয়েছে, "লিগিরি এজনীর ইমান স্পর্ধা! কেনেকৈ? কেনেকৈ?[১৩] পরবর্তীকালে অবশ্য এই শেফালিকে বিয়ে করার জন্যই সুন্দর উন্মাদ হয়ে উঠে। আমরা যদি ধরে নিই যে সুন্দর অনুতপ্ত, তাহলে হয়তো সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না। আসলে মায়ের আদেশের বিরোধীতা করতে গিয়েই সুন্দরের এই সিদ্ধান্ত । তা না হলে শেফালিকে তো অনেক আগেই বিয়ে করতে পারতো!

আজ একুশ শতকে বদলে গেছে অনেককিছুই। নারী আজ আর অন্তঃপুরচারিণী নয়। ঘরে বাইরে তার পরিসর বেড়েছে অনেকখানি। তবে যা বদলায়নি তা হল নারীর নিরাপত্তাহীনতা। শুধু কুরুরাজসভায় কেন সর্বসমক্ষে আজও তাকে বিবস্ত্রা করা হয়। আর ধর্ষণ কি শুধু শরীর সাপেক্ষ! এই যে 'নিমগাছ' গল্পের গৃহবধূ, শেফালি, কাঞ্চন এরা ধর্ষিতা নয়? এদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে ভালোলাগা-মন্দলাগা, এমনকি বেঁচে থাকার অধিকারটুকুকে কেড়ে

নেয়নি সমাজ! প্রশ্ন উঠতেই পারে এরা তবে বিদ্রোহ করল না কেন? আমরা ভুলে যাই, পৃথিবীতে সমস্ত কিছুরই একটা ভিত্তিভূমি চাই- বিদ্রোহেরও। যে সমাজে জন্মাবধি মেয়েরা নিজেদের যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে মেনে নিতে শিখে আসছে, সেখানে বিরুদ্ধ মানসিকতা জন্ম নেওয়াটাই তো কষ্টকর। বাড়ির আসল জিনিস তার ভিত। সেটা যদি মজবুত হয় তাহলে বাইরে ঝাঁ চকচকে রঙের প্রলেপ না দিলেও চলে। কথাটা কিন্তু আমাদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য। নারী তো শুধু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র নয়। তার যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, এই বোধটা আমাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। আর "স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রীজাতিকে।[১৪]

**তথ্যসূত্র:**


১. গরীয়সী; দশম বছর; চতুর্থ সংখ্যা; পৃ: ৮৯, জানুয়ারি ২০০৩।

২. বনফুল; বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প, আধুনিক; ১ম সংস্করণ আষাঢ় , ১৩৮৫, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১৮৭।

৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ১৮৭।

৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর; প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব; অমৃতলোক; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭, মেদিনীপুর-১, পৃ:১১৭

৫. আগরওয়ালা, জ্যোতিপ্রসাদ; কারেঙ্গার লিগিরি, অসম প্রকাশন পরিষদ; প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, গুয়াহাটি-৫, পৃ:৭২।

৬. ভট্টাচার্য, তপোধীর; প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক; প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭, মেদিনীপুর-১, পৃ:১০৬।

৭. পূর্বোক্ত, পৃ: ১০৬।

৮. রায়, অন্নদাশঙ্কর; তারুণ্য; মিত্র ও ঘোষ; প্রথম প্রকাশ ১৯৬৫, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৯২।

৯. চক্রবর্তী , রামী ; আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; প্রথম প্রকাশ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭, কলকাতা-৭৩, পৃ: ৫৭৯।

১০. আগরওয়ালা, আগরওয়ালা, জ্যোতিপ্রসাদ; কারেঙ্গার লিগিরি, অসম প্রকাশন পরিষদ; প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, গুয়াহাটি-৫, পৃ:৭৯।

১১. পূর্বোক্ত, পৃ: ৯২

১২. পূর্বোক্ত, পৃ: ৮৫

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ: ৯০

১৪. চক্রবর্তী , রামী ; আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ; প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ২০০৭, কলকাতা-৯, পৃ: ৭১,১৫।

অসমিয়া উক্তিগুলির বাংলা ভাবানুবাদ:

১.(১). এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত মহৎ খবরটির অর্থ না বুঝে পৃথিবী হাসলেও শিল্পী হিসেবে আমি অসমের সমস্ত শিল্পীর হয়ে আজ তেজপুরের সেই নমস্য মহিলাদের প্রণাম জানাই।
২.(৫). আমাদের দেশের মেয়েরা যাকে ইচ্ছে তাকেই ভালোবাসতে পারে, কিন্তু যাকে ইচ্ছে তাকেই বিয়ে করতে পারে না। ডেকচিকে জিজ্ঞেস করে রান্নার জন্য কেউ চাল বসায় না।
৩. (১০). আপনি সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্যই শুধু আমাকে বিয়ে করেছিলেন। ... অন্য পক্ষের মনকে সেখানে পাবেন, এটা ভেবে নেওয়াটা কতোটা যুক্তিযুক্ত?
৪.(১১). ভালোবাস? এমনিই? সফেন ব্রহ্মপুত্রে বয়ে যাওয়া তোমার আকাঙ্খার সোনা-রুপো, মণি-মুক্তো যোগান দিতে পারব বলেই। সেই জন্যই ভালোবাস। মেয়েরা-মেয়েরা ভালোবাসতে পারে? স্বার্থের আগুনে ভালোবাসাকে পুড়িয়ে ভস্ম করে ছাই এনে সামনে ধরে বলে, এই নাও ভালোবাসা। আর আমরা পুরুষেরা সেই ছাইভস্মকেই গায়ে মেখে সমস্ত ভুলে প্রেমের ধুনো জ্বালিয়ে মেয়েদের প্রেমে উন্মাদ হই।
৫.(১২). অনঙ্গারাম এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমার বন্ধু রইলে না। আমি রাজা, তুমি আমার প্রজা। আমি ন্যায়দন্ডধারী বিচারক, তুমি অপরাধী। মাথা পেতে আমার দেওয়া দন্ড গ্রহণ করতে তুমি বাধ্য।
৬. (১৩). পরিচারিকা একটির এতোটা স্পর্ধা! কীভাবে? কীভাবে?

লেখক : **জাহ্নবী দাশ,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লামডিং কলেজ, আসাম।

# রবীন্দ্র নাটকের গানে জনচেতনা

সায়ক মুখার্জী
দেবযানী ঘোষ

১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর কোলকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়ে সাধারণ মানুষের দ্বারা, সাধারণ মানুষের জন্য যে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল তার নাম 'নীলদর্পণ'। সেই ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে এই নাটক মঞ্চায়ন খুব যে সহজ ছিল এমনটা নয়, হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু অভিনব এই ঘটনাটি যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তা হল প্রথম সুযোগেই মানুষ বেছে নিল এমন একটি নাটক যেখানে শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সুস্পষ্ট, শুধু প্রতিবাদ নয় ছিল প্রতিরোধের এক শক্তিশালী দৃষ্টান্ত। নাটক এমন একটি শিল্প-মাধ্যম যাকে উপেক্ষা করার কোন উপায় থাকে না দর্শকদের। পরাধীন ভারতবর্ষে নাটক বারবার হয়ে উঠেছে শোষিত নিপীড়িত  মানুষের সংগ্রামী কণ্ঠস্বর। 'সতী কি কলঙ্কিনী' 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' 'গজদানন্দ' আরও কত! সেই ধারাবাহিকতার পথ ধরে স্বাধীন ভারতবর্ষেও এই শিল্পমাধ্যম বারবার সোচ্চার হয়েছে জনতার মুখরিত সাম্যের দাবিতে, অন্যায্য অন্যায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। সেইজন্যই শাসককে কখনও লাগু করতে হয় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন কখনও বা স্তব্ধ করে দিতে হয় কোন নাট্যকর্মীর কণ্ঠকে। তবে তাতে নাটকের আবেদন কমে না বরং নাটক রূপ শিল্পমাধ্যম হয়ে ওঠে আরও জনমুখী, আরও দায়বদ্ধ। নাটকের এই সমৃদ্ধ যাত্রাপথের যারা পথিকৃৎ তাদের সাধারণ দায়বদ্ধতাই হল মানবতার প্রতি। এই আলোচনার সূত্র ধরেই আমাদের সামনে যিনি অনস্বীকার্য হয়ে ওঠেন তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস নিয়ে চর্চার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাটক নিয়েও কম চর্চা হয়নি। তবে বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচনা একটু ভিন্নপথগামী। রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথ, আধ্যাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে আমরা খুঁজব এক মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথকে। উনিশ শতকের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রদোষে দাঁড়িয়ে যিনি সোচ্চার হতে পারেন শাসক আর শোষিতের সম্পর্ক নিয়ে।  শুধু ইঙ্গিত, রূপক বা সংকেতে নয় স্পষ্টভাবে সরাসরি বিদেশি শাসনের ভারে নুব্জ একটি জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেন আধুনিক রাজনীতির অবশ্য পালনীয় শর্তগুলি। যিনি সেদিনের সেই দগ্ধদেশের ধ্বংসস্তুপে সযত্নে লালন করেছেন এক আশাবাদ। রবীন্দ্রকাব্য, সংগীত ও প্রবন্ধ থেকে এ বক্তব্যের সপক্ষে অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেত কিন্তু আমরা  আমাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব রবীন্দ্র নাটকে ব্যবহৃত গানে।  বলাইবাহুল্য রবীন্দ্রনাথের নাটক ও তাতে ব্যবহৃত গানের সংখ্যা প্রচুর। আর তাতে রয়েছে বিচিত্র ভাবের প্রকাশ। এর মধ্যে আমরা অনুসন্ধান করব কেমনভাবে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত

হয়েছে সেই সমস্ত নাটকের গানগুলিতে। আমাদের নাটকের গান নির্বাচনও হবে এই প্রতিপাদ্যকে মাথায় রেখে।

বঙ্গাভঙ্গাপর্বে রবীন্দ্রনাথ আক্ষরিক অর্থেই নেমে এসেছিলেন রাস্তায়। সমকাল, স্বদেশ সর্বোপরি স্বদেশবাসীর সঙ্গে এমনভাবে সরাসরি ও রাজনৈতিক ভাবে এর আগে জড়িয়ে পড়ার তার সুযোগ হয়নি। এ সময়ের লেখালেখিতে তাই আমরা দেখি সেই রবীন্দ্রনাথকে যিনি স্বদেশ সমাজ নিয়ে মগ্ন হয়েছেন বারবার। আর সেই ভাবনাই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর রচিত স্বদেশি গানগুলিতে যেগুলি ছড়িয়ে আছে 'প্রবাসী' 'ভান্ডার' এর পাতায় পাতায়। লোকশ্রিত সুরে, সহজ ভাষায় তিনি যাদের কাছে আবেদন রেখেছেন তারা একেবারে আপামর সাধারণ মানুষ। মনে রাখতে হবে এই মানুষ নিশ্চিতভাবে শুধু শহুরে বুদ্ধিজীবী নয় বরং সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষ,যাকে বলে 'জনতা'। যে বৈশিষ্ট্য গুলি এই গানগুলির ক্ষেত্রে বিশেষ করে উল্লেখ্য তার মধ্যে একটি যেমন আশাবাদ তেমনি অপরটি সমষ্টি চেতনা। দেশের অভ্যন্তরে জনতার সম্মিলিত শক্তির যে বিপুল অপচয় ঘটছিল তিনি সর্বপ্রথম দৃষ্টি ফেরালেন সেদিকে। বিদেশি সরকারের শাসন যত তীব্রতর হচ্ছিল ততই বাড়ছিল অন্ত:সারশূন্য রাজনীতির কৃত্রিম আস্ফালন যে রাজনীতিতেও ছিল ব্যক্তি পূজারই বৈভব। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ সমাজবন্ধ মানুষের আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথা বললেন : " আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্রবৃহৎ কোন বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেইজন্য রাজ্যশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই। ... নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাস করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন - সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ বার বার একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে। এই ভারতবর্ষের উপরে আমি বিশ্বাসস্থাপন করি। এই ভারতবর্ষ এখনই এই মুহূর্তেই ধীরে ধীরে নূতন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্য একটি সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিয়াছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি- জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি। "১ এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাজ নিয়ে স্বতন্ত্র আলোচনা হতে পারে, তা হয়েওছে। তবে এই যে জনসমষ্টি বা জনসমাজকেই শক্তির মূল উৎস রূপে চিনতে পারা এ রবীন্দ্রচিন্তার এক অনন্য অবদান । তাঁর নাটকে এই চিন্তারই স্পষ্ট প্রকাশ দেখি।

রূপক সাংকেতিক কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য মিলিয়ে প্রায় অর্ধশতরও বেশি নাটক রচনা করেছেন নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ। বিচিত্র এই নাট্য প্রয়াসের মধ্যে কয়েকটি নিয়েই এ প্রবন্ধে কথা বলা সম্ভব। নাটক নয় আমরা কথা বলব নাটকে ব্যবহৃত নির্বাচিত গান প্রসঙ্গে।

বাংলা নাটকের ধারাবাহিকতা মেনেই রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংগীতের বহুল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নাটকের সারবস্তুকে সুর, কথা, ছন্দের অমোঘ মিশ্রণে সংগীতে রূপান্তরিত করে দর্শক বা শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াসেই গানের ব্যবহার। শুধু ভাষা দিয়ে মানুষের মননের কাছে পৌঁছনো সবসময় সম্ভব যে হয় না সে কথা তো রবীন্দ্রনাথই বলেছেন। 'হৃদয়ের বৃত্তি, ইংরেজিতে যাহাকে ইমোশন বলে, তাহা আমাদের হৃদয়ের আবেগ, অর্থাৎ গতি; তাহার সহিতও অন্যান্য বিশ্বকম্পনের একটা মহা ঐক্য আছে। আলোকের সহিত, বর্ণের সহিত, ধ্বনির সহিত তাহার একটা স্পন্দনের যোগ, একটা সুরের মিল আছে।

এইজন্য সংগীত এমন অব্যবহিতভাবে আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে, উভয়ের মধ্যে মিলন হইতে অধিক বিলম্ব হয় না। ঝড়ে এবং সমুদ্রে যেমন মাতামাতি হয়, গানে এবং প্রাণে তেমনি একটি নিবিড় সংঘর্ষ হইতে থাকে। কারণ, সংগীত আপনার কম্পন সঞ্চার করিয়া আমাদের সমস্ত অন্তরকে চঞ্চল করিয়া তোলে। একটা অনির্দেশ্য আবেগে আমাদের প্রাণকে পূর্ণ করিয়া দেয়। মন উদাস হইয়া যায়। অনেক কবি এই অপরূপ ভাবকে অনন্তের জন্য আকাঙ্খা বলিয়া নাম দিয়া থাকেন।'[২]

রবীন্দ্রনাথের নাটকে সংগীত তার সাংগীতিক প্রতিবেশকে ছাড়িয়ে উন্নীত হয় বৃহত্তর কোন সত্যে। যে সত্যে কেন্দ্রীভূত থাকে নাটকের মূলভাবটি। সেই সংগীতগুলিকে শুধু একটি নাটকের নয় মনে হয় সত্যের এক একটি পৃথক পৃথক অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিষয়বস্তু যে বিচিত্রগামী তা আমরা আগেই বলেছি। এই বহুমুখীনতার মধ্যে 'কান্নাহাসির দোলদোলান পৌষফাগুনের পালা' যেমন আছে তেমনি আছে শোষিত মানুষের সংঘবদ্ধ কণ্ঠস্বর।

'স্বদেশী সমাজ' সহ একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে শক্তির উদ্বোধনের কথা বলেন তা সমাজকেন্দ্রিক, আরও বিশেষ করে বললে গ্রামীণ সমাজকেন্দ্রিক। এই গ্রামীণ সভ্যতা মূলত কৃষিভিত্তিক। কৃষক আর শ্রমজীবী মানুষের নিরন্তর শ্রমের ফলেই মাঠে মাঠে জেগে ওঠে ফসল। সেই উদ্যাম অবাধ কৃষক জীবনের জয়গান দেখি 'অচলায়তন' (১৯১১) নাটকের গানে গানে । শোনপাংশুরা গেয়ে ওঠে-

" আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে ...।"৩

কর্মের এই আনন্দ কোন লাভ লোকসানের মহাজনি ব্যবসায় আবদ্ধ থাকে না কখনও। ভূমিলগ্ন মানুষ তাদের দুই হাতের শক্তিতে করেছে নতুন শস্যের সৃজন। রবীন্দ্রনাথকে বরাবরই

সৃষ্টির এই লীলা আকর্ষণ করেছে। তাই পরবর্তীকালে তিনি কাজের কেন্দ্রভূমি রূপে বেছে নেন শিলাইদহ, প্রতিসরের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রকে। ফিরে আসি 'অচলায়তনে'র কথায়। প্রাণের আনন্দে যে কাজ করে চলে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ তা বিস্ময় জাগায় ' পঞ্চক'দের,যারা কেবল তামা পিতলের কাজ করে। তারা লোহা গলাতে পারে কালেভদ্রে, ষষ্ঠীর দিন মঙ্গলবার পড়লে তবে তারা স্নান করে হাঁপর ছুঁতে পারে। কিন্তু তাই বলে লোহা পেটানো তাদের পক্ষে অসম্ভব। অপরপক্ষে শ্রমজীবী শোনপাংশুরা লোহার কাজ করে তাই লোহাও তাদের কাজ করে।

" কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে ...।" [৪]

এই যে বিপুল কর্মস্রোত আর সেই স্রোতধারায় অবিরাম অংশগ্রহণকারী শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ, তারাই ভাঙতে পারে অচলায়তন। তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত হলে বাধাবাঁধনের কৃত্রিম প্রাচীর চূর্ণ হয়। শোনপাংশুদের কণ্ঠে তাই শোনা যায়

" সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই...।"[৫]

বিশ শতকের প্রথম দশকে বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী পর্যায়ে যখন দেশের দিশাহীন রাজনীতিতে চলছে গুপ্তসংগঠনগুলির ইতস্তত বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপ আর যখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দোদুল্যমান সেই ধোঁয়াশায় এক নাট্যকার শ্রমিক কৃষকের সম্মিলিত শক্তির জয়গান গাইছেন।

রবীন্দ্রকাব্য ও সংগীতের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে আধ্যাত্মচেতনা, মিস্টিক ভাবের রসময় উপস্থিতি। কিন্তু সেই আধ্যাত্মবাদের অন্দরে যে মঙ্গলচিন্তা রয়েছে তা সর্বকালের সর্বমানবের জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে শাসক আর শোষিত মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন অনেকক্ষেত্রেই। আবার যেখানে সরাসরি লড়াইয়ের কথা নেই সেই নাটকেও রয়েছে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মঙ্গল বিধায়ক এক রাজার কল্পনা, যেমন 'রাজা' (১৯১০) নাটকটিতে। এ নাটকে রাজা নেপথ্যবাসী কিন্তু তার উপস্থিতি সর্বজনবিদিত। রাজাকে, রাজশক্তিকে অন্তরালে রেখে জনগণের শক্তিকে প্রকট করে প্রকাশ করার এক অনবদ্য প্রচেষ্টা দেখতে পাই এই নাটকে। রাজশক্তির মূল উৎস যে সমষ্টিবদ্ধ জনতার শক্তি এ কথা তো আমরা বারবার তাঁর কাছে শুনেছি। এই আধুনিকতম মতাদর্শে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বাণীরূপ 'রাজা' নাটকের সেই বহু পরিচিত বহুশ্রুত সেই গানটি।

" আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা সবাই রাজা।
আমরা যা খুশি তাই করি,
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই তাশের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে-
আমরা সবাই রাজা...।"[৬]

সাহিত্য সংগীতকে সরাসরি মানুষের জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য করার যে ধারা রবীন্দ্রনাথ একেবারেই সেই চিন্তার মানুষ নন। কিন্তু তিনি মননশীল, তিনি যুক্তিবাদী তাই সময়ের অমোঘ সত্যকে তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন অকুণ্ঠভাবে। তাঁর নাটকে আমরা তাই পাই এক ধরনের চরিত্র যারা গণনায়ক, তাদের কণ্ঠে গান, অন্তরে মানুষের প্রতি তীব্র ভালোবাসা, তারা ত্যাগী, নির্ভীক অথচ বিনয়ী। তারা কখনও বৈরাগী, কখনও দাদাঠাকুর, কখনও ঠাকুরদা। রবীন্দ্রনাথ এই গৈরিকধারী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে যে জননেতার ধারণা উপস্থিত করলেন তা ভাব, ভাষা এবং কর্মপরিকল্পনার দিক দিয়ে ব্যতিক্রমী। এই ধারারই একটি চরিত্র হল 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩৩৬) নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী। এই নাটকের প্রেক্ষাপট রাজা প্রজার বিরোধ। রাজা প্রতাপাদিত্য ভীষণ প্রকৃতির মানুষ। দু বছর ফসল হয়নি যে মাধবপুরে সেই অঞ্চলের নিরন্ন মৃতপ্রায় প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা সংগ্রহ করতে তিনি দায়িত্ব দেন পুত্র উদয়াদিত্যকে। তার দ্বারা সে কাজ সম্ভব না হলে রাজশক্তি সেনাবাহিনীর সাহায্যে সে কাজ করতে উদ্যত হয়। ফলস্বরূপ রাজা প্রজায় সংঘর্ষ আর এই সংঘর্ষের কেন্দ্রে এসে জনতার নেতৃত্ব দেন ধনঞ্জয় বৈরাগী। চরিত্রের বৈরাগী অভিধাটি বিশেষ লক্ষণীয়, যিনি সর্বত্যাগী। জনগণের সেই প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা ধনঞ্জয় , অস্ত্র যার সংগীত। রাজার মারের সামনে সে নৃত্য করে, গান ধরে-

" আরো আরো প্রভু, আরো আরো।
এমনি করে আমায় মারো।
লুকিয়ে থাকি আমি পালিয়ে বেড়াই,
ধরা পড়ে গেছি আর কি এড়াই?
যা কিছু আছে সব কাড়ো কাড়ো।
এবার যা করবার তা সারো সারো।
আমি হারি কিংবা তুমিই হার!
হাটে ঘাটে বাটে করি মেলা,

কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
কেবল হেসে খেলে গেছে বেলা,
দেখি কেমনে কাঁদতে পারো।”[৭]

শাসকের প্রতি এই যে চ্যালেঞ্জ ‘ আমি হারি কিংবা তুমি হার’ অথবা ‘দেখি কেমনে কাঁদতে পারো’ এ শুধু একটি গানের চরণ নয় বৃহত্তর রাজনৈতিক দর্শন।

বিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালির রাজনৈতিক প্রয়াস দানা বাঁধতে শুরু করে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। বাঙালির একটা অংশ লড়াই করেছেন এও সত্য। কিন্তু এই সময় পর্বে একজন বাঙালি নাট্যকার যে সমুন্নত রাজনৈতিক আদর্শের কথা এবং যে সমাজ ব্যবস্থার স্বপ্ন প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেন তা আমাদের বিস্মিত করে। ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নাটকেই এমন একটি গান শোনা যায় জননায়ক ধনঞ্জয়ের মুখে যে গান আরও একবার স্পষ্ট করে রাজ সিংহাসনে জনতার অধিকারের দাবি। ‘ সব রাজত্বটাই কি রাজার? অর্ধেক রাজত্ব প্রজার নয় তো কী? চাই দোষ নেই রে। চেয়ে দেখিস।” [৮]

“ আমরা বসব তোমার সনে।
তোমার শরিক হব রাজার রাজা,
তোমার আধেক সিংহাসনে।
তোমার দ্বারী মোদের কাছে শির নত,
তারা জানে না যে মোদের গরব কত,
তাই বাহির হতে তোমায় ডাকি
তুমি ডেকে লও গো আপন দনে।” [৯]

রাজার চোখে চোখ রেখে সরাসরি অর্ধেক সিংহাসনের প্রজাসত্বের দাবি রবীন্দ্র নাটকে শোনা যায় বারবার। ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজার ক্ষমতাকে নৃত্যের তাচ্ছিল্যে উড়িয়ে দিয়ে গান ওঠে

“ আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়
কোন খ্যাপা সে।
ওরে আকাশ জুড়ে মোহন সুরে
কী যে বাজে কোন বাতাসে ...।” [১০]

বিমূঢ় বাকরুদ্ধ প্রজাদের জাগিয়ে তুলতে ধনঞ্জয় আহ্বান জানায় “ ওরে খ্যাপার দল গান ধর রে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আনন্দ করে নে। রাজা আমাদের মাধবপুরের নৃত্যটা দেখে নিক।”

" গেল রে গেল বেলা, পাগলের কেমন খেলা-
ডেকে সে আকুল করে, দেয় না ধরা।
তারে কানন-গিরি খুঁজে ফিরি,
কেঁদে মরি কান হুতাশে।" ১১

অহংকারে মত্ত রাজশক্তির বৈশিষ্ট্যই হল প্রজাকে দাস বলে ধরে নেওয়া। সে প্রজাদের মধ্যেও যে একটা প্রাণ আছে সে প্রাণের কিছু সম্মান আছে রাজ-সংবিধানে তার কোন উল্লেখ থাকে না। মনে রাখতে হবে এ নাটক যখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তখন গোটা বিশ্ব জুড়েই পেশিশক্তির আস্ফালন। একদিকে ইংল্যান্ডের মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি শান দিচ্ছে তাদের অস্ত্রে, শক্ত করছে তাদের আসন, জোর করে আদায় করছে রাজস্ব আর অপর দিকে বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষেরা দেশে দেশে সাধ্যমত প্রতিরোধ করছেন আর ঠিক সেই মুহূর্তে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয়ের মুখে রবীন্দ্রনাথ তুলে দিচ্ছেন লড়াইয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের গীতিরূপ

" রইল বলে রাখলে কারে?
হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই,
রবার যেটা সেটাই রবে।
যা খুশি তাই করতে পারে-;
গায়ের জোরে রাখ মার;
যার গায়ে সব ব্যথা বাজে
তিনি যা সন সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকাকড়ি,
অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী-
অনেক তোমার আছে ভাবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও,
জগৎটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে
হয় না যেটাও সেটাও হবে। " ১২

কোন রাজনৈতিক শিবিরের পক্ষ থেকে নয় রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, তার দূরদৃষ্টি, ইতিহাস চেতনায় তাঁকে গণআন্দোলনের এই পথ এবং এই পরিণাম সম্পর্কে এতটা প্রত্যয়ী হতে সাহায্য করেছিল। উদ্ধত দাম্ভিক রাজশক্তির বিপরীতে জনতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধই যে

একমাত্র রাজাকে নামিয়ে আনতে পারে পথের ধূলায় সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে এই সত্য পরবর্তীকালেও রবীন্দ্রনাথ বলবেন তার আরও কয়েকটি নাটকে।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে গোটা বিশ্বের পরিস্থিতি দ্রুত বদলাতে শুরু করে। পেশিশক্তির আস্ফালনে উন্মত্ত যুদ্ধ-ব্যবসায়ীদের চক্রান্তে ঘটে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারতীয় জনগণের উপর ব্রিটিশের নির্যাতনের সাক্ষর হিসাবে অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে ১৯১৯ এর জালিয়ানওয়ালাবাগের কথাই উল্লেখ করা যথেষ্ট হবে। একদিকে যখন চলছিল এই বিপুল ধ্বংসলীলা অপরপক্ষে তখন এই দশকেরই গোটা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষকে সোনালি দিনের স্বপ্ন দেখাচ্ছিল রুশ বিপ্লব। পরিবর্তিত এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে 'মুক্তধারা' (১৯২২) নাটকে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের বিষয় হয়ে ওঠে শোষক শোষিতের সংঘাত। শাসক অধিকার করতে চায় প্রজার সবটুকু, এমন কি প্রকৃতিদত্ত ঝর্ণার জল পর্যন্ত। শিবতরাই গ্রামের অধিবাসীরা এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে তৃষ্ণার জলের অধিকারের দাবিতে সঙ্ঘবদ্ধ হয় । আর এই একতাবদ্ধ জনতার নেতা হিসাবে আবার রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে আনেন 'প্রায়শ্চিত্ত' এর ধনঞ্জয় বৈরাগীকে। 'মুক্তধারা' নাটকে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে ব্যবহৃত কয়েকটি গান যেমন "আরো , আরো , প্রভু আরো। এমন করেই মারো মারো।" এবং 'রইল বলে রাখলে কারে"? ব্যবহৃত হয়েছে।

এই গানগুলির পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি গান নাট্যকার রেখেছেন ধনঞ্জয় বৈরাগীর মুখে। তাছাড়াও অন্যান্য চরিত্রদেরমুখেও কিছু গান আছে। 'মুক্তধারা' নাটকে শাসকের রাজনৈতিক কৌশল আরও তীক্ষ্ণ, তাই প্রতিবাদও অনেক বেশি সঙ্ঘবদ্ধ। সমকালীন ভারতবর্ষে (বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক) যেমন শাসকের শাসন শৃঙ্খল আরও কঠিন হচ্ছিল একের পর এক ঘটনায় রক্তাক্ত হচ্ছিল ভারতবাসী আবার সেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বধ্যভূমিতে জন্ম হচ্ছিল মুক্তিকামী বিপ্লবী শক্তির। ১৯১৮-১৯ সাল থেকে বম্বে আমেদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে দানা বাঁধতে থাকে শ্রমিক আন্দোলন। জামালপুরে শাসকের গুলিতে মারা যান পনেরো জন শ্রমিক। এই সময়ের শিবতরাইবাসী জনগণের নেতা ধনঞ্জয় রাজার ঔদ্ধত্য আর দাম্ভিকতার হিংস্র আস্ফালনের মুখে গেয়ে ওঠে আশ্চর্য অহিংস প্রতিরোধের গান।

" আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে।
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে
ছেঁড়াপালে বুক ফুলিয়ে
তোমার এই পারেতেই যাবে তরী
ছায়াবটের ছায়ে।
পথ আমারে সেই দেখাবে

যে আমারে চায়-
আমি অভয়মনে ছাড়ব তরী এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরোলে জানি জানি
পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্ত কমল
তোমার করুণ পায়ে।" [১৩]

১৯২২ সালে বিশ্ব রাজনীতিতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে। হিটলার মুসোলিনির মত স্বৈরাচারী শাসকদের তৎপরতা তখন তুঙ্গে। আবার পুরনো মধ্যযুগীয় ব্যবস্থাকে সরিয়ে নতুন তুরস্ক গড়ছেন সেদেশের অবিসংবাদী নেতা কামাল আতাতুর। আয়ারল্যান্ডের রিপাবলিকান আর্মি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের সঙ্গে তখন মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত। আর ভারতে অসহেযাগ আন্দোলনের উপর থেকে তখন গান্ধীজী নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। এই অবস্থায় মার্চে গান্ধীজীর গ্রেপ্তারি ভারবাসীর মনে হতাশার স্লান ছায়া এঁকে দিলেও বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি ধারা তাদের মুক্তির সংগ্রাম কিন্তু বন্ধ করেননি। ব্রিটিশের কারাগার ভরে উঠেছিল হাজার হাজার ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দীতে। মুক্তধারার ধনঞ্জয়কেও বন্দী করতে চায় রাজা আর সেই রাজ-আদেশের প্রত্যুত্তরে ধনঞ্জয় বৈরাগী যে গান গায় তা তো আসলে প্রতিবাদী মানুষের কারা শৃঙ্খলকে অস্বীকার করারই ঘোষণা।

" তোর শিকল আমায় বিকল করবে না।
তোর মারে মরম মরবে না।
তাঁর আপন হাতের ছাড়-চিঠি সেই -যে।
আমার মনের ভিতর রয়েছে এই-যে
তোদের ধরা আমায় ধরবে না।
যে-পথ দিয়ে আমার চলাচল
তোর প্রহরী তার খোঁজ পাবে কী বল?
আমি তাঁর দুয়ারে পৌঁছে গেছি রে,
মোরে তোর দুয়ারে ঠেকাবে কী করে?
তোর ডরে পরাণ ডরাবে না।" [১৪]

অসীম প্রজ্ঞা, সাধারণ সমানুভূতি আর অনির্বাণ আশাবাদকে ভিত্তি করে রবীন্দ্রনাথের এই অনুভব। এর বহি:রঙ্গে শিবতরাইবাসী রাজা, ধনঞ্জয় বৈরাগী যারাই থাকুন না কেন এর অন্দরে সমকাল ও সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কী অস্বীকার করা যায়। একুশ শতকের নিবিষ্ট পাঠকরা নিশ্চয় ভাববেন রাবীন্দ্রিক দর্শনের নিবিড় পাঠ কোন ভিন্নতর

অভিমুখ দাবি করে না কি ? রবীন্দ্রনাথ বারবার তাঁর রাজনৈতিক দর্শন স্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মূল কথা আছে বিভিন্ন প্রবন্ধে আর এই নাটকের গানগুলিতে তার ঘন সন্নিবদ্ধ রূপটি আমরা দেখতে পাই। যেমন দেখতে পাই ধনঞ্জয় বৈরাগীর কণ্ঠে 'মুক্তধারা'র আরও একটি গানে।

" ভুলে যাই থেকে থেকে
তোমার আসন-প'রে বসাতে চাও
নাম আমাদের হেঁকে হেঁকে।
দ্বারী মোদের চেনে না যে,
বাধা দেয় পথের মাঝে,
বাহিরে দাঁড়িয়ে আছি,
লও ভিতরে ডেকে ডেকে।
মোদের প্রাণ দিয়েছ আপন হাতে
মান দিয়েছ তারি সাথে।
থেকেও সে মান থাকবে না যে
লোভে আর ভয়ে লাজে।
ম্লান হয় দিনে দিনে,
যায় ধূলোতে ঢেকে ঢেকে।" [১৫]

রাজসিংহাসন বা রাজত্ব যে প্রজার স্বীকৃতির উপরই নির্ভরশীল একথা তো তিনি আগেই স্পষ্ট করেছেন " ... রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চে, এ কথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন স্থির হইয়াছে ন্যাশনাল অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে।" [১৬] সব মিলিয়ে রবীন্দ্র নাটকের এই গানগুলিতে আমরা এভাবেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা ভাবনাকে ধরতে পারি। এই রাজনৈতিক চেতনার এই ধারাবাহিকতাকে লক্ষ্য করলে আমরা এও দেখি সময় যত এগিয়েছে নাট্যকার তাঁর কথা বলার ভাষা আরও পরিণত ও শানিত করেছেন তেমনি ভাবনার ক্ষেত্রেও এসছে উত্তরণ। তাই 'মুক্তধারা'র পথ বেয়েই তিনি পৌঁছে যান 'রক্তকরবী'তে (১৯২৬) যক্ষপুরীর অন্ধকার গহ্বরে শ্রমিকরা যেখানে তুলে আনে তাল তাল সোনা আর শোষিত হয় ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বহুমুখী কৌশলে। আধুনিক পৃথিবীতে যারা 'সভ্যতার পীলসুজ' সেই অসংখ্য অগণ্য শ্রমিক শ্রেণী তাদেরই প্রতিনিধি বিশু, ফাগুলালরা। 'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীতে তাদের পরিচয় শুধু সংখ্যা মাত্র। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সর্দারেরা কখনও ধর্ম কখনও মাদকতা কখনও বা আর কোন রহস্যের লৌহ জালে তিনি আবৃত। এই ঘন অন্ধকারময় পুরীতে আসে নন্দিনী। যে ভোরের আলোর মতই 'ঘুম ভাঙানিয়া' দুখ জাগানিয়া', সে রাজাকে শোনাতে চায় মাঠের বাঁশির সুরে ফসল কাটার গান, রাজাকে আহ্বান করে

মানুষের মাঝে সবুজ মাঠের আদিগন্ত বিস্তৃতিতে। এই নাটকেই রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত করেন আধুনিক কালের যুবশক্তির প্রতিনিধি রঞ্জনকে। যার কাছে আছে প্রবল ক্ষমতার সামনে নির্ভীক প্রতিস্পর্ধা। 'হুকুম মেনে কাজ করা' যার অভ্যাস নয়। মোড়ল তার সম্পর্কে বলে মানুষটার নাকি ভয়ডর কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লাগলেই হো হো করে হেসে ওঠে। সে বলে গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ। রঞ্জনের উপস্থিতিতে খোদাইকরদের উপর থেকেও চাপ নেমে যায়। তারা মেতে ওঠে খোদাই নৃত্যে। কোদালের তালে তালে সে গান ধরে, সোনার পিন্ড নিয়ে সে লোফালুফি খেলে। শাসক শৃঙ্খল দিয়ে তাঁকে বাঁধে, সে কেমন করে যেন পিছলে বেরিয়ে আসে। শাসকের ভয় হয় কিছুদিনে খোদাইকরগুলো পর্যন্ত বাঁধন মানবে না। স্পষ্ট বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের মনে পুঁজিবাদী সভ্যতার চরম শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই এর একটা প্রত্যাশা নিশ্চয় ছিল । আর সে লড়াই এর নেতৃত্ব হিসাবে রঞ্জনের মত একজন যুব নেতার চরিত্র পরিকল্পনা। এই নাটকেও দেখতে পাই রাজা তাঁর রহস্যময় অন্তরাল থেকে পথে নামতে বাধ্য হন শেষ পর্যন্ত। একটি গান এখানে বারবার ফিরে আসে ।

" পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে- আয় রে চলে,
আয় আয় আয়
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়।
......।" [১৬]

যে গানে ভাবীকালের মুক্ত মানবতার অঙ্কুর উদ্গমনের খবর শোনা যায় , মাঠে মাঠে কলে কারখানায় ধরার খুশি উথলে ওঠে মানুষের কঠোর পরিশ্রমে। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকটিকে বলেছেন 'সত্যমূলক' অর্থাৎ নিছক কল্পনা বা অন্য কোন বিশেষণে এই নাটকের বিষয়বস্তুকে ভূষিত করা যায় না। তাই রক্তকরবী হয়ে ওঠে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিষময় পরিণামের এক অসম্ভব সত্যমূলক আখ্যান।

আমাদের আলোচনায় আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি নাটকের কিছু গানের সাপেক্ষে রবীন্দ্র ভাবনার যে বৈপ্লবিক স্ফূরণ লক্ষ্য করেছি সে প্রসঙ্গে আরও কিছু নাটকের আরও কিছু গানের কথা বলা যেতেই পারত। বলা যেতে পারত 'তাসের দেশ' নাটকের 'খরবায়ু বয় বেগে..." , " আমরা নূতন যৌবনেরই দূত...", "বাঁধ ভেঙ্গে দাও.." প্রভৃতি গানের কথা। আলোচনায় আসতেই পারত 'অরূপ রতন ', 'রথের রশি', 'কালের যাত্রা' ইত্যাদি নাটক ও তার গানের কথা। কিন্তু আমরা সীমায়িত পরিসরের কারণে সে আলোচনায় বিরত থাকলাম। রবীন্দ্রনাথের নাটকে ব্যবহৃত কয়েকটি গানের প্রসঙ্গে আলোচনা করে আমরা এই সত্যকেই বুঝতে চেয়েছি কীভাবে নাটকের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে এই গানগুলি হয়ে উঠেছে প্রকৃত

অর্থেই জনতার কণ্ঠস্বর। ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পথে তাদের দুঃখ দিনের রক্তকমল।

**তথ্যসূত্র**

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আত্মশক্তি, স্বদেশী সমাজ, পৃষ্ঠা ২০-৪০।
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঞ্চভূত , গদ্য ও পদ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, পৃষ্ঠা ৯২২।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , অচলায়তন, পৃষ্ঠা ৮১৩।
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , অচলায়তন, পৃষ্ঠা ৮১৪।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , অচলায়তন, পৃষ্ঠা ৮১৫।
৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , রাজা, পৃষ্ঠা ৭৫৪।
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , প্রায়শ্চিত্ত,পৃষ্ঠা ৭০০।
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , প্রায়শ্চিত্ত,পৃষ্ঠা ৭০১।
৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , প্রায়শ্চিত্ত,পৃষ্ঠা ৭০১।
১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , প্রায়শ্চিত্ত,পৃষ্ঠা ৭১৩।
১১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , প্রায়শ্চিত্ত,পৃষ্ঠা ৭১৫।
১২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , প্রায়শ্চিত্ত,পৃষ্ঠা ৭১৪।
১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , মুক্তধারা ,পৃষ্ঠা ২৪।
১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , মুক্তধারা ,পৃষ্ঠা ৩৩।
১৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , মুক্তধারা ,পৃষ্ঠা ২৭।
১৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(১ম খন্ড) , পৃষ্ঠা ৭১৫।
১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ(২য় খন্ড) , রক্তকরবী, পৃষ্ঠা ৭০১।

লেখক ঃ **ড. সায়ক মুখার্জী,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় ও
**দেবযানী ঘোষ,** গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

# জরুরি অবস্থার (১৯৭৫-১৯৭৭) প্রেক্ষিতে রচিত বাংলা নাটক

**অমর ভাণ্ডারী**

শিল্প ও সাহিত্যকলা আমাদের আনন্দ ও সামাজিক শিক্ষা দেয় ঠিকই, সেই সঙ্গে তা ধারণ করে তার সময় ও সমাজকে। শিল্পী ও সাহিত্যিকদের এমন এক অলৌকিক ক্ষমতা থাকে যার মাধ্যমে তাঁরা ত্রিকালদর্শী হয়ে থাকেন এবং পাঠক ও দর্শকদেরও তাঁরা আপন দর্শিত জগৎ প্রত্যক্ষ করাতে পারেন। অনেকে এই বিশেষ ক্ষমতাকে কল্পনাশক্তি বলে নির্দিষ্ট করেছেন। আর এই কল্পনাশক্তি ডানার পালক হয় তাঁদের বাস্তববোধ। যে বাস্তববোধের রসদ সমকাল। সমকাল দ্বারা শিল্পী ও সাহিত্যিকরা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্ত্রন তাঁদের সৃষ্টি। ফলে তাঁদের সৃষ্টি আমাদের অনুধাবন করাতে পারে তাঁদের সমকালকে। নাটক হল শিল্প-সাহিতেরই একটি অংশ। ফলে নাটককার যখন নাটক রচনা করেন তখন সে নাটকে নাটককার নিজের কালকে ধরেন। বিভিন্ন সময়ের নাটকে সেজন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে ঘনীভূত হয় লেখকের সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন লেখক সেই দ্বন্দ্বকে বিভিন্ন দৃষ্টভঙ্গি থেকে দেখেন। এর উপর নির্ভর করে লেখকের মানসিক অবস্থান। জরুরি অবস্থা (১৯৭৫-৭৭) ঘোষণাও ঠিক সেভাবেই নিয়ন্ত্রণ করেছে তৎকালীন নাটককারদের-যার ছাপ পড়েছে তাঁদের রচনার মধ্যে। আমরা এখানে সেই নাটকগুলিরই আলোচনা করব যেগুলি সরাসরি জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে কিছু নাটক কাহিনির অন্য মোড়কে জরুরি অবস্থার বাস্তবতা তুলে ধরেছে। আবার কিছু নাটক সরাসরি জরুরি অবস্থাকেই নাটকের প্রেক্ষাপটরূপে গ্রহণ করেছে। ফলে এই নাটকগুলি সেসময়ের দলিল হয়ে উঠেছে। সেই নাটকগুলির আলোচনার দ্বারা সেই সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র তুলে ধরতে পারি।

(২)

নাটকে জরুরি অবস্থার প্রকাশ আলোচনার পূর্বে জরুরি অবস্থার সময়পর্ব সংক্ষেপে জেনে নেব। ১৯৭১ -এ ইন্দিরাগান্ধী পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিস্তার করে এবং 'গরিবী হটাও' শ্লোগান দিয়ে। এই জয় তাঁকে কংগ্রেসিদের কাছে তুলে 'দেবী দুর্গতিনাশিনী।'[১] ১৯৬৭ থেকেই ইন্দিরা গান্ধী নিজেকে সমাজতন্ত্রী নেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন- ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, রাজন্যবর্গের ভাতালোপ ইত্যাদি তার কয়েকটি নমুনা। কেবল দেশেই নয়, ১৯৭১ এর যুদ্ধে পাকিস্তানকে পরাজিত এবং

বিভক্ত করে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা তাঁকে বিশ্বনেতা হিসেবেও স্বীকৃতি দেয়। তাহলে জরুরি অবস্থা জারি করার কারণ কী?

ইন্দিরা গান্ধীর শাসনকালে বড় সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক মন্দা, খাদ্যশস্যের ঘাটতি, বেকারত্ব, দুর্নীতি। তার উপর প্রধানমন্ত্রীর কনিষ্ঠ ছেলে সঞ্জয় গান্ধী অনভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও বছরে ৫০,০০০ মারুতি গাড়ী বানানোর ছাড়পত্র পেয়ে গেল।[২] এরকম নানা কারণে অসন্তোষ বাড়তে থাকে দেশজুড়ে। ফলে দেখা দিতে থাকে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, ঘেরাও, আন্দোলন। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা তো অনেক আগে থেকেই অগ্নিগর্ভ ছিল; ১৯৭৪-এ এই দুর্নীতি ও খাদ্যদ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে প্রথমে গুজরাটে ও পরে বিহারে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়।[৩] যা ইন্দিরা-সরকারের ভীত নাড়িয়ে দেয়। ফলে তা দমন করতে সরকার হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করতেও পিছপা হয় না। এই দুটি আন্দোলন সারা দেশের জনরোষ একত্রিত করে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রেক্ষিত রচনা করে। এরকম পরিস্থিতিতে ১২ জুন ১৯৭৫ এলাহাবাদ হাইকোর্ট ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন খারিজ করে দেয়। ১৯৭১ -এর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী দুনীতির আশ্রয় নিয়েছিল- এরকম একটি মামলা রাজনারায়ণ করেছিল। যে মামলা কোর্টের এই রায়ের পিছনে কাজ করেছিল।[৪] ফলে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ২৫ জুন বিরোধীরা একজোট হন এবং ঘোষণা করেন এই সরকার অ-সাংবিধানিক। যদি ক্ষমতা না ছাড়ে তাহলে ২৯ জুন থেকে এই সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে আইন-অমান্য আন্দোলন করা হবে। রাজনীতির এই চক্রব্যূহ থেকে নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে হঠাৎ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি দ্বারা ২৬ জুন থেকে দেশে 'অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা' জারি করা হয়।[৫] রাষ্ট্রপতি এই মর্মে হস্তাক্ষর দিয়েছিলেন যে-

"In exercise of the power conferred by clause 1of article 352 of the constitution, I, Fakhruddin Ali Ahmed, President of India, by this proclamation declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances."[৬]

এই জরুরি অবস্থা বহাল থাকে ২১ মার্চ ১৯৭৭ পর্যন্ত।[৭] দীর্ঘ এই ২১ মাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনা করে নেব।

জরুরি অবস্থা ঘোষণার পর থেকেই চলে ইন্দিরা বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার 'MISA' ও 'DIR' আইনদ্বারা। ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তার হন দেশের শীর্ষ নেতারা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজি দেশাই, রাজনারায়ণ, সমর গুহ, মধু লিমায়ে, জ্ঞানেশ্বর মিশ্র, জ্যোতির্ময় বসু, অটল বিহারী বাজপেয়ী, লালকৃষ্ণ আডবাণী, চরণ সিং, অশোক মেটা প্রমুখ এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৬ জুন ৫০ জন সি পি আই (এম) ও ৩০০ জন নকশাল কর্মী গ্রেপ্তার হয়।[৮] শুধু নেতাদের গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত থাকেনি, যে সমস্ত সাংবাদিকরা

বিপাকে ফেলতে পারেন বলে মনে করেছে সরকার বা যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে কলম ধরতে পারেন তাঁদেরও গ্রেপ্তার করেছিলেন। যেমন গৌরকিশোর ঘোষ, বরুণ সেনগুপ্ত, কুলদীপ নায়ার প্রমুখ। বিপান চন্দ্র জানাচ্ছেন প্রায় ১১০,০০ জন গ্রেপ্তার হয়েছে দীর্ঘ ২১ মাসে।[৯]

এই সময় কিছু অতি বাম-পন্থী সংগঠন কিছু দলীয় সংগঠনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। যেমন আর.এস.এস, জামাত-ই-ইসলাম, আনন্দমার্গ।[১০]

জরুরি অবস্থায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমের উপর চেপে বসে সেনসরশিপ। কোনও খবর সেনসর না করিয়ে বাইরে যাবে না এরকম আদেশ দেওয়া হয়েছিল। ফলে দেশে কী চলছে তা সাধারণ মানুষ কিছু জানতেই পারে না।[১১] বেশ কিছু পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যেমন, জনসংঘের 'মাদারল্যান্ড,' 'অর্গানাইজার', জয়প্রকাশ নারায়ণের 'এভরিম্যান', 'লোকনীতি', জর্জ ফার্ণান্ডেজের 'প্রতিপক্ষ', সিউড়ির 'ময়ূরাক্ষী' ইত্যাদি।[১২]

জরুরি অবস্থার সময় পরিবার পরিকল্পনার নামে চলে গণহারে নাসবন্দি- যার জন্য মারা যায় বহু নাগরিক এবং শহরকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য বুলডজার দিয়ে বহু বাড়ি ও বসতি ভেঙে দেওয়া হয়।[১৩]

শিল্প-সংস্কৃতিতেও জরুরি অবস্থার কোপ পড়ে প্রবলভাবে। রবীন্দ্রনাথের গানে হয় নিষেধাজ্ঞা। ব্রিটিশের তৈরি কুখ্যাত 'ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট' পুনরায় চালু করা হয়। নাটককার অমল রায়ের উপর আক্রমণ হয়। ব্যারাকপুরের নটতীর্থ নাট্যগোষ্ঠী 'নিজবাসভূমে', 'গ্যাব্রিয়েল পেরী' মঞ্চস্থ করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে। নৈহাটির মুকুন্দদাস যাত্রাসমাজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ', গল্পের পালারূপ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল। 'লাশবিপণি', 'দিন আসবেই', 'রক্তের জোয়ারে শুনি' নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে গিয়ে নাট্যদলগুলি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল।[১৪] এমনকি ইন্দিরা গান্ধী স্বয়ং মার্চ ১৯৭৬-এ কলকাতায় এসে কবি,সাহিত্যিক, নাটককার, চিত্র পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সেখানে উপস্থিত ছিএলন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শোভাসেন,শম্ভু মিত্র প্রমুখ।[১৫] এই আলোচনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল নিয়ন্ত্রণ।

## (৩)

বাংলা পলিটিক্যাল থিয়েটারের অন্যতম ব্যক্তি উৎপল দত্ত ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সালে শেক্স পিয়ারের 'ম্যাকবেথ' মঞ্চস্থ করেন।[১৬] এর সম্পর্কে ১৯৮৯ সালে শমীক বন্দ্যোপাধ্যাযকে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন-

'শেক্স পিয়ারের ম্যাকবেথ যখন আমরা করলাম, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে,

শেক্সপিয়ারের ম্যাকবেথ-এর চেয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে better play হতে পারে না। এমারজেন্সি-র বিরুদ্ধে এত ভালো নাটক আর নেই। এখনও পর্যন্ত লেখা হয়নি। কিন্তু আমরা জানতাম যে, এটা শ্রীমতি গান্ধীর এমারজেন্সির বিরুদ্ধে নাটক, সেটা ধরার মত বুদ্ধি কংগ্রেসিদের নেই। '[১৭]

জরুরি অবস্থায় ফ্যাসীবাদের উত্থানকে মাথায় রেখে তিনি রচনা করলেন 'এবার রাজার পালা (১৯৭৭) । এখানে তিনি শাসকের ক্ষমতার আস্ফালন যেমন দেখিয়েছেন তেমন প্রতিবাদও করেছেন। নাটককে হাতিয়ার করে জরুরি অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটন করে গণতন্ত্র বিনষ্টকারী শাসকের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। নাটকটি সম্পর্কে সৌমেন চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-

' হিটলারের অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে ব্রেখট্ লিখেছিলেন Der Aufhaltsame Aufstig des Arturo Ui'... ইন্দিরা গান্ধীর সমুত্থান রূপ বিধৃত হল ' এবার রাজার পালা' নাটকে। ফলে ১৯৭৭ -এর ভারতবর্ষ হয়ে উঠল ১৯৪৬ -এর ডিসেম্বর মাসে উত্তর বাংলার মেচগীর রাজ্যের পীঠস্থান গ্রাম।' [১৮]

নাটকটির কাহিনি ও চরিত্রের পরতে পরতে রয়েছে জরুরি অবস্থার ছাপ। কিন্তু লেখার স্থান অল্প থাকাই সম্পূর্ণ কাহিনি আলোচনা করা সম্ভব নয়। জরুরি অবস্থা কীভাবে এসেছে সেটুকুই এখানে আলোচ্য। উত্তরবঙ্গের মেচগীর স্টেটে কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহের আমন্ত্রণে ননী অধিকারীর দল 'কংসবধ' পালা অভিনয় করতে গেছে। সে দলের মুখ্য অভিনেতা বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কু সমস্ত পালায় রাজা চরিত্রে অভিনয় করে। এই অভিনয় করতে করতে তার কাছে নিজের আসল পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে। সে নিজেকে রাজাই ভাবে। তার চালচলনে বা সংলাপে তাই কখনও সিরাজদ্দৌলা কখনও কংস ইত্যাদি ধরা পড়ে। এমনকি সে এটাও বিশ্বাস করে যে তার শরীরে রাজরক্ত আছে। কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যাবে সত্যিই সে রাজা টিকেন্দ্রজিৎ -এর জারজ সন্তান। ফলে টিকেন্দ্রজিৎ মারা গেলে দেওয়ান হরকিশোর , মন্ত্রী দোলগোবিন্দ, ব্রিগেডিয়ার বর্মণ বঙ্কুকে রাজা নিযুক্ত করে। তারা ভেবেছিল রাজপাঠ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এই বঙ্কুকে তারা নিজের মতো চালাতে পারবে- যেমন লালবাহাদুর শাস্ত্রী মারা যাওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করে কে, কামরাজ প্রমুখরা ভেবেছিলেন। কিন্তু রাজা নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই বঙ্কু যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয় তা ইন্দিরা গান্ধীর কথা মনে করায়।

নাটকটির শুরুতেই 'কংসবধ' নাটকের মহড়া চলাকালীন কংস চরিত্রে বন্ধু যে কথা উচ্চারণ করে তা ফ্যাসিবাদী শাসকের চরিত্র -

'... চাহিনা শুনিতে প্রতিবাদ মতামত। আমার রাজ্যে আজি হতে ক্ষীণতম স্বরে কেহ যদি করে মোর শাসনের নিন্দাবাদ, অন্ধকূপ কারাগারে নিক্ষেপিয়া তারে রাখিও শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি।' [১৯]

সিংহাসনে বসেই সে নিজের পছন্দের লোকেদের বিভিন্ন পদে বসায় এবং পুরনো রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা খর্ব করে। কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহকে গ্রেপ্তার করায়। নির্বাচিত প্রজা পরিষদকে অকেজো করে। মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বললেও কিশোরীলাল চামারিয়ার মতো পুঁজিপতিদের হাতে রাজ্যের সম্পত্তি তুলে দেয়। আর যে ৭২ দফা কর্মসূচীর কথা বলে তা ইন্দিরা গান্ধীর ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই ২০ দফা কর্মসূচীর [২০] ঢক্কানিনাদকেই ইঙ্গিত করে। বিশেষ উল্লেখ্য সঞ্জয় গান্ধীর ‘পরিবার পরিকল্পনা’-র নামে যে গণনির্বির্যকরণ কর্মসূচী চলেছিল তার উল্লেখও আছে সেই ৭২ দফা নীতিতে। প্রজা পরিষদের ১০৩ জন বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করে। সংবাদপত্রের উপর সেনসার চাপায়, রাজ্যের সংবিধানও পরিবর্তন করে দেয়। বিশেষ করে নাগরিকদের অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপ করে। অবশেষে রাজ্যে সংকট অবস্থা জারি করে।

এই সমস্ত কাজে বঙ্কুর সহায় হয় ব্রিগেডিয়ার বর্মণ ও গুন্ডা ট্যাংরা। এই সময় যেমন সরকারের পুলিশ ও পোষা গুন্ডা কাজ করেছিল ঠিক তেমনি ভুমিকা নিয়েছে নাটকে এই দুটি চরিত্র। জরুরি অবস্থার যে নগ্নরূপ তা নাটকের ‘পাঁচ’ অংশে বঙ্কুর ভাষণে ধরা পড়ে—

> ‘বন্ধুগণ, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে গোপিকাপুর সেন্ট্রাল জেলের উদ্বোধন করলাম। এই নতুন কারাগারে ১৮,০০০ বন্দী সুখে বাস করতে পারবে। এ জেল মেচগীর বিস্ময়কর অগ্রগতির সাম্প-সাম্প-সাম্প্রতিকতম নিদর্শন। এ দেশের প্রতীক হওয়া উচিত জেল। জেল হচ্ছে সেই মন্দির যেখানে এ-দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বাস্তব রূপ পেয়েছে। আমরা জরুরি অবস্থা জারি করে বলেছিলাম, পুরো রাজ্যকে শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। জেল হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে শৃঙ্খলা সুচারুরূপে পালিত হয়। সহস্র সহস্র সুখী সমৃদ্ধ কয়েদি এক সঙ্গে স্নান করে, এক সঙ্গে খায় তারপর এক সঙ্গে হাসিমুখে উদয়াস্ত খাটে, বোনাস চায় না, মাইনেই চায় না তায় বোনাস এবং প্রহরীর লাঠিকে শ্রদ্ধাসহ অবনতমস্তকে মেনে নেয়। উপরন্তু কয়েদিদের যৌনজীবন নেই, সুতরাং তারা সন্তানের জন্ম দিতে পারে না, সুতরাং পরিবার পরিকল্পনা একমাত্র জেলখানাতেই সম্পূর্ণভাবে সফল ও সার্থক। বন্ধুগণ, কয়েদিরা আদর্শ নাগরিক, ওদের কাছে নিয়মানুবর্তিতা শিখুন, ওদের মতন হয়ে উঠুন। কয়েদিরা কখনো স্ট্রাইক করে না। এ পুরো রাজ্যটাকে জেলখানার অনুকরণে ঢেলে সাজান। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন,সবই যেন একদিন জেলে আসতে পারেন। তাহলে আমরা একদিন গর্ব করে বলতে পারব, পুরো দেশটা একটা জেলখানার মতন সুশৃঙ্খল, কর্মঠ ও প্রতিবাদহীন। আমি ভেবে দেখছি যে সমাজতন্ত্র আমি চাই তা শুধু জেলখানাতেই সম্ভব। আসুন এ দেশটাকে কারাগার বানাবার সাধনায় ব্রতী হই। ’[২১]

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘উত্তর মেলে না’ নাটকটি জরুরি অবস্থায় মধ্যবিত্ত জীবনে যেসব সংকট প্রবল আকার ধারণ করেছিল সেগুলি অবলম্বন করেই রচিত। নাটকটিতে বাড়ির কর্তা একটি প্রাইভেট ফার্মের কর্মচারি, ছেলে খোকা গ্র্যাজুয়েট ও বেকার, বাড়ির মেয়ে খুকু পড়াশুনা করছে এবং তার বিয়ের জন্য দেখাশুনা চলছে কিন্তু বারবার পাত্রপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান হতে হচ্ছে।

নাটকের কাহিনি অংশে দেখা যায়, খুকুকে দেখতে ৩৩ নং ছেলেপক্ষর লোক আসবে সেজন্য চলছে ব্যবস্থাপনার তোরজোড় এবং দেশে চলছে জরুরি অবস্থা। এই নিয়ে মায়ের সঙ্গে খোকার চলছে তরজা। তরজার সংলাপে উঠে আসে সেই সময়ের পরিস্থিতি। যেমন বর্তমান পরিস্থিতিতে সমাজে রয়েছে চাকরির হাহাকার। সেজন্য খোকার ও তার বন্ধুদের বিয়ে করার বয়স ও ইচ্ছা থাকা সত্বেও তা করতে পারছে না। যারা সি.পি.আই(এম) পার্টি করে তাদের বিরুদ্ধে চলছে পুলিশি অভিযান- হয় তারা গ্রেপ্তার হচ্ছে নয় পুলিশের গুলিতে মারা যাচ্ছে। কিন্তু বাড়ির লোক খোকাকে নিয়ে নিশ্চিন্ত, কারণ খোকা কোনও রাজনৈতিক সংগঠনে যুক্ত নয়। কাহিনির অগ্রগতিতে দেখা যায় ছেলেপক্ষ থেকে আসা অতিথিদের আতিথেয়তা করার জন্য খোকাকে কিছু মিষ্টি-খাবার আনতে পাঠানো হয়। তার আসতে অতিরিক্ত দেরি হলে বাড়িতে উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়। অবশেষে জানা যায় ভুল সন্দেহে পুলিশ খোকাকে গুলি করে মেরেছে। নাটককার এখানে দেখিয়েছেন মানুষ রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও রাজনৈতিক হিংসা থেকে দুরে থাকতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতার আস্ফালন বাহু অরাজনৈতিক প্রাণও নিয়ে নিতে পারে। সুতরাং স্বৈরাচারী শাসকের থেকে দূরে নয় তাদের প্রতিবাদ করার দিকেই সাধারণ মানুষকে ইঙ্গিত দেন নাটককার। এই কথাই বলেন নাটকের অন্যতম রাজনৈতিক চরিত্র রজত যখন খোকার বাবা বলেন রাজনীতি না করেও কেন খোকাকে মরতে হল।-

> ‘..এ প্রশ্নের উত্তর চান আপনাদের মুক্তি সূর্যের কাছে। জিজ্ঞাসা করুন- কেন কোন রাজনীতি না করেও আপনার ছেলেকে পুলিশের গুলিতে মরতে হল? কেন শুধু নাটক ভালবাসার অপরাধে প্রবীর দত্তকে পুলিশের লাঠি খেয়ে মরতে হল? কেন শুধু জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের পরিচিত বলেই জেলের অন্ধকার ঘরে তিল তিল করে অভিনেত্রী স্নেহলতাকে মরতে হল বিনা চিকিৎসায়? ’[২২]

অমল রায় জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে রচনা করেন ‘নিজবাসভূমে’ নাটকটি। তবে এই নাটকটিতে জরুরি অবস্থার থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে জরুরি অবস্থার পূর্বের ঘটনা। যখন নক্‌শাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চলছিল রাজ্যজুড়ে পুলিশি তান্ডব। সেই সময় কমিউনিস্ট পার্টির চুপ করে থাকার সমালোচনা করেছেন নাটককার। নকশাল যুবনেতা বিল্টুকে খুন করেছিল প্রশান্ত, রফিক, সমীরণ, বিদ্যুৎ, সুগতরা একসঙ্গে। কারণ সি.পি.আই.(এম)-এর কার্যক্রমকে সে সমালোচনা করত বলে। আর জরুরি অবস্থায় যখন

তাদেরও অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় তখন পূর্ব কৃত ভুলের জন্য তাদের আত্মদহন হয়। তারা এখন প্রত্যেকেই ঘরছাড়া। এলাকায় প্রবেশ করলেই হয় গ্রেপ্তার নয় মৃত্যু তাদের জন্য অপেক্ষারত। সেজন্যই তারা এখন গা-ঢাকা দিয়েছে একটি গীর্জায়। পার্টির শীর্ষ নেতাদের কাজে তারা বীতশ্রদ্ধ। সেজন্যই সমীরণ বলে-

> '... আমি জানতে চাই বুঝতে চাই জরুরি অবস্থার জগদ্দল পাথর বুকের ওপর চেপে ব'সে রয়েছে - এখনই তো সময় প্রতিরোধ-সংগ্রাম গ'ড়ে তোলার। অথচ নেতারা হাত পা গুটিয়ে ব'সে রয়েছে, নির্বাচনী খোয়াব দেখছে, কেন-কেন এটা হবে? ঐ জয়প্রকাশনারায়ণ, মোরারজী দেশাইদেরও যতটুকু সাহস আছে রুখে দাঁড়াবার -এদের তাও নেই কেন?'[২৩]

জরুরি অবস্থার জন্য অনেকাংশ দায়ী সি.পি.আই(এম) -এর নেতাগণ। কারণ হিসেবে নাটককার কান্তির মুখে বসিয়েছেন এরকম সংলাপ-

'...তোমাদের নেতারাই তো ইন্দিরাগান্ধীর স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। ভি.ভি . গিরির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় তোমরা ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করোনি? কংগ্রেস যখন ভাগ হল, তখন মোরারজীর চেয়ে ইন্দিরা বেশি প্রগতিশীল বলোনি?'[২৪] ইত্যাদি।

'ফ্যাসীবাদ কাওকে ছাড়ে না, সে আগে মারে কমিউনিস্টদের - তারপর অন্য সবাইকে'- এই চরম সত্য নাটকে ধরা পড়েছে, সেজন্যই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দিকে ইশারা করেছেন নাটককার। কিন্তু অহিংস পন্থায় তা সম্ভব না। অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই হবে একমাত্র অস্ত্র দিয়েই। অবশ্য নাটককার এই অন্ধকার সময় একদিন কেটে যাবে তার আশাও করেন। সেজন্যই নাটকের শেষ সংলাপ 'লেট দেয়ার বি লাইট, মাই বয়, লেট দেয়ার বি লাইট।'[২৫] বাইবেলের এই বিখ্যাত উক্তি দিয়ে।

জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে আরও বেশ কিছু নাটক পাওয়া যায়, যেমন - উৎপল দত্তের 'সাদা পোশাক', মনোজ মিত্রের 'নরক গুলজার', দিব্যেশ লাহিড়ীর 'নানা হে', অমল রায়ের 'ঝড় উঠুক', অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'দেশটা যখন কারাগার', অসীম মৈত্রর 'ঢাকের বাদ্যি', দেবাশিষ মজুমদারের 'অমিতাক্ষর' ইত্যাদি।

(৪)

শিল্পী সাহিত্যিকদের সৃষ্টি জনমানসকে উন্নত চিন্তা দিয়ে বাস্তব সমাজকে অনুধাবন করতে সহায়তা করে থাকে। সমাজে যা কিছু অশুভ সে সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সচেতন করে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলাও তাঁদের কর্তব্য। নাটক হচ্ছে এমন একটি শিল্প -মাধ্যম যা সরাসরি জনগণের সঙ্গো সম্পর্কিত হয়ে তাদের প্রভাবিত করতে পারে। ফলে রাজনীতি সচেতনতা প্রচার নাটকের অন্যতম দায়িত্ব। রাষ্ট্র যখন সমাজকে অন্ধকারে আবদ্ধ করতে চায় তখন তার বিরুদ্ধে নাটক হয় অস্ত্র। সেজন্যই রাষ্ট্র বার বার শিল্পী-সাহিত্যিকদের পায়ে

শৃঙ্খল পরাতে উদ্যোগ নিয়েছে।

জরুরি অবস্থার সময়েও নাটক হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের হাতিয়ার। আমরা দেখেছি সেই প্রতিবাদ করতে গিয়ে বার বার আক্রান্ত হতে হয়েছে বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীকে। তবে নাটক যেহেতু শিল্প-সাহিত্যের অংশ, সেহেতু নাটক রাজনীতির সঙ্গে যতই জড়িত হোক না কেন তাকে নাটক হয়ে উঠতে হবে। যার বিচার করবে একমাত্র সময়। তার মধ্যে থাকবে কালোত্তীর্ণ হওয়ার শক্তি। জরুরি অবস্থাকে কেন্দ্র করে রচিত সমস্ত নাটকগুলি যে সেই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছে তা বলা যাবে না। তবে 'এবার রাজার পালা', 'নরক গুলজার'-এর মতো নাটকও সেই সময়কে ধরে রচিত হয়েছে। যা আজও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হিসেবে অভিনয় করা যেতে পারে। আবার এই সময় 'দেশটা যখন কারাগার', 'ঝড় উঠুক' ইত্যাদির মতো কেবল প্রপাগান্ডা মূলক নাটকও রচিত হয়েছে। এগুলিতে রাজনীতিই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। শিল্পমূল্য নেই বললেই হয়। কিন্তু জরুরি অবস্থায় বসে, পুলিশের খবরদারিতে ও পোষা গুন্ডাদের চোখ রাঙানিতে যে তাঁরা এরকম নাটক লিখেছিলেন সেটা

**তথ্যসূত্র :**


১. বরুণ সেনগুপ্ত, ইন্দিরা একাদশী, রচনা সংগ্রহ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২, কলকাতা, পৃ- ৫৩৯

২. Bipan Chandra , In the name of Democracy, Penguin Books, 2003, India, P-23

৩. বিপন চন্দ্র প্রমুখ, ভারতবর্ষ: স্বাধীনতার পরে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৭, কলকাতা, পৃ-২৯৫

৪. Coomi Kapoor, The Emergency: A personal History, Penguin Books, 2015, India, P-xxi

৫. বিপন চন্দ্র প্রমুখ, ভারতবর্ষ: স্বাধীনতার পরে, প্রাগুপ্ত, পৃ-২৯৬-২৯৭

৬. Coomi Kapoor, The Emergency: A personal History,প্রাগক্ত, P-23

৭. Ibid-xxvi

৮. সজল বসু, জরুরি অবস্থা : আন্দোলন ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি, বুকপোস্ট পাবলিকেশন, ২০২২, কলকাতা, পৃ-১২২

৯. Bipan Chandra , In the name of Democracy,প্রাগুক্ত, P-157

১০. Ibid-157

১১. রামকৃষ্ণ দাশগুপ্ত, কয়েকটি তথ্য, কলকাতা পত্রিকা, বর্ষা ১৯৭৫ এবং বসন্ত ১৯৭৭, সম্পাদনা- জ্যোতির্ময় দত্ত (পুনর্মুদ্রিত), ২০০৪, প্রতিভাষ, কলকাতা, পৃ- ১০-১১

১২. তদেব- ১২-১৩

১৩. সজল বসু, জরুরি অবস্থা : আন্দোলন ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি, প্রাগুক্ত,পৃ- ৮০-৮১

১৪. সন্দীপ দত্ত, ভারতীয়সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃ-৩৫

১৫. পুলক চন্দ, এমারজেন্সীর অমাবস্যা ও আমাদের বুদ্ধিজীবীকুল, প্রবন্ধসংগ্রহ: সাহিত্য

সময় সমাজ, দে'জ, ২০১৮, কলকাতা, পৃ-২৭৬
১৬. উৎপল দত্ত, ম্যাকবেথ (ভাবানুবাদ), মুখবন্ধ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, থীমা, ২০১৮, কলকাতা, পৃ-এক
১৭. তদেব-এক
১৮. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র-৬, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪২৩ সন, কলকাতা, পৃ-৬৫৬
১৯. তদেব-২৩০
২০. বরুণ সেনগুপ্ত, ইন্দিরা একাদশী, রচনা সমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৭৩
২১. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র-৬, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৭
২২. বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর মেলে না, সত্তর দশকের একাংক, বোম্মানা বিশ্বনাথম্(সম্পাদনা), নির্মল বুক এজেন্সী, ১৯৭৯, কলকাতা, পৃ-৫৭
২৩. অমল রায়, নিজবাসভূমি, বজ্র নির্ঘোষের নাটক, উবুদশ, ১৩৩৬ সন, কলকাতা, পৃ-১২২
২৪. তদেব-১৩৪
২৫. তদেব-১৪৬

---

লেখক ঃ **অমর ভান্ডারী,** গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

# আলকাপের সেকাল-একাল

**অহীনা দে**

**ভূমিকা ঃ** বাংলা গ্রামীণ সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা লোককাহিনি। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে এই কাহিনিগুলি চলে আসছে যুগযুগ ধরে। লোককাহিনি চর্চার ইতিহাস হয়তো হাজার বছরের পুরণো। লোকবিশ্বাসের অনুবর্তী মানুষ লোকজীবন থেকে আহূত নানা কাহিনি সংগ্রহ করে। তারপর সেগুলিকে লোকায়ত শিল্পধারায় নাচ, গান, অভিনয় ও বাজনা যোগে নাট্যরূপ দেয়। গ্রামীণ ভাবনাযুক্ত সেই বিশেষ রীতির নাটককেই বলা হয় লোকনাট্য বা লোকনাটক (Folk Drama) বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ পশ্চিমবাংলার অন্যতম সমৃদ্ধ, শক্তিশালী জনপ্রিয় একটি লোকনাটক হল 'আলকাপ'। আলকাপের উৎস কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া সমাজের প্রান্তিক মানুষের লৌকিক জনজীবন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে লড়তে যাঁদের প্রাণের শিখা প্রায় নিস্তেজ হয়ে এসেছে। আলকাপ যেন তাঁদের মনের আগুনকে উস্‌কে দেয়। আলকাপ তাই নিছক লোকসঙ্গীত বা লোকনাটক নয়, ধুঁকতে থাকা কৃষক-মজুরের মৃতসঞ্জীবনী সুধা, তাঁদের স্বপ্নের আসর। আলকাপ গ্রাম্য সাধারণ মানুষকে একাধারে যেমন আনন্দদান করে, অন্যদিকে লোকশিক্ষা, নীতিশিক্ষায় উদ্দীপিত করে। সেইসঙ্গে থাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝাঁঝ, তীর্যক কটাক্ষ, সমাজ-সালোচনা ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চিত্র।

**আলকাপের উৎস ও উদ্ভবের ইতিহাস ঃ** আলকাপ গানের উৎপত্তি বা উৎস বিষয়ে একাধিক মত প্রচলিত আছে। আলকাপ জগতের শিল্পী সমাজ ও খলিফাদের বিশ্বাস, আকবর বাদশাহের রাজত্বকালের একটি বিশেষ ঘটনা আলকাপ গান প্রবর্তনের পিছনে কাজ করেছিল। একদিন বাদশা আকবর তানসেন বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত হয়ে তাঁর অন্যতম প্রিয় সভারত্ন, সংগীত শিল্পী তানসেনকে সভায় দীপক রাগের গান পরিবেশন করতে নির্দেশ দেন। তানসেন বুঝতে পেরেছিলেন এ তাঁর বিরোধীদের ষড়যন্ত্র। তাই তিনি দীপক রাগ গাইতে রাজী হননি। দীপক রাগের পরিপূরক মেঘমল্লার রাগের গায়ক সভায় নেই, একথা জানিয়ে তিনি দীপক রাগ পরিবেশন করতে সম্মত হননি। তিনি জানতেন মেঘমল্লার গায়কহীন সভায় দীপক রাগ পরিবেশন করার অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। তাই তানসেন আপত্তি জানান। কিন্তু বিরোধীদের ষড়যন্ত্রে বিভ্রান্ত আকবর তানসেনের জীবনের পরিণতির কথা না ভেবে তাঁকে দীপক রাগ গাইতে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। নিরুপায় তানসেন বাদশার নির্দেশকে মান্যতা দিতে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দীপক রাগের গান পরিবেশন করতে আরম্ভ করলে দীপক রাগের উদ্দীপক তানে তাঁর দেহে অগ্নিতেজের প্রজ্জ্বলন সৃষ্টি হয়। সে অগ্নিতেজের অন্তর্দাহে তানসেনের মৃত্যু ঘটে। নিজের ভুলে চোখের সামনে প্রিয় সভারত্ন তানসেনের মৃত্যু ঘটতে দেখে আকবর মনে ভীষণ আঘাত পান। এ ঘটনার পর মর্মাহত অনুতপ্ত আকবর তাঁর রাজত্বে

সংগীত অনুশীলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আকবর বাদশার শাসনাধীন হওয়ার কারণে বঙ্গাভূমিতেও সে আদেশ কার্যকর হয়। গানের চর্চা বন্ধ হয়।

বাংলার মানুষ গান ছাড়া বাঁচতে পারে না। কোন শাসনেই বাংলার মানুষের কণ্ঠ থেকে সংগীতের সুর মুছে দেওয়া যায়নি। দেশের চাষাভুষা, শ্রমজীবী মানুষ শাসকের রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে মাঠে ঘাটে, চাষের জমিতে, নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে, পথ চলতি পথিক আপন মনে কণ্ঠে সুর তুলে মনের সাধ মিটাতে লাগলো। পল্লীর মানুষ আলপথে চলতে চলতে নির্মল হাস্যরসের, ব্যঙ্গাত্মক, তীর্যক গান গাইত। আলপথে যাওয়া আসার সময় গাওয়া হয় বলে এ গানের পরিচয় হল আলকাপ গান রূপে। তাদের মতে আলকাপ শব্দের আল এসেছে আলপথ থেকে আর কাপ এসেছে ব্যঙ্গাত্মক কাচ বা কাপট্য শব্দ থেকে। দু'শব্দের যোগে তৈরী হয়েছে আলকাপ গানের নাম।

আর একদল মানুষের ধারণা আলকাপ গানের উদ্ভব হয়েছে মালদহের গম্ভীরা গান থেকে। গম্ভীরা সংগীত আসরের যে অংশ 'বোলবাই' নামে পরিচিত তা থেকে আলকাপ গানের উদ্ভব হয়েছে। সাধারণ গম্ভীরার বোলবাই আসরে গান পরিবেশনে ধর্মের বাঁধা থাকে না। যে কোনো ধর্মের, যে কোনো সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবুও যেহেতু গম্ভীরা মণ্ডপে শিবমূর্তি পূজিত হয় এবং কিছু ধর্মীয় আচারব্রত পালণ করা হয় তাই এক শ্রেণীর বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ, সেখানে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করে। ইসলামীয় ধর্মীয় অনুশাসন অংশগ্রহণে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই গম্ভীরার ধর্মীয় বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে এক শ্রেণীর উদার হৃদয় মানুষ বোলবাই এর অনুকরণে আলকাপ আসরের প্রচলন ঘটায়। সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ গানের আসরের সূত্রপাত হয়। বনমালী প্রামাণিক (বোনাকানা) এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালণ করেছিলেন। বোলবাই আসর থেকে উদ্ভূত বলে আলকাপ গানের পরিবেশন বোলবাই এর সাদৃশ্য ও প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।

আলকাপ গনের উদ্ভবের তৃতীয় মতটি হল, হঠাৎ করে বা পূর্ব পরিকল্পিত বিশেষ একটি গানের উৎস থেকে আলকাপ গানের উদ্ভব হয়নি। দীর্ঘকাল ধরে নানা সংমিশ্রণ, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিয়োজন, সংযোজনের গড়াপেটার গতিধারার পথ বেয়ে ধীরে ধীরে আলকাপ গানের বর্তমান রূপের উদ্ভব হয়েছে, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের শিল্প-সংস্কৃতি-নৃত্য-গীতের পরিচয় সন্ধান করে জানা যায় গঙ্গা নদীর উভয় পারের জনসমাজে কেবল গম্ভীরা নয় আরও বহু ভিন্ন ধারার সংগীত সংস্কৃতির প্রচলন ছিল। সে সব সংগীত সংস্কৃতির সহযোগ ও মেলবন্ধনে আলকাপ গানের উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন সংগীত ধারার মিশ্রণে আলকাপ গানের উদ্ভব হয়েছিল বলে এ গানের আসরে একাধিক আঙ্গিকের গান পরিবেশন করা হয়। আর সেই কারণে আলকাপ গানের আর এক নাম হয়েছে পঞ্চরসের গান। এই দুই কারণে আলকাপ আসরে এক রকমের নয়, একাধিক তথা বহুবিধ আঙ্গিকের গান পরিবেশিত হয়। বিখ্যাত পরিব্রাজক স্যার ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টনের দেওয়া বর্ণনা থেকে এ মতের সমর্থন

পাওয়া যায়। ১৮০৮-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে বুকানন সাহেব তাঁর 'এ্যাকাউন্টস অফ ডিস্ট্রিক্টস' নামক গন্থে দিনাজপুর, রাজশাহী, ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, মালদহ (তখনও মালদহ নামে স্বতন্ত্র জেলা গঠন হয়নি) অঞ্চল ভ্রমণ করে তাঁর গ্রন্থের 'ফাইন আর্টস' নামক অধ্যায়ে এত্দঅঞ্চলের প্রচলিত নৃত্যগীতাদি সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়ে গেছেন তাতে আলকাপের নামের উল্লেখ নেই। এ থেকে অনুমান করা যায় তখন অর্থাৎ ১৮০৮-১৮০৯ খ্রীঃ পর্যন্ত 'আলকাপ' নামে কোন বিশেষ ধারার গান সমাজে প্রচলিত হয়নি। অথচ সেই সময়কালের এমন কিছু সংগীতের বর্ণনা দিয়েছেন যার মধ্যে আলকাপ গানের বহু মিল আছে। এদেরকে আলকাপ গানের পূর্বপুরুষ বলে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না।

**আলকাপের নামকরণ ঃ** 'আলকাপ' শব্দটি বেশ ব্যঞ্জনাধর্মী। 'আল কাটা কাপ' থেকেই 'আলকাপ'। 'আল' শব্দের নানা অর্থ। যেমন কন্টক, কিনারা, সীমানা, হুল ইত্যাদি। শ্রদ্ধেয় সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ 'আল' শব্দটিকে দেখেছেন আহ্লাদের অপভ্রংশ রূপে- আহ্লাদ >আল্লাদ > আল। 'কাটা শব্দটি উচ্চারণ অর্থে ব্যবহৃত হত। যেমন ছড়া কাটা । আর 'কাপ' শব্দটির অর্থ হল কৌতুককারী, ছদ্মবেশী, তামাশা, সঙ ইত্যাদি। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে 'অন্নদামঙ্গাল'-এ শিবের ভিক্ষাযাত্রা অংশে 'কাপ' শব্দটির উল্লেখ আছে।

'কেহ বলে এলো শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়োটি খেলাও দেখি সাপ।।'

যদিও 'কাপ' এর উৎপত্তি 'কাপট্য' থেকে। যার অর্থ ছদ্মবেশী বা কৌতুক-কাপট্য > কাপ্টা > কাপ। তবে চলতি বাংলায় 'আল' বলতে 'হুল'কেই বোঝায়। বিশেষ করে আলকাপ অধ্যুষিত লোকায় 'আল' বলতে মৌমাছি বা বোলতার 'হুল' বোঝায়। লাট্টুর নীচের সূচালো অংশও 'আল' নামে পরিচিত। 'আলপিন' শব্দটির সঙ্গো আমরা কম বেশি পরিচিত। গ্রাম বাংলার বলদ বা মোষকে জোরে হাঁটানোর জন্য যে হুড়ি ব্যবহার করা হয়, তার আগায় সূচের মতো ধারালো একটা বস্তু থাকে, তাকেও 'আল' বলে। সুতরাং 'আল'কাটা হয় যে 'কাপ' বা অভিনয়ে তাকেই বলে 'আলকাপ'। সেই অর্থে 'আলকাপ' হল গায়ে হুল ফোটানোর ব্যঙ্গামূলক বা বিদ্রূপাত্মক অভিনয়রীতি। অর্থাৎ এটি হল এমন একটি লোকনাট্য যা সমাজের অসঙ্গাতিকে তুলে ধরে।

**আলকাপের সেকাল ঃ** মূলত মুর্শিদাবাদ জেলার জনপ্রিয় লোকনাট্য আলকাপ। মুর্শিদাবাদের পাশের জেলাগুলিতেও আলকাপের অভিনয় হয়ে থাকে। মালদা জেলার প্রায় সবখানেই আলকাপের আসর বসে। এছাড়া বীরভূম জেলার রাজগ্রাম, মুরারই, লাভপুর, নলহাটি, বিহারের সাহেবগঞ্জ জেলার মহেশপুর, রারহাবোয়া, তিনপাহাড়, রূপমহল, পূর্ণিয়া জেলার বাংলা ভাষাভাষী এলাকা, রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, কানসাট, ভোলাহাট, রতনপুর, আমপুরা ইত্যাদি এলাকায় এখনও আলকাপের দেখা মেলে। মালদহের শিবগীতি গম্ভীরা

থেকে আলকাপের সৃষ্টি হলেও ধর্মের সঙ্গো আলকাপের কোনো যোগ নেই। ফলে আলকাপ পরিবেশিত হয় কোনো ধর্মীয় উৎসব ছাড়াই।

আলকাপ কোনও আনুষ্ঠানিক বা পূজা উৎসব ভিত্তিক লোকনাট্য নয়। আলকাপ অভিনয়ের নির্দিষ্ট কোনও সময়কাল নেই। তবে প্রাকৃতিক দিক থেকে অনুকূল সময়কে বেছে নেওয়া হত। যেহেতু মাঠে-ঘাটে আলকাপের অভিনয় হত সেহেতু বর্ষার সময়কে এড়িয়ে যাওয়া হত। প্রধানত শরৎ থেকে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত সময়পর্বে আলকাপ অভিনয়ের আয়োজন করা হত। তবে আমন ধান কেটে নেওয়ার পর চাষীদের অবসরের সময়। তখন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষের কাজ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত আলকাপের অভিনয় সবচেয়ে ভালো সময়। গৃহস্থের বাড়ির বিয়ে, অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য অনুষ্ঠান উপলক্ষেও আলকাপ গানের আয়োজন করা হত। গ্রামের মানুষ, শ্রোতাসাধারণ চাইলে যে কোনো সময় আলকাপ গানের আসর বসানো হত। আগে আলকাপ সন্ধ্যায় হয়ে পরের দিন সূর্য উঠিয়ে ছাড়ত। পরবর্তীকালে আলকাপের সময়সীমা চার-পাঁচ ঘন্টার মধ্যে এসে দাঁড়ায়। এখন তো কমবেশি এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। যদিও তিন-চার ঘন্টা সময় ধরে আলকাপ পালা হচ্ছে এখনও।

অন্যান্য লোকনাট্যের মতো আলকাপের মধ্যেও নাটকের যাবতীয় গুণ বা উপাদান থাকে। তবে শহরে শিক্ষিত নাগরিক সমাজে নাটকের তথা প্রসেনিয়াম প্রথার বাইরে এই লোকনাটক। একবার বীরভূমে ‘মনসার পালা’ নামে একটা লোকনাটক হয়েছিল। সেখানে মনসা দুঃখের গান গাইছে। মৃত লক্ষিন্দর উঠে একটা গান করে আবার মরে যাচ্ছে। গ্রামের লোক কত সহজে বিষয়টা উপভোগ করছে। কিন্তু শিষ্ট সমাজ, শিক্ষিত সমাজ ব্যাপারটা সহজে মেনে নিত না। দোষ খুঁজতে বসে যেতেন নাট্য পণ্ডিতরা। সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিতেন। কিন্তু লোকসমাজ এরমধ্যে কোনও দোষ দেখে না। লোক সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতো লোকনাট্যও এমনই সহনশীল, এমনই নমনীয়। পান থেকে চুন খসলে লোকনাট্যের মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কেননা লোকনাট্যের অভিনেতারা ‘পেশাদার দল নয়, আলু বেচা, তেল বেচা মানুষের সখের দল, অনেকে হয়তো পড়িতেও জানেনা ... শক্ত শক্ত অনেক শব্দই উচ্চারণ হয় না, তাই হাস্যকর রকমে ভাঙিয়া জিহ্বার উপযোগী করিয়া নিয়াছে। বক্তৃতা গুলি কথ্য ও শুদ্ধ ভাষার এক অপরূপ খিচুড়ি। পোশাক পরিচ্ছদের যেমন অভাব, অভিনেতা নির্বাচনের কান্ডজ্ঞানেরও তেমনই অভাব। বালক লখিন্দরের পাশে তার চেয়ে এক হাত বেশি লম্বা বেহুলা নির্বিকারচিত্তে পার্ট বলে - গলাটি মিহি বলিয়া আর চমৎকার মেয়েলি ঢঙে অভিনয় করিতে পারে বলিয়া ওকে বেহুলা করা হইয়াছে আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন নাই।’[১] বোঝা যায়, নাগরিক সমাজের নাটকের সংগে গ্রামীণ মানুষের এই লোকনাট্যের ফারাক আছে। আলকাপে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা প্রধানত নিম্নবর্গের হিন্দু বা মুসলমান। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নবিত্ত, ক্ষেতমজুর, রিক্সাচালক, সবজিওয়ালা, মুদি ইত্যাদি। আগে

কোথাও কোথাও ফাঁকা মাঠে মাটি ফেলে সামান্য উঁচু করে তাতে আলকাপ অভিনয় হত। মাথার উপর থাকত খড়, পাটকাঠি বা শালপাতার ছাউনি। দিনের বেলা সূর্যের আলোই ভরসা। আর রাতে হ্যাজাকের আলোই ছিল একমাত্র সম্বল। খোলা জায়গায় খালি গলায় নির্দিষ্ট সংলাপ যথাযথ মহড়া ছাড়া ঘন্টার পর ঘন্টা অভিনয় করে এই মানুষগুলো তাঁদের সমাজ ও সম্প্রদায়কে আনন্দ দিত। অভিনেতারা আসরে উঠে দাঁড়ালে হত প্রবেশ আর বসে পড়ল হত প্রস্থান। তাঁদের মত করে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলত। খুব সহজেই আলকাপের অভিনয়ের মাধ্যমে তারা মাটি আর মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যেত। একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার দৃশ্যে আসর প্রদক্ষিণ করে ঘোষণা করা হত। আসর প্রদক্ষিণ করার সময় মুখে শব্দ করে ট্রেনে না বাসে যাচ্ছে তা বোঝানো হত।

আলকাপ দলে সাধারণত আট থেকে বারোজন পুরুষ অভিনেতা অভিনয় করে থাকেন। এঁদের মধ্যে ওস্তাদ, ছাড়দার বা মাস্টার থাকেন একজন। মাস্টার বা ছাড়দার হলেন কাপ, পালার রচয়িতা এবং ছড়াগানের পরিবেশক। এঁকে ওস্তাদ বা খলিফাও বলা হয়। দু'জন বা তিনজন ছুকরি থাকেন। এঁরা আসলে নারীর ভূমিকায় অভিনয়কারী পুরুষ। এঁরা নাচেন বলে এঁদের নাচিয়াও বলে। সাধারণত বারো বছর বয়স থেকেই নাচিয়ে ছোকরা জোগাড় করা হত। তারপর শুরু হত তার তালিম। নাচিয়ে ছোকড়া সাজ-পোশাকে হয়ে উঠবে নারী। এমন কি তার মাথায় থাকবে মেয়েদের মত দীর্ঘাকৃতির কেশ। স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের মেয়েদের মতো অঙ্গ ভঙ্গী, চলন অনুকরণ করতে হয়। তাঁদের কন্ঠস্বরও হতে হবে সুরেলা ও সুমিষ্ট। আলকাপের ওস্তাদের ভাষায়— এ যেন কাঠ-খড় মাটি দেয়ে প্রতিমা নির্মাণ করে রঙ মাখিয়ে চোখ এঁকে সাজ পরিয়ে পূজা করা। মনের ভিতর আছে এক মোহিনী নটী, তাকেই পুরুষের শরীরে রূপ দেওয়া হয়। ছোকরা নারী তবুও নারী নয়, পুরুষ তবু পুরুষ নয়। আলকাপ পালায় ছুকরির উজ্জ্বল উপস্থিতি দর্শকদের আকর্ষণের মূল বিন্দু। এঁরাই কিন্তু আলকাপ পালার কেন্দ্রীয় শিল্পী, দলের প্রাণ। 'আলকাপ' বিষয় নিয়ে 'বৈতালিক' নামে (১২৫৪, ভাদ্র, 'স্বরাজ' পত্রিকার পূজা সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল) প্রথম উপন্যাস লেখেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। আর আলকাপ বিষয়ক ভীষণ জনপ্রিয় উপন্যাস সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'মায়ামৃদঙ্গ'। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, আলকাপের প্রবাদপ্রতিম কালজয়ী শিল্পী হলেন ওস্তাদ ঝাঁকসু (ঝাঁকসাই) সর্দার (মন্ডল)। কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রথম যৌবনে ঝাঁকসুর আলকাপ দলের নৃত্যশিল্পী ছিলন। তিনি তাঁর 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসে ছুকরি সুবর্ণ-র বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাষায় -

'মেয়েদের দীঘল কেশ, দু'হাতে চাঁদের চুড়ি, নীলচে শার্ট আর পাজামা, পায়ে কাবুলি চপ্পল, ফরসা মুখের চাপা চিবুক, মসৃণ নিটোল গাল, টানা চোখ, পুরুষ তবু পুরুষ নয়, নারী অথচ নারীও না।' এই উপন্যাসে ছোকরার বয়স সম্পর্কে ঝাঁকসু বলেছেন— 'কম বারো উপরে বিশ/ তাতে একটু উনিশ বিশ।' অর্থাৎ ছোকরার বয়স হতে হবে বারো থেকে

কুড়ি বছরের মধ্যে। একজন কাপদার বা কপ্যা থাকে। মূলত দর্শকদের হাস্যরস পরিবেশন করে মজা দেওয়াই তার কাজ। কপ্যা হিসাবে বোনাকানা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এছাড়া হারমোনিয়াম বাদক, তবলা বাদক এবং চার-পাঁচজন দোঁহারি থাকে। দোহারিরা করতাল বা খঞ্জনি বাজিয়ে থাকে। করতাল বা খঞ্জনিকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'পুরি'। দোহারিদের যেমন বাজনা বাজাতে হয়, গানে দোহার দিতে হয়, তেমনি পাকা অভিনেতাও হতে হয়। গান বা বাজনার ফাঁকে তাদের কোরাসে অংশ নিতে হয়। কখনও কখনও ছোটো ছোটো সংলাপ বলতে হয়। আবার কখনও বিশেষ চরিত্রে অভিনয়ও করতে হয়।

আলকাপ শুরু হয় নানা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে কনসার্ট বাজানোর মধ্য দিয়ে। একে বলা হয় 'গছ'। এরপরই সমবেত কণ্ঠে 'জয়' দেওয়ার প্রথা রয়েছে। সাধারণত তানসেন, ওস্তাদ ঝাঁকসু সর্দার ওস্তাদ বোনাকানা, মাস্টার সিরাজ, দেবী সরস্বতী, গণেশ, দলের ওস্তাদ প্রমুখের নামে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়। অন্যান্য লোকনাট্যের মতো আলকাপের শুরুতেও থাকে বন্দনা অংশ। বিভিন্ন দেবদেবী ও পূর্বসূরি ওস্তাদদের বন্দনা করা হয়। বন্দনার পর শুরু হয় বৈঠকি গান। এর সঙ্গে এক বা একাধিক 'ছোকরা' নাচতে থাকে। এই নাচের মধ্যে ছোকরার হাস্য ও লাস্যময়ী রূপই ফুটে উঠে। আলকাপ নানা সঙ্গীতের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। খ্যামটা, ভাটিয়ালি, ঝুমুর, টপ্পা, ভাওয়াইয়া, কবিগান ইত্যাদি লোকসঙ্গীত থেকে গানগুলি সংগৃহীত হয়। অনেক খলিফা বা ওস্তাদ গান রচনা করেন। সেসব গানে অনেক সময় চটুল সুর ও কৌতুক বিষয় থাকে। যেমন— 'ও পরাণের বিড়ি রে / তোর মাজায় কেন সুতা! কিংবা 'আমি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব / আমার কি ভাতের অভাব' ইত্যাদি। এরপরেই বন্দনা ছড়া পরিবেশন করেন ওস্তাদ বা অন্য কোন গায়ক। তাপর শুরু হয় আলকাপের প্রাণ-অভিনয় সমৃদ্ধ আলকাপ পালা। ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে পালা রচিত হলেও সমাজই এর প্রধান বিষয়। সমাজ ও পারিবারিক নানা সমস্যা ও অসামঞ্জস্যকে চিত্রিত করা হয় এই পালায়। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আলকাপের শিল্পীরা গান বেঁধেছিলেন। সেই গানে যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছিল, তেমনি ছিল স্বাধীনতার স্বপ্ন। নিরস্ত্রভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে লোকসমাজকে সচেতন করতে আলকাপ শিল্পীদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। সেক্ষেত্রে তাঁরা নানা রূপকের আশ্রয় নিতেন। 'বৈতালিক' উপন্যাসে একটি গানে ব্রিটিশদের স্নেহপুষ্ট মহাজন, জমিদার ও দারোগার বিরুদ্ধে ক্ষোভ সোচ্চারিত হয়েছে— 'ওই তিনটা শালাকে মারিয়া দাও ঘুচুক এ জঞ্জাল / আর কতকাল সহিব ভাই দ্যাশের পোড়া হাল।' সামাজিক কুপ্রথা, নানা সংস্কারের প্রতিবাদেও আলকাপ শিল্পীরা গান বেঁধেছিলেন। আলকাপ গানে সমসাময়িক নানা বিষয় ওঠে আসত। পাশাপাশি নারী পুরুষের প্রেম-ভালোবাসার ছবিও ফুটে উঠতো আলকাপ গানে। আলকাপে সাজ-পোষাক লাগে না। অর্থাৎ অভিনয়ের জন্য খরচ অত্যন্ত কম, মঞ্চও অপ্রয়োজনীয়। বাজারে আলকাপের যথেষ্ট চাহিদা আছে, কিন্তু ভালো দল নেই। আলকাপ মূলত সখের অভিনয় ছিল। স্থায়ী মাইনে দেওয়া হত না এখানে কাউকে। অভিনয়ের শেষে সামান্য পয়সা এবং পেটভরে

খাবার দিলেই অভিনেতারা সন্তুষ্ট হতেন। বিভিন্ন অভিনেতা বিশেষত নাচ গানের ছোকরা/ নারী দর্শকদের কাছে 'ফেরি' (সেফটি পিন দিয়ে বুকে টাকা পরিয়ে দিত) বা উপহার পেতেন টাকাপয়সা। দলপতি বা অভিনেতাদের নিজস্ব বৃত্তি থাকত। ঝাঁকসু মন্ডল, নৈমুদ্দিন, সমীরুদ্দিন সরকার, জেকের আলি, মাকড়া প্রমুখ সবাই ছিলেন সমৃদ্ধ চাষি। তাদের দলের সবাই নিজস্ব বৃত্তিতে যুক্ত থাকতেন। লোকশিল্পের রীতি অনুযায়ী শিল্পীর চাহিদা যখন বেড়ে যেত, দূর দূরান্তরে অনুষ্ঠান করতে যেতে হত; তখন শিল্পই হয়ে যেত তাদের বৃত্তি; জীবন এবং জীবিকা। জনগণ তাদের মোটামুটি থাকা খাওয়া, যাতায়াতের ভাড়ার অতিরিক্ত কিছু টাকা দিত। তাতে করে বৃত্তিতে অনুপস্থিতি পুষিয়ে যেত।

**আলকাপের একাল ঃ-** কালের বিবর্তনে আলকাপেরও পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীনতার পরবর্তী কালে আলকাপের উপর থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার প্রভাব পড়ল। বর্তমানে প্রসেনিয়াম মঞ্চেও আলকাপ অনুষ্ঠিত হয়। আগে আসর বসত চারপাশে দর্শক বেষ্টিত মধ্যস্থলে। যাত্রার মতো আলকাপ পালায় প্রবেশ-প্রস্থানের পথ থাকত না। প্রসেনিয়াম মঞ্চে আলকাপ পালা অনুষ্ঠিত হওয়ার ফলে শিল্পীরা, গায়ক-বাদকরা পিছনে সারি সারি বসে থাকতেন। যখন যার অভিনয় আসে তখন তিনি উঠে এসে অভিনয় করেন। দর্শক সাধারণত সামনে বসেন। লোকালয়ে মঞ্চ বেঁধে আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করে, মাইক লাগিয়ে নবকলেবরে আলকাপের অভিনয় হত। বাদ্যযন্ত্রে আর হাঁড়ি, কড়াই থালাবাসন নয়। পরবর্তীকালে হারমোনিয়াম, তবলা, করতাল, কাঁসি, খঞ্জনি ইত্যাদির ব্যবহার শুরু হয়। আলকাপ গানের চরিত্রেরও বদল ঘটেছে। যুক্ত হয়েছে ফিল্মস্টারদের নাম। যেমন— 'ঘরে নাই নুন / ছেলের নাম মিঠুন'। স্বাধীন দেশের স্বার্থপর নেতাদের বিরুদ্ধেও আলকাপ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল 'দেশের নেতা গো পল্লীবাসীর বুকের দরদ বুঝলে না/ .... তোমরা মোটর গাড়ি চড় আমরা চাপা পড়ি/ খুঁজে দেখ কলের ক্ষতি নেমে তাড়াতাড়ি/ বনিক রাজার এমন বিধান/ শোষন,শাসন আর অপমান/ মনের দুঃখ মুখ বুজে/সইতে হচ্ছে বুঝে সুঝে।' দরিদ্র ঘরের মেয়েরা যুক্ত হল আলকাপে। উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীর অনেক নারী-পুরুষ জীবিকা হিসেবে আলকাপে অংশ নিতে থাকেন। ফলে আলকাপে দেখা দেয় নৃত্য-গীত পটিয়সী নারীদের। যাত্রার বাদ্যকরদের। এঁরা কিন্তু খাদ্য এবং সামান্য অর্থেই তৃপ্ত ছিলেন। আংশিক জীবিকা থেকে মুনাফার বিষয় হয়ে উঠল জনপ্রিয় এই লোকনাট্য। দলপতি তথা মালিকদের মুনাফার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল। যদিও আলকাপ দল চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন এমন আলকাপ শিল্পীরও অভাব নেই।

কলকাতার বুকেও গড়ে উঠেছিল আলকাপ দল। যেমন নিউ রাধামাধব অপেরার মালিক ছিলেন মাধবকুমার ঘোষ ও কামাল শেখ। তাঁরা ৯২ বিডন স্ট্রীটে আলকাপের দল খুলেছিলেন। মহাজনের কাছে টাকা ধার করে দল চালাতেন, মুনাফার পরিবর্তে দেনার জালে জড়িয়ে পড়েন। ভেঙে যায় তাঁদের দল। ফিরে আসেন নিজের ভিটে ভগবানগোলাতে। মাধব ঘোষ এখন মনসার গান গেয়ে, স্থানীয় যাত্রার দলে অভিনয় করে কোনমতে পেট

চালান। কখনও সুযোগ পেলে আলকাপ পালায় অংশ নেন। আলকাপ শিল্পীদের উত্তরসূরিরা এই ধরণের লোকনাট্যে আস্থা রাখতে পারেননি, পারেননি ভালোবাসতে। শিল্পী হওয়ার বাসনা তাদের মধ্যে নেই। নান্দনিক সৌন্দর্যের কোনও মূল্য নেই। ফলে আ লকাপ শিল্পীরা একরাশ হতাশা বুকে নিয়ে কোনমতে আলকাপকে আকড়ে সমাজে টিকে আছে।

মেলা বা গ্রাম্য উৎসবের নির্দিষ্ট অভিনয় ছিল আলকাপের। বৈদ্যুতিন প্রচার মাধ্যমের আঘাতে, নীল ছবির প্রসারে, নানা ধরণের লটারি এবং জুয়ার বিপুল বিস্তৃতিতে আলকাপে দর্শক সংখ্যা কমতে থাকে। দর্শক আকর্ষণের জন্য চটুল নাচ, বিজ্ঞাপন, আদি রসাত্মক হাসি তামাশা ঢুকিয়ে দেওয়া হল আলকাপে। আলকাপ গানের পালায় রুচিহীন খেউরের ও যৌন আবেদনের প্রাদুর্ভাব ঘটল। ছোকরাদের অতিরঞ্জিত নারীত্বের উগ্র যৌনতা একশ্রেণির দর্শক এবং ওস্তাদদের আকর্ষণ করল। তাঁদের নাচ, গান, অভিনয়ের জন্য মুগ্ধ দর্শকরা 'ফেরি' দিত। দর্শকের নাম ঘোষণা করা হত। দর্শকদের কেউ কেউ বিশেষ নাচ, গান, বাচ্চাকে কোলে নিয়ে নাচ বা প্রকাশ্যে চুম্বন চাইত। এরজন্য ছোকরাদের অতিরিক্ত 'ফেরি' দিত। 'ফেরি'র প্রাপ্ত টাকার অর্ধেক পেত ওস্তাদ বা দলপতি, অর্ধেক ছোকরা। ফলে আলকাপ নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পথ হারাতে লাগল। আলকাপের ঘোলা স্রোত থেকে মুখ ফেরাতে লাগল জীবনবাদী প্রগতিশীল সাধারণ মানুষ।

ষাটের দশকের পর থেকে আলকাপের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে। সে সময় ওস্তাদ ঝাঁকসু আলকাপের আঙ্গিক বিনির্মাণের মাধ্যমে গড়ে তোলেন 'পঞ্চরস'- এক ভিন্ন যাত্রাধর্মী লোকনাট্য। যদিও আলকাপের সাথে পঞ্চরসতত্ত্বের কোনও যোগ নেই। এখানে পঞ্চরস বলতে পাঁচমিশেলি আঙ্গিককে বোঝানো হয়েছে ঃ- ১. আসরবন্দনা, ২. বৈঠকিগান, ৩. ছড়াগান, ৪. কাপ, ৫. যাত্রাপালা।

**আসরবন্দনা ঃ** আলকাপ পরিবেশনের নির্দিষ্ট সময়-তিথি যেমন নেই তেমনি আসর রচনার জন্য বিশেষ মঞ্চ বা স্থান নির্দিষ্ট থাকত না। গ্রামের চন্ডী মন্ডপে, পূজা প্রাঙ্গাণে, মেলার মাঠে বা গৃহস্থের প্রশস্ত উঠানে সামিয়ানার নীচে আলকাপের আসর বসত। সামিয়ানার নীচে উপযুক্ত ভূমির উপর চট, কম্বল বা সতরঞ্জির আসনে শিল্পী অভিনেতার দল মাঝখানে বাদ্যযন্ত্রাদি এবং অভিনয় উপকরণ রেখে তাকে ঘিরে বৃত্তাকারে আসর রচনা করে। শিল্পীদলের সেই বৃত্তের পার্শ্বে কিছুটা ফাঁকা জায়গা অভিনয়ের জন্য ছেড়ে রাখা হয়। দর্শক শ্রোতারা দলকে ঘিরে চারদিকে বসে পড়ে। আসরে দুটি দল উপস্থিত থাকলে অভিনয় ক্ষেত্রটিকে মাঝে রেখে অপর পারে দ্বিতীয় দল বসে। দল দুটি পর্যায়ক্রমে এক পালা করে সংগীত পরিবেশন করে। আলকাপ আসর সন্ধ্যায় বসে সারারাত চলে। পরেরদিন দুপুর পর্যন্ত চলতে বাধা থাকে না। প্রাচীনকালে তাই হতে দেখা যেতো।

সন্ধ্যা নামলে আলকাপের আসর শুরু হয়। গ্রামের লোকেরা তার পূর্ব থেকে এসে

আলকাপ দলের গায়ক শিল্পীদের বসার জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে দিয়ে চার পার্শ্বে নগ্নভূমির উপর বসে অপেক্ষা করতে থাকে। সময় হলে দলের শিল্পীরা প্রস্তুত হয়ে আসরে এসে বসেন। সবশেষে আসেন ছোকরা ও খলিফা। তারা এলে গান শুরু একথা দর্শকদের জানা। তাই ছোকরা ও খলিফার প্রবেশের সঙ্গো সঙ্গো সমবেত দর্শক শ্রোতারা আনন্দে মেতে উঠতেন এবং হাততালি দিতেন ।

সকলে প্রস্তুত হয়ে বসলে সমবেত যন্ত্র সংগীতের মধ্য দিয়ে আসরের সূচনা ঘোষিত হয়। সূচনার প্রাক মুহূর্তে সরস্বতী, কালী, দূর্গা, মহাদেব, তানসেন ও সংগীত গুরুর নাম উচ্চারণ করে সমবেত কণ্ঠে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়। এক-একটি কলি গাওয়ার পর তাঁরা ডান দিকে ঘুরে যান এবং যন্ত্রবাদকদের দিকে এসে সমাপ্ত হয় আসর বন্দনা।

তবে সাম্প্রতিককালে প্রার্থনা পরিবেশনের ভঙ্গি বদলিয়েছে। দলের ছোকরা শিল্পীরা আসরে দাঁড়িয়ে দীপ-ধূপদানের মাধ্যমে আসর বন্দনা পরিবেশন করছেন। মুর্শিদাবাদের আলকাপ সম্রাট ঝাকসু মন্ডল এ রীতির প্রচলন করেন। আসর বন্দনা গান —

মাগো বাক্‌বাদিনী জ্ঞান প্রদায়িনী
নমামি জননী বীনাপাণি
নাই কোন বুদ্ধিবল দেহ দেহ কণ্ঠবল
ভরসা কেবল রাঙাচরণ দুখানি।।

**বৈঠকিগান ঃ-** আসর বন্দনার পর শুরু হয় ছোকরাদের বৈঠকি বা খেমটা গান। বয়সে ছোটো ছোকরার থেকে শুরু হয়ে একে একে বড়রা গান করতে আসেন। বৈঠকিগান মূলত প্রেম সংগীত। গানের মধ্যে প্রেমজ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ করে চপল দর্শক মনকে আসর করে তোলা বৈঠকি গানের অন্যতম উদ্দেশ্য। বৈঠকি গানের সঙ্গো শিল্পী যে নৃত্য পরিবেশন করেন তা সাধারণত কোনো নির্দিষ্ট রীতি বা গানের অর্থকে অনুসরণ করে না। শিল্পী তার নিজের ইচ্ছা-সাধ্য ও দক্ষতা অনুযায়ী নৃত্য পরিবেশন করেন। প্রত্যেক ছোকরা শিল্পীর একটা করে গান গাওয়া শেষ হলে বৈঠকি আসর সমাপ্ত হয়। পূর্বে ওস্তাদরা এই গানগুলি রচনা করলেও, বর্তমানে হিন্দি-বাংলা ছায়াছবির বহুল প্রচলিত গান গীত হয়ে থাকে আলকাপে। বৈঠকি গান—

আমি বন্ধুর লাগি মরি জ্বলিয়া।
বন্ধু আমার রসিক ভালো
পাতলা কাপড় এনে দিলো
হায় হায়, পাতলা কাপড় রয়না বুকে
যৌবন উঠে ঠেলিয়া।

**ছড়াগান ঃ-** বৈঠকি গানের শেষ আসরে ছড়াগান গাইতে অবতীর্ণ হন দলের মাস্টার বা

খলিফা। তিনি মুখে মুখে প্রস্তুত করে অবিরাম গেয়ে চলেন। আলকাপের উৎপত্তি, সংশ্লিষ্ট দলের শিল্পী সমাজ, দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ইত্যাদি নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে ছড়া গান গাওয়া হয়। ছড়া গানের সুর ও পরিবেশন ভঙ্গি কবিগানের অনুরূপ। ছড়াগান —

ধুয়া- পরম্পুরুষ শ্রীকৃষ্ণনাম বিশ্ব উপাদান। সেই পুরুষ ওঁ ব্রহ্ম নামে সৃষ্টির কারণ।।

তিনি আধার আর আধেয়, অনন্তরূপ যার বিগ্রহ।
অফুরন্ত ভাব প্রবাহ, আকর ভান্ডখান।।

................

খুঁজে খুঁজে যার মাহাত্ম মুনিঋষি হলেন ব্যস্ত
পুরাণ কোরান বেদবেদান্তে অন্তহীন গুনগান।।

**কাপ ঃ-** আলকাপের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ কাপ বর্তমানে গুরুত্ব হারাচ্ছে। পূর্বে যেখানে কাপের মাধ্যমেই রাত অতিবাহিত হত, বর্তমানে কাপের জন্য সর্বাপেক্ষা ঘন্টাখানেক সময় দেওয়া হয়। কাপের প্রধান উদ্দেশ্য কৌতুকাভিনয়, ব্যাঙ্গাত্মক সংলাপের মাধ্যমে মস্করা ও হাস্যরস প্রদর্শন। লাব্বার বা কেপ্যা নামক কুশলী শিল্পী তাঁর স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে আসরে দাঁড়িয়ে ছোকরা শিল্পীদের স্ত্রী সম্পর্কে ডাক দিয়ে এক এক করে আসরে দাঁড় করান। সমাজের রীতি-নীতি, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, স্বামী-স্ত্রী দ্বন্দ্ব, মহাজন, জমিদারের শোষণ-অত্যাচার বিষয়গুলি হাস্যরসের মাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়, যা দর্শকমনে হাসির সাথে সাথে তীব্র অভিঘাত তৈরি করে। তবে সংলাপ যেখানেই শুরু হোক না কেন তা শেষ পর্যন্ত তাদের জীবন বা সংসারের দুর্জয় সমস্যায় গিয়ে উপস্থিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে সমস্যার সমাধান খুঁজতে গ্রামের মোড়লের ডাক পড়ে। তিনি এসে স্বামী-স্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলে এবং আলোচনা করে সমস্যার সমাধানে উপনীত হয়। সংলাপগুলি বেশিরভাগ গীতাভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট সময় ধরে চলে কাপের কৌতুক আসর।

**যাত্রাপালা ঃ-** পূর্বে আলকাপের পালা বা বই বলে কিছু ছিল না। পরবর্তীতে যাত্রাপালার অনুকরণে পালার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। সামাজিক সমস্যামূলক যাত্রাপালা আলকাপে উপস্থিত হয়।

এই পাঁচটি আঙ্গিক নিয়েই আলকাপের নতুন নাম হয় - 'আলকাপ পঞ্চরস'। এছাড়া আলকাপের আরেকটিও উপস্থাপন রীতি হল টেলার। কিছু কিছু দল আসর বন্দনার পর মূকাভিনয় জাতীয় একপ্রকার আঙ্গিক পরিবেশন করেন। এইগুলিকেই টেলার বলে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই টেলার উপস্থাপিত হয়। এই সময় বাদ্যযন্ত্র হিসাবে তবলা, বায়া, ফুলেট, কর্নেট, হারমোনিয়াম প্রভৃতির আগমন ঘটে। চরিত্রোপযোগী সাজপোশাক শুরু হয়। সকলেই মেকআপ নেওয়া শুরু করে। প্রসেনিয়াম

থিয়েটারের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের ছায়া পড়ে আলকাপে। আলকাপে পোশাক ও রূপসজ্জার বিষয়টি ছিল না বললেই চলে। বর্তমানে চরিত্র অনুযায়ী পোশাক ও মেকআপের ব্যবস্থা করা হয়। একসময় আলকাপে অংশগ্রহণকারী অভিনেতারা আসরে যে যে বেশে থাকে, সেই বেশেই পালায় অংশ নিত। কিন্তু বর্তমানে চাকচিক্যময়, জমকালো পোশাক ব্যবহৃত হয়। ফলে এখন অনেক আলকাপ দলে ড্রেসারের প্রয়োজন হয়। এখন আলকাপ শিল্পীরা যাত্রাশিল্পীর মতো চড়া দাগের মেকআপ নেন। সেই কারণে গ্রীনরুমের প্রয়োজন হয়। আগের মতো মাঠে প্রান্তরে নয়, লোকালয়ে মঞ্চ বানিয়ে, কোথাও টিকিট কেটে আলকাপের অভিনয় হয়। উপস্থাপনার দিক থেকেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে আলকাপ লোকনাট্যে। উপস্থাপনার সময়ও ক্রমশ ছোটো হয়ে আসে। অর্থাৎ আলকাপ নামক লোকনাট্যে লাগে আধুনিকতার ছোঁয়া। আলকাপের আঙ্গিক ও উপস্থাপন রীতিতে আরও পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময় আর ছোকরা নয়, নারীরাই নারী চরিত্রে মঞ্চে অবতীর্ণ হন। বাইরের শহুরে শিল্পীর আগমনে আলকাপে গ্রামীণ, আঞ্চলিক ভাষার অবলুপ্তি ঘটতে থাকে এবং শহর ঘেঁষা ভাষা প্রাধান্য পেতে থাকে। প্রচার কাজেও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার হতে থাকে। পূর্বের ন্যায় ঢোল বাজিয়ে নয়, পোস্টার ফেস্টুন লাগিয়ে আলকাপের প্রচার শুরু হয়। বর্তমানে এই লোকনাট্যে ইলেক্ট্রিক গীটার সহ নানা আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আলকাপ পালায় মাঝে সাময়িক বিরতি থাকত। বিরতির সময় বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, মজা সৃষ্টিতে আদি রসের আমদানি করা শুরু হল। যা কখনও কখনও শালীনতার সীমানা ছাড়িয়ে যেত। জনপ্রিয় চলচ্চিত্রের গানও উঠে এল আলকাপ পালায়। আগে অভিনেতাদের সঙ্গে দর্শকদের অবস্থানে খুব বেশি দূরত্ব থাকত না। বর্তমানে মঞ্চ উঁচু করে বাঁধার ফলে কিংবা প্রসেনিয়াম মঞ্চ ব্যবহৃত হওয়ায় সেই দূরত্ব বেড়েছে, ফলে অন্তরঙ্গ থিয়েটারের পরিবেশ অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে।

**উপসংহার ঃ-** সম্প্রতি একটি আলকাপ পালার অভিনয় শেষে আলকাপের সব শিল্পীরা মিলে সমবেত কণ্ঠে গেয়ে ওঠে— 'আলকাপ আলকাপ বলে সবাই/ আলকাপ গাইবে কে?/বাংলায় এখন বড়ো দুঃখ/ কত সমস্যা যে।' সত্যিই তো আলকাপ পালা গাইবার লোকের অভাব এখন! ভোগবাদী সমাজের উদ্দাম সংস্কৃতির অক্টোপাসের থাবায় দ্রুত হরিয়ে যাচ্ছে আলকাপ। নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসী সংস্কৃতি গিলে ফেলেছে আলকাপ সহ লোকনাট্যের অন্যান্য শাখাগুলিকে, বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ লেগে আছে আলকাপে। অথচ বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ, ঐশ্বর্যশালী ও অত্যন্ত জনপ্রিয় এই লোকনাট্যটি আজ প্রয় অবলুপ্তির পথে। এর প্রধান কারণ মানুষের রুচিবোধের বদল, আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন, প্রযুক্তি নির্ভর সভ্যতার দ্রুত অগ্রগতি এবং সর্বোপরি মানুষের নিজ সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা ও হীনমন্যভাব। তবুও আশার কথা এই যে, যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার এই যুগেও কিছু শিল্পী এখনও মানুষের সাথে সরাসরি সংযোগকারী লোকশিক্ষার হাতিয়ার আলকাপকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের মনের তাগিদে, প্রাণের তাগিদে। আজকের আধুনিক থিয়েটারেও আলকাপ বিষয়ক

নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসের স্রষ্টা সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ ঝাঁকসু সর্দারের নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তাঁরই অভিজ্ঞতার ফসল 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাস। এই উপন্যাসে ঝাঁকসু সর্দারের জীবনের নানা স্তর উঠে এসেছে। আলকাপের বৈশিষ্ট্যগুলি ডানা মেলেছে উপন্যাসের শরীরে। পাশাপাশি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে আলকাপ শিল্পীদের দুঃখযন্ত্রণা, হতাশা-অনুশোচনা, সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালোবাসা, মান-অভিমান, বিরহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদি দিকগুলি ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাস অবলম্বনে 'মায়া' নাটক প্রযোজনা করে দর্শক হৃদয় জয় করে নিয়েছিল বহরমপুর রেপার্টারি থিয়েটার। প্রদীপ ভট্টাচার্যের অসাধারণ মুন্সীয়ানায় 'মায়া' নাটকটি লোকনাটকের মাইল ফলক হয়ে আছে। সম্প্রতি 'মায়ামৃদঙ্গ' নামে দমদম শব্দমুগ্ধ নাট্যসংস্থা রাকেশ ঘোষের নির্দেশনায় অভিনয় করেছে। 'মায়ামৃদঙ্গ' উপন্যাসকে কেন্দ্রে রেখে মালদা মালঞ্চ মঞ্চস্থ করেছে 'আলকাপ মায়া'। রচনা ও পরিচালনা পরিমল ত্রিবেদী। বারাকপুর নীহারিকা নাট্যসংস্থার 'বিষয়ের বিষ' নাটকটি আলকাপ আঙ্গিকে লেখা। রচনা শ্যামসুন্দর বসু, পরিচালনা অসীম কর্মকার। এই মুহূর্তে চাকদহ নাট্যজন আলকাপ আশ্রিত একটি নাটক করছে 'কমলি কথা' নামে। রচনা দীপক নায়েক, নির্দেশনা রাহুল দেব ঘোষ। মালদহ মালঞ্চের আলকাপ মায়াতে 'ছকড়ি' চরিত্রে নারী অভিনেত্রী অভিনয় করছে। অন্যান্য প্রযোজনাগুলিতে 'ছকড়ি' চরিত্রে পুরুষরা অভিনয় করছে। প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া এই কোলাজ নাট্যশিল্পটি এক সময়ে গ্রামগঞ্জে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষজনকে তাঁদের একঘেঁয়ে দৈনন্দিনতার মাঝে কিছুটা অবকাশ দিত। আজ এই সময়ের সাধারণ শহুরে থিয়েটার দর্শকদের কাছে আমাদের দেশজ বিপন্ন নাট্যশিল্পটি নতুনভাবে পরিচিতি পাচ্ছে— এটাই আশার কথা।

**তথ্যসূত্র ঃ**

১. বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, রচনা সমগ্র, ২য় খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, পৃ ৫৮-৫৯

**সহায়ক গ্রন্থ ঃ**

১. ঝা শক্তিনাথ, 'আলকাপ', লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১ম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০১০
২. ড. পাল ফণী, 'বাংলার লোকনাটক', ১ম সংস্করণ, বলাকা ২০১৫
৩. শর্মা শিব, সম্পাদক, 'গ্রুপ থিয়েটার' পত্রিকা, বিশেষ লোকনাট্য সংখ্যা, ৪০ বর্ষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা, ২০১৮
৪. ঘোষাল ধনঞ্জয়, সম্পাদক, 'বলাকা', ২৭ বর্ষ, সংখ্যা ৩৬, ফেব্রুয়ারি ২০১৮

লেখক ঃ **অহীনা দে,** ছাত্রী (স্নাতকোত্তর, বাংলা বিভাগ) প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

# পশ্চিমবঙ্গের নাট্যচর্চায় 'স্পেস -থিয়েটার'

অন্তরা দাস

বাংলা লোকনাট্যের ধারাকে আলাদা করে রাখলে আমরা দেখতে পাই বাংলা নাট্যচর্চার ধারা প্রবাহিত হয়েছে 'মঞ্চকে' আশ্রয় করে। বিগত দুই শতকের বাংলা নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে নাট্যমঞ্চের যে পরিকল্পনা তা প্রধানত প্রসেনিয়াম মঞ্চকেই অনুসরণ করে চলেছে। চরিত্রগত দিক থেকে প্রসেনিয়াম মঞ্চ স্থবির এবং পরিমিত। তার স্পেস পূর্বনির্ধারিত। তিনদিক বন্ধ চৌকস নাট্যক্ষেত্রের এই অবরোধকে মুক্ত করার প্রয়াস বহুদিন ধরে চলে আসছে। কখনো মঞ্চের মধ্যে নির্মাণ করা হয়েছে বিরাট যুদ্ধ জাহাজ (কল্লোল), কখনো মঞ্চের মধ্যে হাজির হয়েছে সত্যিকারের ট্যাক্সি (পটলবাবু ফিল্মস্টার), কখনো মঞ্চের সীমানাকে অতিক্রম করে দর্শকাসন পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে র‍্যাম্প (তিস্তা পারের বৃত্তান্ত), কখনো মঞ্চের মধ্যে প্রজেক্ট করা হয়েছে ভিডিও (সিনেমার মতো), কখনো মঞ্চের মধ্যে দেখানো হয়েছে সত্যিকারের বৃষ্টিপাত (বোমা), কখনো আবার দর্শকাসন থেকেই অভিনয় করতে দেখা গেছে নাটকের কুশীলবদের (মেফিস্টো)। এমন আরও অনেক উদাহরণ নিশ্চয়ই অনেকের জানা, তবু এতকিছুর পরও প্রসেনিয়াম মঞ্চের নির্দিষ্ট স্পেসকে মুক্ত করতে পারেনি মুখ্যধারার বাংলা নাটক।

স্থান যখন পূর্বনির্ধারিত এবং স্পেস যখন নির্দিষ্ট হয় তখন তার মধ্যে তৈরি হয় এক ধরনের অবরুদ্ধ অবস্থা। প্রসেনিয়াম মঞ্চের যে স্পেস তা শুধু নির্দিষ্টই নয়, দর্শকের থেকে বিভাজিতও। এখানে দর্শক এবং অভিনেতা নির্ধারিত দূরত্বে অবস্থান করে। একদিকে স্পেসের সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদিকে দর্শক আর মঞ্চের স্থানিক দূরত্ব- এই দুই অবরোধকে সরিয়ে ফেলার জন্যই জন্ম হয় নন-প্রসেনিয়াম থিয়েটারের। নাটককে প্রসেনিয়াম মঞ্চের বাইরে নতুন স্পেসে নিয়ে যাওয়ার প্রথম প্রয়াস দেখা যায় নবীনচন্দ্র বসুর সৌজন্যে। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি শ্যামবাজারের বাড়িতে উপস্থাপন করেন 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক। নির্দিষ্ট মঞ্চের পরিবর্তে বাড়ির বিভিন্ন জায়গা জুড়ে প্রদর্শিত হয় নাটক। নাটকের প্রয়োজনে খোঁড়া হয় সুড়ঙ্গ পথ। দর্শক বাড়ির বৈঠকখানা, বাগানের বকুলতলা প্রভৃতি স্থান ঘুরে ঘুরে দেখেন নাটকের বিভিন্ন অংশ-

Yet Nabin Babu had no stage in his house like the one of the present day and the audience had therefore to move several times to different places to witness different scenes. The scene of Sundara seated on die banks of a tank under a Bakul tree was shown in the tank within the garden of Nabin Babu. The stately council chamber of Beersingh the Raja of Burdwan was shown in his drawing room and the thatched

cottage of Malini (female gardener) in another part of the house. Earth was dug to show the underground tunnel leading from Malini's house to the interior of the Rajah's palace.[১] এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক দর্শন চৌধুরী তাঁর 'বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন- " শোনা যায়, শান্তিপুরে চৈতন্যদেব দানলীলার অভিনয়ে প্রকৃতির বাস্তব পটভূমিকা ব্যবহার করেছিলেন। ভাগরথী নদীর তীরে অভিনয় কালে, মাঠে গাভী চরানো, নদীতে জল-বিহার, প্রকৃত কদম্ববৃক্ষ, দধিদুগ্ধ, লুন্ঠন, সবই অনুষ্ঠিত হতো।"[২] নবীন বসুর প্রদর্শিত পথে নাট্য প্রযোজনার এই ধারা অব্যাহত থাকেনি। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে বাংলা নাট্যচর্চা প্রবাহিত হয়েছে সেই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের পথ ধরেই।

বিংশ শতকের ছয়ের দশকে বাদল সরকার তাঁর নাট্য-উপস্থাপনাকে মঞ্চ থেকে টেনে নামিয়ে আনলেন রাস্তায়, জনতার মাঝখানে। বাংলা নাটকের নন-প্রসেনিয়াম ধারাটি তাঁর উৎসাহ আর উদ্দীপনায় গতি লাভ করল। তাঁর 'থার্ড থিয়েটার' -এর দর্শন প্রভাবিত করল বাংলা নাট্যশিল্পীদের। বাংলা নাট্যচর্চায় 'স্পেস' নিয়ে শুরু হল নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। শুরু হল প্রসেনিয়াম মঞ্চ থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে দর্শকদের সঙ্গে দূরত্ব কমানোর নানান আয়োজন। বাংলা নাট্যচর্চায় আমরা শুনতে পেলাম 'ইন্টিমেট থিয়েটার', 'জার্নি থিয়েটার', 'রুফ-টপ থিয়েটার', 'ইনভিজিবল থিয়েটার' ইত্যাদি শব্দবন্ধ। সাম্প্রতিক যে শব্দবন্ধটি ক্রমশ জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে তা হল 'স্পেস থিয়েটার'। কিন্তু সমস্যা হল এই শব্দবন্ধটি অন্যগুলির মতো নির্দিষ্ট অর্থকে ইঙ্গিত করে না, কেননা চরিত্রের দিক থেকে 'স্পেস থিয়েটার' নন-প্রসেনিয়াম থিয়েটারেরই অঙ্গ। আর নন-প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মূলে আছে নাটক অনুযায়ী 'স্পেস'-কে আবিষ্কার এবং প্রয়োগ করার স্পর্ধা। তাহলে কি এই 'স্পেস থিয়েটার' শব্দবন্ধটি নাটকের কোনো বিশেষ দর্শন অথবা আঙ্গিককে নির্দেশ করতে চায় ? এর উত্তর আমাদের জানা নেই। এখন আমরা এর উত্তরের সন্ধান করব। তবে তার আগে 'স্পেস' শব্দটিকে আমরা একটু জেনে ও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। দেখব নাট্যচর্চায় 'স্পেস' বলতে আসলে কোন বিষয় বা ভাবনাকে নির্দেশ করা হয়।

পিটার ব্রুক তাঁর 'দ্যা এমটি স্পেস' গ্রন্থে বলেছেন: I can take my empty space and call it a bare stage. A man walks across this empty space whilst someone else is watching him, and this is all that is needed for an act of theatre to be engaged. "[৩] একটি শূন্যস্থানের উপর দিয়ে একজন হেঁটে গেলে আর তাকে কেউ একজন দেখলেই থিয়েটার হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ থিয়েটার হয়ে ওঠার জন্য অভিনেতা এবং দর্শকের মতোই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 'স্পেস' । তিনি স্পেসকে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আত্মস্থ করার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন স্পেসের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে , বলেছেন সামগ্রিকভাবে স্পেসকে যাপন করতে- Move through the space, explore it in different ways. Feel it, look at it, speak to it, run it, listen to it, make

sound with it, play music with it, embrace it, smell it, lick it, etc. Let the space do things to you: embrace you, hold you , move you , push you around, lift you up, crush you, etc. let sounds come out of you in relation to the space-to-its volumes, rhythms, texures, materials. Walk through the space, run, roll, somersault, swim, fly.[8]

প্রাবন্ধিক এবং নাট্যশিল্পী প্রবীর গুহ তাঁর 'সহজিয়া থিয়েটার' গ্রন্থের একটি সম্পূর্ণ অধ্যায় জুড়ে বলেছেন স্পেসের কথা। তাঁর প্রবন্ধ অনুযায়ী স্পেস হল এক অনন্ত শূন্য। স্পেসের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু অবস্থান করে সে সব নিয়ে নির্ধারিত এবং সংজ্ঞায়িত করা হয় স্পেসকে। মানুষের মধ্যে যে সৃজনশীলতা আছে, তা নিয়ে সে আদিমকাল থেকে স্পেস বানিয়ে চলেছে। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের জন্য গড়ে তুলেছে আলাদা আলাদা স্পেস। সেই সঙ্গে নিজের মতো করে সাজিয়ে তুলেছে ভিন্ন ভিন্ন স্পেসকে। এই সূত্রে স্পেসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ডিজাইন। ডিজাইনকে সৃজনশীল আর নান্দনিক করে তোলা হয়েছে ব্যালেন্সের মাধ্যমে। থিয়েটারের স্পেস সম্পর্কে তিনি বলেছেন-" আমাদের চলতি থিয়েটার স্পেসগুলোও প্রায় সবসময়ে ভরা। নতুন করে ভরার জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। ..থিয়েটারের জন্য একটা নিউট্রাল এম্পটি স্পেস প্রয়োজন। এই স্পেস আমাদের ক্রিয়েট করতে হবে। "[৫] এই স্পেস নির্দিষ্ট, সাজানো এবং পূর্ব নির্ধারিত হলে চলবে না, তাকে হতে হবে 'এম্পটি'। " একটি সাজানো নির্দিষ্ট স্পেস নয়, চাই শূন্য থেকে ভরাট হওয়া দেখতে। যেমন আমাদের লোকাচারে হয়। ... যদি তথাকথিত কোনো স্পেসে আটকে না গিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত স্পেসের খোঁজ করে চলি নতুনভাবে, তবে আর সব রিহার্সাল এক থাকতে পারে না। স্পেস অনুযায়ী যদি রিহার্সাল ইম্প্রোভাইজ করা যায়- পারফরমেন্স নয় কেন!"[৬]

আমরা বুঝতে পারলাম 'স্পেস ' নাট্যশিল্পের এমন এক উপাদান যার মধ্যে নিহিত থাকে মৌলিক সৃজনের অনন্ত সম্ভাবনা। একটি নতুন এবং অব্যবহৃত স্পেসের সান্নিধ্যে অভিনেতা খুঁজে পেতে পারেন চরিত্রের অনাবিস্কৃত স্তরগুলি। পরিচালক, নাট্য উপস্থাপনায় যুক্ত করতে পারেন পারিপার্শ্বিকের নতুন মাত্রা। যিনি আলোক সম্পাত করেন, যিনি নাটকের জন্য মঞ্চসজ্জা করেন অথবা যিনি নাটকের জন্য আবহ সঙ্গীত নির্মাণ করেন প্রত্যেকের কাছেই স্পেস হয়ে উঠতে পারে সৃজনের আবশ্যিক অনুপ্রেরণা। স্পেস সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা যাঁদের অভিমতকে উপস্থাপন করেছি, তারা প্রত্যেকেই নন-প্রসেনিয়াম থিয়েটারের চর্চা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। 'স্পেস' সম্পর্কে তাঁদের আলোচনার অভিমুখ মূলত প্রসেনিয়াম -থিয়েটারের বহুব্যবহৃত এবং অবরুদ্ধ স্পেস থেকে সরে নন-প্রসেনিয়ামের মুক্ত প্রাঙ্গণের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। প্রসেনিয়াম থিয়েটার চর্চায় স্পেসের আলোচনা খুব একটা প্রাধান্য পায় নি। প্রধানত মঞ্চের দ্বিমাত্রিক পরিসর ও তার বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের মধ্যেই সেই আলোচনা ঘোরাফেরা করেছে।

এবার আমরা আসব 'স্পেস থিয়েটার'-এর আলোচনায়। জানতে চেষ্টা করব

সম্প্রতি বাংলা থিয়েটার চর্চায় 'স্পেস থিয়েটার' শব্দবন্ধটি কি বিশেষ কোনো নাট্য-আঙ্গিক বা নাট্যদর্শনকে নির্দেশ করতে চায়? প্রথমেই বলা দরকার এখনো পর্যন্ত 'স্পেস থিয়েটার' -এর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা গড়ে ওঠেনি, তবে 'স্পেস থিয়েটার' হিসাবে বিশেষ নাট্য -উপস্থাপনাকে চিহ্নিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাহলে সেই বিশেষ নাট্য উপস্থাপনাগুলি কীরকম? 'স্পেস থিয়েটার' হিসাবে উপস্থাপিত নাটকগুলি প্রদর্শিত হয় অনির্দিষ্ট স্পেসে। এখানে দর্শক আর অভিনেতার মধ্যে স্থানিক -দূরত্বকে মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়। নাটক উপস্থাপনে সামগ্রিক স্পেস-কে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়। দর্শককে নাটক দেখার জন্য প্রসেনিয়াম-মঞ্চের মতো নির্দিষ্ট অভিমুখে স্থান গ্রহণ করতে হয় না। সাধারণত মঞ্চ সজ্জার আতিশয্য বর্জিত হয় এবং স্থানের নিরিখে যা সহজলভ্য তাকেই নাটকের প্রয়োজনে সৃজনাত্মক দক্ষতায় ব্যবহার করা হয়, ইত্যাদি।

কিন্তু এই সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তো আমরা নন-প্রসেনিয়াম থিয়েটার ধারার বিভিন্ন নাট্য-উপস্থাপনাতেও দেখতে পাই। তাহলে 'স্পেস থিয়েটার' বলতে প্রকৃত অর্থে কী বোঝানো হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে ড. সুপ্রিয় কাঞ্জিলালের সৌজন্যে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম বাংলার ছয়জন বিশিষ্ট নাট্যজন তথা নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে। যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে প্রধানত নন-প্রসেনিয়াম ধারার নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত, অনেকে নাটচর্চা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নির্মাণ করেছেন নিজস্ব স্পেস। এই নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে টেলিফোন মারফত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছে 'স্পেস থিয়েটার' সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিমত। প্রত্যেকেই সাক্ষাৎকার পর্বটি রেকর্ডিং করার এবং তাঁদের অভিমতকে এই প্রবন্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। আমরা পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকের অভিমতকে উপস্থাপন করব। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে 'স্পেস থিয়েটার' সম্পর্কে তাঁরা যা বলতে চেয়েছেন এখানে তার সারমর্মটি অনুলিখিত হল:

## প্রবীর গুহ

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার মধ্যমগ্রামে নাট্যচর্চার জন্য নির্মাণ করেছেন" Alternative Living Theatre"। ২০০৮ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন, নাট্যচর্চা করেছেন বাদল সরকার, Jerzy Grotowski, Peter Brook, Richard Schchener প্রমুখ বিখ্যাত নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে।

প্রবীর গুহ 'স্পেস থিয়েটার' শব্দবন্ধকে স্বীকৃতি দিতে রাজি নন। তিনি মনে করেন 'স্পেস থিয়েটার' বলে কিছু হয় না। নাটকে অভিনয়ের জন্য স্পেসকে নিজের মতো করে ব্যবহার করা হয়। যে নাটকগুলি প্রসেনিয়ামে হয় সেখানেও তো স্পেস রয়েছে, রাস্তায় হয় যে নাটক সেখানেও রয়েছে স্পেস, ঘরের মধ্যে গাছের উপর বা জলের মধ্যে যদি নাটক হয় সেখানেও থাকবে স্পেস। এক একটি নাটকের এক-এক রকমের স্পেস প্রয়োজন। তাই নাটকের অভিমুখ অনুযায়ী একটা স্পেসকে নির্বাচন করা দরকার। নাট্যকার নিজের রুচি

এবং শৈল্পিক বিচার অনুযায়ী এই স্পেসকে ব্যবহার করেন। তাঁদের নাট্য-দর্শন এখানে গুরুত্বপূর্ণ।[৭]

**জুলফিকার জিন্না**

বীরভূম জেলার নাট্যজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। 'আমরা সবুজ' নাট্যদল এবং 'নিভৃত পূর্ণিমা' নাট্যগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন নন-প্রসেনিয়াম ধারার নাট্যচর্চার সঙ্গে। উল্লেখযোগ্য কীর্তি : চর্যাপদের কবি, নক্সী কাঁথার মাঠ, হায় ধর্ম (নাটক) নাটক নয়, রাষ্ট্রব্যাধির উপসর্গ(গ্রন্থ)।

জুলফিকার জিন্না মনে করেন, অভিনয় শিল্পের জন্য সবচেয়ে জরুরি হল একজন অভিনেতার শরীর, মন এবং স্পেস। থিয়েটার সম্পর্কে আমাদের প্রথাবদ্ধ ধারণা অনুযায়ী স্টেজকে ফিক্সড ধরা হয়। স্টেজের একটা নির্দিষ্ট অবয়ব আছে। এর মধ্যে একজন অভিনেতা অভিনয় করেন। ফলে অভিনেতা নির্দিষ্ট একটা স্পেসের মধ্যে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করেন। একজন অভিনেতা, যখন ইচ্ছা মতন স্পেসকে ব্যবহার এবং আবিষ্কার করতে পারেন, তখন তাকে স্পেস থিয়েটার বলতে পারি। তিনি মনে করেন, এক অর্থে সমস্ত থিয়েটারই স্পেস থিয়েটার, কারণ প্রত্যেকটা থিয়েটারই একটা নির্দিষ্ট স্পেসে অভিনীত হয়। তবে এর রকম-ফের আছে। প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মধ্যে যে মঞ্চমায়া আছে, নন-প্রসেনিয়াম থিয়েটার তার পরিপূরণ করবে কিভাবে? নন-প্রসেনিয়াম থিয়েটার নিজস্ব মায়া ও আকর্ষণ নির্মাণ করবে স্পেসকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে। স্পেস থিয়েটার নন-প্রসেনিয়াম থিয়েটার-দর্শনেরই অংশ। বলা যেতে পারে নন- প্রসেনিয়াম থিয়েটারের পরিমাণগত বিস্তার।[৮]

**পার্থ গুপ্ত**

'Birbhum Blossom Theatre' এর প্রতিষ্ঠাতা, বীরভূমের দারোন্দা গ্রামে নাট্যচর্চার জন্য গড়ে তুলেছেন থিয়েটার কটেজ, নাটক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভারত সরকারের তথ্য-সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক নাট্যক্ষেত্রে জুনিয়র ফেলো হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন।

পার্থ গুপ্ত 'স্পেস-থিয়েটার' বলে কোনো শব্দবন্ধে বিশ্বাসী নন। তিনি মনে করেন, ক্যানভাস একজন চিত্রশিল্পীর কাছে যেমন একটা চ্যালেঞ্জ, একজন অভিনেতার কাছে স্পেসটাও ঠিক তাই। থিয়েটারের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল স্পেস। থিয়েটার তাঁর কাছে একটি 'আর্টফর্ম'। তিনি বিশ্বাস করেন প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো 'আর্ট'-এর চর্চা হতে পারে না। 'বিকল্প থিয়েটার', 'অরগ্যানিক থিয়েটার' বা 'স্পেস থিয়েটার' এই কথাগুলোর কোনো অর্থ হয় না।[৯]

**সুব্রত ঘটক**

সাঁইথিয়া ভবানীপুর সপ্তপদীপ সংস্কৃতি সোসাইটি-র প্রতিষ্ঠাতা। ময়ূরাক্ষী নদীর

তীরে গড়ে তুলেচেন অপরূপ নাট্যক্ষেত্র। উল্লেখযোগ্য কীর্তি : দহনকাঁটা, জয়া, বোলান ফিরবে, কাঙাল ডোম (নাটক) । স্পেস একজন নাট্যপরিচালক বা অভিনেতার মানসিকতার ওপরে নির্ভর করে। তাঁরা কখন, কীভাবে একটা স্পেসকে ব্যবহার করবেন এটা তাঁদের ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, একটা নির্দিষ্ট স্পেসকে নিজের ভাবনা অনুসারে ব্যবহার করে স্পেস উপযোগী বক্তব্য তৈরি করা হয়, অর্থাৎ নাটক যখন সেই স্পেসের সাপেক্ষে তৈরি হয় তখন তাকে স্পেস থিয়েটার বলা যেতে পারে। তিনি মনে করেন 'স্পেস থিয়েটার' এই নামটা অবশ্যই ব্যবহার করা যায়। তবে তাকে সংজ্ঞায়িত করার ভাষা তাঁর কাছে নেই। [১০]

**দেবাশীষ ঘোষ দস্তিদার**

'বেলঘরিয়া হাতেখড়ি' দলের অন্যতম সক্রিয় সদস্য। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের উপস্থাপনা করেছেন রাজ্যের বিভিন্ন নন- প্রসেনিয়াম স্পেসে। উল্লেখযোগ্য কীর্তি: ইটসি-বিটসি, কিউমূলো নিম্বাস, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(নাটক) ।

দেবাশীষ ঘোষ দস্তিদার 'স্পেস থিয়েটার' কথাটি ব্যবহার করেন না। তিনি প্রসেনিয়াম এবং নন-প্রসেনিয়াম টার্মগুলি ব্যবহার করেন। তাঁর কাছে প্রত্যেকটা জায়গাই স্পেস। প্রসেনিয়ামের স্টেজ হোক বা স্টেজ ছাড়া নন-প্রসেনিয়াম হোক সব জায়গাকেই তিনি স্পেস হিসাবে মনে করেন। নাটকের প্রয়োজনে তিনি যেকোনো স্পেসকে নিজের মতো করে ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া আলাদা করে স্পেস-থিয়েটার বলে কিছু বোঝেন না।[১১]

**রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী**

'আসানসোল চর্যাপদ' দলের প্রতিষ্ঠাতা। নাটক নিয়ে পড়াশোনা করেছেন বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'লজ্জা' নাটকের জন্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী মনে করেন যে-কোনো থিয়েটারই আসলে স্পেস-থিয়েটার। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের নিজস্ব ব্যাকরণ রয়েছে, কিন্তু এখন যাকে স্পেস-থিয়েটার বলা হচ্ছে, তার কোনো ব্যাকরণ গড়ে ওঠেনি। প্রসেনিয়াম মঞ্চের মধ্যে যে -স্পেস আছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। সেই স্পেসকে ব্যবহার করাটাও তো স্পেস নিয়ে চর্চা করা। অনেক ক্ষেত্রে স্পেস থিয়েটার নামে যা উপস্থাপিত হচ্ছে, হয়তো সেটা কোনো মুক্ত প্রাঙ্গণে হচ্ছে, কিন্তু উপস্থাপনার সময় সেটি প্রসেনিয়াম মঞ্চের অভ্যাসকেই অনুসরণ করছে। তাহলে তাকে স্পেস থিয়েটার বলা কি সঙ্গত হবে? তিনি তখনই কোনো থিয়েটারকে 'স্পেস থিয়েটার' হিসাবে মেনে নেবেন, যখন কোনো বিশেষ স্থানের উপাদানগুলিকে নাটকের মধ্যে যথাযথ ব্যবহার করা হবে, স্থানের নির্যাসকে জারিত করা হবে নাটকে এবং সর্বোপরি স্পেস যখন নিজেই হয়ে উঠবে একটি চরিত্র।[১২]

এই ছয় জন নাট্যব্যক্তিত্বের অভিমত থেকে আমরা স্পেস-থিয়েটার সম্পর্কে একটা ধারণা অর্জন করতে পারি । মানতে অসুবিধা নেই যে, পরিসংখ্যানের বিচারে ছয় সংখ্যাটি খুবই নগন্য, কিন্তু যাঁদের অভিমত এখানে উপস্থাপিত হল, তারা দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে নিরন্তর নাট্য-চর্চা করে চলেছেন। নিজেদের প্রযোজনা নিয়ে ঘুরেছেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। বিদেশেও গিয়েছেন কেউ কেউ। বিভিন্ন সেমিনার এবং ওয়ার্কশপে নাট্যভাবনার নিয়মিত আদান-প্রদান করে চলেছেন সকলে। সে কারণেই নিজের অঞ্চলের বাইরে নাট্যচর্চার গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যারা অবগত, এই দিকটিকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা প্রত্যেকের অভিমতকে গুরুত্ব দিতে পারি এবং তার ভিত্তিতে 'স্পেস থিয়েটার' বিষয়ক ভাবনাগুলিকে এইভাবে বিন্যস্ত করতে পারি-

* বর্তমানে বাংলা নাট্য-উপস্থাপনায় 'স্পেস থিয়েটার' শব্দবন্ধের বহুল ব্যবহার ঘটলেও, 'স্পেস -থিয়েটার' বলে নতুন কোনো নাট্যদর্শন বা নাট্য-আঙ্গিকের অস্তিত্ব নেই।
* 'স্পেস থিয়েটার' নন-প্রসেনিয়াম ভাবনায় উপস্থাপিত নাট্য প্রযোজনারই অংশ, বলা যেতে পারে নন-প্রসেনিয়াম ভাবনার পরিমাণগত বিস্তার।
* থিয়েটার হয়ে ওঠার জন্য 'স্পেস' একটি অনিবার্য উপাদান। এই অর্থে প্রতিটি থিয়েটারই আসলে 'স্পেস থিয়েটার'।
* থিয়েটার যদি 'স্পেস' - এর সাপেক্ষে নির্মিত হয়, 'স্পেস' যদি অনিবার্য চরিত্র হয়ে উঠতে পারে থিয়েটারের, তাহলে তাকে 'স্পেস থিয়েটার' হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।
* 'স্পেস থিয়েটার' হিসাবে যা ব্যক্ত করতে চাওয়া হচ্ছে তার সংজ্ঞা এবং ব্যাকরণ এখনো নির্মিত হয়নি।

তাহলে শেষ পর্যন্ত আমরা 'স্পেস থিয়েটার' সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবো? কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় এখনো হয়নি। 'স্পেস থিয়েটার' নিয়ে থিয়েটারের মানুষ-জনই যখন একটি সিদ্ধান্তের উপত্যকায় পৌঁছাতে পারছেন না, সকলে মিলে সমস্বরে স্বীকার বা অস্বীকার করতে পারছেন না। তখন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে আরেকটু অপেক্ষা করা দরকার। একটি শব্দ বন্ধকে ব্যবহার করে কিছু একটা ব্যক্ত করার প্রয়াস করা হচ্ছে, তখন সেই শব্দ-বন্ধের নিশ্চিত একটি অভিমুখ অছে। নির্দিষ্ট একটি অর্থের কাছে উপনীত হওয়ার প্রচেস্টা অছে। আমাদের সেই সময়টুকু দেওয়া দরকার।

**তথ্যসূত্র :**

১. Das Gupta, Hemendra Nath, The Indian Stage, Metropolitan Printing & Publishing House, Ltd. 56, Dharmatala Street, Calcutta, Page`286
২. চৌধুরী, দর্শন, বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ৭০০০০৯, দ্বিতীয়

সংস্করণ, ১ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৭৫
৩. Brook, Peter The Empty Space, Touchstone, Rockefeller Center, 1230 Avenue of the Americas, NewYork, NY 10020, First Touchstone Edition, 1996, Page: 7.
৪. Schechner, Richard, Environmental Theater, Applause Theatre & Cinema Books, 19 West 21st Street, Suite 201, New York, ny10010, New expanded edition, 1994, Page:12
৫. গুহ, প্রবীর, সহজিয়া থিয়েটার, প্রথম প্রকাশ, মৌহারি প্রকাশনী, ৫১ সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর, কলকাতা-৭০০০৩২, পৃষ্ঠা : ১৯৩।
৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯৫।
৭. কাঞ্জিলাল, সুপ্রিয়, সাক্ষাৎকার, httpa://archive.org/details/space-theatre, (০১ মিনিট ২৯ সেকেন্ড - ০৫ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড)
৮. তদেব, (০৬ মিনিট ০১ সেকেন্ড - ২০ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড)
৯. তদেব, (২০ মিনিট ৫৩ সেকেন্ড - ২৩ মিনিট ৫১ সেকেন্ড)
১০. তদেব, (২৩ মিনিট ৫২ সেকেন্ড - ২৬ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড)
১১. তদেব, (২৭ মিনিট ৪৩ সেকেন্ড - ৩১ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড)

লেখক ঃ **ড. অন্তরা দাস,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

# নতুন ইহুদী: উদ্বাস্তু জীবনের কথকতা

**কৌশিক কর্মকার**

১৯৫৩ সালের পয়লা মে প্রকাশিত সলিল সেনের নাটক নতুন ইহুদী। প্রকাশকালের সাত দশক পরেও নাটকটির বিষয়বস্তু সমান প্রাসঙ্গিক; নাটকের চরিত্রগুলিও সমান প্রাণবন্ত। চরিত্রগুলি যেন এখনও বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে সমানভাবে ক্রিয়াশীল। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মনমোহন ভট্টাচার্য; পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত একটি মাধ্যমিক স্কুলের ভি এম পাশ পন্ডিত; যিনি স্কুলে সংস্কৃত পড়াতেন। পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তরিত হওয়ার পর পন্ডিতমশাইয়ের বিষয় হয়ে যায় অনাকাঙ্খিত; কারণ তাতে বিশেষ ধর্মের প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে। এহেন এক সংস্কৃত শিক্ষকের কর্মচ্যুত হয়ে নিতান্ত কপর্দকশূন্য অবস্থায় দেশত্যাগ এবং উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে চূড়ান্ত বিপন্নতার মধ্যে অসহায় মৃত্যুবরণ নাটকের মূল কাহিনিবস্তু। মনমোহন ভট্টাচার্য বুঝতে পেরেছিলেন তিনি শিক্ষকসুলভ সম্মানের সঙ্গে পাকিস্তানের মাটিতে বসবাস করতে পারবেন না; তাঁর ভাবনা যে কতখানি দূরদর্শী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘু শিক্ষকদের সঙ্গে সংঘটিত ঘটনাবলীতে। পূর্ব পাকিস্তান বহু লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ হয়েছে, কিন্তু যে আদর্শগত ভিত্তির উপর বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছিল সেই আদর্শের মূলে প্রাত্যহিক আঘাত হেনে চলেছে এক শ্রেণির মৌলবাদী গোষ্ঠী; যার নির্মম শিকার বর্তমান বাংলাদেশের সংখ্যালঘু শিক্ষককুলসহ আপামর সংখ্যালঘু জনগণ। একেবারে সাম্প্রতিককালের দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলে তার ভয়াবহতার স্বরূপ অননুমেয় থেকে যায়। গত ১৮ জুন ২০২২ পুলিশ-প্রশাসনের উপস্থিতিতে নড়াইল সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনাইটেড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন কুমার বিশ্বাসের গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেয় সংখ্যাগুরু মৌলবাদী গোষ্ঠী; উক্ত শিক্ষকের অপরাধ তিনি তাঁর ছাত্রকে দুর্বৃত্ত বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।[১] ২৫ জুন ২০২২ ঢাকার উপকণ্ঠে সাভারের ইউনুস আলী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক উৎপল কুমার সরকারকে সর্বসমক্ষে পিটিয়ে হত্যা করে দশম শ্রেণির ছাত্র।[২] আরেক শিক্ষক হৃদয় মন্ডলকে দীর্ঘদিন কারাগারে কাটাতে হয় ধর্ম ও বিজ্ঞানের পার্থক্য বোঝানোর জন্য; পরিকল্পিতভাবে তাঁকে ফাঁসানো হয়।[৩] বর্তমান বাংলাদেশে শিক্ষক নিগ্রহের সার্বিক চিত্রটি ঠিক এমনই । যা সংগত কারণেই মনমোহন পন্ডিতের দেশত্যাগের কারণটিকে উস্‌কে দেয়।

নতুন ইহুদী নাটকের নামকরণও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। নামকরণ সম্পর্কে নাট্যকারের ব্যাখ্যাটি এরূপ: 'ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের সমস্যা বেদনা নিয়ে এই নাটক। নামটা ইচ্ছে করে 'নতুন ইহুদী' রেখেছিলাম। কিছুটা প্রতীকী। হিটলারের অত্যাচারে যেমন জার্মানি থেকে

ইহুদীদের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। ঠিক সেইরকমই অত্যাচারের মুখোমুখি হতে হয় পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচারিত মানুষদের। তাই নাটকের নাম 'নতুন ইহুদী'। ইহুদি জাতি, যারা আজন্ম উদ্বাস্তু, যাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণহত্যা, তারা শেষাবধি যে সময়ে নিজেদের ভূখন্ড খুঁজে পেয়েছিল, দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঠিক সেই সময় থেকেই সূত্রপাত ঘটে বাঙালি হিন্দুর উদ্বাসন যাত্রার। দেশভাগের অব্যবহিত পূর্ব বর্তীকালে ১৯৪৬ সালে সংঘটিত নোয়াখলি গণহত্যার সময় থেকে বাঙালি হিন্দুর পশ্চিমবঙ্গ-আসাম-ত্রিপুরা পানে অভিপ্রয়াণের সূচনা ঘটে; এরপর ১৯৪৭ সালে দেশভাগ, ১৯৫০ সালে ঢাকা-বরিশাল-খুলনা জেলার গণহত্যা এবং যার জেরে পূর্ববঙ্গের নিম্নবর্ণের নেতা তথা পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলের পদত্যাগ, উচ্চবর্ণের পাশাপাশি নিম্নবর্ণীয়দেরও উদ্বাসনের পথ সুগম করে দেয়। নাটকের প্রথম দৃশ্যে লক্ষ করা যায় গ্রামের 'মুখুইজ্যা', 'পাল' ইত্যাদি পদবির 'ভদ্দর লোকেরা' বাস্তুভিটে ত্যাগ করেছে; 'নম ঘরের' একমাত্র কেস্ট ও তার গিন্নিও তাঁদের মনমোহন ভট্টাচার্যের পরিবারের বদান্যতায়। অনতিবিলম্বে ভট্টাচার্যরা দেশ ত্যাগ করলে 'নম ঘরের' কেস্ট ও তার গিন্নিও তাঁদের অনুসারী হয়। কেস্ট ও তার গিন্নির একমাত্র ভরসাস্থল ভট্টাচার্য পরিবার; তারা কেবল নিজেদের তাঁদের সঙ্গে জুড়ে দিতে চায়। উচ্চবর্ণের সকলে একে একে দেশ ত্যাগ করলে সংখ্যাগুরুর পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু যে সেই-ই হবে, এ বিষয়ে নিঃসংশয়। অথচ স্বাধীনতা-পূর্ব সময় থেকেই উচ্চবর্ণের থেকে নিম্নবর্ণকে পৃথক করে দেওয়ার একটি সুপরিকল্পিত প্রকল্প রচিত হয়েছিল। আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সেই প্রকল্প হয়ে উঠেছিল বিশ্বাসযোগ্য। নিম্নবর্ণের, নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষেরা বিশ্বাস করেছিল এই ভেদনীতি। সংখ্যাগুরু কৃষিজীবীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তারা সমর্থন করেছিল লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব। তাদের অবিসংবাদিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলও তাদের পাকিস্তান ত্যাগ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৫] কিন্তু পরবর্তীকালে যখন তারা ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে আক্রান্ত হতে থাকে, তখন তারা অনুধাবন করে তারা প্রতারিত হয়েছে; এক বিরাট ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। নাটকের কেস্ট চরিত্রটিও যখন মীর্জা সাহেবের তরফে এরূপ প্রস্তাব পায়, তখন অবশ্য সে দৃঢ়ভাবে তা নাকচ করে দেয়: 'দেখেন-চাষা, সে হিন্দু মুসলমান সবারই ঐ এক ঝোঁক-। কেউ বিপদে পড়লে তার জমি ভাইঙ্গা নিজের আইলের মধ্যে টানন। এখন আমি চুনাপুটী, একলা মানুষ, যে কোন হুজুগ তুইল্যা আমার জমি তারা নিবই।' সে হিসেবে তার দূরদর্শিতা অবশ্যই প্রশংসার্হ।

মনমোহন ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে কারাবরণ করে, জেলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। পূর্ববঙ্গের এরূপ অসংখ্য তরুণ স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিল; বস্তুত পূর্ববঙ্গ ছিল স্বদেশী বিপ্লববাদের ঘাঁটি। মনমোহন পুত্রও সে অসংখ্যের মধ্যে একজন। কিন্তু ইতিহাসের নিদারুণ পরিহাস, যে স্বাধীনতার জন্য তাঁরা জীবনপণ সংগ্রাম করল, সর্বস্ব ত্যাগ করল, সেই স্বাধীনতা তাঁদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করল; সেই স্বাধীনতা তাঁদের আক্ষরিক অর্থে নিঃস্ব, দীর্ণ উদ্বাস্তু করে ছাড়ল, পরবর্তী জীবন অতিবাহিত হল অবমানুষ বা না-মানুষের মত একপ্রকার ক্লিন্নতা,

মলিনতায় পরিপূর্ণ হয়ে। যারা জীবনভর ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, জেলেই কাটিয়েছে অর্ধেক জীবন, সেই সমস্ত দুর্দান্ত বিপ্লবীরাও এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুঝতে না পেরে আর পাঁচজন সাধারণ প্রতিবেশীর মত বাস্তু ত্যাগ করে উদ্বাস্তু পরিচয়ে পরিচিত হয়ে উঠতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেছিল। স্বভাবতই ক্ষোভ ঝরে পড়ে মনমোহন ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠপুত্র মোহনের বয়ানে; 'খালি মনে পড়তাছে বড়দাদার লেখা চিঠিগুলি- দেশ-মাতৃকা কইরাই ভর্তি। দেশ মাটি না, দেশ নাকি দেশের মানুষ। আর বড় দাদারা শুধু শুধু বোকার মতন হুজুগে প্রাণ দিছে- আমি হইলে এই স্বাধীনতার লেইগা পরাণ দিতাম না।' স্বাধীনতা তথা দেশভাগের দিন স্কুল কমিটির প্রেসিডেন্ট সাহেব বক্তৃতা দেন: 'দেশভাগ যদি না হইত তা হইলে মুসলমানেরা হিন্দুর হাতে পরাধীন থাক্‌তো'। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মোহনের জিজ্ঞাসা, তাঁর অগ্রজ যে স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে 'সেকি হিন্দু মুসলমান ভাগ কইরা, কোন লোকেরে বাদ দিয়া স্বরাজ চাইছিল?' বস্তুত পূর্ববঙ্গের আপামর সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর কাছে সাতচল্লিশের স্বাধীনতা এসেছিল এক চূড়ান্ত অভিশাপরূপে। পাঞ্জাবও খন্ডিত হয়েছিল; তবে পাঞ্জাবে জন বিনিময় ঘটায় পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের বাংলার উদ্বাস্তুদের মত নিরাশ্রয় হতে হয়নি। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও পেয়েছিল অপরিসীম বঞ্চনা, উদাসীনতা। এই ঔদাসীন্যের নমুনা তুলে ধরার জন্য একটি ঘটনা অবশ্য উল্লেখ্য। ১৯৪৮ সালে উদ্বাস্তুদের একটি সংগঠন 'নিখিলবঙ্গ বাস্তুহারা কর্মপরিষদ' প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবিতে স্মারকলিপি দিতে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় নেহরু তাঁদের জাতীয় কংগ্রেসের বিদেশ দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন; যেহেতু উদ্বাস্তুরা বিদেশের নাগরিক। প্রধানমন্ত্রী নেহরু হয়তো সেই মুহূর্তে ভুলে গিয়েছিলেন স্বাধীনতার মধ্যরাতে প্রদত্ত তার বিখ্যাত বক্তৃতার কথা; যে বক্তৃতায় একটি অন্যতম অংশ ছিল এরূপ: 'We think also of our brother and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good [or] ill fortune alike.'৬ নিম্ন মধ্যবিত্ত মনমোহনবাবু বা নিম্নবিত্ত কেস্ট, সকলকে এক বিপন্ন ভবিষ্যতের পথে ঠেলে দিল এই স্বাধীনতা। যে স্থিতিশীল শান্তির জীবনে তারা অভ্যস্ত ছিল, পরবর্তী জীবনে তা আর কখনোই তাঁরা ফিরে পেল না। পশ্চিমবঙ্গেও কেউ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়নি। তাঁরা প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হয়েছে নিদারুণ অপমান ও প্রবঞ্চনার। নাটকে উদ্বাস্তু পরিবারের সার্বিক অসহায়তার এখটি প্রতিনিধিত্বমূলক চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে।

নাটকের প্রথম দৃশ্যে কেস্ট আশঙ্কা প্রকাশ করেছে যে অদূর ভবিষ্যতে তার জমি আর তার থাকবে না, তা দখল করে নেওয়া হবে। তবে কালক্রমে কেবল সংখ্যাগুরু আধিপত্যবাদের প্রভাবে নয়, রীতিমতো আইন করে সংখ্যালঘুদের জমি দখল হতে থাকে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় 'শত্রু সম্পত্তি আইন' বা 'এনিমি প্রপার্টি অ্যাক্ট' জারি করা হয়; যে আইনের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের জমি অধিগ্রহণ করা হতে থাকে। যে

আইনের সারবস্তু ছিল বসবাস না করলে সরকার আইন বলে জমির অধিকার গ্রহণ করবে এবং জমির মালিক দেশের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত হবে। এই আইন লাগু হওয়ার পর দেশত্যাগী সকল উদ্বাস্তুর যাবতীয় ভূ-সম্পদ বেদখল হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পরও এই আইন বিলুপ্ত হয় না; কেবল ১৯৭৪ সালে আইনটির নাম বদল করে রাখা হয় অর্পিত সম্পত্তি আইন বা 'ভেস্টেড প্রপার্টি অ্যাক্ট'; আইনটির মূলগত কোন পরিবর্তন ঘটে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক আবুল বরকত তাঁর গবেষণাগ্রন্থে জানিয়েছেন: 'লুণ্ঠনের এ মহাযজ্ঞে এ পর্যন্ত (১৯৬৫-২০০৬) মোট ২৭ লক্ষ হিন্দু খানার মধ্যে ১২ লক্ষ হিন্দু খানা মোট ২৬ লক্ষ একর জমি হারিয়েছেন আর সেই সাথে হারিয়েছেন স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ-এসবের বর্তমান বাজার মূল্য হবে আনুমানিক ৩৫০,৪১২ কোটি টাকা। ১৯৬৪ থেকে ২০০১ পর্যন্ত আনুমানিক ১ কোটি হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন।'[৭] সে অর্থে সংখ্যালঘুর দেশান্তরী হওয়ার অন্যতম কারণ এই সাম্প্রদায়িক আইন। এমনিতেই বাস্তু জমির সঙ্গে বাঙালি হিন্দুর একটি বিশেষ সংস্কার জড়িয়ে থাকে; বাস্তুভিটে যেন তার প্রাণেরও অধিক। নাটকে কেষ্ট ও তাঁর মায়ের সংলাপে তার ইঙ্গিত লক্ষ করা যায় সুস্পষ্টভাবে; 'বাস্তুলক্ষ্মী, বাস্তু বেচতে নাই' কিংবা মুখার্জিরা বাস্তুভিটে বিক্রি করেছে শুনে মায়ের বিস্ময়পূর্ণ জিজ্ঞাসা : 'বাস্তু বেচ্‌ল? কও কি কেষ্ট? বাস্তু বেচ্‌ল?' এভাবেই সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তু আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চাওয়া একটা গোটা জাতিকে বাস্তুচ্যুত করা হল।

নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের পটভূমি পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম থেকে সরাসরি স্থানান্তরিত হয়েছে শিয়ালদহ স্টেশনে। বস্তুত কয়েক দশক জুড়ে শিয়ালদহ স্টেশন রীতিমতো উদ্বাস্তু কলোনীতে পরিণত হয়েছিল। কারণ শিয়ালদহ স্টেশন ছিল পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে কলকাতার মূল সংযোগকেন্দ্র। অনির্দেশ্য উদ্দেশ্যের পানে যাত্রা করা উদ্বাস্তুদের প্রাথমিক গন্তব্য ছিল শিয়ালদহ স্টেশন। নাটকেও পণ্ডিত ও কেষ্টর পরিবার আশ্রয় নিয়েছে শিয়ালদহ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে । যেখানে পানীয় জল নেই, খাবার নেই, পরীর মত কিশোরী মেয়ের স্নানের পরিসরটুকুও নেই; কাপড় টাঙ্গিয়ে তাঁরা অস্থায়ী ঘর বানিয়ে থেকেছে। মাঝে মাঝে স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে তাদের নাম নথিভুক্ত করে ও ক্যাম্পে যাওয়ার পরামর্শ দেয় বস্তুত দীর্ঘ দিন ধরে উদ্বাস্তু দুর্দশার অন্যতম সাক্ষী হয়ে উঠেছিল শহরের এই রেলস্টেশন: 'At Calcutta's Sealdah station, where most of the people fleeing East Pakistan detrained, one encountered the problemat its worst. Refugees occupied every nook and corner of the station, resisting official attempts to dislodge them. To make matters worse the numbers were swollen by other than displaced persons who just strayed into the station premises and installed themselves them. To make wherever they could find room. The term 'Sealdah sqatters', it must be borne in mind, applied to a floating population. No sooner had one group dispersed, another installed itself. It was a continuous process of clearence and filling up ...'[৮] সব হারানো নিঃস্ব দীর্ণ মানুষগুলো শিয়ালদহ স্টেশনেই

প্রতিবাদের প্রথম পাঠের সঙ্গো পরিচিত হতে থাকে। নিজের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবণতা গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে। কেস্টর কাছ থেকে তিনশো টাকা ঠকিয়ে নেওয়া হয়। এইভাবে ঠকতে ঠকতেই তারা একদিন রুখে দাঁড়ায়। কেস্টর কাজ জুটে যায় টিটাগড়ের করখানায়। মনমোহন ভট্টাচার্য পরিবারসহ এক বস্তির ঘরে নির্বাসিত হয় পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ তার স্বভাবগত লজ্জা, কুন্ঠা বিসর্জন দিয়ে একরোখা হয়ে ওঠে: 'দিমু না ভাড়া। যা করতে পারস্ করিস্।' অবস্থার ভেদে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে যায়।

একটি সমৃদ্ধ স্থিতিশীল সংসার উদ্বাস্তু হয়ে কীভাবে পুরোদস্তুর ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, পন্ডিতের সংসারটি তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনমোহন ভট্টাচার্য্য শিক্ষক থেকে হয়ে উঠলেন রান্নার হালুইকরের সহযোগী; কৃষক কেস্ট হয়ে উঠল কারখানার শ্রমিক; মেধাবী ছাত্র মোহন অভাবের তাড়নায় কুলির কাজ নিতে বাধ্য হল; বাধ্যতামূলক পেশা পরিবর্তন ঘটল উদ্বাস্তুদের। স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত পেশায় তাঁরা সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি; তাঁদের জীবনে নেমে এসেছিল এক সামুহিক বিপর্যয়। তবে উদ্বাস্তু পুরুষের চেয়ে উদ্বাস্তু নারীর জীবন আরও বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল শুধুমাত্র নারী হওয়ার কারণেই। রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার এই সময়ে নারীর জীবন হয়ে উঠেছিল বিপন্ন; তাকে প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হয়েছে যথেচ্ছ শারীরিক পীড়ন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা; যা তাঁদের পরবর্তী জীবনকেও বিভীষিকাময় করে তুলেছিল। আলোচ্য নাটকের নারী চরিত্রগুলি সরাসরি প্রতিপক্ষের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেনি; কিন্তু তাঁদের জীবনেও নেমে এসেছিল দুর্দশার অন্ধকার। পণ্ডিত কন্যা পরী বিপথে চালিত হয়েছে, দালাল যতীনের কাছে সে নিজেকে সমর্পণ করেছে। উদ্বাস্তু নারীদের লক্ষ্য করে দেশভাগ উত্তর সময়ে গড়ে উঠেছিল অসংখ্য নারী পাচার চক্র; পরীর মত পূর্ববঙ্গের অজস্র অসহায় সরল কিশোরী তাদের সহজ শিকার হয়েছিল। চূড়ান্ত অভাবের ফাঁদে পড়ে পরীও সেই হাতছানি এড়াতে পারেনি; আত্মসমর্পণ করেছে; পরিবারের থেকে চির বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে; চিরন্তন পারিবারিক জীবন থেকে নির্বাসিত হয়েছে। মনমোহন পন্ডিতের অপর সন্তান দুইখ্যাও দুস্টচক্রে পড়ে চৌর্যবৃত্তিতে জড়িয়ে যায়; ধরা পড়ে ভীষণভাবে প্রহৃত হয়; শেষাবধি অপঘাতে মৃত্যু হয় প্রাণচঞ্চল দুইখ্যার। পণ্ডিতেরও অকাল মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। এখটি স্বত:স্ফূর্ত প্রাণময় পরিবারের চূড়ান্ত ট্র্যাজিক পরিণতি ঘটে।

নাট্যকার সলিল সেন আর এস পি'র সাংস্কৃতিক শাখা 'ক্রান্তি শিল্পী সংঘে'র সদস্য ছিলেন। পরবর্তীকালে নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গো যুক্ত হন। শিল্পী সংস্কৃতিকর্মীদের এ জাতীয় সংগঠনের নেতৃত্বে সর্বদাই থাকতেন কমিউনিস্ট সংস্কৃতিকর্মীরা যারা কমিউনিস্ট পার্টির নীতি আদর্শ মেনে চলতেন। যে কারণে পার্টির রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, পরিকল্পনা, প্রচার এই ধরনের নাটকে মুখ্য বিষয় হয়ে উঠত। আলোচ্য নাটকেও লক্ষ করা যায় পার্টির প্রচার মুখ হিসেবে আবির্ভাব ঘটেছে মহেন্দ্র নামে এক চরিত্রের। যে মহেন্দ্রের সংলাপ পুরোদস্তুর একজন পার্টিকর্মীর বক্তব্যের সঙ্গো সাদৃশ্যপূর্ণ। তিনি একটি ধ্বংসোন্মুখ পরিবারের সদস্য মোহনকে

সমষ্টিগত প্রতিরোধের কথা শোনান; নিজের যা নিজ পরিবারের বিষয়ে চিন্তা না করে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের কথা চিন্তা করতে বলেন; মহেন্দ্রের এই বৈপ্লবিক বক্তৃতা শুনে অভুক্ত ক্লান্ত মোহন অতি কষ্টে যোগাড় করা চাকরির একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও সগর্বে ছিঁড়ে ফেলে! যা অনেকখানি অতিনাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। বাস্তবিকপক্ষে একটি ছিন্নমূল উদ্বাস্তু চরিত্র, অভাব যার জীবনের নিত্যসঙ্গী, জীবন যার সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, তাকে দিয়ে এরূপ একটি কাজ করিয়ে নাটকে একটি বিশেষ প্রচারমূলক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা হয়েছে, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। কিংবা নাটকের একেবারে শেষ অংশে মহেন্দ্র যখন 'হৃদয়হীন শোষক' অত্যাচারী' 'অর্থলোভী', 'স্বার্থলোলুপ' 'শাসক'দের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলনের কথা বলে, তাদের অত্যাচার খতম করার আহ্বান জানায়, তখন তা হয়ে ওঠে শ্রেণি ও শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের স্পষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত। যে কারণে গণনাট্যসংঘের সদস্য হওয়া সত্বেও শচীন সেনগুপ্ত মহেন্দ্র চরিত্রের এহেন রাজনৈতিক বক্তব্য উপস্থাপনায় বিরক্তি প্রকাশ না করে পারেননি।[৯] যে নগ্ন সাম্প্রদায়িতা কেবল ধর্মীয় পরিচিতির কারণে অসংখ্য মানুষকে উদ্বাস্তু করল, বীভৎস ও নৃশংস পরিস্থিতির মুখোমুখি করল, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নাটক যদি এরূপ তত্ত্বের ছাঁচে ঢালা, যান্ত্রিকভাবে নির্দিষ্ট মত প্রচারের পরিসর হয়ে ওঠে, তবে তা শিল্পের মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে। স্বাভাবিকভাবে নতুন ইহুদীও সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারেনি।

**তথ্যসূত্র**

১। শ্যামল দত্ত (সম্পা.), 'পুলিশের সামনে অধ্যক্ষের গলায় জুতার মালা, তদন্তে ২ কমিটি,' ভোরের কাগজ, ২৭ জুন ২০২২, ঢাকা
২। শ্যামল দত্ত (সম্পা.), 'সাভারে শিক্ষককে স্ট্যাম্প দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করল শিক্ষার্থী,' ভোরের কাগজ, ২৭ জুন ২০২২, ঢাকা
৩। শ্যামল দত্ত (সম্পা.), 'আমি ষড়যন্ত্রের শিকার, মুক্তির পর হৃদয় মন্ডল', ভোরের কাগজ, ১০ এপ্রিল, ২০২২, ঢাকা
৪। সলিল সেন, নতুন ইহুদী,সম্পা. স্নিগ্ধা বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫। Abhijit Dasgupta, Displacement and Exile: The State-Refugee Relations in India, 2016, Oxford University Press, New Delho, page 41
৬। https://www.files.ethz.ch/isn/125396/1154_trystnehru/pdf
৭। আবুল বারকাত ও অন্যান্য, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বঞ্চনা: অর্পিত সম্পত্তির সাথে বসবাস, ২০০৯, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২
৮। Abhijit Dasgupta, Displacement and Exile: The State-Refugee Relations in India, 2016, Oxford University Press, New Delho, page 26
৯। অশ্রুকুমার সিকদার, পদ্য সংগ্রহ(৫ম খন্ড), দীপ প্রকাশন, ২০১৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৯৯

লেখক ঃ **ড. কৌশিক কর্মকার,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মহারাজা নন্দকুমার বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, প:বঙ্গ।

# রবীন্দ্র -নৃত্যনাট্যে প্রেমের উত্তরণ ও তার পর্যালোচনা

শ্রেয়সী চ্যাটার্জী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পচর্চার শেষ প্রান্তে রয়েছে নৃত্যনাট্য। সারাজীবন ধরে, দেশ-বিদেশ থেকে আহৃত অভিজ্ঞতা ও কাব্য, নাটক, সংগীত, নৃত্যের যে ভাবনা ও অনুশীলন, তার সম্মিলিত ফল যেন তাঁর নৃত্যনাট্য। নৃত্যনাট্যকেই রবীন্দ্র প্রতিভার চরম বিকাশ বলে মনে করেন অনেক রবীন্দ্র গবেষক। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি নৃত্য, গীত, ও কাব্য দ্বারা উপস্থাপিত নাট্য ঘটনা। নৃত্যনাট্যে নৃত্য ও গান সম্মিলিতভাবে সংলাপ বলে এবং এর মাধ্যমেই নাট্যঘটনা বর্ণিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত নৃত্যনাট্যগুলি হল — চিত্রাঙ্গাদা (১৯৩৬), চন্ডালিকা (১৯৩৮) এবং শ্যামা (১৯৩৯)। কাহিনিগত ভাবে নৃত্যনাট্যগুলির মধ্যে কোন মিল না থাকলেও তাদের মূল বিষয়বস্তু অভিন্ন এবং এই বিষয়বস্তু বিস্তারলাভ করেছে প্রেমকে কেন্দ্র করে। আর, এখানেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ত্রয়ী নৃত্যনাটককে এক সুতোয় গেঁথেছেন। প্রতিটি নৃত্যনাট্য নিজ নিজ প্রেমের চিত্রাঙ্কনে ও স্বকীয়তায় অনন্য, অনবদ্য। 'চিত্রাঙ্গাদা'র কাহিনির মূলে আছে চিত্রাঙ্গাদা-অর্জুনের প্রেম। 'চন্ডালিকা'র ক্ষেত্রে প্রকৃতি -আনন্দের প্রেম এবং শ্যামা'য় শ্যামা -বজ্রসেনের প্রেম নৃত্যনাট্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই তিনটি নৃত্যনাট্যই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মোহাবরণ থেকে মুক্ত হয়ে প্রেম উত্তীর্ণ হয়েছে আত্মবোধে। পার্থিব কামনা-বাসনার মোহজাল ছিন্ন করে প্রেমের উত্তরণ হয়েছে অপার্থিবত্বে। এভাবেই প্রেমের কল্যাণময় শাস্বত রূপটি তিনটি নৃত্যনাট্যে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ।

**চিত্রাঙ্গাদা ঃ-** মহাভারতের 'অর্জুনবনবাসপর্বাধ্যায়' থেকে কাহিনির কাঠামোটুকু নিয়ে, নরনারীর চিরন্তন প্রেমসম্বন্ধকে শিল্পে রূপান্তরিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর রচিত প্রথম নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গাদা'য়। শিবের বর অনুসারে মণিপুর রাজবংশে শুধু পুত্রসন্তানই জন্মাবার কথা। তৎসত্বেও রাজকুলে যখন চিত্রাঙ্গাদার জন্ম হল, তখন, রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। রাজকন্যা, শিক্ষা ও অভ্যাস করলেন যুদ্ধবিদ্যা, ধুনর্বিদ্যা। রাজদন্ডনীতিতে পারদর্শী করে তুললেন নিজেকে, হয়ে উঠলেন দক্ষ প্রশাসক। পুরুষ বেশধারী, পুরুষের জীবনচর্যার অভ্যস্ত চিত্রাঙ্গাদা, মণিপুরের বনে ভ্রমণরত ব্রম্মচর্য ব্রতধারী অর্জুনকে দেখার পর প্রথম অনুভব করলেন তাঁর অন্তরের প্রচ্ছন্ন নারীসত্বা। তাঁর মন -প্রাণ নিবেদন করলেন বিশ্বের বীরশ্রেষ্ঠ, অর্জুনকে। কিন্তু, আপাতদৃষ্টিতে পুরুষালি, কুরূপা চিত্রাঙ্গাদা মন জয় করতে পারলেন না অর্জুনের। ব্রম্মচর্যের দোহাই দিয়ে অর্জুন প্রত্যাখ্যান করলেন চিত্রাঙ্গাদাকে। প্রত্যাখ্যাত হয়ে বদলে গেল চিত্রাঙ্গাদার জীবনবোধ। অনায়াসে রাজপাট সামলানো চিত্রাঙ্গাদা, প্রথমবার তাঁর রূপ-লাবণ্যহীনতার লজ্জা অনুভব করলেন। চরম অপমানে আকুল প্রার্থনা জানালেন সৌন্দর্যের

দেবতা মদনকে, রূপ-লাবণ্য-বাঁকা ভুরু ও তীব্র কটাক্ষের জন্য, যা নিশ্চিতভাবে পুরুষ হৃদয়কে বিদ্ধ করতে পারে। মদনদেবের বরে এক বছরের জন্য পেলেন নারীসুলভ সকল গুণ ও অপরিমেয় সৌন্দর্য, লাবণ্য। তাঁর রূপের মোহে ব্রহ্মচর্য ব্রত ভুললেন তৃতীয় পাণ্ডব। নিজের শৌর্য, বীর্য, খ্যাতি, পৌরুষ সর্বস্ব সমর্পণ করলেন চিত্রাঙ্গাদার কাছে। মিলন হল পরস্পরের।

কিন্তু, এই আরোপিত রূপের আগুনে অন্তরে দগ্ধ হতে থাকলেন চিত্রাঙ্গাদা। এই রূপে তাঁর নিজস্বতা নেই, এ নেহাতই ছলনা। এক ঘোর মিথ্যার দ্বারা তিনি তাঁর জীবনবল্লভকে নিজের জীবনে পেলেন বটে, কিন্তু, এ প্রাপ্তিতে গৌরব নেই, আছে অসম্মান। ক্রমে, অর্জুনও তাঁর প্রিয়তমার রূপমাধুর্যে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। লোকমুখে শুনলেন,'স্নেহবলে মাতা, বাহুবলে রাজা' মণিপুর দুহিতা চিত্রাঙ্গাদার বীরগাথা, যিনি সেই রাজ্যের শাসক ও রক্ষক। চিত্রাঙ্গাদার গুণ শ্রবণপূর্বক সেই বীর্যবতীর সঙ্গো সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে উঠলো পার্থর মন।

শেষে, মদনদেবকে তাঁর রূপমাধুরী ফিরিয়ে দিয়ে দৃপ্ত ভঙ্গিমায়, আত্মপ্রত্যয়ে, নারীত্বের গৌরবে, স্বমহিমায়, মণিপুর রাজনন্দিনী চিত্রাঙ্গাদা অর্জুনের সামনে নিজেকে প্রকাশ করলেন। অভিভূত অর্জুন চিত্রাঙ্গাদাকে পেয়ে পূর্ণ হলেন, ধন্য হলেন।

নারীসুলভ শ্রীহীনতার কারণে অর্জুনের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে রূপ ও যৌবনবতী হওয়ার খেলায় মেতে ওঠেন চিত্রাঙ্গাদা, এবং সেই রূপরে দ্বারাই জীবনে পান পরমাকাঙ্খিত পুরুষ, অর্জুনকে। কিন্তু, যে প্রেম বহিরাবরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে তো ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে সাধনা রবীন্দ্রনাথের রচনায় ঘুরে ফিরে এসেছে, বারবার। যা ক্ষণিকের, তার গভীরতা নেই, নেই স্থায়িত্ব। তাই, মিথ্যার জাল ছিন্ন করে নিজের অন্তরের অকৃত্রিম আলোকচ্ছটায় চিত্রাঙ্গাদা আলোকিত করলেন অর্জুনের হৃদয়কেও। সেই আলোয় মোহান্ধকার দূর হলো। ঋদ্ধ হলেন অর্জুন। সত্যের কল্যাণময় প্রেমালোকে শাশ্বত হল, সার্থক হল, চিত্রাঙ্গাদা-অর্জুনের প্রেম।

**চন্ডালিকা ঃ-** প্রণয় কুমার কুন্ডু বলেছেন, "আঙ্গিকের বিচারে, রসের বিচারে, সামগ্রিক রূপের বিচারে এবং ঋজুলক্ষ্য তাৎপর্যে চন্ডালিকাই রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের ক্রান্তিস্থল।" চন্ডালিকায় রবীন্দ্রনাট্যের চরম বিকাশ । বৌদ্ধ 'অবদান' সাহিত্য চন্ডালিকার কাহিনির অনুপ্রেরণা।

'চন্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের কেন্দ্রেও রয়েছে প্রেম। চন্ডালের কন্যা হওয়ার কারণে এই নৃত্যনাট্যের নায়িকা প্রকৃতি সমাজের চোখে অশুচি। সবরকম ক্রিয়াকলাপ, উৎসব অনুষ্ঠানে সে ব্রাত্য। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষের থেকে তার অবস্থান অনেক দূরে, এক কোণে। শুধুমাত্র তার জন্ম চন্ডাল বংশে হওয়ার কারণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাকে এড়িয়ে চলে, সকলের চোখে সে ঘৃণার পাত্রী। এই হীন বংশের জন্মের দায় তো তার নয়, জন্ম তো

ভাগ্য নির্ধারিত। জন্মাবধি এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে করতে চন্ডালিকা প্রকৃতির তীব্র বিদ্বেষ জন্মায় বিধাতার প্রতি। এমনই এক সময়, তৃষ্ণার্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দ এসে প্রকৃতির কাছে জল চান। অস্পৃশ্যা, নীচ জাতীয়া বলে সে সন্ন্যাসীকে জল দিতে অস্বীকার করে। তখন, আনন্দ বলেন, " যে মানব আমি , সেই মানব তুমি কন্যা/সেই বারি তীর্থ বারি, যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে।" প্রকৃতির দেওয়া জলেই সন্ন্যাসীর তৃষ্ণা নিবারিত হয়, প্রকৃতিকে আশীর্বাদ করে তিনি প্রস্থান করেন।

আনন্দকে জলদান এবং আনন্দের চন্ডালিকার উদ্দেশ্যে আশীর্বচন— এই হল এই নৃত্যনাট্যের মূল ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তী কাহিনীর গতি।

এই জলদানের অধিকার, যা অতি অনায়াসে আনন্দ প্রকৃতিকে দিয়ে গেলেন, তা প্রকৃতিকে দান করলো, এক নতুন জন্ম। দিয়ে গেল বহু আকাঙ্খিত সম্মান। এক গন্ডুষ জলদান তাকে মুক্ত করলো সারা জীবনের অপমান, লাঞ্ছনা ও অশুচি জন্মের গ্লানি থেকে। কিন্তু, আনন্দের প্রতি প্রকৃতির এই অপার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হল প্রেমে। আর, প্রেমের হাত ধরেই পার্থিব কামনাও প্রকট হয়ে উঠল। প্রকৃতির দেহ-মন অস্থির হয়ে উঠল আনন্দকে পাওয়ার জন্য। কিন্তু, সন্ন্যাসী আনন্দ এসবের বিন্দুবিসর্গও জানেন না, তিনি পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার উর্ধ্বে। নানারকম যাদুবিদ্যায় পারদর্শী হন চন্ডালরা। আনন্দকে কাছে পাওয়ার উদগ্র বাসনায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য প্রকৃতি, সেই যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে আনন্দকে নিজের কাছে আনার ব্যবস্থা করে। মায়ামন্ত্রের বলে যখন আনন্দ এসে দাঁড়ান প্রকৃতির সামনে, তখন তাঁর অপরূপ দেহকান্তি ঢাকা পড়েছে ক্লান্তিতে, বিষন্নতায়। তাঁকে দেখেই অনুতাপে ভরে ওঠে প্রকৃতির মন। আত্মগ্লানিতে, অনুশোচনায়, আকুল কান্নায় সে আনন্দের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, উদ্ধার করতে বলে তাকে এই অপরাধ থেকে। আনন্দ তখনও প্রকৃতিকে আশীর্বাদ করেন, তার কল্যাণ কামনা করেন।

প্রকৃতির কামনা ও আকুলতা প্রেমেরই নামান্তর। হয়তো তার প্রকাশভঙ্গি খানিকটা আলাদা। তবে, যে প্রেম কামনা- বাসনার আগুন জ্বালিয়েছিল প্রকৃতির মনে , সেই প্রেমই অনুশোচনার পবিত্রজল সিঞ্চন করে শুদ্ধ করল প্রকৃতির অন্তর। তার জীবনে এনে দিল কামনা-কলুষমুক্ত অপার্থিব প্রেমের স্বর্গীয় সুখানুভূতি। এভাবেই চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যে আবারও দেহের সীমা অতিক্রম করে প্রকৃতির প্রেম ডানা মেলল অনন্তে।

**শ্যামা ঃ-** রবীন্দ্র-জীবনের তৃতীয় ও শেষ নৃত্যনাট্য শ্যামা। এই নৃত্যনাট্যের বিষয় ভাবনার মূলে আছে বৌদ্ধ 'মহাবস্তু'। কবির দীর্ঘ জীবন ও নৃত্যনাট্য সৃষ্টির অভিজ্ঞতার যে সুন্দর মেলবন্ধন, তারই ফসল 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। প্রথম দুটি নৃত্যনাট্যের তুলনায় অন্তিমটির কাহিনীর বৈচিত্র্যে ও সামগ্রিক নির্মাণে রবীন্দ্রনাথ যেন আরও পরিণত ও দক্ষ।

শ্যামা নৃত্যনাট্যে প্রেমের দু'ধরনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। প্রথম প্রেমের ছবিটি শ্যামা ও উত্তীয়র, দ্বিতীয়টি শ্যামা ও বজ্রসেনের। অসামান্যা সুন্দরী, রাজনর্তকী শ্যামাকে নিঃশর্তে নিজের ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে কিশোর উত্তীয়। উত্তীয়র এই একতরফা, অসম প্রেম ব্যর্থতায় পরিণত হতে সময় লাগেনি। কিন্তু, উত্তীয়র জীবন আহুতির মধ্যে দিয়ে সেই ব্যর্থতাও এক মর্মান্তিক পরিণতি লাভ করেছে। রাজদরবারের আলোকস্বরূপা যে নর্তকী, সেই আবার নিষ্পাপ কিশোরের জীবনের অকাল যবনিকাপাতের কারণ।

বিদেশি বণিক বজ্রসেন-এর কাছে আছে বহুমূল্য ইন্দ্রমণির হার। সেই হারের কারণেই তাঁকে পড়তে হল রাজরোষে, কোটালের হাতে। কোটাল যখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন রাজার কাছে, তখন শ্যামা তাঁকে দেখেন এবং তাঁর মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি মুগ্ধ করে রাজনর্তকীকে। শ্যামার আপ্রাণ চেষ্টায় প্রাণরক্ষা হয় বণিক বজ্রসেনের। শ্যামার প্রেমিক উত্তীয় এগিয়ে আসে ও মাথা পেতে নেয় কোটাল প্রদত্ত বজ্রসেনের অপরাধের দায়ভার। বিচারে মৃত্যুদন্ড হয় উত্তীয়র। জীবনে না-ই হোক, মরণডোরে সে চিরজীবন নিজেকে বেঁধে রাখতে চায় শ্যামার হৃদয়ে। শ্যামার পরমাকাঙ্খিত পুরুষ বজ্রসেনের প্রাণ রক্ষার্থে এভাবেই প্রাণ বিসর্জন দেয় শ্যামার কিশোর প্রেমিক। এমন এক ব্যর্থ প্রেমের মরণসুতোয় গাঁথা হয় শ্যামা-বজ্রসেনের প্রেমের মালা।

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, জয়চিহ্ন বহন করতে পারে না শ্যামার এই প্রেমও। গভীর পারস্পরিক প্রেমে আবদ্ধ হওয়ার পরে, বজ্রসেন যখন জানতে পারলেন, কারাগার থেকে তাঁর মুক্তিলাভ, অর্থাৎ তাঁর প্রাণ ফিরে পাওয়া এবং তাঁর ও শ্যামার এই প্রেমের সম্পর্ক— দুইয়ের গায়েই লেগে আছে নিরপরাধ উত্তীয়র মৃত্যু দাগ, মুহূর্তকাল চিন্তা না করে চরম ধিক্কার জানিয়ে তিনি শ্যামাকে পরিত্যাগ করলেন। কিন্তু মন থেকে মুছে ফেলতে বা বিসর্জন দিতে পারলেন না প্রিয়তমাকে। না তিনি শ্যামার অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে গ্রহণ করতে পারলেন, না পারলেন শ্যামার প্রেমকে চিরতরে বিদায় জানাতে। নিদারুণ অনুতাপ আর সংশয়ের আগুনে দগ্ধ হতে থাকলেন নিজের অন্তরে, নিরন্তর।

"এলে রজনীর পারে উষাসম,
মুক্তিরূপা অয়ি লক্ষ্মী দয়াময়ী।"---

কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার পর, যখন বজ্রসেন শ্যামাকে একথা বলে অভিহিত করেছেন, তখন শ্যামার "বোলো না বোলো না বোলো না-- আমি দয়াময়ী"!— এই স্বীকারোক্তি তাঁর চরিত্রকে সামান্য মহিমান্বিত করলেও তাঁর অপরাধের বোঝা লাঘব হয়নি তাতে। বজ্রসেনকে পাওয়ার জন্য তিনি উত্তীয়কে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছেন। বজ্রসেনের প্রতি মুগ্ধতা তাঁর এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, যে, নিরপরাধ উত্তীয়র প্রতি অন্যায়ভাবে নিষ্ঠুর হতে একটিবারও বাধেনি। তাঁর বজ্রসেনকে চাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় বা অসঙ্গতি ছিল না, কিন্তু, বজ্রসেনকে পাওয়ার মধ্যে গাঁথা ছিল ক্ষমাহীন পাপের ভিত্তিপ্রস্তর, যা পরবর্তীতে

শ্যামা-বজ্রসেনের প্রেমমন্দির গড়তে না পারার একমাত্র কারণ হয়ে রইল।

এখানে, উত্তীয়র স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জন যেমন তার প্রেমের নিষ্ঠা ও মহত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, একই সঙ্গে শ্যামা চরিত্রের চরম হৃদয়হীনতা ও স্বার্থপরতা প্রদর্শন করেছে। এই ঘৃণ্য অপরাধের কারণেই বজ্রসেন মুখ ফিরিয়েছেন শ্যামার থেকে। শ্যামা যেমন কৃত অপরাধের অনুতাপে দগ্ধ হয়েছেন, জেরবার হয়েছেন প্রেমিক বজ্রসেনের ধিক্কারে, প্রত্যাখ্যানে, বিচ্ছেদ যন্ত্রণায়, অপরাধবোধে; তেমন বজ্রসেনের অন্তরও পুড়েছে তাঁর প্রিয়তমাকে ক্ষমা করতে না পারার নিদারুণ আত্মগ্লানিতে। শ্যামাকে তাঁর কৃত পাপের শাস্তি দিয়ে তিনি নিজেও কি কম শাস্তি পেয়েছেন? ক্ষমা করতে না পারার যে মানসিক অপ্রসারতা, সেও তো এক পাপেরই নামান্তর। আত্মবিসর্জনে, অপরাধবোধে, অনুশোচনা, ক্ষমাহীনতার আত্মগ্লানিতে অগ্নিশুদ্ধ হয়েছে নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'র প্রেম সম্পর্কগুলি। আপাতদৃষ্টিতে এটিকে একটি ব্যর্থ প্রেমের কাহিনি মনে হলেও এখানে জয়লাভ করেছে প্রেমের পবিত্রতা। শ্যামা-বজ্রসেনের প্রেম পরস্পরকে পাওয়ার মধ্য দিয়ে চরিতার্থতা লাভ করেনি বটে, কিন্তু পরস্পরকে কাছে না পেয়ে তাঁরা দুজনেই অপরিসীম দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাই, তাঁদের প্রেমের পরিণতি মিনলনান্তক না হলেও তা ব্যর্থ নয়। শ্যামা-বজ্রসেনের মর্মান্তিক বেদনাময় প্রেমের এমন চিত্র রবীন্দ্রসৃষ্টিতে আর কোথাও নেই।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি তাঁর জীবনের প্রায় অন্তিম লগ্নের রচনা। সারাজীবনের বিন্দু বিন্দু অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতার সঞ্চিত বারি কবি জীবন সায়াহ্নে এসে উজাড় করে দিলেন এই ত্রয়ী নৃত্যনাট্যের মহার্ণব রচনায়। কবি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, সেই সৃষ্টির ধারাগুলি অবশেষে একটি প্রান্তে এসে এই নৃত্যনাট্যের জন্ম দিয়েছে। তাঁর ভাষায় বলতে হয়, "সব পথ এসে মিলে গেল শেষে।" তাঁর নৃত্যনাট্যগুলি তাঁর জীবনব্যাপী সমগ্র সৃষ্টি ধারার পরিণতি, যেখানে তাঁর প্রতিভা ও সৃজনশীলতার চরমতম প্রকাশ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনের প্রাথমিক পর্বে একই সঙ্গে কবিতা, গান ও নাটক রচনা করেছেন, তাদের একত্রিত প্রকাশ হয়েছে নানান গীতিনাট্যের মাধ্যমে। পরবর্তীতে, পৃথকভাবে কবিতা, গান ও নাটক রচনার ধারা ক্রমবিকাশ লাভ করে। এরপর, জীবনপ্রান্তে এসে কবির সৃষ্টিশীলতার সমস্ত নদীর মিলিত ধারা যেন সমুদ্রে লীন হয় নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে।

রবীন্দ্র-নৃত্যনাট্যত্রয়ের কেন্দ্রে আছে, নরনারীর প্রেম সম্বন্ধ। তবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিটি নৃত্যনাট্যে নারীচরিত্র এঁকেছেন সুসংবদ্ধ শৈল্পিক নৈপুণ্যে। প্রতিটি নারীচরিত্র নিজ নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি নিষ্ঠায় নিবেদনে অকৃপণ হয়েও স্বাধীন চিন্তা, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মসম্মানবোধের অধিকারিণী। নানারকম হৃদয়দ্বন্দ্ব, ভুলভ্রান্তি, অনুতাপ-পরিতাপ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে তাঁরা সাধারণ মানবী থেকে হয়ে উঠেছেন মনস্বিনী। বাহ্যিক আড়ম্বর ও দৈহিক কামনাবাসনার মোহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে পেয়েছেন অন্তরের অফুরান মাধুর্যে পরিপূর্ণ প্রেমের স্পর্শসুখ। এভাবেই হয়েছে কল্যাণের পথে প্রেমের জয়যাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ যেমন ঔপনিষদীয় গভীর তত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, তেমন বুদ্ধ জীবনাদর্শের প্রভাবও তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন, প্রেম হল, জীবনের পরম ঐশ্বর্য; মূল্যবান সম্পদ। তিনি একথাও বলেছেন, প্রেম হবে মঙ্গলময়। সত্যের, ন্যায়ের, কল্যাণের পথ ধরে হবে তার আগমন। পাপের ওপরে প্রেমের প্রতিষ্ঠা হতে পারেনা। যেমন, বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার প্রেমে নিষ্ঠা বা নিবেদনের অভাব ছিল না, কিন্তু তা এসেছিল পাপের পথ ধরে। তাই, সেই প্রেম হয়েছে ব্যর্থ। কখনও ঔদার্য বা ক্ষমার মতো মহৎ গুণে পবিত্র হয় মনুষ্য হৃদয়, চরিতার্থ হয় প্রেম। বুদ্ধদেব বলেছেন, ক্ষমা হল, মানবজীবনের পরম ধর্ম ও আদর্শ লক্ষ্য। 'চন্ডালিকা'য় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আনন্দ, প্রকৃতির পাপকে অক্লেশে ক্ষমা করে তার কল্যাণ কামনা করেছেন। কিন্তু, 'শ্যামা'র বজ্রসেন শ্যামার অপরাধকে ক্ষমা করতে না পারার গ্লানিতে দগ্ধ হয়েছেন। তবু, অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেননি। সেও কম অপরাধ নয়। তাই, শুধু শ্যামার পাপে নয়, পারস্পরিক অপরাধেই তাঁদের প্রেম চরিতার্থ হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলি গভীর ভাবগ্রাহী। এগুলি অনেকাংশেই স্পর্শ করতে চেয়েছে আত্মবোধের কেন্দ্রস্থলকে। 'চিত্রাঙ্গদা'র 'সূচনা' অংশে কোন সুন্দরী যুবতীর রূপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়া বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দ্বারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ যুগল জীবনের জয়যাত্রার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্বলতার মালিন্য নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ধ্রুব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ, এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।' রবীন্দ্রনাথের তিনটি নৃত্যনাট্যেই প্রতিধ্বনিত হলো 'চিত্রাঙ্গদা'র 'সূচনা'র এই গভীর ভাবটি। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস ছিল, প্রেমকে 'ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে' প্রতিষ্ঠিত করা। তাই, রবীন্দ্রনাথ, মহাভারত বা বিভিন্ন বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে কাহিনিসারও গ্রহণ করেননি। শুধুমাত্র তার কাঠামোটুকু নিয়ে, তাতে শরীর দান করেছেন, দিয়েছেন প্রাণ। তাঁর নৃত্যনাট্যের চরিত্ররা অত্যন্ত জীবন্ত, যেন বাস্তবের মাটি থেকে সদ্য উঠে আসা। এখানে নায়ক-নায়িকারা রূপজ মোহে আকৃষ্ট হন; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি ষড়রিপুর শাসনে হন শাসিত, পরম আকাঙ্খিত মানুষকে নিজের করে পেতে আশ্রয় নেন ছলনার। ভুল করেন, অপরাধ করেন, আবার সর্বস্ব নিবেদন করে ভালোও বাসেন। তারপর, কোন একসময় জাগ্রত হয় অপরাধবোধ। অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে শুদ্ধি হয় অন্তরের। পার্থিব আবরণ সরে যায় চোখ থেকে, উন্মীলিত হয় জ্ঞানচক্ষু। আত্মবোধে অগ্নিশুদ্ধ হয় নরনারীর চিরন্তন প্রেম। নরনারীর পারস্পরিক আকর্ষণের ফলে জন্ম নেয় প্রেম। রূপজ

মোহ কাটিয়ে, দেহের সীমা অতিক্রম করে যে প্রেম অন্তরের আকুতি ও অভিব্যক্তিতে পরিশুদ্ধ হতে পারে, সেই প্রেমই তার আপন স্বরূপে ধন্য ও সার্থক। শাশ্বত প্রেমরূপে সে প্রতিষ্ঠা পায় নরনারীর অন্তরের কনকমন্দিরে, নিবিড় আনন্দ বন্ধনে বাঁধে পরস্পরকে চিরতরে। পার্থিবত্ব থেকে উত্তীর্ণ হয় অপার্থিবত্বে। সেই প্রেমই হয় অনন্ত আনন্দের উৎস।

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ-**


- কুন্ডু, প্রণয় কুমার। রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৫। পুনমুদ্রণ ২০১০।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৮৬। পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ খন্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৯০। পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্ররচনাবলী ত্রয়োদশ খন্ড। কলকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯৯১।পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৫।
- বসু, ড. অরুণকুমার। বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৮। পুনর্মুদ্রণ ২০১০।
- মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার। গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী। কলকাতাঃ টেগোর রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট, ২০০৩। পুনর্মুদ্রণ ২০১২।


লেখক ঃ **শ্রেয়সী চ্যাটার্জী**, গবেষক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়।

# শ্রী চৈতন্য ও শঙ্করদেবের
# ধর্মীয় চেতনা উন্মেষে নাটকের ভূমিকা

মাম্পি গুপ্ত

ভারতবর্ষের সুবৃহৎ অঞ্চল বঙ্গ ও অসম। ভৌগোলিক, সামাজিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুই অঞ্চলের জাতি, জনজাতিকে সহ্য করতে হয়েছে পরাধীনতার গ্লানি। শুধু ব্রিটিশ শাসিত ভারতে নয়, বহু পূর্ব থেকে বহিরাগতদের আক্রমণে বঙ্গ ও অসমের জনজীবনে দেখা দিয়েছে সংকট। এক্ষেত্রে প্রথমেই তুর্কী আক্রমণের কথা উল্লেখ করতে হয়। মুসলমান শাসকগোষ্ঠী হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালায়। হিন্দুদের মঠ-মন্দির ভেঙে দিতে থাকে। নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা আত্মরক্ষার খাতিরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। একদিকে ধর্মসংকট অপরদিকে সমাজে ব্যভিচারের অন্ত ছিল না, বিশেষত "১২০২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৪১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস হল খুন, লুঠতরাজ, যৌনাচার, ভোগবিলাস ও বিচারের ইতিহাস। হিন্দুদের মন্দিরে তখন আছে দেবদাসী প্রথা। ধর্মের নামে চলছে যৌনাচারমূলক স্থূল নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। ধনীরা ভোগবিলাসে গা ভাসিয়েছে আর দরিদ্ররা হয়েছে শোষণ, বঞ্চনা আর নির্যাতনের শিকার।"[১]

সমগ্র দেশ জুড়ে অরাজকতা। এই ধর্মীয়সংকট অসমীয়া সমাজেও বঙ্গের মতো উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এই সময় উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের সঙ্গে একজোট হওয়াই স্থির করলো। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যোগ সাধিত হল। হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে উচ্চ সম্প্রদায়ের দেবদেবী ও নিম্ন সম্প্রদায়ের দেবদেবী এক আসনে পূজিত হতে থাকলেন। তবে যতই ধর্ম কর্মে মেতে উঠুক না কেন ভোগ-লালসায় লিপ্ত হয়ে মানুষ ভক্তি-শ্রদ্ধা ভুলে গেল। 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে বৃন্দাবন দাস বলেছেন"বিষয়ে সুখেতে সব মজিল সংসার।' তবে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ, ধর্মীয় গোঁড়ামি সমাজে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়ে। এই সময়ে বঙ্গে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। নাম সংকীর্তন প্রচার ও পাপী তাপী উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁর আবির্ভাব বলা হলেও আসলে তিনি নবজাগরণ নিয়ে এসেছিলেন। কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ভোগলালসায় মত্ত সমাজকে শোধরানো একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এমন অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেখানে ধর্মের নামে মানুষের ওপর অত্যাচার তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই সময় অর্থাৎ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে বৈষ্ণব আন্দোলনের জোয়ার সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বঙ্গ ও অসমকেও প্লাবিত করে। শ্রী চৈতন্য সমাজ-সংস্কার সাধনে আকৃষ্ট হন। জাতপাতের ভেদাভেদ দূর করার উদ্দেশ্যে নাম সংকীর্তন প্রচার করেন। অসমের শঙ্করদেব বৈষ্ণব ধর্মের মাধুর্যে অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা সমাজে আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বৈষ্ণব আন্দোলনের উদ্দেশ্য

ছিল " জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে জীবন মর্যাদা দান করা। নীচ কুলে জন্ম লাভ করেও জীবন যে অসার্থক নয়, ভক্তির বলে সে ব্রাহ্মণের থেকেও উচ্চ আসন লাভ করতে পারবে সেই ভাব জাগিয়ে মানবীয় মর্যাদাবোধ দান করা।"[২] মধ্যযুগের এই দু'জন মহাপুরুষের আবির্ভাবে জনজীবন অনেকটা সুস্থির হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ধর্মের নামে যে অরাজকতা বা ব্যভিচারে মানুষ লিপ্ত হয়েছিল সেখান থেকে উদ্ধার করে ভক্তির দ্বারা সমাজকে সুস্থ করে তুলতে শ্রী চৈতন্যদেব ও শঙ্করদেবের নিরন্তর প্রচেষ্টা বাংলা ও অসমের সমাজ সাহিত্য, সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত করে।

চৈতন্যদেব সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষ ভুলে 'মানবতা' প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর লক্ষ। চৈতন্য জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনী সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্র, রসশাস্ত্র, পদাবলী সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। তাঁকে নিয়েও লিখিত হয় 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেও লোকশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হল নাটক। তাই স্বাভাবিকভাবে নাটক রচিত হয়, এককথায় বলা যায় " বাংলার শিল্পে-সাহিত্যে-সঙ্গীতে-ভাস্কর্য এবং বাঙালির মননে চৈতন্যদেব অমর হয়ে আছেন।"[৩] তবে মধ্যযুগে অনাচার-ব্যভিচারে মত্ত মানব সমাজ ধর্ম-এর নামে শোষণ ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজকে রক্ষা করতে ভক্তিভাবজাগ্রত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

চৈতন্যদেব জাত-পাতের ভেদ ভুলে গিয়ে 'প্রেম ধর্ম' বিতরণে অগ্রসর হলেন। ভক্তিই যে ধর্মের মূল সেই চেতনা উন্মেষে তিনি সচেস্ট হলেন। জনগণকে আকৃষ্ট করতে তিনি নিজেও নাটগীত 'রুক্মিণী হরণ' ও 'দানলীলা'য় অভিনয় করেন। আসলে প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা নাটকে সুষ্ঠু রূপে গড়ে ওঠেনি। যাত্রা, পাঁচালি, নাটগীত সমূহের মধ্য দিয়ে দর্শকের মনে ভক্তিভাব উন্মেষের প্রয়াস লক্ষিত হয়। বাংলায় রাধাকৃষ্ণের কাহিনি বহুল প্রচলিত। রাধাকৃষ্ণের জীবনকেন্দ্রিক এবং দেবতার লীলা প্রচার উদ্দেশ্যে অভিনীত হতে লাগল নাটগীত। এইসব নাটগীত প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল দর্শক-শ্রোতার মনে ভক্তি রসের সঞ্চার করা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই চৈতন্যদেব নিজে অভিনয়ের মাধ্যমে ভক্তিরসে জনগণকে আপ্লুত করতে চেয়েছিলেন।

চৈতন্যদেব অভিনয় কলাকে সমর্থন করার কারণ নিহিত আছে 'নাট্যশাস্ত্র' ও 'অভিনয় দর্পণ'-এ। এই গ্রন্থদ্বয়ে চার প্রকার অভিনয়ের কথা বর্ণিত হয়েছে- আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক।[৪] এছাড়াও ভরত লোকোধর্মী ও নাট্যধর্মী দুই প্রকার অভিনয়ের কথা উল্লেখ করেছেন 'নাট্যশাস্ত্রে'। নাট্যধর্মী অভিনয় হল "কোন নাটক প্রচলিত কাহিনীর পরিবর্তন সাধন করে অতিপ্রাকৃত শক্তির আমদানী করে এবং অঙ্গাহার, নৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে স্বর্গীয় দৃশ্য ও স্বর্গীয় চরিত্র আশ্রয় করে তখন অভিনয় হয় নাট্যধর্মী। বাস্তব অবাস্তব ও পরিবেশের অতিরিক্ত বলে যা মনে হয় তা নাট্যধর্মী।"[৫] দেবতার মহিমা জ্ঞাপক নাটগীত সমূহ এই নাট্যধর্মী

অভিনয়ে স্থবির সমাজ-জীবনে ধর্মীয় ভাবনায় আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন ।শ্রীচৈতন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তিনি 'রাধাকৃষ্ণে'র মিলিত বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন। অবতার রূপেও পূজিত হলেন। ফলে চৈতন্যদেবের জীবন-লীলা অন্যতম বিষয় হয়ে উঠল। তাঁকে কেন্দ্র করে 'নিমাই সন্ন্যাস' পালা ও যাত্রার মধ্য দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিরসে সিক্ত করে তুলেছিল । চৈতন্যদেব নাটক ও অভিনয়কলার মাধ্যমে লোকশিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি নাটকের গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন বলেই অভিনয়ের মাধ্যমে সমাজ সংস্করণে অগ্রসর হয়েছিলেন।

বঙ্গে যেমন শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা স্থাপন করলেন ঠিক তেমনি অসমে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব। ১৩৭১ শকাব্দে অসমের আলিপুখুরীতে তাঁর জন্ম। তিনি নববৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তন করে অসমীয়া জাতি ও সমাজকে নতুনভাবে গড়ে তুললেন। মুসলমান শাসকদের ধর্মঘাতে অসমও জর্জরিত হয়েছিল। এছাড়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের জাত-পাতের ভেদাভেদ সমাজকে অস্থির করে তুলেছিল। যে সময় ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর মানুষের আধিপত্য চলছিল সেই সময় শূদ্রশঙ্করদেব উপনিষদের 'একেশ্বরবাদ' প্রতিষ্ঠা করে নব বৈষ্ণব ধর্ম স্থাপন করলেন। তিনিও ভক্তিরসের জোয়ারে সমাজে সমস্ত ভেদাভেদ দূর করতে প্রয়াসী হলেন। তাঁর হরিভক্তি প্রচারে ব্রাহ্মণরা বিচলিত হলেন কিন্তু তিনি মানবসমাজকে শোষণ ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে সব বাঁধা তুচ্ছ করে হরিনাম সংকীর্তনে মত্ত হলেন এবং সাধারণ মানুষকে একজোট করতে সক্ষম হলেন। শঙ্করদেব শুধু ভক্তিভাব প্রচার করেই ক্ষান্ত হননি তিনি সমাজ থেকে অশিক্ষার অন্ধকার দূর করতে এবং অসমীয়া সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি গঠনে নিজেই লেখনী ধারণ করেন। বলাবাহুল্য লোকশিক্ষা ও ভক্তিবাদের প্রচারের উদ্দেশ্যে নাটক রচনায় ব্রতী হন । শঙ্করদেব নতুন নাটক যেমন লিখলেন তেমনি অভিনয় কলার সৃষ্টি করলেন। এক্ষেত্রে উল্লেখনীয় যে "লৌকিক অনুষ্ঠানে ভাবরীয়ার অভিনয় ও ঢুলীয়ার অভিনয়, ধর্মের সঙ্গে জড়িত অনুষ্ঠান দেওধনী নাচ ছাড়াও পুতুল নাচ শঙ্করদেবের বহুকাল আগে থেকেই প্রাচীন অসমে প্রচলিত ছিল। "[৬] শঙ্করদেব যে নাটক প্রবর্তন করলেন তাকে অঙ্কীয়া নাট বলা হয়। সংস্কৃত এক অঙ্ক নাটকের মতো অঙ্কীয়া নাট লিখিত। তাঁর নাটের প্রধান আকর্ষণ- সূত্রধার চরিত্র। নাটকের ঘটনাবলী 'আহে সামাজিক লোক' (আসুন সামাজিক লোক) এই বলে দর্শকদের নাটকে কী ঘটতে চলেছে বুঝিয়ে দেন। শঙ্করদেব নাটসমূহ হল 'পত্নীপ্রসাদ', 'কালিয়দমন', 'কেলিগোপাল', 'রুক্মিণীহরণ', 'পারিজাতহরণ', 'রামবিজয়' নাটকে নান্দীশ্লোকের পর প্রবেশ গীতের উপস্থাপন করেছেন। আসলে দর্শকদের আকৃষ্ট করার সবরকম প্রয়াস তিনি করেছেন। শঙ্করদেবের অঙ্কীয় নাটের অপর এক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে " অঙ্কীয়া নাটে নান্দী ও সূত্রধার গায় এবং "ইতি সূত্র নিষ্ক্রান্তঃ'র পর পুরো নাটেভাবরীয়াদের উক্তি ছাড়াও কাহিনির পরম্পরা

রক্ষার জন্য গীত, কথা ও শ্লোকসূত্রধার আবৃত্তি করেন।" [৭] নাটকগুলোতে ভক্তির আতিশয্য বিদ্যমান ছিল তার প্রমাণ সহজলভ্য। এছাড়া নাটকে সামাজিক সমস্যা পরোক্ষে উল্লেখিত হয়েছে।' পত্নী প্রসাদ' নাটকে ক্ষুদিত কৃষ্ণের যজ্ঞ দ্রব্য দিতে অস্বীকৃত মিশ্র, ভারতী প্রমুখ ব্রাহ্মণদের স্ত্রীরা স্বামীর বিরুদ্ধে গিয়ে কৃষ্ণকে প্রসাদ দিয়েছিলেন এই ঘটনায় ব্রাহ্মণদের বিরোধের আভাস পরিলক্ষিত হয়। শেষে স্ত্রীদের কৃষ্ণ প্রেম দেখে ব্রাহ্মণদের মনে ভক্তিভাবের উদয় হয়। ভক্তিমার্গের প্রাধান্যে নাটকটি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে।

শঙ্করদেবের 'কেলিগোপাল' নাটকটির শৈলিগঠনে 'রাস' নৃত্যের আদর্শ গৃহীত হয়েছে। আসলে 'রাস' শব্দ বহু নর্তকীযুক্ত নৃত্য বিশেষ, রাস নৃত্যের সংজ্ঞায় আছে-

'নটৈগৃহীতকণ্ঠীনামন্যোন্যাও করশ্রিয়াম।
নর্ত্তকীনাং ভাব দ্রাসো মন্ডলীভুয় নর্ত্তনম।'

'কেলিগোপাল' নৃত্যগীত মুখর নাট। নৃত্যও গীতি কেলিগোপালের অভিনয়ের উপাদান ফলে এটি কাহিনি বা ঘটনা প্রধান নয় রসপ্রধান নাট রূপে প্রাধান্য পেয়েছে, কৃষ্ণই শঙ্করদেবের ছ'টি নাটকের প্রধান চরিত্র। 'ভাগবতপুরাণ', 'হরিবংশ', 'বিষ্ণুপূরাণ' প্রভৃতির কাহিনি অবলম্বনে তিনি নতুন আঙ্গিকে নাটক রচনা করলেন। বিশেষ করে গীতিধর্মীতা তাঁর নাটকের অন্যতম অঙ্গ। শুধু নাটকের শেষে নয় পুরো নাটকটির কাহিনি গীতের মাধ্যমে পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। সংগীত-নৃত্য সহযোগে নাটকের প্রকৃত শৈলী গড়ে তুলেছিলেন শঙ্করদেব। অঙ্কীয়া নাটের সাতটি গুণ দর্শকদের বিশেষভাবে আনন্দ দেয়-

সপ্তরসে নাটকর রচনা করয়। শুনিয়োকসপ্ত বিধ নাটর অন্বয়।।
গায়ন বায়ন সবে সভা জয় করে। সূত্র নাট্যগণে রসিকের মন হরে।
পন্ডিতে বুজিব শ্লোক কিরলা বচন। গীত অর্থ বুজিবেক দ্বিজ সভ্যগণ।।[৮]

চৈতন্যদেব ও শঙ্করদেবের আবির্ভাব এমন সময় হয়েছে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের মতো বঙ্গ ও অসমে সুস্থ-স্বাভাবিক সমাজ জীবন গড়ে ওঠেনি। মানুষ ধর্ম ভয়ে ভীত হয়েছে যার ফলে ধর্মের নামে চলেছে অকথ্য অত্যাচার। মানুষ নিষ্পেষিত হয়েছে বহুকাল ধরে। পাপীতাপী উদ্ধার ও সাধারণ মানুষের রক্ষার্তে এই মহারুপষদের অবির্ভাব। "ধর্ম'-এর নতুন সংজ্ঞা স্থাপন করলেন তাঁরা। আচার-বিচার নয়, ভগবানের জন্য ভক্তের আকুতি এবং ভক্তের জন্য ভগবান দয়া, মায়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে ভগবানের কাছে পৌঁছানোর পথ উন্মুক্ত করলেন। মানুষের হৃদয় গহনে সারা জাগাতে চৈতন্যদেবের নাট্য অভিনয়, তাঁকে কেন্দ্র করে লিখিত নাটক, পালা এবং শঙ্করদেবের সৃষ্ট অঙ্কীয়া নাট বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ভক্তির মাধ্যমে চেতনা জাগরণের যে পন্থা চৈতন্যদেব বা শঙ্করদেব অবলম্বন করেছিলেন তা নাটকের দ্বারা সহজেই মানবচিত্ত প্রভাবিত করেছে। নব চেতনা উন্মেষে চৈতন্যদেব ও শঙ্করদেবের এই নাট্যাদর্শ পরবর্তীকালে আধুনিক নাটকেও গৃহীত হয়েছে। এই দুই মহাপুরুষ

নাট্যচর্চায় তাঁদের অনন্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন বলতে হয়।

**সূত্র নির্দেশ**


১. তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, আগষ্ট ২০১১, পৃ.১৯

২. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা: অসমীয়া সাহিত্যব সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, সৌমার প্রকাশ, দশম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ ২০২০।

৩. তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রজ্ঞা বিকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, চতুর্থ সংস্করণ, আগস্ট ২০১১, পৃ.৩৯৪।

৪. অজিত কুমার ঘোষ: নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ১৫।

৫. তদীয়, পৃ. ২২।

৬. হরিনাথ শৰ্ম্মা দলৈ : শঙ্করদেব সাহিত্য প্রতিভা, বীণাপাণি আট প্রেছ, চতুর্থ প্রকাশ, চেপ্তেম্বর ১৯৯৮ ইং,পৃষ্ঠা ১২৭।

(মূল : লৌকিক অনুষ্ঠান ভাবরীয়ার অভিনয় আরু ঢুলীয়ার অভিনয় আরু ধর্মর লগত সম্বন্ধ থকা অনুষ্ঠান দেওধনী নাচর উপরিও পুতলা-নাচো শংকরদেবর বহুকাল আগে পরা প্রাচীন অসমত প্রচলিত আছিল।)

৭. তদীয়, পৃ. ১৩৩।

(মূল: অংকীয়া নাটকত নান্দী ও সূত্রধারেই গায় আরু 'ইতি সূত্র নিষ্ক্রান্তঃ'র পাছত গোটেইখন নাটতে ভাবরীয়ার সকলর উক্তির বাহিরে কাহিনীর পরম্পরা রক্ষাজনিত সকলোবোর গীত, কথা আরু শ্লোক সুত্রধারেই যে আবৃত্তি করে।)

৮. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা: অসমীয়া সাহিত্যর সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, সৌমার প্রকাশ, দশম সংস্করণ, পুনর্মদ্রণ ২০১৫, পৃ. ১১।


---

লেখক : **মাম্পি গুপ্ত,** সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আর্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি।

# মহুয়া গীতিকার আধুনিক রূপান্তর
# নাটক ও যাত্রার সীমায়

হিমাদ্রি মণ্ডল

(১)

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে দীনেশ চন্দ্র সেনের সম্পাদনায় *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকার* ১০টি পালা *মৈমনসিংহ গীতিকা* নামে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পালাগুলি প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বাংলা লোকসাহিত্যের এই শাখাটি নিয়ে দেশ-বিদেশে চর্চার পাশাপাশি নাটক, যাত্রা, চলচ্চিত্র, গীতিনাট্য, সংগীত, ছোটগল্প,কবিতা-ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে আধুনিক রূপান্তর শুরু হয়। ১৯২৫ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের ভূমিকা সম্বলিত 'কল্পতরু সারস্বত পরিষদ্' থেকে প্রকাশিত হয় *মৈমনসিংহ-গীতিকা*'র সবথেকে আলোচিত ও জনপ্রিয় পালা 'মহুয়া'র কাহিনি অবলম্বনে সুশীলকুমার সেন প্রণীত পঞ্চাঙ্ক নাটক মহুয়া। মন্মথ রায় 'মহুয়া' গীতিকার অনুকরণে লিখলেন *মহুয়া* (১৯৩০)। ১৯৪০ সালে নজরুল ইসলাম 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'-র কলকাতা কেন্দ্রের জন্য রচনা করলেন শ্রব্য গীতিনাট্য *মহুয়া*। 'মহুয়া' ও 'মলুয়া' পালার কাহিনি অবলম্বনে 'পল্লীকবি' জসীমউদ্দিন লিখলেন- *বেদের মেয়ে* (১৯৫১)। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হল আযীম উদ্দীন আহমদ-এর *মহুয়া* নাটকটি। নাজমুল আহসান-এর *মহুয়া পালা* (১৯৯২) এবং মনজুরুল হক মিলন-এর *মহুয়া সুন্দরী* (১৯৯৬) প্রকাশিত হয় বিশ শতকের শেষ দশকে।

২০০৫ সালে দেবব্রত দাসের রচনা ও পরিচালনায় 'কোচবিহার কম্পাস নাট্যসংস্থা' অভিনয় করে 'মহুয়া উপাখ্যান'। 'নয়ে নাটুয়া' নাট্যদল ২০১৭ সালের ৩ মার্চ একাডেমি মঞ্চে প্রথম অভিনয় করে গৌতম হালদার প্রদত্ত 'মহুয়া' পালার নাট্যরূপান্তর 'মৈমনসিংহ গীতিকা'। ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ 'নান্দনিক' (বর্ধমান) নাট্যদল মঞ্চস্থ করে সানি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও নির্দেশিত 'মহুয়া সুন্দরী'।

যাত্রার আসরে গীতিকার কাহিনিকে প্রথম আনেন ব্রজেন্দ্র কুমার দে।গীতিকার কাহিনি নিয়ে তাঁর প্রয়াস চাঁদের মেয়ে (১৯৩৬) । 'ঈশাখাঁ দেওয়ানের পালা'র (দেওয়ান ঈশাখাঁ মসনদালি) কাহিনি অবলম্বী এই যাত্রাপালার সাফল্য তাঁকে এতটাই উৎসাহিত করেছিল যে পরবর্তীতে তিনি প্রায় ন'টি যাত্রাপালা লিখলেন গীতিকার কাহিনি নিয়ে। সেই তালিকায় *মহুয়া*-ও (১৯৬১) ছিল। রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও 'মহুয়া' গীতিকার যাত্রা রূপ দেন পালার নামেই।

### অন্যান্য মাধ্যমে মহুয়া গীতিকার রূপান্তর

১৯৩৪ সালে নিউ থিয়েটার্স প্রযোজনা করে 'মহুয়া' সিনেমা। পরিচালক হীরেন বসু; কাহিনী/চিত্রনাট্য-মন্মথ রায়। উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করেন -দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী। ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশের পরিচালক আলি মনসুর নির্মাণ করেন 'মহুয়া' সিনেমা, ১৯৮৬ সালে শামসুদ্দিন টগর 'মহুয়া সুন্দরী' ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ সরকার ও মাস্টার অপেরার যৌথ অর্থায়নে নির্মিত হয় 'মহুয়া সুন্দরী' সিনেমা। কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা- রওশন আরা নীপা।

পার্থিব টেলিফিল্মস 'মহুয়া সুন্দরী' নামে টেলি ফিল্ম বানিয়েছিল। নাট্যরূপ জালাল উদ্দিন চৌধুরী; চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও পরিচালনা- পার্থিব মামুন। আবৃত্তি একাডেমি ৩৪তম প্রযোজনা ছিল মহুয়া পালার শ্রুতিরূপ-'পুঁথি-গীতে মহুয়া'। প্রয়োগ পরিকল্পনা ও ভাবনা মসুদ আহমেদ। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনা এম . আর. রুবেল। বাউল মেয়র গানের আকারে-'মহুয়া সুন্দরী নদের চাঁদ' নামে 'মহুয়া' পালার নবরূপায়ন করেছিলেন। লোকগাথাভিত্তিক অনুষ্ঠান 'মহুয়া সুন্দরী নদের চাঁদ' নামে সিরিয়াল হয়েছে। যার টিভি পান্ডুলিপি- আহমেদ ফখরুদ্দিনের; নির্দেশনা- মনজুর রহমান। কৃষ্ণা মিউজিক 'Folk Dance Drama Audio' 'মহুয়া সুন্দরী' নামে 'মহুয়া' পালার একটি ক্যাসেট প্রকাশ করেছিলেন।

সমকাল পত্রিকার ২৭ এপ্রিল ২০১৭ সালে 'নন্দন প্রতিবেদক' অংশে যে খবর ছাপা হয়েছিল তা থেকে জানা যায়- বিশ্ব নৃত্য দিবস ও নৃত্যলোকের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ২১ ও ২২ এপ্রিল বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালার মূল মিলনায়তনে নৃত্যলোকের সদস্যরা মঞ্চস্থ করে নৃত্যনাট্য 'মহুয়া'। এটির নির্দেশনায় ছিলেন- কবিরুল ইসলাম রতন।

নীরদ হাজরা ময়মনসিংহ গীতিকার গল্প (জুলাই ১৫, ১৯৮৭) 'বাংলা দেশের কিশোর কিশোরীদের হাতে তুলে দেবার' লক্ষ্যে অতি সংক্ষেপে গীতিকাগুলির গল্পরূপ দেন। সেখানে 'মহুয়া সুন্দরী বা নদ্যার চাঁদের কথা' নামে 'মহুয়া' গীতিকার কাহিনি রূপান্তরিত হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য *ভালবাসার গান* (অক্টোবর ১৯৯৩) নামক গ্রন্থে মৈমনসিংহ গীতিকার যে -কটি পালার গল্প-রূপান্তর করেন সেখানে 'মহুয়া' গীতিকা রয়েছে। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *মৈমনসিংহ গীতিকার কথামালা* (ফেব্রুয়ারীরি, ২০১৩) গ্রন্থে যে পাঁচটি গীতিকার কাহিনিকে গল্পরূপ দিয়েছেন তার প্রথমে রয়েছে 'মহুয়ার কথা' নামে 'মহুয়া' গীতিকার আখ্যান। স্বকৃত নোমান ছোটদের *পূর্ববঙ্গ গীতিকার গল্প* (নভেম্বর, ২০১৮) গ্রন্থের প্রথম গল্পটিও 'মহুয়া'।

প্রমথনাথ বিশী 'মহুয়া' পালা অবলম্বনে *প্রাচীন গীতিকা থেকে* (১৩৪৪) কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। কবি আবদুর রশিদ খান সনেটের আঙ্গিকে 'মহুয়া' পালার একটি নবরূপ দিয়েছিলেন। বাংলা প্রথম ব্যান্ড 'মহীনের ঘোড়াগুলি'র জন্মদাতা গৌতম চট্টোপ্যাধ্যায়

'মহুয়া সুন্দরী' নামে একটা মিউজিক্যাল তৈরি করেছিল, যার জন্য প্রায় কুড়িটা গান কম্পোজ করেছিলেন। আর কাকতালীয় একটি তথ্য হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *মহুয়া* (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় *মৈমনসিংহ গীতিকা* গ্রন্থ প্রকাশের পরে।

(২)

'মহুয়া গীতিকার কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত নাটক ও যাত্রার দু-একটি থেকে সামান্য কিছু দৃষ্টান্ত দিয়ে আধুনিক রূপান্তরের স্বরূপ ও রূপান্তরের কারণ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা যাক।

সুশীল কুমার সেনের *মহুয়া* নাটকের আধুনিক রূপান্তরের উল্লেখযোগ্য দিক হল- গীতিকার বিপরীতে হেঁটে মহুয়াকে অনুজ্জ্বল করে নদের চাঁদকে উজ্জ্বল করে তোলা। বাংলা অধিকাংশ নাটক ও যাত্রার নায়কের ধারা মেনে এখানে নদের চাঁদকে সাহসী, বীর করে দেখানো হয়েছে। পালায় মহুয়া নদের চাঁদকে ঘোড়ায় নিজের পিছনে বসিয়ে পালিয়ে ছিল, সেখানে নাটকে আমরা দেখছি নদের চাঁদই প্রস্তাব দিচ্ছে পালানোর। নদের চাঁদের নায়কোচিত গুণের আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে। পালায় সাধু তাকে নদীর জলে ফেলে দিলে সামান্য আত্মরক্ষাটুকুও যে নদের চাঁদ করতে পারে না, নাটকে তার মুখ থেকে আমরা শুনছি:

"মহুয়া" । কি গভীর অন্ধকার, কোথায় যাবে? নদীতে পড়লে আর কি তুমি বাঁচবে।

নদের চাঁদ। মহুয়া, নদীতে পড়তে আমার একটুও ভয় নেই, আমার ভাবনা শুধু তোমার জন্য।"[১]

তার আরও সাহসী উক্তি-

ন। মহুয়া, প্রাণের মমতা আমি করি না। নদীর গর্জ্জনকেও আমি ভয় করি না। প্রাণের মধ্যে যে ঝড় উঠেছে , নদীর ঢেউকে তার তুলনায় আমি অতি তুচ্ছ মনে করি।"[২]

হুমরার দলের লোকদের দ্বারা নদের চাঁদের হত্যার বিষয়টি পালাকার দ্বিজ কানাই-এর এতোই তুচ্ছ মনে হয়েছিল যে তিনি সে সম্পর্কে একটি শব্দও ব্যয় করেননি। সেখানে নাটকে বেদের দলের লোকজন তাকে হত্যার কথা বললে তার নির্ভীক, বলিষ্ঠ ঘোষণা: "সর্দ্দার, মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, আমি মৃত্যুর জন্য সে দিনই প্রস্তুত হয়েছিলাম, যেদিন তোমার কন্যাকে ভালবেসেছিলাম।"[৩] এমনকি শেষে মহুয়ার বুকের থেকে ছুরি তুলে নিয়ে নদের চাঁদ হুমড়াকে [র] হত্যার জন্য উদ্যত হয়। হুমড়ার প্রতি করুণাও করে! আরও আশ্চর্য শেষে নদের চাঁদ মহুয়ার মতো নিজের বুকে ছুরি বসিয়ে আত্মহত্যা করে নায়কের মর্যাদা ছিনিয়ে নেয়।

রূপান্তরে নদের চাঁদকেও ছাপিয়ে গেছে হুমড়া বেদে। এই নাটকে হুমড়া ব্রাহ্মণ সন্তান। শিশুকালে বেদেরা তাকে চুরি করে এনেছিল। নিজের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা থেকেই ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়াকে চুরি এমনটাই নাটককার দেখাতে চাইলেন।

হুমড়া এবং তার দলের লোকজনকে নাটককার বেদে বললেও তাদের কথাবার্তা, ভাবনা চিন্তা এতখানিই পালিশ করা যে তাদের বেদে ভাবতেই আমাদের অসুবিধা হয়। তারা যেন নিম্নবিত্ত শ্রেণীর, দরিদ্র পরিবারের সদস্য। এমনকি নাটকে তাদের কেন্দ্র করে নিম্নবিত্তের জাগরণও দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে হুমড়াকে মনে হয় রবীন্দ্রনাটকের ঠাকুরদা, দাদাঠাকুর জাতীয় চরিত্র। রাজা নদের চাঁদের থেকে হুমড়া রাজসুলভ আচরণ প্রত্যাশা করে (পুরুর কথা মনে রেখেছিলেন?)। মহুয়া নদের চাঁদকে ভালোবাসে এটি জানার পর যতটা আহত হয়েছে তার পিতৃসত্তা তার থেকে বেশি লাঞ্ছিত হয়েছে তার বেদে দলের নায়কসত্তা। হুমরাদের ঘর না থাকলেও জন্মস্থানের প্রতি তাদের মমত্বের খামতি নেই।

পালায় কোনো কমিক রিলিফের প্রয়োজন ছিল না। নাটকে সেটি প্রয়োজন। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাজপথে নাগরিকগণের কথোপকথনে সেটি আনা হল। রাজা নদের চাঁদের বেদের মেয়ে মহুয়ার জন্য নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে কোনো কানাঘুষো আমরা পালায় দেখি না। কিন্তু নাটকে সেটি দেখানোয় বিষয়টি বাস্তবোচিত এবং আরো গ্রহণযোগ্য হয়েছে। অবশ্য এই অংশে সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' -এর ব্যর্থ অনুকরণ অবাক করে আমাদের:

" ১ম। আঃ গেল যা, সকালে যাবে কেন? রাতে গেছে-রাতে-

২য়। তাই হ'লো, যার নাম রাত, তার নাম দিন। কথায় বলে যার নাম ভাজা চা'ল, তার নাম মুড়ি। ও -একই কথা।

১ম। রাত আর সকাল একই কথা। মরি, মরি, কি বিদ্যে! আম আর আমড়া এক কথা, চাল আর চাল্‌তা এক জিনিষ, আলু আর আলু বখ্‌রা এক পদার্থ!"৪

মন্মথ রায়ের *মহুয়া* অল্প সময়ে লেখা এবং মুদ্রিত হওয়ায় বহু অসঙ্গতিপূর্ণ , ঘটনাজটিল ও দুর্বল প্রকৃতির রচনা। মন্মথ রায় নিজে মৈমনসিংহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিজের জেলায় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ থেকে তাঁর নাট্য রূপান্তর এমন অনুমান করা যায়।

মূল নাটক শুরুর আগে রয়েছে 'পূর্বাভাষ' অংশ। সেখানে উদ্ধৃত হয়েছে 'মহুয়া' গীতিকার 'নদ্যার ঠাকুরের সঙ্গো মহুয়ার জলের ঘাটে দেখা'র বিখ্যাত দৃশ্যটি। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় 'মহুয়া' পালার রোমান্টিকতার দিকটিই বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। এ নাটকের চরিত্র পরিচিতি (এখানে ইঙ্গিত'নামে উল্লেখিত) অংশ থেকেই পাঠকের বিস্মিত হওয়া শুরু। নদেরচাঁদ [নদের চাঁদ] এখানে 'রাজা কীর্তিধ্বজ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত শ্যামাসুন্দরজী বিগ্রহের সেবাইত'। রাজাকন্যা মহুয়াকে ডাকাতেরা চুরি করে নিয়ে যাওয়ার সময় ডাকাতদের বাধা দিতে গিয়ে নদেরচাঁদের বাবার মৃত্যু হয়। ফলে নদেরচাঁদ কীর্তিধ্বজ চক্রবর্তীর যাবতীয় সম্পত্তির মালিক হয়। ব্রাহ্মণ কন্যা মহুয়া নাটকে হয়ে গেল রাজকন্যা আর

নদেরচাঁদ মহুয়ার পিতার সম্পত্তির রক্ষা কর্তা। এখানেও হুমড়া রা নির্লোভী, আদর্শবাদী চরিত্র।

'নয়ে নাটুয়া' দলের 'মৈমনসিংহ গীতিকা' আধুনিকতায় মোড়া। প্রসেনিয়ামে দর্শক আকর্ষণের কোনো উপাদানকে বাদ দেওয়া হয়নি। এই প্রযোজনার মহড়া দেখে দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় যে সমালোচনা লিখেছিলেন তা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হল এই নাট্যের আধুনিকতার বিষয়টি বোঝাতে-" লোকনাচে যখন জুড়ে যায় রাপ। শরীরী বিভঙ্গ পূবের হাওয়ায় মাখামাখি হয়েও খানিক পশ্চিমি। অপেরার ধাঁচে হাতে ওঠে মাইক্রোফোন। করিওগ্রাফ টপকায় লোক-অঙ্গের বেড়া।"[৫] গানগুলিতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। বিশেষ করে মহুয়াকে পাওয়ার আশায় নৌকার সদাগর যেভাবে গান গায় তাতে মনে হয় তিনি পালাগান গাইছেন না, গাইছেন আধুনিক বাংলা ব্যান্ডের গান। উল্লেখ্য 'নগরকীর্তন'-এর বিখ্যাত 'লালা...লা...' সুরটি এখানে ব্যবহৃত।

সানি চট্টোপাধ্যায় পালাগানের যাবতীয় শর্ত বজায় রেখে হিন্দু-মুসলিমদের জাতিগত বিদ্বেষকে হাজির করেন নদের-চাঁদ ও মহুয়ার ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য। হুমরা এখানে মুসলমান। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতীক নদের চাঁদের হাতে মেয়েকে তুলে দিতে তার জাত্যাভিমান বাধা দেয়:

খোদা না চায় এক জমিনে বাঁধতে আমার ঘর।
জাতশত্রু হাতে না করি আপন ছেড়ীরে পর।।"[৬]

নাটক শেষ হয় ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী দিয়ে-

" আজিও শুনি ধম্মের নামে বড় হানাহানি
ভিন্ন নয় তা জলের নামে আরেক কইলে পানি।।
উপর হতে দ্যাখছেন তিনি ভায় ভায়ে মারে।
শিশুর চোখেও জাত দেইখ্যা মায়ের কোল কাড়ে।।
বিচার কইর‌্যা দেইখ্যো ভাইরে হিন্দু মুসলমান।
এই কইয়াই সাঙ্গ করি মহুয়া পালার গান।।"[৭]

আমাদের মনে পড়ে যায় গুজরাট দাঙ্গা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জাতি দাঙ্গার স্মৃতি।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র *মহুয়া* যাত্রাপালার কাহিনির মিল মূল গীতিকার কাহিনির সঙ্গে খুবই কম। যাত্রায় মোট ১৮টি চরিত্রের দশটিই কাল্পনিক। মহুয়া এখানে বামুন ডাঙার রাজা সঞ্জয় রায়ের কন্যা। মহুয়ার অন্নপ্রাশনের দিন বেদেদের নাচ-গান, খেলার ব্যবস্থা রাখা হয়। দেওয়ান বিরিঞ্চি নিম্নবিত্তের প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতায় তাদেরকে হেয় করেন, তাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেন-" মেয়ের অন্নপ্রাশনে ঢাক বাজুক, ঢোল বাজুক, উলুধ্বনি হোক, শঙ্খধ্বনি হোক, তা বলে বেদের নাচগান শুনতে হবে? তাড়িয়ে দিন, ...।[৮] বেদেদের

চোরের দল ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না তিনি । নাটকের শুরুতেই নিম্নবর্গের সঙ্গে উচ্চবর্গের দ্বন্দ্বকে হাজির করা হল।

অন্নপ্রাশনের দিনেই কাঞ্চনপুর থেকে এসে নদের চাঁদ বামন ডাঙায় আশ্রয় প্রার্থনা করে দাদা ধর্মকেতুর হাত থেকে রক্ষা পেতে। কারণ ধর্মকেতু রাজপথে জ্যোতিষীর কাছে হাত দেখিয়ে জানতে পারে তার ভাই তার মৃত্যুর কারণ হবে। সেজন্য ধর্মকেতু হত্যা করতে চায় ভাইকে (কংসবধের কাহিনির প্রভাব?) । নদের চাঁদ শত্রু রাজ্যের মানুষ হওয়ায় রাজা ইতস্তত করতে থাকেন আশ্রয় দিতে। কিন্তু রানি ধরিত্রী রাজাকে স্পষ্ট জানান- " যাও রাজা। বিপন্নকে রক্ষা করতে যদি না পার, সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বনে চলে যাও।"[৯]

১৯৪৭-এর দেশভাগের ক্ষত ব্রজেনবাবুর মন থেকে মুছে যায়নি। দেশভাগের পর তাঁর জন্মভূমি ফরিদপুর তাঁর কাছে হয়ে গিয়েছিল বিদেশ, বিভুঁই। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ-এর বহু মানুষ সেদিন এমনই আশ্রয়সন্ধানী ছিল।

মূল পালায় হুমরা কেন ব্রাহ্মণের ছমাসের কন্যাকে চুরি করেছিল তার কারণ স্পষ্ট নয়। এখানে ব্রজেনবাবু উচ্চবিত্তের প্রতি নিম্নবিত্তের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষয়টি যুক্ত করেছেন। মহুয়ার অন্নপ্রাশনের দিন ছিল মানসিক কালীপূজা। সেখানে দশটা পাঁঠা বলি দেওয়ার কথা থাকলেও ঠিক সময়ে দেখা যায় 'কচি পাঁঠা' বাদে আর সবকটি রয়েছে। বামুন ডাঙার পুরোহিত হুমড়ার ছেলে মদনকে চোর সন্দেহে আটক করে। যদিও পাঁঠা চুরি যায়নি, দড়ি ছিঁড়ে পালিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক শোষণের চেনা রূপকে এখানে তুলে আনা হল। গরিব, অস্পৃশ্যদের চোর সন্দেহে শাস্তি দেওয়া যায়, জীবনও কেড়ে নেওয়া যায়। কিন্তু নিচের তলার মানুষরা চিরদিন শুধু মার খাবে না। তারাও ঘুরে দাঁড়াবে। সেটিই দেখান পালাকার।

হুমড়ার ভাই মানিক রাজা, পুরোহিত সবার সামনে প্রশ্ন তোলে-"কেন? করেছি কি আমরা? তোমাদের যে ভগবান, সে কি আমাদের ছিষ্টি করেনি? আমাদের ঘরবাড়ী নেই বলে কি আমরা বানের জলে ভেসে এয়েছি? আমাদের পিঠগুলো কি তোমাদের জয়ঢাক?"[১০] মদনও প্রতিবাদ জানায় অন্যায়ের। রাজা ও রাজপুরোহিতের সামাজিক আধিপত্যে আঘাত লাগে। দুজনে একযোগে মদনকে পদাঘাত করেন। সে আঘাতে মৃত্যু হয় মদনের। প্রতিশোধ নিতে বেদের দল চুরি করে মহুয়াকে। উল্লেখ্য এই যাত্রায় হুমড়া মহুয়াকে চুরি করেনি। কারণ তখন তাকে কাঞ্চন পুরের জেলে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছিলেন সেখানকার রাজা করঞ্জক। রাজা-রানি মনে মনে ঠিক করেন তাদের ছোটো মেয়ে জয়ন্তীর (কাল্পনিক চরিত্র) সঙ্গে নদের চাঁদের বিয়ে দেওয়ার কথা। যদিও শেষ পর্যন্ত পরজন্মে নদের চাঁদকে পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে জয়ন্তী আত্মহত্যা করে দিদির প্রতি কর্তব্য পালন করে ও নদের চাঁদের প্রতি তার প্রেমের গভীরতার প্রমাণ দেয় ।

এই পালায় নদের চাঁদকে হত্যা করতে মহুয়ার হাতে ছুরি তুলে দিয়েছে মানিক, হুমড়া নয়। হুমড়াকে আদর্শবাদী চরিত্র করে তোলা হয়েছে। সে ক্ষমার চোখে দেখতে চেয়েছে রাজাকে, ভুলে যেতে চেয়েছে সন্তান হত্যার বেদনা। যেখানে মানিক নিতে চেয়েছে প্রতিশোধ।

একসময় কাঞ্চনপুরের নম:শূদ্র রাজা করঞ্জক তার সৈন্যদল নিয়ে আক্রমণ করেন বামন ডাঙা, অন্যদিকে বেদেরাও বিদ্রোহ করে। জয় লাভ করেন করঞ্জক ও বেদেরা। কিন্তু লেখক দেখান সেই জয় আসে মূলত বেদেদের বীরত্বে। বেদের দলকে তিনি সাহসী, বীর করে দেখালেন। রাজা প্রাসাদ দখলের পর করঞ্জক ও তার সৈন্যাদক্ষকে তা কৃপা করে ছেড়ে দেয় হুমড়া। প্রতিশোধও নেয় না, মানবিকতার পরিচয় দেয়। বোঝা যায় নিম্নবিত্তের উত্থানের আদর্শ ছবি দেখাচ্ছেন নাটককার।

করঞ্জককে নম:শূদ্র রাজা করা ব্রজেন্দ্রকুমার দে-র উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এই সম্প্রদায়ের মানুষের কথা তাঁর লেখায় বারবার ঘুরে-ফিরে এসেছে। যেমন-সতীর ঘাট যাত্রায় মলুয়াকে করা হয়েছে নম:শূদ্র কন্যা। ভাগ্যের বলিতেও এই সম্প্রদায়ের প্রতি উপরতলার মানুষের ঘৃণার মনোভবের দিকটি উঠে এসেছে। মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছিলেন-"নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ দ্বিজ কানাই নামক কবি ৩০০ বৎসর পূর্বে এই গান রচনা করেন। প্রবাদ এই, দ্বিজ কানাই নমশূদ্র-সমাজের অতিহীনকুল-জাত এক সুন্দরীর প্রেমে মত্ত হইয়া বহু কষ্ট সহিয়াছিলেন, এজন্যই নদের চাঁদ' ও 'মহুয়া'র কাহিনীতে তিনি এরূপ প্রাণঢালা সরলতা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন।"[১২] এই তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিংবা সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ব থেকে তিনি এই কাজ করে থাকতে পারেন। তবে নম:শূদ্রজাতি ও তাদের ইতিহাস সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব গ্রন্থে যা বলেছেন কিংবা বিভিন্ন সূত্র থেকে যা জানা যায় তা থেকে একথাই মনে হয় তৎকালীন ভারতবর্ষের জাতপাতের সমস্যাটিই ব্রজেনকুমার দে-কে এরকম ভাবিয়েছিল। তিনি যে তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের কথা বলছেন তা এই ধরনের সংলাপ থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-" অপরকে হেয় করে কোন জাতি বড় হয় না, বড় হয় তার নিজের গুণে। আমাদের জাতি যেদিন কবি সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক আর ঋষিতে ছেয়ে যাবে, সেদিন কেউ আমাদের হেয় করে রাখবে না। জাতকে যদি তুলতে হয়, হৃদয়ে হৃদয়ে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে দিন, উচ্চ জাতির 'জ্ঞানের ভান্ডার' লুণ্ঠন করে আনুন, - তাদের কন্যাদের জোর করে টেনে আনবেন না।"[১২] স্বাধীনতার পর নিম্নবিত্তের সংরক্ষণ বিষয়ে বি. আর. আম্বেদকরের সওয়াল, তা নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন-আমরা সকলেই কমবেশী জানি। এখনও সংরক্ষণের বিষয় ভারতীয় রাজনীতিতে এক জ্বলন্ত সমস্যা। রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিনিয়ত এই নিয়ে ফায়দা লুটছে। ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর সময়েও দেখেছেন বিষয়টি। আর সেজন্য বারবার বিভিন্ন যাত্রায় তিনি তুলে আনতে চেয়েছেন নিম্নবিত্তের উত্থান, নম:শূদ্রদের জাগরণের বিষয়টি।

সুশীলকুমার সেনের মহুয়া'র মতো এখানেও নদের চাঁদকে সাহসী, বীরপুরুষ করে দেখানো হয়েছে। সুজন আক্রমণ করতে এলে সে তাকে গলাটিপে হত্যাই করে ফ্যালে প্রায়। সন্ন্যাসী (মূলে ছিল ব্রাহ্মণ), তাকে মা কালীর কাছে বলি দিতে গেলে তার বীরোচিত বক্তব্য- " দীর্ঘ অনশনে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি। নইলে তোমার এই লতার বন্ধন কবে আমি ছিঁড়ে ফেলতুম; তোমার এ আঘাত আমি সুদ সমেত ফিরিয়ে দিতুম; আর তোমার মায়ের কাছে তোমাকেই বলি দিয়ে সশরীরে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতুম। "[১৩] দুর্বলতার কারণে যে নদের চাঁদকে মহুয়া নিজের কাঁধে করে নিয়ে ব্রাহ্মণের থেকে পালিয়েছিল সেই নদের চাঁদ এখানে হয়ে গেল নায়ক। সন্ন্যাসী তাকে হাঁড়ি কাঠে মাথা দিতে বললে লাথি মেরে হাঁড়ি কাঠ সরিয়ে দেয় সে। যাত্রার দর্শক এ ধরনের বীর চরিত্র পছন্দ করেন 'পালাসম্রাট' তা ভালোভাবে জানতেন।

*মহুয়া* যাত্রাপালার ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রকুমার দে জানিয়েছিলেন- "অপরাজেয় নাট্যকার শ্রী মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' নাটকের অবিস্মরণীয় অভিনয় আমি দেখিয়াছি, নাটকখানিও বার বার পড়িয়াছি। এ নাটকে যদি তাহার প্রভাব কিছু পড়িয়া থাকে, সে আমার অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি। সেজন্য আমার দুঃখ আছে, কিন্তু লজ্জা নেই।" মন্মথ রায়ের নাটকের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। 'মহুয়া' গীতিকার নরনারীর প্রেমের ট্র্যাজিক আখ্যান, এখনে জাতপাতের দ্বন্দ্বের আখ্যানে পরিণত; পাশাপাশি নিম্নবিত্তের উত্থানেরও গল্প।

(৩)

নাথ গীতিকা আবিষ্কার ও প্রকাশ পেয়েছিল (১৮৭৮) মৈমনসিংহ গীতিকার প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে। তবু নাথ গীতিকার কাহিনির নব রূপায়নের আগ্রহ খুব বেশি দেখাননি পরবর্তী শিল্পীরা (সাইমন জাকারিয়ার ময়নামতী জ্ঞান এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম)। তার কারণ বোধহয় নাথ গীতিকা বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের, ধর্মীয় মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য। অন্যদিকে মৈমনসিংহ গীতিকা বা বৃহত্তর পূর্ববঙ্গ গীতিকার কাহিনি বা আখ্যান ধর্মের প্রভাব মুক্ত ('দস্যু কেনারামের পালা' এরকম দু-একটি দৃষ্টান্ত বাদ দিলে) কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষ,নরনারীর রোমান্টিক প্রেমাশ্রয়ী। রূপান্তরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে বোঝা যায় পরবর্তী শিল্পীরা যারা নাটক ও যাত্রার মধ্য দিয়ে *মৈমনসিংহ গীতিকা* বা *পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা*র কাহিনির আধুনিক রূপান্তর করেছেন তারা মূলত গ্রহণ করেছেন নরনারীর রোমান্টিক প্রেমের আখ্যান আশ্রয়ী পালাগুলিকে। আর অল্পপরিসরে ইতিহাস আশ্রয়ী গীতিকাকে।

নাটক ও যাত্রার ক্ষেত্রে গীতিকা নির্বাচনেও স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। নাটকের ক্ষেত্রে নরনারীর রোমান্টিক প্রেমের কাহিনি গুরুত্ব পেয়েছে ('মহুয়া', 'মলুয়া', 'চন্দ্রাবতী', 'কঙ্ক ও লীলা', 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা'; ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত 'দস্যু কেনারামের পালা')। অন্যদিকে যাত্রায় ঐতিহাসিক কাহিনি, যুদ্ধ-লড়াই ('ঈশাখাঁ দেওয়ানের পালা', 'রূপবতী', 'কঙ্কও লীলা',

'দেওয়ান ভাবনা', 'কমলা', 'চন্দ্রাবতী' ও 'দস্যু কেনারামের পালা', 'মলুয়া', 'সখিনা বিবি', 'সুজা তনয়ার বিলাপ', 'কাজলরেখা', 'আন্ধা বন্ধু')।

আসলে নাটকের দর্শক ও যাত্রার দর্শকের শ্রেণিগত এবং সামাজিক অবস্থানগত পার্থক্য ও দূরত্ব রয়েছে। তথাকথিত ভদ্র, শিক্ষিত, নাগরিক মানুষেরা নাটকের উপভোক্তা। অন্যদিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত (স্কুলের শিক্ষার কথা বোঝানো হচ্ছে) গ্রামীণ মানুষেরা যাত্রার দর্শক। তাদের জীবনে রোমান্স কাছে ঘেঁষতে পারে না। তারা মূলত চায় যুদ্ধ, লড়াই, বীরত্ব। নম:শূদ্রদের কথা, নিম্নবিত্তের উত্থান, হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির কথা এইসব মানুষের কাছে ইচ্ছাপূরণ বা স্বপ্ন পূরণের গল্প। যে স্বপ্নগুলো তাদের প্রতিদিন রাতে ঘুমের আগে চোখ বুজিয়ে আনে, কিন্তু কোনোদিন সত্যি হয়ে দেখা দেয় না।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বদল এখনও ভারতবর্ষের তুলনায় ততখানি হয়নি। গ্রামীণ অর্থনীতি অনেকখানি বজায় রয়েছে। সেজন্য দেখা যায় সে দেশে এখনও গীতিকার কাহিনিগুলি বারবার যাত্রা , নাটক, সিনেমায় উঠে আসছে। 'Youtube', ইন্টারনেট ঘাঁটলে দেখবেন কত তথ্য বেরিয়ে আসছে । অল্প পরিসরে 'মহুয়া' গীতিকা ছাড়া অন্যান্য গাতিকার রূপান্তরের তথ্য দেওয়ার অবকাশ নেই। তবু এটুকু বলা যায় বাংলাদেশে অধিকাংশ গীতিকার কিছু না কিছু আধুনিক রূপান্তর হয়েছে। আসলে এখনও মধ্যযুগীয় আদর্শবাদের 'আচারের মরুবালুরাশি'তে মুখ গুঁজে আমরা সার্থকতা খুঁজতে চাইছি । কিন্তু "আজকের নাগরিক জীবনে তো একেবারেই নয়, এমনকি গ্রামীণ জীবনেও বোধহয় সেদিনের সেই নিশ্চিন্দিপুরটি আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সর্বত্রই এখন বড় ব্যস্ততা, বড় কোলাহল। এ জগতে আর পক্ষিরাজে চড়ে রূপকথার রাজকুমারেরা আসে না। "[১৪] আর একথাও সত্য সহজ সরল ভাষায়, নির্জটিল ভঙ্গিতে উপস্থাপিত একটি গল্প (গীতিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য) দর্শককে সহজেই টানে। নিছক বিনোদনই অধিকাংশ দর্শক পেতে চান। গভীর ভাবনা, তত্ত্ব থেকে বেশিরভাগ দর্শক দূরে থাকতে পছন্দ করেন।

'নয়ে নাটুয়া' দল তাদের প্রযোজনার নাম দিয়েছেন- মৈমনসিংহ গীতিকা'। অথচ এটি 'মহুয়া' পালার নাট্যরূপান্তর। তাহলে এ ধরনের নাম কেন? আসলে এটা বিজ্ঞাপনীয় চমক। 'মহুয়া' পালা নিয়ে এত বেশি চর্চা হয়েছে যে আজ দর্শক সে নামে আকর্ষিত নাও হতে পারেন। সেজন্য আড়াল খোঁজা। গীতিকার উপস্থাপন রীতিকে সামান্য গ্রহণ করে গান, নাচ, অতি অভিনয়ে পালাকে অপেরার কাছাকাছি নিয়ে চলে আসা হল। নাগরিক সংস্কৃতি যে নিজস্ব শর্তেই গ্রহণ করে লোক উপাদানকে তা 'নয়ে নাটুয়া'র প্রযোজনার মতো প্রযোজনা দেখলে বোঝা যায়।

ব্রজেন্দ্র কুমার দে-র মহুয়া যাত্রাপালা গ্রন্থের শিরোণাম পৃষ্ঠায় গ্রন্থের নামের নিচে বড়ো বড়ো হরফে লেখা 'মহুয়া' [কাল্পনিক নাটক]। অথচ যাত্রার ভূমিকা অংশে গ্রন্থকার লিখেছিলেন- "ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্গত মহুয়া-নদের চাঁদের মর্মস্পর্শী কাহিনী অবলম্বনে "মহুয়া" নাটক রূপায়িত।" এ থেকে সহজে অনুমান করা যায় *মৈমনসিংহ গীতিকার* পালাগুলি তাঁর অজানা ছিল না। তাহলে এখন প্রশ্ন লেখক যাত্রাটিকে 'কাল্পনিক নাটক' বললেন কেন? এটিও এক ধরনের ব্যবসায়িক কৌশল। লেখক নিজের কৃতিত্বকে প্রচার করতে চান। কিন্তু নরনারীর প্রেম কাহিনি আশ্রয়ী রোমান্টিক প্রেম আখ্যান কেন ছদ্ম- ঐতিহাসিক হয়ে গেল? এর কারণ নিহিত রয়েছে সমকালীন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে যখন যাত্রা লিখছেন তখন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক যাত্রা বিশেষভাবে চলত। সামাজিক যাত্রা তখন তেমন জনপ্রিয় ছিল না। ফলে কাহিনিকে তিনি ঐতিহাসিক করে তুলতে চাইলেন ইতিহাসসঞ্জাত কিছু চরিত্র সৃষ্টি করে। তাঁর অন্যান্য যাত্রাতেও আমরা এই বিষয়টি লক্ষ করেছি। *সমাজের বলি* (উৎস- 'মলুয়া)তে বারো ভুঁইঞাদের অন্যতম ঈশা খাঁর পুত্র মুশা খাঁর কাহিনি আনা হয়েছিল, *সোনাই দীঘি*(উৎস-দেওয়ান ভাবনা')তে আনা হয়েছে নবান হোসেন শাহকে। ভাগ্যের বলি (উৎস- 'কঙ্ক ও লীলা'), *কবি চন্দ্রাবতী* (উৎস-'চন্দ্রাবতী ও 'দস্যু কেনারামের পালা') যাত্রাপালাতেও এ দৃষ্টান্ত মিলবে। অন্য যাত্রাপালা রচয়িতাদের ক্ষেত্রেও একই বিষয় আমরা দেখতে পাবো। প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত *মহব্বতের ইনাম* (উৎস-'মলুয়া') যাত্রার শিরোনাম পৃষ্ঠাতেও যাত্রাটিকে 'ঐতিহাসিক নাটক' বলা হয়েছে। লক্ষ করুন অধিকাংশ যাত্রাপালায় মূল গীতিকার নাম বজায় রাখা হয়নি। ব্যবসার স্বার্থে, নিজেদের ত্রুটিকে ঢাকতে এই পন্থা অবলম্বন?

আর রচনাগুলিকে 'যাত্রাপালা' না বলে 'নাটক' বলার কারণ হল লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান যাত্রা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের সংস্পর্শে এসে ধীরে ধীরে বদলে নিয়েছিল তার চরিত্র লক্ষণ। বিশিষ্ট যাত্রা গবেষক প্রভাত কুমার দাসের কথাতেও তার সমর্থন মিলছে। "ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগরুচির অনুবর্তনের ফলে যাত্রার মধ্যে নতুন উপাদানের সমন্বয়ে, তার বহিরঙ্গ বদল ঘটতে থাকে। শুধু বহিরঙ্গ বললে ভুল হবে, তার অন্তঃস্থ প্রকৃতিতেও যুগোপযোগী নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়।। সংগীতের ছন্দানুসারী কথোপকথনের সঙ্গে গদ্য সংলাপের সংমিশ্রণ, বিষয় ভাবনায় শুধু ধর্মীয় প্রভাবের পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটাতে থাকে। নিছক ধর্মপ্রচারের প্রবণতা ত্যাগ করে যাত্রা, জনরুচির শর্ত পূরণ করে বিনোদক হিসেবেও নিজের নতুন অস্তিত্ব গড়ে তুলতে থাকে,"[১৫] যাত্রা দলগুলির নাম হতে থাকে 'অপেরা' কিংবা 'নাট্য-কোম্পানী'। যেমন- 'সত্যম্বর অপেরা', 'রয়েল বীণাপাণি অপেরা', 'সত্যনারায়ণ অপেরা', 'নবরঞ্জন অপেরা', 'নিউ গনেশ অপেরা', 'আর্য অপেরা', 'জনতা অপেরা', 'অম্বিকা নাট্য-কোম্পানী',, 'নট্ট-কোম্পানী'। উল্লেখ্য 'মহুয়া' যাত্রা অভিনীত

হয়েছিল ‘সত্যেম্বর অপেরা’য়।

সেসময় বিভিন্ন থিয়েটার হলে যাত্রা মঞ্চস্থ হতো। এর প্রমাণ মিলবে বিখ্যাত *সোনাই দীঘি যাত্রা পালার* শিরোনাম পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনে- ‘বিশ্বরূপা, স্টার, রঙমহল, কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চে যাত্রা, থিয়েটার চিত্রজগতের বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে অভিনীত ...।” বিভিন্ন যাত্রাদল নিজেদের ‘যাত্রাদল’ না বলে ‘নাট্যদল’ বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। ব্রজেন্দ্রকুমার দে তাঁর দীর্ঘ যাত্রা জগতের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছিলেন মতিলাল রায়ের (১২৪৯-১৩১৫)অবসর গ্রহণের কিছু আগে যাত্রাপালা রচয়িতা হিসেবে আসেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়(১২৭৮-১৩৩৩)। তিনিই প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক পালানাটক রচনা করেন মথুর সা’র যাত্রা দলের জন্য। সালটি ১৯১০-১৯১৪। “ এই সময় থেকে যাত্রার দলগুলো একে একে মঞ্চের দাসত্ব বরণ করতে শুরু করে। মথুর সা- তো তাঁর দলের নামই দিলেন ‘মথুরানাথ সাহা থিয়েট্রিক্যাল যাত্রা পার্টি’। থিয়েটারের অনুকরণে যাত্রার সুর, নাচ, অভিনয়, সংলাপ - সবকিছুরই পরিবর্তন ঘটল। গীতাভিনয়গুলো অপেরায় পরিণত হল। হরিপদবাবু একটা নতুন রাস্তা খুলে দিলেন আর মথুর সা ও অন্যেরা মিলে যাত্রাকে সেই যে থিয়েটারের পদসেবায় নিয়োজিত করলেন, আজও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমরা করে চলেছি।”[১৬] ব্রজেন্দ্রকুমার দে থেকে শুরু করে যে-সকল যাত্রাপালাকার গীতিকার আধুনিক রূপান্তর ঘটাচ্ছেন যাত্রার মধ্য দিয়ে তাঁরা যাত্রা লিখছেন এমন এক প্রেক্ষাপটে। ফলে যাত্রাকে তাঁরা ‘নাটক’ বলবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।

আর একটি বিষয় হল সব যাত্রাপালা কিন্তু মুদ্রণ ভাগ্য লাভ করত না। কলকাতা বা ঢাকার (শহরের) দল অভিনয় করার পর যে যাত্রাপালাগুলি জনপ্রিয় (হিট ) হতো সেগুলিই প্রকাশকেরা ছাপতেন। প্রায় প্রতিটি যাত্রাপালার শিরোনাম পৃষ্ঠায় ‘কলিকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত’, ‘কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ.. দলে অভিনীত’ এই ধরনের কথা ফলাও করে লেখা থাকত। নাগরিক সংস্কৃতি কীভাবে লোকসংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে একটি মনে হয় তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

### উৎস নির্দেশ

১) সুশীলকুমার সেন, *মহুয়া*, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, কল্পতরু সারস্বত পরিষদ, ১৯২৫, পৃ.৪২
২) ঐ, পৃ. ৪৩
৩) ঐ, পৃ. ৬০
৪) ঐ, পৃ. ২৬
৫) *আনন্দবাজার পত্রিকা*, অনলাইন সংস্করণ, ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
৬) সানি চট্টোপাধ্যায়, ‘মহুয়া সুন্দরী’ (পাণ্ডুলিপি), পৃ. ১৫

৭) ঐ, পৃ. ৪৮
৮) ব্রজেন্দ্র কুমার দে, *মহুয়া*, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, নির্মল সাহিত্য মন্দির, সন ১৩৯৫, পৃ. ২
৯) ঐ,পৃ. ৬
১০) ঐ, পৃ. ১০
১১) দীনেশ চন্দ্র সেন (সম্পা), মৈমনসিহ-গীতিকা(১ম খন্ড, ২য় সংখ্যা), চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, করিকলিকাতা বিশ্বব্যিদ্যালয়, ১৯৯৩, পৃ. ভূমিকা (২৩)
১২) ব্রজেন্দ্রকুমার দে, মহুয়া, পূর্বোক্ত, পৃ.৮৪০৮৫
১৩) ঐ, পৃ. ১৪৮
১৪) বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'ভালবাসার গান', *ভালবাসার গান*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, অন্বিষ্ট, বীরাষ্টমী কার্তিক ১৪০০; অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ. ২৫
১৫) প্রভাত কুমার দাস, ''যাত্রা-থিয়েটার পারস্পরিকতা : বিনিময় ও বিরোধিতা', *যাত্রা-থিয়েটার ও অভিযাত্রা*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, কালিন্দী ব্রাত্যজন, বইমেলা ২০১৬, পৃ. ২
১৬) ব্রজেন্দ্রকুমার দে, *বাংলার যাত্রা নাটক*, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, দিশারি প্রকাশনী, পৌষ, ১৪১৭; জানুয়ারি, ২০১১, পৃ. ৯-১০

লেখক : **হিমাদ্রি মন্ডল,** গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

# চিত্রাঙ্গাদার প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গাদা’-র আঙ্গিকে একটি আলোচনা

সুমনা ভট্টাচার্য্য

**সারসংক্ষেপ:** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেবলমাত্র কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, ইত্যাদির জন্য সুপরিচিত নন, তাঁর রচনার অন্যতম একটি দিক হলো জীবনের শেষ বয়সে রচিত নৃত্যনাট্যগুলি যথা, চিত্রাঙ্গাদা, চন্ডালিকা ও শ্যামা। নৃত্য ও নাট্যের সহযোগে রচিত এই নৃত্যনাট্যগুলি আজও কালজয়ী, যেগুলির মূল ভাবমূর্তিই হল প্রেম। তিনি চিত্রাঙ্গাদা নৃত্যনাট্যের চিত্রাঙ্গাদা চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের ঘটনা উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। সাধারণভাবে আমরা মানুষের বাহ্যিক সৌন্দর্য তথা রূপকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখাতে চেয়েছেন যে অন্তরের ভালোবাসা তথা মানুষের গুনাবলীই সর্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। বাহ্যিক সৌন্দর্যের ভালোবাসা ক্ষণস্থায়ী অন্যদিকে অন্তরের ভালোবাসা চিরস্থায়ী, যার দ্বারা সব কিছুকেই সহজে জয় করা যায়। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত বাহ্যিক মোহ কাটিয়ে অন্তরের ভালোবাসাকে গ্রহণ করা। চিত্রাঙ্গাদা প্রথমাবস্থায় অর্জুনকে তার প্রাপ্ত বাহ্যিক রূপের মোহে মোহিত করলেও , তার অন্তর আত্মা তা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। এই আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিভবে চিত্রাঙ্গাদা চরিত্রের আঙ্গিকে প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন সে সম্পর্কে একটি বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

**সূচক শব্দ :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; নৃত্যনাট্য; চিত্রাঙ্গাদা, প্রেমের দ্বন্দ্ব; প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্ব।

**সূচনা:** সহজাত এবং সৃষ্টিশীলতা গুণে পূর্ণ রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন সৃষ্টিকর্মে নিজেকে নিমজ্জিত করেছেন। এক পাড় ভেঙেছেন আর সেই পাড় ভাঙা মাটি দিয়ে গড়েছেন আরেক পাড়। গতানুগতিকতার গন্ডিতে তিনি কোনদিনই নিজেকে নিমজ্জিত করেননি। কবিতা থেকে গল্প; গল্প থেকে নাটক, উপন্যাস; কাব্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য; গদ্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য সর্বত্রই তিনি নিজের সৃজনশীল প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই সমস্ত সৃজনশীলতার মূলমন্ত্রটি হল প্রেম। প্রেমকুসুমের চরণচিহ্ন তাঁর রচনাকর্মের মূল প্রেরণা। ঈশ্বর, প্রকৃতি, জীবজগৎ সমস্তই এক অটুট প্রেমের বৃত্তে বৃত্তায়িত হচ্ছে। প্রথম জীবনে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের লেখনি অবলম্বনে এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার উপর ভিত্তি করে লেখেন ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’ (১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় প্রেমতত্ত্ব আলোচনা করেন অচলিত রচনার অন্তর্গত ‘বিবিধ প্রসঙ্গা’ (১৮৮৩) ও আলোচনা (১৮৮৫) গ্রন্থে। তাঁর প্রেম চিন্তা সুদীর্ঘ জীবনকে অতিক্রম করে জীবনের শেষ প্রান্তে রচিত নৃত্যনাট্যগুলিতে বেজেছে বিচিত্র প্রেম রাগিনীতে। এই আলোচনায় তার জীবনের শেষ প্রান্তে রচিত নৃত্যনাট্য ‘চিত্রাঙ্গাদা’ -র মধ্যে কিভাবে প্রেমের দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত

হয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

**আলোচনা :** চিত্রাঙ্গাদা নারী চরিত্রটি কবি মহাভারত থেকে গ্রহণ করলেও তাকে এক বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন তার ‘চিত্রাঙ্গাদা’ কাব্যনাট্য তথা নৃত্যনাট্যে। কবি তাঁর রচনায় চিত্রাঙ্গাদার দ্বৈতরূপের পরিচয় দিয়েছেন। নৃত্যনাট্যের শুরুতে দেখি মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গাদা পিতার ইচ্ছায় পুত্ররূপে পালিত হন। পিতা তাকে ক্ষত্রিয় বংশের পুরুষশ্রেষ্ঠ করবার বাসনায় পুরুষের ক্ষাত্রশক্তি ও বিদ্যাকে সমর্পিত করেন। তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং সঞ্চিত বিদ্যার প্রভাবে চিত্রাঙ্গাদা প্রথমে তার নারীত্ব শক্তিকে অগ্রাহ্য করে। তার এই নারীত্বের প্রথম উন্মেষ হয় দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্যয়ত অর্জুনকে প্রথম দর্শনের পরে চিত্রাঙ্গাদার মন মেতেছে আত্মউদ্দীপনার গানে-

“ ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়, আয়রে আমার
শুকনো পাতার ডালে,
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে। ”[১]

চিত্রাঙ্গাদার চিরপ্রতীক্ষারত নারীত্ব যেন এই রকমই একটি শুভ মুহূর্তের অপেক্ষাতেই ছিল। এই প্রথম সে অনুভব করলো সত্য-সুন্দরের আকর্ষণ। আজ চির অবহেলিত লজ্জিত প্রেম দীপ্ত আলোকে প্রস্ফুটিত-

“বধূ, কোন আলো লাগলো চোখে
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে।
ছিল মন তোমারি প্রতীক্ষা করি
যুগে যুগে দিন রাত্রি ধরি,
ছিলো মর্মবেদনাঘন অন্ধকারে
জন্ম-জনম গেল বিরহশোকে।”[২]

এরপর চিত্রাঙ্গাদা যখন নূতন আভরণে সজ্জিত হয়ে অর্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করে তখন অর্জুন তাকে প্রত্যাখ্যান করে। অর্জুনের অবজ্ঞাপূর্ণ প্রত্যাখ্যানে চিত্রাঙ্গাদার মনে আত্মগ্লানির সঞ্চার হয়।

ব্যথিত হৃদয়া চিত্রাঙ্গাদা প্রেমে ব্যর্থতার জন্য তার রূপহীনতাকে দায়ী করে মদনের তপস্যায় নিজেকে নিমজ্জিত করে

“আমার এই রিক্ত ডালি
দিব তোমারি পায়ে।
দিব কাঙ্গালিনীর আঁচল
তোমার পথে পথে, পথে বিছায়ে।
যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু
তারি ফুলে ফুলে হে অতনু, তারি ফুলে

আমার পূজা-নিবেদনের দৈন্য
দিয়ো দিয়ো দিয়ো দিয়ো ঘুচায়ে।"[৩]

এইরূপ অবস্থায় চিত্রাঙ্গাদা এক বৎসরের জন্য যৌবন ও নারীত্ব লাবণ্যের বর প্রাপ্ত হয়।

" আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি
আনন্দ বিষাদে মন উদাসী
পুষ্প বিকাশের সুরে
দেহমন উঠে পুরে,
কি মাধুরী সুগন্ধ
বাতাসে যায় ভাসি।"[৪]

চিত্রাঙ্গাদার মনের গহনে অনুরণিত বাঁশির সুরে তার সমস্ত অঙ্গা যেন আশার আলোতে ভরে ওঠে, মনে হয় সে তো সেই পরিচিত চিত্রাঙ্গাদা নয়। এরপর মুহূর্তেই তার অন্তর আমিত্ব তাকে নাড়া দেয়

" আমি শুধু এক রাত্রে ফোটা
অরণ্যের পিতৃ মাতৃহীন ফুল,
এক প্রভাতের শুধু পরমায়ু,
তারপরে ধুলিশয্যা
তারপরে ধরণীর চির-অবহেলা।"[৫]

এরপর নবরূপে সজ্জিতা অপরূপা চিত্রাঙ্গাদাকে দেখে অর্জুন তাকে প্রেম নিবেদন করে।

"হে সুন্দরী, উন্মথিত যৌবন আমার
সন্ন্যাসীর ব্রতবন্ধ ছিল ছিন্ন করি। "[৬]

কিন্তু হায়! যে প্রেমপ্রাপ্তির আকাঙ্খায় চিত্রাঙ্গাদার এত তপস্যা, সেই চির কাঙ্খিত প্রেম আজ তার কাছে ধরা দিয়েছে কিন্তু সেই প্রেমের পরিপূর্ণ আস্বাদ চিত্রাঙ্গাদা গ্রহণ করতে পারছে না। প্রেম প্রাপ্তির পর মুহূর্তেই জেগে উঠেছে তার অন্তঃসত্ত্বা। যে অর্জুন একদিন ব্রহ্মচর্য ব্রতের অহংকারে তাকে পরিত্যাগ করেছিল আজ সেই অর্জুনই তার কাছে আত্মনিবেদন করেছে। চিত্রাঙ্গাদার বুঝতে কোন দ্বিধা হয় না তার দেবদত্ত নবরূপে ভুলেছে অর্জুন। চিত্রাঙ্গাদা রাজকন্যা এবং আত্মসম্মানী। সে কিছুতেই তার এই বর প্রাপ্ত রূপের মোহে প্রাপ্ত প্রেমকে মেনে নিতে পারছিল না। যে আত্মনির্ভরতা ও দৃঢ়তা দিয়ে সে তার প্রেমের তথা স্বামীর অন্তর জয় করতে চেয়েছিল, সেই বিশ্বাসী অন্তর উপেক্ষিত হল। অর্জুনকে সে অন্তর স্পর্শই করল না। তার বাস্তব, স্বাভাবিক অন্তঃসত্ত্বা পরাজিত হল দেবদত্ত বাহ্যিক রোমান্টিক সত্ত্বার কাছে। এই অন্তঃসত্ত্বার পরাজয়কে কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি। বাইরের সৌন্দর্যের জ্বালায় দগ্ধ তার অন্তঃসত্ত্বা। ভিতরের আমিত্ববোধে সে বারবার অর্জুনকে সতর্ক করেছে।

" সে আমি যে আমি নই, আমি নই-
হায় পার্থ, হায়,

সে যে কোনো দেবের ছলনা।
যাও যাও, ফিরে যাও বীর।
সৌর্য বীর্য মহত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়ে-
যাও যাও ফিরে, যাও।।"[৭]

কবি এখানে চিত্রাঙ্গদার দুটি সত্ত্বার দুটি রূপ একটি চরিত্রের মধ্যে তুলে ধরেছেন। তার বাইরের রূপ যা বাইরের আমি এবং অন্তরের রূপ যা অন্তরের আমিকে প্রকাশ করে। দ্বন্দ্ব তার এই বাইরের রূপময়ী সত্ত্বার সঙ্গে প্রেমময়ী সত্ত্বার, বাইরের আমি অর্জুনকে ভোলালেও ভিতরের আমি তাতে পরিতৃপ্ত নয়, প্রেমের বৈরাগী চরিত্র রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মধ্যে নেই। যে প্রেম তার প্রেমাস্পদ ছাড়া আর সমস্ত কিছুকেই মূল্যহীন মনে করে, এমনকি সে নিজেও নিজেকে তুচ্ছ বলে মনে করে, সেই চিত্রতো রবীন্দ্রচিত্রাঙ্গদার নয়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমের রাধাভাব রবীন্দ্রচিত্রাঙ্গদার মধ্যে একেবারেই লক্ষ্য করা যায় না। এ চিত্রাঙ্গদা বৈরাগ্যবতী থেকে অনেক বেশি বীর্যবতী।

প্রেমে রূপের সার্থকতার কথা অস্বীকার করা যায় না, কারণ তার অন্তর ও বাইরের মিলনেই প্রেমের সার্থকতা। এই সম্বন্ধে বিভিন্ন কবি বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। যেমন Robert Herric এর মতে-" আজ যে কুসুম হাসিতেছে, কাল সে শুকাইয়া যাইবে। সুতরাং জীবনের প্রারম্ভে বিবাহ না করিলে সারাজীবন অপেক্ষায়ই কাটাইয়া দিতে হইবে।"[৮]

আবার Thomas Carew নারীর অন্তরের সৌন্দর্য দিয়েই প্রেমিকের মন ভোলানোর পক্ষপাতী। কবি Thomas Carew সত্যকারের সৌন্দর্য (The True Beauty) সম্বন্ধে বলেছেন " গোলাপের মতো রক্তিম কপোল বা প্রবালের মতো অধরকে যে ভালোবাসে তাঁহার বাসনার অগ্নিশিখা একদিন নিবিয়া যাইবে। কারণ, মহাকাল এই সৌন্দর্যের ধংসের সূচনা করিবে। দৃঢ় সবল সহজ মন ও হৃদয় লইয়া যেখানে সমান প্রেমে প্রশান্ত বাসনার দ্বারা দুইটি হৃদয়ের চিরস্থায়ী বন্ধন হয় না, সেখানে সত্যকারের প্রেম নাই, সৌন্দর্য সেখানে মূল্যহীন।"[৯]

প্রেম সম্বন্ধে ব্রাউনিং ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার মিল দেখতে পাওয়া যায়। ব্রাউনিং এর 'Meeting at Night', 'Parting at Morn' এবং রবীন্দ্রনাথের রাত্রে ও প্রভাতে কবিতাগুলি আমাদের তাঁদের প্রেম সম্বন্ধে ধারণা আরও স্পষ্ট করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদাকে তার রূপ সৌন্দর্য ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। তার বাইরের সৌন্দর্য বারবার অন্তরকে করাঘাত করেছে। তার কাছে বাইরের সৌন্দর্যের চেয়ে অন্তরের আমিত্বই সর্বাগ্রে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা অনেক বেশি বাস্তববাদী। সে জানে তার এই ছলনার রূপ ধরতে অর্জুনের খুব বেশি সময় লাগবে না এবং যে জীবন তারা যাপন করছে তাতে একদিন ক্লান্তি আসবেই। তাই মিলনের পর মুহূর্তেই এই ক্ষণিক মিলনের আনন্দটুকু নিয়েই

চিত্রাঙ্গাদা আবার মদনের দ্বারস্থ হয়, তার এই বাহ্যিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে নেবার জন্য। আনন্দকে চিত্রাঙ্গাদা কালের সঙ্গে ধরে না রেখে শুধুমাত্র আনন্দের মধু পান করতে চেয়েছেন। আমিত্বের পর্বে ভরপুর চিত্রাঙ্গাদার রূপের ছলনা ধরা পড়ার আগেই তার কাছে সত্য উদ্ঘাটন করতে চেয়েছে।

"শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
সহজে হতে দাও শেষ
সুন্দর যাক রেখে স্বপ্নের রেশ,
জীর্ণ কোরো না, কোরো না,
যা ছিল নূতন।।"[১০]

সংসারের মধ্যে রোমান্টিক প্রেম কে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাই তার এই প্রণয়িনী মূর্তিকেই চিত্রাঙ্গাদা ধরে রাখতে চেয়েছে চিত্রাঙ্গাদার অন্তর আমিত্বের প্রাপ্য সমস্ত সোহাগ আদর গ্রাস করেছে তার সৌন্দর্যময়ী বাইরের আমিত্ব। তাই তার প্রণয়িনী রূপের সমস্ত আনন্দ আস্বাদনের আগে সে গৃহিনী রূপে যেতে চায়না। এক্ষেত্রে কোনো ছলনার আশ্রয় নিতে সে রাজি নয়। তাতে যদি অর্জুন তাকে পরিত্যাগ করে সে সম্মত কিন্তু এভাবে তার প্রেমকে চিত্রাঙ্গাদা পেতে চায় না। মদন তাতে আশ্বস্ত করে-

" না না না সখী , ভয় নেই , ভয় নেই-
ফুল যবে সাঙ্গ করে খেলা
ফল ধরে সেই।।"[১১]

এরপর সেই চির বাস্তব সত্য অর্জুন এর কর্মবিমুখ প্রেমে ক্লান্তি আসে এবং সেই মুহূর্তেই রাজকুমারী চিত্রাঙ্গাদার কথা তার কানে আসে। তাকে দেখার জন্য সে ব্যাগ্র। এইসময় অর্জুনের মনে কুরূপী চিত্রাঙ্গাদার পরিচয় দিয়ে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছে চিত্রাঙ্গাদা নিজেই। এখানেই চিত্রাঙ্গাদার চরিত্রের বিশিষ্ট দিক। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গাদা এখানে রূপের আঁচলে মুখ ঢাকা প্রেমকে মুক্তি দিতে চেয়েছে হৃদয়ের আঁচলে। অর্জুনকে বার বার বলেছে-

ছি ছি, কুৎসিত কুরুপ সে।
হেন বঙ্কিম ভুরুযুগ নাহি তার,
হেন উজ্জ্বল কজ্জল আঁখিতারা।"[১২]

এমন নয়নভোলানো প্রেম, এমন সুন্দর মুখ কিছুই তার নেই কিন্তু তা সত্ত্বেও অর্জুন তার হৃদয় দিয়েই তার প্রেমকে অনুভব করেছে। রূপ সেখানে মূল্যহীন, তুচ্ছ। অন্তর আমির সৌন্দর্যে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বপূর্ণ চিত্রাঙ্গাদাই তার হৃদয়ে পূজনীয়। চিত্রাঙ্গাদা জয়ী হয়েছে প্রেমের যুদ্ধে শেষে তার বহি:সৌন্দর্যের পরিণতি ঘটেছে অন্তর সৌন্দর্যে আর সেই অন্তরসৌন্দর্য দেখেই অর্জুন ধন্য।

**উপসংহার:** রবীন্দ্রনাথ নারীত্বের জাগরণ ঘটিয়েছেন প্রেমের মধ্য দিয়ে। চিত্রাঙ্গাদার সৌন্দর্য

এ যেন বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য- আদি সৃষ্ট জলের মধ্যে যেমন সৃষ্টির প্রভাত, তেমনিভাবেই চিত্রাঙ্গদাকে সরোবরের জলে স্নান করিয়ে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে একাত্ম করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, চিত্রাঙ্গদা শুধু ব্যক্তি রমনীই নয়, বিশ্বসৃষ্টি সৌন্দর্য, পদ্মের উপমায় তারই প্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বশক্তি ও সৌন্দর্য এখানে মিলে গেছে। চিত্রাঙ্গদার বিশ্ব সৌন্দর্যের কাছে ধরা দিয়েছে অর্জুন। অর্থাৎ এই চিত্রাঙ্গদার চরিত্রের মধ্য দিয়ে কবি নারীত্বের জয়গান করেছেন, সৃষ্টির জয়গান করেছেন এবং সেখানে চিত্রাঙ্গদা আপনাতে আপনি অটল মূর্তি।

**উল্লেখপঞ্জি ঃ**

১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, স্বরবিতান ১৭ (নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৪৩
২) ঐ ৩) ঐ ৪) ঐ ৫) ঐ ৬) ঐ ৭) ঐ
৮) শীল বৈদ্যনাথ, রবীন্দ্রকাব্যে নারী, ইউ.এন.ধর এ্যান্ড সন্স প্রা. লি., কলিকাতা-১২,১৩৭৭
৯) ঐ
১০) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, স্বরবিতান ১৭ (নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, বৈশাখ, ১৩৪৩
১১) ঐ
১২) রায় বার্নিক, রবীন্দ্রনাথের নাটকের উৎস, সিগমা, কলকাতা - ৯, ডিসেম্বর, ১৯৮৭

**গ্রন্থপঞ্জী ঃ**

১) কুন্ডু প্রণয়কুমার, রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা - ৯, জানুয়ারী, ১৯৬৫
২) সরকার আলো, রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গঃ সাংগীতিক প্রয়োগ, সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ বিধান সরণী, কলিকাতা - ৬, জানুয়ারী, ১৯৮৬
৩) ভট্টাচার্য আশুতোষ, রবীন্দ্র নাট্যধারা, সংস্কৃতি প্রকাশন, ২০ হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১, ১৯৬৬.
৪) সিকদার অশ্রুকুমার, রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য, আনন্দ পাবলিসশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ১৪, বৈশাখ, ১৩৭৪
৫) বিশী প্রমথনাথ, ববীন্দ্রনাট্য প্রবাহ, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭৩, পৌষ, ১৩৫৫
৬) ভট্টাচার্য উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কোলকাতা, বৈশাখ, ১৩৬১.
৭) মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, রবীন্দ্র সমীক্ষা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮.

লেখক ঃ **সুমনা ভট্টাচার্য্য,** সহকারী অধ্যাপক, সঙ্গীত বিভাগ, মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

# প্রবহমান নাট্যচর্চায় দক্ষিণ দিনাজপুর

দোয়েল চক্রবর্তী

**সারসংক্ষেপ :** অবিভক্ত দিনাজপুরে ১৮৮৯ সাল থেকে যে নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল তা দীর্ঘ ১৩৩ বছর ধরে অক্ষুন্ন রয়েছে। দিনাজপুর থেকে নাট্যব্যক্তিত্ব মন্মথ রায় যে নাট্যচর্চা শুরু করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি 'মুক্তির ডাক ' ১৯২৩ সালে নাটকটি বাংলা নাট্য জগতে একাঙ্ক নাটক হিসেবে স্বীকৃতি পায়। স্বাধীনতার পরে দক্ষিণ দিনাজপুরে পূর্ব বাংলা থেকে বেশ কিছু সক্ষম অভিনেতা, পরিচালক, যন্ত্রসংগীত স্রষ্টা অনেকেই বালুরঘাটে এসে দক্ষিণ দিনাজপুরের থিয়েটারকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেন। কলকাতাকে পরিহার করে ষাটের দশক থেকে বালুরঘাটে বসে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর সৃষ্টিকর্ম আজও চালিয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার থিয়েটারকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবার জন্য। তাঁর রচিত কিছু নাটক পশ্চিমবাংলা ছাড়াও বিহার, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি ও আরো কিছু রাজ্যে বিভিন্ন দল যেমন অভিনয় করছে, সেরকমই তাঁর নিজস্ব দল ত্রিতীর্থ অভিনয় করে দর্শক মনে চিরস্থায়ী দাগ কাটতে পেরেছে। মনে করা হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নাটকের প্রবাহমানতায় এদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন সেমিনার এবং নাট্য উৎসবে উৎসাহিত হয়ে আজকে এই জেলার বিভিন্ন ব্লক এবং কিছু কিছু গ্রাম নাট্য প্রযোজনায় একদল মানুষকে উৎসাহিত করে চলেছে।

**কী ওয়ার্ড :** মন্মথ রায়, হরিমাধব মুখোপাধ্যায়, নির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী

অনুকরণ করার প্রবণতা সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের মধ্যে রয়েছে। মহাভারতের কিছু কাহিনী নিয়ে কিছু মানুষ চারণ বেশে কথকতার আকারে বহু প্রাচীনকাল থেকে একক অভিনয় করে জনগণের মনে পৌঁছে দিতেন। এটা শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয় প্রাচীন গ্রিসে যখন সম্রাটরা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আসতেন, তখন কিছু মানুষ যুদ্ধের অভিনয় করতে করতে প্রচুর দর্শকের সামনে হেঁটে যেতেন। ফাহিয়েনের বর্ণনায় জানা যায় জ্যৈষ্ঠ মাসে বুদ্ধ এবং অন্যান্য মূর্তিদের নিয়ে সুসজ্জিত রথের শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হতো। বহু প্রাচীন অতীতে কোন দেবতার লীলাকে উপলক্ষ করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে সেই দেবতার উদ্দেশ্যে মঙ্গল গান গাওয়া, বা একটু আধটু অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেবতার মহত্ব প্রচার করা হতো। এই যাওয়াটাকেই যাত্রা বলে উল্লেখ করা হতো। এই যাত্রা সাম্প্রতিক অতীতে চৈতন্যদেবের জাতিভেদ না মেনে তার অনুগামীদের নিয়ে কীর্তন সহযোগে যে যাত্রা করতেন সেটাকেও যাত্রা বলে। এবং চৈতন্যদেব কোথাও না গিয়ে রাধা ভাবে উদ্বেলিত হয়ে যে অভিনয় করতেন তাকেও যাত্রা অভিনয় বলা হতো (চৌধুরী ৩১-৪৪)

পরবর্তীকালে ১৬৯৫ সালের পর ইংরেজ শাসিত বাংলায় ইংরেজরা কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকার সুবাদে তাদের মনোরঞ্জনের জন্য এবং বিনোদনের জন্য কিছু রঙ্গমঞ্চ

তৈরি করেন। ১৭৭৫ সালে জর্জ উইলিয়াম ক্যালকাটা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এই রঙ্গালয় ইংরেজদের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় এই মঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে অভিনীত হয় শেক্সপীয়রের *হ্যামলেট, ওথেলো, স্কুল ফর স্ক্যান্ডেল* প্রভৃতি। তারপর ১৭৮৯ সালে প্রাইভেট থিয়েটার এবং ১৭৯৫ সালে লেবেদফের বেঙ্গালী থিয়েটার গড়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তা পায়। ইংরেজদের হাত ধরেই থিয়েটারে আসার আগে বাঙালির বিনোদন বলতে ছিল রাশ যাত্রা, পালা গান, খ্যামটা, খেউড় এবং পাঁচালী ও কীর্তন গাওয়া। এরপরে কলকাতার বাবু সমাজের হাত ধরে বেশকিছু রঙ্গালয় গড়ে ওঠে, যেমন চৌরঙ্গী থিয়েটার, ওরিয়েন্টাল থিয়েটার, জোড়াসাঁকো নাট্যশালা ইত্যাদি। শুরু হয়ে যায় পুরো বাংলা জুড়ে থিয়েটারের প্রতি মানুষের উৎসাহ। তারই ফলস্বরূপ এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় গোপাল লাল শীলের হাত ধরে ১৮৮৭ সালে। এতে দায়িত্বে ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দীনবন্ধু মিত্র, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি প্রভৃতি শিল্পী। এবং সেই সময় এমারেল্ড থিয়েটারের যে মহিলারা থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ক্ষেত্রমণি, সুকুমারী, কুসুম প্রমুখ মহিলারা। এক নতুন দিগন্ত খুলে গেল নাট্য জগতে (দাস, "আঠেরো")।

দিনাজপুর শহরেও শুরু হলো নাটকের জয়যাত্রা। ১৮৮৯ সালের ৭ই ডিসেম্বর দিনাজপুর শহরের রথের মাঠে অস্থায়ী মঞ্চে জয়দ্রথ নাটক অভিনীত হয়। ১৯০৪ সালে দিনাজপুর শহরের ক্ষত্রী পাড়ায় হরিচরণ সেনের নেতৃত্বে ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার হল স্থাপিত হয়। দিনাজপুরে একেবারে জেলার প্রান্তিক একটি জায়গা বালুরঘাট। সেখানে শিক্ষিত ও বিদগ্ধ মানুষের মধ্যে জেলাসহ অবিভক্ত দিনাজপুরের নাট্যচর্চার স্পন্দন পৌঁছে যায়। ইতিমধ্যে ১৯০৪ সালে বালুরঘাট মহকুমা হিসেবে পরিগণিত হয়। শুরু হয় বালুরঘাট নাট্যচর্চার পথ চলা। বহিরাগত কিছু শিক্ষিত মানুষ এবং স্থানীয় বেশকিছু মানুষ মিলে আত্রাই নদীর ধারে অস্থায়ী মঞ্চে *বিল্বমঙ্গল* মঞ্চস্থ করেন স্থানীয় মতিলাল রায়ের উদ্যোগে। পরবর্তীকালে ১৯০৫ সালে একই স্থানে অভিনীত হয় *বেহুলা লক্ষিন্দর*। জায়গাটি বর্তমান আত্রাই নদীর ধারে কংগ্রেস পাড়ায়। শুরু হয় বালুরঘাট মহকুমায় নাটকের পথ চলা। ১৯০৯ সালে বালুরঘাট শহরে তৈরি হয় বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। ১৯১২ সালে তাদের প্রথম নাটক হরিরাজ অস্থায়ী মঞ্চে মঞ্চস্থ হয় যা শেক্সপিয়ারের একটি নাটকের বঙ্গ সংস্করণ। ১৯১১ সালে সপ্তম এডওয়ার্ড ভারতবর্ষে আসেন। তার সম্মান রাখার জন্য বালুরঘাট থিয়েট্রিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের নাম পাল্টে রাখা হয় এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল ড্রামাটিক ক্লাব। ১৯১৪ সালে বর্তমানে যে নাট্য মন্দির আমরা দেখি সেই প্রেক্ষাগৃহ এবং মঞ্চ তৈরি হয়। সেই সময় মূলত হ্যাজাক বা ডে লাইটের আলোতে অভিনয় হতো। যন্ত্র সঙ্গীতের ব্যবহার হতো সরাসরি। বাজিয়েরা বসে বাজাতেন প্রয়োজনমতো ধীর বা দ্রুত লয়ে। সেই সময় বালুরঘাটের মানুষ এক নতুন বিনোদনের দিশা খুঁজে পেল নাটকের মধ্যে দিয়ে। *সাবিত্রী, পান্ডব কৌরব, রানী দুর্গাবতী, প্রহ্লাদচরিত্র, সাবিত্রী সত্যবান*, ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী

নিয়ে যে নাটকগুলো রচিত হয়েছিল দর্শকের চোখে অভিনব রূপে অভিনেতা অভিনেত্রীরা নিজ গুণে ধরা দেয়। মূলত সেই সময়ে রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য, বিভূতি সান্যাল, আশুতোষ ঘোষ, মতিলাল মুখার্জি, ব্রজেন বসু প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ শুধুমাত্র থিয়েটার করবেন বলেই একত্রিত হয়েছিলেন। যে প্রবহমানতা এখনো বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্য এই এডওয়ার্ড ড্রামাটিক ক্লাবের স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করার সময় মন্মথ রায়, যিনি পরে একাঙ্ক নাটকের জনক বলে স্বীকৃতি পান, তিনি এই মঞ্চের ইট বয়ে নিয়ে এসেছিলেন কাছের একটি ইটভাটা থেকে। ১৯২০ সালে মন্মথ রায় বঙ্গে মুসলমান বলে একটি নাটক লিখেছিলেন। সে নাটকটি এতো বড় ছিল যে সন্ধের সময় শুরু হয় এবং পরদিন সকালে শেষ হয়। লোকে তাকে ব্যঙ্গ করে নানারকম কথা বলতে শুরু করে। ফলে তিনি এক নুতন পথের খোঁজ শুরু করেন। ১৯২২ সালে মন্মথ রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয়ে নাট্যাভিনয় করার জন্য তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। সে সময় তিনি নতুন নাটক লেখেন *অম্বা*। সেটি কারোরই পছন্দ হয়না। পরবর্তীকালে স্টার থিয়েটার নাটকটির নাম পাল্টে *মুক্তির ডাক* নামে মঞ্চস্থ করে। ১৯২৯ সালে তিনি বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের সম্পাদক হন। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হবার পর এডওয়ার্ড ড্রামাটিক ক্লাবের নাম হয় বালুরঘাট নাট্যমন্দির। প্রচলিত কীর্তন পালা গানের বাইরে বালুরঘাটের মানুষকে নাট্য প্রিয় করে তোলার জন্য বালুরঘাট নাট্যমন্দিরের অবদান প্রচুর। কিন্তু বালুরঘাট নাট্য মন্দির এর প্রযোজনাগুলিতে নির্দেশকের কোনো কাজ খুঁজে পাওয়া যায়নি সেই সময়। অভিনেতারা নিজেরাই ইচ্ছেমতো কম্পোজিশন করে মঞ্চে চলাফেরা করতেন। এনাদের মধ্যে সুরেশ বসাক নারী চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করতেন। যাদের মধ্যে সেই সময়ে খুবই বিখ্যাত অভিনেতারা হলেন উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল মুখোপাধ্যায়, রাধাচরণ ভট্টাচার্য। পঞ্চাশের দশকে অমিয় সেন, শিবপ্রসাদ কর, তুলসী চন্দ, মনু দাশগুপ্ত, নৃপেন ভট্টাচার্য, নরেশ ব্যানার্জি, কানাই চ্যাটার্জি, ফনী মুখার্জি, প্রণব মুখার্জি প্রভৃতি ব্যক্তি অসাধাররণ অভিনেতা ছিলেন। সেই সময় নাটকের নির্মাণকে কখনোই সুগ্রন্থিত বলা যাবেনা। ইতিমধ্যে বালুরঘাট শহরের প্রাচ্যভারতী, ত্রিশূল, তরুণ তীর্থ, মৈত্রী চক্র এসব সংস্থাগুলি নাটক মঞ্চস্থ করতে এগিয়ে আসে। ১৯৬৯ সালের ২৬শে আগস্ট একটি নতুন নাট্যসংস্থার জন্ম হয়। ত্রিশূল ও তরুণ তীর্থ দুটি দল একসাথে মিশে যায় এবং নাট্যমন্দির ছেড়ে বেরিয়ে আসা বেশকিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীর এই দলের প্রথম দিকে যোগদান করে। নতুন দলটির নাম ত্রিশূল এর ত্রি এবং তরুণ তীর্থের- তীর্থ নিয়ে ত্রিতীর্থ। ১৯৬৯ সালে ত্রিতীর্থ গঠিত হবার পর হেনরিক ইবসেনের নাটক অবলম্বনে শম্ভু মিত্র কৃত অনুবাদে *পুতুল খেলা* নামে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ত্রিতীর্থের প্রযোজনায়। এই নাটকটি বহুরূপীর প্রযোজনা থেকে একেবারেই ভিন্ন স্মার্ট ঝকঝকে নাটক, যা নতুনভাবে উপস্থাপিত হয়। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বিথীকা সরকার ও হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে ত্রিতীর্থের প্রযোজনাগুলির মধ্যে *ভাঙাপাট*, *দেবী গর্জন*, *নাটকের সন্ধানে ছটি চরিত্র* , *বৃষ্টি বৃষ্টি* ইত্যাদি নাটকগুলো জনমানসে সাড়া ফেলে। ত্রিতীর্থ প্রথম থেকে চিন্তা ভাবনা শুরু করে অন্যদের

প্রযোজিত নাটক নয়,নিজেদের সৃষ্ট নাটক দরকার, যা একান্তভাবে ত্রিতীর্থের প্রযোজনা বলে স্বীকৃতি পাবে। তারই ফলস্বরূপ *জল দেবাংশী, পত্রশুদ্ধি, অনিকেত, পনণ, বিছন, গ্যালিলিও, ক্ষুরস্যধারা* ইত্যাদি নাটকগুলো পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন জায়গায় অভিনীত হয়েছে। সাম্প্রতিক প্রযোজনা রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কথ্য রাজবংশী ভাষায় অভিনয় করা হয়েছে যা নাট্য প্রিয় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। কথ্য রাজবংশীতে অনুদিত এই নাটকটি নিয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার ভিত্তিক আলোচনা হয়েছে (দাস, "অবিভক্ত" ৩২-৩৩) প্রথম থেকে ত্রিতীর্থ হরিমাধব মুখার্জির উপরে নির্দেশনার দায়িত্ব ন্যস্ত করে। এবং বয়স্ক অভিজ্ঞ অভিনেতা যাঁদের ত্রিতীর্থ পেয়েছিল তাঁদের মধ্যে শান্তিরঞ্জন গুহ, অমিতাভ সেন, কানাই দত্ত, সত্যরঞ্জন তালুকদার, প্রভাস সমাজদ্দার এঁরা যেমন ছিলেন তেমনি একদম নতুন যাঁরা থিয়েটারের জন্য এসেছিলেন তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে নির্ভরযোগ্য করে তোলা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে গৌতম সেন, তিনু বন্দ্যোপাধ্যায়, রানা রায়, মিলন চৌধুরী, কমল দাস এবং মহিলাদের মধ্যে রুনু দত্তগুপ্ত, তাপসী ভৌমিক সান্ত্বনা গুহ, অনিমা ব্যানার্জি প্রমুখরা গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ত্রিতীর্থের নির্দেশক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় প্রথম থেকেই নিজের ভাবনা অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে যেকোনো নাটকের মানকে সর্বোচ্চ স্থানে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। ত্রিতীর্থ বালুরঘাটের একমাত্র দল যাদের নিজেদের প্রেক্ষাগৃহ মঞ্চ আছে যেমন, তেমনি শব্দ প্রক্ষেপণের সমস্ত উপকরণ ও অত্যন্ত উন্নতমানের আলোকসম্পাতের নানাবিধ উপকরণ নিজেদের আছে। রূপসজ্জার জন্য যা কিছু দরকার সবকিছু তাদের নিজস্ব। ত্রিতীর্থের প্রতিটি সদস্য অত্যন্ত খেয়াল রাখে যাতে ব্যয়ভার না বাড়ে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় *গ্যালিলিও* নাটকের চোখ ধাঁধানো পোশাক, ষোড়শ শতাব্দীর মত করে তৈরি করতে বেশকিছু রং বেরঙের লুঙ্গি কিনে তৈরি করা হয়েছিল। এবং এই পোশাক ও তার সঙ্গে আলোর ব্যবহার কলকাতায় আলোড়ন তোলে। হরিমাধাব মুখোপাধ্যায় নিজেই নাট্যকার-অভিনেতা-পরিচালক। ত্রিতীর্থ মূলত তাঁর লেখা নাটকের সত্তর-আশির দশকে প্রযোজনা করেছেন। বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁর নাটক নাট্যমোদী দর্শককে আপ্লুত করেছে। বিদেশি নাটকের অনুবাদ যেমন তিনি করেছেন, বাংলা সাহিত্যের বেশ কিছু কাহিনীর উপর ভিত্তি করে তাঁর রচিত নাটকগুলো দর্শক গ্রাহ্য হয়। এর মধ্যে আশাপূর্ণ দেবী, অমর মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী সহ আরো অনেকের কাহিনী আছে। তিনি যেমন অন্তত পাঁচটি জেলার কথ্য ভাষায় নাটক লিখেছেন তেমনি দেহাতি হিন্দি ভাষায় তাঁর লেখা একটি নাটক অসম্ভব জনপ্রিয় হয়। তিনি তাঁর সারা জীবনের নাট্যকৃতির জন্য দীনবন্ধু পুরস্কার, কাঞ্চনজঙ্ঘা পুরস্কার, দিশারী পুরস্কার পেয়েছেন। তেমনি ২০০৭ সালে সংগীত নাটক আকাদেমি সম্মান লাভ করে ভারতবর্ষের মাহমান্য রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি প্রতিভা পাটিলের হাত থকে তিনি পুরস্কার গ্রহণ করেন। [১]

ত্রিতীর্থের সাথে সাথে সত্তরের দশকে আরো ক'টি নাট্যসংস্থা আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৭২ সালে লোকায়ন, ১৯৭৩ তূণীর, ১৯৭৪ সালে সংকেত নাট্য সংস্থাটি আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮২ সালে বালুরঘাট নাট্যতীর্থ আত্মপ্রকাশ করে দেবল রায়, প্রণব চক্রবর্তী, কালি কর, দীপক রক্ষিত, আশিষ রায় মূলত এঁদের উদ্যোগে। তাঁদের নাটকের মধ্যে *জুলিয়াস ফুজিক, কালাবদর, কানা মামা, সাজানো বাগান, খারিজ* ইত্যাদির উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। ১৯৯৩ সালে প্রদোষ মিত্র, প্রাণতোষ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে নাট্যকর্মী বলে একটি দল তৈরি হয়। প্রদোষ মিত্র নির্দেশিত প্রথম নাটক *ন্যায়*। *একা একা* নাটকের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে লখনৌ সর্বভারতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে পুরস্কৃত হয় জিষ্ণু নিয়োগী। ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়ের লেখা নাটক *সাঁনাই* প্রদোষ মিত্রের নির্দেশনায় কলকাতা ও মুম্বাইয়ে অভিনীত হয়। শিশু অভিনেত্রী হিসেবে রায় নুপুর মিত্র নেহেরু চিলড্রেনস মিউজিয়াম পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। [২]

নাট্যকর্মী ও কিছু সদস্য মিলে বালুরঘাট নাট্যকর্মী নামাঙ্কিত একটি দল তৈরি করেন। তাদের প্রথম নাটক *অল-কায়েদা* রক্তিম সাহার নির্দেশনায় হয়। শোক মিছিল ভবেন্দু ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ হয়। এছাড়া *ঘর কথা, শিক্ষামেব জয়তে, পদোভূষণ, পাওনা গন্ডা আজির আজও, অন্য জন্ম, ভাতের গন্ধ* প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ হয়, যা দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। ২০০৪ সালে বালুরঘাট শহরে তৈরি হয় গণনাট্যের শপথ শাখা। তাদের প্রথম নাটক পদধ্বনি। এছাড়াও *বদনাম, অন্য ঝুমুর, রক্ত করবী* প্রভৃতি নাটক তারা মঞ্চস্থ করে। শপথ শাখা বহু পথ নাটিকার মধ্যে দিয়ে সমাজকে সচেতনতার বার্তা দিয়েছে। ২০০৬ সালে ২০ই জুলাই প্রদোষ মিত্রের নেতৃত্বে বালুরঘাট সমবেত নাট্যকর্মী তৈরি হয়। তাদের প্রথম নাটক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের *এক দুই*, যা সামাজিক নাটক। এছাড়া মোহিত চট্টোপাধ্যায় *সুন্দর*, অসিত ঘোষের *নাটকের গুরু* প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে। বালুরঘাট সমবেত নাট্যকর্মী পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন নাট্যদল কে আমন্ত্রণ জানিয়ে নাট্য উৎসবের আয়োজন করে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষকে নাটক দেখার সুবিধা করে দেয়। ২০১৫ সালের ৯ই আগস্ট বালুরঘাট শহরের সমমন নাকে আরও একটি নাট্য সংস্থা আত্মপ্রকাশ করে, যাদের প্রথম নাটক রাজার চিঠি(দাস, "নাটকের" ১০-১১)।

সদর শহর বালুরঘাট ছাড়াও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন ব্লকেও নিয়মিত নাট্যচর্চা চলছে বহুদিন আগে থেকেই। বাংলাদেশ লাগোয়া ব্লক হিলিতে ১৯৬৮ সালের ২১শে অক্টোবর যুব গোষ্ঠী নাট্যসংস্থাটি তাদের প্রথম নাটক ম্যানিয়া মঞ্চস্থ করে। ১৯৭২ সালের সমরেশ ঘোষের *ফাঁসির মঞ্চ* একটি হালকা হাসির নাটক মঞ্চস্থ হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কিছুদিন নাট্যচর্চা বন্ধ থাকে। হিলি যুবগোষ্ঠী ১৯৮২ সালে *ছেঁড়া তার* নাটকটি মঞ্চস্থ করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৯৯৪ সালে *সাজানো বাগান শুকিয়ে যায় না, হইতে সাবধান* এই নাটক দুটি পর পর মঞ্চস্থ হয়। হিলি যুবগোষ্ঠী সফলতার সাথে বহু নাটক মঞ্চস্থ করলেও নানাবিধ অসুবিধার কারণে ২০০৭ সালের পরে যুবগোষ্ঠী তাদের নাট্যচর্চা আর ধরে রাখতে পারেনি(মণ্ডল)। হিলি শহরে দীর্ঘদিন নাটক বন্ধ থাকার পর

হিলির বেশকিছু নাটক প্রেমী মানুষ ২০১৪ সালে হিলি শিল্প নাট্য একাডেমি নামে একটি সংস্থা তৈরি করে। হিলি শিল্প নাট্য একাডেমী যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ করেছে সেগুলি হল *মুচকি মঙ্গলকাব্য, শতাব্দীর পদাবলী, ঘরে ফেরা, এখনো মানুষ* প্রভৃতি। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে তারা নিয়মিত নাট্যচর্চা করে চলেছে।

সদর শহর বালুরঘাটের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত তপন ব্লকে মিতালি ক্লাবটি সূচনা হয় ১৯৭৫ সালে। বেশ কিছু বছর পর থেকে তারা নাট্যচর্চা শুরু করে। মনোজ মিত্রের *চোখে আঙুল দাদা* তারা সফলতার সাথে প্রযোজনা করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *"তোলপাড়", "সবুজের অভিযান", "দেবতার গ্রাস"* প্রভৃতি কবিতাকে নাট্যরূপ দেন সংস্থার কর্ণধার দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য। এছাড়াও *মহিষাসুরমর্দিনি, হারাধনের দশটি ছেলে, বিদ্যাসাগরের বিদ্যা দর্শন* নাটক মঞ্চস্থ হয় মিতালি ক্লাব থেকে। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় ২০০৮ সালে নাট্যসংস্থাটি বিভিন্ন অসুবিধার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। প্রত্যন্ত গ্রাম হলেও তপন ব্লকের মানুষের নাটকের প্রতি যে ভালোবাসা সেখান থেকে তৈরি হয় আরও একটি নতুন নাট্য সংস্থা তপন সাংস্কৃতিক সেবা মঞ্চ। তবে সংস্থাটির নির্দিষ্ট সাল বা তারিখ বলা ভীষণ কঠিন। কিছু নাট্যপ্রেমী মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তপন সাংস্কৃতিক সেবা মঞ্চ নামে একটি সংস্থা তৈরি করে। মূলত সমাজকে সচেতনতার বার্তা দেবার জন্য শুরু হয় তাদের নাট্যচর্চা। মিশন নির্মল বাংলা, কন্যাশ্রী, রূপশ্রী প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা নাটক রচনা করেছে এবং তা মঞ্চস্থ করেছে। তারা মঞ্চ নাটকের পাশাপাশি পথনাটিকাও করে থাকে।[৩] ১৯৯৪ সালের পয়লা জানুয়ারি গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত বুনিয়াদপুরে অরুণি নাট্য সংস্থা তৈরি হয়। তারা এখনো নিয়মিত নাট্যচর্চা করে চলেছে। ২০১৪ সালে আত্মপ্রকাশ করে বুনিয়াদপুরে সহচরী নাট্য সংস্থা। খুব কম সংখ্যক নাটক তারা মঞ্চস্থ করলেও তা দর্শকদের হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।[৪]

সদর শহর বালুরঘাট থেকে ৬৮ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ দিনাজপুরের একটি প্রান্তিক ব্লক কুশমন্ডি। লোকসংস্কৃতি এবং মুখোশ শিল্পের প্রাচীন পরম্পরা রয়েছে এখানে। কুশমন্ডি ব্লক এর কিছু মানুষ চেষ্টা করে চলেছেন উন্নত থিয়েটারের সাথে সাধারণ মানুষের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রাক্তন লোকসভার সদস্য প্রখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ এবং কলকাতার সুপরিচিত নাট্যনির্দেশক দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একটি নাট্যদল দিনাজপুর থিয়েটার কোম্পানি তৈরি হয়। তাদের প্রথম নাটক গিরিশ কার্নাডের *হয়বদন*। নাটকটির বিশেষত্ব নাটকটি লোক আঙ্গিকের স্থানীয় খন গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। এবং মহিষবাথানের বাঁশ শিল্পকে মঞ্চ সজ্জার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৮ সালে কুশমন্ডিতে দিনাজপুর কৃষ্টি নামে আরও একটি নতুন দল আত্মপ্রকাশ করে। *প্রতিবিম্ব, মৃত্যুটা সন্দেহজনক, হিপোলিটাস, পিঞ্জর ভাঙ্গা রাজহাঁস* প্রভৃতি সফল প্রযোজনাগুলো সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই সাড়া ফেলে। দিনাজপুর কৃষ্টি স্থানীয় ছেলেমেয়েদের যেমন থিয়েটার চর্চায় নিয়োজিত রাখে তেমনি কলকাতা থেকে প্রখ্যাত

অভিনেতা অভিনেত্রীদেরকে নিয়ে এসে তারা কুশমন্ডিতে নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন যাতে নাটকের ধারাবাহিকতা কুশমন্ডিতে দর্শক-মনে স্থায়ী হয়।[৫]

দক্ষিণ দিনাজপুরের সভ্যতার প্রবাহমানতা বহু প্রাচীন। এই স্থানটি প্রাচীন ইতিহাসের বুদ্ধ পুর্ববর্তী সময় থেকেই জ্ঞানে, সংস্কৃতিতে প্রখ্যাত। পুন্ড্রবর্ধন নগরীর কোটিবর্ষের অন্তর্গত অংশ। দক্ষিণ দিনাজপুরে বিশেষত মৌর্য, শুঙ্গ, গুপ্ত, পাল, সেন এবং মুসলিম উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে এই অঞ্চলের মানুষ। মহাভারতেও পুন্ড্রু দেশের কথা আছে। স্বভাবতই সাহিত্য-সংস্কৃতি সঙ্গীত এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের এক উন্নত চর্চা বিভিন্ন সময় ধরে এই অঞ্চলে হয়ে এসেছে। এই অঞ্চলের মানুষের বৌদ্ধিক চিন্তায় নানা জাতির সংস্কৃতি ছাপ রয়েছে (রায়)। কৃষ্ণযাত্রা, রামমঙ্গাল, কীর্তন, মনসামঙ্গাল এবং আরো নানা লৌকিক সংস্কৃতি চর্চা দীর্ঘদিন ধরে হত। বিংশ শতকের প্রথম দিকে দিনাজপুর জেলায় নাট্য চর্চা শুরু হয়, যা এখনো বহমান। এই অঞ্চলের নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা উন্নতমানের প্রেক্ষাগৃহ নেই। তেমনি আলোর সরঞ্জাম ও মঞ্চ ভাবনার স্রষ্টা কোন মানুষও নেই। ফলে রাজধানীকেন্দ্রিক যে নাট্যচর্চার সুবিধে, উত্তরবঙ্গের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে তা পাওয়া কখনোই সম্ভব নয়। মানুষের প্রবল ইচ্ছে, আগ্রহ ও পরিশ্রমে যে নাট্যচর্চার শুরু হয়েছিল তার ফলস্বরূপ কলকাতা থেকে সুদূরে বসে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর নাট্যরচনা , নির্দেশনা ও অভিনয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আবার অনেক ছোট ছোট নাট্যদল সারা জেলাজুড়ে শুধুমাত্র মনের জোরকে সম্বল করে সৃষ্টির আকাঙ্খায় নাট্যচর্চা করে চলেছেন। আমরা এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সকল থিয়েটার কর্মীদের কুর্নিশ জানাই।

**তথ্যসূত্র:**

চৌধুরী, দর্শন। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস। পুস্তক বিপনি, ২০১৬।

দাস, কমল। "অবিভক্ত দিনাজপুরের নাট্য পথ চলা"। মুক্তধারা, প্রথম বর্ষ, মার্চ ২০১৯, পৃ: ৩২-৩৩।

...। "নাটকের সহর"। eচ্ছে পূরণ, ১, ২০১৮, পৃ: ৮-১৩।

দাস, সৃজনী। "আঠেরো উনিশ শতকের কলকাতার থিয়েটার ও সমাজ:: পারস্পকিরক সম্পর্ক ও বিবর্তনের একটি প্রারম্ভিক অলোচনা।" সপ্তডিঙা: বাঙালিচর্চার সারস্বত উদ্যোগ, ষষ্ঠ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৪২৭।

রায়, নীহার রঞ্জন। *বাঙালীর ইতিহাস*। দে'জ পাবলিশিং। ষোড়শ সংস্করণ ১৪২৭।

মণ্ডল, রঞ্জন কুমার। *আলেখ্য*। সারদা অফসেট প্রেস। প্রথম প্রকাশ ২০০৮।

**সাক্ষাৎকার**

১। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ২। প্রদোষ মিত্র ৩। সঞ্জয় শীল ৪। পবিত্র দাস ৫। সুরজিত ঘোষ

---

লেখক : **দোয়েল চক্রবর্তী,** গবেষক, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গা।

## অসমিয়া 'ভাওনা'র ভিন্নরূপ

# প্রসঙ্গ নগাঁও জেলায় প্রচলিত 'হাজারি ভাওনা'

অজিত কুমার সিংহ

আসামে শ্রী শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের নব-বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'ভাওনা'। এই 'ভাওনা' শব্দের মূল অর্থ হল 'ভাও' দিয়ে দেখানো কাজ। পঞ্চদশ শতকের শেষপাদ থেকে ভাওনার ইতিহাস পাওয়া যায়। বিশেষ করে বলা যায়, অসমিয়া ভাষায় অভিনয়কে 'ভাওনা' বলা হয়। খুব সম্ভব 'ভাবনা' শব্দ থেকে 'ভাওনা' শব্দের উৎপত্তি হতে পারে। 'কেলি গোপাল' অঙ্কিয়া নাটকের মধ্যে ভাবনা শব্দটির উল্লেখ রয়েছে— 'মই কৃষ্ণ বুলি করে ভাবনা' — আর এই ভাবনাই হল ভাওনা। সন্তাবলী নামক এক গ্রন্থের মধ্যে লিখা রয়েছে 'অন্তরেসে সর্ব্বমনে ভাবনা মিলয়। এহিহেতু সর্ব্বজনে ভাওনা বোলয়।' (নারায়ণ চন্দ্রদেব গোস্বামী , সত্রিয়া সংস্কৃতির স্বর্ণরেখা, পৃ. ৬৩৬) বিশেষ করে বলা যায়, একজন ব্যক্তির ভাবভঙ্গিমা, ধ্যান-ধারণা অন্য একজন ব্যক্তি প্রকাশ করাই ভাওনা। অলংকার শাস্ত্রমতেও ভাবাবেগের অভিব্যক্তি-ই 'ভাবনা'। আর এ জন্যেই অঙ্কিয়া নাটকের অভিনয়কেই 'ভাওনা' বলা হয়।

শঙ্করদেব কিংবা মাধবদেব এই 'ভাওনা' শব্দটি কোথাও সরাসরি ব্যবহার করেননি, করেছেন 'অঙ্ক' কিংবা 'যাত্রা' শব্দটি। তবে সেই সময়কালে কিংবা এর পূর্ববর্তীকালে অসমিয়া লোকনাট্যে পরম্পরাগত ভাবে 'ভাওনা' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, 'ঢুলিয়া ভাওনা' ইত্যাদি। মহাপুরুষ শঙ্করদেব নানা ধরনের লোকনাট্যের উপাদানের সঙ্গে মৌলিক চিন্তা ভাবনার সংযোগে 'অঙ্ক' কিংবা 'যাত্রা'র যে প্রচলন করেছিলেন, তা-ই পরবর্তীকালে 'অঙ্কিয়া নাটক' বলে পরিচিতি লাভ করে । তাঁর 'চিহ্নযাত্রা'-ই হল প্রথম 'ভাওনা' বলে জানা যায় এবং উনিশ বছর বয়সে 'চিহ্নযাত্রা'য় অভিনয় করে ভাওনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন।

শঙ্করদেব মূলত তিনটি প্রধান উৎস থেকে নিজের নাটক ও ভাওনার কারণে উপাদান গ্রহণ করেছিলেন। এই তিনটি উৎস হল (১) সংস্কৃত নাট্য শাস্ত্রের মত তাত্ত্বিক অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়নপুষ্ট জ্ঞানলব্ধ অভিজ্ঞতা, (২) তৎকালীন সময়ের স্থানীয় লোকনাট্য অনুষ্ঠান এবং (৩) ভারতের আনাচে-কানাচে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠ-মন্দির পরিদর্শন করে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত করেছেন, তার অভিজ্ঞতা।

শঙ্করদেব নাটক ও অভিনয়কে সাধারণ জনসাধারণের সঙ্গে অঙ্গীভূত করার জন্য সংস্কৃত নাট্যরীতিকে যথাসাধ্য সহজবোধ্য করে তোলেন। লোকনৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সুসমন্বয়ে সৃষ্টি হওয়া নাটক-ভাওনাই আমাদের ভারতীয় জনজীবনে এক

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তবে নানা কারণে বর্তমান সময়ে ভাওনার ঐতিহ্য ও পরম্পরায় এক দুর্বল স্রোত প্রবহমান।

অঞ্চল বিশেষে, অভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তির বয়স বিশেষে কিংবা সময় ও ভাষা বিশেষে ভাওনার ভিন্নরূপ দেখা যায়। ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকার পরিচিত যে তিনটি ভাগ রয়েছে — নিম্ন আসাম, মধ্য আসাম ও উজান আসাম— এই তিন অঞ্চলের মধ্যে অনুষ্ঠিত ভাওনার রূপ ভিন্ন ভিন্ন। শুধু রূপ ভিন্নভিন্ন নয়, তাদের মধ্যে রয়েছে নিজস্ব স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ। আবার একইভাবে রয়েছে যুবকদের ভাওনা, বুড়োদের ভাওনা, মহিলাদের ভাওনা, দিন ভাওনা, রাত্র ভাওনা,অঙ্কিয়া ভাওনা ও মাতৃভাষার ভাওনা ইত্যাদি। এগুলিরও রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ। এছাড়াও রয়েছে আসামের দরং জেলার জামগুরিহাটের 'বারো শহরিয়া' ভাওনা, নগাঁও জেলার কলিয়াবর অঞ্চলে প্রচলিত 'হাজারি ভাওনা', উজান আসাম ও দরং জেলায় প্রচলিত 'বাঙালি ভাওনা', মরিগাঁও চরাইবাড়ি অঞ্চলের 'কমিটি ভাওনা', শিবসাগর জেলার ঐতিহ্যমন্ডিত রামখাপীঠের দুর্গাপুজোয় পরিবেশিত 'পরী ভাওনা' ইত্যাদি।

'ভাওনা' মূলত সমাজে নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শঙ্কর মাধবদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে, কোনো মহন্তের তিথি উপলক্ষে, বাৎসরিক সেবা-অনুষ্ঠানে, কোনো ব্যক্তি-বিশেষের অমঙ্গল দেখা দিলে- তা দুর করার জন্য ভাওনা অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এখানে উল্লেখনীয় 'ভাওনা' সাধারণত রাত্রে অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে সন্ধ্যা থেকে শেষরাত অবধি ভাওনার অভিনয় পরিচালিত হয়। কোনো কোনো সত্রে একই ভাওনা দুই-তিনরাত্রি অনুষ্ঠিত হয়। তবে বর্তমান সময়ে মানুষের কর্মপরিধির কথা চিন্তা করে তিন থেকে চার ঘন্টার মধ্যে ভাওনা অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ভাওনার সাজসজ্জা ভিন্ন ভিন্ন ধরনে ব্যবহৃত হয়। এই ভাওনায় ব্যবহৃত যেসব সাজসজ্জা বা উপাদান রয়েছে সেসবের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল 'মুখোশ'-এর ব্যবহার। এই মুখোশের ব্যবহার খুব সম্ভব শঙ্করদেবই শুরুপাত করেছিলেন। যাই হোক, ভাওনায় যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয় সেগুলির মধ্যে প্রধান হল খোল, করতাল, কাসি, দবা ইত্যাদি। বিশেষ করে চরিত্র ও উপস্থাপন রীতির উপর নির্ভর করে এসব বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। আবার যুদ্ধের আবহে বাজানো হয় বড় বড় করতাল, ডাব্বা, শঙ্খ ও খোল ইত্যাদি।

এতক্ষণ আমরা 'ভাওনা'র উৎপত্তি ও স্বরূপ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম, বর্তমানে নগাঁও জেলার 'হাজারি' ভাওনা নিয়ে আলোচনা করার প্রচেস্টা করব। বহুল প্রচলিত 'হাজারি' ভাওনা নগাঁও জেলার বিভিন্ন স্থানে একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে এই 'ভাওনা' নগাঁও জেলার বরদোয়া, ধিং, জাজরি, রহা, রূপসী ইত্যাদি স্থানে অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এখানে উল্লেখনীয় ভাওনার জন্য কোনো মঞ্চের প্রয়োজন হয় না। নামঘর বা সত্রের মধ্যে ভাওনা পরিবেশন করা হয়। ভাওনা মঞ্চস্থ করতে পোশাক পরিচ্ছেদ পরিবর্তন কিংবা এ সংক্রান্ত কাজে নামঘর বা সত্রের কোনো অংশকে অস্থায়ীরূপে ব্যবহার করা হয়। যাই হোক, হাজারি ভাওনার শুরুপাত কখন হয়েছিল—তা সঠিকভাবে বলা যায়না। আনুমানিক ভাবে

বলা যায়, সলাল গোঁসাই নামে কলিয়াবর অঞ্চলের একজন শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাঁর সময়কালেই তৎকালীন রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে পাওয়া যায় যে আহোম রাজত্বকালে নগাঁও অঞ্চলে আটটি হাজার ছিল। এই হাজারগুলি হল ডিমরুগুড়িয়া হাজার, বাজোয়া কোঁওর হাজার, বাজোয়া কোঁওর হিলৈদারী হাজার, বকলর দুহাজার, ধাদুমর হাজার, ভিতরুয়াল সেকেরাতলিয়া হাজার, চামধরা হাজার— এই আটটি বিশেষ হাজার গোষ্ঠী নগাঁও জেলার জনসাধারণকে সামাজিকভাবে বিভক্ত করেছিল। আহোম রাজা স্বৰ্গদেও ও লক্ষ্মীসিংহের রাজত্বকালে এই হাজারগুলি সক্রিয় ছিল। সেসময়ে এসব হাজার ছিল হরনাথ ফুকনের অধীনস্ত। এই 'হাজার' শব্দটি মূলত এক হাজার পাইক ও বিভিন্ন গ্রামের চার হাজার মানুষকে বোঝানো হত। কিংবা অসংখ্য লোক একত্রিকরণের বিষয়ে এই 'হাজার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখনীয় সলাল গোঁসাই এর সময়কালে কলিয়াবরের বৈষ্ণব দেবালয়গুলিতে দৌল উৎসব ও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্ঠমী পালনের সময়কালে বৃহত্তর কলিয়াবর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ সহযোগিতা করেছিলেন।

এসব 'হাজারি ভাওনা'র মঞ্চ নির্মাণের শৈলীও আধ্যাত্মিকতায় পরিপুষ্ট। মূল মণ্ডপকে একটি পদ্মফুল এবং তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপমণ্ডপগুলিকে পদ্মের পাপড়ি হিসেবে কল্পনা করা হয়। মূল মণ্ডপ ছাড়াও আটটি উপমণ্ডপ থাকে এবং সেগুলিকে একত্রিতভাবে অষ্টদল পদ্ম হিসেবে কল্পনা করে মূল ধ্বজা স্থাপন করা হয়। ফলস্বরূপ এক ঐক্য ভাবনার প্রকাশ পায়। যাই হোক, অঙ্কিয়া নাট্যের শৈলীর প্রয়োগ ভাওনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অসমিয়া সমাজের মধ্যে ঐক্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখে এবং তৎসঙ্গে জনসেবার উদ্দেশ্য বজায় রেখে লোকসংগ্রহ, লোকরঞ্জন এবং লোকস্থিতির পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে এই ভাওনাগুলি স্থানে স্থানে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাৎসরিক উৎসব-অনুষ্ঠান হিসাবে মানুষের মনে আনন্দের জোয়ার ওঠে। কামপুর অঞ্চলের নামঘরের ভাওনা উৎসব 'বারোগঞা' ভাওনা নামে অভিহিত হয়। যাই হোক ভাওনাগুলি মূলত রাসপূর্ণিমা ও শঙ্করদেবের জন্মোৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। আর এসব ভাওনা অনুষ্ঠান মূলত মহাপুরুষ শঙ্করদেবের প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের এক অঙ্গাস্বরূপ। তবে ভাওনা ধর্মীয় পরিসরে বেড়ে উঠলেও শেষপর্যন্ত হয়ে উঠেছে সর্বধর্মীয় অনুষ্ঠান। এবং ভাওনার মাধ্যমে মানুষদের মনে গড়ে ওঠে ঐক্য ও সম্প্রীতির এক বিশাল পটভূমি।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী : সত্রীয়া সংস্কৃতির রূপরেখা, গুয়াহাটী: লয়ার্স বুকস্টল, ১৯৮৪-২০০৪

২. নবীন চন্দ্র শর্মা : অসমীয়া লোকসংস্কৃতির আভাস, গুয়াহাটী: বাণী প্রকাশ , ১৯১৫

লেখক ঃ **ড. অজিত কুমার সিংহ,** বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, এডিপি কলেজ, নগাঁও, আসাম।

# গত একবছরে ত্রিপুরায় নাট্যচর্চার খন্ডচিত্র

**শেখর সি দত্ত**

শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, মানুষের জীবনে নাটক এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। অর্থনীতি, রাজনীতি বা সমাজনীতি যাই বলি না কেন সর্বক্ষেত্রেই নাটক দীর্ঘকাল ধরে সমাজের দর্পণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে প্রচেষ্টা থেমে যেতে বাধ্য হয়েছে নানা কালে, নানা কারণে। সম্প্রতি সারা পৃথিবীর মানুষ আবারো এরকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো কোভিড-১৯ এর কারণে। "কত মানুষ মারা গেল, গঙ্গা বক্ষে কত লাশ ভেসে গেল"। চারিদিকে অন্তহীন শোক আর শঙ্কা। অনেক কিছুর মত নাট্য উপস্থাপন বা নাট্য সাহিত্য প্রকাশও থমকে দাঁড়িয়েছিল। তবে একেবারে না থেমে বলা চলে স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। কারণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে নাটকও বেছে নিলো ভিন্ন পথ। অনলাইন নাটক, রুফটপ নাটক, বিধি মেনে উঠান নাটক, ইন্টিমেট থিয়েটার, বিকল্প ধারার কত না উপস্থাপনা! আগরতলা শহরেও ত্রিপুরা থিয়েটার, নাট্যভূমি সহ বিভিন্ন গ্রুপ নানাবিধ নাট্যধারায় নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিল। অর্থাৎ শত বাধায়ও নাট্যক্রিয়া কোন অবস্থায়ই থেমে থাকেনি।

তেমনি আমাদের নাট্যসম্পর্কিত বার্ষিক জার্নাল ত্রিপুরা থিয়েটার। ২০০৬ সাল থেকে শুরু করে চলে বিরামহীন। এলো ২০২২। নানা বাধা অতিক্রম করে আজ ইউ জি সি কেয়ারলিস্টে অন্তর্ভূক্ত। এ বড় কম কথা নয়। করোনার চোখে চোখ রেখে নিয়মিত নাট্য মঞ্চায়নের পাশাপাশি নাট্য সাহিত্য প্রকাশ।

বিগত বছরে সারা রাজ্যে নাট্যক্রিয়া কতটা সচল ছিল তারই একটা চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি এই প্রতিবেদনে। যদিও আগরতলা, ধর্মনগর, উদয়পুর, মেলাঘর ছাড়া বাকি স্থানে বলা চলে এই সময়কালে অনুপস্থিত। তবে এইসব উপস্থাপিত নাটক সম্পর্কে বিশ্লেষণের কোন সুযোগ নেই বললেই চলে।

কাজ চালিয়ে যাওয়ার বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, নানা জায়গায় শো, উৎসব বা নাট্যমেলা হয়েছে তাতে যেমন বাস্তব, অবাস্তবতার সন্ধান আছে, ক্লাইমেক্স রয়েছে, কল্পনার আশ্রয় আছে তেমনি প্রকৃত নাট্যচিন্তার উন্মেষও আছে। বর্ণময় উপস্থাপনায় দর্শকের মন কেড়েছে, ভীড় বাড়ছে।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো নাটক যেখানে কম ছিল সে সময়কে অতিক্রম করে আগরতলার ১৬টি নাট্যদল মিলে "সম্মিলিত নাট্যপ্রয়াস" এর উদ্যোগে আবার ফিরে পেল সেই নাট্যযৌবন, প্রতি মাসের দ্বিতীয় শনিবার রবীন্দ্রভবনের ২ নং হলে নিয়মিত একটি নাটক পরিবেশন। এছাড়া বাড়তি পাওনা হিসাবে যে কোন দলের উপস্থাপনা তো আছেই। গত প্রায় এক বছরে একটা চিত্র মোটামুটিভাবে আমরা তুলে ধরতে পারি।

**সারণি -১**

| তারিখ | মঞ্চ | নাটক | নাট্যদল | নাট্যকার, নির্দেশক |
|---|---|---|---|---|
| ২৭/১১/২১ | রবীন্দ্র ভবন-২ | বান্ধ কেনো দালান ঘর | সুর পঞ্চম | পার্থ মজুমদার |
| ৩০/১২/২১ | ,, | মতিজানের মেয়েরা | ত্রিপুরা থিয়েটার | বিভু ভট্টাচার্য |
| ১২/২/২২ | ,, | ভেঁপু | নাট্যভূমি গ্রুপ থিয়েটার | দারিও ফো- এর অনুবাদ ও পরিচালনা পার্থপ্রতিম আচার্য্য |
| ০৯/০৩/২২ | ,, | রাণী লক্ষ্মীবাঈ | ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার | প্রভীতাংশু দাশ |
| ১২/০৪/২২ | ,, | তাহার নামটি রঞ্জনা | উত্তর ফাল্গুনী | বিধায়ক ভট্টাচার্য সুমন ভট্টাচার্য্য |
| ১৪/০৪/২২ | ,, | বাঁয়েন | সমর্পণ সোসিও কালচারেল সোসাইটি | মহাশ্বেতা দেবী, সম্পাদনা ও নির্দেশনা - ননী দেব |
| ১১/০৬/২২ | ,, | শঠে শাঠ্যং | রাঙ্গামাটি নাট্যক্ষেত্র | সুভাষ দাস, উত্তম দাস |
| ০৯/০৭/২২ | ,, | মিডিয়া | ভাবিয়া সোসিও কালচারেল অর্গানাইজেশন | রচনা- ইউনিপিডিস সম্পাদনা- অপ্রতীম কর মৌসুমী দেবনাথ |
| ১৩/০৮/২২ | ,, | প্রথম পার্থ | কবিতালোক | বুদ্ধদেব বসু, পিনাকপানি দেব |

শিল্পী সংগঠনী অদম্য উৎসাহ ও নিরলস চেষ্টায় বরিষ্ঠ সাহিত্যিক ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য স্মরণে ভীষ্মদেব স্মৃতি ছোটদের নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে চলেছে ১৯৯৫ সাল থেকে। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যে ক্ষুঁদে শিল্পীদের মধ্যে যারপরনাই আনন্দ পরিলক্ষিত হয়। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে নতুন শিল্পী, সংগঠক, নাট্যকার, পরিচালক ও কলাকুশলী তৈরি হচ্ছে যারা পরবর্তীতে বড়দের নাট্যদলকে সমৃদ্ধ করছে। অতিমারি জনিত কারণে এ বছর প্রতিযোগী দল সংখায় কম হয়েছে :-

**সারণি -২**

| তারিখ | মঞ্চ | নাটক | নাট্যদল | নাট্যকার, নির্দেশক |
|---|---|---|---|---|
| ০৪/০৫/২২ | মুক্তধারা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রথের মেলা | অর্কদ্যুতি | সুমন ভট্টাচার্য |
| ০৪/০৫/২২ | মুক্তধারা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুষ্টু কবিতা অবলম্বনে নাটক - দুষ্টু | ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ | পার্থ মজুমদার, শেখর সি দত্ত ও রেখা ভট্টাচার্য |
| ০৪/০৫/২২ | মুক্তধারা | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুরাতন ভৃত্য কবিতা অবলম্বনে নাটক-ভৃত্য | সুর পঞ্চম | প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব ভট্টাচার্য |

দুবছর বাদে অনেকগুলি আকর্ষণীয় শিশু নাটক দেখে মুগ্ধ হলো নাট্যমোদি ছোট-বড় দর্শককুল। রাজ্যের একটি ঐতিহ্যবাহী রবীন্দ্র অনুরাগী রবীন্দ্র সাহিত্য নির্ভর সংগঠন (১৯৬১)। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ আয়োজিত অষ্টাহব্যাপী সাহিত্যমেলায় শিশু নাট্য দিবস যা প্রতি বছর ৪ঠা মে তারিখ মুক্তধারা মঞ্চে শিশু-অভিভাবকদের দারুণ উৎসাহে মঞ্চস্থ হয় তিনটি শিশু নাটক -

**সারণি -৩**

| তারিখ | মঞ্চ | নাটক | নাট্যদল | নাট্যকার, নির্দেশক |
|---|---|---|---|---|
| ২৫/০৫/২১ | রবীন্দ্র ভবন | ইয়ে দোস্তি -হাম | হামটি ডামটি | সুশান্ত কুমার দে |
| ,, | হল-২ | নেহী তোরেঙ্গে | নাট্য বিদ্যালয়, আগরতলা | ইন্দিরা সরকার |
| ২৬/০৫/২২ | ,, | আদর্শ | মুসাফির, আগরতলা | জয় শঙ্কর শর্মা |
| ,, | ,, | ডি-ডার্ক এইজ | চলো নাটক করি, মেলাঘর | শুভব্রত চক্রবর্তী, দুলা লোধ |
| ২৭/০৫/২২ | ,, | চিত্রপট | সঙ্কল্প | শ্রী শুভব্রত চক্রবর্তী, |
| ,, | ,, | রাজকন্যা কঙ্কাবতী | লিটল ড্রামা গ্রুপ | কৌশিক নারায়ণ দত্ত, গৌতম সাহা, সংযুক্তা সরকার |
| ,, | ,, | শেষ বৃক্ষ | মুক্ত প্রতিভা, উদয়পুর | শ্রী শুভব্রত চক্রবর্তী, অয়ন পাল, দেবাদৃতা দেব |
| ২৮/০৫/২২ | ,, | স্বপ্নের বিশ্ব | উত্তরণ নাট্যাঙ্গণ, খোয়াই | গনেশ দেবরায় |
| ,, | ,, | বুম্পেনা ষ্টিলকিন | ত্রিবেণী নাট্যম | পার্থ মজুমদার, বিপ্লব ভট্টাচার্য |
| ,, | ,, | চোর ভাগনেসে আকল খুলতা হ্যায় | পটভূমি, আগরতলা | জয়শঙ্কর ভট্টাচার্য্য |

ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে বেশ কয়েকটি নাট্যদল যথেষ্ট শক্তিশালী এবং সারা বছর সচল ও প্রাণবন্ত নাট্য উপস্থাপনা এবং নাটক নিয়ে অন্যান্য কাজে। যেমন বলা হয় নাট্যভূমি, ত্রিপুরা থিয়েটার, সুর পঞ্চম, শিল্পতীর্থ', LDG, অভিমুখ উদয়পুর এবং ধর্মনগর। একটু বিস্তৃতভাবে বলা যায়- ত্রিপুরা থিয়েটার পর পর দু'টি নাটক মঞ্চস্থ করল "মতিজানের মেয়েরা " রচনা , নির্দেশনা- বরিষ্ঠ নাট্যব্যক্তিত্ব বিভু ভট্টাচার্য, "কাক চরিত্র" ০৯/০৬/২০২২ রবীন্দ্র ভবন, রচনা মনোজ মিত্র, সম্পাদনা বিভু ভট্টাচার্য্য, পরিচালনা কমল মজুমদার। তাছাড়া ত্রিপুরা থিয়েটার জার্নাল ২০২১ প্রকাশ একটি বলিষ্ঠ সৃজনশীল কাজ। ০৬/০৯/২০২২ মুক্তধারা মঞ্চে মতিজানের মেয়েরা মঞ্চস্থ হয়। যাত্রিক নাট্যগোষ্ঠী, কুমিল্লা, বাংলাদেশ-এর

আমন্ত্রণে ০৯/০৯/২০২২ ইং কুমিল্লা টাউন হলে 'মতিজানের মেয়েরা' নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়। 'নাট্যভূমি' জাতীয় নাট্য উৎসব (online) সঞ্জয় কর এর রচনা নির্দেশনায় 'সুখু দুখু' নাটক ২১/০৭/২০২১। ২৭/০৮/২০২১ আমি মাধবী ২৮/০৮/২০২১ রাইমা শাইমা, workshop online নাটক Shakespear's 'Othelo' অবলম্বনে রঙ্গীন রুমাল, (in house in December), রবীন্দ্র ভবনে ১৫/০১/২০২২, ২৭/০৩/২০২২ এবং Udaipur Kakrabon Town Hall-1 অভিমুখ, আয়োজিত নাট্য উৎসবে মঞ্চস্থ করে। 18-24 August, 2021 online theatre class হয় Assam, Tripura, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ৫৩ জনকে নিয়ে। তাছাড়াও একটি 6 days workshop on Music তাদের ছাদের মহড়াকক্ষে করা হয় যাতে বিশিষ্ট নাটক ও চলচ্চিত্র সঙ্গীত পরিচালক Subhadeep Guha উপস্থিত ছিলেন। এ যেন এক চলমান নাট্যশালা। গত ৩০-৮-২২ তাদের Roof Top-এ চার সপ্তাহের নাট্যকর্মশালা সম্পন্ন হয় এবং 'নাগিনকন্যা' নাটক উপস্থাপন করে যার প্রশিক্ষক ছিলেন বরিষ্ঠ নাট্যব্যক্তিত্ব সঞ্জয় কর। 'সুরপঞ্চম'- পার্থ মজুমদার এর রচনা ও নির্দেশনায়- জালিয়ানওয়ালাবাগ, ০২/১১/২০২১, বান্ধ কেনো দালান ঘর রবীন্দ্র ভবন হল -২ এবং মেলাঘর টাউন হল ২৪/০৩/২২ এ মঞ্চস্থ করে। তাছাড়া ২১/০৫/২০২২ শ্রুতি নাটক 'পরিতাপ' রচনা পার্থ মজুমদার, নির্দেশনা পীযূষকান্তি রায়, মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে উপস্থাপন করে। সেই সঙ্গে ওরা ১০-১৮ জুলাই ২০২২ International Webinar series এ অংশ নেয়, ২-১১ জুন ১০ দিনের Children Theatre Workshop করেছে। তাদের বর্ষব্যাপী কার্যক্রমের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় Mime Acting, Joyanta Bhowmik এর নির্দেশনায় Mime performance করেছে Save Tree and Mobile Phone সফলতার সঙ্গে।

**সারণি - ৪**

| তারিখ | মঞ্চ | নাটক | নাট্যদল | নাট্যকার, নির্দেশক |
|---|---|---|---|---|
| ১৮/১২/২১ | রবীন্দ্র ভবন | উজান ভাটি | মুক্ত প্রতিভা | শুভব্রত চক্রবর্তী |
| ১৮/১২/২১ | ,, | মিমিক্রি | বাদল কোলাজ | বাদল সরকার, মনোজিৎ দেবরায় |
| ১৯/১২/২১ | ,, | যুযুধান | ত্রিবেণী, বিলোনীয়া | মৃণাল মুখোপাধ্যায়, পিনাক দত্ত |
| ১৯/১২/২১ | ,, | জল সিঁদুর | মেলাঘর | শুভব্রত চক্রবর্তী, বুবাই চক্রবর্তী |
| ২০/১২/২১ | ,, | 'কে' | রংপীঠ, আগরতলা | গৌতম দাস |
| ২০/১২/২১ | ,, | হর গৌরী সংসার | লোক নাট্যম | রঞ্জিৎ পুরকায়স্থ |
| ২১/১২/২১ | ,, | গোধূলিবেলা | খোয়াই নাট্যাঙ্গণ, | গণেশ দেবরায় |
| ২১/১২/২১ | ,, | চন্দ্রাবতীর পালা | অভিমুখ, উদয়পুর | আফসার আহমেদ, অভিজিৎ দাস |
| ২১/১২/২১ | ,, | কুলভাঙ্গা মনু | রেনেসাঁ, কৈলাসহর | অভিজিৎ সরকার |

২২/১২/২১ সমাপ্তি দিনে নাট্য আলোচনা করেন নাট্যব্যক্তিত্ব ববিতা পাণ্ডে ও কার্তিক বণিক।

১৩/০৩/২০২২ বরাক উপত্যকায় শিলচর বঙ্গ সম্মেলনে শিল্পতীর্থ পরিবেশন করে 'কিপ সাইলেন্স'। ২৭/০৩/২০২২ বিশ্ব নাট্য দিবস -শিল্পতীর্থ ও সম্মিলিত নাট্য প্রয়াস রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক বার্তাপাঠ, আলোচনা ও নাট্য সঙ্গীত পরিবেশন করে । শিল্পতীর্থ পথনাটক ও অঙ্গান নাটকও পরিবেশন করেছে বিভিন্ন জায়গায় যেমন -সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্রের আহ্বানে সফদার হাশমির জন্মদিনে এবং DYFI এর রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে অঙ্গান নাটক 'কোথা পাব তারে' পরিবেশন করে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে রবীন্দ্রভবন এ ১১/০৭/২০২২ নন্দন তৃষার নিবেদন, 'সার্কাস', রচনা ও প্রয়োগ সমীর দত্ত, ১২/০৭/২০২২ 'ফালতু ' রচনা শিবঙ্কর চক্রবর্তী, প্রয়োগ কুমার শঙ্কর পাল, প্রযোজনায় রূপম। যেটুকু সংবাদ সংগ্রহ করা গেছে তাতে জানা গেল সৃষ্টি নাট্য সংস্থা ২০/০৮/২০২২ মুক্তধারা হলে উপস্থাপন করে 'কুসুম কথা', রচনা- গৌতম রায়চৌধুরী, নির্দেশনা- গৌরদাস দেব, 'মঙ্গালদীপ' ৫/০৩/২০২২ রবীন্দ্রভবন-এ মঞ্চস্থ করে নাটক 'ব্যঙ্গারস', রচনা ও নির্দেশনায় জয়শঙ্কর শর্মা, বরিষ্ঠ নাট্যকার ননী দেব-এর রচনা ও নির্দেশনায় 'ননী দেব ফ্যান ক্লাবের 'মা' ও শ্রাবণ সন্ধ্যা 'চলতে চলতে চলা' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করে। কবি সাংবাদিক জ্যোতির্ময় রায় এর কাছ থেকে জানা যায় ১৪-২৩ /১১/২১ ইং নাটক অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষক ছিলেন হিমাদ্রি শেখর দে, কোলকাতা, রূপকথা অবলম্বনে নাটক 'রাইতং'- নির্দেশনা অনির্বাণ চক্রবর্তী, এই নাটকটি ৩১/১২/২১ কালিঘাটের তপন থিয়েটার, ০২/০১/২০২২ গোবরডাঙ্গা সংস্কৃতি সদনে মঞ্চস্থ হয়। ২৭/০৩/২২ 'কথাচিত্র' নাট্যোৎসব তাদের নাট্যশালায় 'নাটকের সাথে গৃহস্থালি' শিরোনামে। মনোজ মিত্র রচিত 'তেঁতুল গাছ', পরিচালনা মিলন দেব, পরিবেশন করে পঞ্চম বৈদিক এবং কোলকাতার রানীকুঠি আঙ্গিকের 'বাতিঘর' মঞ্চস্থ হয়, রচনা সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা সুমন্ত মজুমদার এবং 'হরগৌরীর সংসার' রচনা ও নির্দেশনা রঞ্জিত পুরকায়স্থ, পরিবেশনায় ধর্মনগর লোকনাট্যম। ২৪-২৭ মার্চ ২০২২ অষ্টম নাট্যমঞ্চ নাট্যোৎসব ভট্টাচার্য স্মৃতিভবনে সঙ্গীত নাটক একডেমির সহযোগিতায় উপস্থাপন করে 'আজকের প্রজন্ম', শিলচর। 'অধরা মাধবী' রচনা - ইন্দ্রনীল দে, নির্দেশক- সায়ন বিশ্বাস, উদয়পুর 'অভিমুখ' করে চন্দ্রাবলীর পালা' রচনা -আফসার আহমেদ, নির্দেশক অভিজিৎ দাস, নাটক 'বাতিঘর' পরিবেশনায় রানীকুঠি আঙ্গিক, কোলকাতা, রচনা ও প্রয়োগ- সুমন্ত চট্টোপধ্যায়, সুমন্ত মজুমদার,' নাথবতী অনাথবৎ' নাট্যকার -শাঁওলী মিত্র, প্রয়োগ - সুব্রত রায়, 'সুবলের করচা' রচনা ও প্রয়োগ শেখর দেবরায়, 'গণসুর' শিলচর পরিবেশনায়। 'গম্ভীরা গম্ভীরা' - রচনা ও পরিচালনা - পরিমল ত্রিবেদী, উপস্থাপনায় মালদা মালঞ্চ, পশ্চিমবঙ্গা। তাছাড়াও লারনার্স এডুকেশন্যাল সোসাইটি তাদের 'যশোমতি' নাটকটি দেবাশীষ রায়ের রচনা ও পরিচালনায় কোলকাতা, উড়িষ্যা, শিলচর বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ করে। তাদের উদ্যোগে ধর্মনগর নাট্যসৃষ্টি হলে সাত দিনের নাট্যকর্মশালার আয়োজন করে এবং দেবাশীষ রায়ের রচনা ও নির্দেশনায় 'ভালোবাসার ইস্কুল' নাটকটি মঞ্চায়ন করে। তাছাড়াও

২৩শে জুলাই থেকে ২৫ জুলাই বর্ণমালা আয়োজিত নাট্যোৎসবে নাটক দায়বন্ধ, সুখ, নিশিডাক, অলকানন্দার পুত্রকন্যা ও জেরা মঞ্চস্থ হয়। EZCC সহযোগিতায় মেলাঘরে ৫ দিনের নাট্যোৎসব হয়ে গেল, তাতে অংশ নিয়েছিল সুরপঞ্চম, লারনার্স এডুকেশানেল সোসাইটি, নাট্যভূমি, চল নাটক করি মেলাঘর। অভিমুখ উদয়পুর ডিসেম্বর ২১-এ 'চন্দ্রাবতীর পালা' রচনা আফসার আহমেদ, নির্দেশনা অভিজিৎ দাস। ১৬/১২ হাওড়া বাণী নিকেতন , ১৭/১২ চাকদহ, ১৮১২- সোনাঝুড়ি শান্তিনিকেতন, ১০০৩২২ কাকড়াবন, উদয়পুর অভিমুখ-এর নাট্যসৃজন-এ , ১০০৪ শিলচর বঙ্গ ভবন-এ নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ২৭০২ বিসর্জন, ভুবনেশ্বরী মন্দিরে ও ২৩০২ বিলোনীয়া কেন্দ্রবিন্দু উৎসবে 'নাইটগার্ড', রচনা ও নির্দেশনা অভিজিৎ দাস সফল মঞ্চায়ন করে।

প্রাক্ পূজায় 'উত্তর ফাল্গুনী' ৩১/৮-২/৯/২২ তিন দিনের নাট্যোৎসব করে রবীন্দ্রভবনে। তারা এবং 'সায়ক' কোলকাতা পরপর 'তাহার নামটি রঞ্জনা' 'আত্মজন' ও 'ভালোলোক' মঞ্চস্থ করে দর্শককে যথেষ্ট আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে।

সবশেষে আমার উপলব্ধি নাট্যচর্চায় সারা রাজ্যেই নাট্যকর্মী ও নাট্যানুরাগী মানুষ নিয়ত ব্যস্ত নতুন নতুন নাটক রচনা, উপস্থাপনা, প্রশিক্ষণ এবং নাট্যসাহিত্যের প্রচার, প্রসার ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে। ব্রেখট বলেছেন "নাট্যধারা একটি মুক্ত চিন্তার শরিক হতে পারে যদি তা সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী স্রোতের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারে। থিয়েটার সমাজের নানা কার্যকরী প্রতিরূপ তৈরি করে এবং সমাজকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে।" আমি বিশ্বাস করি নাটক এই ক্ষমতা দ্বারা মানুষের জীবনবোধ ও সমাজ পরিবর্তনের অভিমুখ রচনা করবে বিনোদনের মাধ্যমে যা বর্তমান ঘটনার ঘনঘটায় বিচলিত এই জটিল সময়ের দাবি মেনে মানুষের মনন-চিন্তনে প্রয়োজনীয় পরিশুদ্ধ মুক্ত চিন্তার প্রকাশ ও প্রয়োগে আন্তরিক কার্যকরী দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে।

লেখক : **শেখর সি দত্ত** , রাজ্যের বিশিষ্ট কবি, দক্ষ অভিনেতা ও ত্রিপুরা থিয়েটারের নাট্যকর্মী।

# বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদপত্রে নাট্য মন্তব্য

**‘ডেইলি দেশের কথা’**

## ভিড়ে ঠাসা হলে ত্রিপুরা থিয়েটারের নাটক ‘কাক চরিত্র’

নিজস্ব প্রতিনিধি ।।আগরতলা ৬ জুন: সোমবার সন্ধ্যায় পরিবেশিত হলো ত্রিপুরা থিয়েটারের নিবেদন মনোজ মিত্রের নাটক ‘কাক চরিত্র’। রবীন্দ্র ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে হয় পরিবেশনা।

মনোজ মিত্রের ‘কাক চরিত্র’ নাটকটির রূপান্তর ঘটিয়েছেনে বিভু ভট্টাচার্য। ২০২২ সালের ত্রিপুরা থিয়েটারের প্রথম উপস্থাপনা এটি। এই নাটকটি দেখার জন্য সোমবার সন্ধায় রবীন্দ্র ভবন ছিলো ভিড়ে ঠাসা। নাট্যশিল্পীদের পরিবেশনা মুগ্ধ করে তোলে দর্শকদের। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন কমল মজুমদার।

ত্রিপুরা থিয়েটারের বক্তব্য নাটককে সমাজের দর্পণ বলা হয় কারণ মানুষ এটা বিশ্বাস করে যে যা ঘটে তাই নাটকে প্রদর্শিত হয়। ভাবনা নিশ্চয়ই সঠিক।। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটে তা যদি নাটকে দেখা না যায় অথবা পাল্টে যায়। কোন একটা স্তরে ফাঁক থাকলেই বিভ্রম ঘটতে পারে। কারণ মানুষের বহিরঙ্গ আর অন্তরঙ্গে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে তো আকছার। লেখক প্রতিদিন যা লিখছেন তাই বিশ্বাস লিখছেন কিন্তু বাস্তবের অভিঘাতে সেই ঘোর ভেঙে যেতে কতক্ষণ। এই নাটকে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে লেখককে খবর দেয়া নিছক প্রতীকী মাত্র। মূল বিষয় বলো সত্যি কথা জানার প্রয়াস আন্তরিক হলে সে বিষয়ে লিখিত নাটক নিশ্চিতভাবেই সমাজের দর্পণ হয়ে উঠবে।

**‘স্যন্দন পত্রিকা’**

## ত্রিপুরা থিয়েটারের সফল প্রযোজনা

আগরতলা , ৩১ ডিসেম্বর।। গত ৩০ ডিসেম্বর ‘রবীন্দ্র ভবন’ এর ২নং প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ হয় ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় ‘মতিজানের মেয়েরা’। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখিকা সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প অনুসরণে নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় বিভু ভট্টাচার্য। অর্থনৈতিক বিপন্নতা ও সামাজিক নানা অন্যায় মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে কিভাবে তছনছ করে দেয়, সম্পর্ক ছিন্ন হয় সুস্থ জীবনবোধ কিভাবে ধ্বংস করে তারই প্রতিফলন দেখা যায় এই নাটকে। মানুষের এই সমস্যা গোটা ভারতীয় উপমহাদেশেই দেখা যায়। নাটকটির সকল অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। আগরতলা সম্মিলিত নাট্যপ্রয়াস এই প্রযোজনায় সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

**'দৈনিক সংবাদ'**

আগরতলা। বৃহস্পতিবার। ২৮ পৌষ, ১৪২৮ বাংলা

# মতিজানের মেয়েরা সাহসী এবং সংযত মঞ্চায়ন

Drama is very important in life.you have to come on with a bang. You never want to go out with a whimper. Everything can have drama if it's done right. Even a pan cake . - Julia Child

ত্রিপুরা থিয়েটারের নাটক 'মতিজানের মেয়েরা' মঞ্চস্থ হলো ৩০ ডিসেম্বর, রবীন্দ্র ভবনের দু-নম্বর হলে আর বাংলাদেশের নারীবাদী লেখিকা সেলিনা হোসেননের ছোটগল্প অনুসরণে প্রস্তুত নাটকটি দেখতে দেখতে জুলিয়া চাইল্ডের কথাগুলো খুব প্রাসঙ্গিক ঠেকলো। আঘাত করো সজোরে, ইনিয়ে বিনিয়ে নয়। মতিজানের দেওয়া আঘাত সমাজের আবহমানকাল থেকে চলে আসা 'সিস্টেমের' উপর, যে 'সিস্টেমে' অত্যাচরিত নারীর উপর লাঞ্ছনার শৃঙ্খল চাপিয়ে দেওয়া হয়। মতিজান ভিন্ন ধাঁচে গড়া 'অন্য' নারী। সে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক অনুশাসন অগ্রাহ্য করে আত্মমুক্তি আর আনন্দের পথ নিজে নিজেই খুঁজে নিয়েছে। এই নারী ও এই সময়ের ব্যতিক্রমী আরেক নারী। সচেতন ভাবনা থেকে সে যে লোকমানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল তা নয়, যা কিছু ঘটে ছিল তা ঘটেছিল স্বাভাবিকতার পথ ধরে-স্বামীর অবহেলা আর দজ্জাল শাশুড়ির অত্যাচার থেকে।

বিভু ভট্টাচার্যের নির্দেশনায় নাটকটিতে সাজেশনের ব্যবহার প্রচুর। গুলতি ছুঁড়ে ফল পাড়ার দৃশ্যটি, ঝড়ের শব্দ Pre Cursor হিসাবে কাজে লাগানো হয়েছে, লোকমানের শারীরিক মিলনের দ্যোতক হিসাবে। নাটক শুরুই হয়েছে চারটি মেয়ের স্কিপিং করার দৃশ্য নিয়ে, স্বাধীন জীবনের সাজেশন হিসাবে। মূল লেখাতে শারীরিক নির্যাতন ছিল, তাও এড়িয়ে গিয়ে নাট্য পরিচালক verbal wrestling এর মাধ্যমে শাশুড়ির প্রতাপ প্রকাশ করেছেন। শর্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে লোকমানে বেরিয়ে যাওয়া পরিচালকের পরিশীলিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। প্রপস্ (Props) হিসাবে নাটকে দুটো বাঁশের বেড়া, বিশাল মাছের জাল, শুকনো গাছের ডাল, ঝাড়ু, বাসনকোসন, পুতুল ইত্যাদির ব্যবহার মিনিমালিস্ট (Minimalist) ধারাকে সুন্দরভাবে বহন করেছে। উত্তর আধুনিক এই ধারাকে অমর করে গেছেন নাট্যকার স্যামুয়েল ব্রেকট্, চিত্র পরিচালক ব্রেশন। কারভারের ছোট গল্প গুলোও তাই। কোভিড পরিস্থিতিতে নাটক মঞ্চস্থ করার পাশাপাশি মিনিমালিস্ট নাটক করার সাহসও দেখিয়েছে ত্রিপুরা থিয়েটার। কুর্নিশ অবশ্যই প্রাপ্য বিভু বাবুর কারণ এই ফর্মাটেই দেখানো কম হয় কিন্তু বলা হয় অনেক কিছু। নাটকের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নাটকের কুশীলবরা কথ্য ভাষাতেই কথা বলে। লেখিকার বাংলাদেশ আর বৃহত্তর বাংলাতে অনেকেই এই ভাষাতেই

কথা বলেন। তবু কয়েকটি দৃশ্যে শুদ্ধ ভাষা ও কথ্য ভাষা মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে কমিক্ রিলিফের জন্যয নাটকের নতুন করে কিছু দৃশ্য রূপায়িত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগ কেন স্টাডি হিসাবে মতিজানের অত্যাচারের বিষয়টিকে চিহ্নিত করে, তখন শিক্ষিতদের প্রতিনিধিত্বমূলক শুদ্ধ ভাষা ব্যবহৃত হয়। যদিও নাটকের মোমেন্টাম কতটুকু এগোলো এই দৃশ্যের মাধ্যমে, তা তর্কের বিষয়। কিন্তু নাজমা চরিত্রটি একেবারে মাস্টারস্ট্রোক ,শাশুড়ি গুলনুরের কানে বিষ ঢালার কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন। এতে নির্দেশক শাশুড়ি গুলনুরকে একেবারে আউট অ্যান্ড আউট খল চরিত্র হওয়া থেকে কিছুটা উদ্ধার করতে পেরেছেন। বেশ কয়েকটি গান ব্যবহৃত হয়েছে নারীর অধিকারমূলক এই নাটকে। মতিজানের বিয়ের আগে 'ঘরেতে ভ্রমর এলো গুনগুনিয়ে', বিয়ের সময় 'সাজো সুন্দরী কন্যা, সাজো বিয়ার সাজে, অবৈধ সম্পর্কের আহ্বায়ক হিসাবে 'মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষের সনে'। কিন্তু দর্শকদের মন মজেছে গাঁজাখোর ইমপর্টেন্ট আবুলের গলায় মহম্মদ রফির কালজয়ী হিন্দি গান ' তেরী প্যায়ারী প্যায়ারী সুরতকো'তে। শব্দের কিছু প্রয়োগ প্রশংসার দাবী রাখে। তীব্র টেনশনের দৃশ্যকে তরলায়িত করা হয়েছে ভেঁপু বাজিয়ে, নবজাত শিশুর আগমনের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসাবে আজানের সুরের ব্যবহার, কনফ্লিক্ট সৃষ্টিতে তবলার দ্রুত লয়ের কাজ। আলোর ব্যবহার মোটামুটি চলনসই। নাটকের বিষাদগ্রস্ততার কথা মাথায় রেখে সাধারণ আলোই ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। নীল আলো ব্যবহৃত হয়েছে মতিজানের সলিলকি দৃশ্যে, ডক্টর ফস্টাসের ধাঁচে শুভ আর অশুভ শক্তির টানাপোড়েন বোঝাতে। নিজের এন সি্ (mise-en-scene) এভাবে তৈরি হয়েছে।

**ড. সুরজিৎ সেন**, আগরতলা।

---

# ত্রিপুরা থিয়েটারের নিবেদন 'কাক চরিত্র' নিয়ে কিছু কথা

## রাকা চক্রবর্তী

ত্রিপুরা থিয়েটারের সাম্প্রতিক নিবেদন 'কাক চরিত্র' গত ৬ জুন সন্ধ্যায় পরিবেশিত হল রবীন্দ্র ভবনের ২নং হলে। মনোজ মিত্রের 'কাক চরিত্র' নাটকটির রূপান্তর করেছেন শ্রী বিভু ভট্টাচার্য্য এবং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রী কমল মজুমদার। যিনি এই নাটকটির প্রধান চরিত্র 'ব্যোমকেশের' চরিত্র রূপায়ণেও দর্শকদের মনে অনন্য ছাপ রেখেছেন। মূল বিষয়টি মনোজ মিত্রের 'কাক চরিত্র' থেকে নেওয়া হলেও, রূপান্তরে যথেষ্ট স্বকীয়তা বজায় রাখা হয়েছে। নাট্য পরিচালক নাটকটির মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে চরিত্র রূপায়ণে সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন দক্ষতার সঙ্গে।

নাটকটির মূল ভাবনা- লেখক প্রতিদিন যা দেখছেন, তাই বিশ্বাস করে লিখছেন এবং যতদূর সম্ভব চেনা-জানা জীবনের কথাই যুক্তিসঙ্গতভাবে লিখছেন। যার জন্য তিনি

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারেও পুরস্কৃত হয়েছেন। এটা সামাজিক স্তরে একটা বড় ভ্রান্তিই বলা যেতে পারে। কিন্তু তার মধ্যেও কঠিন বাস্তব থাকে। সেই বাস্তবের অভিঘাতে লেখকের ঘোর ভেঙ্গে যেতে কতক্ষণ! এখানে বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে লেখককে কাকের খবর দেয়া নিছক প্রতীকি মাত্র। মূল বিষয় হলো, "সত্যি কথা জানার প্রয়াস আন্তরিক হলে সে বিষয়ে লিখিত নাটক নিশ্চিতভাবেই সমাজের দর্পণ হয়ে উঠতে পারে।"

লেখক ব্যোমকেশবাবু বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীকে নিয়মিত নিজের লেখা নাটক দিয়ে সাহায্য করেন কিন্তু নিজের ঘরের এবং আশেপাশের খবর রাখেন না। তিনি পাড়ার দ্বিজুবাবু, ডাক্তার দাশকে বিশ্বাস করে নিজের নাটকের নায়ক বানিয়ে ফেলেন কিন্তু তাদের বাস্তব চরিত্র জানেন না। এমন কি নিজের স্ত্রীর অন্য পুরুষে আসক্তি সম্পর্কেও অবগত নন। বরং বাড়ির গাছে কাকের বাসা ও নিরন্তর কা-কা শব্দে বিরক্ত বোধ করেন। সেই কাক লেখকের চোখ খুলে দিয়ে, যথার্থ লেখক হওয়ার অনুপ্রেরণা যোগায়।

নাটকটি সম্পূর্ণভাবেই উপস্থাপিত হয় কৌতুক রসাত্মক ফর্মে, যেখানে গুরুগম্ভীর বিষয় উচ্চারিত হয়না বরং হাল্‌কা স্ফূর্তির স্পর্শ থাকে, যা দর্শককে দেয় এক হাস্যমুখের অভিজ্ঞতা। নাটকটির শেষ অংশটি, যেখানে বাস্তব জীবনের কঠোর অমানবিক নিষ্ঠুরতায়, লেখক হাহাকার করেন, নাটকটির ভরকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

নাটকটির নেপথ্যে যারা ছিলেন, তাঁদের কাজ ও প্রশংসনীয়। মিউজিক এ সৌমেন্দ্র নন্দী, মেকআপ এ তপন কর্মকার যেমন বাহবা পাবেন, তেমনই প্রশংসার দাবি রাখেন মঞ্চসজ্জায় আশীষ সাহা ও শব্দ পরিচালনায় শিশির কর। মৃণালকান্তি চ্যাটার্জির আলোর ব্যবহার ও যথাযথ তবে মাঝে মাঝে আলো-স্বল্পতা চোখকে অল্পবিস্তর পীড়া দিয়েছে।

অভিনয়ে প্রত্যেকেই ছিলেন যত্নবান এবং নিজ নিজ ভূমিকাগুলি সম্পাদন করেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রথমেই উল্লেখ্য কমল মজুমদার, অসাধারণ সামগ্রিক অভিনয়ের জন্য। তাঁর সংলাপ উচ্চারণ ও প্রক্ষেপণ অনবদ্য। তেমনই তাঁকে সঙ্গত দিয়েছেন 'কাক-১' চরিত্রে সুপ্রিয়া চৌধুরী। আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে 'কাকের ম্যানারিজম' এবং সংলাপ উচ্চারণ এক কথায় অপূর্ব। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, সুপ্রিয়া চৌধুরীর অভিনয় আগেও দেখার সুযোগ হয়েছে এবং সত্যিই তিনি মনে প্রাণে একজন যথার্থ নাট্যশিল্পী।

ভাল লেগেছে দ্বিজু বাবুর চরিত্রে কিশোর দত্ত ও ডাক্তার দাশের চরিত্রে শেখর সি দত্তকে। সাধু চরিত্রে দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও যথাযথ। লোকটির চরিত্রে শ্যামলকান্তি দে ও ব্যোমকেশের স্ত্রীর চরিত্রে মণিদীপা রায়ের গানের উপস্থাপনা দর্শককে দারুণ আনন্দ দিয়েছে।

নাটকটি দেখতে দেখতে মনে হলো আন্তরিক প্রচেস্টা থাকলে যেকোনো শিল্পকলার উপস্থাপনা এক অন্য মাত্রা পায়। সীমিত সাধ্যের মধ্যে ত্রিপুরা থিয়েটারের এই প্রয়াস দীর্ঘদিন দর্শকদের মনে থাকবে এবং এমন নাটক এই প্রজন্মের দর্শকমন্ডলীকেও সমানভাবে আকৃষ্ট করবে। ত্রিপুরা থিয়েটার আরো নাটক নিয়ে আসুক। আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

# বাংলা
# না ট ক

# ENGLISH
# P L A Y

## স্মৃতির অলিন্দ থেকে

*নাটক রচনায় ত্রিপুরা রাজ্যের রয়েছে দীর্ঘ ঐতিহ্য। ১৮৯৭ সাল থেকে পাশ্চাত্য রীতিতে স্টেজ বেঁধে নাটক শুরু। মহারাজা বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সংস্কৃতিপরায়ণ সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্টপোষকতায় "উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ" এর পরিবেশনায় নাটক " পতিব্রতা"। নাটককার মহারাজ কুমার মহেন্দ্র দেববর্মা। এটিই রাজ্যের প্রথম নাটক হিসাবে পরিগণিত এবং মুদ্রিত। পরবর্তি নাট্যানুরাগী মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নাট্যচর্চা অধিকতর সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। দেশ স্বাধীন হলে ত্রিপুরা ভারতে যোগ দেবার পর শুরু হয় আরেক অধ্যায়। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সুধন্ব দেববর্মা, ত্রিপুরেশ মজুমদার, শক্তি হালদার সহ বহু নাট্য-নিবেদিত প্রাণ নাটক লিখে এবং মঞ্চস্থ করে নাট্যচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যান। ষাট এর দশক পেরিয়ে এলো সত্তর এর দশক। ত্রিপুরার নাটকে লাগল আধুনিকতার ছোঁয়া। গঠিত হলো অনেক গ্রুপ এবং সৃষ্টি হলো বহু মৌলিক নাটক। নাটক লেখায় যেন জোয়ার এলো। বিশিষ্টদের মধ্যে নাটক লিখে সাড়া জাগালেন অজিত মজুমদার, নিখিল ভট্টাচার্য, কমল রায়চৌধুরী, চন্দন সেনগুপ্ত সহ অনেকে। ত্রিপুরার নাট্যক্ষেত্রে 'নক্সীকাঁথার মাঠ', 'দেবোনা তিতুন', 'সাদা পায়রার জন্য' বা ' অন্য পৃথিবী' সহ বহু নাটক রাজ্য এবং বহিরাজ্যে বিশিষ্ট নাট্যজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চমক সৃষ্টি করলো। জীবনে সমসাময়িকতার আঙিকে এইসব কালজয়ী রচনা ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনকে গভীরভাবে ঋদ্ধ করলো।*

*তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যারা অতীতে সফল নাট্য রচনা করে সারা দেশে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের একটি করে নাটক ত্রিপুরা থিয়েটারের প্রতি সংখ্যায় ছাপা হবে। আমরা বিশ্বাস করি তাদের নাট্যরচনা পাঠ করে বর্তমান প্রজন্ম বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত হবে। ২০২০ সাল থেকে শুরু। এবার তৃতীয় নাটক, অজিত মজুমদারের "নক্সী কাঁথার মাঠ"*

*- সম্পাদক*

# নক্সী কাঁথার মাঠ

অজিত মজুমদার

(মঞ্চ সফল অপেরাধর্মী নাটক)

### চরিত্রলিপি

**পুরুষ**

সূত্রধার, গায়েন (এ দু'টি চরিত্র একজন বা দু'জনে করতে পারে।) রূপাই, দুখাই, ছোবান, আকবর, কালু, বছির, সাজুর চাচা, কন্যার খালু, রূপার খালু, রূপার চাচা, রূপার মামু ও গ্রামবাসীরা। (মূলতঃ সূত্রধার, গায়েন, রূপাই ছাড়া অন্যান্যরা প্রায় সকলেই কোরাস শিল্পী বা

গ্রামবাসী হিসেবে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে মঞ্চের অভিনয়ে। নাট্যকৌশল অনুযায়ী এক একটি নাট্যমুহূর্ত তৈরী হতেই শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে রূপান্তরিত হতে পারে।)

**স্ত্রী**

সাজু, সাজুর মা, বুড়ী, রূপাইর মা, পড়শিনী দুই মহিলা ও সম্ভবস্থলে নাট্য প্রয়োজনে অন্যেরাও অংশ নিতে পারে।

নাটকে নির্দেশিত আলো, সঙ্গীত, মঞ্চ ইত্যাদি যেভাবে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছে সেভাবেই উল্লিখিত আছে। উৎসাহী প্রযোজকগোষ্ঠী নিজেদের মত করেও ওসব বিষয়ে প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাতে পারেন।

(পর্দা বন্ধ। গ্রাম্যদৃশ্য রচনার বাড়ী ও গাছের কাট আউট নিয়ে শিল্পীরা মঞ্চে অপেক্ষমান। বেজে ওঠে রাখালিয়া সুরে বাঁশের বাঁশী। দৃশ্যসজ্জার কাটআউটগুলো সব সময়েই মঞ্চে থাকবে। সুবিধেমতো নাট্য মুহূর্তানুসারে তাদের স্থান বদল হতে পারে। মঞ্চের বাইরে পর্দার সামনে গায়েন দাঁড়িয়ে যাবে। গায়েন ও সূত্রধার দুজনের দ্বারাও অভিনীত হতে পারে বা একজনের দ্বারাও। এই গায়েনের রূপসজ্জা অনেকটা গ্রাম্য গাজীর মত। যারা পটে আঁকা নানা গল্প কথা বলে বেড়ায়, হাতে তার নাতিদীর্ঘ একটি বাঁশের লাঠি যা সময়ে সে বাঁশীর মতও ব্যবহার করতে পারবে। আলো গায়েনের ওপর। এখন সে চৌদিক বন্দনা করে নাট্যক্রিয়ার সূত্রপাত করবে।)

(পাঁচালী ঢঙ-এ) উত্তরে বন্দনা করলাম হিমালয় পর্বত।
যাহার হাওয়ায় কাঁপে সকল গাছের পাত।।
দক্ষিণে বন্দনা করলাম ক্ষীর নদীর সাগর।
এই দুনিয়া জন্ম নিল যাহার ভিতর।।
পূবেতে বন্দনা করলাম পূবে ভানুশ্বর।
একদিকে উদয় গো ভানু চৌদিকে পশর।।
পশ্চিমে বন্দনা করলাম মক্কা মদিস্থান।
উদ্দেশ্যে জানাই আমি সবেরে সেলাম।।
গাইবো হেথায় সবে মিলি মানুষেরই গান।
যাহার কথায় আসে মনে কোরাণ পুরাণ ।।

(জারী ঢঙ-এ) দোয়া কর সকলে আল্লা রে।
ও আল্লা, দোয়া কর সকলে আল্লারে।।

(গাজীর কথক ঢঙ) হেই! আল্লাতালার দোয়া হোক সবার উপর
হেই! ছিরামের দোয়া হোক সবার উপর।।
হেই ! হজরৎ নবীর দোয়া হোক সবার উপর
হেই! বুদ্ধদেবের দোয়া হোক সবার উপর।
হেই! যীশুখ্রীষ্টের দোয়া হোক সবার উপর।
হেই! ছিকিষ্ণের দোয়া হোক সবার উপর।
মাগি সকল নবীর দোয়া শুরু করি আসর

(এবার গানের সংগে সংগতি রেখে পর্দা খুলছে। মঞ্চশিল্পীরা কোরাসে অংশ নিচ্ছে। গানের শেষে অন্তর্হিত হবে গায়েন। মঞ্চ খুলবে এমন ভঙ্গীতে যেন গায়েন গাজীর পট উন্মোচন করছে। শিল্পীদের হাতে কাটআউটগুলো ছন্দে আন্দোলিত হতে থাকবে। শিল্পীরা সকলেই গ্রাম্য চরিত্রাভাষে প্রকাশিত। মঞ্চের শিল্পীরা প্রতি লাইনের শেষাংশ শুধু গাইবে। " চিহ্নিত অংশ শুধু গাইবে।")

হেথায় হোথায় আছে দুই গাঁও "মধ্যে ধূ ধূ মাঠ।"
ধান কাওনের লিখন লিখি " করছে নিতুই পাঠ।"
এ গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা " হেথায় হোথায় গাছ।"
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব " দাঁড়ায় তারি পাছ।"
এ গাঁয় যেন জমাট বেঁধে " বনের কাজল কায়া।"
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে " বাড়ায় ঘরের মায়া।"

(মঞ্চশিল্পীরা দৃশ্য সংযুক্ত। দৃশ্য আন্দোলিত হচ্ছে পর্দা খোলার সংগে সংগে বোঝা যাচ্ছে। গ্রাম্য পরিবেশ রচনায় কিছু পশু পাখীর শব্দধ্বনি শোনালে মন্দ লাগবে না। বাঁশীর শব্দ শোনা যাবে। আলোতে গ্রামের সবুজ আভা। নেপথ্য থেকে ভেসে আসবে মুর্শিদা গানের কলি। এই অংশ মঞ্চকে দুটো গাঁ বোঝাতে দৃশ্যসজ্জার একদিকে 'রূপাই'র গাঁ বোঝাতে এই সঙ্গীতের সংগে হাল্কা দোলায়িত হবে। বিপরীত অংশ তখন স্থির। অনুরূপ পরবর্তী অংশে 'সাজু'র' গাঁ বোঝাতে ঐ অংশে দোলায়িত হবে ও রূপাইদের অংশ স্থির থাকবে।

" এক কালা দতের কালি— যা দ্যা কলম লেখি।
আর এক কালা চক্ষের মণি, যা দ্যা দৈনা দেখি।
-ও কালা ঘরে রইতে দিলিনা আমারে।

(রূপাইদের দৃশ্যের দোলা থামছে। অন্যদিকে সাজুদের দৃশ্যের দোলা শুরু হবে পুরুষ কণ্ঠে মুর্শিদা গানের কলি ভেসে আসতেই।)

"চন্দনের বিন্দু বিন্দু কাজলের ফোঁটা
কালিয়া মেঘের আড়ে বিজলীর ছটা।

(বাঁশী বাজছে। শিল্পীরা দৃশ্যপট রেখে প্রস্থান করবে পরবর্তী নাট্যক্রিয়ায় অংশ গ্রহণের প্রস্তুতির

জন্যে। সূত্রধার এগিয়ে আসে। বিবৃত করে তাদের আগমনের উদ্দেশ্য। তাদের ভাষা ভঙ্গী এবং আনুসঙ্গিক কিছু বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়ে দর্শকের সহযোগিতা কামনা করে। আলো সূত্রধারকে ধরেছে। (সূত্রধারের ভাষায় বাঙ্গলার নানা আঞ্চলিক মিশ্রণ।)

সূত্রধার : বাবুরা, আমাদের এই ব্যাপার স্যাপার দেইখে আপনাদের মনে কিবা একটা পরশ্ন দেখা দিল— আমরা কারা, কোথ্থেকে এয়েছি? এয়েচি গো বাবু আমরা ঐ নক্সী কাঁথার মাঠ থেকে। এইয়েচি আপনাদের কাছে আমাদের দুটো কথা বইলব বলে। বড় দুঃখ্যুর কথা বাবু। শুইনবেন আর যত দেইখবেন, ততই টনটন করি উইঠ্‌বে বুকখান। এতখনে কিবা জাইন্‌তে আপনাগো সাধ হইতেছে বাবু— কুথায় ঐ নক্‌সী কাঁথার মাঠখান? কুথায়? বইলব, সবই বইলব বাবু। তবে আপনারাও ঐ মনডারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। দেইখবেন ঠিক ঠাওর পাইবেন। ... দিনের পর দিন আমাগো বুকে তারে বইয়ে বেড়াইতেছি। তাই কইলাম, নজর মেললেই খুইজা পাইবেন তারে। হ্যাঁ, আমাগো একটা পরিচয় আছে বাবুরা— আমরা অইলাম গিয়া চাষীর জাত। .... কথায় আর কামে যদি কিছু খিচুড়ী মনে হয় বাবুগো, নিজগুণে ক্ষেমা কর‍্যা দিবেন আমাগো।

.... গাঁয়ের মানুষ আমরা, সাদামাটা চালচলন, কিন্তু ভদ্দরলোকের ঠায় আইয়া কথা বাত্‌রা আর চালচলনে আমাগো তালডা কিছু বেতাল হইয়ে যাচ্ছে বাবু। তবু মনকে অনেক বুইঝে সুইঝে, সাহসে ভর করেই এই আসরে আমাগো বড় সাধের নক্সী কাঁথার মাঠখান মেইলে ধরতেছি।

(আলো নিবে যায়। মঞ্চে নতুন আলো জ্বলবে। সূত্রধার সে আলোতে ধরা পড়বে না। পরবর্তী সংলাপ বলার জন্যে সে নিজেকে সুবিধাজনক স্থানে স্থাপন করবে । প্রায়ান্ধকার মঞ্চ থেকে ভেসে আসে সূত্রধারের সংলাপ।)

সূত্রধার : আমরা সবাই চাষী। নক্সী কাঁথার নক্সায় নক্সায় ফুটে উইঠেছে আমাদের জীবনের করুণ কাহিনী। যে বাঁশের বাঁশীতে আমাদের জীবনের গান বেইজে উঠে সেই বাঁশেরই লাটিতে..... কিন্তু না, সে কথা এখন নয়। মাঠই চাষীর মূলধন— একথা কে না জানে বাবুরা? কিন্তু সেই মূলধনকে নিয়েও চাষীদের জীবন সংগ্রামে সইতে হয় কতই না দুঃসহ যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার বিরুদ্ধে ক্ষণে ক্ষণে শোনা যায় জোট বাঁধা চাষীদের অসহায় সংগ্রামী আর্তনাদ। ঐ আর্ত প্রতিবাদ এখন আমাদের বিধাতার বিরুদ্ধে । কারণ ......

(এবার হাল্কা রক্তিম আলো চাষীদের মঞ্চরূপী মাঠে। এই সংলাপ চলাকালীন দেখা গেল চাষের অভিব্যক্তিতে চাষী শিল্পীরা স্থির চিত্রের মত। সূত্রধার তাদের মাঝখানে। দর্শকের দিকে মুখ। প্রথম সংলাপে উঁচু গ্রামে কণ্ঠ।)

সূত্রধার (উঁচুগ্রামে) : ফাগুন গিয়া চৈত্র যায়, ভীষণ খরায় পরাণ যায়।

চাষীরা কোরাস : হায়রে হায় !! (চাষীরা নড়ে ভিন্নভাবে স্থির হয়)

সূত্রধার : (দর্শককে পেছন দিয়ে উঁচুতে তাকিয়ে) আকাশে নাই মেঘের ছিটা - জমিন হইলো ফাটা ফাটা। ... ফাটা মাঠে গরুর পা পড়ে না ভয়ে। ডোলের বীজ রইলো ডোলে। জোয়াল লুটায় ধূলার পরে, হায়রে। লাঙ্গালেতে মরচা ধরে-

চাষীরা : হায়রে আল্লারে!

সূত্রধার : (এবার আড়কোণ করে দাঁড়ায়) আকাশ থেইকা আগুন ঝরে আবার বাউকুড়ানী মারে জনে মানবে!

চাষীরা : আঃ!! আঃ!! আঃ!!!

(দমকা হাওয়ার শব্দ চলতে থাকে)

সূত্রধার : দুনিয়া করছে খাঁ খাঁ। চলছে জাহান্নামের খেলা।

(মাথায় হাত)

চাষীরা : (টানা সুরালো ঢং) হা ....... আল্লা .... হা ....... আল্লা ........

সূত্রধার : বৈশাখ ও তো যায়রে আল্লা, চাষী পানী বিনে কেমনে বা আর বাঁচে?

... আজরাইলের ও ডাক শুনি ঐ, — খরদরজালে ঐ হাঁকে!

(চাষীদের নিয়ে সূত্রধার লাঙ্গাল কাঁধে যীশুর ক্রুশ বয়ে নেওয়ার ভঙ্গীতে মঞ্চ পরিক্রমার শেষে দর্শককে পেছন দিয়ে দাঁড়ায়। মুখে ক্রমে দ্রুত লয়ে আর্তনাদ।)

চাষীরা : হা আল্লা! - হা আল্লা- হা আল্লা! !!

সূত্রধার : (গানের ঢং) আল্লা মেঘ দে, পানী দে, ছায়া দে রে তুই (আলো কাঁপছে যেন)

চাষীরা : আল্লা মেঘ দে!

(বিভিন্ন ঢংয়ে কয়েকবার গীতাংশ চলছে। আলোর কম্পনেও যেন আর্তনাদ। বাতাসেরও শোঁ শোঁ— সব মিলে ভাবের অসহায়তা আর্তনাদের ঢেউ তুলে যেন তা আছড়ে পড়ে শেষ হবে নেপথ্য থেকে মেয়েদের গানের শুরুতে। উপরের অংশ সাইড হ্যান্ড স্পটে অভিনীত হতে পারে। ঐ আলোর দাপাদাপি ধীরে অন্ধকারে পর্যবসিত হবে। পরবর্তী আলো হবে স্থির। ঐ আলো উজ্জ্বল হওয়ার ফাঁকে -কিঞ্চিৎ আলো আঁধারি পরিবেশে চাষীশিল্পীদের বয়ে আনা সেই পূর্ব গ্রাম্য পরিবেশের ঘর, গাছ গাছালীর ফাঁকে ফাঁকে মঞ্চে সাজু ও সঙ্গীনিরা মেঘ রাজার মাগন মাগার অভিনয়াংশের জন্যে গীতকণ্ঠে ঢুকবে। তারা ঐ গ্রাম পরিবেশকে ঘুরবে এমনভাবে যেন এ বাড়ী ও বাড়ী মাঙন মাগছে বোঝা যায়। অবশ্য এ দৃশ্যে যেহেতু সাজুরা রূপাইর বাড়ী আসছে সেজন্যে মঞ্চের একদিক থেকে বিপরীত দিকে আসবে তারা।

সাজুর পরনে থাকবে লাল শাড়ী। গাছ গাছালীর ওপর আলো। কেবল সাজুদের ওপর একটু তীব্র আলোর ফালি। পেছনের মঞ্চ থেকে গান গেয়ে এগুচ্ছে সাজুরা। গানে পুরুষ কোরাস অংশে মঞ্চে উপস্থিত শিল্পীরা অংশ নেবে।)

সাজুদের গান : কালো মেঘা নামো নামো, ফুল-তোলা মেঘ নামো,
ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো!
কানা মেঘা, টলমল বারো মেঘার ভাই,
আরো ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই,
কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া!

পুরুষ কোরাস : আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,

সাজুরা : নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথায় ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়।

পুরুষ কোরাস : আজকে যেন দেয়ার ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।
(রূপাই ঘরের কাজে যেন ব্যস্ত। সাজুরা তার বাড়ীর সামনে এসে গেছে। রূপাই দেখছে তাদের আড়চোখে। এবার সাজুদের গানে কিছু চঞ্চল ভঙ্গী।)

সাজুদের গান : দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো
দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামো।
ঘরের লাঙ্গাল ঘরে রইল, হাইলা চাষা রইদি মইল—
ঘরের গরু ঘরে রইল, ডোলের বেছন ডোলে রইল
দেয়ারে.......

(রূপাইর মা একটা পাত্রে করে অল্প ধান দিতে যাচ্ছিল সাজুকে, রূপাইর তা পছন্দ না হওয়ায় মাকে একধারে টেনে কথা বলবে। ওদের কথা বলবার সময় সাজুদের গান খুব নীচুগ্রামে থাকবে। থাকবে অঙ্গাভঙ্গীও। রূপাইদের কথা ও কাজ শেষ হলে সংগীতধ্বনি আবার শোনা যাবে।)

রূপাই : (মাকে একপাশে টেনে) মা, তুমি দেও কি মাত্র এই একটু ধান?—
এই দিলে আর তাগো কাছে থাকবো না আর মান।

রূপাইর মা : তবে .... ? (রূপাই পাত্র নিয়ে ভিতরে যায়। গান বাড়ে, রূপাই ফিরে আসে, কথা বলে, গান কমে, রূপাই মাকে।)
.... অন্ততঃ এতটুকু দিতেই হয় — বুঝলা মা!

(যেন সম্মান রাখল। মায়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে কথা বলে সাজুর মাগুনপাত্রে ধান দেয়ার অভিব্যক্তি। এ সময়ে চোখাচোখি হলো দু'জনাতে। উভয়ে রোমাঞ্চিত। গান কমে বাঁশীতে

প্রাণ কাড়া সুরতরঙ্গ ধ্বনিত হয়ে কমে আসে। গান বাড়ে। বাঁশীর মুহূর্তে মেয়েদের অভিব্যক্তি থাকবে যেন তারা নেচে গেয়েই চলছে। দর্শকরাই কেবল তা শুনতে পায়নি। সাজু মাণ্ডন ভাণ্ড তুলে গানে যোগ দিয়ে সকলের সংগে নৃত্যায়িত ভঙ্গীতে বেরিয়ে যেতে যেতে বিদ্যুৎ নজরে পিছু ফিরে রূপাইকে দেখে এগুচ্ছে। ঘুরে ঘুরে চলছে তারা। এবার গোটা দৃশ্যপটের ঘর গাছও যেন দোলায়িত, ছন্দায়িত, নৃত্যচটুল ভঙ্গীতে মাতোয়ারা। গানের শব্দ কমছে। বাঁশী বাড়ছে। আলো তাদের এগিয়ে দিতে দিতে কমছে। হ্যান্ডস্পটেতে সূত্রধারের প্রবেশ হবে। সাজুদের আলো কমে যাওয়া মুহূর্তে মঞ্চদৃশ্যের শিল্পীরাও ভিন্ন দৃশ্যে অভিনয়ের জন্যে সঙ্গাতি রেখে প্রস্থান করবে। বাঁশীর ধ্বনিও কমে যাচ্ছে আঁধারে। সাজুদের গান কমে গায়ক বা সূত্রধারের গান শোনা যাবে তাদের প্রস্থানের পূর্বেই সাজুর অবস্থা বোঝাতে যাতে সুবিধা হয়। সাজুরা যাচ্ছে, গায়ক ঢুকছে।)

গায়ক : (গানের ঢং) লাজ রক্ত হইল কন্যার পরথম যৈবন,
মদনমোহন বানে জরজরিত মন,
আগে পিছে চলে তার যত সহচরী
পিছু চাইয়া চলে কন্যা লাজে রাঙা মরি। ....

(সাজুদের প্রস্থান হয়ে গেছে। সূত্রধারের অভিনয় অংশে এবার কিঞ্চিৎ আলোতে অভিনীত হয়ে কিছু অংশ পুরো আঁধারে অভিনীত হবে। ঐ অন্ধকার অংশে অভিনয়ের সময় ঝড়ো হাওয়ার শব্দ তরঙ্গ শোনা যাবে। গায়ক ও সূত্রধার দুজন হলে গায়কের প্রস্থান সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার : বিধাতার রুদ্ররোষ থেকে নিজেদের বাঁচাতে গোটা গাঁয়ের কি অসহায় আকুতি। হায়রে! মাঠে ফসলের বান ডাকাতে না পারলে কি বাঁচে চাষীর পরাণ, না বাঁচে দেশের পরাণ? এই চাষীর রক্তচোষে যারা — এই রক্তজল করা ফসল গুদামজাত করে ফেঁপে ফুলে ওঠে যারা .... কিন্তু না, এখনও নয় তাদের কথা .....। আমরা দেইখেছি জীবনে জীবন মিশিয়ে, পরাণে পরাণ মিশিয়ে জীবন সংগ্রামে যখন মেইতে উঠে সারা গ্রাম— বিধাতার সিংহাসনও তখন থর থর কইরে কেঁপে ওঠে—। সেবারও কেঁপে উঠেছিল। মেঘরাজার মন গলে মাঠও ফসলে ভইরে উঠেছিল। — কিন্তু এই ভরে ওঠার মধ্যেই চাষীদের নড়বড়ে জীবনে নেইমে এল আর এক তীব্র কষাঘাত। (আলো কমে অন্ধকার ঘনায়।

শোনা যাচ্ছে ঝড়ের শব্দ। এবার সূত্রধার প্রায় অন্ধকারে গিয়ে কথা বলে। কেবল শব্দ উঠা নামা করে ঝড়ের। সূত্রধারের নিম্নাংশে অভিনয়ের সময় পেছনের মঞ্চে বাঁশবনের প্রতীকি প্রস্তুত করে অপেক্ষা করবে শিল্পীরা। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনে যেমন বাঁশবন , কবর ইত্যাদির দৃশ্য সুবিধার্থে পেছনের মঞ্চে সুবিধামত স্থাপন করা যেতে পারে। অবশ্য ওটা মঞ্চের সুবিধা অনুযায়ী চিন্তা করতে হবে। দৃশ্য কিন্তু কিছু হাল্কা ধরনের হলে আগু পিছু করার প্রয়োজনেও

সরানো যেতে পারে। এবার সূত্রধারের গলায় গ্রাম্যতার আভাস বেশী।)

সূত্রধার: ঐ শনশনে আওয়াজ। ঐ এক মারণ মন্ত্র। আশ্বিনের ঝড় তুফান। হ্যাঁ গো বাবুরা, এই ঝড়ের কেরামতে, দুমড়াইয়া দিল আমাগো জীবন। মুষড়াইয়া দিল আমাগো গেরামখান। গাঁয়ের মানুষ আমরা। মাথা গুঁজবার ঠাঁইখান বড় লড়বড়ে... খোদার মেহেরবানীতে যদি কোনরকমে মাফ পাই কালবৈশাখীর থেইকা, — তো আইত্যানে কাইত্যানে থাপড়াইয়া দোজকের দুয়ার দেখাইয়া আনবো। এই তো খোদার কুদরৎ। আল্লা বেজার অইলে চোখে শর্ষা ফুল। গাঁয়ের মানুষ — এই হক কথা জানি। এই তুফানের তাফালে যে আমরার কত ঘর বাড়ীর জান কবুল অইল! হায়রে, এই আইত্যানে জবাই অইল আমরার রূপাইয়ের রুশাই ঘরখানও । হায়, হায় — এইবার কি উপায় ?

(রূপাই ও সূত্রধারকে এরপর দেখা যাবে দুই সাইড হ্যান্ডস্পটে সামনের মঞ্চে। পেছনের মঞ্চে অন্ধকার। ঐ অন্ধকারে বাঁশবন অপেক্ষা করে আছে। রূপাইর কাঁধে গামছা, মাজায়-দা, কোমরে চিড়ার পুঁটুলির আভাস! ওপরের সংলাপ শেষে উভয়ের ওপর দুই বিপরীত আবর্তে আলো পড়তে সূত্রধার রূপাইকে ডাকছে। রূপাই কিছু আনমনা, ধীর পায়ে গতি উদাস।)

সূত্রধার : রূপাই! ও রূপাই! (রূপাইর প্রবেশ স্পষ্ট হয়)

রূপাই : ভাইসাব কি আমারে ডাকছ?

সূত্রধার : হ। তোমার কোচায় কি? ঐডা এই রকম গাল ফুলাইয়া গোস্যা করছে কেন?

রূপাই (যেন ব্যস্ত): না, না, গোসা টোসা কিছু না। মা—

সূত্রধার : (হেসে) কোচায় মা?

রূপাই : (বিরক্ত) ধ্যুর! মা বান্ধ্যা দিলো, চিড়া গো।

সূত্রধার : চিড়া?

রূপাই : হ । বাঁশ কাটতে যামো কিনা রুশাই ঘরের লাইগা। তাই।

সূত্রধার : অঃ। তা চিড়া খেয়ে লাইগবে বুঝি?

রূপাই : হ—না—মানে ... (সাজুদের গাঁ আলতোভাবে ইঙ্গিতে দেখায়) ... ঐ ...ঐ...ঐ গাঁয়ে যামো কিনা?

সূত্রধার : (না বুঝার ভানে যেন তাকে কেবল খোঁচাতে চায়) ঐ গাঁ মানী? কোন গাঁ গো? ... কি উত্তরে ... না দক্ষিণ...?

রূপাই : না মানী, ঐ তো .......ঐ যে,

সূত্রধার : কৈ যে?

রূপাই : (আঙ্গুল দিয়ে দেখতে গিয়ে যেন সম্বিত ফিরে) ঐ যে দেখা যায় — ঐ — ঐ— ঐ গাঁয়ে, ঐ যে ছাওয়া ছাওয়া বাঁশবন.......

সূত্রধার : (যেন বুঝ পায়) ওঃ! ঐ গাঁ।

রূপাই : হ্যাঁ, (কিঞ্চিৎ লজ্জিত যেন)

সূত্রধার : (আচমকা) কিন্তু ঐ গাঁয়ের মানুষ এই গাঁরে বাঁশ দিলে এই গাঁয়ের মানুষ বাঁশ দিবো কারে রূপাই ?

রূপাই : (সোজা উত্তর) যে চাইবো তারে।

সূত্রধার : (মিষ্টি হাসির ঝলকে) ওঃ। ... তা তুমি চাওনা কেনে ?

রূপাই : (কিঞ্চিত রাগত ঢংয়ে) কেনে চাইবো ? ... মোল্লাবাড়ীর বাঁশ ভাল, কিন্তু ফাঁপগুলান কি জ্যুৎসই ? সাধে কি আর এই গাঁ ছেইড়ে যাই ? ঐ খাঁ বাড়ীর বাঁশগুলানের খবর জান ? সব ঢোলা ঢোলা। কোন কম্মের নয়। কিন্তু ঐ

গাঁয় — ঐ সেখের বাড়ীর বাঁশ ? বাঁশ তো নয় — য্যান ফালা ফালা কাঠ ভাইজান। আঁশগুলানও তার চেকন চেকন।

সূত্রধার : (আবার অনুসন্ধানী কন্ঠ) তা কোন গাঁয়ের সেখের বাড়ী কইলা রূপাই ভাই ?

রূপাই : (বাঁশবনের দিকে আঙ্গুল) আরে ঐ তো।

সূত্রধার : কই তো ? আমি কিছুই দেখিনা তো। তুমি একটু আগাইয়া দেখাও না।

রূপাই : (সেদিকে ফিরে) ঐ যে দেখা যায়।

সূত্রধার : দেখাও না আগাইয়া। দেখাও আগাইয়া দেখাও।

রূপাই : (ধীরে সেদিকে পা বাড়ায়) ঐ ঐ তো - ভাল কর‍্যা নজর মেললেই দেখা যায়—

সূত্রধার : (প্রস্থান মুখে দর্শককে) যদি ভাবে মজে মন, কি বৃন্দাবন আর বাঁশবন। (তার আলো নিবে যায়। রূপাইর ওপরের আলো কমতে থাকে। বাঁশবনের আলো অস্পষ্ট থাকবে। যেন আলো ছায়ার যাদুখেলা সেখানে। রূপাই নিম্নের সংলাপ মুখে নিয়ে বাঁশবনের পরিবেশে প্রবেশ করবে।)

রূপাই : হ্যাঁ বাঁশবন। ঐ যে ছাওয়া ছাওয়া। ঐ যে বাঁশগুলান সব হেইলে দুইলা আছে ।.... হোক না ভিন গাঁ, — তবু যত ভাল বাঁশ— সব ঐ তো, এই বনে.....

(রূপাই বাঁশবনের মঞ্চে। তাকায় এদিক ওদিক। সম্ভবস্থলে বাঁশবনের শব্দতরঙ্গ শোনানো যেতে পারে। “শ্লো মোশান” ভঙ্গীতে বাঁশ কাটার অভিনয় শুরু করে রূপাই। কিন্তু আবহ সঙ্গীতের লয় দ্রুত। ঐ আলোতেই হাতের মুঠোয় শুকনো লাকড়ী কুড়োতে সাজুও বাঁশবনের এলাকায় ঢুকে পড়ে। ঐ মুহূর্তে রূপাই অমনোযোগী হয়ে সাজুর দিকে নজর করতেই তার বুকের কোথাও লাগার অভিব্যক্তি করবে সে। কিন্তু সাজুর সে দিকে দৃষ্টি নেই । ঐ মুহূর্তে হঠাৎ আবহসঙ্গীত থেমে যাবে।)

রূপাই : আঃ !

বাঁশবনের নেপথ্য থেকে প্রতীক বহনকারী শিল্পীদের কোরাস প্রতিধ্বনি— আঃ !!

(রূপাই প্রতিধ্বনি বোঝে না। নিজেই লজ্জানম্র হয়। একদৃষ্টে সাজুর দিকে তাকিয়ে সে

স্পটের একফালি আলো সাজুর পায়ে গড়িয়ে চলতে পারে। কিন্তু রূপাই আঁধারী আলোতে। বাঁশী বেজে কমে আসে ১০-১৫ সেকেন্ড। সাজু কখনো এদিক, কখনো ওদিক ঘুরে ধীরে লাকড়ি খুঁজছে।)

রূপাই : (স্বগতঃ) খড়ি কুড়াও সোনার মেইয়ে , শুকনো গাছের ডাল, শুকনো আমার প্রাণ নিয়ে যাও, দিও আখার জ্বাল।

কোরাস : আঃ হাঃ !

রূপাই : (এদিক ওদিক তাকিয়ে বুঝলো যেন নিজের মনের প্রতিধ্বনি) শুকনো খড়ি কুড়াও মেইয়ে। কোমল হাতে লাগে !

কোরাস : লাগে !

রূপাই : তোমায় যারা পাঠায় বনে বোঝেনি কেন আগে ?

কোরাস : আগে ! (রূপাই এদিক ওদিক তাকিয়ে ঢোক গিলে)

রূপাই : আমার .... সব শরীর য্যামন .... কি রকম অসাড়.... অসাড় আমি ..... য্যামন....

(এতক্ষণে দুজনাতে দু'জনার নজর পড়ে। পূর্বরাগে অনুরাগে বাজে পাগল, পারা বাঁশী। দু'টো স্পটের আলো বিন্দুর মত দু'জনার মুখকে দর্শকের চোখে তুলে ধরেছে। সাজুর মায়ের প্রবেশে রূপাই বসে পড়ে। আলো আগের মত আঁধারী হবে। বাঁশী থামবে।)

সাজুর মা : (ডাকতে ডাকতে প্রবেশ) সাজু। সাজু । ওলো ও সাজু। ........(প্রবেশ) সাজু। আয়তো দেখি মা , নথ বেঁইধে দেই তোর নাকে। (বাঁশ বনে নজর যায়। চমকে) ...... ওমা ! ও কে লা ? ঐ বাঁশ ঝাড়ে বইসে ? ও কে ? (ঘোমটা টানে বারে বারে)

সাজু : (চমকে) অ্যাঁ ?

সাজুর মা : ও কে ? (এগিয়ে চিনতে পেরে) আরে রূপাই না ? (রূপাই জড়সড়) হ্যাঁ, ঠিক ধইরে ফেলেছি। চিনে ফেলেছি। বহুকাল বাঁচবি বাছা। আয় -এদিক আয়। আরে আমি যে তোর খালাম্মা রে !

রূপাই : (যেন স্বস্তি পায়) ওঃ ! (দাঁড়ায়)

সাজুর মা : ওঃ ! তা ও জানোনা বুঝি বাছা। ঐ মোল্লাবাড়ীর, আচ্ছা তোর মার কাছে গিয়াই খোঁজ নিয়া জানবি রে ছেইলে।

রূপাই : আচ্ছা।

সাজুর মা : আচ্ছা । কি আবার ? আরে আমি যে তোর মার ছোট বেলার সইরে। খেলার সাথী। ..... তা তুই এই বেলা দুপুরে বাঁস কাইটা খাওয়া দাওয়া করবি কৈ ?

রূপাই : খাওয়া ? মানে—

সাজুর মা : হ্যাঁ খাওয়া ?

রূপাই : আছে।

সাজুর মা : কৈ আছে । কি আছে?

রূপাই : এই বান্ধা দিছে মা। চিড়া, চিড়া (মুখ ফেরায়)

সাজুর মা : ওমা! কয় কি রে ব্যাটা।... দেখি, ফিরাতো মুখখান। আমি তোর খালা থাকতে তুই থাকবি ভুখা? পরে শুনুক তোর মা। আর গোসা কর‍্যা দোষাদুষি করুক আমারে।.... না অইবো না। ও সাজু, তুই বাড়ী গিয়া বড় মোরগটারে ধর, যা। আমি হেই গাঁও থেইকা এক হাঁড়ি দুধ নিয়া আই। না, আর দেরী না। যাও বাবা, সাজুর লগে বাড়িতে যাও। ওলো সাজু , অরে নিয়া যা। (প্রস্থান)

(দুজনে প্রথমে মাথা হেঁট । আবার স্পট ধরেছে দুজনকে। বাঁশীতে হাল্কা ধুন। উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হতে রোমাঞ্চিত হল দুজন। বাঁশী থামল। লজ্জিত দু'জনেই। বাক্‌হীন সাজু বাড়ীর পথ ধরেছে। রূপাই নিশ্চল হয়ে তা দেখছে। হঠাৎ সাজু পেছন ফিরে রূপাইকে দেখতেই সে চমকায়।)

সাজু : (লজ্জা ভেঙ্গে) রূপা— ভাইগো—এইসো।

(উল্লসিত রূপাই ছুটে সাজুর হাত ধরতে গিয়ে যেন লজ্জায় ক্ষ্যান্ত হয়ে যায়। এই সময়ে হাল্কা চালে মিউজিক চলে। ওরা উভয়ে প্রস্থান পথে এগোয়। বাঁশ ঝাড়ের আলো কমে যায়। ঝাড়-দৃশ্য আঁধার হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে। সাইডস্পটে সূত্রধারের ওপর আলো পড়ে।)

সূত্রধার : যা হবার তাই হতে চললো। আপনাদের চোখ যা দেখলে আর মন যা বুঝলো। হ্যাঁ, খালার বাড়ীর এমন খানা আর জুটবে কোথায় বাবুগো? .... (দীর্ঘশ্বাস) ঐ খানা বুঝি মেলছে ডানা মনে। (সুরে) " হায়! .... কিসে কি হয় কে জানে—? কেউ জানেনা কেউ জানে না যার জানা কি সে নিজেই জানে? " তাই জানতে পারলেন না রূপাইর মাও। কিন্তু এইটুকু টের পেইয়ে গেলেন ছেলের যেন কি হয়ে গেল এরি মধ্যে ! (প্রস্থান)

(সামনের মঞ্চে গায়েন প্রবেশ করে গেয়ে চলবে, যখন রূপার জোনে রূপা বাঁশী হাতে উদাস ভাবে বসে থাকবে তখন।)

(পদাবলী ঢং এ)

গায়ক : আর ঘরেতে রূপার , মন টেকে না, যে, তরলা বাঁশীর পারা
কোন বাতাসেতে চায় ভেসে যেতে হইয়া আপন হারা,
খেতে খামারেতে মন বসে নারে, নাই কাজে কামে কোন ছিরি
মনের তাহার কি যে হল হায়, ভাবে তাই ফিরি ফিরি
বসি সারাদিন কি যে ভাবে মনে, নিজেই নাহি জানে
ভেবে ভেবে হায় দিন চলে যায়, মার মনে নাহি মানে।

(গায়েন বেরিয়ে যাচ্ছে সাজুদের বাড়ীর কোণের দিকে। গায়েন থাকা সময় পর্যন্ত তার বাঁশী

শোনা যাবে না। শুধু রূপাইর উপর আলো। বাঁশীর শব্দও এবার শোনা যাচ্ছে। রূপাই এবার বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। বাঁশীর সুর প্রাণ কাড়ানো। ২০-২৫ কেন্ডে প্রায়। মা ডাকবে তারপর। কয়েকবার ডেকে মায়ের প্রবেশ হলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বাঁশী থামবে।)

রূপাইর মা : রূপাই, ও রূপাই, ..... ওরে শোন .... তোর কি হইছে আমারে খুইলা ক'তো বাবা .....

(মায়ের দিকে সে নিরুত্তর তাকিয়ে) .... কি রে, অমন কর্য়ে বইয়া রইলি কেনে? মার পরানের ব্যথা কি তোর পরানে বাজে না রে পাষাণ? ... ক আমারে সব খুইলা ক। ... ঐ যে বাঁশ কাটতে গেলি — তারপর থেইকাই আর তোর মুখে দানা রোচে না— গায়ে কাম গছে না। মার পরানে আমার কি কর্য়া সয়রে বাপ? (রূপাই নিরুত্তর, মা যেন এবার সব বোঝে)..... ঠায় দুপুরে বাঁশ গাছের নীচে .... কান্না চেপে) তবে কি জীন পেরেতে ..... (আঁৎকে ) না-না..... আমার কলিজার ধন আমি কেউরে ক্যাড়া নিতে দিমো না। (ছেলেকে জড়িয়ে ) হেই গাঁয়ের থেইকা আজকাই আমি ওঝা আনমো—জীন — পেরেতের কিচ্ছু ডর নাই। মার কিরা্যয় এই আমি থু দিয়া গেলাম বাবা। আমি ওঝা নিয়া আই। (ছেলের মাথায় থু থু করে প্রস্থান)

(আবহ সঙ্গীত দ্রুত লয়ে চরমে উঠে থামছে। রূপাই ভাবছে কি করবে? নেপথ্যে সামনের যে কোন উইংসের পাশ থেকে গায়েনের কণ্ঠে গায়কী ঢংয়ে ভেসে এলো—)

গায়ক : ওঝার কথা শুন্যা রূপাইর ফাল্-দা উঠে মন।
ছুটলো রূপাই খালার বাড়ী খুঁজতে ওঝা ধন। ওহে খুঁজতে......

(খমকের লঘু গমক তরঙ্গ শোনা যাচ্ছে যেন। রূপাই ছুটে ভেতর থেকে গামছা এনে কোমরে বাঁধছে। যেন একটা দিগ্বীজয়ে বেরুবে। হেঁটে মাঝ মঞ্চে সাজুদের বাড়ীর জোনের কিঞ্চিৎ দূরত্বে থেকে একই জায়গায় হাঁটার অভিনয় করে চলেছে। আর মুখে বলে চলেছে সংলাপ। মাঝে মাঝে সংলাপ ভঙ্গীতে যেন কারো সংগে মুখোমুখি প্রশ্নোত্তর চলছে।)

রূপাই : (এলোমেলো বলে চলে, হাসে, যেন বেসামাল) আমার উপর কিনা জীনের ভর! ... ঐ সেখের বাড়ীর জীন। ... হে মা কালী। হাঃ হাঃ হাঃ। থাক, আর একটু ভর কইরে জীন বাবাজী। ... একি যেমন তেমন ওঝার কাজ? ... ওঝাকে ধর্য়ে আনতে হবে না। নাক বরাবর গো বইল্ব— রোগী হা-জি-র। ....... ঝাড়পোক কইরবে, কর। তুক তাক্ কইরবে, কর। কিন্তু ঝাটাপিটা করতে গেলে.... অ্যাঁ কি বইল্লে? .... গেছিনু। .... না বট ফট — শ্মশান মশান নয়- কি? হ্যাঁ বাঁশবন। তা আমি বইলছিলাম........ কি, আমি কিছু ....... আমি ...... আমি না বললে .... কিন্তু ঐ বদনা বিয়ের .... ওঃ চুপ করি থাকতি হবে। (মন খুলে হেসে ফেলে) ..... ওরে বাবা.... এ যে এই - সে গেলাম। গাডা ছম ছম করে ক্যান্। মাথাটা কেন্ ঝিম ঝিম করে? থর থর কর্য়া কেন্- (ঢোক গিলে) গিয়া কি কমো? - কিন্তু কারে কি কমো? .... মা?

..... না সাজুরে? .... না পারমো না। ....... খালাম্মারে ? .....ঐ সোজা রাস্তা। গিয়া কমো.... কিন্তু কি কমো .....? হ্যাঁ কমো, তালাস লইতে আইছি। .... কার তালাস? .... যদি জিগ্যায় কার তালাস? ..... খালাম্মা তোমা-র , তো -মার। (রূপাই সাজুদের জোনের মধ্যে এসে গেছে। এ দৃশ্যে সাজুর মা নেপথ্য থেকেই অনেক সংলাপ বলবে। মঞ্চে দৃশ্যমান থাকবে রূপাই। তার অভিব্যক্তিতেই সাজুর মা'র দূর ও নিকট আনাগোনা বোঝা যাবে।)

নেপথ্যে সাজুর মা: কার পায়ের শব্দ শুনলাম- দেখত সাজু।

রূপাই : (আমতা আমতা) আ-আমি।

নে, সাজুর মা: আমিডা কে?

রূপাই : আমি- আমি ঐ গাঁর।

নে, সাজুর মা: ঐ গাঁর কি মুন্সী না মোল্লা?

রূপাই : হায় আল্লা। (চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ)

নে, সাজুর মা: জবাব দেওনা কেন- তুমি কোন শর্ম্মা?

রূপাই : (একটানা বলে যায়) আমি ঐ গাঁর রূপাই খালাম্মা।

নে, সাজুর মা: ও রূপাই?

রূপাই : তোমার জ্বর আইছে কইয়া পাঠাইছে আমারে কানাই। কইছে জ্বর, খুব জ্বর। তুলছো হাই। এও কইছে কানাই, কানাই কয়- জ্বরে রোচেনা অন্ন। খাওন খোঁজ ভিন্ন কোন , যা জ্বরের মুখে ধরবো মন। খুইজ্যা খাওন পাইয়া গেলাম, কিন্যা দৈরা লইয়া আইলাম। .... এই গজা।

(কোচা দেখিয়ে থেমে পড়ে বড় চোখ করে পরবর্তী আশঙ্কায়। সাজুর মা এতক্ষণে খিল খিল করে হাসতে হাসতে রূপাইর কাছে আসে। কস্টে যেন হাসি সামলায়।)

সাজুর মা : ওরে বালাই বালাই। জ্বর আইবো কেন রে পাগলা। (আবার হাসে) কি মজাই না করলি রে তুই। .... হ্যাঁ রে, জ্বরে কি কেউ গজা খায়রে? .... কি রে রূপাই চুপ কর্য়ে যে?

রূপাই : (ঢোক গিলে) ওহ্। .... খায়না বুঝি! জ্বরে যদি না খায় গজা। তবে অইল আমার আচ্ছা সাজা।

সাজুর মা : কেন? সাজা অইবো কেন?

রূপাই : এ কি আমার দোষ, জ্বরে যে গজা খায় না.... আমি কি জানি?

সাজুর মা : আবার জ্বর — কইলাম যে জ্বরই অয় নাই।

রূপাই : ওঃ। ............ অয় নাই। ....... (হঠাৎ) কিন্তু খালা, অইতে কতক্ষণ - কও!

সাজুর মা : (রাগত ঢংয়ে) কি কইলিরে বোনের পো! .... আমার জ্বর অইতো কেন?

জ্বর অইবো তো ওক গাজনা চরের বড় মোল্লার। ধন দৌলতের অভাব নাই। জন মানবের অভাব নাই। কই জ্বর তার কাছ ঘেসে না কেন? লাঠি দিয়া যেমন চাষীরারে ঠেঙ্গাইয়া রাখছে, এই রকম জ্বর জ্বারিও ঠেঙ্গাইয়া রাখছে।

রূপাই : তা আমি কি কর‍্যা জানমো? আমারে কইলো কেন কানাই? .... অখন আমি কি করি— গজা গুলানরে কি করি?

সাজুর মা : কি করবি আবার? ... ওলো সাজু, সাজু, (সাজুর প্রবেশ) বাছার কাছ থেইকা গজাগুলান নিয়া খাইয়া দেখতো কেমন মজা! (মায়ের প্রস্থান। সাজু রূপাইর কাছে শংকিত পায়ে আগু পিছু করে এগুচ্ছে। তাদের অবস্থান মঞ্চের পেছন ভাগে। সামনের মঞ্চে গায়েনের উপর সাইডস্পটের টুকরো আলো পড়বে রূপাই সাজুর ঐ অভিব্যক্তির কিছু পরে। গায়কের নিম্ন গীতাংশের কিছু অংশে রূপাইদের দেখা যাবে। শেষ দিকে রূপাইদের আলো নিবে গায়েনের আলো শেষে নিববে। অর্থাৎ রূপাইদের মিলন মুহূর্তের সমালোচনা সমাজে কিরূপ ধারণ করছে গায়ক তাই বিবৃত করবে। সাজু ধীরে পায়ে এগিয়ে সলজ্জ ভঙ্গীতে রূপাইর সামনে দুহাত পাতবে গজা নেবার উদ্দেশ্যে। রূপাইরও যেন দেয়ার উদ্যোগ হয়েছে— ঐ অবস্থায় আলো উঠানামা করে ধীরে নিবে যাবে। আলোর সঙ্গে তাদের অভিনয়ের অভিব্যক্তি থাকবে। ওদিক গায়কের রূপাইর জোনের প্রথম উইংসে প্রবেশ, বিপরীতে প্রস্থান হবে। এ সময়ে ২ জন গ্রাম্য মহিলা কলসী কাঁখে কানাকানি করতে করতে এগুচ্ছে। এই সময়ে গায়ক .....)

গায়ক : (গায়কী ঢং) কিন্তু পাড়াপড়সীতে
গাঁথল মনের বড়শীতে—
কানাকানি গুনগুনানি
চললো পথে ঘাটেতে।
লাজুক ধনির হিয়ার কথা
কালা চাঁদের মরম কথা-
বাজবে কেন বাঁশীতে?
বলছে পাড়া পড়শীতে-।
(আলোর স্থান পরিবর্তন হবে গায়কের প্রস্থানে)

১ম মহিলা : আলো মুন্‌সীর ঝি।

২য় মহিলা : ক' না কইবি কি?

১ম মহিলা : লাজের মাথা খাইয়ানি-

২য় মহিলা : মনের কথা কইবিনি?
১ম মহিলা : কইতে গেলে কইতে নারি।
২য় মহিলা : আমরা যে অবলা নারী।
১ম মহিলা : বুক ফাটে হায়—
২য় মহিলা : মুখ ফাটে না।
১ম মহিলা : লাজের কথা।
২য় মহিলা : থাক কইও না।
১ম মহিলা : পারতে কি আর কইতে পারি, (দু'জনে একটু থেমে)
২য় মহিলা : ঘরের মরদ করলে দেরী।
১ম মহিলা : গোস্যা জানি করবো ভারী। (আবার চলতে শুরু করে)
২য় মহিলা : আসল কথা কোন খানে?
১ম মহিলা : রূপাই সাজু যেইখানে।
২য় মহিলা : মনটানে সই কালার বাঁশী- (বাঁশী ধ্বনি শোনা যাচ্ছে)
১ম মহিলা : ঐ টানে যায় কাপড় খসি।
২য় মহিলা : জান সই বাজলে বাঁশী—
১ম মহিলা : হয় গো সই মন উদাসী।
২য় মহিলা : ঘরে থাকা বিষম দায়।
১ম মহিলা : হায়রে হায়।
২য় মহিলা : হায় হায়! (উভয়ে হায় হায় করে প্রস্থান। সাজুর জোনে ২ উইংসে) (আবহ সঙ্গীত চঞ্চল ও চরমে উঠেছে। রূপাইর জোন থেকে চঞ্চল পদক্ষেপে রূপাইর উজ্জ্বল ভঙ্গীতে সাজুর জোনের দিকে প্রবেশ হচ্ছে। আলো তাকে অনুসরণ করছে এবার।)
রূপাই : সাজু, ও সাজু-সা-জু। (সাজুর মার প্রবেশ)
সাজুর মা : কে রূপাই?
রূপাই : মজা, দারুণ মজা, বুঝলে খালা। আজ হাটে গে পাইলাম দুই গাছি পুতির মালা। একটা ছোড়া ডাইকা কয়- রাঙা সুতু নিবে গো- রাঙা সুতু? লাগবে না দাম। .... নিলে আর কি ক্ষেতি হবে- ভেইবে আমি নিয়েই নিলাম।
সাজুর : ভালই তো।
রূপাই : ভাল? কি ভাল? এই তো এখন ভাইবতে বসেছি- কি করি? এ গুলান দে আমি কি করি? যদি ঘরে ছোট বোন টোনও থাকতো না হয় সাজতো। তাই ভাবলাম-
সাজুর মা : কি ভাবছ?
রূপাই : ভাবলাম যে সাজু- মানে সাজু

সাজুর মা : কি- সাজু কি- ?

রূপাই : সাজু তো ছোট বোনের মত!

সাজুর মা : হ।

রূপাই : এই ভাইবাই বাড়ীর থেইক্যা ঘুর‍্যা আইলাম যে- যাই। তারে না অয় দিয়া আই।

সাজুর মা : বেশ কইছ বাছা, বেশ কইছ। ...... ওলো সাজু, সাজু-এক্কেবারে লাজে রাঙা অইয়া গেছে। ..... আয় এইদিকে আয়, পিনলে এই মালা খান, দেখি কেমন লাগে তোর গলাখান!

(আবহ সঙ্গীত বেজে ওঠে বাঁশী বা অন্য কোন যন্ত্রে। সাজু এগোয় ধীরে। রূপাই দু'খানা মালাই সাজুর হাতে দিতে গিয়ে একখানা সাজুর গলায় পরিয়ে দেবার জন্যে মায়ের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিজেই পরিয়ে দেয় সাজুর গলায়। আলো কমে আসে।

(অন্ধকারে কোরাস শিল্পীরা বলে যাবে)

একক : হেই, তিতিত্ তিতিত্

কোরাস : বাঁয়- বাঁয়।

একক : নাও বাও ভাই ধীরে।

একক : যার যার বাঁয়ে বাইয়ো যার যার বাঁয়ে।

একক : ডাইনে পানির ঘুরপাক।

একক : হইবোরে নাও কুপোকাৎ।

কোরাস : কুপোকাৎ, কুপোকাৎ, কুপোকাৎ

(যেন প্রতিধ্বনির মত মিলিয়ে যাচ্ছে শব্দ তরঙ্গ)

(আলো ধীরে জ্বলছে। অন্ধকার মঞ্চে এসে কোরাস শিল্পী একটা বটগাছের প্রতীক ধরে দাঁড়িয়েছে। তারা থাকবে তার পেছনে অদৃশ্যে। গাছটি ধনী এবং আগ্রাসী মোল্লার প্রতীক। ধারণকারীরা যেন তার অনুগত কর্মী গোষ্ঠী। ধারণকারীরা প্রয়োজন মুহূর্তে কোরাসে অংশ নেবে। তাদের অভিনয়ে মোল্লা সাহেবের প্রতাপ ফুটে উঠবে। সামনের মঞ্চে বিপরীত উইংস থেকে প্রবেশ করবে ধুতি পরা চাষী কালু। পাতলা মাথায় ও টুকরো বাঁশের ডগায় মাছের খলই নিয়ে প্রথমে আসে ছোবান জেলে। কালুর হাতে জ্বলন্ত হুকা। পরে সময় মত প্রবেশ করবে কাস্তে হাতে আকবর।

(সামনের মঞ্চের দিকে প্রথমে ছোবান ঢোকে)

ছোবান : সেব্ মত যখন জাল পাতছি আর উপরওলার ইচ্ছায় সোঁতটা যদি ঠিকমত বয়, শোল বোয়াল শালারা জালে না পড়্যে এইবার যাবি কৈ? ....
(বিপরীত উইংসে তাকিয়ে ) ....... আরে ও কালু - কালু।
শুইনে যাও। শুইনে যাও। (কালুর প্রবেশ)

কালু : কি ভাই ছোবান?
ছোবান : আরে অত তর তর কর্যা কই চলছ? বাউলের আসরে বুঝি দাবাৎ পড়ছে?
কালু : না- না তিনাথের আসর।
ছোবান : হেই কথা কও। আজকা কিন্তু বাবা তিনাথের পেস্বাদ একটু আমারে খাওয়াইবা,
কালু : তা তুমি ও যখন পীরের সিন্নি খাওয়াইছ—
ছোবান : হ, ভাবতা পার পাল্টাপাল্টিঐ।
কালু : কেন্- তোমার পীরের সিন্নীতে আমার কি উবগার কল্লো তোমারে কই নাই? এইবার তো আর তোমার বইনের গভ্যপাত হয় নাই।
ছোবান : (হেসে) কও কওরে ভাই কালু। আমার সিন্নীতে তুমি চলছ বাপ অইতে, আর তোমার তিনাথে কোরবান আলী চলছে চাচা অইতে। এইডারেই কয় রাম রহিমের কেরামতি। দেও ডাবাডায় দুইডা টান দিয়া দেই।
কালু : নেও। (/কা দেয়) (ছোবান কল্কেতে ফুঁ দেয়)
ছোবান : গতর খাইটাতো আর ফুরসৎ পাই না দুইডা সুখ দুঃখের কথা কওনের। - কও, তোমার ক্ষেতের ভাওডার কথা একটু শুনি।
কালু : আর ক্ষেতের ভাও? নিজের জমি যে কি আছে তা তো তুমি জানোই। এদিকে সময় মত মেঘও নামলো না যখন, গরীবের রাক্ষুসে ক্ষুধায় কি আর তখন ডোলে বীজ থাকে?
ছোবান : হ , কইছ কথা ঠিক । মানুষের যেমন খাওন দরকার -
কালু : জো মত ক্ষেতের পেডেও দেওন দরকার।
ছোবান : দরকার।
কালু : কিন্তু পারলাম কৈ ? রূপাই চাড্যা বীড দিয়া বাচাইছে। না ঐলে কি উপায় অইতো কও?
বটগাছের কোরাস : মাল হাতে মোল্লা আছে দিতো বটের ছাও।
(কালু ছোবানের সে কথায় কান নেই, ওটা সামাজিক সত্য। দর্শকের কানে দেয়া হচ্ছে মাত্র)
ছোবান : হ। গরীব গুণা এইরকম একটা ডোরে বান্ধা না থাকলে বাঁচনের আর উপায় কি? তোমার কি বা মনে আছে আমার ক্ষেত লাগানের সময় তোমরা গাঁওর দশ ভাই হাত লাগাইছলা বল্যা বাঁচছি। ট্যাকা দিয়া জন খাডানোর আমার ক্ষ্যামতা কই?
কালু : তারপর ধর, প্যার কর্যা ভাগচাষে একটু জমিও দিছে মালদার মোল্লা।
ছোবান : ও আল্লাহ্। রোইদে যেমন শরীলডা যায় জইল্যা।
কোরাস : মোল্লার আছে বটের ছাওয়া - আইয়ো রে ভাই-

ছোবান : চল ও ভাই-
কালু : ঐখানে যাই বইয়া।
(ওদের দর্শকের দিকে মুখ সংলাপের পরেই। কিন্তু যেন বটের কোরাসের সঙ্গো ওরা যাদুকরের আকর্ষণের মত বটের দিকে আকর্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ ওরা ফোকাসের সংলাপের সঙ্গো সামনে মুখ অথচ পিছু পায়ে হেঁটে বটের দিকে এগুবে। বটও অল্প এগুবে ওদের দিকে কোরাস বলতে বলতে । আকর্ষণটা পারস্পরিক।)
কোরাসে একক : বটের ছায়া—
কোরাসে একক : যাদুর মায়া।
কোরাস : মোল্লার দয়া, মোল্লার দয়া। বটের ছায়া!
(এতক্ষণে কালু ছোবান থপ করে বটের নীচে যেন বসে পড়েছে। কাস্তে হাতে দুরন্ত বেগে ঢুকে পড়ে আকবর)
আকবর : আরে ও ছোবান ভাই , তোমার কাছে দুন্যাইর কিবা কোন খবর নাই।
কালু : ক্যান, কি অইল ভাই— আকবর? অত তরস্ত ক্যান? কও চাই কি খবর?
আকবর : মোল্লা বাড়ীর গরুতে খাইছে আমার ক্ষেতের ধান, উপায় কিরে ছোবান?
উভয়ে : (দাঁড়িয়ে) অ্যাঁ!!
আকবর : হ্যাঁ- আমি তো ক্ষেতের মুড়ার জঙ্গাল কাটি। খবর দিল বলরাম। কানাই নিকি মোল্লার দুয়ার পর্যন্ত হেইগুলিরে ধাওয়া কর‍্যা দিয়া আইছে।
কালু : আর—
আকবর : আর ডাইকা হগলেরে জানান দিয়া গেছে- সাবধান সাবধান, মালদারের হাত থেইক্যা বাঁচাও সোনার ধান।
ছোবান : মালদার না জানোয়ার! জানোয়ার!!
কালু : উঃ , মালাদার মোল্লার পরানে ভগবান দয়া মায়ার একটু ছিডা ফোডা দেয় নাই? নইলে ক্ষেতের ধান—
আকবর : ক্ষেতে ধান অইলে যে গরীব বাচ্যা যাইবো— তো মোল্লার গোলা কেমনে ভরবো কালু—?
ছোবান : আর কার সর্বনাশ অইছে ক আকবর (স্থির দৃষ্টি)?
আকবর : কার অয় নাই? রহম চাচা, কলম শেখ, দুলাল ভূঁঞা- মোল্লা সাহেবের দুয়ারে গিয়া যখন তারা জিগাইল যে আপনার গরুর দল (যেন কণ্ঠ রুদ্ধ হয়) .......
বট কোরাস : অবলা জীব। অবলা জীব।
কালু, ছোবান: কি কইল?
আকবর : দাড়ি আতাইয়া কেবল হাসল!
কালু : (হঠাৎ) রূপাই ভাইরে লইয়া গেলানা ক্যান্ তোমরা? দশের কথা তো হেও ভাবে , নাকি?

আকবর : হ! কিন্তু সাজুর প্রেমে পইড়া অখন রূপাইর চোখে অন্ধকার।
বট কোরাস : মেহেরবান খোদার, মহব্বৎ প্যার!
ছোবান : পাড়া পড়শী ছি ছি করে, কানে যায় না তার?
আকবর : যদি যাইতো কানে, তবে কি আর কান্দে ক্ষেতের ধানে? বোধ নাই তাঁর!
ছোবান : আর কে আছে সেয়ান সমজদার!
আকবর : হায়রে, বাঁচার কোন উপায় নাই?
কালু : আছে। যদি উঠ্যা পড়্যা লাগে গাঁওর দশ ভাই, তো আর কি চাই?
ছোবান,আকবর : আর কি চাই!
কালু : চাই- রূপাই ভাইরে চাই।
(ঢোলক বেজে উঠে । যেন দিগ্বীজয়ের তাল। আলো কমে অন্ধকার। পূর্ব দৃশ্যের প্রস্থান। রূপাইর জোনে হ্যান্ডস্পটের আলো ঠিকরে পড়ে। তার মাথায় একটা টুকরী, হাতে ছোট ফোলানো বেলুন। বেশ ছন্দ করে এগুচ্ছে সাজুদের পাড়ার দিকে। ঋতুরাজ বসন্ত যেন তাকে তাড়া করেছে। সাজুর মা সাজুদের জোনের অংশটি তখন ঝাড় দিচ্ছে। আজ তাঁর মেজাজ ভাল নেই। রূপাইকে পেছন দিয়ে ঝাড় দিতে থাকবে রূপাইর কথা বলার সময়। আলো যেন রূপাইর সঙ্গে এই জোনে প্রবেশ করে।)
রূপাই : খালাম্মা, আজ হাটে সঙের খেলা দেইখেছি গো। যাকে বলে বউরূপী, আর দেইখেচি নাচের দল। বিড়ির নাচ। এমনি কর‍্যে নেচে গেয়ে....
(কোমর দুলিয়ে ঘুরে দেখে সাজুর মা ঘুরে গেছে)
—এ্যাই দ্যাখ, আরো আরো কত কি দেইখেছি। আজ যেন হাটে মেলা বইসেছিল গো খালা!
(দৌড়ে আসে সাজু)
সাজু : কে এইলে গো, রূপাই------?
সাজুর মা : (হঠাৎ ক্ষেপে সাজুর চুলের মুঠি ধরে, পিঠে মারে কিল)
ওরে, ও ধাড়ী মেইয়ে, তোর লজ্জা সরম নাই, কে এলে গো-! যা, যা আমার সামনে থেইকা।
(রূপাই হতবাক। সাজু নতমস্তকে ভেতর দিকে যায়। রূপাই চাপ দিয়ে বেলুনটা ফাটিয়ে দেয়। নতমস্তকে বেরিয়ে যাবার জন্যে সেও পা বাড়ায়। সাজুর মা ডেকে বলে তাকে।)
সাজুর মা : ও বাছা রূপাই, (রূপাই দাঁড়ায়) শোন তোমারেও কই। গাঁয়ে ঢি ঢি পড়্যে গেছে বাপু। ঘরে আমার সোমত্ত মেয়ে। তুমি বুইঝবে না বাছা। এ হইলো দগদগে আগুন! দশজনের মুখ তো আর আমি চাপা দিতে পারি না। কারনৈ তুমি আর এ বাড়ী আইবা না।
রূপাই : (যেন ক্ষেপে উঠে) দশজনে কয়।.... দশজনের কি আমি খাই না পরি? না

খালাম্মা, তুমি খাও পর। কার ঘাড়ে ক'ডা মাথা ? কে কি কয়? আমি তার ....

সাজুর মা : থাক বাছা, আর বীরত্ব দেখাইয়া কাম নাই। আমি সোজা মানুষ, সোজা কথাই পছন্দ করি। গাঁয়ে পড়ছে টি টি। মাইয়া কুলনাশী অইতে চলছে। কারনৈ তুমি আর এ ময়াল আইবানা বাছা।
(প্রস্থান)

(রূপাই করুণ চোখে সাজুর মার পথে চেয়ে দ্রুত বেরোতে গিয়ে আবার ধীর পায়েই বেরিয়ে যেতে পা বাড়াচ্ছে। বিপরীত থেকে সাজু হাত বাড়িয়ে অসহায় অভিব্যক্তি জানাচ্ছে যেন। সামনের মঞ্চ থেকে গায়কের কণ্ঠে নিম্ন সঙ্গীত শোনা যাবে। রূপাই চলতে গিয়ে ফিরবে আবার চলবে)

গায়ক : (পদাবলী ঢংয়ে) হায় রে
আমারই বঁধূয়া যায়রে চলিয়া
আমারই আঙ্গিনা দিয়া-
কালারে ছাড়িবো না কুলেরে ছাড়িবো
ভাবিয়া না পায় মোর হিয়া।
ঐ চলে যায় কালা, চলে না চরণ
যেতে যেতে পথে বেঁধে যায় মন।
কেমনে জীবন ধরিবে না জানে ধনি
তাহারে না দেখিয়া! (প্রস্থান)

(আলো নিবল। আবহ সঙ্গীতের রেশ চলছে। কমছে। নতুন আলো জ্বললো রূপাইদের জোনে। আলো উজ্জ্বল হবে না। দেখা গেল সেখানে রূপাই মাথার নীচে হাত দিয়ে মাটিতে শুয়ে আছে। বাঁশীটি বুকের ওপরে। মা পাশে হাঁটু গেড়ে মোনাজাত করছে।)

রূপাইর মা : (হাঁটু গেড়ে বসা, প্রার্থনা শেষে মুখ হাত বুলিয়ে ছেলের দিকে ফিরে-)
হ্যাঁরে—
তোর মনের কথাটা আমারে খুল্যা ক' নারে বাপ। মায়ের পরাণ আমার।এই জ্বালা যে আমি আর সইতে পারিনারে! কি গুনা করছি আমি? পীরের সিন্নী খাওয়াইচি তোরে.... কিন্তু তবু তোর .... (ব'সে মাথাটা মায়ের কোলে নেয়) যখন ছোটটি ছিলি কত কষ্টে লালন পালন করে তোরে এতবড় করেছি। ওরে রূপাই—

রূপাই : মা - মাগো! কি যে আমার হইল আমি নিজে তা জানিনা। কুথায় যেন একটা ব্যথা মা, কইতেও পারি না- বুঝাইতেও পারিনা- আমি—

রূপাইর মা : সবই সারবো বাবা। যাই, কোরবান আলীরে দিয়া আমি পীরের দরগার থেইক্যা একটু পানি পড়া আনাইয়া লই। কিচ্ছু চিন্তা নাই বাবা, আমি আই।

(মায়ের প্রস্থান। রূপাই তেমনি শুয়ে। ডিমারে আলো কিঞ্চিৎ কমানো হল। নেপথ্য থেকে

ভেসে আসে একটু বিরহী গানের কলি। সে সঙ্গীত তরঙ্গাধ্বনি একবার কাছে আবার মনে হয় দূরে ভেসে বেড়াচ্ছে।)

আমি কেনে বা পীরিতিরে করলাম
আমার ভাবতে ভাবতে জনম গেলরে
আমার কানতে জনম গেলরে।
সে ত ধান নয় চাল নয়
তারে আমি ডোরেতে ভরিবরে।
আমি কেনে বা পিরিতিরে করলাম।
আগে যদি জানতাম আমি প্রেমের এত জ্বালা
ঘর করতাম কদমতলা, রহিতাম একেলারে
আমি কেনে বা পিরীতিরে করলাম।

(প্রয়োজনে এই গানের অংশ বিশেষও গাওয়া যাবে)

(মঞ্চ জুড়ে সাধারণ নীল আলো। ঔজ্জ্বল্য কম। রূপাই বসে বাঁশী বাজাতে শুরু করে। ৪০-৫০ সেকেণ্ড। বাঁশীর সুর চড়া, সকরুণ। পূর্ব গানের রেশও থাকতে পারে বা নতুন কিছু। চোখ বন্ধ তার। সাজুর জোনের প্রকাশিত দিকটিতে বিপরীত দিকের স্পট থেকে রঙ বেরঙের আলোর খেলা চলছে। একটা নতুন স্বপ্নাল পরিবেশ রচিত হচ্ছে। যে আলোর বৃত্তে নুপূর পায়ে, ওড়না মাথে, মালা গলে ছন্দে ছন্দে অভিসারিকা সাজুর প্রবেশ হচ্ছে। মুখে হাসি। রূপাইর মুখে বাঁশী। চোখ খুলেছে। অবাক দৃষ্টিতে স্বপ্নের সাজুর দিকে তাকিয়ে। বাঁশীর কিন্তু এক্ষণে শব্দ বেরুচ্ছেনা আর। কেবল মুখে বেজে আছে। .... রূপাই কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখছে। সাজু যেন এক হাত বাড়িয়ে লজ্জায় অন্য হাতে ওড়নায় মুখ ঢাকছে। রূপাই আবিষ্ট হয়ে হাত বাড়াচ্ছে। লজ্জা নম্র সাজু দু'হাতে মুখ ঢাকে। এমন সময় পেছন থেকে কালো পোষাক পরিহিত দাড়িযুক্ত মোল্লার প্রতীক একটা দুরন্ত লোক রাবণের সীতা হরণের মত দুরন্তভাবে সাজুকে হরণ করছে। অসহায় যন্ত্রণায় সাজু মালা ছিঁড়ছে। ওপরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সে তাকাচ্ছে সাহায্যের প্রত্যাশায়। রূপাই অসহায়ভাবে যেন তাকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু স্থবিরবৎ অবস্থা তার। যেন কেউ তাকে আঁকড়ে ধরে আছে। আর্তনাদ করে রূপাই। )

রূপাই : এ আমি কি দেখছি? না— আমি সইতে পাচ্ছি না! ঘরে ফির‍্যা যাও কন্যা। মোর তরে তুমি আর ব্যথা সইয়োনা।

(রূপাইর সংলাপের শুরু হতেই সাজুদের রঙ বেরঙের আলো নিবে যায়। রূপাইর সংলাপ শেষ হচ্ছে— নিবছে রূপাইর আলোও। আবহ সঙ্গীতে উঁচুগ্রামে ঝালা। ১৫ সেকেন্ড প্রায়। এই অন্ধকারে রূপাইর ঘরের পেছনে এসে গেছে ঘটক দুখাই মিঞা। তার পেছনে সে চুপ করে বসে আছে। পরে প্রয়োজনে সে বেরুবে। দর্শক তাকে এখন দেখছেনা। ঘরের সামনে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে গ্রাম্য এক বুড়ী ও রূপাইর মা। হ্যান্ডস্পট থেকে তাদের

উপর আলো ঠিকরে পড়ে। আবহ সঙ্গীত বন্ধ। শুরু হল সংলাপ।)

বুড়ী : হ্যাঁলা, রূপাইর মা, খাইছ কিনা কানের মাথা, তাই কানে কিছু যায়না কথা?

রূপাইর মা : কইতে চাও কি কথা? কও শুনি আসল কথা।

বুড়ী : কই তোর রূপাইর কথা।

রূপাইর মা : ওঃ। খেঁদির মা, টুনির ফুপু, জনে জনে কি যে কয়— কথার নাই তো কোন মাথা।

বুড়ী : বুঝছ তুমি ছাতা। ... তোর রূপার নামে রটছে গাঁয়ে যা তা। আমরাও তো কই, সোনার কলি ছেলে রূপাই — তার নামে রটনা?

রূপাইর মা : আমি মাথা মুন্ডু বুঝি না। লাগে আমার ঘোর। সোনার টুকরা ছেইলে আমার কি কথা কয়— কে ঐ হারাম খোর?

বুড়ী : (ক্ষেপে যায় এবার) কে না জানে এই কথা লা? বাড়াইচনা আর জ্বালা। কেমনে মা তুই হইলি কালা? হায়রে আল্লা .... আল্লাহ। ... ঐ পাড়ার ঐ ডাঙ্গর ছুড়ি, সেখের বাড়ীর সাজু। তারে নিকি গড়্যা দিছে তোর ছেইলালো — সাজু!

রূপাইরা মা : অ্যাঁ।

বুড়ী : হ্যাঁ, ঢাকাই শাড়ী কিন্যা দিছে, দিছে গড়্যা হাসুলী। এ্যাত কর‍্যা ক্যান আর অখন রাখলি শাদীর বাকী?

(ক্ষেপে কথা বলে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু প্রচন্ড কাসি ওঠায় হাঁটতে পাচ্ছে না। প্রায় বসে পড়ছে। রূপাইর মা ব্যস্ত।)

রূপাইর মা : কয়দিন কইছিনা - তুমি ক্ষেইপ্যা কথা কইয়ো না?

বুড়ী : (কাসির ফাঁকে) তামুক পাতা.... তামুক ... পাতা।

রূপাইর মা : অ্যাঁ।

বুড়ী : তামুক পাতা, সাদা পাতা... তামুক পাতা (বলতে থাকে)

রূপাইর মা : দেই — দেই....... (আঁচল থেকে খুলে দেয়) নেও।

বুড়ী : দেও। (মুখে পোরে, ধীরে যেন কাসি কমে)- কইয়া আইছি,— ঐ পাড়ার ঐ দুখাই মিঞা, ঘটকালিতে পাকা। সাজুর লগেই লাগা বিয়া, লাগুক যত টাকা। কথা দে পাক্কা, ক, শুনি আইচ্ছা। আইচ্ছা।

রূপাইর মা : (মন্ত্রমুগ্ধের মত) আইচ্ছা!!

(এবার বুড়ী নীচের সংলাপ বলতে বলতে বিশেষ ছন্দায়িত চরণে সাজুর জোনের দিক দিয়ে প্রস্থান করবে। তার চলন ভঙ্গীর সংগে ছন্দ মিলিয়ে দুখাই পেছন থেকে এগিয়ে যাচ্ছে সাজুদের সেটে। বুড়ীর সংলাপ)

বুড়ী : (যাদুকরী ঢংয়ে বলে চলবে) আয়রে আয় দুখাই মিঞা, শাদীর কাজের রাজারে। রূপাই সাজুর লাগা বিয়া ঘটকালীতে লেইগেরে। সাজুর বাড়ীর

ঘরের দোরে— দামান রূপাই কইবি ওরে। য্যামন করে শাদী হয়, কইবি মিঞা তেমনি কার্য্যে। (প্রস্থান)

(বুড়ীর সংলাপ চলাকালীন মিউজিকের রেশ তখনো চলছে। বুড়ীর প্রস্থান হতে দুখাই হঠাৎ নিজের চারপাশে চক্কর খেতে থাকে। সংগে হাল্কা আবহ সংগীত। ৩/৪ চক্করের পর সংলাপ চলে)

দুখাই : (চক্কর চলছে। আসলে আগা গোড়াই দুখাইর শরীরে ছন্দায়িত দোলা ভঙ্গী থাকবে) সাজুর মাগো, সাজুর মা, ঘর দুয়ারে দুখাই মিঞা, বইলব শুনে লাইগবে তাক, — ঘুরপাক হইলো সাতপাক্। ... আইয়ো কাছে কথা আছে, লম্বা ঘোমটা টাইনা পিছে।

সাজুর মা : (পিঁড়ি হাতে প্রবেশ) আইছি দৈরা, বওগো মিঞা।

দুখাই : (পিঁড়িতে বসে) পানি দেও। (শরীর দোলে, যেন ক্লান্ত)
(সাজুর মা দৌড়ে এনে জল দেয়, দুখাই জল খায়।)

দুখাই : পান দেও। (সাজুর মা দৌড়ে এনে পান দেয়, সে পান মুখে পুরে) তামুক দেও।
(সাজুর মা দৌড়ে তড়িঘড়ি তামাক দেয়, যেন তা তৈরীই ছিল)

সাজুর মা : এই ন্যাও। (দুখাই তড়িঘড়ি তামাক টানছে দেখে।) আস্তে টান— ধীরে টান।

দুখাই : (যেন সম্বিত ফেরে) ওঃ। বুইঝলে ওগো সাজুর মা।

সাজুর মা : কিছুই তো কইলে না তো বুইঝবোডা কি কওনা?

দুখাই : ওঃ। জানো — দুখাই হাড়ে যেই ময়ালো,— মিলে দুল্যা দামান হেই ময়ালো? (ছোট দুটি কাসি দেয়)

সাজুর মা : জানি।

দুখাই : (গর্বে হেসে হঠাৎ থেমে) আরো তুমি জানো জানি—। শুনছো ওগো সাজুর মাগো—

সাজুর মা : কও তুমি- কইয়া যাও।

দুখাই : ঘরে তোমার আছে কন্যা, দেখছ অইছে কত বড়?

সাজুর মা : অইল।

দুখাই : তবে কও কইছি কথা ঠিক।

সাজুর মা : ঠিক।

দুখাই : ভাবছ না কি দিবারাতি, হোক না কন্যার শাদী। জানি, এই না তোমার ইচ্ছা?

সাজুর মা : কইছ কথা সাচ্ছা। .... তোমরা আচ ময় মুরব্বি, ডাকে বোলে ভাই। আমি অইলাম মেইয়ে মানুষ, বুঝি কি আর ছাই?

দুখাই : চিন্তার কিছু নাই।

সাজুর মা : তো দেখ্যা শুন্যা বিয়া শাদী তোমরাই দিয়া দাও।

দুখাই : এইতো, আসল কথা কও। .... একটা কিছু দিমোই কর‍্যা, ছুট্যা আইছি তাই। এই পাড়াতেই আছে ছেইলা চেন তারে ভাই। সোনার চান পাইবা ঘরে - রূপাই গো রূপাই।

সাজুর মা : (আপত্তি তোলে) মিঞা বুঝি জান না- গাঁয়ে অইছে কত রটনা? রূপাইর লগে দিলে বিয়া মান আর আমার থাকবো না।

দুখাই : (অদ্ভূত হেসে , হঠাৎ থেমে) বইন তুমি অবলা নারী- বইলবে অত কি আর বুইঝতে পারি? কইন্যা অইছে সেয়ান ভারী- তাই তারে যেমনে পারি বিদায় করি।

সাজুর মা : কিন্তু ঐ গাজনা চরের মোল্লা-

দুখাই : করতো পারে হল্লা? তোহুবা তোবা তোবা । রূপাই যেমন আসল চাষা, সাজু তেমন জমিন খাসা। এমন জমি কইরবে হরণ মইরবে তবে চরের রাবণ। জানবা কথা কইলাম যা সব, হুকুম দিছে আল্লা।

সাজুর মা : রূপাইর নামে নিন্দা রটায় ঐ মালদার মোল্লা।

দুখাই : শাদীর পরে অইবো ভারী দেখবা রূপাইর পাল্লা। কাডা দিয়া তুলবা কাডা। আরে তাগো মুখে পড়বো ঝাড়া, ঐ নিন্দা কর‍্যা ঘুরে যারা,যখন শাদীর দাবাৎ পাইবো তারা! (হেসে) .... আর রূপাইরে পছন্দের কথা ও যদি উঢে - তো কই- এই তল্লাটে আর এমন ছেইলে কই? এমন ছেইলেরে জামাই পাইলে- স্বয়ং লক্ষ্মী ঠাকরাইনরে বউ বানাইয়া দেয়, - এই কইলাম দশকথার হক কথা। (হাসে) দশ খান্দা রূপাইর জমি, হালে গরু তিনডা। বড় ঘরের চালে তার ধান যায় ঠেইক্যা। (হাসে) সাজু তোমার কন্যা যেমন, তেমন রূপাই ছেইলে। জান, সাত গেরামের ঘটক আমি - এমন জুড়ি- ? (হাসে) তারপর ধরনা, রূপার বংশের কথা। রূপার দাদার নামে তো গাঁও কাঁপতো। রূপার নানা- ঐ সোয়েদ ঘেঁসা আছল কাজীর বাড়ীর পেয়াদা। হুঁ- আরো কই, - রূপার বাপ? গাঁওর চৌকিদার খাতির করতো তারে। ‘আহেন-বহেন’ খাতির কর‍্যা গান শুনাইতো তারে, আরো শুন - রূপার চাচা অছিমদ্দি- কি এংরাজীডাই না কইতো। অ্যাঁ! হার মানতোনা আবার, শুনতো যেই বেডা, টের পাইয়া যাইতো। (হেসে) আরো কমো? না, তার আগে হেই কথাডা ঐ আবার কই- রূপাইর লগে সাজুর বিয়া- কইলাম আমি দুখাই মিঞা - কর তুমি ঠিক।

সাজুর মা : (কথা শুনে আবেগে আপ্লুত) ঠিক, কইলাম আমি ঠিক।

দুখাই : (আগে বাড়ে) আবার কও, ভাইজান, রূপাই আমার সোনার চান, ঘরে চাই তারে।

সাজুর মা : হ, আইনা দেও তারে।... কিন্তু দেখবা কথার য্যামন লরন চরণ অয়না।

আছে মানটুক শেষ কালে আর জলাঞ্জলি দিও না।

দুখাই : আউ ছিঃ ছিঃ ! কইলা তুমি কি ? কথার অইবো লরন চরন তোমার কইন্যার বিয়াতে ? এই ঘটকালীতেই ইস্তফা- তো দিলাম আমি গোঁস্যাতে। (উঠবার জন্য ব্যস্ত হয়)

সাজুর মা : আরে না মিঞা, ভাই, রাগ কর ক্যান ? মায়ের মনডা বোঝনা- সাজু আমার পরাণ পরাণ-

দুখাই : পরাণের পণডা এইবার কও। আমি কই, কুড়ি দেড়েক, বায়না অইলো তেরো। চিনি, সন্দেশ আগোড় বাগোড়, এই ধরোগা সব দ্যা তাইলো দুই কুড়ি। এই কইলাম বোন। এর থেইক্যা আর চাইলে বেশী, কিন্তু জামাইর বেজার অইবো মন।

সাজুর মা : আমি কি আর মিঞা ভাই অতশত জানি ? তোমরার কথাই খোদার শুক্‌কুর, তারেই আমি মানি।

দুখাই : এই তবে হক কথা। সাক্ষী রইলো খোদা। চলি। খোদাহাফেজ। (ঘটক চলছে রূপাইর জোনের দিকে। লাঠি তুলে বাঁশী বাজানোর ঢং। আবহ সঙ্গীতে শোনা যাচ্ছে যেন সানাই। ঘটককে এগিয়ে দিতে দিতে আলো কমছে, ক্রমে অন্ধকার। অন্ধকারে শোনা যাচ্ছে নেপথ্য থেকে ভেসে আসা মেয়েলি কণ্ঠে কোরাসে বিয়ের গানের কলি)

(নারী কণ্ঠে নেপথ্যের কোরাস গান-)

" কি কর দুল্যাপের মালো বিভাবনায় বসিয়া
আসত্যাছে বেটীর দামান সইলো ফুল পাগড়ী উড়াইয়া নারে
(নিম্নাংশ প্রয়োজনে গাওয়ানো হবে কিনা নির্দেশকের বিচার্য)
' আসুক আসুক বেটীর দামান সই কিছুর চিন্তা নাইরে
আমার দরজায় বিছায়া থুইছিস কামরাঙা পাটী নারে।"

(আলো জ্বলছে। বিয়ে বাড়ীর আভাষ দেখা যাবে সাজুদের জোনের দিকে। ঐ বিয়ে বাড়ীর দৃশ্য রচনা হবে প্রতীকি, বিবাহ দৃশ্য বোঝাতে সূত্রধারের হাতে একটা প্রজাপতি (বড় খেলনা আকারের) ধরা থাকতে পারে। নিম্নাংশের অভিনয় সূত্রধারের। নেপথ্য থেকে শোনা যাচ্ছে বিয়ে বাড়ীর কথাবার্তা, হৈ হল্লাদি। পূর্ব সংঙ্গীতাংশ এবং বিয়ে বাড়ীর হল্লাদি টেপেও চলতে পারে। সূত্রধার সাজুদের জোনের সামনে। তার এই অংশের অভিনয়ে খেলার মাঠ থেকে রীলে করার ঢং থাকবে। ভেতর বাড়ীর বিয়ের দৃশ্য তার বাচন ভঙ্গীতে যেন বোঝা যাচ্ছে। এই দৃশ্যের অভিনয়ে সূত্রধারের একটু পোষাকী মেজাজ। মাথায় একটা রঙিন পাগড়ীর মত থাকলে বোধ হয় মন্দ দেখাবে না। অধিক নির্দেশকের বিচার্য। বিয়ে বাড়ীর শোর ছাপিয়ে উঁচু গ্রামে সূত্রধারের কণ্ঠ।)

সূত্রধার : দুল্যার বাড়ী থেইকে বোইলছি। এই দিন বড় খুশীর দিন। রূপাই সাজুর আজ

মালা বদলের দিন। অর্থাৎ শাদীর দিন। এই শাদীর জন্যে যে আত্মীয় কুটুম্ব পাড়া পড়শীর মধ্যে কত ঝুট ঝামেলা গেছে, তা আশা করি অজানা নেই আপনাদের। আপনাদের মধ্যে আবার যারা দাবাৎ পেয়েছেন এই শাদীতে, নাড়ী নক্ষত্র সবই তাদের জানা। ..... গোটা বাড়ী জুড়্যা ছড়াইয়া পড়ছে আতরের খসবু, আর মেহেন্দীর মিঠা রঙ। ভেতরে বাইরে রমরমা ঝমঝমা হৈ হুল্লুড় ব্যাপার স্যাপার আপনারা বেবাকেই শুনছেন। বৌ ঝি বাচ্চা বুড়া বাদ নাই কেউ। গাঁওর মানুষ, কাজী, গাজী, মোল্লা মুন্সী আইসা গেছেন, আসতেছেন। প্যার মহব্বতের পরে শাদী, কারনৈ খুশীতে যে খুব বাড়াবাড়ি সেইটা আপনারা দয়া কর্‌যা বুইঝ্যা নিবেন।.... ঐ তো মানুদ হানিফ সোনাবান-জয়গুন বিবির হাত ধর্‌যা একবার দুল্যা একবার দামানের দুয়ারে ধাওয়া করতেছেন দেখতেছি।.... ঐ একটা বাচ্চা রশুই ঘর থেইক্যা গোস্তের টুকরা আতে ছুইটা যাইতেই হোঁচট খাইয়া পড়লো। আ হায়রে, আল্লারে। সরমের চোটে বুক ফাটলেও মুখটা ফাটতেছে না দেখতেছি। হয়, জীবনে অনেক মুহূর্তে এইরকম হাল অনেকেরই হয়। চারদিকে চোরা চোখে চাইয়া নিজেরে সামলাইয়া নিতে হয়। (একটু উঁচু গ্রামে) যাক, ঐ যেমন এক মিছিলের মাথায় দেখতেছি কে আইসতেছেন? হ্যাঁ, আমাগো জাহানারা ফুপু। ..... সারি কর্‌যা আগে পিছে তাঁর ছেইলে মেয়েরা। কী দারুণ সাজ জনে জনের। পাট করা চুলগুলান সব তেল চুবচুবা। বুঝতাম পারছি- তেলের দামে ঘামেনা ফুপু। যাক্- ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯- আল্লার ওয়াস্তে তাঁর কাচ্চা বাচ্চা অইলো গিয়া দশজন। ইনস্‌ওয়াল্লা! ঐ - ঐ আরমনালীর নাতি, চল্লিশ ইন্‌চি তার বুকের ছাতি। তর্জ্জন গর্জ্জন যাই করেন আপনারা, আমি মিছা কইতে পারি না। দেখতেছি সব ডাঙর কন্যারা তারে আড় চোখে চায়। চাইতে গিয়া দেখতেছি ঐ যেমন বেহেস্তের হুরী নূরজাহান-হ-নূ-রজাহান লাজুক পায়ে সইর্‌যা গেল। গাঁয়ের মেইয়ে গুলার লজ্জার ঠেলায় অগো চাঁদ মুখগুলা দেখনের বড় একটা সুবিধা নাই। কারনৈ ঐ নয়ন সুখ থেইক্যা আমরা বেবাকেও বন্‌চিত।। তবু আমার তরফ থেইকা চেরেস্টার কোন কসুর নাই। এই রে, কি ব্যাপার, য্যান শুনতেছি- হৈ হৈ পড়্যা গেল অন্দরে।

নেপথ্যে

নারীপুরুষ কোরাস : শাদীর জোগাড় কর।। জলদি কর্‌যা দুল্যার মুখে পান সরবত ধর।

সূত্রধার : হ্যাঁ সবই বুঝতাম পারতাছি। ছুটাছুটি শুরু অইয়া গেছে। ধাক্কা ধাক্কি পাক্কা পাক্কিতে নারী পুরুষ কার চেয়ে কে কম। হ্যাঁ, পান সরবত হাতে সেয়ান কন্যারা চমকে ঠমকে ইশারায় আসত্যেছে, আসত্যেছে। কারনৈ, যত পুরুষ - জোয়ান, বুড়া, মুন্সী, মোল্লা বেবাকেরই একটু সরা উচিত। হ্যাঁ..

দেখতেও আছি সরি-সরি ভা-ব ! কি-ন্-তু বুঝতেই পারতেছেন। আপনেরা সেয়ান সমঝদার। হায়রে ! আল্লার আতের আজব আয়না খান্ যদি এই মুহূর্তে আমার হাতে থাকত- দেখাইতে পারতাম। হ্যাঁ দেখতাছি- একটু পরশ লাগি ঐ কত বুঝিনা শুনিনা ভাবের কেরামতি। যাক্ কোনরকম পান সরবতের পালা সারলো।.... কিন্তু হঠাৎ অন্দর বাড়ীতে য্যামন গরম গরম বাক্যালাপ চলছে। অবস্থা বেশ বেগতিক। যদিও বিয়ে বাড়ীতে এইসব ... হ্যাঁ, কন্যা পক্ষই যেমন একটু বেশী গরম। না, আর তো চুপ কর্য়ে থাকা যায় না। মীমাংসার একটা রাস্তা খুঁজছে হয়। আসর বুইঝা কীর্তন না কর্যা উপায় নাই। বুদ্ধিমানের লক্ষণ - হও রে ভাই- যখন যেমন তখন তেমন। সেই কারণেই আপাতত: সাজুর মামার ভূমিকাতেই নাইমা পড়তাছি আমি। বিয়ের আসর বেসামাল, তাই আর মুখ না খুইলা পারি না আমি।

(বিয়ে বাড়ীর জোনে একদম পেছনের উইংস কন্যার ও তার আগের উইংস বরের জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে অভিনয়ের সুবিধার্থে)

সূত্রধার : (পেছন উইংসে তাকিয়ে) আরে ও রূপার মামু, ডাকছি আমি সাজুর মানু, শুইনা যাও - শুইনা যাও।

(রূপার মামু বেশে একজনের প্রবেশ)। পরনে লুঙ্গি বা পাজামা পাঞ্জাবী , মাথায় টুপি)

রূপার মামু : কও মিঞা।

সূত্রধার : তুমি আমার হবু বেয়াই, লাজের কথা কেমনে শুনাই। আইছ দিতে ভাইগনা বিয়া - আনছনি কও সাদাপাতা ! ....... কারনৈ বিয়ার অইবো গউন। সাদার পাতার কথা পণে হয়তো ছিল না তখন। কিন্তু এতো জানা কথা- আনবা তোমরা সাদা পাতা। অখন দেখ কেমন বেজার অইছে সবার মন। ..... আরে বিয়া বাড়ীর মন- দেখ কেমন বেজার অইছে?

(চটকদারী হাল্কাচালের আবহ সঙ্গীত কথার ফাঁকে ও অ্যাকশান অনুযায়ী বেড়ে কমে চলতে পারে)

রূপার মানু : হায়রে আল্লা, হুনছ কথা? হেঁট অইলোনি বংশের মাথা। অখন - (চক্কর খেতে খেতে বলে চলেও প্রস্থান সামনের উইংসে। আয়রে আয় সাদা পাতা। সেরেক পাঁচেক সাদার পাতা, সাদার পাতা সাদার পাতা .....

(সুবিধা অনুযায়ী নিম্নাংশ অভিনীত হতে পারে। একই শিল্পীর বারংবার প্রবেশ বা নতুন শিল্পী দিয়েও অভিনয় করানো যায়। সূত্রধার এই মুহূর্তে অভিনয় করানোর কাজে অংশ নিলে বোধহয় ভাল হবে। যেহেতু চটক ভঙ্গীতে বিয়ে বাড়ীর আভাস দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে সুতরাং অভিনয় ধারায় খুব দৃষ্টি রাখা উচিত। সূত্রধার পার্শ্ব চরিত্রের অভিনয়কালে নিজের সংলাপ বলেই ফ্রিজ স্টাইলের অ্যাকশানে পরবর্তী অংশের জন্যে অপেক্ষা করবেন। চরিত্রদের অবস্থাও হবে অনুরূপ। একদিক স্থির, অন্যদিক অস্থির। অর্থাৎ পাশাপাশি যেন স্টীল ও মুভিং মুভমেন্ট।

সূত্রধারের সংলাপে চরিত্রশিল্পী স্থির তাকাবে। সূত্রধারের হাতে তখনো প্রজাপতি মর্যাদা সহকারে রয়েছে। পেছনে উইংসে তাকিয়ে বলবে।)

(এবার সূত্রধারের আহ্বানে কন্যাপক্ষ পেছনের ও বরপক্ষের সামনের উইংস দিয়ে প্রবেশ)

সূত্রধার : কন্যার খালু আইসা বলে — (স্থির হয়)

কন্যার খালু : সিন্দুর হইল উনা।

সূত্রধার : রূপার খালু— (রূপার খালুর প্রবেশ)

রূপার খালু : ন্যাও মিঞা ভাই যা লাগে তার দুনা।(সিঁদুর দেয়। উভয়ের প্রস্থান বা ফ্রিজ যেমন ভাবেন নির্দেশক — এই দুই চরিত্রের জন্য তার নির্দেশ দেবেন।

সূত্রধার : বিয়া বাড়ীর কান্ড কত হৈ হৈ ব্যাপার। আরো আছে বাবুমশাই কিছু দেখাশুনার। কন্যার চাচা আইসা কইল— (কনের চাচার প্রবেশ)

কনের চাচা : হইছে খাটো শাড়ী, হ হ হইছে খাটো সাড়ী।

সূত্রধার : রূপার চাচা— (রূপার চাচা আসে)

রূপার চাচা : (অছিমদ্দি, তিনি কষ্টকল্পিত ইংরেজী বলতে চেষ্টা করেন) হালাই! ডোন্টথিঙ্ক দি শাড়ী খাটো শাড়ী)। ব্রিঙ্গা দি ঢাকাই শাড়ী। ইউ নো, আনতে শাড়ী কন্‌ষ্টেন্ট, করছি কত কষ্ট, — আন্ডারষ্ট্যান্ড?

কনের চাচা : (ইংরেজী বোঝেনা, তাই ক্ষেপে গেছে) কি ইংরেজী কথা? বেডা হারামজাদা— বইক্যা দিলিযাতা? ভাবছ আমি বুঝিনা? না, কোন কথা শুনমোনা। তামসাডা ঐ দেখনা? (ভেতর বাড়ীকে লক্ষ্য করে ডাকে) অপমান, দুল্যার চাচারে দামানের চাচায় করছে অপমান।

রূপার চাচা : (ব্যস্ত) - অপমান ? হোয়াট অপমান? ইজ ইট অপমান?

কনের চাচা : না আর কথা না , জুতা মার্‌য়া গরু দান? তোমরা কে কৈ আছ– দেখ্যা যাও, শুন্যা যাও। আইয়ো যত আমার ভাই, বাপের ভাই, আর ছমির সেখের নাতি। দেখাইয়া দেই, রূপার চাচার বুকের কত ছাতি?
(কনের উইংস ও বরের উইংস দিয়ে ক’জনের প্রবেশ)

কনের চাচা : অপমান! তোমরার দামান লইয়্যা যাও। ভাল চাও তো ফির‍্যা যাও।

কনের বাড়ীর কোরাস: ফির‍্যা যাও। ফির‍্যা যাও। (শ্লোগান ঢংয়ে)

রূপার চাচা : ভাইসব, উই গট অপমান । উই ফ্লাই। রেডি কর দামান।

কনের বাড়ী : ফির‍্যা যাও। ফির‍্যা যাও।

বর কোরাস : চলো।

সূত্রধার : (উভয় দলের মাঝে উঁচু গ্রামে বক্তৃতার ঢংয়ে) তোমরা থামো, থামো ভাইয়েরা আমার, কুটুম্বরা আমার। আল্লার হুকুমে তোমরা থামো। (উভয় পক্ষ থেকে দু’পাশে স্থির হয়।)

আমি আছে গাঁয়ের মোড়ল, আমার কথা শুন— আজরাইলের অভিশাপে

এই সব কুকান্ড কারখানা অইতে চলছে ভাইজানেরা। বেহেস্তের দুয়ারে তালা পড়্যা যাইবো আপনাগো এইসব ব্যাভারে। লাজ পাইবো আশমানের চান সুরুজ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ।হায়রে আল্লা। তুমি দোয়া কর। দোজকের দুয়ার থেইকা তুমি তারারে বাঁচাও মেহেরবান। যে ইনসানেরা এই পবিত্র সাদীর আসরে বে-ইনসানী কাম করে, — সাদীতে পণ লইয়া বেআদ্দপী করে, তুমি তাগো রহেম করো হে আল্লাহু! (সকলের নত মস্তক। মোড়ল সূত্রধার তা দেখে) আমার কথাই যদি মানেন, ভাইজানেরা- তো আসেন, বসেন, পণের এই গুণার মাফ চাইয়া আল্লার কাছে আমরা মোনাজাত করি। স্থির শিল্পীরা সকলে হাঁটু ভেঙ্গো আল্লার উদ্দেশ্যে হস্ত প্রসারণ করে)

সূত্রধার : (নেপথ্যকে লক্ষ্য করে) মোল্লা সাহেবেরা শাদীর আয়োজন সম্পন্ন করেন। আল্লার হুকুমে সাক্ষী উকিল ডাইকা কল্‌মা পড়ার কাজ কাম্ এইবার শুরু করা হো-উ-ক। (ধীরে আলো নিবে)

(অন্ধকারে মঞ্চে রূপাইর জোনে কদম্ব গাছের প্রতীকি একটু সামনের দিকের মঞ্চে এসে গেছে। মঞ্চে যেন চাঁদের আলো। গাছতলায় রূপাই বসে বাঁশী বাজাচ্ছে। তার সাজে কিছু রঙ চড়েছে। নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসতে বাঁশী কমে আসে।)

পুরুষ কোরাস: হেই। ধান কাটি, কাটি ধান, ধান কাটি।

একক : সোনা মাজা দেইখারে ধান, জুড়ায় মোদের আঁখি।

কোরাস : হেই।

একক : চলছে ধানের মলন মলা

স্ত্রী কোরাস : বিহান দুপুর রাইতের বেলা

দ্বৈতকণ্ঠে স্ত্রী পুরুষ: ধানে পরান ভরায় মোদের
খুশীতে আজ হাসি।

কোরাস : হেই।

(গানের ধ্বনি কমে আসে। বাড়ে রূপাইর বাঁশী। মিঠে আলোর বুক চিরে এক ঝলক হ্যান্ড স্পটের আলো পড়ে। এলোচুলে প্রবেশ করে সাজু। তারও কিছু সাজের বাহার আছে। এক আলোয় বৃত্তে দুজন এখন।)

সাজু : (সজ্জিত, বিনীত, আদুরে ঢংয়ে) ওগো শুনছ। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আর ভাল্ লাগেনা আমার। চলনাগো এবার ঘরে যাই। (রূপাই বাঁশী বাজিয়েই চলছে। যেন কিছুই শোনেনি।)

সাজু : ... দেখ আগেই বইলে রাখছি - পরে কিন্তু - দেখ, তবে কাল যা করেছি- এ্যাই শুনছ? সারা রাতভর যদি আজকেও বাঁশী বাজাও - তবে, তবে এই সিন্দুরও পরমোনা- কাজলও না। হ্যাঁ, এই শোননা- এই খোপাও বানমোনা

আর খুলছি এই কানের দুল !

রূপাই : (বাঁশী নাবায়) আচ্ছা তো এই হার মানছি গো হুজুর। কিন্তু এই বেচারা বাঁশীর কপালে এত বড় সাজা, সিঁন্দুর খোপা, কাজল, দুল,— আচ্ছা দাঁড়াও দেখাই মজা।

সাজু : (হেসে) শোন, বাঁশীর তো সাজা হলো— কিন্তু সে বাজালো—

রূপাই : (থিয়েটারী যাত্রার কায়দায়) এই অধম। অধম যদি হয় ভয়ানক অতি। দন্ড দেও। দন্ড দেও সখি- এই দিনু মাথা পাতি। (সাজু হেসে হেলে দুলে পড়ে)

সাজু : এই দণ্ড তোমার, আ: । আরো কাছে এইসনা। সুন্দর করে বাঁশীটা ধরে, আমাকে ছুঁইয়ে, দোলা দিয়ে তোমার সুরের ঢেউয়ে আমার মনটা ভরো দেওনা গো। (উভয়ে দাঁড়ায় রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তির মত। উদাস বাঁশী বাজে পাগল পারা তানে। ধীরে আলো কমে অন্ধকার। পূর্বের সেই নীল চাঁদনী আলো জ্বলছে কয়েক সেকেন্ড পর। দেখা গেল ওখানেই সাজু ঘুমিয়েছে কাত হয়ে। রূপাই পাশে বসে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে। কখনো মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কখনো থামছে। ধীরে তুলে নেয় রূপাই বাঁশী। বাজায় এবার বড় বিরহিণী মরমিয়া তান। তার চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। কয়েক সেকেন্ড। যেন সাজুর গালে জলের ফোঁটা পড়ায় সে জেগে ওঠে। গালে হাত বুলিয়ে ওঠে, যেন বোঝেনি কিছু। অবাক চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে)

সাজু : ও কি গো ! তুমি এখনো জেইগে আছো ? আমার চুল খোলা... একি আমার পায়ে যেন কে ফুল ঘইসে দিলো। (স্বামীকে দেখে) ওকি .... ও কিগো। তুমি কান্দ কেনে গো ? (গলা কাঁপে) ওগো তুমি কান্দ কেনে ?

রূপাই : (বিষন্ন ভয়ার্ত কণ্ঠে) জানিনা সই, আমার মনে ক্যানে (চোখ মোছে) ... বড় ডর... যেন ... কে তোমারে.... আমার কাছ থেইকা নিয়া যাইতে চায়। দূরে— অনেক দূরে।

সাজু : (ভয়ার্ত) কোন দূরে গো ?

রূপাই : দূ-র দেশ। সে অনেক অ-নেক দেশ ছেইড়ে যেতে হয়। সমুদ্দুর পেরিয়ে। সেথা তুমি আর ঐ অচেনা ছাড়া কেউ নাই। কিচ্ছু নাই।...চোখ বুইজে যখনি তুমি ঘুমাও সই, আমারে যেন কে কানে কানে কইয়া যায়— যাই, এই রথে কইর‍্যা আসমান দিয়া ওরে আমি নিয়া যাই আমার দেশের পানে। ... ও গো সই, সত্য কর‍্যে কও- আমারে ছেইড়ে তুমি যাবে না। কক্ষনো না।

সাজু : (কান্না কাঁপা কণ্ঠে) না- নাগো, না। (রূপাইর বুকে লুকায়)।

রূপাই : সাজু গো, আমার এ ঘর খানি কুঁড়ে ঘর। তবু তোমারে.... তুমি যে আমার ফুল গো সই। রোদের জ্বালায় রঙ জ্বলবে তার, এই তো আমার ডর। তাই

তো আমি কেন্দে মরি গো! (দু'জনে কখনো নীরব। কখনো দু'জনাতে চোখ দু'জনার। আসন্ন বিরহ সম্ভাবনায় দু'জনেই কাতর হয়ে পরস্পরকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। নেপথ্য থেকে ভেসে আসে গানের কলিটি-)

"এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি
পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি
দুঁহু করে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।"

(নেপথ্য থেকে বছির মামুর তীক্ষ্ম কণ্ঠে — " ও রূপাই, রূপাই"—)

রূপাই : তুমি ভিতরে যাও সাজু, দেখি কে ডাকে? (সাজু ভেতরে যাচ্ছে)

নেপথ্যে বছির : বলি ও রূপাই, অখনো কি ঘুমাইয়া রইলে জিগাই?

রূপাই : কে- কে ডাকে ? (বছির মামুর প্রবেশ)

বছির : আরে আমি তোর বছির মামুরে। বছির মামু।

রূপাই : কি অত তরস্ত ক্যান তুমি?

বছির : আর তরস্ত! ঐ গাজনা চরের?

রূপাই : (তীক্ষ্ণ কণ্ঠ) কি গাজনা চরের?

বছির : গাজনা চরের মোল্লা ভূঞার বন-গেঁয়োরা

রূপাই : কি?

বছির : আমাগো ধান কাইটা লইয়া যায়রে। রক্ত জল করা ধান কাইটা লইয়া যায়। আমি গাঁও জাগাইয়া যাই- আর উপায় নাই। (প্রস্থান)

(দপ করে জ্বলে উঠে রূপাইর চোখ। নীল আলোর বুক চিরে আচমকা তার উপর লাল আলো দাপাদাপি করতে থাকে। সমস্ত শরীর প্রচন্ড উত্তেজনায় কাঁপছে। বাঁশীর দু'মাথায় ধরে হাত তুলে হুঙ্কার দেয়-)

রূপাই : আলী! আলী!!

(মঞ্চের একপাশ থেকে মিলিটারী কায়দায় ঢুকছে সূত্রধার। হাতে একটি বাঁশের লাঠি- মুখে সংলাপ। রূপাইর দিকে গতি)

সূত্রধার : এখন আর তোর হাতে বাঁশী থাকাবার কথা নয় রূপাই। তোর বাঁশীর জীবন তারা কেড়ে নিয়েছে। যে বাঁশের বাঁশী শুনিয়ে একদিন তুই সবার মন হরণ করেছিলি- সেই বাঁশের লাঠি দিয়েই সবার সাথে আজ তোরও অধিকার কায়েম করতে হবে। কায়েম করতে হবে গাঁয়ের সব চাষী ভায়ের অধিকার। . .বাঁশীর বদলে হাতে তুলে নে এই লাঠি। লাঠির বদলে ফিরিয়ে দে তোর বাঁশী। (লাঠি বাঁশি বদল হয়, সূত্রধার রূপাইর মুখোমুখি) বাঁশী বদল কত্তে মন বড় কাঁদে, নারে। ওরে আমাদের যে প্রাণকাড়া বাঁশী বেজে উঠেছে- সেই ডাকাতিয়া বাঁশী এবার তোকে বাজাতে হবে রূপাই। যেমন প্রাণের

বাঁশী ছেড়ে প্রেমিক কেষ্টকেও মাঝে মধ্যে সুদর্শন ধরতে হয়েছে। স্বর্গ থেকে মর্ত্যে ছুটে আসতে হয়েছে। ভয় নেই রূপাই। মা ভৈঃ। মারণ যন্ত্র হাতে নিয়ে যারা আমাদের পেটে লাথি মাচ্ছে, আমাদের জান খতম করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম।

(মিলিটারী কায়দায় পার্শ্ব বদল ও প্রস্থান পর্বের সংলাপ)

- জেগে উঠেছে, গাঁয়ের ছেলে বুড়ো জোয়ান। সেই জীয়ন মন্ত্রে তুই জোগাবি প্রাণ। সে যত বড় মালদার ভূঁঞা হোক, গোটা গাঁয়ের বাঁচন মন্ত্রের মিছিল জোয়ারের সামনে নস্যাৎ হয়ে যাবে রূপাই। হুংকারে ফেটে পড়। মেঘের মত গর্জ্জন করে ওঠ। বিদ্যুতের তেজে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ লুটেরা অত্যাচারীকে নিজেদের অধিকার বুঝিয়ে দে। (প্রস্থান)

(রূপাইর উপর বিচিত্র আলো ঘুরতে থাকে। যেন সব ঘুরছে। বেজে ওঠে পাগলা ঢোলক। প্রচন্ড শক্তিতে রূপাই লাঠি ধরে। যুদ্ধের পরিবেশে যেন স্থাপন করছে নিজেকে। লাঠিটা ঘোরাতে শুরু করে। তারপর হঠাৎ মাঝ মঞ্চে স্থির হয়ে যায়। চোখ দুটো এদিক ওদিক ঘুরে যেন কাউকে খুঁজছে। এ সময়ে মিরর বা অন্য স্পটে তার চোখে মুখে শুধু ধরতে পারলে সমস্ত আলো কমে যাবে। এবং তাতে পরিবেশ বিশেষ গাম্ভীর্য পূর্ণ হবে। বাজনা থেমেছে বা নীচুগ্রামে দূর প্রসারী হচ্ছে)

রূপাই : রহম চাচা, কলম শেখ আর ছমির মিঞা। হাতের কাছে যে যা পাও, আইওরে তা লইয়া। কাজেম খুনী আর মণিমপুরের যত চাষী জোয়ান, কসম খাইয়া চল সবে বাঁচাই গাঁয়ের জান। আইয়ো ছুইটা গদাই ভূঁঞা। মামুদপুরের নীলকুঠি যার লাঠিতে ছারখার। ভায়েরা আমার - কাইল আমাগো আধেক জমির ধান কাইটা নিয়া গেছে মালদার মোল্লারা,- আর আধেক আছে বাকী। নিজের জমি, ভাগের জমি, জাত ধরম যাই হোক, - গায়ের রক্ত জল করা আমাগো সোনার ধান, কাচির খোঁচায় যারা খুন করলো,- আমরা গাঁয়ের সব চাষী ভায়েরা, যা দিয়া পারি, যেমন কর্‌্যা পারি, তারে রুখবোই- রুখবোই।

(দপ্ করে নিবে যায় আলো। পিছিয়ে গেছে কদম গাছের কাট আউট। শুরু হবে মহরমের দুরন্ত জারী গান। দলের শিল্পীরা লাঠি হাতে সজ্জিত, কারো হাতে রঙিন লাল রুমাল। ঢোলকও আছে। উদ্দাম নৃত্যে রুমাল ও লাঠি ঘুরিয়ে নেচে গেয়ে প্রস্থান করবে তারা। পরবর্তী লড়াইয়ের পরিবেশ রচনার সুবিধার জন্য মঞ্চে তারা দু'ভাগ হয়ে যাবে। সেখানে নতুন শিল্পীরাও লড়াইয়ে অংশ নিতে পারে। এবার আলো জ্বলছে সঙ্গীতের স্থান ও পরিবেশ অনুযায়ী। শুরু হয়েছে মহরমের জারি গান, গায়েনের একক ও কোরাসে সুবিধামত তা গীত হবে। এই সঙ্গীত মূর্চ্ছনায় যেন প্রলয়ের পূর্বাভাস। সামনের মঞ্চে বাঁশী মার্কা লাঠি ঘুরিয়ে সঙ্গীতের শুরু ও শেষ করবে গায়েন। অংশ নেবে অন্য শিল্পীরা। গানের সঙ্গে " হু, আল্লাহু"

হামিং থাকবে। আলো পরিবেশানুকুল— অর্থাৎ কিছু অস্থিরতা জ্ঞাপক।)

(গান) : " সাজ সাজ বলিয়ারে পইড়া গেল সাড়া
সাত হাজার বাজে ঢোল চৌদ্দ হাজার কাড়া
প্রথম সাজিল মর্দ আহলাদ ডগরী
পাঁচকাঠা ভুঁই জুইড়া বসে মর্দ এয়সা ভারি,
তারপরে সাজিল মর্দ তুরুক আমানি,
সমুদ্দুরে নামলে তার হৈত আঁটু পানি
তারপরে সাজিল মর্দ নামে আইন্দ্যা ছাইন্দ্যা
বাইশমন তামাক নেয় তার লেংটির মধ্যে বাইন্ধ্যা।
আতালী পাতালী সাজে গগনেরী ঠাটা
মেঘনাল সাজিয়া আইল তাম তুরুকের বেটা।
বন্দুকি বন্দুকি চলে কামানে কামান
ময়ূর ময়ূরী চলে ধরিয়া পয়গাম।"

(গানে 'হু ! আল্লাহু' ধ্বনি এবং সঙ্গে 'হায় হাসান' ' হায় হোসেন' ধ্বনি থাকবে ও সকলের প্রস্থানের সঙ্গে রূপাই পেছন মঞ্চ থেকে মুষ্টিবদ্ধ লাঠি হাতে সামনের মঞ্চে এগিয়ে আসবে মুখে নিম্ন সংলাপ বলতে বলতে। সংলাপ শেষে রূপাইর 'আলী' ধ্বনিতে উভয়পক্ষ 'আলী' কোরাস ধ্বনি উচ্চারণ করবে। লড়াইয়ের সময় নেপথ্যে প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র বাজতে পারে- আর মঞ্চে শিল্পীদের মুখে ঐ ধ্বনি প্রয়োজনীয় মুহূর্ত পর্যন্ত । যাক্ - রূপাই এসে গেছে। )

রূপাই : থাল বাজারে থাল বাজারে!
থাল বাজায়ে সড়কি ঘুরা হানরে লাঠি এক হাজারে। হানরে লাঠি, মাররে কুঠার, ছেনি, আর রাম দা ঘুরা- হাতের মুঠে যা মিলে যায় তাই লয়ে আজ লড়বি তোরা .... আলী ! আলী!
(রূপাই ঘুরে লড়াই শুরু করেছে, উভয় পক্ষের প্রবেশ ও লড়াই শুরু হয়)

রূপাই : আলী।।
কোরাস : আলী।।
রূপাই : আলী।।
কোরাস : আলী।। (শেষ দিকে 'আলী' শব্দ এলোমেলো হবে)

(লড়াই দৃশ্য চলাকালীন সময়ে রক্তিম আলোর ঝলকানির পরিমণ্ডলের মধ্যে স্ট্রোভ লাইট ব্যবহার হতে পারে। রক্তাক্ত পরিবেশ ও নাট্য মুহূর্তের দ্রুতি উভয় তরফে। আলোর অভিনয় দৃশ্য পট রসঘন করে তুলতে সাহায্য করবে। আলী হামিং সাউন্ডে পরিণত হচ্ছে। উভয় পক্ষের মধ্যে বিপক্ষ যোদ্ধারাই বেশী কাবু হচ্ছে। কিন্তু মার খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না কেউ। হাত, পা বা মাথার আঘাতে যুদ্ধ বিরতি দিয়ে তারা ক্রমান্বয়ে স্থির চিত্র রচনা করবে।

শেষ দিকে আচমকা স্থির, ফ্রিজ মারমুখী ভঙ্গীতে রূপাইর। তখন নেপথ্যে থেকে সাজুর বিরহ সন্তপ্ত মানসিকতার দ্যোতক সঙ্গীত ভেসে আসবে।।)

" রাইত তুই যারে যা পোহাইয়ে
বেলা গেল সন্ধ্যা হৈল — ও হৈলরে!

(আলো নিভে ক্রমে অন্ধকার। কিন্তু শোনা যাচ্ছে ঐ সঙ্গীতাংশের পুনরাবৃত্তি। এই অন্ধকার মুহূর্তে সকলের প্রস্থান হবে। অন্ধকারে সাজু চলে আসবে রূপাইর জোনে আলুলায়িত ভঙ্গীতে। আর আসবে একটি কালো বাক্স তার পেছনে থাকবে একটি বড় কাপড়খন্ড,— যেটিকে নক্সী কাঁথার অভিনয়াংশে কাজে লাগানো হবে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সবই শেষ করতে হবে।)

আলো জ্বলছে ধীরে। খুব স্পষ্ট হবে না। আলোর সংগে সংগীত বন্ধ। শোনা যাবে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। সাজু বাইরে অর্থাৎ নিকট উইংসের পাশে। ৫/১০ সেকেন্ড ঝিঁ ঝিঁ ডাকের পর শুনবে মানুষের অস্পষ্ট কথা বলার শব্দ। রূপাই এলো ভেবে ছুটে যাবে। কিন্তু না— রূপাই নয়। যখন ফিরছে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক বন্ধ। সঙ্গীতের বাকী অংশ শোনা যাচ্ছে। সম্ভবস্থলে সাজুও গাইতে পারে।)

" না জানি অবলার বন্ধু আসবেন কত রাতিরে
রাইত তুই যারে — যা পোহাইয়ে।"

(সঙ্গীত শেষ করতে করতে সাজু বাক্সের পাশে এসে যায়। দুপ করে অসহায়ভাবে বসে পড়ে সেই কালো বাক্সে। দু'হাতে চোখ ঢাকে। আবার ঝিঁ ঝিঁ-। ১০ সেঃ প্রায়। দোরের পাশে শোনে কুকুরের ঘেউ ঘেউ। ছুটে যায়। অসহায় হয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ওপরে তাকায়। ফুঁপিয়ে ওঠে কান্না। শুরু হলো আবার ঝিঁ ঝিঁ। ঐ শব্দকে সঙ্গী করে সাজু চোখ মুছতে মুছতে বাক্সে আছড়ে পড়ে। তারপর বাক্সের পেছনে রাখা সেই কাঁথাটি মেঝেতে বিছায়। বড় একটা সুঁই নেয় তাতে মোটা কালো সুতা জড়ানো। ওটা প্রথম থেকেই সেখানে রাখা থাকবে। কাঁথার উপর ধীর গতিতে নক্সা টানতে টানতে সে স্থির হয়ে যাবে। ঐ স্থির সময় জুড়ে ভিন্ন আলোতে গায়ককে দেখা যাবে নিম্নাংশ অভিনয়ের মাধ্যমে সাজুর কর্ম ও মানসিকতা ব্যক্ত করতে।

গায়ক : (গান অংশে পদাবলী ঢং) কাঁথাটি বিছায়ে বসিল সজনী
বঁধুরে মনে গুনি
কত কি নকসা করিল তাহায়
আঁখি জলে বিরহিনী।
(কথক ঠাকুরের ঢংয়ে কথায়) - সে কি ভোলা যায়?
প্রথম যেদিন কালারে ধনি
প্রথম দেখিল হায়।

(আবার গায়কী ঢং ) - সেই অনুরাগ ক্ষণ, মনে আছে অনুখন
তাহে আঁকিল কাঁথার বুকে
বধূয়ার ঘর বিবাহ বাসর
আঁখি জলে যায় ঢেকে।

(আলো নিবে যাচ্ছে গায়কের, প্রস্থান হলো তার। সাজুর স্থিরতা ভেঙ্গে ডুকরে সে কাঁথার উপর কেঁদে থুবড়ে পড়ে। কয়েক সেকেন্ড । ত্রস্ত কণ্ঠে বাইর থেকে ডাকে রূপাই।)

রূপাই : (ত্রস্ত কন্ঠ) সাজু। সাজু।

সাজু : (চমকে) কে, কে ডাকে গো! ওগো- ওগো তুমি এয়েছ? (ছুটে উইংসের দিকে যায়। কাঁথা কুঁকড়ে যায়। রপাইর প্রবেশ।)

সাজু : (কান্না মিশ্রিত কণ্ঠ, তবু চোখ মুছ্ছে) এতক্ষণে আইতে মনে অইলো তোমার? ভেবে ভেবে যে আমি আর বাঁচিনাগো! আর যাইও না তুমি কাইজা করতে। তুমি যারে মারতে যাও তার ঘরেও তো ছেইলে মেয়ে আছে। ... বউ আছে।

রূপাই : (কান্না চেপে) বউ, বউ, আমার সব ফুরায়ে গ্যাছে। আমার হাতের বাঁশী— খইসে গেছে বাঁশী। ... আর শুনবানা রাইতের বেলা, ঘুমের— ঘোরে আমার বাঁশীর গান।

সাজু : (রূপাইর মুখ চাপতে চায়) ওগো না, না । ওকি কথা কও গো।

রূপাই : লড়াইয়ে— এই বাঁশী হাতে আমি যে কত মাথা হাত আর পা ভেইঙ্গোছি বউ। ... আগে তো আমি বুঝি নাই, এতে আমার সাজুর মাথার সিন্দুর, .....

সাজু : (আৎকে ওঠে) না গো না!

রূপাই : লোহু— লোহু বউ! লোহুতে সব লালে লাল। ... যদি জানতাম যে ঐ লোহুর নদীতে ভাইসা যাইবো আমার বুকের মালা, খইসা যাইবো আমার আঁচলের সোনা.... তবে যে আমি কি করতাম—।

সাজু : (কান্না মিশ্রিত হলেও সান্ত্বনা কণ্ঠ) আমারে খুইল্যা কও তোমার সব কথা। ... দেখি - আমারে দেখাও কোনখানে ব্যাথা তোমার?.... তারা বুঝি তোমারে খু-ব ..... কই দেখি কোনখানে লেইগেছে বেশী, আমারে দেখাও। .... আ..মি তোমার সব ব্যাথা....

রূপাই : লেইগেছে বউ— খুউব লেইগেছে। কিন্তু সে মোর গায়ে নয় গো। .... তোমার — তোমার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়েছে তাতে, কাঁকন ভেইঙ্গোছে.... হায়রে ভেইঙ্গোছে তোমার পায়ের খাড়ু। ... ছিঁড়েছে তোমার গলার হার! (বাঁশী বেজে থেমে যায়) ... আর বাজবে না আমার বাঁশী! তোমার আমার ... এই শেষ দ্যাখা বৌ!
(আবার বাঁশী গুমরে বেজে থামে)

... আমার ধান, গায়ের রক্ত জল করা ধান, আমার ক্ষেতের সোনার ধান— ! এই ধানের কি আমার সাধের সাজুর চাইতে কম দাম? - আমি জানি না আমি কি সব ভাবলাম! কিন্তু খুন চাইপা গেল মাথায় বৌ — তাই আমার হাতে কত জখম— কত খুন! ....
(সোচ্চার কণ্ঠে) কিন্তু ঐ মালদার জানোয়ার মোল্লা ..। (নীচু নির্বিকার কণ্ঠে) পুলিশ লেলাইয়া দিছে পিছে আমার। আমার খুন ঝরা আমারই জমি— অথচ আমিই খুনী! (চাপা উত্তেজনা) সব তারা ক্ষেমতাবান— আর আমরা? আমার পিছে পুলিশের ফাঁদ। ধরতে পারলে .. আঃ (আর্তনাদে মুখ ঢাকে)

সাজু : লক্ষীটি শোনো— একটু হাত মুখ ধোও....

রূপাই : (শান্তকণ্ঠ) আমি আসামী। তোমারে শেষবারের মত দেখতে এইসেছি বউ। যেই ডাল ধরলা তুমি, — আজকে যদি মাও বাইচা থাকতো— আমার কথা কইয়া বুকে নিয়া থাকতো তোমারে। যদি থাকতো আমার একটাও ভাই... আমার বুকে বড় জ্বালা। সেই জ্বালায় তোমারেও জ্বালাইয়া গেলাম বউ।

সাজু : (কেঁদে ফেলে) তোমারে ছাড়তে যে আমার বুকটা ফাইটা যায় গো স্বামী। বুকের আঁচল দিয়া সেই ব্যাথারেও আমি চাপতে পারি। ... কিন্তু ... কিন্তু আমার এই পোড়া রূপেরে আমি কি দিয়া ঢাকি গো? ... তোমার বিহনে কত লোভী চোখের আগুন ... (ডুকরে কেঁদে ওঠে)

রূপাই : (বাঁধ ভাঙ্গা বেদনা, তবু সান্ত্বনা দিচ্ছে) না সাজু, সাজু-দীন দুঃখীর যারে ছাড়া আর কেহ নাই — সেই আল্লার হাতে আল্লার ধন, সঁপিয়া গো যাই। (মোরগ ডেকে ওঠে) ... আমি যাই, ওগো আমি যাই। রাতের আর বাকী নাই... আমি .... (রূপাই যেতে উদ্যত)

সাজু : ওগো, আর কিছুই তোমার বলার নাই গো? ... আমার এই রাত,— রাত তো নয় গো — বছর। ... বছরের ভারের চেয়েও যে আমার এই ব্যাথার ভার বড়। এই শেষ বিদায়ে আর কিছু কইবে না গো?

রূপাই : (কান্নাজড়িত, তবু চাপার চেষ্টা ) আর আমি সইতে পারি না। তোমার চোখের জলে আমার এই চোখের জলকে ক্ষমা করগো সই।

সাজু : এ্যাই.. শেষ কথা? .. আর কথা নাই বুঝি কিছু! (কান্নায় গলা জড়িয়ে যায়। রূপাই তাকে সান্ত্বনা দিতে নানা চেষ্টায় নিয়োজিত। কখনো বুকে জড়িয়ে কখনো দু'পা এগুতে গিয়ে আবার ফিরে আসে। নীরবে চোখে চোখ মিলিয়ে তাকাচ্ছে। আবার প্রস্থানোদ্যত হয়ে হয়তো ফিরে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সান্ত্বনা ছলে মাইম অ্যাকশন চলছে। সাজু কখনো চোখ মুছছে নিজের, কখনো মুছিয়ে দিচ্ছে রূপাইর। রূপাইও তদ্রুপ। কখনো বা নিজেরা

পরস্পরকে আড়াল করে নিজেরই চোখ মুছে। এই অভিব্যক্তি চলাকালীন সময়ে মরমীয়া কীর্তনীয়া সুরে গায়কের কণ্ঠে শোনা যাবে রূপাইর মন সাজুকে কি বলছে। গানের সংগে তাদের অভিব্যক্তি টিমওয়ার্কের কাজ করবে। গান একবারই গেয়ে যাওয়া হবে। সঙ্গতি রেখে অভিনয় চলবে মঞ্চে। গায়কের গানের ফাঁকে সংলাপ অংশ রূপাইকে দিয়েই বলানো হবে। গায়কের গান চলাকালে রূপাই সাজু এবং রূপাইর কথার সময় গায়ক ফ্রিজ থাকবে। এই ঢংয়ে চলবে এই অংশের অভিনয়।)

গায়ক : (গানে ) "মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কাজলের রাগে।"

কথায় রূপাই : সিন্দুর খানি পরিও ললাটে, মোরে যদি পড়ে মনে
রাঙা শাড়ীখানি পরিও সজনী চাহিও আরশী কোণে।

গায়ক(গানে): " মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যতনে বাঁধিও চুল,
আলসে হেলিয়া খোঁপায় বাঁধিও মাঠের কলমি ফুল।"

কথায় রূপাই : যদি একা রাতে ঘুম নাহি আসে— না শুনো আমার বাঁশী,
বাহুখানি তুমি এলাইও সখি মুখে মেখে রাঙা হাসি।

গায়ক(গানে): "চেয়ো মাঠ পানে— গলায় গলায় দুলিবে নতুন ধান
কান পেতে থেকো, যদি শোন কভু সেথায় আমার গান।"

(রূপাই সাজুকে ছেড়ে প্রস্থান কচ্ছে। আলো কমেছে ধীরে। দেখা যাচ্ছে সেই আলো আঁধারে অসহায় সাজু চোখ বুজে, বুক চেপে ধরে। আলো নিবে যায়। সাজুর প্রস্থান, সঙ্গে দৃশ্যপটের বস্তুও। এবার যখন আবার নতুন করে আলো জ্বলবে তার আগে অন্ধকারে গাঁয়ের ৫/৬ জন লোক দর্শকের দিক মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। বিড়ির আয়োজন আছে। মাঝখানে মুখ্যবক্তা দলের শিল্পীদের মধ্য থেকে রয়েছে ছোবান। তাদের এলোমেলো উচ্চহাসি শোনা যাচ্ছে। বোঝা গেল কোন বিষয়ে তারা খুব আলোচনায় রত, অনেকটা গাঁও সভার নমুনা। আর সেই পরিবেশেরই হাসি ও কিছু এলোমেলো কথা। সংলাপ উঁচু নীচু গ্রামে নিম্নরূপ হতে পারে অন্ধকারে)

বছির : হ, হ ঠিক কইছেন।

আকবর : কন, আসল কথাডা শুইনাই যাই।

কালু : তুমি আসল কথার মাঝখানে দাও মাইরোনা থাম!

(আলো জ্বললো ইতিমধ্যে। ছোবান সকলকে সামলাতে চেস্টা করে। আপাতত: এই দৃশ্যে গ্রাম্য নেতা বা মোড়লগিরিতে গ্রামের অনগ্রসরতার চিত্র পরিস্ফুট করার চেস্টা হবে।)

ছোবান : আরো শোন ভাইজানেরা— আমরার তো এইডাই অইল গিয়া বড় দোষ, নিজেরার কথা কমো— এর মধ্যেও কত দলাদলি। নিজে পলাইয়া থাইকা

আর একজনেরে ঠেইলা দেওন। আর ঝোপ্ বুইঝা কোপ মারন্। যাক্ হেইবার তো ঐ সড়কের ভাঙা মাথা ঠিক করার ব্যাপারে মালদার মোল্লা মোড়লের মিটিং -এ আছিলাম- হেই কথাডাই তোমরার কাছে কমো। বুঝবা তার মোড়লগিরির কেরামতি। ধর আমি অইলাম গা মোল্লামোড়ল, কালু অইল গা ছোড ভাই, শহরে বন্দরে থাইক্যা বাবু ইস্কুল কলেজ পাশ করছে। আর তোমরা যারা আছিলা হেইদিন— দাবীডা তোমরাই তোল, আর যারা ছিলানা— তারা মোড়লের কান্ড কীর্তি কি বুঝ? - দেখ।

(আলো পরিবেশ বদলের কিঞ্চিৎ অভিনয় কচ্ছে যেন। ফ্ল্যাস ব্যাকের অভিনয়ে সকলে দৃশ্যানুরূপ হবে। ছোবানের বসার কায়দা মহাজনী, জমিদারী বা মালিকী কায়দা। কালু তার পাশে দাঁড়িয়ে। ছোবান অবস্থা গতিকে কখনো বা পায়চারী করবে। অন্যরা সব কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে একপাশে। ছোবান সুবিধা মত বসতেও পারে।)

আকবর : সাব্, সড়কের জরুরতের কথাটা তো আশা করি এইবার আপনে বুঝছেন।

ছোবান : (এখন মোড়লী ঢং) কই আর বুঝলাম, বুঝাইয়া কও।

বছির : ঐ যে সড়কটা বাঁও হাতি গিয়া ডান দিক্ মোচড়া দিয়া

আকবর : আপনার সদরের লগে মিলছে।

বছির : (আকবরকে তুমি অত আগ বাড় কিল্যাগা? আমি কি সাব্‌রে কইতে পারি না?

আকবর : তো অইলডা কি?

বছির : না, এইরকম কথা কইবা ক্যান?

সাজুর চাচা : আঃ। আসল কথা আগে কও। কাইজা করার সময় আছে।

ছোবান : কিন্তু সময়ের কাম সময়ে না করলে বাসী অইয়া যায়। বছির মিঞা মিছা কয় নাই। গোসা অইবোনা ক্যান।

আকবর : তো আমি মিছাডা কইলাম কি হুজুর?

ছোবান : কও নাই বল্যাই তো তুমিও বছিররে ছাড়বা না।

ছোবান : কেন ছারবা? তোমার রক্ত মাংসের শরীল না?

সাজুর চাচা : কিন্তু দশকথার হক কথা, — সড়কটা—

ছোবান : (যেন বোঝেনা) মানে সড়কটা, ঠিক... এমন পেচাইয়া কইলা?— সরল কর্‌য়া কও, বুঝাইয়া কও।

আকবর : গরু গোতান নিতে পারিনা।

সাজুর চাচা : রাইত বেরাইতে চলতে পারি না।

ছোবান : একজন একজন কর্‌য়া ধীরে সুস্থে বুঝাইয়া কও।

আকবর : আমি কই। আপনার সদরের বাঁও তরফের সড়কটা ঘুর‍্যা যেইখানে পড়ছে—

ছোবান : (নীচু কন্ঠে) পড়ছে। মানে পড়নের কথা— না কিভাবে পড়ছে?

কালু : (এখন ছোটভাই, দাদার মুর্খতা যেন অসহ্য) তুমি বুঝলেনা?

ছোবান : (তাকে সামলায়) আঃ!

আকবর : বলরামের, কোরবান আলীর আর কাজমের জমিনডিও সড়কের লাগ্যা ভাঙ্গা শেষ অইতাছে। বছর বছর ফসল মরতাছে। মেঘের দিনে চলাচল করতে—

ছোবান : (নির্বিকার কন্ঠে) কোন সড়কটার কথা যেমন কইলা, গোলাইয়া গেছে সব! পইলা থেইকা কও। আরে কইবা তো খোলসা কর‍্যা কও। সরল কর‍্যা বুঝাইয়া কও।

কালু : (ক্ষোভ) ভাইসাব—

ছোবান : চোপ্।

সাজুর চাচা : বাজারের উত্তরের দিয়া যেই সড়কটা আইয়া-

ছোবান : হ্যাঁ আইল

সাজুর চাচা : আইয়া নাজিমপুর ছুইয়া আপনের গাজনাচরে ঢুকল।

ছোবান : হ্যাঁ ঢুকল, কিন্তু তার আগে পূর্বমুখী আর একটা সড়ক আছে না?

বছির : হ আছে। আছে।

ছোবান : হেই সড়কটা ডাইনে মোচড়া দিয়া গেল কৈ?

সাজুর চাচা : মামুদপুর।

ছোবান : হ, হ, মামুদপুর। এতক্ষণ ধর‍্যা ভাবতাছি কিছুতেই মনে পড়ে না, তা তুমিও তো কইলানা মিঞা, নাঃ এইডা ভাল না, কেবল নিজের কথাই কমো, আর কারোনা।

বছির : কিন্তু হুজুর—

ছোবান : আরে হুজুর তো এইরকম কত মূল্যবান কথাই তো কই, কিন্তু মিঞারা তোমাগো মনে থাকে কৈ? .... যাক, কও চাই দেখি- কোন সড়কের কি কইতে আছিলা জানি? যা কইবা বুঝাইয়া কও। আবার পইল্যার থেইকা কও চাই শুনি।

সাজুর চাচা : যাক্ আজকা তো নামাজের ওক্ত অইয়া গেছে গা, আর একদিন আইয়া বুঝাইয়া কমো। চল মিঞারা।

ছোবান : আল্লাতে মতি হোক। মিঞারা খোদার কাছে আমি তোমরার লাইগা কত দোয়া মাগি। আচ্ছা যাও নামাজে যাও।

(ওরা নিকট দূরত্বে পিছন দিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে মূকাভিনয়ে কিছু বলার চেস্টা কচ্ছে যেন এই অভিব্যক্তিতে থাকে।)

কালু : (প্রচুর ক্ষেপেছে যেন) এই সোজা সরল কথাটা তুমি বুঝলে না ভাইসাহেব?

ছোবান : (দাড়ি হাতাচ্ছে যেন এবং মিষ্টি হাসে) কোন্টা?

কালু : ঐ যে ওরা রাস্তার কথাটা বললো?

ছোবান : বুঝাইয়া কও।

কালু : আমার সংগেও তোমার হেঁয়ালী!

ছোবান : চোপ।

কালু : কেন চুপ করবো?

ছোবান : চুপ করবা এইজন্য যে এখনো তোমার বাল্যকাল। শিক্ষার সময়। বয়স হইলে আর ইস্কুলে কলেজে পড়লেই শিক্ষা অয়না। এ বড় কঠিন নীতি রাজনীতি। মন্ত্রী যদি অয় ঠাকুর্দ্দা, মোড়ল অইল তার নাতি।

কালু : কন কি ভাইসাব?

ছোবান : হ্যাঁ, সোজা বইলা যত সরলভাবে তুমি বুঝতে যাইবা— ততই সর্ব্বনাশ। তারার অভাব মিটলেই যত মোড়লগিরি খইস্যা যাইবো। তারার কথা বুইঝা ফালাইলেই সড়কের লাইগা কিছু মালও বাইর অইয়া যাইবো। কারনৈ কইতে হয়, বুঝলা- বুঝাইয়া কও।
হাঃ.... হাঃ....হাঃ

(হ্যান্ডস্পটের আলো কয়েকটা চক্কর খাচ্ছে। শিল্পীরা পূর্ব্ববৎ আবার আসে আলোও স্থির হচ্ছে)

কোরাস : বুঝলাম।

ছোবান : না অখনো বোঝ নাই। এই কি রূপাই শিখাইয়া গেছে? যদি বুঝতা রূপাইর কথা, তো কও, জলীর বিলে জাল ফালাইতে ক্যান অখনো মোল্লারে ছেলামী দিতে হয়?

সাজুর চাচা : মোড়লের সুদের ট্যাকাই অখনো আমানো শেষ হয় না।

ছোবান : ভাগচাষে যারা জমি কর, কইছলাম, চল, গহগলে মিল্যা বইয়া ঠিক করি জমি করতে বাবুরার কাছে কি কি আমরা দাবী করমো- আর ফসলের আমরাই বা কি নিমো- আর বাবুরারেই বা কি দিমো?

বছির : ঠিক আছে, চল আমরা যাই গদাই ভূঁঞার কাছে। হগলে বইয়া আলোচনা কর‍্যা ঠিক করি।

ছোবান : হ, চল যাই।

(যাচ্ছিল সবাই। চলতে গিয়ে অন্যদের আড়াল করে কালু আকবরকে টেনে কিছু কথা বলার জন্য আটকায়। অন্যেরা চলে গেছে। কালু আকবরকে টেনে মাঝ মঞ্চে আনে। ইঙ্গিতে তাকে বসিয়ে নিজেও বসে। অল্পক্ষণ। বাজে করুণ আবহ সঙ্গীত।)

কালু : (উদাস দৃষ্টি) আজকা এই দিনে রূপাইর কথা বড় মনে পড়েরে আকবর। তোর পড়েনা?

আকবর : (প্রশ্নে সেও শোকার্ত) পড়ে। পড়ে!

কালু : জাফর ফির‍্যা আইল। কিন্তু রূপাই?

আকবর : মামলা মোকদ্দমা তো উইঠা গেছে সব। লড়াইয়ে যত আসামী আছিল, খালাস ও অইয়া গেছে সব।

কালু : উঃ লড়াই! রাম-রাবণের যুদ্ধ দেখি নাই। কুরুক্ষেত্রও দেখি নাই। কিন্তু এই লড়াইয়ের কথা মনে অইলে এখনো আমার শরীর শির শির কর‍্যা উঠে।

আকবর : যখনই জম জমাইয়া জাইগা উঠলো গাঁয়ের ভাইরা—

কালু : মোল্লা সাহেবের কেল্লামাতের তখন আর রাস্তা কৈ?

আকবর : কৈ? .... কিন্তু মাইরের ঝালডা যে আমরা অখনো হজম কর‍্যা উঠতে পাল্লাম নারে কালু?

কালু : পাল্লোনা মোডেই রূপাই। ... বছর ঘুর‍্যা গেল। ক্ষেতের ধান উইঠা আবার আমরার সাধের সোনার ধানে ক্ষেত তমতমাইয়া উঠল-

আকবর : কিন্তু রূপাই....?

কালু : যে রক্তের নদী বইল রূপাইর লাঠিতে, হয়তো বা তা শুকাইছেনা ভাইবা .... সাতরাইয়া আওয়ার বল যে উপরোলা অখনো আমরারে দেয় নাইরে আকবর।

আকবর : কালু!

কালু : যখনই মনে হয়, মন মানেনা, ধিকি ধিকি বুকটা জ্বলে।

আকবর : আর ভাইবা দেখতো বেচারী সাজুর কথাডা। তার দিকে তো আর চাওন যায় না। তার মার বাড়ীতে দিয়া আইছি তারে। কিন্তু সুখ তো আর অইলো না তার কপালে।

কালু : আমরার হগলের কপাল ফিরাইতে গিয়া তার নিজের কপালটাই কেবল ভাঙ্গাল।

আকবর : কত খুঁজলাম তারে- কিন্তু কৈ? কালু, চল পাট বেইচা- খুইজা দেখি তারে কৈ পাই?

কালু : আমার তো পাট নাইরে আকবর। রূপাইর দৌলতেই আছে কিছু ধান। তার থেইকাই আমি কিছু বেইচা দিমো। খুইজা আনমো তারে।

আকবর : হ্যাঁ তাই চল। (নেপথ্যে থেকে আবাহ সংগীতে বাঁশী বা বেহালা, দুজনে প্রস্থানোদ্যত। পেছন দিক থেকে আলুলায়িত ভঙ্গীতে প্রবেশ করে সাজুর

মা, তিনিও অনুসন্ধানী)

সাজুর মা : ভাইজানেরা, অভাগিনী মায়ের একটা কথা শুইনা যাও। শুইনা যাও দয়া কইরা। (কালু পিছু দেখে)

কালু : আরে। এ যে সাজুর মা । (দুজনে দাঁড়ায়)

আকবর : কি কথা? কন মা?

সাজুর মা : মা। মা ডাকছ তো মায়ের বুকের ভিতরা একবার দেইখা যাওরে পাব। ধিকি ধিকি শোকের আগুনে যে বুকটা আমার জ্বইলা যায়!

উভয়ে : মা!!

সাজুর মা : তোমরা গাঁওর ছেইলারা মিলা পারনা আমার হারান ছেইলাডারে আইনা দিতে। আমার সাজুর রূপাইরে। ... কওনা কই দেখছ তারে? (কালু ও আকবরের দৃষ্টি বিনিময়) বছরটা কাইটা গেল। সোঁতের শেলোর মত- সোঁতের ফেনার মত দুঃখের সায়রে সাজু আমার ভাসে। আঁচলের ধনটারে আর খুঁইজা পাইনা। যার কাছে যাই কেউ তার খোঁজ দেয়না.. খোদার কছম খাও, কওনা বাবারা - কই দেখছ তারে? কবে ফিরা আইবো বাপ আমার? কও ...(কালু আকবরের দৃষ্টি বিনিময়)

কালু : ফিরবো।

সাজুর মা : ফিরবো? কবে? কবে? (ব্যস্ত জিজ্ঞাসা)

আকবর : এইতো আর বেশী দিন নাই।

সাজুর মা : কতদিন? কও কতদিন?

কালু : অল্পদিন! হ্যাঁ...

আকবর : হ্যাঁ, অল্প কমাস।

সাজুর মা : কোন্ মাস? কোন মাস কও? ফাগুন ? চৈত?

উভয়ে : না।

সাজুর মা : আষাঢ় ? শাওন?

কালু : ভাদর!

আকবর : হ ভাদর!

সাজুর মা : ভাদর? ভাদর মাসে ফিরবো! ... বেশ তবে গিয়া কই আর কাঁদিচনা সাজু, ভাদ্রমাসে ফিরা আইবো আমার বাছা জাদু! (বলতে বলতে প্রস্থান)

(আলো নিবছে। কালু আকবর সব ভুলে সেদিকে তাকিয়ে আছে । আলো কমার সংগে নিচের গানের কলিটি। গান চলছে, ক্রমে আলো কমে অন্ধকার হবে। এই অন্ধকারে কালু আকবরের প্রস্থান। মঞ্চে এসে যাবে সাজু সাজুদের জোনে। কারণ এখন সে মায়ের বাড়ী।

মঞ্চে কালো বাক্সটিও পেছনে থাকবে। সাজু আঁধারেই কাঁথা বিছিয়ে সেলাইর ভঙ্গিমার আলোর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। এ সময়ে অন্ধকারের বুক চিরে শোনা যাবে কেবল নিম্ন সংগীতাংশটুকু।)

" হামারি দুঃখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

(আলো জ্বলে ধীরে। সাজু কাঁথা সেলাইয়ে রত। সে কিছু ক্লান্ত। বিরহিণী। চোখের জল মোছে বার বার। চোখ মুছে আবার সেলাই করে। সেলাই চলছে ধীরে। বিশেষ আবহ সঙ্গীতে সাজুর মনে পূর্বস্মৃতি ফুটে ওঠার আভাস। পূর্ব স্মৃতি গোচরীভূত হওয়ার সময় সাজু ফ্রিজ অ্যাকশন নেবে)

" দেয়ারে তুমি অধরে অধরে নামো
দেয়ারে তুমি নিষালে নিষালে নামো।"

(ফ্রিজ ভেঙ্গে মুখ তুলতেই গান মুছে যায়। চোখ মুছে মন দেয় সেলাইতে। পূর্ব স্মৃতির অংশগুলো টেপেও চালানো যায়। আবার পূর্বস্মৃতি । সে ফ্রিজ।)

সাজুর মা : ও সাজু, তুই বাড়ী গিয়া বড় মোরগটা ধর। যাও বাবা, সাজুর লগে বাড়ীতে যাও। ওলো সাজু, অরে নিয়া যা।
(ফ্রিজ ভেঙ্গে আবার চোখ মোছে)

(কাঁথা সেলাইতে রত সাজু। আবার পূর্বস্মৃতি । এবার রূপাইর জোনে স্মৃতিদ্যোতক স্বপ্নীল আলোর টুকরো জ্বলবে। তার আগে মঞ্চে রূপাই বসে যাবে বাঁশী মুখে। আলো জ্বলতে শোনা যাবে বাঁশী। যেন রূপাই বাজাচ্ছে যেমন এক বিশেষ রাতে বাজিয়েছিল। সাজু ফ্রিজ হয়েছে। বাঁশী ৩০/৪০ সেকেন্ডের মত চলতে পারে। বাঁশী কমে সাজুর কণ্ঠে শোনা যাবে—।)

সাজুর কণ্ঠ : ওগো শুনছ। দুটি পায়ে পড়ি। আর ভাল লাগে না আমার। চলনা গো, এবার ঘরে যাই।

(ফ্রিজ ভেঙ্গে হঠাৎ সাজু উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ে। রূপাইর জোনের আলো দপ করে নিবে যায়। সাবধানে সে প্রস্থান করবে। অসহায় ব্যঞ্জনায় সাজু সেই কালো বাক্সের উপর থুবড়ে পড়ে কান্নায়। )

সাজু : মা! মা! মাগো ! (মায়ের প্রবেশ)

সাজুর মা : সাজু, সাজুরে— মা আমার! (মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে চায়)

সাজু : (মায়ের কাঁধে মুখ নিতে চেষ্টা করে) মা গো! আর আমি সইতে পারি না। আ...র আ...মি ... (ফুঁপিয়ে ওঠে)

সাজুর মা : (মেয়ের চোখ মুছে) ওরে আমি তো মা। মার পরানে তোর কোন্ কথা জানা নাই বল? তোর বুকটা যে ...
(কান্না সামলায়) চোখের কোলে তোর ....

সাজু : মা! মা গো! (গলা কাঁপছে)

সাজুর মা : (নিজের চোখ মুছে) এইতো, ভাদ্র মাস তো অখনো শেষ অয় নাই। সব জ্বালা নিবাইয়া, সোনা জাদু আমার, এই মাসেই আইবো জানি মা!

সাজু : (শরীরে কষ্ট, মৃত্যুর পূর্বাভাস) মাগো, তোমারও কি ব্যথা, আমি বুঝি বুঝিনা? ... জানি গো, স-ব আমি জানি। কি-ন্-তু তার চেয়ে ওযে আমার বুকে ..... সোনা মা আমার!

সাজুর মা : সাজু!! (কান্না চেপে, দুজনে দুজনার চোখ মুছে)ওহ! ... আমার এই নক্সী কাঁথাখানা ভাল কর্য়া একটু মেইল্যা দেও তো মা। (মা মেলে) হ্যাঁ, এইবার ঐ সুঁই সুতাটা আমার হাতে দেওনাগো মাগো! দেখি যদি আমি শেষ ছবিখান আঁকতে পারি গো।)

(সাজু কাঁথা সেলাইতে নিবিষ্ট হয়। ধীর পায়ে মায়ের প্রস্থান। সে চোখ মুছে ক্ষণে ক্ষণে। কাঁপা কাঁপা হাতে সেলাই কচ্ছে। সব মিলিয়ে সাজুও মরমিয়া। বেজে চলছে বাঁশী নীচু গ্রামে গুমরানো বিরহী তানে। ভিন্ন আলোতে গায়েনকে দেখা যাবে অল্পক্ষণ সাজুর অ্যাকশন চলার পর। সঙ্গীতে এবং কথক ঢঁয়ে সে বোঝাবে সাজু কাঁথায় কি করে চলেছে। গায়েনের প্রতি কিন্তু সাজু থাকবে সম্পূর্ণ উদাসীন। কারণ গায়েন তারই মানসিকতা ও কর্মকান্ডের ঘোষক।)

গায়ক : (পদাবলী ঢংয়ে) ওঃ ওঃ ওঃ
ভাসি আঁখি জলে আঁকিল যে ধনি
নিজেরই কবরখানি
তারি পাশে আঁকে রাখালিয়া বসে
মুখে ধরে বাঁশীখানি।
বিরহে কাঁদে বাঁশী আঁখি জলে ভেসে-
কবরে শুয়ে ধনি আঁখি জলে ভাসে-
কেঁদে ভাসে দশদিক আঁধার রজনী

(ক্লান্ত পদক্ষেপে গেয়ে বেরিয়ে যায় গায়ক। সে আলো নেবে। বাঁশী বাজন ১০/১৫ সেকেন্ড প্রায়। সাজুর কাজে, ক্লান্তিতেও যেন উৎসাহ। মাকে ডাকে সাজু।)

সাজু : মা! মা... ওমা ।। (সে যেন কষ্ট চাপছে। মায়ের প্রবেশ)

সাজুর মা : কিরে সাজু?

সাজু : (মাকে টানে সোহাগে) সোনা মা আমার। মা গো, যদি আমি তোমাকে ফাঁকি দিয়া যাই.. এই কাঁথাখান তুমি আমার কবরে বিছাইয়া দিও মা। .. সকাল সাঁঝে কুয়াশার জল এরি বুকে কাঁইদা শুকাইয়া যাইবো (গলা কাঁপছে)

সাজুর মা : ওরে এ কি কথা সাজু!

সাজু : আর যদি ফিরা আইসে গো মা তোমার সোনা যাদু- জানি তারও চোখের জলে আমার ঐ ... কবরের মাটি ভিজবেগো। .. তার কাঁদা শুইনা.. হয়তো আমারও কবরের ঘুম ভাইঙ্গা যাইবো মা।।

সাজুর মা : আমি পারিনারে, সাজু, আর সইতে পারিনা।

সাজু : (নির্বিকার বলে চলে) তারে কান্দাতে হয়তো আমিও জেইগে উঠবো ... জেইগে উঠবো মাগো অনেক রাতে।

সাজুর মা : সাজু! (মেয়ের মুখে হাত দেয়, সাজু হাত সরিয়ে)

সাজু : কইতে দাও মা। ... এই ব্যথা কেমন কইরে সওয়া যায় তুমিই তারে বুঝায়ে দিওগো। ... আর ... তার দুই ফোটা চোখের জল যেন ফেলে আমার নক্সী কাঁথার বুকে, - এই কথাটাও তারে বইলে দিও মা। (সাজু ধীরে মৃত্যু পথে)

সাজুর মা : আর আমারে পোড়াইসনে মা- আর ... (কান্নায় চেপে যায়)

সাজু : (এবার দারুণ কষ্টে বলছে) আমার .. যত ব্যথা, যত কাঁদা সব এই কাঁথায় নক্সী কর্য়ে কর্য়ে.. আমি .. লেইখে গেলাম মা। .. তাই এই কাঁথারে আমার কবরে বিছায়ে দিও। আর বলো আমার বেথাটারেও যেন তার বেথার সনে মিল কর্য়ে দেখে। (আচমকা) মা!

সাজুর মা : (ভীত) সাজু!

সাজু : মা, ঐ শুনছ, ঐ ডাকে সোনার ধান- । ঐ ডাকে ডাকাতিয়া বাঁশী - আমার... বড় সাধের নক্সী...

(হঠাৎ কথা আটকে পড়ে যায়। সাজুর মা তাকে ধরে রাখতে পারেননি। এই পতনে সাজুর মৃত্যু)

সাজুর মা : (কণ্ঠে কাঁপা কান্না) সাজু সাজু ... ওরে আমার সোনার সাজুরে ... মায়ের দিকে একবার মুখ তুলে দ্যাখ মা-

(আলো নিবে আসে মায়ের কথার সংগে। অন্ধকারে আবাহ সংগীতে বেহালার বা বাঁশীর করুণ রাগিনীতে যেন গুমরানো কান্না। সেই অন্ধকার সময়ের মধ্যে দৃশ্য বদল হচ্ছে। ঐ কালো বাক্স মঞ্চের পেছনে স্থাপন করে তার উপর বিছিয়ে দেয়া হয়েছে নক্সী কাঁথা। গ্রামবাসীদের হাঁটু গেড়ে টুপি মাথায় কবরের দুপাশে মোনাজাতের অভিব্যক্তিতে দেখা যাবে। আলো শুধু কবরে। তারই আলোতে গ্রামবাসীদের দেখা যাবে।)

কোরাস : আল্লাহু আমিন্।

সূত্রধার : (কবরের ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠে) মোনাজাত কচ্ছে গাঁয়ের সব চাষী ভায়েরা মিলে।

গ্রামবাসী কোরাস : আল্লাহু আমিন্!

(মুখে হাত বুলিয়ে আবার বাহু প্রসারিত।)

সূত্রধার : (ঠিক কবরের ওদিকে হাঁটু গেড়ে বসে, ঐ অল্প আলোতে সেও কিছু আলোকিত) কিন্তু- কোন কারণে সাজুর কবরের পাশে গোটা গাঁ! কারণ রূপাইর আধখানা যে এই কবরের তলে ঘুমিয়ে। রূপাই যে তাদের এই গোটা গাঁয়ের। গাঁকে বাঁচাতে গিয়েই তো রূপাই নিজেকে হারিয়েছে। .. আর সেই রূপাইর বড় সাধের আধখানার জন্যে গোটা গাঁ কাঁদবেনা?

গ্রামবাসী কোরাস : আল্লাহু আমিন্। (আবার পূর্ব্ববৎ)

সূত্রধার : নক্সীকাঁথার মাঠে আসার কথা ছিল বাবুরা, কোন ফাঁকে যে সেখানে এইসে গেছি, আপনাদের কিবা হুঁস নাই। কিন্তু গো বাবু, আমার কি বেহুঁস হইলে সাজে? আমাকে যে বড় মুখ করে কান্ডারী সাজিয়েছে। ... এই নক্সী কাঁথার মাঠে আসার আগে বাবুরা কি কোনদিন শুনেছেন কোন আউল, বাউল বা রাখালিয়ার কণ্ঠে এই নক্সী কাঁথার গান? ... কেউ বলে, শুনেছে-হয়তো শুনে থাকবে। ... কিন্তু ঐ বাঁশী শোনেনি - এমন কিন্তু কেউ নেই। হেসে হেসে যে বাঁশী শুরু হয়েছিল- (বাঁশী বাজতে থাকে। সংলাপের সময় নীচু, ফাঁকে উঁচুতে। এবার বাঁশী বাজবে পাগল পারা মন কাড়া সুরে)

সূত্রধার : ঐ .. ঐ যেন শোনা যচ্ছে। .. গাইতে গাইতে কালার হাতের ঐ ডাকাতিয়া বাঁশী আমাদের কি গান শুনিয়ে গেল- কার গান শুনিয়ে গেল? (কোরাস শিল্পীদের) চলনা ভায়েরা, কবরের একটু মাটি মুঠো মুঠো করে হেথায় হোথায় ছড়িয়ে দিয়ে আমরা সেই কালো মানিককে খুঁজে বেড়াই। যদি তার দেখা মিলে যায় তবে তার প্রিয়ার স্মৃতি জাগিয়ে বইলব- প্রিয় হে, প্রিয়া তোমারে ভুলে নাই। আমরাও ভুলি নাই।

(গ্রামবাসীরা সব মুঠো মুঠো কবরের, মাটি নেয়ার অভিব্যক্তিতে কবর ছেড়ে দৃশ্যপট সজ্জার দিকে এগুচ্ছে। টুপী খুলে কোমরে গুঁজে নিচ্ছে। দৃশ্যপট দোলাবার পরবর্তী অভিনয়ের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছে সব। সংলাপ শেষে সূত্রধার তুলে নেবে বাক্সটি? দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে সে ওটা দুলিয়ে নাট্যযবনিকার পথে এগিয়ে যাবে। আলো সঙ্গতি রক্ষা করে ঈষৎ বেগুনি রঙে সব আভাসে উদ্ভাসিত হচ্ছে।)

সূত্রধার : আর বইলে দাও তুমি আমাদের, কি গান গাইল তোমার ঐ ডাকাতিয়া বাঁশী। সোনার ধান বাঁচাতে গিয়ে সাধের সাজুকে যে হারায়ে যায়। সে

গান কোন গান? যে গানের টান পড়েছে আমাদেরও মনে।

(সমবেত শিল্পীরা ইতিমধ্যে মঞ্চ সজ্জার দৃশ্যপটে পৌঁছে গেছে। প্রথম নাট্যারম্ভে দোলায়মান দৃশ্যের নাট্যক্রিয়ায় অংশ নিয়েছে তারা। নিম্নাংশ গাইতে গাইতে প্রবেশ কচ্ছে গায়ক। নাট্যারম্ভের মত সংগে অংশ নেবে কোরাস শিল্পীরা। এই নাট্যক্রিয়ায় গায়ক পাঁচালী ঢংয়ে গাইছেন।)

গায়ক : (পাঁচালী ঢংয়ে) নকসী কাঁথার মাঠের কথা হয় রে সমাপন।
বাঁশী বাজি কি কয় ডাকি ভাবরে অবুঝ মন।
গাজীর কথক ঢং - এই বাঁশীর টানে একটা কথা হইতেছে স্মরণ
ভেইবে দেখেন, ও বাবু গো - পড়ে কি না মন?
গায়েন (সুরে) রাবণ রাজা করলো হরণ সোনার সীতারে-
উদ্ধারিল রাম অবতার পড়ে মনে রে।
হায়রে, কংসের হাতে ছারখার হয়রে ধরণী।
উদ্ধারিতে অবতীর্ণ কিষ্ন গুনমনি রে কিষ্ন গুনমনি।
নক্সী কাঁথার মাঠের বাঁশী কি বলিয়া বাজেরে!
নক্সী কাঁথার মাঠরে!

কোরাস : "নকসী কাঁথার মাঠ।"

গায়েন : সারা বুক ভরি, কি কথা সে লিখি, নীরবে করিছে পাঠ রে-

কোরাস : "নকসী কাঁথার মাঠ" (কয়েকবার গাইবে)

গায়েন : (কোরাসের ভেতর দিয়ে) নকসী কাঁথার মাঠ .......

(আলো কাঁপছে, কমছে। বাঁশী বাড়ছে। দৃশ্য কাঁপছে, দুলছে। সকলেরই জিজ্ঞাসা যেন আছড়ে পড়ছে। ধীরে পর্দা নাবতে থাকে। চরম কোরাস ধ্বনির সঙ্গীত মূর্ছনা ভেদ করে গায়ক কণ্ঠে 'নক্সী কাঁথার মাঠ" শোনা যাচ্ছে সুরেলা কণ্ঠে। "নক্সী কাঁথার মাঠ" শোনা যাচ্ছে সুরেলা কণ্ঠে। নক্সী কাঁথার মাঠ হতে আগত শিল্পীরা যেন "নটে গাছটি মুড়োলো" বলে নাটকের যবনিকা ঘোষণা করছে- নাট্যারম্ভের দৃশ্য রচনার দোলায়মান মঞ্চসজ্জার ভঙ্গীতে। আলোতে, সঙ্গীতে, দৃশ্যপটে মিলে অপূর্ব নাট্যমুহূর্ত অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে ধীরে পর্দা নেমে আসতে আসতে।)

---

লেখক : **অজিত মজুমদার,** ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট নাটককার (প্রয়াত)।

# ত্রিপুর রাজার উপাখ্যান

কমল রায়চৌধুরী

**চরিত্রলিপি**

| | | |
|---|---|---|
| দৈত্য | ত্রিবেগ রাজ্যের রাজা | বৃদ্ধ |
| ত্রিপুর | তার পুত্র, যুবরাজ | নবীন যুবক |
| হেরম্ব | হেরম্বের রাজা | প্রৌঢ় |
| বিদুষক | (ত্রিবেগ) | প্রৌঢ় |
| মন্ত্রী | ” | প্রৌঢ় |
| সেনাপতি | ” | যুবক |
| চন্তাই | পুরোহিত | প্রৌঢ় |
| কিরাতগণ | | প্রৌঢ় |

ঘাতক / গ্রামবাসী /হেরম্ব সেনা / হেরম্বর দূত / একটি লোক

| | | |
|---|---|---|
| হীরাবতী | ত্রিপুরের স্ত্রী | যুবতী |
| পরিচারিকা | | ” |

(কথক দলের সদস্যগণ)

| | |
|---|---|
| নরধ্বজ | সূত্রধার |
| চন্দ্রধ্বজ | সহযোগী |
| ত্রিশূলধ্বজ | ” |
| পাগল | ” |

অন্যান্য সহযোগীবৃন্দ

**মঞ্চ**

মূল মঞ্চের মধ্যিখানে প্রায় এক ফুট উঁচু একটি ছোট মঞ্চ করা হবে। তার দুপাশে গায়কদল ও বাজনদারেরা বসবে। দর্শকাসন থেকে ওদের দেখা যাবে। সামনের দিক খোলা থাকবে। পেছনের দিকে যাত্রামঞ্চের প্রবেশ পথের মত বাঁশ বেঁধে প্রবেশ প্রস্থানের পথ তৈরী করা হবে।

দৃশ্যপট পরিবর্তনে কাট-আউট এবং অন্যান্য উপকরণ (যেমন সিংহাসন, শয্যা, বেদী, তোরণ ইত্যাদি) ব্যবহার করা হবে। পাগল ও তার সহযোগীরা দৃশ্য সজ্জা পরিবর্তন করে যাবে বিভন্ন দৃশ্যের আগে।

**আবহ**

(সাঁওতালীদের ব্যবহৃত) দেশী সানাই, মৃদঙ্গা, ঢোল, বাঁশী, রামকরতাল, ঢাক/দুন্দুভি, কাশি, করতাল, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র দিয়ে আবহ সৃষ্টি করা হবে।

গড়িয়া নৃত্যের গানের সুর বাজানো হবে।

পাখীর ডাক, হরিণের ডাক, বাঘের ডাক, মানুষের কান্না, আর্তচিৎকার নেপথ্য থেকে টেপ বাজানোর মাধ্যমে শোনানো যেতে পারে। নয়তো গায়ক দলের মধ্য থেকে কণ্ঠের সাহায্যেও দেয়া যেতে পারে।

**নৃত্য**

নাটকের নির্দেশ অনুযায়ী ভূমিকা দৃশ্যগুলোতে গড়িয়া নৃত্য হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ঈষৎ পরিবর্তন করে নেয়া যেতে পারে নৃত্য-আঙ্গিক।

**আলো**

মঞ্চে কোন জোন ব্যবহৃত হবে না। স্পট, ফোকাশ ও মিরর-এর সাহায্যে আলোর প্রয়োগ ঘটবে। বেশিরভাগ অংশই ফ্লাড লাইটে হবে। পরিস্থিতি (নির্দেশ) অনুযায়ী বিভিন্ন রঙের আলো ব্যবহার করা যাবে।

**কুশীলবদের সাজসজ্জা**

ত্রিপুর — হলুদ রঙের ধুতি। গোলাপি উত্তরীয়। মুক্তোর মালা গলায়, হাতের বাজুতে ও কব্জিতে। ধুতি পশ্চিমী ঢঙে মালকোচা দিয়ে ধুতি পরা হবে। রাজা হবার পরে মুকুট থাকবে। খালি গা। খালি পা।

দৈত্য — সাদা চুল, দাড়ি। মাথায় মুকুট। রঙিন ধুতি। মুক্তো বা পুঁতির মালা গলায় হাতে। উত্তরীয়।

মন্ত্রী— চুল-দাড়ি কাঁচাপাকা। আর সব দৈত্যের মত। মাথায় মুকুট থাকবে না। পাগড়ি দেয়া যায়।

সেনাপতি - চুলদাড়ি কাঁচা। আর সব মন্ত্রীর মত।

চন্তাই— সাদা ধুতি। সাদা উত্তরীয়। পাগড়ি ও লাল তিলক। উপবীত।

কিরাত— খাটিয়া (খাটো ধুতি), খালি গা, চুল কাঁচা।

গ্রামবাসী— ধুতি (হাটু সমান), গায়ে ফতুয়া/খাটো পাঞ্জাবী, চুল দু-একজনের কাঁচা, এক জনের পাকা।

হেরম্ব— দৈত্যের মত। চুল কাঁচা-পাকা।

হেরম্বসেনা- ধুতি-পাগড়ি। হাতে বল্লম/বর্শা।

হীরাবতী- লাল/নীল/সবুজ, চুমকি/জরি বসানো শাড়ি;ব্লাউজ; সোনার গয়না।

পরিচারিকা- রিসা-রিগনাই। হাতে চুড়ি (কাঁচের), পুতির মালা।

নরধ্বজ- ধুতি । উত্তরীয়। হাতে গলায় পুতির মালা।

চন্দ্রধ্বজ- (একগুচ্ছ) ঘুঙুর বাঁধা ধনুক। মাথায় পাগড়ি ।

ত্রিশূলধ্বজ- চন্দ্র(অর্দ্ধ) বসানো দণ্ড। ত্রিশূল বসানো দণ্ড) পোষাক নরধ্বজের মত। গায়ে জামা, মাথায় পাগড়ি।

পাগল— দলের আর সবার মত। চুল এলোমেলো। মুখে না কামানো দাড়ি।

দলের আর সকলে ধুতি, জামা, উত্তরীয় পরবে। সকলের খালি পা।

**বন্দনা**

(সম্প্রদায়ের সকলে একসাথে)

প্রণাম করি ওগো জগতের বাসী।
একই প্রাণের অংশ স্বদেশী- বিদেশী
এক বাগানের পুষ্প মোরা ভিন্ন বর্ণ-গন্ধ।
এক বাতাসে দুলে মোরা পাইযে আনন্দ।।
ধরিত্রীমার গর্ভ থেকে সকলের জন্ম।
সকলের ভাল্ করুক সকলের কর্ম।।
উঠুক ঐক্যসূর্য বিভেদেরে নাশি।
মিথ্যার আঁধার ভেঙে সত্য পরকাশি।।

[ সুর-তাল কাঠি নৃত্যের। (—) (নিচে) চিহ্নিত বর্ণগুলো অ উচ্চারণ (হলন্ত)। ]
বন্দনাশেষে সকলে মঞ্চ থেকে অবতরণ করে। তারপর মঞ্চে ওঠে চন্দ্রধ্বজ-ধারী। তখন গড়িয়া নৃত্যের সহযোগী সুর বাজানো হবে।

চন্দ্রধ্বজের গান

আজিকে গাইব গো মোরা ত্রিপুরার কথা।
ত্রিপুর নামে রাজা ছিল শুন সে বারতা।।
চন্দ্রবংশের রাজা ছিল রাজসিংহাসনে।
রাজমালায় লেখা আছে ভেবে দেখ মনে।।
প্রথম যে রাজা ছিল দ্রুহ্য নাম তারি।
আমি তার সাক্ষী দেখ চন্দ্রধ্বজধারী।।
— (তিন বার)

মঞ্চের সম্মুখভাগে ডানপাশে দাঁড়ায় চন্দ্রধ্বজ ।
ত্রিশূলধ্বজধারীর প্রবেশ।

ত্রিশূলধ্বজধারীর গান

আজিকে গাইব গো মোরা ত্রিপুরার কথা।
ত্রিপুর নামে রাজা ছিল শুন সে বারতা।।
শিব তারে মেরেছিল ত্রিশূলের ঘায়ে।

কিরাতের সাথে তার পীরিতি ঘুচায়ে।।
তাহারে সংহারি শিব হল ত্রিপুরারি ।
আমি তার সাক্ষী আছি ত্রিশূলধ্বজধারী।। — (তিন বার)

মূল গায়েন নরধ্বজ এল গীতধনুক হাতে। ত্রিশূলধ্বজ ও চন্দ্রধ্বজকে দুপাশে রেখে ঠিক মধ্যিখানে সে দাঁড়ায়।

নরধ্বজের গান

নমি আমি দশদিক নমি নরগণে।
নমি আমি চন্দ্রভানু তারকা গগণে।।
বন্দিলাম এইক্ষণে যত গ্রহরাজি।
নদীগিরি সমুদ্দুর সবারে সম্ভাষি।।
ত্রিপুরা রাজার কথা গাহিব এক্ষণে।
কিছুটা আভাসে আর কিছু অনুমানে।।
ঝুমুর। নরধ্বজ ও সঙ্গীরা নাচে। নরধ্বজ গীতধনুক নাচায়।
বিচার করিবে কাল তার সত্যাসত্য।
শ্রোতা সুধীজন পরে রহিল দায়িত্ব।।
সুর ছাড়া আবৃত্তি।
সুরে
আসরতে সমাগত সবারে প্রণাম।
অভাজন করি আমি নরধ্বজ নাম।।
সহায় আছেন মোর বিপিন বিহারী।
ভূলোকবিহারী আমি গীতধনুকধারী।। — ৩বার
আবার জুমুর ও সমবেত নাচ।

নর : চন্দ্র!
চন্দ্র : যথা আজ্ঞা গীতধনুকধারী।
নর : ত্রিশূলধ্বজ!
ত্রিশূল : যথা আজ্ঞা ধনুর্ধর।
নর : আজকের পালার নাম বিঘোষিত হোক।
চন্দ্র ও ত্রিশূল : আজকের পালার নাম—
ত্রিপুর রাজার উপাখ্যান
নর : ত্রিপুর রাজার পরিচয় গীত হউক। সুধীবৃন্দ!
আমাদের পালার এ অংশটি "ত্রিপুরা রাজমালা" নামক গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

নর, ত্রিশূল, চন্দ্র একযোগে গান—

দ্রুহ্যবংশে দৈত্যরাজা কিরাত নগর।
অনেক সহস্রবর্ষ হৈল অমর।।
বহুকাল পরে তার পুত্র উপজিল।
ত্রিবেগেতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল।।
জন্মাবধি না দেখিল দ্বিজসাধু ধর্ম।
সেইহেতু ত্রিপুর হলি ক্রুর কর্ম।।

নর : এবার ত্রিপুরের স্বভাব সম্পর্কে কী লেখা আছে, শুনুন।

গান

দীক্ষিত না হৈল গুরু দেব না চিনিল।
সল্লোকের ব্যবহার কিছু না দেখিল।।
কিরাত প্রকৃতি হৈল কিরাত আচার।
সাধুসঙ্গ না ঘটিল কখনে তাহার।।
পুত্রের চরিত্র দেখি দৈত্য মহারাজা।
নিজকর্ম স্মরি বনে দিছে পিতাপ্রজা।।
কিরাত আলয় সব অগ্নিকোন দেশ।
এই রাজ্য পিতা আমা দিয়াছে বিশেষ।।
আর্যাবর্ত হৈতে ভূমি নাই পৃথিবীতে।
ত্রৈলোক্য দুর্লভ স্থল জগত বিদিতে।।

নর : এই 'অগ্নিকোন দেশ'ই হল ত্রিবেগ, যার বর্তমান নাম 'ত্রিপুরা'।

**গান**

অনেক সহস্রবর্ষ রাজ্য করি ভোগ।
পুত্রে সমর্পিল রাজ্য মনে বাঞ্ছা যোগ।।
বনে গিয়া যোগ সাধি রাজা মৃত্যু হৈল।
তার পুত্র ত্রিপুর কিরাতপতি ছিল।।
দৈত্যমৃত্যু পরে রাজা নামেতে ত্রিপুর।
কিরাত প্রকৃতি ছিল ধর্ম হৈল দূর।।
অনেক বৎসরাবধি হৈল রাজ্যপীড়া।
যুদ্ধাকাঙ্খা অবিরত মারে হস্তীঘোড়া।।
অন্যত্র নৃপতি নাহি পারে যুদ্ধবলে।
সকলেরে জয় করে নিজবাহুবলে।।

শেষ চরণটি পুন: পুন: আবৃত্তি করতে করতে নর, চন্দ্র, ত্রিশূল মঞ্চ পরিত্যাগ করে।

পাগল ও সঙ্গীরা নাচতে নাচতে মঞ্চে এসে কয়েকটি গাছের কাট-আউট রাখে। অন্যরা চলে যায়, পাগল থাকে। ওর হাতে ভার বহন করার একটি বাঁশের বাক। সে কাঁধের গামছাটি দিয়ে মুখমণ্ডল ও শরীর মুছতে মুছতে কথা বলে।

পাগল : বাবুমশায়গণ। এতক্ষণ আপনারা রাজমালার কথা শুনিলেন। ইহার কতখানি সত্য? এই রাজমালা কে বা কাহারা লিখিলেন? ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা মিলিয়া ইহা লিখিল। প্রাচীন কালের কথা যে যাহা লিখিয়া থাকে সে তাহা নিজের সুবিধামত মনের রঙ লাগাইয়া লিখিয়া থাকে। অতএব—

ব্যস্ত হয়ে নরধ্বজ আসে।

নর : এই পাগলা কি বলছিস্ তুই?

(চাপা গলায়)

পাগলা : না - না । কিছু নাহি বলিলাম। বাবুমশায়গণের সহিত একটু বাত্চিত্ করিলাম আর কি?

নর : (পাগলকে ধরে) চল্। বাতচিত করিল। আর কাম নাই। ভণ্ডুল লাগাইতে আইসে পালা শুরু হওনের সময়। (স্বগত। যেতে যেতে। পাগলকে নিয়ে প্রস্থান)

**প্রথম অঙ্ক।। প্রথম দৃশ্য ।।**

বন। ত্রিপুর শিকার যাত্রায়। সঙ্গে কিরাতগণ।

(সমবেত গান ও শিকারনৃত্য)

আমরা বলছি শিকার করে (২)।
পাহাড় করি লণ্ড ভণ্ড
উদ্দাম তোলপাড়ে।।
বাঘের হুঙ্কারে
হরিণ ছুটে মরে
আমরা তখন খুঁজে ফিরি
হিংস্র শ্বাপদেরে।।
বনেরই আহ্বান
মোদের দিচ্ছে আকুল টান
সোহাগ শাসন
কোন কিছুই
রাখতে নারে ঘরে।।

( দূরে বাঘের গর্জন। হরিণীর কাতর আর্তনাদ। ওদের নাচ থেমে যায়)।

ত্রিপুর : শ্ শ্ শ্ শ্ ! চুপ্ চুপ ! চল্ ছুটে যাই। বাঘটাকে বিঁধে ফেলি তীরের ফলায়। ভারী মজা ।

কিরাত-১ : কুমার। হিংস্র বাঘ। ভীষণ। আহারের পেছনে ছুটছে রাগে অন্ধ। চলুন কুমার সরে পড়ি।

ত্রিপুর : কাপুরুষ! এ জন্যেই আসা? ভীতু সব।

কিরাত-২ : না কুমার। আমরা তৈরী। আজ হোক মৃত্যুর সাথে বোঝাপড়া।

কিরাত-৩ : নেই পরোয়া!

কিরাত-৪ : ছুড়ব তীর!

ত্রিপুর : এইতো কিরাতের কথা। নেই পরোয়া। তীরধনুকে বর্শায় কথা বলি আমরা। বাঘ সিংহ বন্যহাতি সব আমাদের শিকার-খেলার সাথী। তীর ছোড়ে।
[ত্রিপুর এবং সঙ্গী কিরাতেরা ধনুকে তীর সংযোজন করে। ত্রিপুর তীর ছোড়ার পরে দূরে তাকিয়ে]

কিরাত-১ : লেগেছে। লেগেছে। বাঘের কানে লেগেছে।

কিরাত-২ : ওর মাথা এফোর ওফোর হয়ে গেছে।

ত্রিপুর : চল্। চল্। ওটাকে ধরি। দৌঁড়ে চল্।

কিরাত-৩ : খুব জোরে ছুটছে কুমার। ক্ষিপ্ত বাঘ। [যেতে যেতে ইশারা করে অনুসরণ করতে] কিছুটা গিয়েই ঘুরে পড়বে মাটিতে।

কিরাত-৪ : অবশ্যই বেশিদূর পারবে না যেতে।

কিরাত-১ : হরিণটা নিরাপদে লুকিয়ে ঝোপে।

কিরাত-২ : তাই হবে। বাঁচল বেচারা।

কিরাত-৩ : শয়তান বাঘের কবল থেকে প্রাণে রক্ষা পেল।
[ ওরা ত্রিপুরের পিছে পিছে ছুটতে ছুটতে কথা বলে।]
[ হঠাৎ দূরে (প্রবেশ পথে) আর্ত মানুষের চিৎকার।]

ত্রিপুর : এ কার চিৎকার? কে কাঁদে? কেন কাঁদে? মানুষ কেন কাঁদে? এ বুকের কান্না যে পাঁজরটাকে গোড়াশুদ্ধ নাড়িয়ে দিচ্ছে। কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এলামেলো করে দিচ্ছে। ওরে চল্ চল্। চল দেখি। ছুটে চল্।
[ এরা প্রস্থান পথ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। ওদিক থেকেই প্রবেশ পথ দিয়ে ঘাতক টেনে নিয়ে আসতে থাকে একটি লোককে]
[ প্রবেশ পথে ]

লোকটি : বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছ কোথায়?

ঘাতক : চল্।

লোকটি : হে ভগবান! রক্ষা কর। কে আছ ভাই? [ ঘাতক ওকে মঞ্চের ওপর টেনে নিয়ে আসে।] ঘাতক তোমার পায়ে পড়ি। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে। [ ত্রিপুর ও কিরাতগণ ছুটে আসে।]

ত্রিপুর : ঘাতক! ছাড় ওকে।

ঘাতক : কুমার ত্রিপুর! [বিস্মিত] [ লোকটিকে ছেড়ে দিয়ে করজোড়ে দাঁড়ায়।]

ত্রিপুর : ওকে নিচ্ছিস কেন?

ঘাতক : বলি দিতে কুমার।

ত্রিপুর : কে দিয়েছে আদেশ?

ঘাতক : পুরোহিত চন্তাই। রাজকুমার নিতে হবে আরো তিনটি।

ত্রিপুর : নিতে হবে না। বলি, হোম, যজ্ঞ হবে না।

কিরাত-১ : যজ্ঞ অনাদিকাল থেকে হচ্ছে কুমার।

ত্রিপুর : ক্ষতিকর এ প্রথা। বর্বরতা। তাই এ হবেনাকো ত্রিবেগ ভূমিতে কোনদিন আর। ছেড়ে দে ওকে।

ঘাতক : অভিশাপ দেবে যে।

ত্রিপুর : অভিশাপ! হা হা হা! কে দেবে অভিশাপ?

ঘাতক : চন্তাই কুমার।

ত্রিপুর : এতো মিথ্যার ছলনা। স্বার্থান্ধ ক্ষমতার এ মায়াবী কৌশল।

কিরাত-২ : যজ্ঞবিনা হবেনা যে রাজ্যের মঙ্গল যুবরাজ, তাই—

ত্রিপুর : প্রজার জীবন নিয়ে এ কোন মঙ্গল?

ঘাতক : আমার যে শিরচ্ছেদ হবে যুবরাজ।

ত্রিপুর : আমি আছি। ভয় নেই।

ঘাতক : প্রণাম কুমার। [ প্রণাম ও প্রস্থান]

লোকটি : সাক্ষাৎ মরণ থেকে বাঁচালে যুবরাজ। তুমি যে প্রাণদাতা। তুমি পিতা। অক্ষমের, দুর্বলের ত্রাতা। [ পদতলে পড়ল]

ত্রিপুর : উঠে দাঁড়াও। এদেশের মানুষ তুমি। ত্রিবেগ ভূমির সন্তান। আমার ভাই।

লোকটি : আমি যে কিরাত। জন্মপাপী।

ত্রিপুর : একী কথা! কিরাতের ঘরে জন্ম নেয়া অপরাধ?

কিরাত-১ : আমরা বনের লোক। অনার্য। রাক্ষস।

কিরাত-২ : বনেতে ছিলাম মুক্ত। আর্যজাতি এসে কেড়ে নিল সব। কেড়ে নিল সুখ, শান্তি, পিতৃপুরুষের মুখে একথা শুনেছি।

কিরাত-৪ : অনার্য, অসভ্য, বর্বর, রাক্ষস মোরা!

ত্রিপুর : মিথ্যে। মিথ্যে। বন্ধু তোমরা রাক্ষস নও। মানুষ। ঠিক একই রক্ত বয় দেহে তোমার আমার।

কিরাত-১ : আমরা বলিতে বধ্য।

ত্রিপুর : বন্ধ হবে বলি। কোন জাতি বধ্য নয়। কিরাত, কুকি, হালাম, বরক সকলে! সকলের জন্মদাতা ভগবান। ভিন্ন আমরা আকারে, রঙে। অন্তরেতে এক। একপ্রাণ বহিতেছে বুকের ভেতরে। এসো ভাই।
[লোকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে]
বুকে এসো তুমি। বধ্য নও। এ রাজ্যের তুমি প্রজা। তুমি অধিবাসী ত্রিবেগ ভূমির। ত্রিবেগ মায়ের তুমি সন্তান। আমরা ভাই ভাই। রাজপুত্র আমি। কিন্তু ভেদ নেই রাজায় প্রজায়। বলো 'ভাই-ভাই'।

সকলে : ভাই ভাই। ভাই ভাই।

(আলো নেভে)

[ পাগলের সঙ্গীরা নাচতে নাচতে গাছের কাট আউটগুলো সরিয়ে নেয়। একটি সিংহাসন বসায়। চন্দ্রধ্বজ ও ত্রিশূলধ্বজ ওদের সঙ্গে সঙ্গেই নাচতে নাচতে ঢোকে। অন্যরা সরে গেলে চন্দ্র ও ত্রিশূল সিংহাসনকে মধ্যে রেখে মঞ্চের সম্মুখভাগে দুইপাশে দাঁড়ায়।
[ দৈত্য, মন্ত্রী, সেনাপতি ও চন্তাই এসে যথাস্থানে দাঁড়ায় ও আসন গ্রহণ করে।]

**প্রথম অঙ্ক ।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।**

রাজসভা

[ সিংহাসনে মহারাজ, দৈত্য, চন্তাই, মন্ত্রী ও বিদূষক উপস্থিত]

মন্ত্রী : মহারাজ ! পুরোহিত চন্তাই- প্রবর কিছু নিবেদিতে আজ ব্যগ্র অতিশয়।

চন্তাই : যুবরাজ খুব দুর্বিনীত, মহারাজ।

দৈত্য : এই বুঝি আপনার নিবেদন চন্তাই? এতো বহুবার শোনা। নতুন কি কোন অভিযোগ আছে কিছু?

চন্তাই : মহারাজ ! সে যে যজ্ঞে ঘটায় বিঘ্ন। লাগায় বিভ্রাট সে প্রতিপদে।

মন্ত্রী : দেশ বুঝি ডোবে অন্ধকারে।

সেনাপতি : যেন ঘোর কলিকাল আসিছে ঘনিয়ে।

দৈত্য : কি করি চন্তাই? আমি বড় নিরুপায়।

চন্তাই : নির্বাসন দিন তারে।

মন্ত্রী : দিন বনবাস।

সেনাপতি : রাজা হলে সে যে, দেশ হবে অরাজক।

দৈত্য : একমাত্র পুত্র সেতো। বংশের প্রদীপ।

চন্তাই : অমিতাচারী কুলাঙ্গার পুত্রের চেয়ে বংশধারা ছিন্ন হওয়া অনেক শ্রেয়।

মন্ত্রী : হেরম্বপতি প্রতিবেশী আপনার, চন্দ্রবংশে জাত—

সেনাপতি : জ্ঞাতিভাই আপনার।

মন্ত্রী : তার হাতে রাজ্য সঁপে যান বনবাসে।

সেনাপতি : চন্তাইয়ের ওটাই ইচ্ছা।

মন্ত্রী : আমারও।

দৈত্য : দুর্বোধ্য তার ভাবনা। কী করে যে হল?

বিদূষক : যে ফুল নতুন আসে, তাতে যদি আসে অপরিচিত নববর্ণ, নতুন গন্ধ; বংশের গৌরব তাতে বহু বেড়ে যায়।

দৈত্য : হেঁয়ালী নয় বিদূষক। এ সমস্যার আশু সমস্যা কাম্য।

বিদূষক : সমস্যা যা নয়, তার লঘু-গুরু কিছু নেই, বাক্যে তার আছে জ্ঞানগর্ভ বাণী।

চন্তাই : [উত্তেজিত] শিরচ্ছেদ হোক এ উন্মাদ মাতালের। প্রবীন হয়েও অর্বাচীন সেজে এই সব দুষ্টগ্রহ ভ্রান্তপথে টেনে নেয় নব যৌবনেরে।

বিদূষক : যৌবনেরে চালাবার কী সাধ্য আমার? আমি শুনি বসন্তের দূত গান গায়। দেখি নবফুল প্রস্ফুটিত বৃক্ষশাখে। নব মেঘে আসে ঝড় বিপুল গর্জনে।

চন্তাই : মহারাজ! দূর হয়ে যাক বিদূষক।

মন্ত্রী : বিদূষক সবতাতে লাগায় ভন্ডুল।

সেনাপতি : অশিক্ষিত বাচালের মত কথা তার।

চন্তাই : ভেঙে দিতে ইচ্ছা হয় বীণাখানি তার।

বিদূষক : চারণের বীণা যদি ভাঙো, পুরোহিত, তবু আকাশ রাঙিবে অরুণের রাগে। পাখীরা গাইবে প্রভাতের আগমনী।

চন্তাই : এতক্ষণে বুঝে গেছি, কোন্ সে কারণে ত্রিপুরের মতিচ্ছন্ন হয়। কে ভোলায় ওকে?

বিদূষক : ঠাকুর! নতুন দিনের সূচনা, নব সূর্য়োদয়। আমি তো নিমিত্ত। কুমারও কিছু নয়। আলোকের স্পর্শে ঘুমভাঙা পাখী শুধু।

চন্তাই : উশৃঙ্খল কিরাত সংসর্গে লব্ধ কুশিক্ষার অন্ধকার— নব আলো তোমার ভাষায়?

দৈত্য : এ আদেশ হল আজ, কিরাত সংসর্গ তার নিষিদ্ধ সম্পূর্ণ। লোকাচার নয়, শাস্ত্রাচার গণ্য হবে রাজধর্মরূপে। বিদূষক! ত্রিপুরেরে বল, তার বালখিল্য চিন্তারাশি যত সব যেন ত্যাগ করে অন্ধকার ঘরে। মন্ত্রীবর, সেনাপতি, সভা ভঙ্গ করি, ক্লান্ত আমি পারিনে বইতে রাজভার।

মন্ত্রী : বিশ্রামের বড় প্রয়োজন আপনার।

সেনাপতি : অতি সত্যি কথা মহারাজ।
চন্তাই : বিলক্ষণ।
দৈত্য : সন্ধ্যা ডাকে, বানপ্রস্থ হাতছানি দেয়। আঁধার ঘনিয়ে আসে। বিদায়, বিদায়।
সকলে : জয় হোক জয়। ত্রিবেগাধীপের জয়।

[আলো নেভে]

[পুষ্পলতা শোভিত একটি সুদৃশ্য তোরণ স্থাপন করে সিংহাসনটি নিয়ে যায় পাগল ও তার সঙ্গীগণ]

**প্রথম অঙ্ক ।। তৃতীয় দৃশ্য ।।**

অন্তঃপুর

[ একটি বেদীতে উপবিষ্ট ত্রিপুর। পাশে নতমুখে হীরাবতী।]

ত্রিপুর : কেন তুমি উদ্বেগে আকুল, যুবরানী। কোথা গেল প্রেমের সিঞ্চনসিক্ত ফুল, যা তোমার যৌবনের নিকুঞ্জের শোভা।
হীরা : হৃদয় আমার কাঁপে আশঙ্কায়। পর্বতেরে সরাতে যেন উদ্যত তুমি, যেন প্রাসাদ টলোমলো কাঁপে আঘাতে তোমার। শঙ্কা জাগে। যদিবা পিষ্ট হই ভগ্ন প্রাসাদের চাপে।
ত্রিপুর : চিন্তা কিছু নেই।
নতুন বাতাসে উড়াবে পাথর-রাজি।
নবমেঘে জলধারা ঝরাবে বর্ষণ।
ফুটবে যে তৃণাঙ্কুর নবজীবনের।
হীরা : কিরাত সংসর্গ তুমি ত্যাগ কর প্রিয়।
ত্রিপুর : মাটির সংশ্রব কভু কি কাটাতে পারে
বনস্পতি? হীরাবতী, এযে অসম্ভব!
হীরা : যজ্ঞেতে দিয়েছ বাঁধা, বিপ্র তাই রুষ্ট;
অভিযোগ করেছেন পিতার সমীপে।
কেন ধর্মদ্রোহী তুমি? অধর্মের দূত?
ত্রিপুর : হিংসার আয়োজন যজ্ঞের হোমচক্রে।
মনুষ্যত্ব বলি হয় মানুষের হাতে,
একি ধর্ম?
হীরা : রাজ্যহিতে বলি। রাজধর্ম।
ত্রিপুর : মোর ধর্ম, ধর্ম নয়? অহিংসার বাণী?
প্রেম? শান্তি?
হীরা : এযে শাস্ত্রে লেখা নেই প্রিয়।

ত্রিপুর : এযে লেখা আছে হৃদয়েতে সকলের।
ভালবাসা বড় ধর্ম।

হীরা : পারিনে বুঝিতে
এতো কঠিন কথা। আমি যে অবলা।

[ পরিচারিকা অভিবাদন করে দাঁড়ায় ]

পরি : মহারাজ পাঠিয়েছেন জরুরি বার্তা, এক্ষুণি যেতে, যুবরাজ!

ত্রিপুর : যাই তবে
আরো কিছু কথা আছে, বলব এক্ষুণি
ফিরে এসে। অপেক্ষায় কাল গুন, রানী।

হীরা : পিতৃবাক্য শুনে এস বাধ্যমনে, প্রিয়।
বসে রব ততক্ষণ তোমার আশায়।

[ ত্রিপুরের প্রস্থান, আলো নেভে ]

[পাগল ও সঙ্গীরা এসে তোরণটি সরিয়ে একটি শয্যা রেখে যায়। চন্দ্রধ্বজ ও ত্রিশূলধ্বজ পাখা হাতে দাঁড়ায়। ]

## প্রথম অঙ্ক ।। চতুর্থ দৃশ্য ।।

শয্যাগৃহ

[বিশ্রামরত দৈত্য। কখনো অস্থিরভাবে হাঁটছে, কখনো বসছে দৈত্য।
ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ করে ত্রিপুর। ]

ত্রিপুর : কিবা আজ্ঞা তব, পিতৃদেব?

দৈত্য : কোথা ছিলি এতক্ষণ? যুবরাজ তুই। প্রাসাদের সুখ ফেলে কোথা যাস ওরে মূঢ় সারাদিন?

ত্রিপুর : গ্রামে, বনদেশে, কিরাত পাড়ায়, পিতা।

দৈত্য : কি আছে ওখানে?

ত্রিপুর : শান্তি আছে, আছে প্রেম, সরলতা, প্রকৃতির শ্যামল সোহাগ।

দৈত্য : এতো গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর কথা পুত্র। তুই ওরে যুবরাজ, ভাবী অধীশ্বর ত্রিবেগ রাজ্যের।

ত্রিপুর : তাই আমি ছুটে যাই প্রজাদের মাঝে, ওদের প্রাণের কথা কান পেতে শুনি।

দৈত্য : তুই নাকি বাঁধা দিস যাগযজ্ঞে? বলিরে ছাড়িয়ে নিস্ তুই?

ত্রিপুর : নিরীহের অকারণ প্রাণবধ রোধে লিপ্ত আমি।

দৈত্য : ওরে দুর্বিনীত! যাগযজ্ঞ অকারণ নয়। অনাদিকালের রীতি রাজ্যরক্ষা তরে।

ত্রিপুর : প্রজারে সংহার করি রাজ্যের সুরক্ষা? পিতৃদেব, নির্যাতন বুঝি হবে শাসনের

রীতি? সৌহার্দ্যের সহজ বন্ধন রাজায় প্রজায়। তাতে কি রাজধর্ম সুরক্ষিত নয়?

দৈত্য : চপল এই যুক্তি। ওরে, এইক্ষণে ত্যাগ করে কিরাত সংসর্গ, রাজকর্মে রত হবি, শাস্ত্রশিক্ষা লবি তুই পণ্ডিতের কাছে।

ত্রিপুর : পুত্র হয়ে কিরাত মাতার, কীভাবে যে ত্যাগ করি কিরাতেরে, নিজ সহোদরে, পিতা! —

দৈত্য : স্তব্ধ হও! বাচাল! দুরাচার! এই হল শেষ কথা। শাস্ত্র রবে উচ্চে। পুরোহিত যাহা ইচ্ছা করে, তাই হবে ধর্মের বিষয়ে।

ত্রিপুর : তাহলে বিদ্রোহী আমি, ছুটে যাব প্রজাদল মাঝে, উচ্চারিব সত্যলব্ধ বাণী, সমবেত ঐকতানে।

দৈত্য : তবে হারাবি রাজ্যপাট, ধর্মের রোষে, সভাসদগণ হয়েছে ভীষণ রুষ্ট। আর আমি পারিনে যে এ দ্বন্দ্ব সহিতে। চলে যাব রাজ্যপাট ছেড়ে বনবাসে।

ত্রিপুর : পিতা তুমি যেয়ো নাকো। আমি চলে যাই। ধর্মভ্রষ্ট আমি। পিতা তোমাদের মতে—

দৈত্য : ঔদ্ধত্য তোমার আকাশ ছাড়িয়ে গেছে। এবার সংগ্রাম কর আপন শক্তিতে। দেখি কার জয় হয়। ধর্ম না মূঢ়তার? [দৈত্যের প্রস্থান, ত্রিপুর দাঁড়িয়ে থাকে]

[আলো নেভে]

**দ্বিতীয় অঙ্ক ।। প্রথম দৃশ্য ।।**

[ ত্রিশূলধ্বজ, চন্দ্রধ্বজ ও নরধ্বজের প্রবেশ। ওরা নাচে ]

গান-

দুঃখ নিয়ে মনে / রাজা দৈত্য গেল বনে
পুত্র ত্রিপুর হল রাজা / শত্রু চারিপাশে (২)।
ত্রিপুর রাজা উদার / মুক্ত করে দ্বার
বনবাসী কিরাত আসে / প্রসাদ মাঝার (২)।
ক্রূর পুরোহিত / চায় না প্রজার হিত
ষড়যন্ত্র করে তারে / মারতে অবশেষে।। (২)।

[পাগল এসে যথাস্থানে সিংহাসন রাখে কিরাতদল "ত্রিপুর রাজার জয়" ধ্বনি দিতে দিতে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে চলে যায়। ত্রিশূলধ্বজধারী ও চন্দ্রধ্বজধারী সিংহাসনের দুপাশে দাঁড়ায়। একে একে এসে ঢোকে চন্তাই, মন্ত্রী ও সেনাপতি]

চন্তাই : ওহ্! বন্যগুলোর চিৎকারে প্রাসাদে তিষ্ঠানো দায় হলো দেখছি, মন্ত্রীবর!

মন্ত্রী : অসহ্য হলেও লেগে থাকুন ঠাকুর। সরে গেলে হয়ে যাবে মগের মুল্লুক।

সেনা : পুত্রের হাতে রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন মহারাজ। এ ভারী অন্যায়।

চন্তাই : অনাসৃষ্টি। বর্বর পুত্রের হাতে রাজ্য ছেড়ে পিতা চলে যায় বলে। শুনিনি এমন কথা।

মন্ত্রী : প্রথা অনুযায়ী ত্রিপুরই হবে রাজা।

চন্তাই : ধর্ম মতে হবে নাকো অভিষেক তার।

[ ত্রিপুরের নামে জয়ধ্বনি তীব্র হয়]

মন্ত্রী : আসছে ত্রিপুর। আমাদের মনোভাব যেন কিছুতেই না টের পেয়ে যায় সে। দাঁড়াতে হবে আনুগত্যের হাসি নিয়ে।

চন্তাই : হবে না তা। বাঁধা দেবো তাকে প্রতিপদে।

মন্ত্রী : ঠাকুর! প্রলয় ঘনিয়ে আসে যখন তখন অমিতবিক্রম মার্তণ্ডকেও মুখ লুকোতে হয় মেঘের আড়ালে। ওদের চলার এখন বন্যার বেগ, বাঁধা দিলে ভেসে যেতে হবে আমাদেরই। তাই—

চন্তাই : উত্তম! বলছেন বটে ঠিকই।

সেনা : তিনমাথা একজোটে পরামর্শ করে চলতে হবেই সদা সুযোগ সন্ধানে, বিপ্রবর!

মন্ত্রী : বহন করব তিনজনে আর্যধর্ম ধারা। — প্রভুত্বের দণ্ডনীতি, ভেদনীতি। সঙ্গোপনে ফাঁদে ফেলে তারে প্রতিষ্ঠা করব ফের ব্রাহ্মণের জয়।
[ত্রিপুরকে ও বিদূষক নিয়ে কিরাতদলের জয়ধ্বনি দিতে দিতে প্রবেশ।]

মন্ত্রী : জয়তু মহারাজ!

সেনা : জয় ত্রিবেগাধীপ!

চন্তাই : চন্দ্রবংশতিলক মহারাজ ত্রিপুর! আপনার সিংহাসন নিঃষ্কণ্টক হোক।
[ ত্রিপুর সিংহাসনে বসে। চন্তাই, মন্ত্রী সেনাপতি বিস্মিত হয়। পরস্পরের দিকে দৃষ্টি বিনিময় করে। ] মহারাজ! অভিষেক বিনা সিংহাসনে বসা শাস্ত্ররীতি নয়—

মন্ত্রী : রাজত্বের শুভারম্ভ হোক অভিষেকে।

ত্রিপুর : বৃথা কালক্ষেপ।

বিদূষক: বিলক্ষণ মহারাজ।

চন্তাই : বাচাল, কে দিল তোমাকে অধিকার কথা বলার?

বিদূষক: (মৃদু হেসে) নিজ অধিকারে বলছি কথা।

ত্রিপুর : থামুন আপনারা। অভিযোগ সমস্যাদি প্রজাগণ জানেন এক্ষণে। (হাত তুলে ইঙ্গিত দেয়)

কিরাত-১ : মহারাজ ক্ষেত্র করে লণ্ড ভণ্ড বনের শূকরে।

কিরাত-২ : এইবার উপবাস পুত্রকন্যা নিয়ে।

কিরাত-৩ : আসছে ঘোর দুর্যোগ আমাদের ঘরে।

ত্রিপুর : তবে আর দেরি নয়। ফসল বাঁচাতে চল সবে। চল দেখি কোথায় নেমেছে শূকরের পাল। চল ফসল বাঁচাতে। (দ্রুত উঠে যায়। সঙ্গে সঙ্গে কিরাতের দল। ব্যস্ত হয়ে)

চন্তাই : স্পর্দ্ধা তোর বন্য বরাহের মতো (স্বগত)

বিদূষক : রাজ কর্তব্য সম্পাদনে বড় আন্তরিক আমাদের নতুন রাজা।

চন্তাই : স্তব্ধ হও, এইক্ষণে ত্যাগ করো রাজসভা।

মন্ত্রী : এইক্ষণে। (বিদূষক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বেড়িয়ে যায়)

সেনা : কিভাবে করি নিধন এই দূরাত্মারে।

মন্ত্রী : দেরি নয় আর সেনাপতি। চলে যাও হেরম্ব রাজার কাছে। অনুরোধ কর—ত্রিপুরকে হত্যা করে ত্রিবেগ রাজ্যের ভার নিজ হাতে নিতে। আমরা প্রস্তুত রাজা বলে মেনে নিতে তারে।

চন্তাই : মন্ত্রীবর! যুবরানী হীরাবতী অতি ভক্তিমতী, তাকে হাত করে, চালাতে আরেক ঘুঁটি চললাম অন্তঃপুরে।

মন্ত্রী : শুভস্য শীঘ্রম। যান, যান চন্তাই ঠাকুর। চতুর্দিকে আক্রমণ! অভিমন্যু বধ! হা, হা, হা।

চন্তাই : জয় শিবশম্ভু! জয় জয় মহাদেব! (পুরোহিতের প্রস্থান)

মন্ত্রী : সেনাপতি! কালই জয় ভবানী বলে করুন যাত্রা মাহেন্দ্রক্ষণে পূর্বদিকে।

সেনা : অন্যথা হবে না মন্ত্রীবর।

মন্ত্রী : শুরু হোক অভিযান ত্রিপুর নিধন সমরের। (মন্ত্রী ও সেনাপতির অট্টহাসি)

আলো নেভে।

**দ্বিতীয় অঙ্ক ।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।**

অন্তঃপুর

[হীরাবতী ও পরিচারিকা ]

হীরা : (স্বগত) অভাগিনী আমি। অন্তঃপুরে দিনকাটে বিরহ শয্যায়। পতি ঘোরে বনে বনে। মৃগয়া। মৃগয়া শুধু । সংসার অপ্রিয়।

পরিচা : চুল বেঁধে দেব, রানীমা? সন্ধ্যা ঘনায়—

হীরা : কিছু আর লাগেনারে ভাল। সিংহাসনে বসে যুবরাজ মেতেছেন জনহিতে, আসে না অন্তঃপুরের কথা তার মনে।

পরিচা : আমাদের যুবরাজ সাগরের মতো।

হীরা : ওলো দাসী! তুই কি সাগর দেখেছিস?

পরিচা : নাগো রানীমা। শুধু শুনেছি লোকমুখে।

হীরা : তবে কেন তুই দিস সাগরের সাথে রাজার তুলনা?

পরিচা : সাগরের বুক নাকি খুব বড়। তিনিও অনেক বড়।

চন্তাই : [বাইরে, দরজায়] বধূমাতা!

পরিচা : [সম্ভ্রমে হীরাকে] চন্তাই ঠাকুর!

হীরা : [চাপা গলায়] নিয়ে আয় ঠাকুরেরে ।

[পরিচারিকা বাইরে যায়। হীরাবতী খানিকটা এগোয়। চন্তাই আসে। হীরাবতী করজোড়ে অভ্যর্থনা জানায়]

চন্তাই : দীর্ঘায়ু হও মা। দীর্ঘায়ু হও।

হীরা : ঠাকুর ! কী কারণে পদধূলি অভাগীর ঘরে?

চন্তাই : বৎসে! গত রাতে যে দুঃস্বপ্ন দেখেছি। মহেশ্বর রূদ্রমুর্তি ধরে এসেছেন ত্রিবেগ ভূমিতে। রুদ্ররোষে মেতে ওঠে সংহার করেছেন ত্রিপুরেরে।

হীরা : [ আতঙ্কিত ] ঠাকুর!

চন্তাই : পাপে ভরে গেছে আজ ত্রিবেগের মাটি।

হীরা : কী করলে প্রশমিত হবে রুদ্ররোষ?

চন্তাই : রাজরানী তুমি। অমঙ্গাল হবে দূর, রাজ্য পাবে রক্ষা শুধু তোমার ভক্তিতে।

হীরা : স্বামীর মঙ্গাল চাই। চাই রাজ্যসুখ। যা করবেন আদেশ, করব পালন।

চন্তাই : শোন বৎসে। ত্রিপুর উদ্ধত ভীষণ; যাগযজ্ঞ সব বন্ধ আজ তার ভয়ে; তুমি নামাবে তাকে দর্পের চূড়া থেকে।

হীরা : কীভাবে ঠাকুর?

চন্তাই : তুমি ধর মৌনব্রত। যতদিন না হয় সে সম্মত, স্বেচ্ছায় যজ্ঞ সম্পাদনে; মৌন না ভাঙবে তুমি।

হীরা : যদি মঙ্গাল হয় আমার সাধনায়, শিবের প্রসাদ চেয়ে তবে থাকি মৌনী। যেদিন স্বামীর হৃদয়ে আসবে ভক্তি, সেদিন বলব কথা মৌনব্রত ভেঙে। নাহলে আমৃত্যু রবে প্রতিজ্ঞা আমার, কৌরব-জননী সতী গান্ধারীর মত।

চন্তাই : তাই হোক বাছা।

হীরা : [প্রণাম করে] আশীর্বাদ চাই পিতা।

চন্তাই : তথাস্তু। তথাস্তু। ত্রিদিবের জয় হোক। ত্রিবেগের ভূমি পরে ঝরুক কল্যাণ।

[আলো নেভে]

পাগল এসে একটি গাছের কাট আউট রেখে গেল। বোঝাতে হবে যে ওটা পথের পাশের একটি গাছ।

**দ্বিতীয় অঙ্ক ।। তৃতীয় দৃশ্য ।।**

[গ্রামবাসীগণ একজন দুজন করে বিভিন্ন দিক থেকে যেন গাঁয়ের পথ ধরে গাছের তলায় জড়ো হয়।]

প্রথম : বৃষ্টি আর হবে না এবার। কি যে হল!

দ্বিতীয় : বৈশাখ চলে যায়, মেঘের দেখা নেই।

তৃতীয় : ছড়াগুলো শুকিয়েছে। ফেটে গেছে মাটি।

চতুর্থ : নির্ঘাৎ মরতে হবে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়।

প্রথম : সম্বল বনের আলু আর ফলমূল।

দ্বিতীয় : তাও পাওয়া যাবে কিনা, সেটা কে জানে?

তৃতীয় : আরে আরে। চন্তাই যে আসে এই দিকে।

চতুর্থ : গ্রামে তার পদধুলি, এতো অবিশ্বাস্য।

প্রথম : কিজানি, কি মনে করে আগমন তার।

দ্বিতীয় : তাকেই জিজ্ঞাসা করি, বৃষ্টি হবে কিনা।।

[চন্তাই-এর প্রবেশ ]

গ্রামবাসীগণ : পেন্নাম ঠাকুর! [প্রণাম করতে কাছে এগোয় ]

চন্তাই : [তটস্থ হয়ে] দূরে থাক। দূরে থাক। [গ্রামবাসীগণ দূরে সরে যায়] রাজপুরোহিত গ্রামে এল। জানিস্ না? ব্রাহ্মণ দেবতা? ফলমূল নেই? চাল? গরু-বাছুর? জুমে ফলে না বিন্নি ধান?

প্রথম : ফলে ঠাকুর, ফলে। কষ্ট করে নেবেন?

চন্তাই : গ্রহণে আপত্তি কেন হবে বাছাগণ?

দ্বিতীয় : ঠাকুর বৃষ্টির দেখা নেই, বহুদিন—

চন্তাই : ওরে! সে জন্যই তো আজ দেখা দিলাম। পদার্পণ করলাম। বৃষ্টি হয় না কেন? (গম্ভীর)

তৃতীয় : কেন ঠাকুর?

চন্তাই : পাপে ভরে গেছে রে দেশ, পাপে ভরে গেছে। বড় দুঃখে বৃদ্ধ রাজা, ত্রিপুরের পিতা, গিয়েছেন বনবাসে। কেন, কার পাপে?

চতুর্থ : কার পাপে, হে ঠাকুর?

চন্তাই : অগ্নিকাণ্ডে ঘর পোড়ে মানুষের, কেন? নামেনা এখনো বৃষ্টি, কার পাপে বলো?

প্রথম : কার পাপে? বলুন ঠাকুর।

চন্তাই : রাণীমাতা ভীষণ অসুখী। তিনি বোবা, মূক আজ, কার পাপে?

দ্বিতীয় : কার পাপে, বলুন ঠাকুর!

চন্তাই : হায়, সবই দুর্ভাগ্য! হঠাৎ হয়েছে রাজা চপলমতি ত্রিপুর। বন্ধ আজ বলি। যাগযজ্ঞ পূজার্চনা সব বন্ধ আজ।

তৃতীয় : তার জন্য বৃষ্টি বন্ধ? এত অঘটন?

চন্তাই : ভোজ না পেয়ে বৃষ্টির দেবতা হয়েছে ভীষণ রুষ্ট। যজ্ঞাগ্নিতে দিয়ে আহুতি ঘৃত-মাংস-যোগে করিলে তাহারে তুষ্ট তবে বৃষ্টি হবে।

চতুর্থ : দেবতাতো পিতা মাতা। তবে রক্ত চাইবেন কেন সন্তানের? বলি দেব নাকো।

চন্তাই : বলি দিবি নাকো তোরা? বুঝেছি। দুষ্ট ত্রিপুর খেয়েছে তোদের মাথা। শোন। রুদ্রশাপে মৃত্যু হবে তার।

প্রথম : কেন? কেন? [উদ্বিগ্ন]

চন্তাই : সে তো অধার্মিক, স্বেচ্ছাচারী।

দ্বিতীয় : ঠাকুর! ওকথা বলবেন না আর।

চন্তাই : কি! কথার ওপরে কথা! ম্লেচ্ছ! দুরাত্মা! বজ্রপাতে ধ্বংস হবি ত্রিপুরের সাথে।

তৃতীয় : ধ্বংস হই সেও ভাল। ছাড়বনা তাকে। এই রাজা ভালবেসেছেন আমাদের।

চন্তাই : [স্বগত] অভিশাপে হল নাকো কাজ। ধরি তবে নতুন কৌশল। [প্রকাশ্যে] ওরে শোন। আমিও যে ভালবাসি তারে। সেতো উদার। মহান। কিন্তু দৈববাণী শুনেছি যে নিজ কানে আসিবেন মহাদেব আমাদের দেশে সংহার করিতে ত্রিপুরেরে। কি যে করি! কীভাবে যে বাঁচাই তাকে! হায় শিব!

চতুর্থ : সত্য যদি হয়ে যায় দৈববাণী তবে আমরা যে হারাবো তাকে। হে ভগবান! রক্ষা কর। রক্ষা কর ত্রিপুর রাজারে।

প্রথম : হায় হায়। আমাদের কীযে হবে তবে।

চন্তাই : তাইতো বলি রে বাপ। ত্রিপুরের বল, যেন সে সম্মতি দেয় হোমাগ্নি জ্বালাতে প্রজাহিতে চিরজীবী হতে দৈববলে।

দ্বিতীয় : বলব।

তৃতীয় : হ্যাঁ হ্যাঁ বলবই বলব তাকে।

চতুর্থ : দল-বেঁধে আমরা রাজার কাছে যাব।

চন্তাই : চল তবে তোরা। রাজার সভায় চল।

সকলে : চলুন চন্তাই ঠাকুর! আগে চলুন। [চন্তাইয়ের নেতৃত্বে ওরা এগিয়ে চলে।]

[আলো নেভে]

**তৃতীয় অঙ্ক ।। প্রস্তাবনা দৃশ্য ।।**

পাগল মঞ্চে আসে। সিংহাসন রাখে। মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে নাচতে নাচতে। তারপর হঠাৎ থেমে—

পাগল : (সুর করে) আজিকে গাইবোগো মোরা ত্রিপুরার কথা।
ত্রিপুর নামে রাজা ছিল শুন সে বারতা।।
অচ্ছা, 'ত্রিপুর' নাম হইতে 'ত্রিপুরা' হইল, নাকি 'ত্রিপুরা' হইতে 'ত্রিপুর' হইল।
আপনারা কেউ কি বলিবার পারেন? [দাঁত বের করে হাসে] আমি পারি।
'ত্রিপুরা' কীভাবে হইল? 'তুই' আর 'প্রা' মিলিয়া 'তুইপ্রা' হইল। তিপ্রা ভাষায়
'তুই' হইল জল, পানি। আর 'প্রা' হইল ধার— জলের ধার। তুইপ্রা হইল
জল ঘিরা রাখিচে যেই দেশ।
বুঝিখাদা? বুঝিতে পারিল? ককবরক মানে তিপ্রা ভাষা দিয়া কইল আর কি।
'ত্রিপুর' এই দেশের মাটির সন্তান আছিল। এই কারণে সে ত্রিপুরার মানুষ 'কিরাত'
জাতিরে ভালবাসিত।
ইটাই তার অপরাধ। ইটার লাগিঐ তারে বধ করা হইছিল। কেটা বধ করিল?
এ্যাঁ? কেটা? উত্তর খুঁজেন। [হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নরধ্বজ এসেছে।] আরে
বিপদ! পালাই। পালাই। [দৌঁড়ে পালানো]

নরধ্বজ : হেঁ হেঁ বাবুমশায়রা। কি জানি বলে গেল সে। আপনারা কিছু মনে করবেন না।
[করজোড়ে এই কথা বলে প্রস্থান]
[চন্দ্রধ্বজ ও ত্রিশূলধ্বজ আসে। যথাস্থানে দাঁড়ায়। ত্রিপুরকে অনুসরণ করে
আসে মন্ত্রী। ত্রিপুর সিংহাসনে বসে।]

**তৃতীয় অঙ্ক ।। প্রথম দৃশ্য ।।**

রাজসভা (সিংহাসনে ত্রিপুর), ত্রিশূলধ্বজ, চন্দ্রধ্বজ ও বিদূষক যথাস্থানে। প্রজাদলের প্রবেশ ও দান। চন্তাই তাদের সম্মুখে।)

**গান**

জয় জয় মহাদেব, জয় ত্রিপুরারি। / ত্রিভূবন পালক ত্রিশূলধারী।।
অন্ধকাসুর বিনাশক, জয় ত্রিপুরারি। / ত্রিলোচন কৃত্তিবাস ত্রিলোক বিহারী।।
কিরাতগণ - জয় শিবশম্ভু! জয় জয় মহাদেব!
জয় জয় জয়! ত্রিবেগ রাজ্যের জয়! / জয় জয় জয়! ত্রিবেগ রাজ্যের জয়!

ত্রিপুর : কি সংবাদ ভাইসব।
কিরাত-১ : সংবাদ অশুভ।
কিরাত-২ : মহাদেব হয়েছেন রুষ্ট।
কিরাত-৩ : তাই আজ অনাবৃষ্টি।
বিদূষক : এ তোমাদের ভুল ধারণা। বৃষ্টি না হলেই মহাদেব রুষ্ট একথা সত্য নয়।

কিরাত-৪ : সৃষ্টি বুঝি যায় রসাতলে।

ত্রিপুর : কেন কেন? মহাদেব রুষ্ট কেন, বল?

কিরাত-১ : যাগ নেই, যজ্ঞ নেই দেশে।

কিরাত-২ : বলি নেই।

বিদূষক : এ ভুল ধারণা, এ মিথ্যে।

চন্তাই : স্তব্ধ হও।

ত্রিপুর : বলি চান তিনি?

চন্তাই : হ্যাঁ ত্রিপুর। বলি চান। স্বপ্নাদেশ করেছেন তিনি।

ত্রিপুর : অবিশ্বাস্য। সত্য হলে আমাকে বলুন তিনি এসে। (কিরাতেরা একে অপরের দিকে তাকায়।)

চন্তাই : রুদ্ররূপ ধরে যদি নামেন ধরায় শিব। তখন দেখবে তুমি কী ভীষণ রূপ তার। ভস্মীভূত হবে সব, জেনো।

ত্রিপুর : হয় হোক, দেখে যাব আমি। হে ঠাকুর! আমি চাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অলৌকিক স্বপ্নাদেশ, দৈববাণী - ছলের ছলনা।

বিদূষক : ঠিক ঠিক মোক্ষম জবাব দিয়েছেন মহারাজ।

চন্তাই : কী বললে? আমি ছল? মিথ্যাবাদী আমি?

ত্রিপুর : সত্যতা সূর্যের মত। যেমন বাতাস। শিবেরে আনুন এই রাজসভা মাঝে। (চন্তাই অপ্রস্তুত) (বিদূষকের হাসি)

কিরাত-১ : ঠিক কথা বলেছেন আমাদের রাজা।

কিরাত-২ : চন্তাই ঠাকুর। শিবেরে ডাকুন বসে করজোড়ে।

কিরাত-৩ : আসুন দেবতা সশরীরে।

ত্রিপুর : তখন পড়ব আমি তার পায়েতে লুটিয়ে।

চন্তাই : তাই হবে। আনব যে তাকে ডেকে আমি। তপস্যায় রত হব দেবাদিদেবের। হে ত্রিপুর! তার আগে দেখাবনা মুখ। (প্রস্থান)

কিরাতদল: জয়/জয়/জয়। ত্রিপুর রাজার জয়। (চরের প্রবেশ)

চর : হেরম্ব রাজের দূত সমাগত দ্বারে, মহারাজ।

ত্রিপুর : সসম্মানে নিয়ে এসো তাকে। (চরের প্রস্থান)
(স্বগত) হেরম্বরাজের দূত, এইক্ষণে কেন? (দূতের প্রবেশ)

দূত : সহস্র প্রণাম ত্রিবেগাধীপ, রাজেন্দ্র। এই পত্র হেরম্বরাজের।

ত্রিপুর : দেখি তবে। (দূত পত্র দেয় ত্রিপুরকে)
[পত্র পাঠ করে উত্তেজিত] এই বার্তা হেরম্বের? হয় আত্মসমর্পন, নয় যুদ্ধ?

জেনে যাও দূত। যুদ্ধ হবে। যাও চলে যাও তুমি এই বার্তা নিয়ে।

[দূতের প্রস্থান] [মন্ত্রীর ব্যস্ত হয়ে প্রবেশ]

মন্ত্রী : মহারাজ! মহারাজ ! বড় ভুল হল, যুদ্ধের ঘোষণা হল না তো ঠিক। হেরম্ব শক্তিধর। আমরা অপ্রস্তুত।

ত্রিপুর : কেন, কেন মন্ত্রী?

মন্ত্রী : সেনাপতি শয্যাশায়ী। কালজ্বর। সাতদিন ধরে। তদুপরি—

ত্রিপুর : কোনো কথা নয়। যুদ্ধ যত্রা হবে দ্রুত, যত দ্রুত করা যায়, ততই মঙ্গল।

কিরাত-১: আমরা প্রস্তুত।

কিরাত-২ : যুদ্ধ হোক শত্রু সাথে।

কিরাত-৩ : যুদ্ধলিপ্সা মেটাব হেরম্বর।

কিরাত-৪ : আমরা রক্ত দিয়ে তুলব পতাকা বিজয়ের।

ত্রিপুর : অভিযান হবে শুরু। করো আয়োজন অতিদ্রুত। দিকে দিকে সবে তৈরী হও।

কিরাতগণ: জয় জয় ত্রিবেগ রাজ্যের জয়। জয় ত্রিপুর রাজার জয়।

[মন্ত্রী বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ]

**তৃতীয় অঙ্ক ।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।**

[পাগল এসে সন্তর্পনে এদিক ওদিক তাকায়। ওর দুজন সঙ্গী এসে সিংহাসনটি সরিয়ে নেয় এবং কালো কাপড়ে ঢাকা তিনটি বাক্স রেখে যায়। এই ব্যবস্থাটি পাগল দেখে। ]

পাগল : ব্যস, ব্যস, হইছে যাও। আমি দুইখান কথা কইয়া আইতাছি। দেইখ্যো আবার ম্যানেজাররে কইয়া দিও না। [দর্শকদের দিকে] চলছে ষড়যন্ত্র। ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্ কানাকানি। শলা-পরামর্শ। কিভাবে ত্রিপুরেরে ধ্বংস করা যায়।
বেশি কথা কইয়া লাভ নাই। যাইগা। এইবার যদি নরধ্বজদা দেখে, একবারে বাইন্ধ্যা রাখবো গ্রীনরুমের ভিতরে। যাইগা। [প্রস্থান]

[গভীর রাত্রিতে অন্ধকার কক্ষে মন্ত্রী, চন্তাই ও সেনাপতি পরামর্শ করছে। কালো কাপড়ে তারা ঢেকে নিয়েছে নিজেদের]

মন্ত্রী : এখন হেরম্বরাজ সন্মত হয়েছেন।

সেনা : বিলক্ষণ!

চন্তাই : হেরম্ব যেন আর না করে কালক্ষেপ। উপযুক্ত সময় এখন।

সেনা : সব পাকা। শুরু হয়ে গেছে অভিযান।

মন্ত্রী : থাকতেন যদি হেরম্বের পুরো ভাগে স্বয়ং আপনি, উত্তম হত যে তবে।

সেনা : ভেবে দেখলাম মন্ত্রীবর। বৃত আছি আমি সেনাপতিপদে ত্রিবেগের দলে। এই দলে থেকে, সৈন্যগণে ভুলপথে ঠেলে দিয়ে, সংকটে ফেলব ত্রিপুরকে।

মন্ত্রী : উত্তম। উত্তম।

সেনা : এইরূপ পরামর্শ হেরম্বপতিরও।

মন্ত্রী : নাস্তিকটাকে ভুলাতে এখন ধরুন ছদ্মরোগ, কালাজ্বর। আমি তো বলেছি তাকে, আপনি আছেন বন্দি, রোগের শয্যায়।

সেনা : অতীব উত্তম।

চন্তাই : ওরা চায় দেবতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাই ছদ্মবেশ পরে যাব জনপদে, ভোলাব প্রজাকে। মাতিয়ে তুলব গিয়ে ধর্মের আবেগে। মহাদেব সেজে যাব কিরাতপাড়ায় রুদ্রসাজে।

সেনা : [ধূর্ত হাসি] আমরা তো নন্দী ভৃঙ্গী আপনার সাথী।

মন্ত্রী : রাত্রির প্রহর শেষ। চল এইক্ষণে পরে নিই যার যার ছলনার বেশ। ধর্ম-নামে যা কিছু করি সবই ধর্ম, সনাতন। আমি নটরাজ। রুদ্রনৃত্যে তুলি আমি প্রলয় হুঙ্কার।

সেনা : আমরা সাথী নন্দী ভৃঙ্গী।

মন্ত্রী : উঠেছে যে ত্রিলোকে আর্তি মহাশঙ্কার।

চন্তাই : বেজে চলে রুদ্ররবে ডমরু ডঙ্কার!

[নেপথ্যে ডমরুধ্বনি। দীপশিখা কাঁপতে থাকে।] চন্তাই নটরাজ শিবের ভঙ্গীতে দাঁড়ায়। দুইদিকে মন্ত্রী ও সেনাপতি—নন্দী ভৃঙ্গী হয়ে। পাগল এবং সঙ্গীরা এসে মোটা গাছের কাট-আউট রাখে।

[চন্তাই, মন্ত্রী ও সেনাপতির প্রবেশ মুখোশ পরে ]

পাগল : হেঁ হেঁ লাগাইছেন? ঠিক কইর‍্যা মুখোশ লাগাইছেন? আসল মুখটা দেখলে লোকে চিন্যা ফালাইব। মুখের থিক্যা মুখোশেই সুবিধা বেশি।

চন্তাই : [ধমক দেয়] ধ্যুৎ!

পাগল : [সচকিত হয়ে] মাগ্গো! কী তেজ! [চম্পট দেয় ]

চন্তাই : আমি ডমরু বাজালে গ্রামবাসীরা আসতে থাকবে। সব জড় হলে আমি শিঙা ফুঁকব। তারপর তোমরা ঘোষণা করবে যেমন বলে দিয়েছি।

মন্ত্রী ও সেনাপতি : আচ্ছা ঠাকুর।

(চন্তাই ডমরু বাজাতে থাকলে একে একে গ্রাবাসীরা ছুটে আসতে থাকে। ওরা এসে প্রত্যেকেই করজোড়ে দাঁড়ায়। লোক জড় হলে চন্তাই শিঙা ফুঁকে।)

নন্দী : যতেক ত্রিবেগবাসী হও সাবধান। (জোরে)

ভৃঙ্গী : মহাকাল মেতেছে রুদ্ররোষে আজি। প্রলয় ধ্বংস আসে ত্রিপুরের দোষে।
নন্দী : সবে বল তাকে প্রজার কল্যাণ তরে,
ভৃঙ্গী : সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে যেতে বনবাসে।
নন্দী : নাহলে যে যজ্ঞে যেন প্রায়শ্চিত্ত করে।
ভৃঙ্গী : যাগযজ্ঞ, নরবলি নিত্য হওয়া চাই।
নন্দী : দেবদ্বিজে ভক্তি যেন রাখে সে সদাই।
চন্তাই : চোখ বোজ। চোখ বোজ তোমরা সবাই।
[কিরাতগণ চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে। শির, নন্দী ও ভৃঙ্গীর অন্তর্ধান]
কিরাতগণ: [প্রার্থনার ভঙ্গীতে] রক্ষা কর মহাদেব পতিতপাবন। আমাদের রাজ্যকে রক্ষা কর ঈশ্বর!
প্রথম : [চোখ খুলে] আরে ভাই শিব করেছেন অন্তর্ধান।
সকলে : হায় হায়! কেন হলেন অদৃশ্য ত্রিমূর্তি?
প্রথম : চল ভাই সকলে রাজার কাছে যাই!
দ্বিতীয় : একি অমঙ্গল! একি অশুভ সংকেত!
তৃতীয় : হে শিবশম্ভু! দেবাদিদেব! রক্ষা কর।
[সকলে রক্ষা কর রক্ষা কর বলতে বলতে চলে যায়]

**তৃতীয় অঙ্ক ।। পঞ্চম দৃশ্য ।।**

রাজসভা

ত্রিপুর ও কিরাতগণ

ত্রিপুর : [অট্টহাসি] হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ এই দৃশ্য সচক্ষে দেখেছ?
কিরাত-১ : হ্যাঁ মহারাজ হ্যাঁ। নন্দীভৃঙ্গী সঙ্গে তার।
কিরাত-২ : তারা বললেন, রাজার পাপে রাজ্যের অমঙ্গল—
ত্রিপুর : কার পাপে?
কিরাত-৩ : তোমার।
ত্রিপুর : আমার? [কিরাতেরা নীরব। ত্রিপুর হেসে ওঠে] কি আমার অপরাধ?
কিরাত-৪ : তুমি অধার্মিক।
কিরাত-৩ : যজ্ঞে দিয়েছ বাঁধা। মানা করেছ বলি।
কিরাত-৪ : তাই নাকি হয় নাকো বৃষ্টি এই দেশে।
ত্রিপুর : শোন ভাই। বুদ্ধি এক এসেছে মাথায়। প্রয়োগ করব তাকে যুদ্ধ থেকে ফিরে।
কিরাত-১ : কি সে বুদ্ধি? রাজা!

ত্রিপুর : নদীবুকে দেব বাঁধ। যতজল সাগরে গড়ায় তাকে বেঁধে শস্যক্ষেত্রে বহাব যে তীরে। শূণ্যে চেয়ে হাহুতাশে প্রয়োজন নেই।

কিরাত-২ : অতীব কৌশল এক। তবু বৃষ্টি চাই।

কিরাত-৩ : বলি দিয়ে দেবতারে চাই তুষ্ট করা।

কিরাত-৪ : যজ্ঞ চায়, বলি চায় শিব।

কিরাত-১ : বলি তারে দিতে হরে রাজ্যের মঙ্গল চেয়ে, রাজা।

ত্রিপুর : রক্ত চায় শিব? মিথ্যা। মিথ্যা।

কিরাত-১ : শুনলাম নিজ কানে।

কিরাত-২ : নিজ চোখে দেখলাম সবে।

কিরাত-৩ : রাজা! শীঘ্র করুন যজ্ঞের আয়োজন।

কিরাত-৪ : নাহলে শিব, তোমাকে সংহার করবে।

ত্রিপুর : ওহো। পড়েছ তো সবে মিথ্যার কুহকে।

কিরাত-১ : মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয় রাজা। এতো সত্যি!

কিরাত-২ : তোমার জন্য যে বড় ভয় হয় রাজা।

কিরাত-৩ : আকাল আসছে ধেয়ে দুই ডানা মেলে।

কিরাত-৪ : তোমার্ পরে রুষ্ট হয়েছেন শিব।

সকলে : দাও আজ্ঞা। দিতে বলি। তাহার সন্তোষে।

কিরাত-১ : আজ্ঞা দাও।

ত্রিপুর : যজ্ঞ? যজ্ঞ চাই? বলি চাই? আমাকেই বলি দাও তবে এইক্ষণে শিবের সাক্ষাতে। কোথা শিব? ডাক তারে। প্রাণ দেব। প্রাণ দেব আমি তার পায়ে।

কিরাত-২ : একি হয় রাজা? প্রিয় তুমি আমাদের। প্রাণ দেব আমি।

কিরাত-৩ : দেব আমি।

কিরাত-৪ : দেব আমি।

ত্রিপুর : শোন্ তোরা। ওরে অবুঝের দল। বিদেশের সেনা আসে রাজ্য গ্রাস তরে। ফিরে যাও ফিরে যাও ঘরে। তৈরী হও যুদ্ধসাজে। যুদ্ধযাত্রা আগামী প্রত্যুষে। বলো সবে, "ত্রিবেগ রাজ্যের হোক জয় "।

কিরাতগণ : জয় জয় জয়। ত্রিবেগ রাজ্যের জয়। [ধ্বনি দিতে দিতে কিরাতদের প্রস্থান] প্রবেশ করে মন্ত্রী ও সেনাপতি

মন্ত্রী : জয়তু রাজন্!

সেনাপতি : জয় জয় মহারাজ!

ত্রিপুর : কোথায় ছিলেন আপনারা এতক্ষণ?

মন্ত্রী : আমরা বেরিয়েছি রাজ্য পরিদর্শনে।

ত্রিপুর : কাল হবে যুদ্ধ অভিযান মন্ত্রীবর।

সেনাপতি : আমি তৈরী মহারাজ।

ত্রিপুর : সুস্থ হয়েছেন সেনাপতি?

সেনাপতি : অসুস্থ এখনো। তাই বলি। কিছুদিন পরে যুদ্ধযাত্রা হলে—

ত্রিপুর : না না । কিছুতেই নয়। দেরি নয় একদিনও। আপনি থাকুন তবে গৃহমাঝে।

সেনাপতি : অসুস্থ আমি তবু জন্মভূমি রক্ষায় প্রাণ দিতে চাই মহারাজ। এ আমার ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।

ত্রিপুর : তাহলে থাকুন পশ্চদভাগ রক্ষায় কুকি সেনা নিয়ে। কিরাত সেনা নিয়ে আমি থাকি সামনে।

সেনাপতি : যথা আজ্ঞা রাজন্!

ত্রিপুর : মন্ত্রীবর থাকুন শাসনের দায়িত্বে, রাজ্যের সুরক্ষায়।

মন্ত্রী : নিশ্চিন্তে করুন যুদ্ধযাত্রা মহারাজ।

ত্রিপুর : দেখবেন প্রজাগণ যেন সুখে থাকে।

মন্ত্রী : মহারাজ ব্যত্যয় হবেনা তাতে কিছু।

ত্রিপুর : প্রার্থনা করুন যেন জয়ী হতে পারি।

মন্ত্রী, সেনা : এ প্রার্থনা আমাদের শয়নে স্বপনে মহারাজ!

ত্রিপুর : অতি উত্তম। অতি উত্তম। সম্পন্ন করুন দ্রুত যুদ্ধ আয়োজন।
[সেনাপতি ও মন্ত্রী নতমস্তকে] [ আলো নেভে।]

**তৃতীয় অঙ্ক ।। ষষ্ট দৃশ্য ।।**

অন্তঃপুর

(হীরাবতী মৌন হয়ে বসে আছে। পাশে পরিচারিকা) (ত্রিপুরের প্রবেশ)

ত্রিপুর : হীরাবতী! হীরাবতী! রানী! চললাম যুদ্ধ করতে। বিদায় দাও। আমাকে বিদায় দাও । রানী! হেরম্ব রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললাম, রানী!

পরিচারিকা: মহারাজ রানী মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন।

ত্রিপুর : কেন?

পরিচারিকা: তিনি শিবের আরাধনা করছেন।

ত্রিপুর : শিবের আরাধনা (বিশ্চয়)

পরিচারিকা: হ্যাঁ মহারাজ। রাজ্যের মঙ্গলের জন্যে, আপনার মঙ্গলের জন্যে।

ত্রিপুর : আমার মঙ্গলের জন্যে? হাঁ - হাঁ - হাঁ - হাঁ --
চললাম রানী। প্রর্থনা করো যেন জয়ী হয়ে ফিরে আসি।
(ত্রিপুরের প্রস্থান) (আলো নেভে)

## চতুর্থ অঙ্ক ।। প্রস্তাবনা দৃশ্য ।।

(চন্দ্র ও ত্রিশূল নাচতে নাচতে ঢোকে)

গান

চন্দ্র : ত্রিপুর রাজা চলিল।

ত্রিশূল : কিরাত বাহিনী নিয়ে ত্রিপুর রাজা চলিল।

চন্দ্র : ত্রিপুর রাজা চলিল।

ত্রিশূল : হেরম্বর রাজ্যলিপ্সা ঘুচাইতে চলিল।

চন্দ্র : ত্রিপুর রাজা চলিল।

(নরধ্বজ নাচতে নাচতে প্রবেশ করে)

নরধ্বজ : প্রবল বিক্রমে তারা পাহাড় ভেঙে চলিল।
দুর্গম বন্ধুর পথে পাহাড় ভেঙে চলিল।
সেনাপতি মন্ত্রীগণ পিছনেতে রহিল।
তিনমাথার ষড়যন্ত্র ঘনাইয়া উঠিল।
প্রতি চরণের পরে চন্দ্র ও ত্রিশূল এক সুরে গায়, ত্রিপুর রাজা চলিল।

সমস্বরে : হেরম্বের বনভূমে ত্রিপুরের সেনাগণে
আসুন এবার দেখি আমরা কেমন যুদ্ধ করিল।
"ত্রিপুর রাজা চলিল" বলতে বলতে ওরা চলে যায়।

[গান চলার সময়ে পাগল ও সঙ্গীরা কয়েকটি গাছের কাট-আউট ও পাহাড় চূড়ার কাট-আউট মঞ্চে রাখে। সঙ্গীরা চলে গেলে পাগল একা থাকে।]

পাগল : আজিকে করিব যুদ্ধ সর্বশক্তি দিয়া ।
বিদেশীর বিষদাঁত উপরি ফেলিব।
দিতে হয় দিব আমি এই তুচ্ছ প্রাণ।
মাতৃভূমি রক্ষা তরে —

[নরধ্বজের প্রবেশ। পাগল হঠাৎ থেমে যায়।]

নরধ্বজ : কিরে। থামলি কেন ? বল—

পাগল : দাদা । আমি যুদ্ধ করিব।

নর : এ্যাঁ ?

পাগল : হ, আমি ত্রিপুর রাজার দলে থাকিয়া যুদ্ধ করিব, হ।

নর : তাহলে যা, ঐত ত্রিপুর যুদ্ধযাত্রা করেছে । ঐ দলে দলে কিরাত সৈন্যরা ছুটে যাচ্ছে।

পাগল : ঠিক ত? তাহা হইলে চলিলাম।
[দৌঁড়ে যায়। নরধ্বজ দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে মৃদু হেসে চলে যায়।]

**চতুর্থ অঙ্ক ।। প্রথম দৃশ্য ।।**

যুদ্ধক্ষেত্র

হেরম্ববাহিনীর প্রবেশ

হেরম্ববাহিনীর ধ্বনি : জয় জয় জয়, হেরম্ব রাজ্যের জয়। (তিন বার) [প্রস্থান]
[ত্রিবেগ বাহিনীর প্রবেশ]

ত্রিবেগ বাহিনীর ধ্বনি : জয় জয় জয়, ত্রিবেগ রাজ্যের জয়। (তিন বার) [প্রস্থান]
[একা প্রবেশ করে ত্রিপুর খোলা তরবারি হাতে পিঠে তীর ধনুক ]

ত্রিপুর : একি! কুকিবাহিনী এখনো এলো না! তাহলে সেনাপতি গেল ভুলপথে। হেরম্বের সৈন্যদল দেখে মনে হয়, আমাদের বাহিনী সংখ্যায় হীনবল। তাহলে কি হার মেনে যেতে হবে ফিরে? না না। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে যাব। লোকাভাব পূর্ণ হবে দৃঢ় মনোবলে। সৈন্যগণ! এগিয়ে চল জোড় কদমে। উর্ধ্বে তুলে ধর মাতৃভুমির পতাকা। [নেপথ্যে— জয় ত্রিবেগ রাজ্যের জয়! ]
[সশস্ত্র হেরেম্বের প্রবেশ]

হেরেম্ব : দূরাচার! নাস্তিক! ত্রিপুর! এসেছিস? মরবার সখ দেখি খুব আছে তোর।

ত্রিপুর : মরবার সখ? কার? তোর না আমার? রে পিপীলিকা। ক'টি পাখা উঠেছে তোর? পাঠালি যুদ্ধের প্রস্তাব কোন সাহসে?

হেরম্ব : দেখ তবে, মরার পাখা কার উঠেছে!

ত্রিপুর : আয় দেখ।

হেরম্ব : হ্যাঁ দেখ্।

ত্রিপুর : দেখ তুই।

হেরম্ব : হ্যাঁ দেখ্।
যুদ্ধ চলে। পরাস্ত হেরম্বের দিকে উন্মুক্ত অসিহাতে ছুটে যায় ত্রিপুর।

ত্রিপুর : এই দেখ। লোভে পাপ। পাপে মৃত্যু। দেখ্।
[অসি বিঁধিয়ে দেয় ত্রিপুর হেরম্বের বুকে।]

হেরম্ব : আঃ! কিন্তু আমাকে মেরেও রক্ষা পবি না। মূঢ়! ঘরেই তোর রয়েছে বিভীষণ।
[হেরম্বের মৃত্যু]

ত্রিপুর : [স্বগত] কী বলে গেল? ঘরের ভেতরে শমন? হাঁ। ঘরের ভেতরে বাসা বেঁধেছে শত্রু। সত্য বটে তোমার কথা হেরম্বরাজ! শত্রুরূপে বন্ধু তুমি, অপ্রিয় হলেও বলে

গেলে সত্য কথা। এখন দেখবো বন্ধুরূপী শত্রু কারা। বন্ধুরূপী শত্রু কারা। [প্রস্থান]
[জয়ধ্বনি দিতে দিতে কিরাত বাহিনীর প্রবেশ ও মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে ত্রিপুরের অনুগমন] (আলো নেভে)

**চতুর্থ অঙ্ক ।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।**

[ দরবার কক্ষ ।। মন্ত্রী ও সেনাপতি ]

মন্ত্রী : হেরম্বের যুদ্ধে তবে পরাজয় হবে?

সেনা : সে তো সুনিশ্চিত। কেবল কিরাত সেনা নিয়ে যুদ্ধে জেতা অসম্ভব। কুকীদেরে পাঠিয়ে দিয়েছি মেখলি রাজ্যের দিকে। [ধূর্ত হাসি]

মন্ত্রী : আপনার এই চাল বড় সুচতুর। বিশ্বসের ঘরে তালা দিয়ে পিছনের খিড়কি পথে সব কিছু তুলে নেয়া। সুচতুর তস্করেও বুদ্ধিতে হারবে আপনার কাছে।

সেনা : এইবার অন্যকথা। মারামারি বাঁধে যদি কুকি ও কিরাতে, ত্রিপুরের শক্তিহানি নিশ্চয় ঘটবে।

মন্ত্রী : সেইমতো চালুনতো ঘুঁটিগুলো, দেখি, দাঙ্গা হাঙ্গামা বাঁধাতে কেমন দক্ষতা আপনার।

সেনা : সেই দীক্ষা মাতৃগর্ভে পেয়ে ধরায় নেমেছি আমি অভিমন্যু সম।

মন্ত্রী : শুভকাজে হাত দিন। দেরি নয় আর।

সেনা : গুরু। যেইমত অভিপ্রায় আপনার।

মন্ত্রী : উভয়ের গুরু সেই চন্তাই ঠাকুর শিবরূপে বিরাজ করছেন প্রাসাদে। হীরাবতী করজোড়ে ধ্যানেতে নিমগ্ন তার পদতলে। মনে হয় এলেন।
[প্রবেশ পথের দিকে তাকিয়ে]
আসুন আসুন, বিপ্রবর। সুপ্রভাত! [শিববেশী চন্তাই-এর প্রবেশ]

সেনা : আশীর্বাদ করুন ঠাকুর, অভাজনে। [উভয়ের প্রণাম]

চন্তাই : হেরম্বের বার্তা কিছু আসে নাই বুঝি?

সেনা : ভাবিতেছি সেই কথা আমরাও বসে। ঠাকুর! এঁটেছি বুদ্ধি এক।

চন্তাই : (উৎসাহিত) বলো বলো। কোন সে বুদ্ধি? দমন? বিভেদ? হনন?

মন্ত্রী : বিলক্ষণ! চন্তাই ঠাকুর! শাস্ত্রে বলে, "জ্ঞানীজন সর্বদেশে একরূপে ভাবে"। লাগাব বিদ্বেষ আজ কিরাতে-কুকিতে।

চন্তাই : ভেদবীজ বুনে দাও রাজ্যের ভূমিতে। বিভেদের কাঁটাগাছ ছড়াবে ত্রিবেগে, নির্মূল হবে না তা হাজার বছরে।

সেনা : তাহলে আগেই ছুটি কুকি মহল্লায়।

মন্ত্রী : বল গিয়ে, বংশ নাশ হলে কিরাতের, কুকির খুলবে ভাগ্য সকলের আগে।

চন্তাই : দিয়ো কিছু অস্ত্রশস্ত্র, উহাদের হাতে। বিদ্বেষ উথলে উঠে রক্তারক্তি হলে।

সেনা : তাই হবে রাজগুরু! চললাম তবে প্রজাদের কাছে। দেবতার মূর্তি ছুঁয়ে বলব তাদের, "বধ কর ভিন্ন জাতি, বাঁচবার পথ আর নাই কিছু ভবে"।

চন্তাই : তথাস্তু! তথাস্তু! কার্যসিদ্ধি হোক তব। লাগুক সংঘর্ষ আজ কিরাতে কুকিতে।

[ সেনাপতি যায়। পুরোহিত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে। মন্ত্রী হাত নেড়ে বিদায় জানায়]

আমি চলি অন্তঃপুরে রানীকে ভোলাতে।

মন্ত্রী : আপনি করুন অন্দরটাকে দখল, আমরা করি বাহিরটাকে লণ্ড ভন্ড। চলুক সাঁড়াশি অভিযান, পুনরায় বসাতে পেষণ-যন্ত্র পালনের নামে।

[ চন্তাই ও মন্ত্রী ক্রুরভাবে হাসতে থাকে ]

## চতুর্থ অঙ্ক ।। তৃতীয় দৃশ্য ।।

অন্ধকার রাত্রি। শোনা যায় শিশু ও নারীর আর্তচিৎকার। পলায়নরত জনতার কোলাহল। আবছা আলোতে সপরিবারে মানুষের পলায়নদৃশ্য। অগ্নিকাণ্ড। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সেনাপতি। তার দুপাশে দুটি মুখ মশালের আলোয় উদ্ভাসিত।

প্রথম : লাগিয়ে দিয়ে এলাম হুজুর। একটি ঘরও বাদ যায়নি।

সেনা : ঠিক করেছিস। এভাবেই জ্বালিয়ে দিবি কিরাতের ঘর।

দ্বিতীয় : কাল কোন পাড়ায় যেতে হবে হুজুর।

প্রথম : না না, কাল নয়, আজই।

সেনা : হাঁ, হাঁ, আজই। বিশ্রাম নয় এক মুহূর্তের জন্যেও।

প্রথম : ওরা বাঁচলেই আমাদের মৃত্যু। আর—

দ্বিতীয় : ওদের মৃত্যু মানেই আমাদের জীবন।

সেনা : বাঃ! বাঃ! চমৎকার! দারুণ বলেছিস। শিখেছিস বেশ তোরা সামান্য কদিনে। এবার যা। করে আয় আরো পাড়ায় নরকগুলজার। চৌদ্দ পুরুষ হবি স্বর্গবাসী তোরা স্বজাতি উদ্ধার করে। যা যা যা ওরে আগুন লাগা দিকে দিকে।

[ হাত দিয়ে ঠেলে দেয় দুই সাকরেদকে]

প্রথম ও দ্বিতীয় : হারে রেরে রেরে রেরে রেরে রেরে .......

[ মঞ্চে ঘুরতে ঘুরতে চীৎকার করতে করতে চলে যায়। সেনাপতির মুখটি দেখা যেতে থাকে। চারদিকে আবার শোরগোল, আর্তি,কান্না আরও তীব্রভাবে বাড়তে থাকে]

### চতুর্থ অঙ্ক ।। চতুর্থ দৃশ্য

দরবার কক্ষ ।। মন্ত্রী ও সেনাপতি

মন্ত্রী : কুকিগণ উত্তেজিত হয়েছে ত ঠিক?

সেনা : তাতে কিছু অবকাশ নাই সন্দেহের। এদিকে কিরাত ছেলেরা উঠেছে ক্ষেপে আমার কথায়; যখন বলেছি ক্রুদ্ধ কুকিরা আসছে ছুটে কিরাত পাড়ায় হত্যার নেশায়। অমনি ছুটল তারা বল্লম হাতে, বিঁধে মারতে কুকিদের।

মন্ত্রী : (উল্লসিত) কুকি কিছু বধ হলে, খেপবে ওরাও?

সেনা : হাঁ

মন্ত্রী : মহাক্রোধে ছুটে গেল কিরাত পাড়ায় দলে বলে, লাগাতে আগুন ঘরে ঘরে? আঃ! কি আনন্দ! আগুনেই দেখি বাঁচাবে![হাসি]

সেনা : হাঁ।

মন্ত্রী : ত্রিপুরের হার হবে একথা নিশ্চিত। ত্রিবেগের সিংহাসন হবে হেরম্বের। তখন কিরাতদের তাড়াবই বনে।

[ নেপথ্যে নাকাড়া ও জয়ধ্বনি ]

জয়ধ্বনি: জয় হেরম্ব বিজয়ী ত্রিবেগাধীপ মহারাজ ত্রিপুরের জয়!

মন্ত্রী : একি! কিরাত সেনারা ফিরে এল নাকি? [স্বগত]

[চরের প্রবেশ]

চর : মহারাজ ত্রিপুর সদলে আসছেন হেরম্ব বিজয় করে, সভাসদ্‌গণ! [প্রস্থান]

সেনা : এযে অঘটন ঘটে গেল পৃথিবীতে মন্ত্রীবর! এখন বিপদ মহাঘোর। কিভাবে যে বাঁচি ত্রিপুরের রোষ থেকে!

মন্ত্রী : ভেবো নাতো সেনাপতি। হবে যে উপায়। এসো আমরাও জয়ধ্বনি তুলি তার নামে। ....... জয় জয় ত্রিপুর ত্রিবেগ অধীশ্বর!

সেনা : জয় জয় হেরম্ব বিজয়ী মহাবীর! [কম্পমান] সামনে এগোয়। সদলে ত্রিপুর প্রবেশ করে।

ত্রিপুর : বল সবে ত্রিবেগের জয়।

সকলে : জয় জয়!

ত্রিপুর : বন্ধুগণ! হেরম্ব জয়ের অবসানে প্রতিবেশী সব রাজ্য করে নেব জয়। তার আগে দেখে নেব ঘরভেদী কারা। বিভীষণ রূপে আছে কারা।

সেনা : জয় জয় হেরম্ববিজয়ী মহাবীর!

ত্রিপুর : রণাঙ্গাণ ছেড়ে দিয়ে কুকিসেনা নিয়ে কোনদিকে সরেছিলে?

সেনা : ভীষণ অবাধ্য কুকিদল মহারাজ। যতবার বলি ‘আগে চল্’, ততবার চলে আসে

পিছে। অবশেষে করে বসে পৃষ্ঠ প্রদর্শন। তাদের সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আজই ফিরেছি আমি রাজধানী মাঝে।

ত্রিপুর : তোমার বিবৃতি শুনে কষ্ট পাই বড়, কথা সত্য হলে কুকি হবে রাজ্যছাড়া। মন্ত্রীবর! কেমন অবস্থা রাজত্বের?

মন্ত্রী : চারিদিকে ঘোর অমঙ্গল, গৃহযুদ্ধ। একদিকে অনাবৃষ্টি, আকালের ধ্বনি; অন্যদিকে রক্তপাত কিরাতে কুকিতে।

ত্রিপুর : মহা সর্বনাশ ঘনিয়েছে রাজ্যমাঝে। কি করেছেন আপনি শান্তিরক্ষা তরে?

মন্ত্রী : যথাসাধ্য তো করেছি। কতবার গেছি নিভাতে বিরোধানল। কতবার গিয়ে ওদের পল্লীতে দিয়েছি প্রীতির বাণী। নাহি শোনে কথা। বন্যজাতি জনগণ বারবার ওঠে মেতে রক্ত লালসায়।

ত্রিপুর : অবিশ্বাস্য! কেন তারা মারমুখী হবে?

সেনা : তাদের অন্তরে বহু হিংসা নৃপবর।

ত্রিপুর : থামুন! থামুন! অবিশাস্য এই কথা!

(চরের প্রবেশ)

চর : মহারাজ! মহারাজ!
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ত্রিপুর : কীহেতু সন্ত্রস্ত অনুচর? বাক্যহারা? ভয়ে আর্ত তুমি?

চর : কিরাত পল্লীতে প্রলয়ের অগ্নিশিখা, আগুন ছড়িয়ে গেছে সমস্ত পাহাড়ে।

কিরাত-১ : কুকিগণ লাগিয়েছে এমন দুর্যোগ । [উত্তেজিত]

কিরাত-২ : আত্মীয়েরে মেরে ফেলে কুকিগণ এসে। [উত্তেজিত]

কিরাত-৩ : নিতে হবে নির্মম নিষ্ঠুর প্রতিশোধ।

কিরাত-৪ : চলগিয়ে বংশহীন করি কুকি জাতে।

ত্রিপুর : শান্ত হও, বন্ধুগণ, শান্ত হও সবে। চল আগে আগুন নেবাই সবে মিলে।

কিরাত-১ : না রাজা! আগে আমরা মারব কুকিরে। (ছুটে যায়)

কিরাত-২ : অস্ত্র হাতে ছোটো সবে কুকির পল্লীতে। (ছুটে যায়)

কিরাত-৩ : যুদ্ধের কুঠারে আজ কাটব কুকিরে। (ছুটে যায়)

কিরাত-৪ : মাটিরে ভাসাব আজ রক্তের বন্যায়। (ছুটে যায)

ত্রিপুর : একি সংকট! ঘোর সংকট! ভ্রাতৃঘাত প্রলয়ের রূপে সমাসন্ন। যাই তবে কিরাত পাড়াতে আগে আগুন নেভাতে। (যেতে উদ্যত)
প্রবেশ পথে শিববেশী চন্তাইয়ের আবির্ভাব।

চন্তাই : একাকী পেয়েছি আজ কুলাঙ্গার তোরে! (ত্রিশূল উদ্যত)

ত্রিপুর : কে তুমি দেবের বেশে অশান্তির দূত? (তরবারি উন্মোচন)

সেনা : এসেছে শমন তোমার দর্প ঘোচাতে। [মন্ত্রী ও সেনাপতির অসি উন্মোচন]

ত্রিপুর : এই বুঝি তোমাদের রূপ, বিশ্বাসঘাতক? মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নরেরে ছলনা? তবে দেখ প্রবঞ্চনার কিবা পরিণাম।
[ তরোবারি নিয়ে প্রতিশোধ। কিছুক্ষণ লড়াই চলে। তিন শক্তির মিলিত আক্রমণে নিহত হয় ত্রিপুর।]

ত্রিপুর : হায়! ষড়যন্ত্রে হত আমি অভিমন্যু। হিংসা যে প্রবল বড় অহিংসার চেয়ে। সত্যের কণ্ঠ চেপে ধরে অসত্যের রাশি তবু সত্য জয়ী হবে। জয়ী হবে প্রেম।
(চন্তাই, মন্ত্রী ও সেনাপতির পালাক্রমে ও একত্রে অট্টহাসি। ত্রিপুরের মৃত্যু।)

বিদূষক : কিরাত পাড়ায় হায় লেগেছে আগুন। একই আগুনে পোড়ে কুকিদের ঘর। এলেম তাইতো ছুটে রাজার সকাশে। একি? সিংহাসনে রাজা নাই? তিনি কোথায়? (মন্ত্রী ও সেনাপতিদের অট্টহাসি)

মন্ত্রী : একা একা কীসের সন্ধানে বিদূষক?

বিদূষক : শান্তি খুঁজি মন্ত্রীবর, কোথা নাহি পাই। রাজা কোথা? কোথা ত্রিপুর?

সেনাপতি : ওই দেখুন, আপনার প্রিয়পাত্র শমনের কোলে।

বিদূষক : [নিহত ত্রিপুরকে দেখে] তোমরা মেরেছ তাকে বিশ্বাসঘাতক! ওই সিংহাসনে কাকে দেখি?

মন্ত্রী : মহাদেব।

সেনাপতি : রুদ্রবেশে আবির্ভূত।

বিদূষক : মিথ্যা! এ ছলনা!

সেনাপতি : [ বিদূষককে আঘাত করে] তবে মর তুই!

বিদূষক : আঃ! আঃ! হায় ভগবান! তোমার পৃথিবী ভরে গেছে শয়তানে। [মৃত্যু]
[ ত্রয়ীর অট্টহাসি ]

চন্তাই : নিষ্কন্টক হল রাজসভা। এইবার সুদৃঢ় কর সুরক্ষা বলয় অচিরে। অনার্য কিরাত যেন না পারে ঢুকিতে।

মন্ত্রী : তাই হবে মহাত্মন!

সেনাপতি : অবশ্যই হবে।
[ হীরাবতীর প্রবেশ। পিছে পিছে পরিচারিকা।]

হীরাবতী : (দূরে থেকে) রাজা! রাজা! (উন্মাদিনীর মত)
রাজা কোথায়? রাজা কোথায়? শুনলাম মহারাজ ফিরেছে দেশ জয় করে, হঠাৎ কেন স্তব্ধ হল জয় ধ্বনি।

পরিচারিকা: রানীমা! শান্ত হোন রানীমা, আমি যে তার চিৎকার শুনেছি! রানীমা!

হীরাবতী : একি ! একি ! একি দেখি ! দেবাদিদেব ! রাজা ! রাজা ! কথা বল রাজা ! কথা বল। (কান্নায় ভেঙে পড়ে রানীকে সামলাতে গিয়ে পরিচারিকাও কাঁদে নিঃশব্দে।)

চন্তাই : কথা আর বলবে না সে। ত্রিবেগ থেকে দূর হল অধর্মের বিষবৃক্ষ আজি।
প্রতিষ্ঠিত হবে পুনঃ ধর্মের শাসন এই আর্য ভূমিতে।
আর্য হোমাগ্নিতে পূত পবিত্র হবে চন্দ্রবংশের ধারা,
তোমর গর্ভের সন্তান হবে সুখ্যাত ত্রিলোচন নামে।
যে নাম আমার। ওঠো বৎসে, বৃথা কান্না, আর তো ফিরবে না জীবন তাহার,
যে গেছে অমর্ত্যলোকে। ওঠো মাগো ওঠো। বৈধব্যের বেশ ধারণ করো।

হীরাবতী : না, তোমাকে মানি না আমি।

চন্তাই : আমি শিব, বিশ্বনিয়ন্তা।

হীরাবতী : না তুমি শিব নও ! প্রতারক।

চন্তাই : করো এবে মৃতের সৎকার। ধর্মকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাক পুত্র জন্ম তরে।

হীরাবতী : না, না, না। (হারাবতীর কান্না)

চন্তাই : ওকে নিয়ে যাও অন্তঃপুরে। (আলো নেভে)

**চতুর্থ অঙ্ক ।। পঞ্চম দৃশ্য ।।**

গ্রামের পথ

[ পাগল এসে গাছের কাট-আউট রাখে।]

পাগল : ত্রিপুরকে মেরে শিব নিজের হাতে তুলে নিলেন ত্রিপুরার শাসনভার।
ত্রিপুরের পুত্র ত্রিলোচন তখন মাতৃগর্ভে।

নরধ্বজ : হুঁ! যত পাগলের কথাবার্তা হুঁ।

পাগল : (এদিক ওদিক তাকিয়ে দেয় দৌঁড়।)
গ্রামের পথে
[ নেপথ্যে শোরগোল, আর্ত চিৎকার, ছুটতে ছুটতে আসে কিরাতেরা একে একে। কিরাত-১ - এসে হাঁফাতে থাকে, হাতে বোচকা। ২ নং আসে।]

কিরাত-১ : উঃ ! মহা বিপদ !

কিরাত-২ : প্রাণ নিয়ে বুঝি পালাতে পারব না।

কিরাত-১ : মেয়েগুলোকে নিয়ে হল ঝামেলা।

কিরাত-২ : শুধু মেয়েগুলো নাকি ? বাচ্চা আর বুড়োগুলো ?
৩নং আসে দৌঁড়তে দৌঁড়তে।

কিরাত-৩ : আরে থামলে কেন? রাজার লোক যে এসে পড়বে।
কিরাত-১ : কী করব ভাই। ওরা যে কেবল পিছিয়ে পড়ে।
কিরাত-৩ : পড়লে পড়ুক চল। জান হাতে নিয়ে চল।
কিরাত-২ : দাঁড়া না ভাই। একটু দম নিয়ে নিই।
কিরাত-৩ : দম নিতে হলে একেবারে যূপকাঠে গলা দিয়েই নিতে হবে। স্বয়ং শিবের শাসন। আর রক্ষে নেই।
কিরাত-১ : শিবের শাসন না ছাই।
কিরাত-২ : শিব হলে আমাদের মারত নাকি?
কিরাত-: : ধরে ধরে নিয়ে ছাগলের মত বলি দিচ্ছে।
কিরাত-৩ : হায় হায়! কি ভুলটাই না করেছিলাম আমরা।
কিরাত-২ : রাগে অন্ধ হয়ে ছুট দিয়েছিলাম আমরা কুকিদের মারতে। ত্রিপুরের মানা শুনিনি।
কিরাত-১ : ওকে আমরা একলা ফেলে চলে গিয়েছিলাম—
কিরাত-২ : আমাদের সর্বনাশ হলো।
কিরাত-১ : আরে, ও কে ছুটে আসছে? গা বেয়ে রক্ত ঝরছে তার।
কিরাত-৩ : এতো আমাদের উছম সর্দার! (৪নং ছুটতে ছুটতে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে)
কিরাত-১ : একি হল উছম ভাই?
কিরাত-২ : উছম ভাই কী হল তোমার?
কিরাত-৪ : ভাই আমি আর বাঁচব না। তোরা চলে যা। ঐ আসছে! রাজার সৈন্য বাহিনী! ধরতে না পারলে ওরা তীর ছুঁড়ে, বল্লম ছুঁড়ে প্রাণে মেরে ফেলবে। হায়। মুক্তি আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের মুক্তি আমরা রাখতে পারলুম না, এযে আমাদেরই ভুল। আমাদেরই ভুল! যা ভাই চলে যা। আরও গভীর বনে চলে যা।
কিরাত-১ : তুই যাবি নে?
কিরাত-৪ : আমি যাচ্ছি। আমি সেই দেশে যাচ্ছি যে দেশে ত্রিপুর গেছে। ত্রিপুর! ত্রিপুর! আমি আসছি ত্রিপুর।
কিরাত-১,২,৩ : উছম!! [ কিরাত-৪ এর মৃত্যু ] [ ওরা স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে ]

**।। উপসংহার ।।**

[ গড়িয়া নৃত্যের সঙ্গাতে নাচতে নাচতে প্রবেশ করে চন্দ্রধ্বজ, ত্রিশূলধ্বজ ও নরধ্বজ ]

চন্দ্র : ত্রিপুরের বধ করে শিব ত্রিনয়ন।
ত্রিশূল : হীরাবতী পায় পুত্র নাম ত্রিলোচন।

নর : ত্রিবেগে আসিয়া শিব মারে ত্রিপুরেরে।
ত্রিশূল : ত্রিলোচন জন্ম নেয় মহাদেব বরে।
চন্দ্র : শিবের সাক্ষাতে সে বাড়ে দিনে দিনে।
নর : সাবালক হলে সেতো বসে সিংহাসনে।।
চন্দ্র : তারপরেতে মহাদেব করেন অন্তর্ধান।
ত্রিশূল : রাজবংশ শিবঅংশ ইহার প্রমান।। ( থামে )
[ পাগলের প্রবেশ]
পাগল : এই না না থামলে চলত না। চালাও নাটক আরও হইব।
নর : এই পাগলা লাম। নাটক শেষ হইছে, লাম।
পাগল : না এইখানে শেষ হইতে পারত না।
নর : আরে মহা মুস্কিল হইছে—
পাগল : তুমি মানুষের জয় দেখাইছনি?
নর : কেমনে দেখাইমু?
পাগল : দেখান লাগব। মানুষেরে জিতাইতে হইব, অত্যাচারীর পরাজয় দেখাইতে হইব।
নর : আরে পাগল এইটা কি সম্ভব? ত্রিপুর রাজা আছিল তিন হাজার বছর আগে। মহাভারতের যুগে। তখন জয় হইছে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের, আর গরীব বনবাসী অনার্য-প্রজাদের হইছে পরাজয়।
পাগল : না, এইটা মানতাম না। মানুষের জয় দেখাও।
নর : তখনও ত হইছে না মানুষের জয়।
পাগল : একদিন ত হইব।
নর : কবে হইব ঠিক নাই ত। অখন সর। ড্রপ্‌সিন পড়তে দে।
পাগল : না দিতাম না। ড্রপ্‌সিন পড়তে দিতাম না। যতদিন আমরার জয় না হইব ততদিন নাটক বন্ধ হইত না। যুদ্ধ চলুক। চলুক যুদ্ধ।
ড্রপ্‌সিন ঘনিষ্ঠ হতে থাকলে পাগল ছুটে গিয়ে ধরে রাখতে চায়। কয়েকজন মিলে ওকে জোর করে নিয়ে যেতে থাকে,
পাগল : না না । সিন্ পড়ত না। পড়ত না! পড়ত না! [চিৎকার ]
গড়িয়া নৃত্যের বাজনার তালে তালে যবনিকা ঘনিষ্ঠ হতে থাকে।
চন্দ্র, ত্রিশূল ও নরধ্বজ দর্শকদের অভিবাদন জানায়।

লেখক : **শ্রী কমল রায়চৌধুরী**, ত্রিপুরার প্রখ্যাত নাটককার।

## একক কথানাট্য

# পাবলিক

### দেবেশ ঠাকুর

পাবলিক।। আমার সামনে যে চারখানি বোতল দেখছেন তার একটি খালি। যেটি খালি, বিকেল থেকে নানা ধরনের আলাপ শুনতে শুনতে ঢুকু ঢুকু করেছি ছোলা বাদাম মুড়ি এটা সেটা দিয়ে। মিথ্যে বলব না। সাত পেগ গিলেছি। প্রতি পেগের চুমুকে রামধনুর মতো সুযুম্নাতে আশ্চর্য খেলা করে গেছে। ভুল বললাম। সাত নাম্বারটি হাতে ধরা। ষড় রিপু হজম হয়ে গেছে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ মদ মাৎসর্য মাত করে দিচ্ছে ইডেন গার্ডেন। চার আর ছয় এর ঝংকার শুনতে পাচ্ছেন? আমার পাঁজর এখন হারমোনিয়ামের রিড। কখনো ইমন বাজছে, কখনো পূরবী, শুধু দরবারী বাজতে বাকি। রাত কাবার। বাত কাবার। বাকি যে তিনটি বোতল আছে, লক্ষ্য করে দেখুন তাদের তিনটি আলাদা আলাদা রঙ। ভিতরের রঙ কেমন জানি না। বোতলের রঙ নীল লাল হলুদ। আমার উপর চাপ আছে, যে কোনো একটা গিলতে হবে। বাংলা না ইংরেজি জানি না। একটাই গিলতে হবে। ছোটবেলা থেকেই বোতল ধরেছি। বাপ ছেড়ে গেছে। মা মরে গেছে। মাতৃদুগ্ধ মাতৃভাষা হয়ে উঠল না। ফিডিং বোতলে চোলাই ভরে প্রথম খাইয়েছিল শ্যামাপদ সামুই।

এই একটি মানুষ। আহা। যার কোন জেরক্স হয় না। আর একটা স্যাম্পেল হয় না। ভেরি সিম্পল লোক। গুরুজনদের মুখে শুনেছি, ভগবান ছাঁচে মানুষ গড়েন। শ্যামাদাকে গড়ার পর ছাঁচটা ভেঙে দিয়েছিলেন। উনি আমার প্রথম গুরু। আমার গোঁসাই। আমার গোবিন্দ। মা নাকি ছোটবেলাতে নাম দিয়েছিল, পাবলো। শ্যামাদা নাম বদলে দিয়ে বললেন, এ সব নামের মর্ম এদেশে কেউ বুঝবে না। মায়েরটাও থাক আমারটাও থাক। তোর নাম দিলাম "পাবলিক"।

শ্যামাদা বলেছিল, পাবলিকের আগা নেই গোঁড়া নেই, গোঁড়ামিও নেই। পাবলিক মানে কিছুই নয়। আবার পাবলিক মানে বিশাল কিছু। আছে আবার নেই। পাবলিকের জাত নেই। ধর্ম নেই। নির্দিষ্ট কোন কর্ম নেই। যেদিকে ডগা ভারী, সেদিকেই গৌড়হরি। পাবলিক চলে না। জলের স্রোত পাবলিককে চালায়। বানের জলে যেমন খড়কুটো হাদি ভেসে চলে যায়, পাবলিকও তাই। পাবলিক কপালে তিলক দেয়। মাথায় টুপি পড়ে। সংক্রান্তিতে পিঠে খায়। বড়দিনে কেক খায়। ঈদে সিমাই।

শ্যামাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, পাবলিক কথার মানে কি?

—পাবলিক মানে পাবলিক। বিদেশে মাল খাওয়ার জায়গাকে বলে 'পাব'। যেসব লোক

বেগড়বাই করে তাদের 'পাব' এ ধরে নিয়ে যাও দিয়ে 'লিক' করে দাও। প্রতিবাদের যেটুকু হাওয়া ছিল, সব ফুস করে বেরিয়ে যাবে।

আহা মধু মধু। এই না হলে শ্যামাদা। সাইক্লোন এর মত জ্ঞান। এনসাইক্লোপিডিয়া। জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই যে সব পার্টি, কংগ্রেস পার্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি .... এসবের মানে কি?

— কম গ্রেস মার্ক দিয়ে পাস করে যারা টিকে থাকে তারা কংগ্রেস। কম্যুনিস্ট পার্টির সরকারে, মানে ফ্রন্টে, অনেকগুলো দল ছিল না? কম করে ঊনিশটি পার্টি। বলতে পারিস, কম অনিষ্ট করে যে পার্টি।

পাবলিক জানে, সবচাইতে শক্তিশালী কে? কে বলুন তো? সবচেয়ে বেশী অনিষ্ট বা ক্ষতি করতে পারে যে। প্রফেসার, এরোপ্লেনের ড্রাইভার, ভালো মানুষ এদেরকে কেউ গ্রাহ্য করে না। এদের কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু মুনিসিপালিটির যে লোকটা মাপ জোক করে তাকে খুব ভয়। রেগে গেলে বা খুশি না হলে ফিতে ধরে বলবে, বাড়িটা সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এগিয়ে গেছে। সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি থাম ভাঙতে হলে গোটা বাড়িই যে ভাঙ্গা পড়ে!

পুলিশ ভালো কাজ করবে মনে করলে খুব ভালো। যদি রেগে যায় রুমাল হয়ে যাবে বিড়াল। পকেটে ছিল দুটো জিভে গজা। সেকেন্ডে হয়ে যাবে গাঁজার পুড়িয়া। নারী আর নারকটিকস দুটি কেসই ভয়ানক। রড গরম করে পিছনে ভরে দেওয়া। ঠাণ্ডা দিকটা ভরে। কিন্তু বার করার উপায় নেই। হাত দিয়ে বার করতে গেলেই ছ্যাঁকা। শ্যামাদা এসব কথা শিখিয়েছে। শ্যামাদা কোন পার্টির? শ্যামাদাকে নিয়েই তো গান আছে:

" শ্যামা কখনো শ্বেত কখনো পীত
কখনো নিল লোহিত রে"....

ভাবছেন, ছয় পেগ টেনে ভুল বকছি। ধুর। গোটা খালাসিটোলা গিলে ফেললে আমার পা টলে না। পেটে কিছু না পড়লেই বরং টলে। চোখে অন্ধকার দেখি। সূর্যের তাপে গা পুড়ে যায়। শীতে জ্বর। পেট ভর্তি থাকলে জোয়ার আসে। জনসমুদ্রে জোয়ার অসে। হৃদয়ে চড়া পড়ে। তাড়াতাড়ি করলে চলে না। তারিয়ে তারিয়ে খেতে হয়। এক এক পেগে রঙ এক এক রকম। প্রথমে রাগ, তারপর অনুরাগ, তারপর প্রবল বাসনা, তারপর হতাশা, তারপর দার্শনিক বোধ। সবশেষে বৈরাগ্য। মনে হয়, সারা পৃথিবী জলমগ্ন। পৃথিবীতে- কিছুই নেই বিশ্ব চরাচরে। আমি নারায়ণ হয়ে মানকচু পাতায় জলে ভাসছি। ভেসেই চলেছি।

শ্যামাদা বলেছিলেন, ভাসাটাই সত্যি রে, পাবলিক। ভাসবি আর হাসবি। ভাষা ব্যবহার করবি নে। ভাষা হচ্ছে গুলতির বাঁটুল, হাত থেকে বেরিয়ে গেল আবার নারায়ণবাবুর মত জলে ভাসতে হবে।

আমার যা কিছু পড়াশোনা, সব শ্যামাদার কাছে। বাকিটা সামাদের কাছে, কেউ কেউ বলে শ্যামাদা আর সামাদ একই ব্যক্তি। পৈতে আর টুপির হেরফের।

— বুঝলি পাবলিক, সবাই বলে সান রাইজেস ইন দা ইস্ট। তুই বলবি না। বলবি ইন দা ওয়েস্ট। দেখবি বাকি পাবলিক খাচ্ছে। আসল কাজ হল, খাওয়ানো। যা খাওয়াবি, লোকে তাই খাবে। কোথায় কি ফিট করছে সেটা দেখা। বস্তাপচা গান খাবে। পচা সিনেমা খাবে। পচা থিয়েটার খাবে। পচা বক্তৃতা খাবে। পচা নেতা খাবে। নেতার যাত্রাপালার এ্যাক্টিং খাবে। হাসতে হাসতে কান্নার ফোঁটায় পান্না দেখবি।

আমি বললুম, নেতা কি খাওয়া যায়?

— নিশ্চয়ই খাওয়া যায়। শ্যামাদা বললে রেগেমেগে। হাতে একটা রামদা তুলে, দেখিস নি, আমাদের লেবা, ওই যে রে নিবারণ, জীবনের কোন পরীক্ষায় পাস করে নাই, পঞ্চায়েতের কেউকেটা। দরখাস্ত পড়তে পারে না। স্টাম্প মারে আর সই করে, বিবরণ সত্য নিবারণ দত্ত। তাকে খাচ্ছে না পাবলিক? নিবারণও দুহাতে খাচ্ছে। কেউ বারণ করে? তুমিও খাও আমিও খাই। দুধের সর খাও। যত পারো খাও। তবে হ্যাঁ, গোঁপে যেন সরের দাগ লেগে না থাকে। চুরি করে সরকারের সর খাও। গোঁপে লাগা চলবে না। সুকুমার রায়ের একটা গল্প আছে এই নিয়ে, সর খেতে গোঁপে লেগে পাবলিকের ক্যালানি- ওই যে গোঁপচুরি না কী--

ক্যালানি বহুবার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছি। বেছে খেয়েছি তো! শ্যামাদাই শিখিয়েছে, করে খাও। খেয়ে করো। কেউ যেন বুঝতে না পারে তুমি কার সঙ্গে আছো। সবার সঙ্গেই আছো। কিন্তু কারো সঙ্গে নেই। এই হল পাবলিক। লিক্ করে গেলেই গয়া। ক্লিক করে গেলেই নেতা।

শ্যামাদা বলতেন, পাবলিকের কিন্তু মানুষ হলে চলবে না। পাবলিক মানে পাবলিক। মানুষ ভীষণ হারামি। মানুষ মানেই ভোটার নাগরিক ডাক্তার মাস্টার বেকার ব্যবসাদার। পাবলিক এসব কিছুই না। প্রতিবাদ করে মানুষ। ক্যালানি খায়। বাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়। পাবলিকের এসব সমস্যা থাকে না। হ্যাঁ -তে হ্যাঁ, না-তে না। মানুষের নাকি অনেক ডাইমেনশন আছে। থ্রি ডাইমেনশন। ফোর ডাইমেনশন। পাবলিক কিন্তু গোল। নিজে চলবে না। গড়িয়ে দাও। ঠিক চলতে থাকবে। ঢালু পেলেই গড়াবে।

জ্ঞানের ভাণ্ডার শ্যামাদা। বিটিশ যুগের লোক কিনা। আমি দেখেছি, বিটিশ যুগের লোকের অনেক বুদ্ধি।

—জানিস পাবলিক, তখন লালেদের সঙ্গে ছিলাম। ভাগাভাগি হয়নি। দায়িত্ব দিয়েছিল, জোলা-মুসলমান পাড়ায় আর বাউরি পাড়ায় সংগঠন করতে। কিছুতেই বোঝানো যায় না। মুসলিম পাড়ায় স্লোগান শেখালাম, ইন খিলাপ। জিন্না বাদ। আমি বলবো ইনখিলাফ, তোমরা বলবে জিন্নাবাদ। খিলাফতি ব্যাপার কি না, তাই আমাদের জিন্নাকে দরকার, জিন্নাবাদ মানে জিন্নার মতবাদ। বাউরি পাড়ায় বললাম, জিন্নাবাদ। কেটে কেটে উচ্চারণ করলাম, জিন্নাকে বাদ দিতে হবে, আমার পিছনে শত শত পাবলিকের লাইন। পাবলিককে যা খাওয়াবে

তাই খাবে। খাওয়ানোর কায়দা রপ্ত করতে হবে। টুপি খেলে টুপি, হিজাব খেলে হিজাব, পৈতে খেলে পইতে, হনুমান খেলে হনুমান। যেখানে রাম খাবে সেখানে যদি চোলাই নিয়ে হাজির হোস একুল ওকুল দুকুল যাবে। হোস পাইপ দিয়ে পাছায় জল ঢুকিয়ে দেবে, চিন খেলে চিনি। পাবলিককে কোথাও বলে আম্ জনতা। আমের চুসি ভুসি চুমরি শেষ পর্যন্ত খেতে হবে। বহু পীরের সেরা পীর বিলেতের শেক্ষপীর পাবলিককে বলতেন 'মব'।। যেদিকে খেলাবে সেদিকে খেলবে। ঝালে ঝোলে অম্বলে সবেতেই আছে । এক্ষুণি বলবে একে রাজা করো, তক্ষুনি বলবে ওকে রাজা করো।

শ্যামাদার প্রতিটি কথা প্রতি মুহূর্তে মেনে চলেছি। শেষ জীবন পর্যন্ত মেনে চলবো। সেই সেবার পঞ্চায়েতের ভোটে কানু ভচ্চারের টাকা নিয়ে আমি, জোলা মুর্মু আর সব মিলে কানুকে ভোট দিলাম। হামিদ মোল্লার টাকা খেয়ে হামিদকে দিলাম। গণার টাকা নিয়ে গণাকেও দিলুম। গণতন্ত্র কিনা। তখন কাগজে ভোট হত কিনা। কাউকে বঞ্চিত করি নাই। বড় অবিবেচনার কাজ হতো। পয়সা দাও। সঙ্গে আছি। মিছিল - মিটিং সবেতেই থাকবো। আমি আছি তাই তুমি আছো। তুমিও আমাকে দেখো। আমি তোমাকে দেখবো। না না তুমি যা মনে করছ তা নয়। ওদের সঙ্গে ওঠাবসা করি বলে, এক গেলাসে খাই বলে, যতক্ষণ জল ততক্ষণ থাকি। বাকিটা তোমার। এই দেহ মন প্রাণ সবই তোমার। তোমাকেও বলি, পাবলিক চটিও না চটিতে পা গলবে না। চটিতে পা গললে চট্টোপাধ্যায়। না গললে গোলাম হোসেন।

সেবার একটা ফাউল হয়ে গেল। বলতে গেলে সেম সাইডে গোল। ভোগাদা বললে, বেলাড ডোনেশন আছে।

আমি বললাম, ব্লেড দাও। কার হাত কেটে ব্লাড আনতে হবে বলে দাও।

— আরে চাঁদা তুলতে হবে। চাঁদায় চাঁদি আসে। পনের পার্সেন্ট নিয়ে নিস।

আরো চারটে পাবলিক নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নাম্বার চার নাম্বার তিন নাম্বার দু নাম্বার সেরে বেল মারলাম এক নাম্বার এলগিন রোডে।

বয়স্ক একজন দিদিমা এলেন। দিদিমণির গলায় বললেন, কাকে দরকার?

—কাউকে না ম্যাডাম। মাল দরকার বেলাড ডোনেশন আছে। পাঁচ হাজার এক টাকা চাঁদা দিন।

ইশকুলের হেড মিস্ট্রেসের মত গলা করে তিনি বললেন, এটা কার বাড়ি জানেন? সুভাষ বোসের বাড়ি।

আমি বললাম, তাহলে সুভাষদাকে ডেকে দিন। বিভাসদা আভাসদা দিয়েছে সুভাষদাকেও দিতে হবে।

ভোগাদা বকে ঝকে বললে, আচ্ছা পাবলিক! সুভাষ বোসকে চিনিস না।

— কি করে চিনবো দাদা? আমাদের ঠেকে যারা না আসে তাদের তো চেনা যায় না।

তুমি যে সুভাষদার কথা বলছ, তিনি তো শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে ঘোড়াতেই চেপে বসে আছেন বেশ কয়েক বছর। ঘোড়া থেকে নেমে এ পাড়াতে ফেলাট কিনেছেন জানতাম না।

সেই নিয়ে কি ঝামেলি ! পটলা বললে, ঘোড়া নিয়ে তিনি হিমালয় পাহাড়ে গিয়ে সাধু হয়েছেন।

কেউ বললে, শোল মেরে খাচ্ছেন শোলমারিতে।

কেউ বললে জাপানে। কেউ বললে জার্মানে।

এসব ঝামেলির সময় আমি চুপ থাকি। শ্যামাদা শিখিয়েছে, দুটো কান দুটো চোখ। দেখবি শুনবি। মুখ কিন্তু একটা। কথা বলবি না। মাঠ ভরাতে বললে ভরাবি। লাইন বাড়াতে বললে বাড়াবি। ঝাণ্ডা বা ডান্ডা ধরতে বললে বলবি, ডান্ডি অভিযানে যখন যাচ্ছেন আপনার হাতেই ডান্ডা থাক। বলে অন্যকে ধরাবি। নিজে ধরবি না। আর কিছুতেই জড়াবি না।

দেখবেন এক পাড়ার কুকুর অন্য পাড়ার কুকুরকে দেখলে খ্যাক খ্যাক করে ওঠে। আমরা নিজের পাড়ায় প্রচুর লাফড়া করি। কেলিয়ে বিন্দাবন দেখিয়ে দিই। আবার অন্য পাড়ায় গেলে লেজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করি। এরই নাম পাবলিক। পাবলিকের সঙ্গে মানুষের তফাৎ এই, মানুষের লেজ নেই। শিরদাঁড়া থাকে। পাবলিকের লেজ আছে শিরদাঁড়া নেই। লেজ অবশ্য দেখা যায় না। যেখানে খাদ্য কিংবা খাদ্যের প্রতিশ্রুতি সেখানে পাবলিক। যেখানে খাবার নেই সেখানে পাবলিক নেই। মাল যে দেয় সে মালিক। তারজন্য পাবলিক মালামাল করে দিতে পারে। মালাইকারি নিয়ে আসতে পারে, মালাইকাকেও হাজির করতে পারে। মাল না পেলে বিরোধী পক্ষে গিয়ে খাল খুলে নিতেও পারে। খাল কেটে কুমির আনতে কেউ চাই না। তাই পাবলিক চটায় না। পাবলিক মানেই ছটা। চিঙ্গারি। রওনাক। নাক কেটে যাত্রা ভঙ্গ করতে চাইলে পাবলিক চটাও।

বোতলের গল্পটা বলি । আমাকে ধরে ফেলেছে তিনটে গ্রুপই। বলে দিয়েছে, একটা বোতলের মাল খেতে হবে। তিন চারটে চলবে না। আমি বুঝতে পারছি না, কোনটা ধরব। যাদের ছাড়বো, তারা আমার ছাল ছাড়াবে, কুচি কুচি করে কেটে নুন মাখিয়ে শুটকি মাছ বানিয়ে শীতকালে খাবে।

আপনাদের মধ্যে যারা পাবলিক আছেন, অনেকেই আছেন জানি, চুপ থাকুন। যদি কেউ মানুষ থাকেন, যদি জ্যোতিষ থাকেন, দয়া করে বলে দিন, কোন বোতলটা ধরলে আখেরে লাভ হবে।

> 'আখেরে লাভ আখের গুড়ে, গুড় খেয়ে যায় মুচিরাম
> সুচের পিছন সুতো ঢুকলে সবাই হবে শুচি-রাম।'

---

লেখক ঃ **দেবেশ ঠাকুর,** পশ্চিম বঙ্গের প্রখ্যাত একক নাট্যশিল্পী, কবি, নাটককার।

# স্ট্রাইক

মূল নাটক ঃ ক্লিফোর্ড ওডেট্স- এর Waiting For Lefty
রূপান্তর ঃ **নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য**

**চরিত্রলিপি**

অটল - শ্রমিক নেতা (মঞ্চে অনুপস্থিত), ৪০, সামন্ত- শ্রমিক নেতা (বিপক্ষ দলীয়), ৪৫ পাণ্ডে- শ্রমিক, ৩০, কলাণী - পাণ্ডের স্ত্রী, ২৪, বিকাশ, কলেজে পড়া শ্রমিক, ২৩, অণিমা- দেবুর প্রেমিকা,১৯, লালওয়ানি- ম্যানেজার, ৪৫/৫৫

দেবু- শ্রমিক, ২৫, টেকচাঁদ শর্মা- শ্রমিক, ৩৭ (সামন্তের বন্ধু), বাবু- পাণ্ডের ছেলে, ৮, সামন্তের ভাড়াটে গুন্ডা, ৪৫/৫৫, সীতারাম ও সুশান্ত, ২৭/২৮, আরও জনতিনেক শ্রোতা। পর্দা উঠলে দেখা যাবে স্টেজে অর্ধবৃত্তাকারে ছ'সাত জন লোক বিভিন্ন ভঙ্গিতে বসে আছে। স্টেজের পেছন দিকে একটি ছোট টেবিল। বেশ গম্ভীর, আবেগ এবং দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে শ্রমিক নেতা সামন্ত। এটা বক্তৃতার শেষ অংশ।

সামন্ত : তাই বলছিলাম, বন্ধুগণ গত কয়েক বছরে, বিশেষত আগের সরকারের পতনের পর আজ আমি আপনাদের নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে শ্রমিক মালিক পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন এসেছে। মিছিল, মিটিং, ঘেরাও, স্ট্রাইক এসব আজ মরচে পড়া হাতিয়ার মাত্র।

একজন শ্রমিক: এ যে দেখছি নতুন কথা শোনাচ্ছে ভায়া।

দ্বিতীয় শ্রমিক : শুনে যাও খুড়ো, আখেরে কাজে লাগতে পারে

সামন্ত : (কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে) আমার কথা আপনাদের অনেকের কাছে হয়ত নতুন মনে হচ্ছে, কিন্তু জানবেন এটা কারও শেখানো বুলি নয়। এ আমার শ্রমিক আন্দোলনে দীর্ঘকাল প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণজাত গভীর উপলব্ধি।

তৃতীয় শ্রমিক : উপলব্ধি! গুষ্টির মাথা। ব্যাটা বক্তৃতা দিচ্ছে না যেন মহাভারত পড়ছে।

সামন্ত : (গম্ভীরভাবে, রাগ ও বিরক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে) আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি আমার বক্তৃতায় কয়েকজন বিপথগামী শ্রমিক বার বার বাধা সৃষ্টি করছেন। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। আমি আবার আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি মেকি বিপ্লবীদের গরম গরম বুলিতে উত্তেজিত হয়ে হঠকারিতা করতে যাবেন না। ওরা আপনাদের স্ট্রাইকে নামিয়ে দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেবে। আপনাদের ছেলেমেয়েরা না খেতে পেয়ে ভিক্ষে করবে। মা বোনেরা ভাতের জন্য নারীদেহ ব্যবসায়ীদের শিকার হবেন। হ্যাঁ, এটা যদি আগের সরকারের আমল হত, আমি কক্ষনো আপনাদের

স্ট্রাইক করতে নিষেধ করতাম না বরঞ্চ সবার আগে ঝাণ্ডা নিয়ে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াতাম। কিন্তু এখন আমাদের উপরে আছে এক জনদরদী সরকার। আমরা এখন আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি।

বিকাশ : আর সেই সঙ্গে তুমিও পকেট ভারী করতে পার, তাই না? শালা, দালালী করতে আসার জায়গা পাওনি? দেব ঠ্যাঙ ভেঙে।

সামন্ত : বুকের পাটা থাকে তো দাঁড়িয়ে বল যা বলতে চাও। (কেউ দাঁড়ায় না। সামন্ত একবার সামনে বসা শ্রমিকদের ভালভাবে দেখে নেয়) আমি জানি আমাদের ইউনিয়নে তিন চারটি চিনের দালাল আছে, এদের সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছুই বলব না। আমি শুধু এটুকুই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে নৃশংস বর্বর চিন ৬২'তে আমাদের মাতৃভূমিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল সেই চিনের যারা উপাসক তাঁরা শুধু আমাদের দেশেরই শত্রু নয়, তারা মানবতার শত্রু, এদের কোন ক্ষমা নেই। এদের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করা আমি আমার পবিত্র কর্তব্য মনে করি।

একজন শ্রমিক : জয় হিন্দ! (একসঙ্গে অনেক তালি)

দ্বিতীয় শ্রমিক : অটল কোথায়?

অন্যান্য শ্রমিক : (সমস্বরে) অটল কোথায়?

সামন্ত : (নিজের পকেটে হাত রেখে) আমার পকেটে। আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন? আপনারা ওকে ইউনিয়নের এ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান করেছেন, আপনারাই এবার ঠ্যালা সামলান। আমি তো আগেই সাবধান করেছিলাম, তখন কেউ গা করলেন না। সাতটার মিটিং দশটা বাজতে চলল, নেতার দর্শন দেবার সময় হল না। আশ্চর্য! কই, কমিটির অন্যান্যরা কই?

একজন শ্রমিক : হ্যাঁ, একটা ফয়সালা হওয়া দরকার। কোথায় কমিটির লোকজন? আমাদের সোজাসুজি বলে দাও ভাই স্ট্রাইক হবে কি হবে না। ঘরে গিয়ে একটা কিছু বলতে হবে তো।

তৃতীয় শ্রমিক : হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ, এক্ষুণি ফয়সালা হওয়া দরকার। পেটে কিল মারলেও তার জন্য তৈরি হতে হয়ে, কি বল ভাই?

সামন্ত : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমিও তো তাই বলছি। (পান্ডে উঠে দাঁড়ায়) এই যে এতোক্ষণে কমিটির একজন উঠে দাঁড়িয়েছে। ওর মুখ থেকেই আপনারা শুনুন আপনাদের ফয়সালা।

(সামন্ত পান্ডের দিকে কটমট করে তাকায়, তারপর দ্রুত ফিরে যায় নিজের জায়গায়। যাবার পথে একপাশ থেকে সে একটা ছোট টুল বা জলচৌকি

টেনে নিয়ে শ্রমিকদের ঠিক মাঝখানে বসে গম্ভীরভাবে সিগারেট ধরায়। শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। পান্ডে হাত তুলে সবাইকে শান্ত হতে নির্দেশ দেয়। তারপর ....)

পান্ডে : বিশ্বাস করুন,আমি চিন বা রাশিয়ার দালালি করে এখন পর্যন্ত কোন পয়সা কামাতে পারিনি। ওসব বাজে কথা ছাড়ুন। মার্ক্স লেনিনের ছবি দেখেছি, লেখা পড়িনি, সে বিদ্যে নেই। পেটের দায়ে আঠার বছর সেপাই হয়েছিলাম। কারগিলে যুদ্ধ করতে গিয়ে গুলি লাগে। পেটে সাত ইঞ্চির সেলাই, হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকা একখানা কাগজে চোতা আর গলায় দুটো গেঁদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে দিয়ে বলল, ' ছুট্টি , যাও ঘর যাকে ক্ষেতি করো। ' বাপ ঠাকুদ্দা রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল কয়লাখনিতে কাজ করেছে, ক্ষেতি কোথায় মিলবে? তাই মরতে এলাম এখানে। দেখ ভাইসব, রাজনীতি বাম-ডান এসব আমি কিচ্ছু বঝিনা, যে রাস্তায় গেলে সবাই খেতে পায় আমিও সেই রাস্তায়। অটল জানে সেই রাস্তা। তোমরা বিশ্বাস কর অটল সব সময় হক কথা বলে। একদম সাচ্চা মানুষ, শের কা বাচ্চা শের।

একজন শ্রমিক : কোথায় গেল তোমার বাঘের বাচ্চা?

দ্বিতীয় জন : চিড়িয়াখানায় আটকা পড়েনি তো?

পান্ডে : কেন ফালতু কথা বলছ তোমরা? বেচারা হয়ত ভিড় বাসে উঠতে জায়গা পায়নি। হয়ত এক্ষুণি এসে পৌঁছবে। অটল আসুক বা না আসুক আমরা তো রাস্তা ঠিক করতে পারি।

দেবু : সেই কথাই তো তোমার কাছে শুনতে চাই পান্ডে। তুমি তো সেই তখন থেকে নিজের কিসসা শুনিয়ে যাচ্ছ। এবার আসল কথা বল।

পান্ডে : মাথা উঁচু করে রুটি যদি কামাতে চাও তবে লড়াই -এর রাস্তায় নামতেই হবে। আর কোন রাস্তা খোলা নেই। যে শালা যাই বলুক না কেন আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি আর কোন রাস্তা নেই। দু'হপ্তা আগেও আমি শালা ভাবতাম লড়াই করে পড়েশানি বাড়বে, লড়াই-এ কাজ নেই। কিন্তু পাঁচদিন আগে এক রাতে আমার বউ আমার চোখ খুলে দিয়েছে। সে রাত্তিরে মেয়েছেলেটা এমন একখানা ঝগড়া বাঁধিয়ে বসলনা কী বলব তোমাদের। কী বলে জান? বলে ' যে মরদ বউ বাচ্চাকে খেতে দিতে পারে না তার মুখে সাত ঝ্যাটা'। বলে 'যাও গোঁফ কামিয়ে শাড়ি পড়ে হেঁসেল ঢুকে পড় চটপট। আমি ঝি-গিরি করে তোমার চাইতে অনেক বেশি রোজগার করে আনছি দ্যাখ।" আর সবচাইতে আশ্চর্য কি জান, যে মেয়েছেলেটা কিতাব দেখলে 'হায় রাম!' বলে ভিরমি খায় সে পর্যন্ত বলে দিল,' লড়াই করার হিম্মত নেই? যদি বাঁচতে চাও তবে ....'

১) **পাণ্ডে পরিবার**

আলো ক্রমশ কমে গিয়ে নিভে যায়। স্পট পড়ে অর্ধ বৃত্তাকারে বসে থাকা শ্রমিকদের সামনে। শ্রমিকদের স্পষ্ট দেখা যায় না, তারই মধ্যে সামন্তর উপস্থিতি চোখে পড়ে। তার সিগারেটের ধোঁয়া মাঝে মাঝে স্পটের মধ্যে এসে পড়ে।

পাণ্ডে : (ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত) বিয়ের আংটিটা সাউয়ের দোকানে বাঁধা দিতে তোমার হাত কাঁপল না?

কল্যাণী : নাঃ, একটুও না। আগে কাঁপতো, বুক ধড়ফড় করত, তোমার সঙ্গে বিয়ের পর আর কাঁপে না। দিন দিন তুমি আমাকে যেভাবে সাহসী করে তুলছ তাতে একদিন হয়ত শরীরটাও বাঁধা দিতে পারব, ভয় করবে না।

পাণ্ডে : (চাপা গর্জন) লজ্জা করল না কথাটা বলতে বেশরম? সাত তারিখ অতগুলো টাকা এনে দিলাম, আজ বিশ তারিখের মধ্যে সব ফতুর! কোথায় গেল আমার টাকা, জবাব দাও নইলে তুলকালাম কান্ড বাঁধাব বলে দিচ্ছি।

কল্যাণী : অত টাকা সামলাব কী করে ভেবে ভেবে রাতে আমার ঘুম হচ্ছিল না তাই ঘড়ায় ভরে ঘরের মাঝখানে পুতে রেখেছি। তোমার চোদ্দ পুরুষ ওই টাকা খাবে আর তোমার প্রশংসায় বুক চাপড়াবে।

পাণ্ডে : চোপরাও বেয়াদব! সারাদিন হারামির আখড়ায় কাম করে এসে এসব মজাখ একদম ভাল পাগে না। স্পষ্ট করে বল টাকাগুলি কোথায় গেল, নইলে ...

কল্যাণী : (শান্ত, অনুত্তেজিতভাবে) মারবে? তা আগে বললেই হয়। পেটে দেবার তো মুরোদ নেই, তাই পিঠে দেবে। মরদ বলে কথা। তা খালি হাতে মেরে কেন কষ্ট পাবে, যাই ছাতা লাঠি, বেলন কাঠি একটা কিছু নিয়ে আসিগে যাই। (কল্যাণী পা বাড়ায়, পাণ্ডে হাত ধরে টেনে আনে, তারপর চোখে চোখ রেখে ঠান্ডা কিন্তু হিংস্র গলায় বলে)

পাণ্ডে : ওসব অনেক শুনেছি। আর নয়। আমার টাকার হিসেব দাও, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।

কল্যাণী : (নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত নামতা পড়ার মত গড়গড় করে বলে যায়) বাড়ি ভাড়া আড়াই হাজার টাকা, মুদির দোকানের গত মাসের ধার মেটাতে দেড় হাজার টাকা, এ মাসের রেশন তুলতে পাঁচশো টাকা, বাবুর জন্য গোয়ালার কাছ থেকে একপো করে তের দিনের দুধ নেওয়ার খরচা দুশো ষাট টাকা, এ মাসের নুন তেল মশলা দুশো টাকা, তোমার চা বিড়ির জন্য দিয়েছি একশো টাকা। সব মিলিয়ে খরচ পাঁচ হাজার ষাট টাকা। (অর্ধ-বৃত্তাকারে বসে থাকা শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে পাণ্ডের সংসার

নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। তাদের কথায় কল্যাণীর হিসেব ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ে যায়। শুধু তার ঠোঁট নাড়া অঙ্গভঙ্গি দেখা যাবে)

একজন শ্রমিক : কল্যাণী সত্যিই খুব হিসেবি মেয়ে, যাই বলো। কী সুন্দর ছোট বড় সব খরচের ঠিক ঠিক হিসেব দিয়ে যাচ্ছে। বউটাকে কতবার বলেছি হিসেব রাখবি, সংসারি মানুষের হিসেব না রাখলে চলে?

দ্বিতীয় শ্রমিক : কিসসু লাভ নেই খুড়ো, ওই দ্যাখো তের দিনের হিসেব বাবদ পাঁচ হাজার ষাট টাকার হিসেব কল্যাণী দিয়ে দিল। আর রইল চারশো চল্লিশ টাকা। যত হিসেবি মেয়েই হোক ওই টাকায় আরও সতের দিন সংসার চালানো কল্যাণীর কম্ম নয়।

তৃতীয় শ্রমিক : মা অন্নপূর্ণাও হিমসিম খেয়ে যাবেন।

প্রথম শ্রমিক : আমার মনে হয় কল্যাণীর এবার ম্যাজিক শেখা উচিৎ।

দ্বিতীয় শ্রমিক : ঠিক বলেছ। ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া দেখেছতো? ওই জিনিষ চাই। ভাতের হাড়ি যতবার উপুর করবে ততবার ঝর ঝর করে ভাত পড়বে।

তৃতীয় শ্রমিক : ভারতবর্ষের সব কাপড়ের মিলের শ্রমিকদের বউদের ম্যাজিক শেখাবার জন্য দেশ জুড়ে ট্রেনিং ক্যাম্প গোছের কিছু একটা খোলা দরকার।

প্রথম শ্রমিক : অবিলম্বে।
(শ্রমিকরা চুপ করে, কল্যাণীর গলা শোনা যায়)

কল্যাণী : ... কাপড় কাচা সাবান পঞ্চাশ টাকা, ভগবতী জাগরণের চাঁদা কুড়ি টাকা, বাবুর ইস্কুলের মাইনে পঞ্চাশ টাকা ... এই হলো গিয়ে পাঁচ হাজার একশো আশি টাকা। আর আংটি বাধা দিয়ে পেয়েছি... (কল্যাণী কাপড়ের খুঁট খুলে টাকা বের করে পান্ডের হাতে দেয়) এই এক হাজার টাকা। (কোমর থেকে চাবি বের করে) এই নাও তোমার চাবি, ওই ঘরে রইল তোমার ছেলে। এবার তুমি মনের সুখে সংসার কর, আমি চল্লাম। জয় মা কালী!
(দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে কল্যাণী বাইরের দিকে পা বাড়ায়)

পান্ডে : (আশ্চর্য হয়ে) কোথায় যাচ্ছ রাত দুপুরে?

কল্যাণী : ইস্টিশানে। কাল সকালে কালকা মেল ধরে আসানসোলে বাপের বাড়ি চলে যাব তোমার হাড় জুড়োবে আর আমার দু'বেলা ভাত জুটবে।

পান্ডে : (অবিশ্বাসীর ভঙ্গিতে) ট্রেনে উঠতে পয়সা লাগে।

কল্যাণী : আমার টিকিটের চিন্তা তোমাকে করতে হবে না। তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও। দরকার হলে স্টেশনে কাউকে মা মাসি ডেকে ভজিয়ে ভাজিয়ে টিকিট কাটিয়ে নেব।

পান্ডে : তারপর? বাপ ব্যাটাতো মরে ভূত হয়েছে। ভাইয়ের বউ-এর লাথি ঝাঁ্যাটা কতকাল সইবে?

কল্যাণী : আমি রোজগার করব। কুলি কামিনের কাজ করে পেট চালাব। দরকার হলে ভাল পয়সা কামায় এমন একটা মরদ জুটিয়ে নিতে কতক্ষণ?

পাণ্ডে : (উল্লসিত হয়ে ) তাহলে এতক্ষণে তোমার আসল মতলব বোঝা গেল। আসল কথাটা হচ্ছে আমাকে তোমার আর ভাল লাগে না।

কল্যাণী : কোন মেয়েছেলেরই খালি পেটে আদর সোহাগ ভাল লাগে না।

পান্ডে : (গর্জন করে) বেরিয়ে যা বেশরম, এক্ষুণি বেরিয়ে যা আমার ঘর থেকে।

কল্যাণী : (মুখিয়ে উঠে) অঃ ভাত দেবার ভাতার নয়, কিল মারবার গোসাই! যাবইতো, একশোবার যাব। এক্ষুণি যাব। (কল্যাণী নিজের দু'একটা শাড়ি, ব্লাউজ টুকিটাকি গুছিয়ে নিতে দৌড়ে ভিতরে চলে যায়। পান্ডে দ্রুতপদে পায়চারি করে, বিড়ি ধরায়, ফোঁস ফোঁস শব্দে টানে। শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে-)

প্রথম শ্রমিক : পান্ডের সংসার তাহলে ভেঙে গেল। দোষটা কিন্তু কল্যাণীর, যাই বল তোমরা।

দ্বিতীয় শ্রমিক: : পান্ডের হম্বিতম্বিই সার। বাঙালি মেয়ে বিয়ে করেছে বলে একেবারে মাথায় করে রাখে। তুই তুকারি পর্যন্ত করে না। রোজ দু'ঘা করে দিলে আজ এমনটা হত না।

তৃতীয় শ্রীমক : বাঙালি মেয়ে এমনিতেই খুব তেজি হয়। কল্যাণীর কোন দোষ নেই। দুঃখে কষ্টে খিদেয়, চিন্তা ভাবনায় অমন সুন্দর চেহারাটা সাত বছরে ভেঙে গেল। কত সুন্দর চোখ ছিল কল্যাণীর। বিয়ের পরে পান্ডে সবার কাছে বউ-এর চোখের তারিফ করত মনে আছে তোমাদের? সেই চোখে এখন কালি পড়ে গেছে। আহা বেচারা!

(কল্যাণী সুটকেস বা পুটুলি হাতে ফিরে আসে। পিছনে চোখ মুছতে মুছতে বাবু 'ওমহা, কোথায় যাচ্ছ তুমি? কোথায় যাচ্ছ? ওমা যেও না... ইত্যাদি বলতে বলতে বেরিয়ে আসে।

বাবু কল্যাণীর কাপড় আঁকড়ে ধরে, কল্যাণী ছাড়াবার ব্যর্থ চেস্টা করে।)

প্রথম শ্রমিক : এইবার ঠ্যালা সামলাও, কল্যাণীর আর যাওয়া হচ্ছে না।

দ্বিতীয় শ্রমিক : কল্যাণী খতরনাক মেয়ে, ও ঠিক বেরিয়ে যাবে।

তৃতীয় শ্রমিক : ছেলেটা যে কিছুতেই ছাড়ছে না।

প্রথম শ্রমিক : এইবার নাটক জমেছে। মজা আগেয়া।

বাবু : (সকাতরে) না মা তুমি যেতে পারবে না। আমি তোমাকে যেতে দেবনা। বাবা ও বাবা, মা যে চলে যাচ্ছে, মাকে আটকাও।

কল্যাণী : ছাড় হতভাগা, আমার শাড়ি ছাড়, আমি তোর কেউ নই। যা, বাপের কাছে যা।

পান্ডে : এই না হলে মা! এদিকে আয় বাবু, ও ঠিকই বলেছে ও তোর মা নয়। যে মা পেটের ছেলেকে পর্যন্ত ছুঁয়ে ফেলে সংসার ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারে সে মা নয়, দুষমণ। আয় বাবু, আমার কাছে আয়, আমি তোকে বরফি কিনে দেব।

বাবু : আমি বরফি চাই না, আমি মাকে চাই।

কল্যাণী : ছাড় বলছি হতভাগা, ছাড়! বাপের বরফি খাগে যা।

পান্ডে : আয় বাবু , ও ডাইনির কাছ থেকে সরে আয়। (সে কাছে এগিয়ে এসে বাবুর হাত ধরে, বাবু 'না না' বলে জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মায়ের হাঁটু শক্ত করে ধরে জোরে চেঁচিয়ে কান্না শুরু করে।)

বাবু : মা, যেয়োনা, ওমা আমি আর শিশিবোতল ভাঙবোনা, জলকাদা ঘাটবোনা, লক্ষ্মী হয়ে থাকব। তুমি যেয়োনা, মা।

কল্যাণী : ছাড়, বলছি, ছাড়। ভাল হবে না কিন্তু বাবু, এইবার মার লাগাবো।

পান্ডে : (প্রায় তেড়ে আসে) দেখি কেমন বাপের মেয়ে তুমি যে আমার বাচ্চার গায়ে হাত তোল। ওর গায়ে হাত পড়লে তোমাকেও আমি ভালভাবে মেরাম্মত করে দেব, জেনে রেখ।

কল্যাণী : ইস্ ছেলের জন্য দরদ দেখে মুচ্ছো যাই। যে বাপ ছেলেকে বছরে একটা প্যান্ট পর্যন্ত কিনে দিতে পারে না সে আবার ছেলেকে দরদ দেখাতে আসে কোন সাহসে? রাস্তার ভিখিরির ছেলেগুলোও ওর চাইতে ভাল খায় পড়ে চেয়ে দেখ।

পান্ডে : তোমার মুখ ঝামটা আর আমি সহ্য করব না। তুমি যেখানে খুশি সেখানে যাও, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আয় বাবু, লক্ষ্মী সোনা আমার, আয় আমি তোকে এত্তবড় একটা খেলার বল কিনে দেব।

বাবু : (কাঁদতে কাঁদতে) আমি বল চাইনা, আমি মাকে চাই।

পান্ডে : আমি তোকে নতুন মা এনে দেব। দেখবি নতুন মা তোকে কত আদর করবে। আয় ওই রাক্ষুসিকে ছেড়ে চলে আয়।

বাবু : আমি নতুন মা নেবনা, আমি এই মার সঙ্গে থাকব। মা আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমাকে নিয়ে চল মা।

কল্যাণী : কেন, নতুন মার কোলে বসে বরফি খাবি না?

বাবু : না।

কল্যাণী : বাপ যে বল কিনে দেবে বলল? বল খেলবি না?

বাবু : না

কল্যাণী : বোকা ছেলে। দেখিস, আমি গেলে বাপ তোকে কত আদর করবে, কত খেলনা কিনে দেবে। তারপর নতুন মা আসবে, ব্যান্ড বাজবে, লাল নীল আলো জ্বলবে, কত আনন্দ হবে।

বাবু : (চিৎকার করে) না, না, না, আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

কল্যাণী : তবে চল্ আমার সঙ্গে। মনে থাকে যেন আমি তোর বাপের মত বড়লোক নই যে ঘন্টায় ঘন্টায় বরফি কিনে দেব।

বাবু : আমি বরফি চাইনা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

(কল্যাণী বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে গেলে পান্ডে এসে পথ আটকে দাঁড়ায়)

পান্ডে : বাবুকে নিয়ে যেতে পারবেনা।

কল্যাণী : আমি কাউকে নিয়ে যাচ্ছি না। ক্ষমতা থাকলে ওকে আটকাও।

পান্ডে : তোমার মতলব আমি আগেই বুঝেছি। তোমার ভেগে যাবার ইচ্ছে হয়েছে, যাও, তাই বলে ওকে ঘুম থেকে খুঁচিয়ে ওঠানোর কি দরকার ছিল?

কল্যাণী : আমি ওকে ঘুম থেকে তুলিনি, ওকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ। তোমার তর্জন গর্জন শুনে ও অনেক আগেই বিছানায় উঠে বসেছিল।

পান্ডে : (দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে হতাশভাবে) বেশ, যাবে যখন যাও। যাবার আগে আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে।

কল্যাণী : অনুরোধ ? কিসের অনুরোধ?

(পান্ডে হঠাৎ বউ ছেলের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ায়)

পান্ডে : বিছানার তলায় আমার যে ভোজালিটা রাখা আছে সেটা নিয়ে এসে আমার বুকে বসিয়ে দাও।

বাবু : বাবা!

পান্ডে : (ঘুরে দাঁড়ায়) হ্যাঁ, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর আমি শূন্য ঘরে কার জন্য ফিরে আসব বলতে পারিস বাবু? কার মুখ দেখে আমি উপরওয়ালার চোখ রাঙানি, গালি গালাজ ভুলে যাব? আমি আর বাঁচতে চাইনা। কল্যাণী আমার শেষ অনুরোধটা অন্তত রাখ। (হাত জোড় করে) যাচ্ছই যখন সব শেষ করে দিয়েই যাও। আমিও বাঁচব আর তোমারও কোনদিন ফিরে আসার কথা মনে হবে না।

কল্যাণী : ভেবে দেখ, এসব কিছুরই দরকার ছিল না শুধু যদি তুমি ঘরে আর কিছু টাকা বেশি নিয়ে আসতে পারতে, যদি আমাদের দু'বেলা খাওয়া জুটত, মাসের পনের তারিখ বিয়ের আংটি বাঁধা না দিতে হত, আমার কি দরকার ছিল তোমার বুকে দাগা দিয়ে চলে যাবার? তা যখন হবেনা.... নাঃ আমি কারো বুকে ছুরি বসাতে পারব না, মাফ কর।

পান্ডে : মালিক বেশি টাকা মাইনে দেয় না সেটাও কি আমার দোষ?

কল্যাণী : দোষ নয়, গাফিলতি। অতগুলো মরদ তোমরা গায়ের রক্ত জল করে মালিকের হয় খাটছো আর সেই মালিক প্রত্যেক দু'বছর পর সাত দিনের

জন্য বসিয়ে দিয়ে চাকরির সব সুবিধেগুলো কেড়ে নিচ্ছে। জিনিষের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে অথচ তোমাদের রোজগার সেই পাঁচ হাজার পাঁচশ টাকাই রয়ে গেল সাত বছর ধরে। এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পার তোমরা। ধর্মঘট করতে পার।

পান্ডে : ধর্মঘট করলে যে না খেয়ে মরব, যা জুটছিল তা-ও জুটবে না।

কল্যাণী : ধর্মঘট না করেও যে না খেয়ে মরছ সেটা দেখতে পাচ্ছ না? না হয় আমি ঝি-গিরিই করব কিছুদিন। এর চাইতে রাস্তার পাশে চা বিড়ি নিয়ে বসলে অনেক বেশি রোজগার হয়।

পান্ডে : তা হয়, কিন্তু ...

কল্যাণী : এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। যদি বাঁচতে চাও তবে লড়াই-এর রাস্তায় একদিন না একদিন নামতেই হবে। তোমার বাপ ঠাকুর্দা কয়লা খনিতে লড়াকু শ্রমিক ছিল, সেকথা কি তুমি ভুলে গেলে?

পান্ডে : ঠিক, ঠিক, খাঁটি কথা বলেছ। কিন্তু ইউনিয়নের কিছু লোক বলে স্ট্রাইক করে শেষ পর্যন্ত ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

কল্যাণী : ওরা মালিকের দালাল। মালিকের পয়সা খেয়ে শ্রমিকদের ভুল রাস্তায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

পান্ডে : অটলও ঠিক এই কথাই বলে, জান। তোমার সঙ্গে অটলের অনেক কথার মিল আছে। ভাবছি আজ একবার ওর কাছ থেকেই ঘুরে আসি, কি বল?

কল্যাণী : অনেক আগেই তার কাছে তোমার যাওয়া উচিৎ ছিল।
(পান্ডে যাবার জন্য পা বাড়ায় তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে)

পান্ডে : (হেসে) তাহলে তোমার আসানসোলে যাওয়া হচ্ছে না এ যাত্রায়, কি বল এ্যাঁ?

কল্যাণী : (মুখ ঝামটা দিয়ে) মরণ! চল বাবু, অনেক হোল, এখন ঘুমোগে যা।

বাবু : তুমিও চল তাহলে।

কল্যাণী : হ্যাঁ যাচ্ছি, চল।
(দু'জনে ডান দিকে উইংসের দিকে এগোয়। আলো নিভে যায়। আলো জ্বললে দেখা যায় পান্ডে তার বক্তৃতা শেষ করছে)

পান্ডে : এতো তোমাদের জানা কিস্‌সা ভাইলোগ। সবার ঘরেই এক অবস্থা। কিন্তু আমার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই যে লড়াই ছাড়া আর কোন রাস্তা আমাদের খোলা নেই। (পান্ডের বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলো নিভে যাবে।)

২) **বিকাশ ও লালওয়ানি**

আলো জ্বলে উঠলে দেখা যাবে স্পটের মধ্যে বাঁ দিকের উইংসের মুখোমুখি

একটি চেয়ারে বসে লালওয়ানি টেবিলের উপর কিছু কাগজপত্র দেখছে। ডান দিকের উইংস থেকে বেরিয়ে ক্লান্ত বিকাশ সামনে এসে দাঁড়ায়।)

বিকাশ : নমস্কার স্যার।

লালওয়ানি : (হাত দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে) বোস, কথা আছে তোমার সঙ্গে। (বিকাশ বসে। লালওয়ানি নিঃশব্দে কাগজ নাড়াচাড়া করে, তারপর....)

লালওয়ানি : তোমার কদ্দিন হল আমাদের ফ্যাক্টরিতে?

বিকাশ : তিন মাস স্যার।

লালওয়ানি : হাতের কাজ করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

বিকাশ : না স্যার, কোন অসুবিধা হচ্ছে না। (একটু থেমে) আর অসুবিধা হলেই বা কি করি বলুন স্যার। এর চাইতে ভাল চাকরিতো আমায় কেউ দেবেনা।

লালওয়ানি : That's the spirit, my boy. White collar job-এর পিছনে পড়ে না থেকে আমার মনে হয় আজকালকার শিক্ষিত যুবকরা যদি কলে কারখানায় শ্রমিকের কাজ নিয়ে নেমে পড়ে তবে বেকার সমস্যা কখনোই এত তীব্ররূপ ধারণ করতে পারে না। তোমার কি মনে হয় না আজকালকার যুবকরাখুব আয়েশি হয়ে পড়েছে?

বিকাশ : ঠিক কথা স্যার। কিন্তু শ্রমিকদের কাজই বা ক'জন জোটাতে পারে।

লালওয়ানি : নিশ্চয়ই পারে। তুমি যেভাবে জুটিয়েছ তেমনিভাবেই পারে।

বিকাশ : এই সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার জন্য আমাকে এক হাজার মাইল আসতে হয়েছে সেটা মনে রাখবেন স্যার। যাকগে ওসব কথা। আমাকে যে জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন....

লালওয়ানি : তেমন কিছুইনা, একটু গল্প করা... এই তোমরা যাকে বল আড্ডা দেওয়া তাই আর কি। আচ্ছা ঘরে তোমার কে কে আছে?

বিকাশ : মা, দুই বোন, এক ভাই, এক বিধবা পিসি, মোট পাঁচ জন।

লালওয়ানি : বেশ ছোট সংসারই বলা চলে।

বিকাশ : মোটেই নয় স্যার। জিনিস পত্রের যা দাম আর আমাদের যা রোজগার তাতে পাঁচজনের সংসার বেশ বড় সংসার। সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি বলতে পারেন।

লালওয়ানি : (কপট বিস্ময়ের ভান করে, ভ্রু তুলে) আচ্ছা, তার মানে তোমার বোনদের এখনও বিয়ে হয়নি, ভাই চাকরি করছে না আর ভাড়া বাড়িতে থাক, তাই না?

বিকাশ : আপনি ঠিক ধরেছেন স্যার, নইলে এত অল্প টাকার জন্য এতদূরে আসতাম না।

লালওয়ানি : (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) তোমার ঘরের কথা শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কী করি বল, এখানে যে ক্লারিকল পোস্ট একটাও খালি নেই ভাই। তবু দেখি চেষ্টা করে অন্তত সামনের মাস থেকে তোমাকে হাজার খানেক টাকা বেশি দেওয়া যায় কিনা।

বিকাশ : (মহানুভবতায় গলে গিয়ে) আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ জানাব স্যার।

লালওয়ানি : আরে না না, তুমি আর ভাইয়ের মত। বড় চাকরি করছি বলে কি মনুষ্যত্বটুকুও বিসর্জন দিতে হবে? তোমার জন্য এটুকু করতে পেরে আমি নিজেই কৃতার্থ বোধ করছি।

বিকাশ : আপনার দয়ার কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে স্যার।

লালওয়ানি : তোমরা বাঙালিরা বড্ড সেন্টিমেন্টাল। অবশ্য আমিও একই দোষে দোষী। যেদিন থেকে শুনেছি একটি শিক্ষিত ছেলে আমার কারখানায় হেল্পার -এর চাকরি নিয়ে গতর খাটিয়ে খাচ্ছে সেদিন থেকেই মনের মধ্যে বার বার একটা অপরাধবোধ কাঁটার মত বিঁধে ছিল। আজ অন্তত এই প্রায়শ্চিত্তটুকু করার সুযোগ পেয়ে মনে কিছুটা শান্তি পাচ্ছি। আমকে অকারণ ধন্যবাদ দিয়ে তুমি আর আমাকে অপরাধী কোরনা, বিকাশ।

বিকাশ : তবে আমি মনে প্রাণে আপনার মঙ্গল কামনা করব।

লালওয়ানি : তা কোরো । তোমাকে দেরী করিয়ে দিলামনাতো?

বিকাশ : না না আমার কোন তাড়া নেই।

লালওয়ানি : নাঃ তোমাকে আর আটকে রাখা ঠিক হবে না। তোমাকে পরিশ্রান্ত লাগছে, যাও গিয়ে বিশ্রাম কর। সময় পেলে আবার এসো। তোমার সঙ্গে গল্প করে খুব ভাল লাগল।

বিকাশ : আচ্ছা স্যার, অনুমতি দেন তো আজকের মত চলি।

(বিকাশ যাবার জন্য পিছন ফিরে দু'কদম যেতেই পিছন থেকে লালওয়ানি ডাকে-)

লালওয়ানি : (চিন্তিত মুখে) শোন।

(বিকাশ ঘুরে দাঁড়ায়)

বিকাশ : কিছু বলছিলেন স্যার?

লালওয়ানি : (গভীরভাবে চিন্তিত, একটু অন্যমনস্ক) না, ভাবছিলাম ... আচ্ছা থাক না হয় এখন। পরে বরঞ্চ ...

বিকাশ : আমার দ্বারা যদি আপনার সামান্য উপকার হয় তবে বলতে দ্বিধা করবেন না স্যার।

লালওয়ানি : ইংরেজিতে essay, precis, paragraph এসব লেখায় তোমার কেমন হাত ছিল বলো ত? Just academic interest, আর কিছু নয়।

(লালওয়ানি মুচকি হেসে পেন্সিল দিয়ে কান চুলকোয়।)

বিকাশ : (হেসে) কলেজে পড়বার সময় খুব একটা খারাপ লিখতাম না স্যার। একসেলেন্ট না পেলেও কম্পোজিশন -এ বরাবরই আমি গুড, ভেরিগুড পেয়ে এসেছি। কিন্তু কেন বলুন তো স্যার? কাউকে পড়ান.....?

লালওয়ানি : না না, ওসব কিছু নয়, বললাম না জাস্ট এ্যাকাডেমিক ইন্টারেস্ট। তা তোমার হাতের লেখা কেমন বলো ত? পড়তে কোন অসুবিধা হয়না তো?

বিকাশ : আমার হাতের লেখা মোটামুটি ভালই বলতে পারেন স্যার। বেশ পরিস্কার গোটা গোটা করে আমি লিখি। এই যে দেখুন মাকে লেখা আমার একটা চিঠি (বিকাশ ব্যস্তভাবে বুক পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে লালওয়ানির সামনে মেলে ধরে) এটা অবশ্য বাঙলায় লেখা, আপনি পড়তে পারবেন না, তবু ...

লালওয়ানি : (এক পলক দেখে নিয়েই) বাঃ চমৎকার। তাহলে তোমাকে দিয়েই কাজটা করাব ভাবছি।

বিকাশ : আপনার কোন কাজে লাগলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব স্যার।

লালওয়ানি : (নড়েচড়ে বসে, তার হাবভাব দেখে মনে হয় এতক্ষণে সে নিজ মূর্তি ধারণ করার সুযোগ পেয়েছে) শোন বিকাশ, তোমাকে ছোটখাট একটা লেখার কাজ দিতে চাই।

বিকাশ : আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব স্যার। কিন্তু যদি একটু খুলে বলেন....

লালওয়ানি : অটলের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে ? তোমার ফ্লোরেই কাজ করে।

বিকাশ : আলাপ আছে তবে আমি তো নতুন ঢুকেছি, অতটা ঘনিষ্ঠতা নেই। আর তাছাড়া আমি লেখাপড়া জানি বলে মনে হয় ওরা আমার থেকে একটু দূরে থাকে, ঠিক জানিনা কেন।

লালওয়ানি : ধীরে ধীরে জানতে পারবে। (গলা নিচু করে) শোন, তোমার কাজ হচ্ছে প্রতি সপ্তাহে অটল যাদের সঙ্গে সচরাচর মেলামেশা করে তাদের সম্পর্কে মানে ওদের দলের গতিবিধি, আলাপ আলোচনা ইত্যাদির উপর প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে বেশ গোটা গোটা করে পরিষ্কারভাবে লেখা দু'পাতার ছোট্ট একটা রিপোর্ট দেওয়া। (বিকাশের চোখে চোখ রেখে) আশা করি আমার জন্য এ সামান্য কাজটুকু করতে তুমি অরাজি হবে না। (থেমে, একটু হেসে ) অবশ্য টাকা পাবে এর জন্য... মাসে এক হাজার টাকা।

বিকাশ : (প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মত, চোখ বড় করে) এক হা-জা-র টাকা! (হঠাৎ বিকাশ বিষন্ন হয়ে পড়ে) কিন্তু স্যার এটা যে অন্যায় কাজ।

লালওয়ানি : কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায় তা বোঝার বয়স তোমার এখনও হয়নি

বিকাশ। এথিক্স খুবই জটিল সাবজেক্ট। তুমি ওর মধ্যে নাক গলাতে এসো না, মাথা ঘুরে যাবে, এমন কি পাগল হয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। ও প্রশ্নটা বরঞ্চ আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি টাকার বিনিময়ে কাজ করছো। আমার প্রয়োজন কাজ, তোমার প্রয়োজন টাকা। নাট বল্টুর সঙ্গে যেভাবে খাপে খাপে আটকে যায়, এ ঠিক তাই। সোজা হিসাব।

বিকাশ : (অসহায়ভাবে) কিন্তু স্যার আমি যে গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারব না, conscience বলে যে জিনিষটা আছে তাকে কি করে অস্বীকার ....

লালওয়ানি : ধর তোমাকে যদি আমি প্রতিমাসে দু'হাজার টাকা দিই? ভেবে দেখ তোমার ঘরে মা, ভাই, বোন আছে। বোনদের বিয়ে দিতে হবে, ভাইকে পড়াতে হবে। কোথায় পাবে টাকা? কে দেবে? (লালওয়ানি বিকাশের চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে সম্মোহনকারীর মত শান্ত, সুরেলা গলায় বলে যায়) সমস্ত দেশ জুড়ে ছাঁটাই চলছে, চাকরি নেই, জিনিষের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। তুমি ভালভাবে বাঁচতে চাও, ঘরে আরও বেশি টাকা পাঠাতে চাও, বিয়ে করে ঘর সংসার করতে চাও, কে দেবে এত টাকা? কে দেবে? বিকাশ ভালভাবে ভেবে দেখ টাকা, দু-ই হাজার - টাকা, দু-ই হা-জা-র....

(বিকাশ আর সহ্য করতে পারেনা, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তার মনের মধ্যে অজস্র চিন্তা তাকে তাড়না করে। সে ঘন ঘন শ্বাস নেয়, তারপর হঠাৎ লালওয়ানির দিক পিছন ফিরে দাঁড়ায়)

বিকাশ : আমাকে ভাবতে দিন স্যার, আমাকে একটু ভাবতে দিন।

লালওয়ানি : নিশ্চয়ই দেব। ভাব, ভালভাবে ভেবে দেখ। তুমি যাতে ক্লারিকেল গ্রেডে যেতে পার তার ব্যবস্থাও আমি অবিলম্বে করতে পারি, জেনে রেখ। শুধু তোমার কাছ থেকে চাইছি একটা ছোট্ট রিপোর্ট।

(বিকাশ পায়চারি করে, চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে চুল এলোমেলো করে, ঠোঁট কামড়ায়, নিজের মনে বিড় বিড় করে.... 'দু'হাজার টাকা, প্রমোশন'... । শ্রমিকরা এবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে-)

প্রথম শ্রমিক : লালওয়ানি জব্বর টোপ ফেলেছে। বিকাশকে ও ঠিক গেঁথে ফেলবে, দেখে নিও।

দ্বিতীয় শ্রমিক : বিকাশের আরও সতর্ক হওয়া উচিৎ ছিল। যখনই লালওয়ানি এক হাজার টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলল, তখনই ওর বোঝা উচিৎ ছিল এর পিছনে কোন বদ মতলব আছে।

তৃতীয় শ্রমিক : কী করবে বেচারা, ঘরে অতগুলো খাইয়ে, তার উপর ওতো একেবারে বাচ্চা ছেলে। লালওয়ানির ফন্দি ওর বোঝার কথা নয়।

প্রথম শ্রমিক: তা ঠিক, ওকে কোন দোষ দেওয়া যায় না।
(বিকাশ পায়চারি থামা, তারপর টেবিলের খুব কাছে এসে সরাসরি লালওয়ানির দিকে তাকিয়ে বলে-)

বিকাশ : মাফ করবেন স্যার, আমি আপনার কাজ করতে পারব না।

লালওয়ানি : বেশ, এর পরিণাম তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছ?

বিকাশ : সামনের মাস থেকে যে এক হাজার টাকা বাড়াবেন বলেছিলেন...

লালওয়ানি : নাঃ তার আর কোন সম্ভাবনা দেখছি না।

বিকাশ : চাকরিটাও...

লালওয়ানি : ... চলে যাবে, সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। তবে এখন নয়, ছাঁটাইয়ের মরশুম আসুক, তখন। আমি তাড়াহুড়ো করে কিছু করিনা, তবে আমাকে এ ব্যাপারে অন্তত বিশ্বাস করতে পার।

বিকাশ : (হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে) বিশ্বাস! তোমাকে বিশ্বাস? শঠ, জোচ্চোর, শয়তান। ক্ষমতা থাকলে আমি এক ঘুষিতে তোমার ....

লালওয়ানি : (প্রাণ খুলে দরাজ গলায় হাসে) হাঃ হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ (আলো নেভে)

## ৪) অণিমার প্রেমিক

(ঝগড়ারত অণিমা ও তার ভাই সুশান্ত। অভিনয় যথারীতি স্পটের মধ্যে চলবে)

অণিমা : .... একশোবার যাব, হাজার বার যাবো। তাতে তোমার কি? তুমি কোন মেয়েকে ভালবাসলে আমি কক্ষণো এভাবে বাধা দিতে আসতামনা।

সুশান্ত : তুই ভালভাবেই জানিস অণিমা, শয্যাশায়ী না হলে আমি তোদের ব্যাপারে কক্ষণো নাক গলাতে আসতামনা।

অণিমা : আমি মাকে কোনদিন অবহেলা করিনি।

সুশান্ত : আমি সেরকম কোন অভিযোগ নিশ্চয়ই করিনি। আমার বলার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে মা চাননা তুই দেবুর সঙ্গে মেলামেশা করিস।

অণিমা : মাকে বলে দিও, আমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছি, আমি রোজগার করি। আমার ব্যাপারে তিনি যেন মাথা গলাতে না আসেন।

সুশান্ত : খুব ভাল কথা। তোমার আদেশ আমি মাকে জানিয়ে দেব। কিন্তু মনে রেখ দেবুর চাকরির কোন নিশ্চয়তা নেই।

অণিমা : কে বলেছে তোমাকে? ও পাঁচ বছর ধরে চাকরি করছে, ও নিশ্চয়ই এতদিনে পার্মানেন্ট হয়েছে।

সুশান্ত : (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) দেবু বুঝি তোকে তাই বলেছে?

অণিমা : দেবু মিথ্যা কথা বলে না। আমিই ওকে জিজ্ঞেস করিনি।

সুশান্ত : জিজ্ঞেস করলে ভাল করতিস। ওর সঙ্গে যদি ঘর বাঁধতে চাস তবে

এখন থেকেই হটযোগ প্র্যাক্টিস কর। জল, বায়ু এবং প্রয়োজন হলে ঘাস খেয়ে জীবনধারণ করতে হতে পারে।

অণিমা : তোমার ঠাট্টা আমার একদম সহ্য হয়না। আমি তোমাকে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি দাদা ও পার্মানেন্ট হোক আর নাই হোক, আমি ওকে ভালবাসি, আমি ওকে বিয়ে করব।

সুশান্ত : বাঃ ফুল ফুটুক না ফুটুক , আজ বসন্ত। চমৎকার! তোর যুক্তি খন্ডন করে কার সাধ্য? তবে আমি তোকে সবিনয়ে জানিয়ে রাখি, বছর পাঁচেক পর যদি কাচ্চাবাচ্চা সহ এ বাড়িতে ফিরে আসিস দরজা হয়ত তখন খোলা নাও পেতে পারিস।

অণিমা : না খেয়ে রাস্তায় পড়ে মরে থাকলেও তোমার দুয়ারে আমি কোনদিন আসব না, সে তুমি জেনে রাখ।

সুশান্ত : শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। (দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ) ওই তিনি আসছেন, আমি স্থানান্তরে গমন করি, তুমি তোমার টেম্পোরারি প্রেমিকের মোকাবিলা কর। (সুশান্ত দ্রুত ডানদিকের উইংস দিয়ে বেরিয়ে যায়। অণিমা এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে। বা পাশের উইংস দিয়ে দেবু ঢোকে। অণিমা ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ গম্ভীর করে।)

দেবু : কী ব্যপার, মুখ ভার করলে যে বড়? (হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) আজ কিন্তু আমি একদম দেরী করিনি। সাড়ে ছ'টায় আমাদের শো, এখন বাজে পৌনে ছ'টা। পনের মিনিটের রাস্তা, পথে এক কাপ চা-ও খেয়ে নেয়া যেতে পারে। চল চটপট বেরিয়ে পড়ি।

অণিমা : (ঘুরে দাঁড়িয়ে) আমি সিনেমায় যাবনা।

দেবু : কী ভয়ঙ্কর কথা! সালমান খান অভিনয় করবে আর তুমি যাবেনা? এযে অবিশ্বাস্য, অণি। এ নিশ্চয়ই সেই কুচক্রী ঋত্বিক রোশনের ষড়যন্ত্র।

অণিমা : ঠাট্টা ভাল লাগেনা, দেবু, আমার শরীরটা আজ ভাল নেই, আমি সিনেমায় যাচ্ছিনা, তুমি একাই চলে যাও। আমার টিকিটটা কাউকে বিক্রি করে দিও।

দেবু : যাঃ সে কি করে হয়? সলমান খানের ছবিতে তো তোমার জন্যই যাওয়া। আমার প্রিয় নায়ক হচ্ছে উত্তম কুমার। গ্র্যান্ড ওল্ড উত্তম। মনে আছে চৌরঙ্গীর সেই সিনটা যেখানে বোসদার রোলে উত্তম বলেছে (দেবু ঘাড় উঁচু করে চোখ অর্ধেকটা বুজে, গলা মোটা করে দার্শনিকসুলভ আচ্ছন্নতার ভাব নিয়ে বলে যায়) ' মাঝে মাঝে মনে হয় কি জান শঙ্কর প্রথম আমি যেদিন এই চৌরঙ্গী হোটেলে এসেছিলাম সেদিন কত নাচ, গান, আলোর বন্যা, মনে হয়েছিল এ বুঝি স্বর্গপুরী। আর আজ যখন চলে যাচ্ছি (বিষন্ন হেসে, দীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে, মাথা নেড়ে) মনে হচ্ছে সব কিছু ফাঁকা, একটা বিষন্নতা এসে ...'

অণিমা : (কানে হাত চাপা দিয়ে) উঃ অসহ্য ! উত্তমকুমারের ন্যাকামি আমি একদম সহ্য করতে পারিনা।

দেবু : সালমানের লম্ফঝম্ফ ঢিশুম ঢিশুম মারপিট কিন্তু আমার মন্দ লাগেনা, মনে হয় সার্কাস দেখছি। নিজেকে বেশ ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ মনে হয় যাই বল।

অণিমা : (রেগে) মিথ্যে কথা, সালমান কখনো লাফ ঝাঁপ দেয়না, যারা ওর বই দেখেছে তারা জানে ও খুব সোবার, অন্যান্য হিন্দি ছবির নায়কদের মত নয়।

দেবু : (নাটকীয় ভঙ্গীতে) তবে আর বিলম্ব কেন প্রিয়ে ? চল ত্বরা করি...

অণিমা : তোমার সঙ্গে আমার কিছু সিরিয়াস কথা আছে, দেবু।

দেবু : (একটু চমকে গিয়ে, ঢোক গিলে) পথে যেতে যেতে বললে হোত না ?

অণিমা : না, রাস্তায় লোক জড়ো করে কি লাভ বলোত ? আচ্ছা দেবু, তুমি আমাকে নিজের সম্পর্কে সব কথা খুলে বলনা কেন, বলোত ? আমাকে নিশ্চয়ই তুমি অবিশ্বাস করোনা ?

দেবু : কী ব্যাপার অণি ? এই ভর সন্ধ্যেয় আমাকে ঝেড়ে কাশতে বলছ ?

অণিমা : নিশ্চয়ই তোমার গলখাকারির অর্থ সব সময় স্পষ্ট নয় সেইজন্য।

দেবু : যথা ?

অণিমা : পাঁচ বছর চাকরি করেও তুমি যে এখনো পার্মানেন্ট হতে পারনি, তোমার যে কোন মুহূর্তে চাকরি চলে যেতে পারে, এটা আমার জানা ছিলনা।

দেবু : জানাবার প্রয়োজন মনে করিনি কেননা আমাদের ফ্যাক্টরিতে পঞ্চাশ জন ওয়ার্কার এবং স্টাফ-এর মধ্যে মাত্র দশজন পার্মানেন্ট, বাদ বাকি আমারই মত টেম্পোরারি।

অণিমা : (চোখ কপালে তুলে) তার মানে পঞ্চাশ জনের মধ্যে চল্লিশ জনের চাকরিই অনিশ্চিত ?

দেবু : তা নয়ত কি ? চাকরি পাকা হলে মালিকের অনেক অসুবিধে। গ্র্যাচুইটি, প্রফিডেন্ট ফান্ড, বোনাস সব কিছুই দিতে হবে। ছাঁটাই করতে হলেও তিন মাসের মাইনে দিতে হবে। লেবার ট্রাইব্যুনালে গিয়ে ওয়ার্কাররা মালিকের পিন্ডি চটকাবে। তাই ....

অণিমা : তাই এই দুরবস্থা। ধর আজ যদি তোমার চাকরি চলে যায় তবে তুমি কি করবে ?

দেবু : কেন, আরেকটা চাকরি ধরব ?

অণিমা : যদি চাকরি না জোটে ? বেকারের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে তোমার মত টাইম অফিসের ছোটবাবুর চাকরির বাজারে কি দাম আছে বল ?

দেবু : (লজ্জিতভাবে মুখ নিচু করে) তুমি ঠিকই বলেছ অণি, চাকরির বাজারে কিছুই দাম নেই। আমার মত কেরানি পুঁটি মাছের দরে বাজারে বিকোয়।

অণিমা : কিন্তু তোমার অভিজ্ঞতা? তারও কি কোন দাম নেই?

দেবু : যৎ সামান্য। মাছিমারা কেরানির অভিজ্ঞতা অনভিজ্ঞতার চাইতেও খারাপ। আমাদের মত ছোটখাট ফ্যাক্টরির কেরানিদের বড় অফিসে বা ফ্যাক্টরিতে কোনদিন জায়গা হয়না।

অণিমা : (এগিয়ে এসে দেবুর হাত ধরে) কিন্তু আমি যে ঘর বাঁধতে চাই দেবু।

দেবু : চোরাবালির উপর ঘর বেঁধে কি লাভ বল? দু'দিনেই যে আমাদের ঘর তলিয়ে যাবে, তখন?

অণিমা : কিন্তু এভাবে... শরতের মেঘের মত কতদিন আর আমরা বিচ্ছিন্নভাবে ঘুরে বেড়াব?

দেবু : (আত্মমগ্নভাবে) মাসের শেষে হাজার দশেক টাকা পাই, তার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা বাড়ি না পাঠালেই নয়। ছোট ভাই আর বোন এখনো স্কুলে। ওরা যতদিনে রোজগার করতে শুরু করবে ততদিনে হয়ত আমার চুল পেকে যাবে।

অণিমা : কাপড়ের দোকানে সেলস গার্ল আমি, হাজার পাঁচেক টাকা হাতে পাই। তার থেকে মাকে তো কিছু দিতেই হয়। দাদা একা কত সামলাবেন। ঘরে পাঁচজন খাইয়ে।

দেবু : তাহলে উপায়?

অণিমা : (মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে) আছে।

দেবু : বল।

অণিমা : কেন, আমার সালমান আর তোমার উত্তম।

দেবু : (অপ্রকৃতিস্থের মত হাসে) হোঃ হোঃ হোঃ হাঃ হাঃ হাঃ বেশ বলেছ অণি, বেশ বলেছ।

(দেবু হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে, চোখের জল মোছে)

অণিমা : (দেবুর হাত টেনে নিয়ে ঘড়ি দেখে) চল, আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

দেবু : হ্যাঁ, তাইতো(দেবু উঠে দাঁড়ায়)। এগোতে যায়। অণিমা হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়)

দেবু : কি হলো, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?

অণিমা : একটু দাঁড়াও, লক্ষ্মীটি। আমার হঠাৎ একটা পুরনো গান মনে পড়ে গেল। ছোটবেলা ঠাকুমার মুখে শুনেছিলাম। (অণিমা ঠোঁট কামড়ে, চোখ কুঁচকে গানটা মনে করার চেষ্টা করে, তারপর গুনগুন করে কাননদেবীর ঢঙে গায়) 'অনাদি কালের স্রোতে ভাসা, মোরা দুটি প্রাণ/নয়নে নয়নে জানিগো,

নয়নে নয়নে জানিগো।' (অণিমা হঠাৎ খিল খিল করে বাচ্চা মেয়ের মত হাসিতে ফেটে পড়ে) কী ন্যাকা, কী ন্যাকা, বাব্বা... শুনলে হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়। (অণিমা ক্ষণিকের জন্য হাসি থামিয়ে দ্বিতীয়বার গানটা গাইবার চেষ্টা করে-'অনাদি কালের স্রোতে... কিন্তু মাঝপথে হাসির দমকে ফেটে পড়ে)

অণিমা : (হাসির দমকের মাঝে মাঝে) .. নয়নে নয়নে... ও হোঃ হোঃ, যাই বল দারুণ কিন্তু .. হিঃ হিঃ হিঃ চন্দ্রশেখর সিনেমার গান ঠাকুমা বলেছিল আমাকে .. হুঃ হুঃ হুঃ কানন দেবীর গলায় ...

দেবু : (ধমক দিয়ে) কী পাগলামি শুরু করলে অণি, চল দেরী হয়ে যাচ্ছে আমাদের। (হঠাৎ হাসি থামিয়ে অণিমা দেবুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। তার ঠোঁটে বিষন্ন হাসি, চুল এলোমেলো। অণিমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, সে মুছবার কোন চেষ্টা করেনা)

দেবু : (ত্রস্ত হয়ে এগিয়ে এসে) অণি কাঁদছ কেন? কী হল তোমার?
(অণিমা জবাব দেয়না, শুধু নিঃশব্দে কান্নাভরা চোখে দেবুর দিকে তাকিয়ে থাকে। আলো নিভে যায়)

৫) **ব্যাঘ্রচর্মাবৃত শৃগাল**

সামন্ত : বন্ধুগণ, আপনারা আমার সমালোচনা করতে চান, আমার মতের বিরুদ্ধে মত প্রচার করতে চান, করুন। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। প্রত্যেকটি শ্রমিক তার গণতান্ত্রিক অধিকারের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন, আমি সেটাই চাই। কিন্তু যারা আমাদের মিটিং-এ গোলযোগ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন, তাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করা এবং তার নেতৃত্ব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে আসছি, তারা জানি শ্রমিকদের সংগ্রামের মুখে ঠেলে দেওয়া যত সহজ তাদের দাবি আদায় করা তত সহজ নয়। আমাদের মিল শ্রমিকদের কথাই চিন্তা করুন। মাত্র মাস তিনেক আগে আমেদাবাদের রাজন ক্লথ মিলসের মজুররা ধর্মঘট করেছিল। কিন্তু তার ফল কি হল? আমেদাবাদ জায়গাটা কোথায়? একরকম আমাদের নাকের ডগায়ই বলতে পারেন।

একজন শ্রমিক: মোটেই নয়, পাক্কা বারো ঘন্টার রাস্তা।

সামন্ত : স্বীকার করছি, কিন্তু প্লেনে গেলে দু'ঘন্টাও নয়। আমি যে কথা বলেছিলাম। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আজ আমাদের সভায় উপস্থিত আছেন এমন একজন শ্রমিক নেতা যিনি রাজন ক্লথ মিলসের

দু'হাজার শ্রমিকদের নিয়ে ধর্মঘটে নেবেছিলেন, যিনি মিলের ফটকের সামনে পিকেটিং করতে গিয়ে পুলিশের লাঠিতে গুরুতরভাবে আহত হন, এমন কি এক সপ্তাহ সশ্রম কারাদন্ড ভোগ করেন এবং সবচাইতে দুঃখের বিষয় (গলা অস্বাভাবিক থমথমে ভারী করে) যিনি ধর্মঘট উঠে যাবার পরও অন্যান্য শ্রমিকদের মত কাজে ফিরে যেতে পারেননি। কারন (থেমে অর্থবহ দৃষ্টিতে শ্রোতাদের উপর চোখ বুলিয়ে) আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। ধর্মঘটের পুরোভাগে থাকার জন্য যে পঁচিশজন মজুরকে কর্তৃপক্ষ ছাঁটাই করে, ইনি তাদের মধ্যে অন্যতম। তাই আমি মনে করি আমরা আজকের সভায় কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে এর মুখ থেকে রাজন মিলস-এর সাম্প্রতিক ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা জেনে নেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। শঙ্করলাল ক্লথ মিলসের মজদুর ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে উপস্থিত শ্রমিক কর্মচারীদের পক্ষ থেকে আমি শ্রী টেকচাঁদ শর্মাকে অনুরোধ করব তিনি যেন দয়া করে আমেদাবাদের সাম্প্রতিক ধর্মঘটের বিষয়ে তার যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আমাদের সামনে তুলে ধরেন।
(ঘোষণা শেষ করে সামন্ত জোরে জোরে তালি বাজায়। শ্রোতাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সাড়া দেয়। শর্মা এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ায়।)

শর্মা : আমার মজদুর ভাইয়েরা, আপনারা আজ আমার কথা শুনে যদি আমার বাপ মা তুলে গালিগালাজ করেন, এমনকি আমার মুখে থুতু দেন আমি আপনাদের কিচ্ছু বলব না। এমনকি আপনারা যদি আমাকে মাটিতে ফেলে মাড়িয়ে যান কিংবা আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে কুকুরকে দিয়ে খাওয়ান তবু আমি কিছু বলব না- যদি আমি বুঝি যে তাতে আপনাদের মিল শ্রমিকদের পকেটে দুটো বাড়তি পয়সা আসবে। ভুলে যাবেন না আমি আপনাদেরই একজন। রাজন মিলসের দু'সপ্তাহ ব্যাপী ধর্মঘটে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করে আমি আজ যা স্পষ্ট বুঝতে পাচ্ছি তা হচ্ছে এই যে আপনারা যে যাই মনে করুন সামন্তর কথাই ঠিক- স্ট্রাইক করে আপনাদের বিন্দুমাত্র লাভ হবে না, কিন্তু ক্ষতি হবে অপরিসীম । দিল্লি হরিয়াণার শ্রমিকদের সঙ্গো আমি গত একমাস ধরে কাজ করছি কিন্তু এই অল্প ক'দিনের মধ্যেই বুঝতে পাচ্ছি আপনাদের প্রকৃত অবস্থা কী এবং আপনাদের কী করা উচিৎ।

একজন শ্রমিক : (অন্যজনকে) শুনলিতো ধর্মঘট না করে মালিকের বাড়িতে ভগবতী জাগরণ করতে বলছেন উনি।

একজন বি. শ্রমিক: বসে পড় শালা শুয়োরের বাচ্চা!

শর্মা : (উঁচু গলায়) আওয়াজ দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করা যাবে না। আমি আবার

বলব সামন্ত যা বলেছে তাই ঠিক। স্ট্রাইক করার এখনও সময় হয়নি। আমার মনে হয় শ্রম-মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য অবিলম্বে আমাদের দাবিগুলি জানিয়ে একটা দরখাস্ত দেওয়া উচিৎ।

বিশেষ শ্রমিক : তার আগে তোর বাপের শ্রাদ্ধ কব, দ্যাখ শালা। (সে এবার সত্যিই উঠে দাঁড়িয়ে মারমুখী হয়ে শর্মার দিকে হাত গুটিয়ে এগিয়ে আসে। তার আশপাশের দু'একজন শ্রমিক 'আরে কী করছ সীতারাম, মারবে নাকি, বোসো বোসো, মজা দেখতে দাও' ইত্যাদি বলে তাকে রুখবার চেস্টা করে)।

সামন্ত : (কোণার দিকে সবার থেকে আলাদা বসে থাকা একটা ষণ্ডা মার্কা ছেলেকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দেয়) রাঘব! একে দু'ঘা দিয়ে বসিয়ে দেতো চটপট। ব্যাটা তাড়ি খেয়ে এসে বড্ড গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। (রাঘব ছুটে এসে সীতারামকে জাপ্টে ধরে, সীতারাম বুনো শুয়োরের মত গোত্তা মেরে রাঘবের হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে টেকচাঁদের সামনে দাঁড়ায়। রাঘব পিছু নিতে গেলে অন্য দু'তিনজন শ্রোতা তার পথ আটকে দাঁড়ায়। রাঘব কিছুটা হতাশ হয়ে সামন্তর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।)

সীতারাম : (টেকচাঁদকে) তুই শালা টেকচাঁদ হলি কবে থেকে এ্যাঁ? (শ্রোতাদের দিকে ফিরে) তোমরা সবাই জেনে রাখ এ দালালটার নাম টেকচাঁদ নয়, রামলাল, ব্যাটা দালালি করবার জন্য নাম ভাড়িয়েছে।

সামন্ত : (শাসিয়ে) সীতারাম আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি মিটিং ভাঙবার চেস্টা করলে আমি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দেব না।

সীতারাম : (মুখ বিকৃত করে) তোমার মিটিং-এর আমি নিকুচি করেছি। এ হারামজাদার আসল পরিচয়টা ফাঁস না করে আমি একপাও এখান থেকে নড়ব না, তোমাকে সাফ বলে দিচ্ছি সামন্ত। যদি বাধা দিতে আস ছেড়ে দেবনা, জেনে রেখ। আর কিছু না পারি দাঁত দিয়ে তোমার কান কামড়ে ছিঁড়ে ফেলব নয়তো চোখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দেব ( ভাব ভঙ্গিতে সীতারাম তার আক্রমণের পদ্ধতি প্রাঞ্জল করে। সামন্ত ভয় পেয়ে একটু পিছিয়ে আসে, তারপর রাঘবকে বলে)

সামন্ত : রাঘব, এই বদমাসটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দে। কোন অবস্থায়ই আমি এই জরুরি মিটিং ভাঙতে দেবনা।
(রাঘব আবার এগিয়ে আসে, সীতারাম হা করে রাঘবকে কামড়াতে আসে, রাঘব পিছু হটে এসে সামন্তের দিকে তাকায়। আগের কয়েকজন শ্রোতা সামন্তকে উদ্দেশ্য করে চেঁচিয়ে ওঠে সীতারাম যা বলতে চাইছে বলুক, ওকে কেন আটকান হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর বক্তব্য আমরা শুনতে চাই ইত্যাদি।)

সামন্ত : অন্য একজন বক্তার বক্তৃতার মাঝখানে কথা বলার ওর কোন অধিকার নেই ও যা বলতে চায়, পরে বলুক।

সীতারাম : (গলা ফাটিয়ে আঙুল দিয়ে টেকচাঁদ শর্মাকে দেখিয়ে) এ শালা মালিকদের পোষা দালাল। শুনে রাখ তোমরা এ লোকটা মালিকের ভাড়াটে গুপ্তচর।

সামন্ত : (দাঁতে দাঁত ঘসে) যদি প্রমাণ করতে না পারিস তবে তোর গায়ের চামড়া আমি তুলে নেব মনে থাকে যেন।

সীতারাম : প্রমাণ? কিসের প্রমাণ? ওর বুকের পাটা থাকে বলুক ও মালিকের পোষা কুত্তা নয়! আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলুক।

টেকচাঁদ : (ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে, স্খলিত স্বরে) মিথ্যে কথা সব মিথ্যে কথা। আমি ... আমি তোমাকে চিনিনা।

সীতারাম : তোমরা কেউ খোঁজ রাখ এই বদমাশটা ধানবাদের আশপাশের কোলিয়ারি গুলিতে মালিকের পয়সা খেয়ে পঁচিশটা ইউনিয়ন ভেঙেছে। পঞ্চাশটা লোককে জেলে পাঠিয়েছে। বিহার , গুজরাট, মহারস্ট্রে স্টিল, কয়লা খনি আর কাপড়ের মিলে ভাড়াটে গুন্ডা লেলিয়ে কয়েকশো ইউনিয়নের পান্ডাদের হাত-পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে, মজদুরদের ভয় দেখিয়ে মালিকের পায়ের নীচে ঠেলে ফেলেছে। আর এখন, এখন এ কুত্তার বাচ্চা...

টেকচাঁদ : (সামন্তের দিকে তাকিয়ে হাসবার চেস্টা করে) লোকটা মনে হচ্ছে সত্যিই খুব নেশা করেছে।

সীতারাম : (টেকচাঁদের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে, উত্তেজিতভাবে) তোমরা সবাই জেনে রাখ এ শালা শুয়োরের বাচ্চা এখন এ তল্লাটে সেই কুখ্যাত নবাবের দলে ঢুকে গুন্ডা ভাড়া করে দিল্লি, হরিয়াণা, চন্ডীগরের ফ্যাক্টরীগুলিতে ধর্মঘট বানচাল করবার জন্য মজদুরদের ধরে ধরে চোরাগোপ্তা ঠ্যাঙানি দিয়ে যাচ্ছে। যদি বাঁচতে চাও তো একে তোমরা সবাই ভালভাবে চিনে রাখ, এই আমার শেষ কথা।

টেকচাঁদ : (হাত ঠোঁট কাঁপছে) আমাকে আপনাদের জেনারেল সেক্রেটারি ভালভাবেই জানেন কাজেই নতুন করে আর আপনাদের সামনে আমার পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আমার মনে হচ্ছে এ লোকটা আপনাদের মিটিং ভেঙে দেবার জন্য এসেছে। আমার মজদুর ভাইয়েরা ভয় পাবেন না বা উত্তেজিত হবেননা, নিজের জায়গায় শান্তভাবে বসে থাকুন। আমরা এক্ষুণি ওর মুখোশ খুলে নেব।

সীতারাম : কী বললি তুই, আমার মুখোশ খুলে দিবি, এত সাহস তোর এ্যাঁ? আয় দেখি কে কার মুখোশ খোলে। (ফিরে দাঁড়িয়ে) তোমরা জান এ হারামির বাচ্চার পরিচয়, জান কেউ?

টেকচাঁদ : আমার মজদুর ভাইয়েরা, আপনারা এই মাতালটার কথায় কান দেবেন না। একে আমি চিনি না, এর আগে কোনদিন এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি।

সীতারাম : (গলা নামিয়ে ভাঙা গলায় ) বিশ্বাস করবে তোমরা এই বদমাশটার সঙ্গে ষোল বছর আমি এক বিছানায় ঘুমিয়েছি? বিশ্বাস করবে মজদুরদের দুষমণ এই নেমকহারাম আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই?

সামন্ত : (ঝুঁকে, শর্মার কানের কাছে মুখ এনে) ও যা বলছে তা কি সত্যি? (শর্মা কোন জবাব দেয়না।)

সীতারাম : (দাঁতে দাঁত চেপে) ভগবানের কিরে, মাথাটা গুড়িয়ে দেবার আগে এখান থেকে কেটে পড় রামলাল। (টেকচাঁদ নিঃশব্দে টেবিল ছেড়ে সরে দাঁড়ায়, তারপর সন্ত্রস্তভাবে একবার সামন্তর দিকে এবং আরেকবার শ্রোতাদের দিকে তাকাতে তাকাতে পিছু হটতে থাকে। কয়েকজন শ্রোতা হাতা গুটিয়ে উঠে আসতেই টেকচাঁদ প্রাণের তাগিদে চোঁচা দৌড় লাগায়। সীতারাম এবার বক্তার জায়গায় দাঁড়িয়ে বলে) মুখটা তোমরা চিনে রেখ, কোনদিন আর সব কিছু পাল্টালেও ওটা ও কোনদিন পাল্টাতে পারবেনা। (সামন্তকে উদ্দেশ্য করে ) কিন্তু সামন্ত এটা কী করে সম্ভব? দুনিয়ার ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে তোমার দহরম মহরম আর এ বদমাসটাকে তুমি চেননা? এযে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। (সামন্ত কোন জবাব দেয়না। আলো কমে আসে। সীতারাম ফ্যালফ্যাল করে সামন্তর ভাবলেশহীন মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে, তারপর কপাল চাপড়ে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বলে-)

সীতারাম : হায় রাম! কে জানত পণ্ডিত হরপ্রসাদের ঘরে এমন খরতনাক দুষমণ জন্মাবে।

(আলো নিভে যায়)

৬) **প্রচার**

(এই দৃশ্যে ফিল্মে যেভাবে কাটশটের সাহায্যে কতগুলো টুকরো ঘটনাকে একসঙ্গে গ্রন্থীবন্ধ করা হয় তেমনিভাবে তৈরি করতে হবে। এই দৃশ্যে সামন্ত তার সহকর্মিদের ধর্মঘটের বিরুদ্ধে রায় দেবার জন্য প্ররোচনা দিতে সচেস্ট হবে। অন্ধকার স্টেজে DRC -এ স্পট জ্বলবে। সামন্ত দু'জন সাধারণ শ্রমিককে বোঝাবার চেস্টা করছে।

সামন্ত : কালকের মিটিং -এ তোমরা আসছ তাহলে, কেমন?

প্রথম শ্রমিক : নিশ্চয়ই, আপনি যখন বলছেন...

দ্বিতীয় শ্রমিক : আমাদের কী করতে হবে সামন্তদা?

সামন্ত : আমি যখন স্ট্রাইকের বিপক্ষে হাত তুলতে বলব তখন হাত তুলবে, মনে

থাকবে তো?

প্রথম শ্রমিক : (দ্বিতীয় শ্রমিককে ইশারা করে) তাহলে টাকার ব্যাপারটা এখনই মিটিয়ে দেন বাবু, পরে আপনার যদি মনে না থাকে।

সামন্ত : মিটিং-এর পরে আমার বাড়ি এস, তখন...

দ্বিতীয় শ্রমিক : তা কি করে হয় বাবু, অন্তত আগাম শ'খানেক টাকা না দিলে..

সামন্ত : বেশ, তাই দিচ্ছি। (পকেট থেকে টাকা বের করে দু'জনকে দেয়। দু'জন চারপাশে তাকিয়ে টাকাগুলো চটপট পকেটে পুরে ফেলে)তাহলে ওই কথাই রইল, কেমন?

প্রথম শ্রমিক : আপনি ভাববেননা বাবু, আমরা ঠিক সময়মত হাত তুলে দেব।

সামন্ত : আর শোন, একটা নয় তোমরা দুটো হাতই তুলবে।

দ্বিতীয় শ্রমিক : সে কি করে হয়, সবাই যে দেখে ফেলবে।

সামন্ত : (গলা খাটো করে) ভোটাভুটির সময় সবার পিছনে চলে যাবে। কারও পিছনে চোখ নেই। তোমরা কী করছ না করছ কেউ দেখতে পাবে না। তারপর যখন সময় হবে তখন এমনি করে (সামন্ত মাথা নিচু করে দুই হাত তুলে দেখায়) দুই হাত তুলবে। এক মিনিটের ব্যাপার। আমিই হাত গোনার দায়িত্ব নেব, কাজেই চিন্তার কিছু নেই।

প্রথম শ্রমিক : কিন্তু বাবু, আপনি যা রেট করেছেন শুনেছি তাতেতো এক হাত তুললো দুশো টাকা। দু'হাতের জন্য আমাদের চারশো করে দিন নইলে এতটা ঝুঁকি পোষাবেনা বলে দিচ্ছি।

সামন্ত : (শক্ত হয়ে) গাড়োলের মত কথা বোলনা, এক হাতে একশ, দু'হাতে দুশো। এতে যদি না পোষায় অটলের কাছে যাও। পাছায় দুই লাথি মেরে ভাগিয়ে দেবে। আমি আর এক টাকাও বেশি দিতে পারবনা।

দ্বিতীয় শ্রমিক : ছেড়ে দে কানাই, যা জুটছে তাই নিয়ে নে। বাবু এখন ঠেকায় পড়ে এসেছেন, এখন ঝামেলা করিসনি। (সামন্তকে দাঁত কেলিয়ে) ভোটে আপনার জয় হলে কিন্তু মিস্টি খাবার জন্য পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে, সেটা কিন্তু ছাড়বনা বাবু।

সামন্ত : (পিঠ চাপড়ে দিয়ে) সে দেখা যাবে খন। এখন যা, গিয়ে তোদের ইয়ার দোস্তদের পটাগে যা। যে কটা মজদুর আমার জন্য হাত তুলবে বলিস সব্বাইকে আমি দুশো করেই রেট দেব। একহাত একশো দুই হাত দুশো।

প্রথম ও
দ্বিতীয় শ্রমিক : যাচ্ছি বাবু, এক্ষুণি যাচ্ছি।

(দু'জন শ্রমিক দুই দিক দিয়ে ছুটে স্টেজ থেকে বেরিয়ে যায়। আলো নেভে। অন্ধকারে মন্থর পায়ে সামন্ত হেঁটে যাবে স্টেজের DRLC-তে।

স্পট সামন্তের উপর পড়লে দেখা যাবে সে পান্ডের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। চোখ, মুখ হাতের ভঙ্গিতে পাণ্ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করছে, পান্ডে তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে। কয়েক মুহূর্ত মাইমের সাহায্যে এইভাবে অভিনয়ের পর উভয়ের গলা শোনা যাবে-)

সামন্ত : ভুলে যেওনা পান্ডে, ছেলেবউ নিয়ে ঘর করছ, স্ট্রাইক হলে অটল একা মানুষ ওর গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগবে না। ওর অবস্থাও শুনেছি ভাল, কিন্তু তোমরা? তোমরা না খেয়ে মরবে রাস্তার কুকুরের মত।

পান্ডে : ভয় পাইনা, সামন্ত। অফিস পাড়ায় কিলো দুয়েক কলা, মুলো, পেপে নিয়ে বসবো। দিনে গোটা পঞ্চাশ টাকা ঠিক রোজগার করতে পারব। আমার বউতো ঝিগিরিতে নামবার জন্য কোমড়ে কাপড় জড়িয়ে তৈরিই হয়ে আছে।

সামন্ত : আমি তোমাকে তিনশো পর্যন্ত দিতে রাজি আছি।

পান্ডে : (হেসে) কী ব্যাপার, সামন্ত আমার জন্য কবে থেকে আলাদা রেট বাঁধলে বলোত? আমি দু'হাত তুলতে পারবনা আগেই বলে দিচ্ছি। গত বছর আমার বাঁ হাতটা ভেঙে যাবার পর ওটা আর কাঁধের উপর ওঠেনা, কী মুস্কিল বলোত?

সামন্ত : (গম্ভীরভাবে) এটা ইয়ার্কির সময় নয় পাণ্ডে। টাকা নিচ্ছ কি নিচ্ছনা, স্পষ্ট করে বল।

পান্ডে : তোমার টাকা হজম করতে পারব না সামন্ত, গলায় আটকে থাকবে।

সামন্ত : (রেগে গিয়ে) তবে মর, দেখব কে তোমাকে রক্ষা করে।

পান্ডে : মারে সামন্ত রাখে কে, এই কথাতো? এ আর নতুন কি?

(আলো নিভে যায়। এবার স্পট পড়ে MLC স্টেজে। স্পটে দাঁড়িয়ে সীতারাম খৈনি টিপছে। সামন্ত অন্ধকার থেকে স্পটে ঢোকে। তার হাঁটার ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় সে কিছুটা ক্লান্ত, মুখে চিন্তার ছাপ। সীতারাম সামন্তের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকায়, ধীরে সুস্থে খৈনি মুখে পোরে, তারপর চোখের ইশারায় প্রশ্ন করে- 'কী ব্যাপার?' সামন্ত মাইমের সাহায্যে হাত পা নেড়ে তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে। তারপর সে হাতের ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয় একহাত তুললে একশো আর দু'হাত তুললে দুশো টাকা। সীতারাম চোখ পাকিয়ে ভয়ানক মুখ করে আঙ্গুল দিয়ে সামন্তকে বেরিয়ে যেতে বলে। সামন্ত আবার মাইমের সাহায্যে সীতারামকে ঠান্ডা করার চেস্টা করে। সীতারাম এবার এক হাতে পা থেকে জুতো খুলে নিয়ে অন্যহাতের তর্জনী দিয়ে সামন্তকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দেয়। সীতারাম শেষ চটি হাতে এক পা এগোতেই সামন্ত ল্যাজ গোটানো কুকুরের মত

স্পট ছেড়ে অন্ধকারে বেরিয়ে আসে। এবার আলো জ্বলে ULC স্টেজে। স্পটে দাঁড়িয়ে অণিমা। সামন্ত ক্লান্ত, হতাশ মানুষের ভঙ্গিতে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অনিমার সামনে এসে দাঁড়ায়। শ্লথ, পরিশ্রান্ত ভঙ্গিতে দেঁতো হাসি হেসে সে মাইমের সাহায্যে অণিমাকে বোঝাবার ভঙ্গি করে। অণিমা কাপড়ের খুঁট দাঁতে কাঁটতে কাঁটতে কিছুটা অন্যমনস্কভাবে সামন্তর ভাব ভঙ্গি লক্ষ্য করে। কয়েক মুহূর্ত মাইমেরপর সামন্তের গলা শোনা যায়। )

সামন্ত : তুমি বললে দেবু ঠিক শুনবে। তোমার কথা ও কক্ষণো ফেলতে পারবেনা।

অণিমা : ওকে আপনি চেনেন না, ও ভীষণ গোঁয়ার।

সামন্ত : ওকে বলবে লালওয়ানিকে বলে আমি ওর মাইনে বাড়িয়ে দেব।

অণিমা : অটলকে গিয়ে বলুন। অটল হচ্ছে ওর গুরু। এসব ব্যাপারে আমার কথা ও একদম কানে তুলবে না।

সামন্ত : তবু তোমার কথার একটা দাম আছে। ধড়পাকড় শুরু হলে ও রেহাই পাবেনা, হাজতে নিয়ে পুলিশ খুব পেটাবে। (সামন্ত চোখের কোণ দিয়ে অণিমার মুখের ভাব পরিবর্তন লক্ষ করে নেয়) আর যত ছোট চাকরিই হোক একবার চাকরি গেলে কে ওকে চাকরি দেবে বল?

অণিমা : (অসহায় কাঁদো কাঁদো মুখে) আমি কী করব বলুন? আমার কথা যে ও একদম শোনেনা। আমি কোথায় যাই, আমি কী করি বলুনতো সামন্তবাবু? ওর কিছু হলে আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব... আমি বিষ খেয়ে মরবো।

সামন্ত : (হঠাৎ চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অণিমার শেষ কথায় তার মাথায় হঠাৎ যেন কোন নতুন চিন্তার উদয় হয়েছে) ছি ছি অণিমা এসব চিন্তা মনে আনাও পাপ। আমি থাকতে দেবুর গায়ে হাত দেবার কারও ক্ষমতা নেই জেনে রাখ। হ্যাঁ শোন, তোমাকে একটা বুদ্ধি বাতলে দিচ্ছি, দেবুকে তুমি নির্ঘাত বশ করতে পারবে।

অণিমা : (হাঁপ ছেড়ে, উল্লসিত কণ্ঠে) সত্যি আপনাকে যে আমি কী বলে ধন্যবাদ...

সামন্ত : শত হলেও দেবু আমার সহকর্মি, তুমি আমার বোনের মত। শোন, আজ দেবু এলে তুমি ...
(সামন্ত অণিমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে তাকে পরামর্শ দেবে)

অণিমা : (খুশি মুখে) বাঃ চমৎকার বুদ্ধি দিয়েছেন তো আপনি! ঠিক সিনেমার মত হবে। উঃ ভাবতেই আমার গা কেমন শির শির করছে। যাই বলুন দেবু কিন্তু বেশ ভিতু আছে।

সামন্ত : (খুশি মুখে) হেঁ হেঁ, সেই জন্যেইতো বললাম। মনে থাকে যেন বিষ

খাবার পর নিঃশ্বাস খুব আস্তে আস্তে ফেলবে। হাতের মুঠো শক্ত, চোখ আধবোজা .....

অণিমা : (খুশিতে ডগমগ) আপনি কিছু ভাববেন না সামন্তবাবু, সিনেমায় দেখে দেখে এসবতো মুখস্ত হয়ে গেছে। ওঃ দারুণ হবে কিন্তু...

সামন্ত : হেঁ হেঁ ... আচ্ছা আমি তাহলে চলি দিদি, কেমন? যাবার পথে আমি শিবু ডাক্তারকে সব বুঝিয়ে দেব, তোমার কোন ভয় নেই। (সামন্ত হাতজোড় করে নমস্কার করে ডান দিকে ঘুরে স্পট থেকে বেরোয়। অণিমা সেদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে, তারপর মুচকি হেসে স্বগোতক্তি করে-)

অণিমা : কে বলবে আমি অভিনয় জানিনা? বুড়ো শেয়ালটা কেমন খুশিতে ডগমগ হয়ে চলে গেল। ও যদি জানত দেবুকে আমিই অটলের সঙ্গে থাকতে বলেছি তবে নির্ঘাত মূর্ছা যেত। ভাগ্যিস দেবু আগেই ওর সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছিল, নইলে যা ভয় দেখাতে শুরু করেছিল, বাবা...

(আলো নিভে যায়। এবার স্পট পড়ে UMC স্টেজে। ঝাঁটা বা বেলনচাকি হাতে কোমড়ে কাপড় আঁট করে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে কল্যাণী। স্পটের বাইরে অন্ধকারে তার দৃষ্টি যেন কী খুঁজে বেড়াচ্ছে। মনে হয় সে অন্ধকারের মধ্যে কোনো ছুঁচো বা কীট পতঙ্গ দেখেছে এবং সেজন্য তৈরি হয়ে আছে। কাছে এলেই ঝাঁটার সাহায্যে শত্রু নিপাত করবে। খুশিমুখে দুই হাত জোড়া করে নমস্কার জানায় সামন্ত কল্যাণীকে। কল্যাণী এতক্ষণে যেন তার উত্যক্তকারী কীটটিকে খুঁজে পেয়েছে এমনি ভঙ্গিতে ঝাঁটা বা বেলনকাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে। সামন্ত দুই হাতে মাথা বাঁচিয়ে দৌড়াবার ভঙ্গি করে। আলো নিভে যায়। এবার আলো জ্বলে স্টেজের URC-তে। উইংসের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লালওয়ানি। সামন্ত এসে কাছে দাঁড়ায়।

লালওয়ানি : কি রকম বুজছ, সামন্ত?

সামন্ত : ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা, স্যার। কয়েকটাতে তো লোভ দেখিয়ে হাত তুলতে রাজি করিয়েছি কিন্তু অটলের গ্রুপটা নিয়েই হয়েছে মুস্কিল....

লালওয়ানি : যারা টাকা পেয়েছে তারাও অটলের পক্ষে হাত তুলে বসতে পারে, সেটা খেয়াল রেখ।

সামন্ত : তা হবেনা স্যার। সব টাকা আমি থোড়াই দিয়েছি ওদের। হাত তুলবে তবে পাবে, তার আগে নয়।

লালওয়ানি : তুমি তো ওদের একবার দেবে, কিন্তু অটল যে ওদের বুঝিয়েছে স্ট্রাইক সাকসেসফুল হলে দু'হাজার টাকা মাইনে বাড়বে সেটার লোভ ওরা কী করে সামলাবে বলতে পার?

সামন্ত : কী যে বলেন স্যার। ওরা সব মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আখেরের কথা একদম ভাবেনা। হাতের মুঠোয় যা পাচ্ছে তাই নিয়েই ওদের কারবার।

লালওয়ানি : অটলের কাছে আমাদের ব্যালান্স শিট আছে, আছে লাভ লোকসানের নাড়ী নক্ষত্র হিসেব। সবাই জেনে গেছে ত্রিশ দিনের লাগাতার স্ট্রাইক চালাতে পারলে আমরা শুকিয়ে মরব। এমনকি ছাঁটাই করেও ক্ষতিপূরণ হবে না। তখন লাভের গুড় যে পিঁপড়েয় খাবে সেটা চিন্তা করেছ সামন্ত?

সামন্ত : এই শালা অটলের ভাল ব্যবস্থা করতে হবে স্যার নইলে ...

লালওয়ানি : হ্যাঁ বেশ ভাল ব্যবস্থা করা দরকার। ও মিটিং -এ এলে স্ট্রাইক হবেই সেটা ভুলে যেওনা।

সামন্ত : (ইষৎ দ্বিধীগ্রস্তভাবে) আপনি যদি অনুমতি দেন স্যার তবে... (লালওয়ানির) মনের ভাব বুঝে নেবার চেস্টা করে) ও যাতে আর কোন মিটিং-এ না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করে ফেলি, কী বলেন স্যার? নবাবদের দলের টেকচাঁদের সঙ্গে আমার খুব খাতির আছে। ওকে নিয়েই ....

লালওয়ানি : ( অসহায় মুখ করে) কিন্তু আইন আদালত যে আমি একদম সহ্য করতে পারিনা সামন্ত।

সামন্ত : ওরা প্রফেশনাল স্যার... আপনি কিছু চিন্তা করবেন না ।

লালওয়ানি : বেশ বেশ, তাহলে তুমি যা ভাল বোঝ তাই কর।

(লালওয়ানি টুক করে উইংসের ভেতর সেধিয়ে যায়। সামন্ত ঘুরে দাঁড়ায়। তার কোণাকুণি স্টেজের ঠিক DLC-তে স্পট পড়ে। স্পটে দাঁড়িয়ে আছে টেকচাঁদ। তার ঠোঁটে সিগারেট। সামন্ত তার দিকে তাকাতেই সে হাত তোলে। সামন্তও হাত তোলে সামন্ত হাতের ইঙ্গিতে মাথায় আঘাত করার নির্দেশ দেয়। টেকচাঁদ ঘাড় নেড়ে জানায় সে বুঝেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথার পিছন দিকে হাত দিয়ে সে দেখিয়ে দেয় ঠিক কোন জায়গায় সে আঘাত করবে। সামন্ত ঘাড় নাড়ে, তারপর দু'জনেই হাত তোলে। সম্পূর্ণ স্টেজ অন্ধকার হয়ে যায়।

## ৭) সিদ্ধান্ত

সীতারাম : ভদ্দরলোক ও ভদ্দরমহিলাগণ, আমার কথাগুলো এবার একটু মন দিয়ে শোন। ভদ্দরমহিলা এখানে কেউ নেই বলে যেন আবার তোমরা চেঁচামেচি শুরু করে দিওনা। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি তেনাদের অনেকেই প্যান্ট পরে আমার সামনে বসে আছেন। কি বিশ্বাস হলনা বুঝি কথাটা? বেশ তাহলে ধরে নাও আমারই মাথায় কোন গন্ডগোল আছে। ছোটবেলা একবার মার কোল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, সেই থেকেই দিমাগটায়

| | | |
|---|---|---|
| | | একটু গন্ডগোল ....। |
| প্রথম শ্রমিক | : | বকওয়াস বন্ধ্ কর সীতারাম। |
| দ্বিতীয় শ্রমিক | : | বসে পড় বে। |
| সীতারাম | : | (সামন্তকে উদ্দেশ্য করে) মিটিং-এ আওয়াজ দেবার জন্য তোমার রেট কত সামন্ত একবার বলবে? হাত তোলার জন্য দুশো দিলে আওয়াজ দেবার জন্য অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা দেওয়া উচিৎ। |
| সামন্ত | : | (ক্রুদ্ধ) খৈনি ছেড়ে তুমি যে গাঁজা ধরেছ তা বেশ বুঝতে পাচ্ছি। যদি তোমার বলার কিছু না থাকে তো চটপট নেবে যাও। আমরা এবার একটা সিদ্ধান্ত নেব। দরকার হলে ভোট হবে। |
| সীতারাম | : | (খেপে গিয়ে) আমাকে আবার তুমি খেপিয়ে তুলছ সামন্ত। বেশি খেপলে আমি কিন্তু পাগলা কুত্তার মত তোমাকে কামড়াতে আসব, মনে থাকে যেন। আমার বাপ ঠাকুর্দা খৈনি খেত, আমিও খাই। খোদা কসম, আমি গাঁজা খাইনা। আমি এখানে দাঁড়িয়ে দু'ঘন্টা বক্তৃতা দেব, দেখি কার বাপের সাধ্য আমাকে থামায়। কেন, আমি কি শালা ইউনিয়নের মেম্বর নই? আমি শালা বছরে একশো টাকা চাঁদা দিইনা? |
| তৃতীয় শ্রমিক | : | ওকে ঘাটিওনা সামন্ত। খেপে গেলে কিন্তু ও সব লন্ড ভন্ড করে দেবে। ওর মাথায় ছিট আছে, কে না জানে। |
| সীতারাম | : | হ্যাঁ আমার মাথায় ছিট আছে। আমার মত এগারো বছর বয়সে যদি পেটের দায়ে ফার্নেসে বারো ঘন্টা কাজ করতে হত তবে তোমাদের প্রত্যেকের মাথার ইস্ক্রুপ ঢিলে হয়ে যেত। (হঠাৎ যেন সীতারামের পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়,সে স্বগোতক্তি করে) ফার্নেসের আগুনের তাপে বাঁ চোখটা গলে গেল। আগুনের তাপে চুলগুলি সব সাদা হয়ে গেল, গায়ের চামড়া কুঁচকে গেল। শাদি করতে গেলাম শালা মেয়ের বাপ কিছুতেই বিশ্বাস করলনা আমার বয়স পঁচিশ। বলে তোমারতো হরিদ্বার যাবার বয়স হয়েছে ভাই,কেন আর এই বয়সে সংসারের ঝামেলা মাথায় নিচ্ছ? |
| প্রথম শ্রমিক | : | ব্যাটাকে তক্ষুণি তোমার কামড়ে দেওয়া উচিৎ ছিল সীতারাম। |
| সীতারাম | : | আমার সঙ্গে মজাখ কোরনা তোমরা। মন দিয়ে আমার কথা শোন, তোমার চোদ্দ পুরুষের কাজে লাগবে। আমাদেরও একটা ইউনিয়ন ছিল। সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্ট, মেম্বার কারও পায়ের ডগায় কোনদিন ফোস্কা পড়েনি, কী করে পড়বে? তেনারা কোনদিন ফার্নেসের দু মাইলের মধ্যে আসেননি। ম্যানেজারের ঘরে বসে গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর করতেন সেইসব ভদ্দরলোকেরা আর মালিকের বাড়িতে পার্টি হলে পিপে পিপে |

মদ গিলতেন (সামন্ত কটমট করে তাকায় সীতারামের দিকে, তারপর রাঘবের সঙ্গে পরামর্শ করে। সীতারাম তা লক্ষ করে হঠাৎ সুর পাল্টায়।) তোমরা আবার কথার উল্টোপাল্টা অর্থ করে বোসনা যেন। আমি যা বললাম সবই শোনা কথা, নিজের চোখে দেখা নয়। একচোখে আর কতটা দেখা যায় বল?

দ্বিতীয় শ্রমিক : ঠিক কথা। শোনা কথায় বিশ্বাস নেই।

সীতারাম : কিন্তু আমি শুনেছি সব ইউনিয়নেরই একই হালত। পান্ডারা সব মজদুরদের টাকায় মদ মেয়েছেলে নিয়ে ফূর্তি করে বেড়ায়। মজদুররা খেপে গেলে পান্ডারা মালিকের হাত পা ধরে দু'চার টাকা পাইয়ে দেয়।

প্রথম শ্রমিক : এবার আমাদের ইউনিয়নের সম্পর্কেও একটু আধটু বল, নইলে আমাদের চোদ্দ পুরুষ যে উদ্ধার হবেনা।

সীতারাম : আমাদের শঙ্করলাল ক্লথ মিলসের ইউনিয়ন হচ্ছে ভারতের একমাত্র সাচ্চা ইউনিয়ন।

(একসঙ্গে অনেকগুলো তালি পড়ে)

সামন্তের মত নেতা যে ইউনিয়নে আছে সে ইউনিয়ন দরকার হলে মজদুরদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে স্বর্গের টিকিট ধরিয়ে দিয়ে বলতে পারে, 'যাও ভাই নীচে অনেক কষ্ট করেছ, এবার উপরে গিয়ে ফূর্তি কর।'

সামন্ত : বড্ড বাজে বকছ সীতারাম।

সীতারাম : কী বললে বাজে বকছি? আমার মাথায় গণ্ডগোল আছে সেটা কি প্রত্যেকে দু'মিনিট পর তোমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে?

১ম ও ২য় শ্রমিক : কারও কথায় কান দিওনা সীতারাম, তুমি বলে যাও।

সীতারাম : হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমাদের মত সাচ্চা ইউনিয়ন ভারতে আর একটাও নেই। নেতারা সব শের কা বাচ্চা শের। এক একজন গলাখাঁকারি দিলে পর্যন্ত ভয়ে মালিকের প্যান্ট খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু আমি, আমি শালা কে?

প্রথম শ্রমিক : তুমি হরিদাস পাল।

সীতারাম : না আমি সীতারাম, মজদুরদের দুষমণ টেকচাঁদ ওরফে রামলালের ভাই সীতারাম। বউ ছাড়া আর কারও সঙ্গে আজ পর্যন্ত কোন লড়াই করিনি। জেল খাটিনি একদিনও কিন্তু বেগার খাটছি আজ পঞ্চাশ বছর, তার কি দাম বল? আমাদের সামন্ত যাকে বলে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামজাত অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি' সেসব কিছুই নেই। তবু কুজোরও মধ্যে মধ্যে চিৎ হয়ে শোবার শখ হয়। সকালে ভাবলাম আজ যখন ইউনিয়নের মিটিং আছে অন্তত ইউনিয়নের ব্যাজটাতো বুকে সেঁটে নিই, বুকে একটু বল পাব। লে হালুয়া, ব্যাজটা হাতে নিতেই এমন একটা বদ গন্ধ নাকে লাগল যে

কী বলব তোমাদের, ঠিক যেন মড়া পোড়া গন্ধ।

সামন্ত : অসহ্য। পাগলামি করতে হয় পাগলা গারদে যাও, এখানে নয়। আয়তো রাঘব। এটাকে এখান থেকে টেনে বের করতো।

(সামন্ত ও রাঘব একসঙ্গো ঝাঁপিয়ে পড়ে সীতারামের উপর। সীতারাম রাঘবের হাত কামড়ে দেয়। রাঘব 'উঃ' বলে চিৎকার করে পিছনে হটে আসে। সীতারাম ছিটকে বেরিয়ে আসে স্টেজের ডানদিকে, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তার শার্ট ছিঁড়ে গেছে। কেউ কেউ হেসে ওঠে।

সীতারাম : (চেঁচিয়ে) দেখলেতো? দেখলেতো তোমরা, আমার একটা মাত্র শার্টও তোমাদের মহান নেতার দয়ায় ছিঁড়ে ফাট্রাফাই। বাকি রইল এই তাপ্পি মারা প্যান্টটা। এটাও যদি ওরা কেড়ে নেয় তবে গায় ছাই মেখে চিমটে হাতে নিয়ে ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবেনা। (রাঘব হাতের যেখানটায় সীতারাম কামড়ে দিয়েছিল সেখানটায় মুখ লাগিয়ে চোষে, তারপর সামন্তের দিকে তাকায়, সামন্ত চোখের নির্দেশে সীতারামকে আবার আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়, দু'জনে একসঙ্গো সীতারামের দিকে এগোতেই একসঙ্গো বিকাশ, দেবু, পান্ডে ও আরও দু'একজন এসে ওদের পথ আটকে দাঁড়ায়। )

সীতারাম : (চেঁচিয়ে) আমার শার্ট ছিঁড়েছে বলে যারা মজা পেয়েছে তারা হাত তুলে দাঁড়াও, দেখি তোমাদের মুখমণ্ডল। তোমরা কি ভাব আমি তোমাদের হাঁড়ির খবর রাখিনা? (বিকাশকে উদ্দেশ্য করে) এই যে বিকাশ তুমি নাকি খুব শিগ্‌গিরই মজুর থেকে কেরানির পদে যাচ্ছ?

বিকাশ : (দর্শকদের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায়) লালওয়ানি আমাকে সামনের মাস থেকে ফ্যাক্টরিতে আসতে না করে দিয়েছে।

সীতারাম : দেবু, তুমিওতো আমার ছেঁড়া শার্ট দেখে হাসছিলে। তোমার না এদ্দিনে বিয়ে করে থিতু হবার কথা ছিল? আমাদের কবে মিস্টিমুখ করাচ্ছ বল।

দেবু : (সামনের দিকে তাকিয়ে ) আমার বিয়ে করার ক্ষমতা নেই, সীতারাম। বিয়ে করলে আমার মা-ভাই না খেয়ে মারা যাবে।

সীতারাম : আর পান্ডে, তোমার বিয়ের আংটি সাউয়ের দোকান থেকে কবে ফেরত আনবে?

পান্ডে : এ জন্মে হবে না ভাই। এ মাসে আমার আর্মিতে পাওয়া রূপোর মেডেলটাকে বাঁধা দিয়েছি।

সীতারাম : ভাল খবর। (অন্যান্য শ্রমিকদের দিকে তাকিয়ে ) আর তোমরা? তোমরা তো মনে হচ্ছে আনন্দে খাবি খাচ্ছ, তাইনা?

তিন-চারজন শ্রমিক: (সমস্বরে) মিথ্যে কথা, আমরা তলিয়ে যাচ্ছি।

সীতারাম : কেন জিনিষপত্রের দামতো হু হু করে কমে আসছে। তোমরা নিশ্চয়ই খোঁজ রাখনা । সামন্ত বলছিল সোনার দাম নাকি এক হাজার টাকা কমে গেছে।

শ্রমিকরা : (সমস্বরে) মিথ্যে কথা। ম্যাঙ্গাই বাড়ছে বাড়বে, বাড়ছে বাড়বে, বাড়ছে বাড়বে।

সীতারাম : আর তোমরা?

শ্রমিকরা : (সমস্বরে) মরছি মরব, মরছি মরব

সীতারাম : শঙ্করলালের মেয়ের বিয়েতে কত টাকা খরচ হয়েছে কেউ জান?

শ্রমিকরা : (একসঙ্গে বলে ওঠে) মাত্র দেড় কোটি টাকা। (শ্রমিকদের মধ্যে কেউ কেউ বলে ‘ না না, অত হবেনা, এক কোটি’ বাকিরা চেঁচায় ‘দেড়কোটি, দেড়কোটি’।

সীতারাম : (আস্তে আস্তে উত্তেজিত হয়) লালওয়ানির বড় কুকুরের শখ। ওর তিনটে কুকুরের পিছনে কত খরচ হয় জান? মাসে বিশ হাজার টাকা। কোথায় পায় ওরা এত টাকা।

সবাই : (সমস্বরে) আমাদের রক্ত চুষে।

সীতারাম : তোমরা দেখছি সব খবরই রাখ। তবু তোমরা জাননা তোমাদের কি করা উচিৎ। আমি একটা চোখ দিয়ে যা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তোমরা কেন দুটো চোখে তাই দেখতে পাবেনা? নাকি তোমরা দেখতে চাওনা? ভয় পাও?যদি তাই হয় তবে দুটো চোখই উপড়ে ফেলে দাও, মনে অন্তত শান্তি পাবে। (উঁচু গলায়) কম্যুনিষ্ট খারাপ,আমাদের শত্রু, দেশের শত্রু, শুনে কান পচে গেল। কিন্তু আমি কী করে ভুলি যে’৯৭তে ছাঁটাই হবার পর যে মানুষটা আমাকে, আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছিল, খেতে দিয়েছিল সে আমাকে ডাকত কমরেড বলে। আর কী আশ্চর্য ২০০৪-এ এই ফ্যাক্টরীর দুয়ারে যখন চাকরির জন্য মাথা কুটে মরছিলাম তখন যে লোকটা আমাকে ডেকে কাঁধে হাত রেখে ভেতরে নিয়ে গিয়েছিল সেও বলেছিল ‘কমরেড’। সে লোকটাকে তোমরা সবাই চেন। তার নাম অটল। অটল আজ মিটিং -এ আসুক না আসুক সে এলে কী সিদ্ধান্ত নিত আমার চাইতে কে ভাল জানে? তাই বলছিলাম ....

(একজন ছুটে এসে ঢোকে স্টেজে। কয়েকজন ছুটে গিয়ে তাকে ধরে। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে-)

লোকটা : অটলের খোঁজ পাওয়া গেছে!

অন্যান্যরা : কোথায়? অটল কোথায়?

কয়েকজন : চুপ কর, ওকে বলতে দাও।

লোকটা : (হাঁপাতে হাঁপাতে) ফ্যাক্টরির পিছনের গলিতে ছাইগাদার পাশে অটলের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। এই মাত্র পুলিশ এসে ওকে মর্গে নিয়ে গেল।
(ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই ক্ষণিকের জন্য নীরব হয়ে যায়। সীতারাম ফ্যাল ফ্যাল করে বার্তাবাহী লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করে-)

সীতারাম : এ্যাঁ কী বললে? কী বললে তুমি? (সে লোকটার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটা মুখ নিচু করে। সীতারাম এবার অন্যান্য সবার মুখের দিকে তাকায়। কেউ কোন কথা বলেনা। শ্রমিকদের মুখগুলোতে বিভিন্ন অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে- কয়েকজন বেশ ভীত, সন্ত্রস্ত, কয়েকজন গভীরভাবে চিন্তিত, পান্ডে, দেবু, বিকাশ ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, তাদের চোখ মুখ কঠিন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ)

পান্ডে : (হাতের মুঠি তালুতে ঘসে) আমরা এর প্রতিশোধ নেব।

সীতারাম : কি লাভ? অটলতো আর ফিরে আসবেনা।

কয়েকজন : খুনকা বদলা খুন! চল পান্ডে আমরা তোমার সঙ্গো আছি।

অন্য কয়েকজন : আমরা অটলের বদলা নেব। চল পান্ডে ।
(পান্ডে শ্রমিকদের নিয়ে উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে যাবার মুখে সীতারাম এসে দুই হাতে সবার পথ রোখে)

সীতারাম : দাঁড়াও, সব দাঁড়াও । আমারও কিছু বলবার আছে।

অনেকে একসঙ্গো: পথ ছাড়, সীতারাম। আমাদের কথা শুনবার সময় নেই।

সীতারাম : (চাপা আক্রোশে) হল্লা কোরনা। বদলা নেবে নাও, কিন্তু তারপর? তারপর কী করবে তোমরা একবার বলে দাও।

পান্ডে : আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।

সীতারাম : (ধমক দিয়ে) বাজে কথা। আজ সব খেপে গিয়ে পাগলা কুকুরের মত লাঠি সড়কি নিয়ে অটলের বদলা নিতে যাচ্ছ কিন্তু কাল সকালে নেড়ি কুকুরের মত ল্যাজ গুটিয়ে যখন সুড়সুড় করে ফ্যাক্টরিতে ঢুকবে তখন ... তখন অটলের কথা ক'শালার মনে থাকবে বলতে পার? পান্ডে এবং

আরও দু'একজন : যে কুত্তার বাচ্চাকে কাল ফ্যাক্টরির দরজায় দেখব তার ঠ্যাঙ ভাঙব আমরা।

সীতারাম : ঠিক কথা। সামন্ত বা লালওয়ানির ঠ্যাঙ ভেঙে নয় ফ্যাক্টরির দরজা বন্ধ করে আমরা বদলা নেব অটলের। সেটাই আসল প্রতিশোধ। (চারপাশে তাকিয়ে) বল এইবার, অটলের নামে শপথ করে বল তোমরা কাল থেকে স্ট্রাইক হবে কি হবেনা? যে শালা চুপ করে থাকবে তাকে আমার দাঁতের সঙ্গো মোকাবিলা করতে হবে স্পষ্ট বলে দিচ্ছি।

সবাই : (সমস্বরে) স্ট্রাইক! আমরা স্ট্রাইক চাই।

সীতারাম : আমি কানে আজকাল বড্ড কম শুনি। একটু জোরে বল দেখি ভাইসব।
সবাই : (উঁচু গলায়) স্ট্রাইক!
সীতারাম : (কালার ভান করে কানে হাত দিয়ে) নাঃ কানটা আমার একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। কী বললে যেন তোমরা ফিসফিস করে?
সবাই : (গলা ফাটিয়ে) স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!
(সবার উত্তোলিত হাতের উপর দিয়ে পর্দা নেমে আসে)

( আমেরিকার প্রথম সারির নাট্যকার, পরিচালক এবং অভিনেতা ক্লিফোর্ড ওডেট্স (১৯০৬-১৯৬৩ ) কে নোবেল বিজয়ী নাট্যকার ইউজিন ও নিল - এর উত্তরসুরি বলা হয়ে থাকে। তাঁর সমাজ সচেতন নাটকগুলি পরবর্তী কয়েক দশকের যেসব নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছিল তার মধ্যে আছেন আর্থার মিলার, নেইল সাইমন এবং ডেভিড ম্যামেট। সমগ্র বিশ্বে তথা আমেরিকায় ২০০৮-এর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পরে ওডেটসের যে নাটকগুলো আবার মঞ্চে ফিরে আসে তার মধ্যে আছে Awake And Sing, Paradise Lost এবং Waiting For Lefty। ১৯৩৪ সালে নিউইয়র্কে যে ট্যাক্সি স্ট্রাইক হয়েছিল তার উপর লেখা Waiting For Lefty প্রসেনিয়াম স্টেজের বাইরেও পথনাটিকা হিসেবে অভিনয় হয়ে থাকে।
Stanishlavaski নির্দেশিত Method Acting আমেরিকাতে প্রবর্তন করার শ্রেয় ওডেটসকেই দেওয়া হয়ে থাকে।)

লেখক : **নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য**, দিল্লীর বিশিষ্ট নাট্যকার।

# ভারতবর্ষ

শ্যামল ভট্টাচার্য

(একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ঘর। একটি ছোট খাট, একটি সেন্টার টেবিল ও দু তিনটি চেয়ার। একটি ছোট আলনা। দুই বন্ধু অনুপম ও মোহনদাস, দুজনের বয়স ৪০-৪৫ বছরের মধ্যে, কোনও একটা বিষয়ে প্রবল তর্ক করছে। সময় - বেলা ১১টা।)

অনুপম : তোমার বয়স হচ্ছে আর ভিমরতি বাড়ছে। এসব কথা তুমি বলো কি করে?

মোহন : আরে, বাবা, আমার না হয় ভিমরতি ধরেছে। তোমার? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার মাথাটাও গ্যাছে?

অনুপম : আজ্ঞে না স্যার, আমার মাথাটা এখনও যথেষ্ট ঠিকঠাক আছে বলেই তোমার ঐসব আবোলতাবোল প্রলাপ আমি নিতে পারছি না।

মোহন : আমি কি আবোলতাবোল বললাম শুনি? সারা দেশের মানুষ যা বলছে আমিও তো সেই কথাই বলছি নাকি? দেশের সব মানুষ তাহলে আবোলতাবোল বলছে?

অনুপম : এই হল তোমাদের মস্ত দোষ; তোমরা নিজেরা যা বিশ্বাস করো সেটাই দেশের মানুষের বিশ্বাস বলে চালাতে চাও। আর যদি সেটা কেউ বিশ্বাস না করে, তাহলেই সে হয়ে যাবে দেশদ্রোহী।

মোহন : ওঃ। তুমি ব্যাপারটা বুঝতে চাইছ না। এটা স্রেফ আমাদের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ব্যাপার না। ইতিহাস। ইতিহাসটা মানবে তো? নাকি সেটাও দেশদ্রোহের ইতিহাস বলে বাতিল করে দেবে?

অনুপম : ইতিহাস? ইতিহাসের কথা তুমি বলছো? তোমাদের কাছে তো পৌরাণিক কাহিনীগুলোই ইতিহাস। পুরাণ আর ইতিহাসকে গুলিয়ে দেবার জন্য একেবারে আদাজল খেয়ে লেগেছ তোমরা। আর ধর্মপ্রাণ সরল মানুষগুলোর মাথা খাচ্ছ ধর্মের সুড়সুড়ি দিয়ে।

মোহন : এইবার, এইবার কিন্তু তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছো ভায়া। তুমি একেবারে তথাকথিত সেকুলারপন্থীদের মতো সংশয়বাদী হয়ে উঠেছ। এইজন্যই বলছিলাম তোমার মাথাটা একেবারে গ্যাছে।

অনুপম : হ্যাঁ, সে তো বলবেই। ঘটা করে একটা পাঁচশো বছরের বেশি পুরনো মসজিদের নীচে রামলালার জন্মভিটে আছে দাবি করে বসলে, তারপর কয়েক মাস ধরে খোঁড়াখুঁড়ি করে মসজিদের তলা থেকে যখন কিছুই পাওয়া গেল না, তখন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সব রিপোর্টে জল ঢেলে দিয়ে বললে ---

"মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে"। ব্যাস, একথা শুনে ভক্তরা একেবারে ক্ষেপে উঠলো.... ভোটেও জিতে গেলে... প্রমাণ হল যে ইতিহাস মিথ্যা, তোমাদের পৌরাণিক প্রলাপই সত্য!!

মোহন : নাঃ, সত্যি ভায়া- এবার তুমি ডাক্তার দেখাও। মাথাটা তোমার পরীক্ষা করা দরকার। ম্যাডামকে ডেকে বলে যাচ্ছি যাতে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে যেন একজন পাগলের ডাক্তার, নাঃ পাগলের ডাক্তার দরকার নেই, আপাতত একজন নিউরো সার্জনকে দেখালেই চলবে। (উঠে ভেতরের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকে) সুচরিতা ম্যাডাম... সুচরিতা ম্যাডাম- একবার শুনবেন? না, না, চায়ের কথা বলছি না, জরুরী কথা, খুব আর্জেন্ট....

অনুপম : এই যে ভিমরতিগ্রস্থ পুরাণবিদ, চেঁচিয়ো না, চেঁচিয়ো না। সুচি বাড়িতে নেই।

মোহন : কেন? বাড়ি নেই মানে? এইসময় তো ম্যাডাম কোথাও যায় না। এটা আমাদের রেগুলার টি টাইম ... ম্যাডাম নিজের হাতে চা বানিয়ে....

অনুপম : তোমাকে খাওয়ায়, তাই তো? সেসবই হবে। তাকে বাড়ি ফিরতে দাও। সে গেছে মেয়ের স্কুলে রেজাল্ট আনতে... আজ মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোল কিনা, মা মেয়ে দুজনই সকাল থেকেই বেশ উত্তেজিত। ওরা ফিরুক, তারপর শুধু চা কেন, যা খেতে চাইবে খাওয়াবো।

মোহন : ওঃ মাই গড। আজ মণিমালা মায়ের রেজাল্ট বেরোবে? তুমি আমাকে আগে জানাও নি কেন?

অনুপম : জানাবো কি করে? মেয়ের মায়ের কড়া নির্দেশ... আগে থেকে কাউকে কিছু বলা চলবে না। যদি মেয়ের রেজাল্ট ভালো না হয়, পাঁচজনকে কী বলবে?

মোহন : ভালো হবে না মানে? মণিমালা মায়ের মতো অমন মিষ্টি মেয়ে পরীক্ষায় ভালো ফল করবে না, একথা আমি বিশ্বাসই করি না।

অনুপম : হ্যাঁ, তোমার ঐ বিশ্বাসই তো তোমাকে অন্ধ করে রেখেছে।

মোহন : তার মানে? আমি অন্ধ? গোঁড়া?

অনুপম : একশোবার। অন্ধ বিশ্বাস থেকেই তো গোঁড়ামির জন্ম হয়।

মোহন : (উত্তেজিত হয়ে) এবার কিন্তু তুমি ভায়া আমাকে ইনসাল্ট করছো।

অনুপম : এই দ্যাখো, ইনসাল্ট আবার করলাম কখন? তবে গোঁয়ার্তুমি যে তোমাদের আছে, এটা মানবে তো?

মোহন : কেন ভায়া, আমাদের গোঁয়ার্তুমি কোথায় দেখলে? তোমাদের মতো সেকুলারিজমের গোঁয়ার্তুমি আমাদের নেই একথাটা অবশ্য ঠিক।

অনুপম : এইটা তুমি ঠিক ধরেছো। হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক। এ দেশে যতবেশী গোঁড়া জন্মাবে তত তাড়াতাড়ি দেশটা মুক্তি পাবে, তা না হলে এ দেশের কপালে যে

আরও কতো দুর্ভোগ আছে... দেবা ন জানন্তি!!

মোহন : রাখো, রাখো ব্রাদার, তোমাদের সেকুলারিজম মানে তো মানুষগুলোকে তোল্লা দেওয়া ... বুঝি না ভেবেছো? নিজের ধর্ম নিয়ে যারা গর্ব করতে শেখে নি, তারা শুধু অধার্মিক নয়,

অনুপম : দেশদ্রোহীও বটে... তাই তো?

মোহন : নিশ্চয়ই। আমি অবশ্য বিধর্মী বলতে চেয়েছিলাম, আমি তো তাই মনে করি।

অনুপম : আচ্ছা ভায়া, একটা কথা বলো তো, মনে করো তুমি এমন একটা দেশে বাস করো যে দেশে ধর্মীয় সংখ্যাগুরু মানুষের কাছে শূয়রের মাংস নিষিদ্ধ। তা ধরো, তুমি একদিন বাজারে বেরিয়েছো, হঠাৎ কিছু লোক তোমাকে ঘিরে ধরে, তারা অবশ্য তোমার আশেপাশে থাকা প্রতিবেশী, অভিযোগ করতে শুরু করলো যে তোমার ঘরে ফ্রিজে তুমি শূয়রের মাংস লুকিয়ে রেখেছো। তুমি প্রথমে অবাক হলে, তারপর সজোরে অভিযোগ অস্বীকার করলে... ততক্ষণে তোমার উপরে দু'চারজনের চড়, থাপ্পর, ঘুষি বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে। এবার তুমি ভীষণ রেগে গিয়ে চিৎকার করে প্রতিবাদ করতে শুরু করলে, এরপর আর দু'চারজন নয়, মারমুখী একদল লোক নৃশংসভাবে মারতে লাগলো... কিছুক্ষণ আত্মরক্ষার চেষ্টা করে শেষপর্যন্ত জ্ঞান হারালে। একজন বিধর্মীকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া গেছে ভেবে রীতিমত গর্বের সঙ্গে বীরপুঙ্গবেরা তোমার অচৈতন্য দেহটা ফেলে রেখে চলে গেল। পুলিশ এসে তোমাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তাররা তোমাকে দেখেই বলে দিলেন যে তোমার অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে। এই কাজটাকে তুমি কি বলবে?

মোহন : দেখো, আমাকে নিয়ে তুমি একটা আজগুবি গল্প বানিয়ে আমার মতামত জানতে চাইলে, এবার আমার মতামত শুনে আমাকে বোকা বানাবে... এতো বড় ঢ্যাড়স আমি নই। তবে আমার একটা কথা মনে হয়েছে যে, ঐ লোকগুলো আমাকে মারবার আগে আমার ফ্রিজে সত্যিই শূয়রের মাংস আছে কিনা একবার দেখে নেওয়া উচিৎ ছিল।

অনুপম : তার মানে তুমি বলতে চাও তোমার ফ্রিজে সত্যিই যদি শূয়রের মাংস থাকতো তাহলে তোমাকে মেরে ফেলাই ঠিক কাজ হয়েছে। মানে তুমি কিসের মাংস খাবে সেটা ওই ধার্মিক দাদাদের ঠিক করে দেওয়ার অধিকার অছে?

মোহন : না, না। সেকথা বলতে চাই নি। দেখো যে দেশেই আমি বাস করি না কেন, সে দেশের নিজস্ব কিছু আচার বিচার সংস্কার আছে। সেগুলো আমার মেনে চলা উচিৎ। আমি সব জেনেশুনেও যদি ফ্রিজে শূয়রের মাংস রাখি, তবে আমি তো আক্রমণটা ইনভাইট করে আনলাম, তাই না?

অনুপম : ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করো। শূয়রের মাংসটা কোনও ইস্যুই নয়, ওটা উপলক্ষ মাত্র। তোমাকে মরতে হল কারণ তোমার নাম মোহনদাস গোস্বামী... হিন্দু ব্রাহ্মণ!!

মোহন : যাঃ! এটা তুমি কী বলছো? এ আবার হয় নাকি?

অনুপম : হয় নাকি নয়, হয়েছে ভায়া, অন্য দেশে নয়, এই দেশেই হয়েছে, এদেশেই তোমাকে বর্বরের মতো পিটিয়ে খুন করা হয়েছে প্রকাশ্য দিবালোকে, প্রকাশ্য রাস্তায়, হাজার মানুষের চোখের সামনে- কেন জানো?

মোহন : আমাকে খুন করা হয়েছে? কেন?

অনুপম : কারণ এ দেশে তোমার নাম মহম্মদ আখলাখ। তোমার ফ্রিজে নাকি গরুর মাংস ছিল!! (বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চমকে তাকায় মোহন। কী বলবে বুঝতে না পেরে স্তব্ধ হয়ে থাকে। হঠাৎ জোরে কলিং বেল বেজে ওঠে। ওদের সম্বিত ফেরে।) দাঁড়াও, সুচি বোধহয় মেয়েকে নিয়ে ফিরে এলো। দরজাটা খুলে দিই। (অনুপম এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে আবার ফিরে আসে।)

মোহন : কই ম্যাডাম এলো না?

অনুপম : না, সুচি নয়, গোপাল ঠাকুর এসেছে।

মোহন : গোপাল ঠাকুর? সে আবার কে?

অনুপম : ঐ সুচির পূজো আচ্চার জন্য ফুলটুল দিয়ে যায় আর কি। সেই উড়িষ্যার কালাহান্ডি থেকে কোন ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে এই শহরে এসেছে, পানের দোকানে বসতো। ওর বাবা কয়েকটা দোকানে ঠাকুরকে ফুল চন্দন দিয়ে তারপর লোকের বাড়ি বাড়ি খাবার জল দিতো, এখন সেসব দৃশ্য আর দেখা যায় না। কাঁধে বাঁক নিয়ে দুই ড্রাম জল নিয়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে এবাড়ি ওবাড়ি জল দিতে দিতে বেলা হয়ে যেতো...

মোহন : ঐ ব্যবসা তো কবেই উঠে গেছে। এখন তো বড় বড় বোতলবন্দী মিনারেল ওয়াটার বাড়ি বাড়ি চলে যাচ্ছে। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকানে দোকানে যেখানেই যাও জলের বোতল ওল্টানো আছে... গ্লাসে ভরো আর খাও। (গোপাল ঠাকুর প্রবেশ করে)। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে গেঞ্জির উপরে নামাবলী জড়ানো। হাতে ফুলের সাজি, ঠাকুরের স্তব উচ্চারণ করতে করতে 'লক্ষ্মী জনার্দন-অ দেব পরম পূজ্যপাদ-অ/জগন্নাধ-অ মহাপ্রভু দিবেন আশীর্বাদ-অ" দ্রুত এসে অনুপম আর মোহনের কপালে চন্দনের ফোঁটা লাগিয়ে, কপালে ঠাকুরের আশীর্বাদ ফুল ছুঁইয়ে আবার দ্রুত চলে যেতে যেতে বলে-) দোর বন্দ করি দিয়ো দাদাবাবু, ঠাকুর ঘরে ফুল আছে... (চলে যায়)

অনুপম : ঠিক আছে, তুই যা- (উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসে)

মোহন: (মুচকি হেসে) হুঁ হুঁ ব্বাবা, মুখে যতই সেকুলারিজমের বুলি আওড়াও, ভিতরে ভিতরে তুমি ব্রাদার একজন আস্ত ভক্ত মানুষ। চন্দনের তিলক, পুজো আচ্চা

সবই চলে ... আবার পাবলিকের সামনে সেকুলারিজম সেকুলারিজম বলে প্রগতিশীল সাজো... !!

অনুপম : এই, এই জন্যেই তো বলি, সেকুলার হওয়া তো দূরের কথা, তুমি সেকুলার শব্দটার মানেই জানো না। তাই নিজের পছন্দ মতো ব্যাখ্যা করো। সেকুলার মানে নিজের ধর্মের প্রতি যেমন, অন্য সব ধর্মের প্রতি তেমন সমান শ্রদ্ধা থাকবে। সকলেরই নিজের নিজের ধর্মাচার পালন করার সমান অধিকার থাকাটাই সেক্যুলারিজম। সেটা ভুলে গিয়ে আমার ধর্মই শ্রেষ্ঠ, আর সব ধর্মই বিধর্মী ... একথা বলা মানেই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেওয়া-

মোহন : তোমার ব্যাখ্যা ঠিকই আছে। তবে আমার খুব মনে হয় আমাদের দেশে কালচার ব্যাপারটাই নতুন করে ব্যাখ্যা করা উচিৎ, এ নিয়ে মানুষের মধ্যে যথেষ্ট বিভ্রান্তি আছে।

অনুপম : এ দেশের কালচার তুমি কেমন বুঝেছ জানি না। তবে আমি একথাটা মানি এই দেশটা একটা কালচারাল ডেকাডেন্সের মধ্যে দিয়ে চলেছে। চতুর্দিকে একটা অধঃ পতনের ঝড় উঠেছে। গভীর, বড় গভীর খাদ সামনে-" অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানেনা সন্তরণ/কান্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ/হিন্দু না ওরা মুসলিম, ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?/ কান্ডারী বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মার।" (কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধতা)। হঠাৎ কলিং বেল বেজে ওঠে। অনুপম এগিয়ে গিয়ে দরজা খোলে। মণিমালা, অনুপমের মেয়ে, বছর ষোলো বয়স, ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে 'বাপী' বলে চিৎকার করে অনুপমকে জড়িয়ে ধরে ঘুরতে থাকে। অনুপম বলে ওঠে...) ওরে ছাড়, ছাড়, পড়ে যাব যে!! কি হলো বলবি তো?

মণিমালা : (হাসতে হাসতে) এপাং...ঝপাং... ঝপাং... হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ

অনুপম : আরে এসব হেঁয়ালি ছেড়ে আসল কথা বল না মা- রেজাল্ট কৈ?

মণিমালা : পড়াশোনা না করে, স্রেফ ফাঁকি মেরে ফার্স্ট ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন... ফার্স্ট ডিভিশন !! হাঃ হা হাঃ

মোহন : বাঃ ! এই তো চাই। তবে? আমি বলেছিলাম না, মণিমালার মতো মিষ্টি মেয়ে কখনও ফেল করতে পারে না। দেখলে তো ভায়া!!

মণিমালা : বলেছিলে বুঝি??

মোহন : ইয়েস, বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস কর তোমার পিতাশ্রীকে.... (মণিমালা ঢিপ ঢিপ করে দুজনকেই প্রণাম করে।)

অনুপম : তোর মা কে দেখছি না, তিনি আবার কোথায় গেলেন?

মণিমালা : মা আসছে, মিষ্টি কিনতে গেছে। মায়ের সঙ্গে একটা কাকীমা আছেন, আমার একটা বন্ধু আছে, আমাদের সঙ্গেই পড়ে, ওরা সবাই আসছে।

অনুপম : ওরে বাবা, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছিস বলে তোর মা যে একেবারে মিছিল

করে বাড়ি আসছে।

মণিমালা : না বাপী, মায়ের সঙ্গো আমার যে বন্ধুটা আসছে, ওর মনটা একটু খারাপ- ও সেকেন্ড ডিভিশনে পাশ করেছে কিনা- ওর মা খুব খুশী , বাট ও একটু মনমড়া হয়ে আছে। আমি প্ল্যান করেছি ওকে আজ রাতে আমাদের বাড়ীতে খাওয়ার নেমতন্ন করবো। খুব মজা হবে, ওর মনটাও একটু হাল্কা হবে।

মোহন : বাঃ , এতো দারুণ কথা। দেখেছ ভায়া, আমার মণিমা এই বয়সেই কেমন বিচক্ষণ হয়ে উঠেছে। অবশ্য কার মেয়ে দেখতে হবে তো ...

অনুপম : না, না, আমার মেয়ে বলে নয়, মণিটা বরাবরই একটু ইয়ে, মানে খানিকটা নরম প্রকৃতির আর কি।

মোহন : আরে এইটাই তো সীতা সাবিত্রীর দেশের মেয়েদের প্রকৃতি। ওরা সর্বংসহা মায়ের জাত। প্রথম জীবনে বাপ মায়ের সেবা করে, যৌবনে স্বামীর সেবা করে, বার্ধক্যে সন্তানের সেবা করে। বুঝলে ভায়া, এই আর্যাবর্তের নারী হল মহিয়সী নারী... অন্য কোথাও এর তুলনা পাবে না।

অনুপম : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিকই বলেছ ব্রাদার, সারাজীবন সকলের মন যুগিয়ে চলার শিক্ষাই দেওয়া হয় এদেশের মেয়েদের। ওদের নিজস্ব মন, মর্জি, স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে নেই। এটাই তো মহান মনু সংহিতার নির্দেশ- কি বলো?

মোহন : এই দেখো, এই হল তোমার মস্ত দোষ। কথা হচ্ছে মণিমায়ের নরম প্রকৃতি নিয়ে, ওর জননীসুলভ স্বভাব নিয়ে, তুমি তার মধ্যে আবার মনুসংহিতা টেনে আনছ কেন? মনু তোমার কোন বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে শুনি?

অনুপম : হাঃ হাঃ হাঃ জানতাম তুমি রেগে যাবে। দেখো ব্রাদার, সবাই এ দেশে মনুসংহিতা পড়ে নি। হয়তো তুমিও পড় নি। কিন্তু এ দেশের সনাতন নারী চরিত্র সবার জানা হয়ে গেছে। নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার অধিকার দিতে আমরা কেউ রাজী নই, আমিও না, তুমিও না। (খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অনুপমের স্ত্রী সুচরিতা, সঙ্গো আর একজন প্রায় সমবয়সী মহিলা, ফর্সা, এবং একজন কিশোর, গায়ের রং কালো, বয়সের তুলনায় চেহারা ভালো। সুচরিতা ঢুকতে ঢুকতে বলে-)

সুচরিতা : এসো মন্দিরা, এসো ভেতরে এসে বোসো, (অনুপমকে বলে) বুঝলে, এরা আজ আমাদের অতিথি। (মন্দিরা ও কিশোর সসংকোচে দাঁড়িয়ে থাকে)

অনুপম : বাঃ! আসুন, আসুন, আরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। (মন্দিরা ও কিশোর সসংকোচে খাটের এককোণে বসে)

সুচরিতা : ওর নাম মন্দিরা সরকার। ওই যে পূব পাড়ার পিছনে একটা ইটভাটা আছে না, ঐখানে ওরা থাকে। আজ ওর ছেলে মাধ্যমিক পাশ করেছে, ও ছেলেকে নিয়ে এসেছে তোমার কাছে।

অনুপম : আমার কাছে? কেন আমার কাছে কেন?

সুচরিতা : (মন্দিরাকে বলে) কি গো, বলো, তুমি নিজের মুখেই বলো। আমি তোমাদের জন্য বরং একটু চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করি...

মোহন : ইয়েস ম্যাডাম। আপনার হাতের এক কাপ চায়ের জন্য চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করছি, আর অনুপম সেই সুযোগে আমাকে ছাত্রের মতো সামনে বসিয়ে রেখে এক নাগাড়ে পড়িয়ে যাচ্ছে। আমি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি। এখন আপনি,

সুচরিতা : (হেসে) কি করবে বলুন, মাস্টারি করাটা পেশা যে! হাঃ হাঃ হাঃ, এসে গেছি যখন, আর চিন্তা করবেন না, বসুন, আমি এক্ষুনি চা করে আনছি। বাইরে যা ঝড় উঠেছে, খুব শিগগিরই বেরোতে পারবেন না, বরং রাতের খাবারটা আজ এখানেই খেয়ে যাবেন।

মোহন : এই তো বসুধৈব কুটুম্বকম! (সুচরিতা হাসতে হাসতে চলে যায়)

অনুপম : হ্যাঁ, আমার কাছে আসার কারণটা কি ম্যাডাম?

মন্দিরা : নমস্কার, আমার নাম মন্দিরা সরকার।এই আমার একমাত্র ছেলে। আপনার মেয়ে মণিমালার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। আজ ওদের মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোল। বড় কষ্ট করে পড়াতে হয় ছেলে। ওর বাবার রোজগার পাতি তেমন নেই। আমি একটা হসপিটালে নার্সের কাজ করি, বুঝতেই পারছেন, বেশ কষ্ট করেই আর কি, ওকে তো মানুষ করতেই হবে।

মোহন : এটি আপনার ছেলে?

মন্দিরা : আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোহন : না, মানে দেখলে বোঝার উপায় নেই কিনা....

অনুপম : আঃ, থামো তো ব্রাদার। বলুন দিদিভাই, কোনওরকম ফিনান্সিয়াল হেল্প দরকার হলে বলুন, আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করবো।

মন্দিরা : না, না, সেরকম কিছু না। আমাদের কষ্টের সংসারে ওকে বড় করে তোলার লড়াই তো আমাদেরই লড়তে হবে। আসলে ---

অনুপম : বেশ তো, তাহলে সমস্যাটা কি?

মন্দিরা : দেখুন, আমার ছেলেটা পড়াশোনায় নেহাৎ খারাপ নয়। সব সাবজেক্টের জন্য তো মাস্টার রাখতে পারি নি। শুধু সায়েন্স গ্রুপটা স্কুলের একজন মাস্টার মশাই ওকে আলাদা করে বাড়িতে পড়ান। তা ও সব সাবজেক্টেই মোটমুটি ভালো নম্বর পেয়েছে, কিন্তু গন্ডগোল করেছে ইংরাজিতে। ইংরাজিতে ও বড্ড কাঁচা, তাই ফার্স্ট ডিভিশনটা হল না। ইংরাজিতে ভালো না হলে, আপনি বোঝেনই তো, ভবিষ্যতে কোথাও কোনও সুযোগ পাবে না। তাই আপনার কাছে একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে এসেছিলাম ---

অনুপম : হ্যাঁ বলে ফেলুন, অতো হেজিটেট করছেন কেন?

মন্দিরা : না, মানে বলছিলাম, অনেকের কাছেই শুনেছি আপনার কথা, সুচরিতাদিও

বলেছেন, আসলে কোনও টিচার কাছে পড়তে পাঠানোর অনেক অসুবিধা আছে। মানে সমস্যা রয়েছে আর কি, তাই অনেক আশা নিয়ে এসেছি, আপনি যদি আমার ছেলেকে ইংরাজিটা একটু দেখিয়ে দেন, তাহলে---

অনুপম : ওঃ এই কথা? এর জন্য আপনি এতো সংকোচ করছেন কেন? পড়ানোই তো আমার কাজ। এদিকে এসো তো বাবা, দেখি তোমার রেজাল্ট! কি নাম তোমার?

মন্দিরা : (ছেলেকে বলে) যা না, যা, মাস্টারমশাইকে প্রণাম করে।
(ছেলেটি রেজাল্ট হাতে ধীর পায়ে এগিয়ে এসে প্রণাম করে। মার্কশিটটা অনুপমের হাতে দেয়। অনুপম এক হাতে মার্কশিট নিয়ে আর একটি হাত ছেলেটির মাথায় রেখে জিজ্ঞেস করেন --) কি নাম তোমার?

ছেলেটি : (ক্ষীণ কণ্ঠে) আজ্ঞে, আমার নাম সোমরা।

মন্দিরা : ওর নাম সোমরা মারান্ডি সরকার হোসেইন। (অকস্মাৎ প্রবল বাজ পড়ার শব্দ, বিদ্যুৎ চমক, ঘোর বিস্ময়ে অনুপম আর মোহন চমকে ওঠে।)

অনুপম : আশ্চর্য!! এরকম অদ্ভূত নাম কেন?

মন্দিরা : মণিমালা, সোমরা তোরা যা না, বাইরে গিয়ে গল্প কর---

মণিমালা : সেই ভালো, চল সোমরা, আমরা বাগানে যাই। ঝড় উঠেছে দেখছিস তো, দেখবি চল কতো আম পড়ে আছে বাগানে। আম কুড়াব চল --- (সোমরা ও মণিমালা বেরিয়ে যায়। ঝড়ের গর্জন কমে বাড়ে)

মন্দিরা : আমার ছেলের এই নামের পিছনে একটা বড় ঘটনা আছে। সেটা বললে বুঝতে পারবেন। আমার স্বামীর নাম আফজালুল হোসেইন। আমরা ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। কিন্তু কেউ কারোর ধর্ম ত্যাগ করি নি। আমি তখন সবে নার্সিং ট্রেনিং কমপ্লিট করে একটা হসপিটালে কাজে জয়েন করেছি। আর আফজালুল দোকানে দোকানে মাল সাপ্লাই দেওয়ার কাজ করতো। একটা গাড়ির কারখানা হবে বলে রাস্তার পাশে প্রচুর দোকান হয়েছিল। কিন্তু কারখানাটা কিছু হতে দিল না। ফলে সেই দোকানগুলো আস্তে আস্তে সব উঠে গেল। অনেক দোকান কর্মচারী কাজ হারালো। (ক্রমশ: আলো কমতে থাকে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসা মঞ্চে একটা আলোকবৃত্তে দাঁড়িয়ে কথা বলে চলে মন্দিরা।) কাজ হারিয়ে আফজালুল খুব হতাশ হয়ে বসে থাকতো। আমারও দিন কাটছিল খুব দুশ্চিন্তায়। হসপিটালে শিফ্‌টিং ডিউটি। ডিউটিতে গিয়েও ওর জন্য বড় চিন্তায় থাকতাম। আমাদের কোনও বাচ্চা কাচ্চা তখনও হয়নি। (ঝড়ের গর্জন, বিদ্যুৎ চমক চলতে থাকে।) আফজালুল একটা উপায় শেষ পর্যন্ত বের করলো। ওর এক বন্ধুর একটা পুরনো ভ্যান ছিল। সেটা চাইতেই ওর বন্ধু ভ্যানটা দিল ওকে। ঐ ভ্যান চালিয়ে টুকটাক সামান্য যা রোজগার শুরু হল, ও তাতেই খুশি ছিল। আমি ওর সকাল সন্ধ্যা নামাজ পড়ার জন্য আসন পেতে রাখতাম। ও প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমার

লক্ষ্মীপুজোর জন্য ফুল এনে রাখতো। এইরকম একদিন, সেদিন ছিল শিবরাত্রি-- ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ভোর বেলা বাড়ি ফিরলাম---

(মন্দিরা আলোকবৃত্ত থেকে বেরিয়ে যায়। মঞ্চে আলো-আঁধারিতে দেখা যায় মন্দিরার ঘর। আফজালুল নামাজ পড়ছে। পড়নে লুঙ্গি ও গেঞ্জি। আবহে আজানের সুর ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ পরে মন্দিরা প্রবেশ করে। পড়নে চুড়িদার। ছাতা বন্ধ করতে করতে ঘরে আসে। আফজালুল নামাজ শেষ করে জামা পড়তে থাকে। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসে। মন্দিরা বলে ---)

তুমি এখন বেরোবে নাকি?

আফজাল: হ্যাঁ, ঐ শিবমন্দিরের ফুলের অর্ডার আছে। আজ শিবরাত্রি, সকাল সকাল ফুল পৌঁছে দিতে হবে। তুমি নাস্তা করে নাও। আমি তার মধ্যেই চলে আসবো।

মন্দিরা : নাইট ডিউটি থাকলে এই এক ঝামেলা-- বাড়ি ফিরে আর কোনও কাজ করতেই ইচ্ছে করে না। মনে হয় মরার মতো ঘুমোই।

আফজাল: তা ঘুমাও না, এখন কিছু করা লাগবে না। আমি বরং ফেরার সময় পেটা পরোটা আর সবজি নিয়ে আসবো, দুজনের নাস্তা হয়ে যাবে।

মন্দিরা : এইটা ঠিক বলেছ। তাই করো। ছাতাটা নিয়ে যেয়ো। (শিশুর কান্না শোনা যায়)। বৃষ্টির জল গায়ে লাগিয়ো না। (আফজালুল উৎকর্ণ হয়ে শোনে)। ছাতাটা হাতে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। বলে ---)

আপজাল: মনি, একটা বাচ্চার গলা শুনতে পাচ্ছো, থেকে থেকে কেঁদে উঠছে?

মন্দিরা : হ্যাঁ, আমার মনে হচ্ছিল। দাঁড়াও, দেখে আসি। (মন্দিরা বেরিয়ে যায়।) আবহে আজানের সুর ও শিশুর কান্না ভেসে আসে। নেপথ্যে মন্দিরার গলা শোনা যায়।) আফজল (চিৎকার করে) শিগগিরই এসো, এখানে একটা বাচ্চা!! (আফজল দ্রুত বেরিয়ে যায়। নেপথ্যে দুজনের কথা চলতে থাকে।)

আফজাল: এ কী? ? ? এইটুকু বাচ্চা এখানে এলো কি করে?

মন্দিরা : কেউ বোধহয় বাচ্চাটাকে ফেলে গেছে।
ইস্! এতোটুকু একটা শিশু, কেমন মা গো!! এইখানে ফেলে গেছে?

আফজাল: আরে বাচ্চাটাকে তুমি তুলে নিচ্ছো কেন? কি করবে?

মন্দিরা : দেখতে পাচ্ছো না বাচ্চাটার গায়ে জল পড়ছে? মরে যাবে তো!! ওকে জল থেকে বাঁচাব না?

আফজাল: ওর মা হয়তো রেখে গেছে! তুলে আনলে আবার পরে কোনও বিপদে পড়বো না তো?

মন্দিরা : সে তখন দেখা যাবে। এখন এই অবস্থায় বাচ্চাটাকে ফেলে যাই কি করে বলো?

আফজাল : ঠিক আছে, আগে তো বাঁচাই, আল্লাহ রাসুলের দোয়ায় বিপদ আপদ কেটে যাবে, কি বলো? নিয়েই এসো--- (মন্দিরা বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নেয়। দুজনেই মঞ্চে প্রবেশ করে। আফজাল মন্দিরার মাথায় ছাতা ধরেছিল। মঞ্চে এসে ছাতা বন্ধ করে।)

মন্দিরা : কোনও মা তার বাচ্চাকে এভাবে রেখে চলে যেতে পারে? নিশ্চয়ই ফেলে দিয়ে গেছে। আহারে, কাঁদতে কাঁদতে কিরকম হাঁপাচ্ছে দেখো।

আফজাল: এই সময় বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাওয়াতে পারলে ভালো হতো তাই না?

মন্দিরা : ঠিকই বলেছ। কিন্তু এই সময়ে দুধ কোথায় পাবো? ব্রেস্টমিল্কটাই এখন দরকার ওর। কিন্তু ওর মাকে পাব কোথায়?

আফজাল: ওর মাকে কি তুমি জানো? তাকে খুঁজে লাভ নেই। তুমি অন্য কিছু ভেবে দেখো--

মন্দিরা : দাঁড়াও, তুমি একটু রাখতে পারবে ওকে? আমি তাহলে দোকানে গিয়ে একটা মধুচুষি বা ছোট একটা ফিডিং বোতল পাই কিনা দেখি। দুধের কৌটোও একটা লাগবে। কিছু খাওয়াতে না পারলে এইটুকু প্রাণ বাঁচানো যাবে না।

আফজাল: ঠিকই বলেছ। দাও, আমার কাছে দাও, আমি পারবো মনি।

মন্দিরা : তুমি আমার একটা শাড়ি ভাঁজ করে দুইহাতে পাতো। তারপর বাচ্চাটা ধরো। (আফজাল তাই করে। মন্দিরা আফজালের হাতে বাচ্চাটাকে শুইয়ে দিয়ে বলে) যদি খুব কাঁদে তাহলে আস্তে আস্তে হাতে দোলা দেবে, দেখবে চুপ করে গেছে।

আফজাল: আমার কেমন ভয় করছে জানো!!

মন্দিরা : কোনও ভয় নেই। মনটাকে একটু শক্ত করো। তোমার নিজের বাচ্চা হলে কি করতে? চিন্তা কোর না, আমি এক্ষুনি চলে আসবো।

আফজাল: দরজাটা বন্ধ কোর না, খোলা থাক--(মন্দিরা চলে যায়। আফজাল অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে বাচ্চাটার দিকে। কান্না থেমে গেছে। ধীরে ধীরে দোলায়। মঞ্চজুড়ে সন্তুরের লহরী ছড়িয়ে পড়ে। আফজাল প্রথমে কিছুক্ষণ গুন গুন করে। তারপর গান ধরে-

দে দে পাল তুলে দে, মাঝি হেলা করিস না
ছেড়ে দে নৌকা আমি যাবো মদিনা।।
দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে,
হাসিলে হাজার মানিক কাঁদিলে মুক্তা ঝরে।।
ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিসের ভাবনা-
হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা --।।
দে দে পাল তুলে দে, লালা, লালা, লা লা... (হঠাৎ খোলা দরজা দিয়ে একজন) অল্পবয়সী মহিলা উর্ধ্বশ্বাসে প্রবেশ করে। নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করে। ভীষণ হাঁপাচ্ছে মেয়েটি। আফজাল আঁতকে উঠে বাচ্চাটাকে কোলে চেপে ধরে

চেঁচিয়ে ওঠে ---)
এই, এই মেয়ে, কে তুমি? ঘরে ঢুকে পড়লে কেন? কি হল, কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? কি চাই এখানে ? (মেয়েটি ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে বলে আর করুণ চোখে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকে)
কি হল, কথা বলছো না কেন?

মেয়েটি : (কথায় আদিবাসী টান) চুপ চুপ আস্তে- আস্তে - বুলছি- বুলছি, সব বুলছি। টুকুন দম লিয়ে লি, মুই লক্ষ্মীমুণি মারান্ডি বটে, তুদের এই বস্তির উই পিছুতে যে ইটভাটাটো আছে, উখানে কামিনের কাম করিরে দাদাবাবু। ওই ইটভাটায় কুলি মজুরদের দালাল মুক কামে লাগাইলো, আর রেতের বেলা আমার ঝুপড়িতে এস্যে (বলতে বলতে কেঁদে ফেলে) হর রোজ মুর ইজ্জত লিয়ে খেলা কইরতো), আর আমি পেটে ধইরলাম এই ছিল্যা। ইখন দেশে গিয়ে মুখ দিখাইতে লাইরবো। মুর মরদ আসামে চা বাগানের কুলি বটে। উ জাইনতে পাইলে ই বিটাশুদ্ধু মোক মাটিতে পুঁত্যে দিবেহঁ। কিন্তু আমি কী কইরবো? কুথা যাব? নিজেরে হাতে উ ছিল্যাটাকে মেইরে ফেইলতে পারবক নাই, তাই তুয়াদের দুয়ারে ফেইল্যে রেইখে গিলম, মারাংবুরুর যুদি দয়া হয় তো উ ছিল্যা বাইচবে, আর আদিবাসী বুল্যে যদি ঘর নাই পায় তো ছুঁড়ে আস্তাকুঁড়ে ফেইলে দিবি দাদাবাবু। এই লক্ষ্মীমুণি যখন পেটে ধইরেছে তখুন লিজের হাতে উয়াকে মাইরতে লারব রে দাদাবাবু, লিজের হাতে উয়াকে মাইরতে লাইরবো। (কান্নায় ভেঙে পড়ে। ছুটে চলে যেতে চায়। আফজাল ডাকে)

আফজাল: দাঁড়াও গো মেয়ে--- দাঁড়াও-- মন্দিরা যখন কোলে তুলে নিয়েছে তখন ও দায়িত্ব নেবেই। কিন্তু তোমার বাচ্চার নাম কি সেটা বলে দাও।

মেয়েটি : আদিবাসী কামি মাগীর পেটে কনটাকটরের বাচ্চা, তার আবার নাম!!! তুয়ারা উর নাম রাখিস দাদাবাবু। তব্যে কেও যদি শুধায় তো বুলিস উয়ার নাম দিলম সোমরা--- সোমরা মারান্ডি!! ফের যদি মায়ের নাম শুধায় তো বুল্যে দিবি উয়ার মা মইরে গিছে--- (ছুটে চলে যায়। বাকরুদ্ধ আফজালুল দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। আলো ক্রমশ: ছোট হতে হতে একটা বৃত্তের মধ্যে ধরে তাকে। বাচ্চাটার মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে আফজালুল। তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে মৃদু উচ্চারণে ---) আফজালুল হোসেইন আর মন্দিরা সরকারের ছেলে সোমরা মারান্ডি??? (আলো নেভে। আবহে অঝোরে বৃষ্টির শব্দ। আলো জ্বললে দেখা যায় বিস্ময়াপন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অনুপম। দু'হাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে মোহনদাস। মন্দিরা চোখের জল মুছতে মুছতে বলে।)

মন্দিরা : আফজলই ওর নাম রেখেছে সোমরা মারান্ডি সরকার হোসেইন। বলল লক্ষ্মীমুণি মারান্ডি ওর জন্ম দিয়েছে সেটা যেন সোমরা কোনও দিন না ভোলে।

তাই ওর নামটাই থাকবে। আর আমরা ওকে দ্বিতীয় বার জন্ম দিলাম, তাই সরকারও থাক- হোসেইন ও থাক।

অনুপম : আশ্চর্য!! আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না-- এমনও ঘটে??

মোহন : ট্রুথ ইজ স্ট্রেনজার দ্যান ফিকশন বলে একটা কথা আছে-- মানো তো ভায়া?

মন্দিরা : আমি বরং ভেবেছিলাম আমার জেদ দেখে আফজাল বোধহয় রেগেই যাবে। কিছুতেই বাচ্চাটাকে রাখতে রাজী হবে না। কিন্তু বিশ্বাস করবেন না, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি ওর মনোভাব দেখে। ওর পয়সার অভাব আছে একথা সত্যি--- কিন্তু পয়সার অভাবে ওর মধ্যে মনুষ্যত্বের কোনও অভাব হয়নি।

অনুপম : বিত্তবান হলেই তবে সে চিত্তবান হবে - এ কথা কে বললে? (প্রবেশ করে সুচরিতা। হাতে চায়ের কাপসহ ট্রে। সঙ্গে আসে মণিমালা ও সোমরা।)

সুচরিতা : (নীচে) ওঃ, দুটোতে সেই যে বাগানে ঢুকেছে, বক বক, বক বক, কথা আর শেষ হয় না। খেতে দিয়ে ডেকেই যাচ্ছি, কানেই যায় না। শেষে আমি বাগানে গিয়ে দুটোকে টেনে নিয়ে এলাম। এই, সবার জন্য চা এনেছি, মোহনদা নিন, মন্দিরা চা নাও। (প্রস্থান)

মন্দিরা : হ্যাঁ নিচ্ছি।

মোহন : ধন্য আপনার ছেলের জীবন দিদিভাই। আপনি যে কী করেছেন আপনি জানেন না।

মন্দিরা : ও আমার ভোলানাথ। শিবরাত্রির দিন আমার ঘরে ভোলা মহেশ্বর নিজে এসে ধরা দিয়েছেন। এতোকাল বুকে করে আগলে রেখেছি আমরা। ওর বাবা তো এ সংসারে ঐ ছেলেকে ছাড়া কাউকে চেনে না। ভ্যান টেনে সারাদিন খাটাখাটনির পর সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরে ছেলেকে পাশে পড়তে বসায়, আর নিজে নামাজে বসে। ছেলেও বাপের দেখাদেখি নামাজে বসতে চায়। উনি দেন না। বলেন তুই তো তোর জন্মকথা সব জানিস বাপ। আদিবাসীদের ধর্মটাই তোর ধর্ম, কিন্তু আমরা তো সেই ধর্মের আচার বিচার কিছুই জানি না। তাই তোর ধর্ম এখন কেবল পড়াশোনা করা, বড় হ, তারপর পূজো কিম্বা নামাজ যেটা ভালো লাগে করবি। ইচ্ছে না করলে কোনটাই করবি না। কিন্তু --

সোমরা : আমি বলি?

মন্দিরা : (হেসে) বল-

সোমরা : কিন্তু লোখাপড়া না করলে পিঠে চালাকাঠ ভাঙবো। আমি বলি, বলতো বাবা পিঠ ইংরেজি কি ? বাবা বলবে জানিনে, যা: হতচ্ছারা! আমি বলি বলতো বাবা চালাকাঠ ইংরেজি কি? বাবা বলবে, ওরে ব্যাটা, বাপের সঙ্গে মস্করা হচ্ছে? আমি তখন বলি, বারে, তুমি আমার পিঠ ভাঙলে স্কুলে যখন স্যার জিজ্ঞেস করবে- একি। তোমার পিঠে কি হয়েছে? তখন আমি বলবো, স্যার- স্যার- মাই

ফাদার চড়াম চড়াম চালাকাঠ অন মাই পিঠ স্যার !!! (সবাই হেসে ওঠে)

মন্দিরা : (হাসতে হাসতে) এই শুনে ওর বাবা হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়বে আর ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কতো সোহাগই না করবে।

সুচরিতা : বাঃ, বেশ মজার ছেলে তো! যেমন চুপচাপ থাকে দেখলে বোঝা যায় না যে ওর মধ্যে একটা রসিক মানুষ লুকিয়ে আছে।

মন্দিরা : ও ইংরাজিতে বড্ড কাঁচা। আপনার কাছে দিলাম, একটু দেখবেন দাদা।

অনুপম : সে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দিদিভাই। ওকে পড়াবো, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য!! (মোহনকে বলে) দেখো, দেখো ভায়া, এই আমার ভারতবর্ষের ভূমিপুত্র!!!

মন্দিরা : আয় সোমরা, বৃষ্টি নেমেছে। এখন বেরিয়ে পড়ি, তোর বাবা আবার চিন্তা করছে--- এতোক্ষণ নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে এসেছে, জানে ছেলের রেজাল্ট বেরোবে--- পীরের দরগায় মানত করে ফুল দিতে গেছে,
(সোমরা মন্দিরার দিকে এগিয়ে গেলে মোহন ডাকে)

মোহন : দাঁড়াও বাবা, এদিকে এসো। (সোমরা এগিয়ে আসতেই তার মাথায় কাঁধে হাত বুলিয়ে বলে) তুমি আজ আমাকে জীবনের সব থেকে বড় শিক্ষাটা দিয়েছ বাবা। আমি নতুন করে এই দেশটাকে চিনলাম। এ দেশের মানুষকে সত্যিই আমি চিনতাম না। তুমিই আজকে আমায় মানুষ চেনালে। তোমার মধ্যে আস্ত দেশটাকে দেখতে পাচ্ছি!! এই তো আমার ভারতবর্ষ!! তুমি আমার ভারতবর্ষ!! আমার ভারতবর্ষের আর এক নাম সোমরা মারান্ডি সরকার হোসেইন !!! (গভীর আবেগে সজল চোখে সোমরার মাথাটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নেয়। সকলে মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকে। ধীরে পর্দা নামে।)

(গল্পসূত্র সংগৃহীত)

লেখক : **শ্যামল ভট্টাচার্য**, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব, সম্পাদক - 'গণনাট্য', পশ্চিমবঙ্গ।

# ঝড়া সময়ের রূপকথারা

## শিবংকর চক্রবর্তী

চরিত্র ।। অরিন্দম, অন্বেষা, অনিতা, সোহম, তনুময়, কচি, ডা: সত্য

[মধ্যবিত্ত ফ্ল্যাট বাড়ির আভাস। মঞ্চে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছে। নেপথ্যে কলিং বেল। হাত মুছতে মুছতে মঞ্চে ঢোকে অনিতা]

অনিতা : বাবা আজ সূর্য কোন্ দিকে উঠলো- বিকেল না হতেই কলিং বেল? আজ Firstকে অনু না সমু? কি জানি বাবা- এদের চাকরি বাকরির যা ঢং হয়তো ঘরে ঢুকেই বল্লো- যা কাজটা ছেড়ে দিলাম। যদি বলি কেন রে? বলবে- আরো ভালো অফার পেলাম। [টেপটা কমিয়ে এগিয়ে যায় গ্রিল গেটের সামনে মুখোমুখি অরিন্দম-অনিতা]

অনিতা : হ্যা- বলুন—

অরিন্দম : একটু দীপান্বিতাকে ডেকে দেবেন?

অনিতা : দীপান্বিতা!

অরিন্দম : হ্যা দীপান্বিতা - ওকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি -এটা দীপান্বিতার বাড়ি তো?

অনিতা : না-মানে—দীপান্বিতা—

অরিন্দম : দীপান্বিতা বাড়ি নেই? কাজে গেছে?

অনিতা : হ্যা-মানে —

অরিন্দম : ফিরবে তো- দীপান্বিতাকে ঘরে ফিরতে হবে তো। সেই সময়টুকু দীপান্বিতার জন্যে অপেক্ষা করার সুযোগ আমাকে দেবেন কি? না- না- আমি ভিতরে যাবো না - এই গেটের সামনেই—

অনিতা : আপনি কে? কেন আপনি দীপান্বিতাকে খুঁজছেন? দীপান্বিতা আপনার কে?

অরিন্দম : জানি না- শুধু জানি আমি দীপান্বিতাকে খুঁজছি- অনেক দিন।

অনিতা : আপনার নাম কি? আপনি কোথা থেকে আসছেন?

অরিন্দম : আমাকে আপনি বলবেন না- আপনি দীপান্বিতার মা আমাকে তুমি বলুন।

অনিতা : ঠিক আছে কিন্তু—

অরিন্দম : দীপান্বিতা এখনও কাজ থেকে ফেরে নি? চিরকালই ও ভীষণ কাজ পাগোল। ঠিক আছে ও নিশ্চয়ই এসে যাবে—সময় মতো এসে যাবে-ততক্ষণ—

অনিতা : গ্রিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তুমি ঘরে এসে বসো। আমি তোমার দীপান্বিতার খোঁজ দিতে না পারলেও বুঝতে পারছি তুমি অনেক দূর থেকে এসেছ। ঘরে এসো একটু জল খাও— চা খাবে?

[অরিন্দম ভেতরে আসে- এদিক ওদিক দেখে- হঠাৎ কানে আসে রবীন্দ্র সঙ্গীত]

অরিন্দম : রবীন্দ্র সঙ্গীত— বা;

অনিতা : ঐ — গান গাইতে পারি না- কিন্তু একা মানুষ । ছেলেমেয়ে দু'টোই সারাদিন বাড়ির বাইরে - নিজের কাজ সামলে ঐ রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনেই দিন কাটাই।

অরিন্দম : মনের মধ্যে একটা জোর তৈরী হয় - তাই না? বেশ একটা— একটা—। আরো জোরে করে দিন না- শুনতে পাচ্ছি না যে ঠিকমত।

অনিতা : তাই? তোমার রবি ঠাকুরের গান ভালো লাগে?

অরিন্দম : এক সময় লাগতো।

অনিতা : এখন?

অরিন্দম : জানি না—।

অনিতা : ঠিক আছে- আমি গানটা জোরে করে দিচ্ছি। তা হ্যাঁ বাবা - দেখে তো মনে হচ্ছে খুব ক্লান্ত- কিছু খাবে?

অরিন্দম : না থাক- আগে দীপান্বিতা আসুক।

অনিতা : চা? জল?

অরিন্দম : চা- লিকার- কে যেন খুব ভালো বানাতো- দীপান্বিতা না ওর মা - কি জানি—

অনিতা : আমি তোমার জন্যে লিকার চা-ই নিয়ে আসছি- তুমি ততক্ষণ গান শোন [গানের ভলিউম বাড়িয়ে ভিতরে চলে যায়। যেন রান্না ঘরে - মোবাইল বার করে। Zone এ এক সোহম]

সোহম : সত্যি তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না মা। তুমি কি পাগোল- চেনা নেই জানা নেই- একটা মানুষকে দুম্ করে ঘরে ঢুকিয়ে নিলে? ঘরে তুমি একা- লুটপাটের কথা ছেড়ে দাও— যদি তোমাকে মারধোর করে? Oh, God, ঠিক আছে ছাড়ো - আমি এখুনি Start করছি। ... আচ্ছা মা লেখাপড়া বড় - কেরিয়ার বড় না নিজের মায়ের জীবনটা বড়। ঠিক আছে - ঠিক আছে- দিদি আসছে আসুক আমিও যাচ্ছি। [ রবীন্দ্র সঙ্গীত জোরে হয়। আলো নেভে। পূর্ণ মঞ্চে আলো — অরিন্দম চা খাচ্ছে- বিস্কুট খাচ্ছে লোভীর মতো।]

অরিন্দম : আ: কতোদিন বাদে এমন চা খেলাম। মায়ের হাত না লাগলে এমন চা কে বানাবে। আ—

অনিতা : তুমি তো এখনও বল্লে না বাবা - তোমার নাম কি- তুমি কোথা থেকে আসছো। দীপান্বিতা তোমার কে?

অরিন্দম : খুঁজছি তো - আমার নাম- ঠিকানা। সব দীপান্বিতা জানে। ঐ জন্যেই তো আমি খুঁজতে বেরিয়েছি আমার দীপান্বিতাকে। [ কলিং বেল বাজে ]

অনিতা : বসো বাবা- কে এলো দেখি-

অরিন্দম : নিশ্চয়ই দীপান্বিতা—

[ অনিতা উঠে যায়। বাইরে থেকে ফিরে আসে সঙ্গে অন্বেষা ]

অরিন্দম : এই তো দীপান্বিতা- তুমি এসেছো- তোমার জন্যে আমি -

অন্বেষা : Sorry- আমি দীপান্বিতা নই- আমি অন্বেষা-।

অরিন্দম : অন্বেষা? কিন্তু কথা তো ছিল দীপান্বিতা এই বাড়িতে - এই ঘরেই আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

অন্বেষা : কে আপনি? আমার স্মৃতি যদি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাহলে আপনাকে আমি আগে কোথাও না কোথাও দেখেছি- কে আপনি?

অরিন্দম : আমি- আমি এই ভাঙাচোরা সময়ে সুস্থ ভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাওয়া একজন মানুষ।

অন্বেষা : না - আপনি-আপনি-

অরিন্দম : আমি একটা Non Identity - আমি মানুষ- শুধুই মানুষ [ নেপথ্য আবহ]

[ আলো জ্বলে মঞ্চে সোহম - অনিতা- অন্বেষা ]

সোহম : আশ্চর্য কথা- যে ভদ্রলোক নিজের নাম বলতে পারছেন না- কোথায় থাকেন বলতে পারছেন না- শুধু দীপান্বিতাকে খুঁজছেন। এদিকে দিদি- বলছে ওকে নাকি মনে হচ্ছে চেনে। মাথাটা গেছে কার? দিদির না ঐ লোকটার?

অন্বেষা : না- না আমার প্রথম দেখে মনে হয়েছিল ওকে আমি চিনি কিন্তু সারাদিন এতো মানুষের সাথে আলাপ হয়- ভুলতো হতেই পারে।

সোহম : তাহলে এখন আমাদের কাজ কি? একটা অপরিচিত মানুষ যাকে চিনি না - জানি না তাকে নিয়ে এক ছাদের তলায় থাকতে হবে? লোকটাতো চোর ডাকাত -ধান্দাবাজও হতে পারে।

অনিতা : না- না - রে সমু- ছেলেটা ভালো - ওর চোখ দুটো দেখেছিস্ - অমন স্বপ্নভরা চোখ যার সে চোর ডাকাত? না- না আমি মানতে পারবো না।

সোহম : চোর ডাকাতের কি আলাদা মেকআপ থাকে নাকি মা? তোমাদের সময় এর শোলের আমজাদ খানের মতো ? বরং আজকাল চোর ডাকাতরাই ভালোমানুষ - গোবেচারার মুখোশ পড়ে থাকে।

অনিতা : অতো ভাবছিস্ কেন? আমি তো ঘরেই থাকবো।

অন্বেষা : আমিও থাকবো- নিজের চাকরী সামলে। শোন্ ভাই আমার মনে হয় এটা কোনও সমস্যাই নয়। একজন ভদ্রলোক - হ্যা-তিনি ভদ্রলোক- তাঁর

পোষাকে -কথায়-ব্যবহারে - । তিনি যদি মন চায় থাকবেন- ক'টা দিন আমাদের ঘরে। তারপর স্মৃতি ফিরে এলে - মানে ওর নিজের নাম বলতে পারলে -

সোহম : দীপান্বিতার ঠিকানা মনে পড়লে-

অনিতা : না- না আগে তো ওর নিজের ঠিকানাটা মনে পড়ুক। এমন হয় জানিস্ তো। আমার মেজোমামা একবার পুরীতে বেড়াতে গিয়ে দলছুট হয়ে এতো নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে সবটাই ভুলে গিয়েছিলেন। নিজের নাম- কোত্থেকে আসছেন। শেষে মামী মোবাইলে যোগাযোগ করে মামাকে হলি ডে হোমে ফিরিয়ে আনে।

সোহম : তোমাদের ঐসব গাঁ গঞ্জের গল্প এখন আর চলে না মা। এখন মানুষের সভ্যতা যেমন এগিয়েছে ক্রাইমও সেইভাবেই এগিয়েছে। তুমি সাইবার ক্রাইম এর খবর রাখো? সামান্য একটা Information - তোমার ব্যাঙ্ক একাউন্টের -Just Phone এ জেনে নিয়ে কেউ না কেউ তোমার মতো মানুষের টাকা ফাঁকা করে দিচ্ছে- দিচ্ছে না?

অনিতা : তোদের নিয়ে এই মুস্কিল- অকারণে অতিরিক্ত Tension করিস্।

সোহম : অকারণে?

অন্বেষা : নয়তো কি? একজন ভদ্র সভ্য মানুষ হঠাৎ নিজের স্মৃতিকে হারিয়ে আমাদের ঘরে এসেছেন- মা তাকে আশ্রয় দিয়েছে। এখন আমি তুই তাকে তাড়িয়ে দেবো? উনি যাবেন কোথায়?

সোহম : যেখান থেকে এসেছেন—। এটা তো অনাথ আশ্রম নয়- পাগলা গারদও নয়- যে খুশি আসবে- বসে বসে অন্নধ্বংস করবে- এটা মানা যায়?

অনিতা : সোহম- তোমার কাজটা তুমি করো- ওই মানুষটার জন্যে যদি একটা টাকাও খরচা করতে হয়- সেটা করবো আমি কারণ এই সময়েও আমার মতোই উনি একজন রবীন্দ্রপ্রেমী।

সোহম : কিন্তু তুমি বেহিসেবী, কাজ করছো কিনা সেটা দেখাও আমার কাজ। কারণ তোমার অবর্তমানে ও টাকাটা আমারই।

অনিতা : সোহম - ছি: ছি:

সোহম : এটাই আমাদের চল মা। No matter বুঝতে পারছি তোমাদের মধ্যে আমি সংখ্যালঘু- So এখন একমাত্র উপায় আমার Friend, Philosopher and Guide তনুদা।

অন্বেষা : তনুময়!

সোহম : Yes আমার বাবার একমাত্র বোনের একমাত্র ছেলে তনুময় রায়।

অনিতা : ওকে আবার এই সামান্য ব্যাপারে জড়াচ্ছিস্ কেন রে? বাপের ব্যবসা

সামলাতে ও নিজেই নাজেহাল- তার মধ্যে-

সোহম : তারমধ্যেও তনুদাকে খবরটা দিতেই হবে - কারণ আমাকে ছোট বলে Ignore করলেও তনুদার কথা তোমরা এড়াতে পারবে না।
[ স্মার্ট ফোন বার করে ডায়াল করে। Zone light এ একদিকে সোহম -একদিকে তনুময় ]

তনু : Yes brother-

সোহম : ঝামেলায় পড়েছি- উটকো ঝামেলা

তনু : কলেজে?

সোহম : না- বাড়িতে- একবার আসতে পারবি?

তনু : এখন?

সোহম : Please-

তনু : আসলে ক'টা মাল ডেলিভারী এখনও বাকী - ঠিক আছে- কেসটা কি?

সোহম : আজ বিকেলে আমাদের বাড়ীতে হঠাৎই এক ভদ্রলোক এসে হাজির। তিনি নিজের নাম বলতে পারছেন না - কোথায় থাকেন বলতে পারছেন না।

তনু : পুরো ঢপবাজী- বাড়ি ফাঁকা করার ধান্দা।

সোহম : অথচ মা- দিদি- কেউ মানতে চাইছে না-

তনু : কেন? মানতে চাইছে না কেন?

সোহম : মা বলছে আহা- ছেলেটা কি ভীষণ রবীন্দ্রসঙ্গীত পছন্দ করে আর দিদি বলছে ওই লোকটাকে - দিদি নাকি চেনে।

তনু : তোর ফুল ফ্যামিলি রাঁচী পৌঁছে গেল নাকি রে ভাই- মালটাকে মেরে তাড়া।

সোহম : কি করে? আমি তো এখানে সংখ্যালঘু-

তনু : ঠিক আছে- আমি একাই তোর কোরাম করিয়ে দেবো।
আধঘন্টা-ম্যানেজ করতে পারবি না?

সোহম : কি যে বলো গুরু—
[ আলো তনুময় থেকে সরে যায়। পূর্ণ মঞ্চে আলো ]

সোহম : তনুদা আসছে-

অন্বেষা : তারপর?

সোহম : সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। একটা reasonable ডিসিশান।
ততক্ষণ — [ নেপথ্য থেকে ভেসে আসে অরিন্দমের কণ্ঠে-]

সোহম : কি যে বলো গুরু—

দৈপায়ন হ্রদে ডোবা ভগ্ন জানু মন
তোমাকে দেখেছি বার বার এ শহরে হে দুর্যোধন

লালসার জ্যোতুগৃহে ভস্মিভূত তোমার চক্রান্ত
এনেছে যুগান্ত-
অর্জুন - অর্জুন আজ লক্ষ লক্ষ জনগণমন
দোর্দন্ড গান্ডিব তাই অতি প্রয়োজন
বৃহন্নলা ছিন্ন করো ক্লীব ছদ্ম সখ্যার ব্যসন
বিদ্রোহের সমীবৃক্ষে সব্যসাচী অস্ত্র খোঁজে আজ
ঘুন গ্রস্থ এ যুগ মৃত্যু জ্বরে কাঁপে হাড়ে হাড়ে
আরক্ত সূর্যের অস্ত পশ্চিমের রক্তিম পাহাড়ে।
[ মধুবংশীর গলি- জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র]
[কথাটা বলতে বলতেই মঞ্চে ঢোকে। কবিতা শেষে]

অরিন্দম : Give me light- Give me light- আলো দাও
দীপান্বিতা তুমি আলো জ্বালাও - আমার চারপাশ আলোকিত করো-
আলেকিত করো হে দীপান্বিতা।

অন্বেষা : কে আপনি - আপনার কথা- আপনার হাঁটাচলা দেখে বার বার আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আমি চিনি ভীষণভাবে চিনি- অথচ মনে করতে পারছি না। কে আপনি - please বলুন কে আপনি?

অরিন্দম : কে আমি? আমি এক নেই আমি - কোথাও নেই- শুধু অস্তিত্বহীন অর্থহীন এক আমি। তবু যেন দীপান্বিতা আমি অমৃতের পুত্র—

অন্বেষা : Please - আমি জানতে চাই- কে আপনি- কে?
[নেপথ্য আবহে সুচিত্রা মিত্রের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সুরে অমৃতস্য পুত্রা বিদ্যাতে ......। ধীরে ধীরে আলো নেভে]
[ আলো জ্বলে। মঞ্চে একা অরিন্দম গ্রিল গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে। হঠাৎই তার চোখে পড়ে সোহমকে]

অরিন্দম : [ সোহমকে ডাকে] আরে এই শোন্ - শোন্। আয়না
কাছে আয় না। [ সোহম ইতস্তত করে অরিন্দমের কাছে আসে] তুই এখানে? রায়গঞ্জ কলেজে যখন পড়াতাম — তুই তো ছিলি আমার সব থেকে প্রিয় ছাত্র-

সোহম : রায়গঞ্জ কলেজ-। মেরেছে রে-

অরিন্দম : তুই আমার কথা শুনে inspired হতিস্- বলতিস্ দেখবেন স্যার একটা দিন আসবে যেদিন আমরা সবাই আপনার পথে পা মেলাবো। কি যেন তোর নামটা - কি যেন- এই শোন্ গ্রিল গেটটা একটু খুলে দে না। এই অন্ধকারে বাগানটা একটু দেখি। অন্ধকার চারিদিকে অন্ধকার- তার সাথে ফুল-- অনেক ফুল - অনেক গন্ধ - অনেক আলো- খুলে দে না তোর ঐ

আগলটা—

সোহম : সে খুলে দিচ্ছি- কিন্তু রায়গঞ্জ কলেজে আমি কখনো [ কথা শেষ হয় না- গ্রিল খুলে দেয়]

অরিন্দম : আঃ শান্তি— কতো ফুল— কতো গন্ধ— কতো আলো আঃ

সোহম : কে রে বাবা— লোকটা কে ভয়ও করছে- আবার — [ মটর সাইকেলের শব্দ— ভিতর থেকে ঢোকে অনিতা— অন্বেষা]

তনুময় : [ নেপথ্য থেকেই] এসে গেছি — আমি এসে গেছি—
[ ভিতরে ঢোকে] don't take any tension, পুরো কেস্‌টা আমার উপর ছেড়ে দাও। আর মামী ঠিক গুছিয়ে বলো তো— কিভাবে লোকটা এ বাড়িতে ঢুকলো?

অনিতা : না মানে কি জানিস্ তো-

তনু : By the by- সে মালটা এখন কোথায়?

সোহম : আর বলিস্ কেন- বলে কিনা আমি নাকি ওনার ছাত্র- রায়গঞ্জ কলেজের-

তনু : তুই - হা: হা: হা:

সোহম : যাক্ গে গ্রিল গেট খুলে দিতে বল্লো- এখন বাগানে ঘুরছে—

তনুময় : ঢ্যামনামো- মাটাই ঢ্যামনামো- এ মালটা পুরো দু'নম্বরী কোনও একটা ধান্দা নিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

অনিতা : ধান্দা?

তনু : মামী- খবর তো রাখো না। কাগজ তো পড়ো না। ক'দিন থেকেই মিডিয়া সরগরম এক সিরিয়িাল কিলারকে নিয়ে - আগে থেকে খোঁজ নিয়ে একা ঘরে থাকা মেয়ে - বৌদের উপর ঝাঁপায়ে- খুন করে টাকা পয়সা হাতিয়ে এমন কি মেরে ফেলার পর রেপ করে-

অন্বেষা : Stop - please Stop— আমি আর নিতে পারছি না।

তনু : নিতে পারলেও এটাই বাস্তব মেজদি। মানুষ পাল্টাচ্ছে তাকে পাল্টে দেওয়া হচ্ছে। আরো চাই - আরো। TV, ফ্রিজ , ল্যাপটপ, রাতে যত খুশি বিদেশী মদ। এটাই বাজার সভ্যতা আমি নিজে কি? দু পয়সা কামাবার ধান্দায় দিনরাত লড়ে যাচ্ছি। যাদের এই পরিশ্রমের ইচ্ছে থাকেনা তাদের ধান্দা করতেই হয় —যেমন এই মালটা করছে— তোমাদের বাড়ি ফাঁকা করার ধান্দায় নাটক করছে—

অন্বেষা : না- না- ওভাবে ভাবিস্ না। যদি আমি ভুল করে না থাকি উনি আমার পরিচিত - মনে করতে পারছি না কিন্তু সত্যি বলছি আপন ছিলেন উনি— কোথায় যেন দেখেছি- কবে যেন ওর সাথে মিশেছি—
[নেপথ্যে অরিন্দমের কন্ঠ— তুমি তো অন্বেষা নও তুমি দীপান্বিতা-

তোমরা সবাই আমার চোখে দীপান্বিতা- এ অন্ধকারে সব কিছু আলোকিত করার দায়িত্ব যে তোমার - তোমাদের-]

অন্বেষা : মনে পড়েছে - হ্যা - মনে পড়েছে- উনি আমাদের অরিন্দম স্যার। দু'হাজার এগারো - হঠাৎই আমাদের রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল ঘটলো। স্যার ছিলেন ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী- ছিলেন সমঝোতা বিরোধী। তাই ওনাকে বদলি হতে হলো । আমরা ওনাকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম। শাসক দলের পক্ষ থেকে ওকে অফারও দিয়েছিল। কিন্তু ওনার গোঁ - মতাদর্শ হচ্ছে মানুষের হৃদযন্ত্র - হার্ট সেটা পাল্টানো যায় না- সেটা পাল্টালে মানে মৃত্যু আর তাই—

[ নেপথ্য থেকে অরিন্দম ঢোকে]

অরিন্দম : [কবিতায় ছন্দে] তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছো নিচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হতো যে মিছে

[ কথার মধ্যে অন্বেষা গানটা ধরে নেয় - গেয়ে ওঠে তাই তোমার ----]
[ গানের মধ্য পথেই-]

তনুময় : এই যে মাল এসো- এসো - kindly এই চেয়ারটাতে একটু বসো তো-। তোমাকে একটু নেড়ে ঘেঁটে দেখি।

অন্বেষা : আ: তনু- উনি একজন অধ্যাপক।

তনু : মেজদি - সেই ভদ্রলোক কে তুই চিন্‌তিস্ প্রায় দশবছর আগে- তাও এক বছরের পরিচয়। আমার তো মনে হয় তোর ভুল হচ্ছে- এ লোকটা আদৌ তোর প্রফেসর নয়।

সোহম : হতেই পারে- দিদি যা তালকানা- তারপর দশবছর আগের কেস্- সন্দেহ থেকেই যায়।

তনু : আর যায় বলেই আমাকে একটু বাজিয়ে দেখতেই হচ্ছে।
এই যে স্যার- আরে মশাই আপনাকে বলছি—

অরিন্দম : আমাকে—

তনু : হ্যাঁ - আপনাকে।

অরিন্দম : কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনতে পারছি না। আগে কোথাও দেখেছি কি?

তনু : কি করে দেখবেন- আমি তো কোনও দিন পাগলা গারদের পাহারাদার ছিলাম না। হাসপাতালের জমাদারও ছিলাম না- যে আপনার সাথে আগে পরিচয় থাকবে। তা এলেন কোত্থেকে - পাগলা গারদ নাকি মেন্টাল হস্‌পিটাল?

অরিন্দম : হস্-পি-টাল- শব্দটা খুব পরিচিত - কোথায় যেন শুনেছি শব্দটা - নাকি দেখেছি। কোনও এক হস্পিটাল সাদা বিছানা - নীল পোশাকের নার্স। কোথায় দেখেছি বলুন তো?

অনিতা : বাবা- এসে থেকেই কিছুই তো খেলে না- একটু কিছু দিই।

অরিন্দম : কি দেবেন বলুন তো?

অনিতা : জল খাবার- রুটি, লুচি যা চাইবে।

অরিন্দম : পাউরুটি- লাল করে স্যাঁকা- কি যেন বলে টোস্ট- সঙ্গে একটু মাখন- সামান্য ছড়িয়ে দেওয়া চিনি-

অনিতা : খাবে বাবা টোস্ট? আমি এখুনি করে আনছি।

সোহম : আমিও যাই চলো মা - ক্ষিধে পেয়েছে। তনুদা যখন দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়েই নিয়েছে তখন এখানে ফালতু সময় দিয়ে কি লাভ?

তনু : হ্যা- হ্যা- তুই যা - মেজদি তুমিও কেটে পড়ো তো। এ মালকে একটু ছানবিন্ করে দেখি।

সোহম : ও. কে- [ চলে যায় ]

অন্বেষা : তনু—

তনু : বাপের ইট বালির কারবার চালালেও কলেজটা আমার চেনা জায়গা। সেখানে গন্ডায় গন্ডায় মাষ্টার - এতো বছর পরও - এক বছরের পরিচয়- এক মাষ্টারকে আজও মনে রাখা- অদ্ভুত নয় কি?

অন্বেষা : অরিন্দমদা- মানুষটাই অদ্ভুত। আজকের দিনে একটা মানুষ শুধুমাত্র নিজের মতাদর্শে সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে - সব প্রলোভন জয় করে, সব অত্যাচারকে মেনে নিয়েও যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে- তার প্রতি প্রথমেই জাগে শ্রদ্ধা- আর শ্রদ্ধা থেকেই আসে ভালোবাসা- প্রেম। একটা মানুষকে চুড়ান্তভাবে ভালো না লাগলে ভালোবাসা যায় না রে তনু।

তনু : খুব কঠিন কঠিন কথা - আমার ইট, বালি, সিমেন্টের মাথায় এসব ঢুকবে না। ঠিক আছে যদি সত্যিই উনি তোমার মনের মানুষ হ'ন - আমি ওনাকে একটা প্রণাম করে কেটে পড়বো। কিন্তু উনিই যে সেই অরিন্দম - সেটা তুমি কনফার্ম- হচ্ছো কি করে? এতো বছর পরে - তখনও কি এ বাবুর ডাইস্টা ঠিক এমনই ছিল?

অন্বেষা : মানুষ নিজের সবটা পাল্টে ফেলতে পারে- বয়েসের সাথে সাথে মানুষের চেহারায় অনেক কিছুই পাল্টে যায়। কিন্তু পাল্টায় না একটাই জিনিস- মানুষের চোখ। তুই তাকিয়ে দেখ্ তনু এই মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ্। কি গভীর কতো শান্ত- যেন এক দীঘি কালো জল।

তনু : ব্যাস্- আর এসব বাণী বেশী শুনলে আমার হিক্কে উঠবে। এই যে স্যার

নিজের নামটা মনে পড়লো?

অরিন্দম : আমাকে কিছু বললেন?

তনু : বলি বাপের দেওয়া নামটা কি? মনে পড়ছে?

অরিন্দম : পড়বে। নিশ্চয়ই একদিন না একদিন মনে পড়বে। আমার নাম আমার বসত- আমার দীপান্বিতার ঘর। সবটাই এতো ধোঁয়া ধোঁয়া- এতো এলোমেলো-

তনু : যে কিছুই মনে পড়ে না- তাই না?

অরিন্দম : ঠিক বলেছেন—

তনু : এটাও ঠিক বলবো- যে আপনার সবটাই ঢ্যামনামো।

অন্বেষা : তনু—

তনু : ছাড়ো তো মেজদি। একটা মানুষ হাঁটতে হাঁটতে তোমার ঘরে ঢুকে পড়লো - ঘরে ঢুকে চা খেল- টোস্ট এর অর্ডার দিল। যে লোকটা টোস্ট চেনে সে নিজেকে চেনে না? ইয়ার্কি?

অরিন্দম : না - আসলে-

তনু : আসলে - নকলে বুঝি না। আসল ধান্দাটা খুলে বলবেন কি? নাকি পুলিশ ডাকবো?

অরিন্দম : পুলিশ? কেন? আমি তো চোর নই ডাকাত নই।

তনু : ধান্দাবাজ- নাটক সারিয়ে নি:খচ্চায় দু'একদিন ভালোমন্দ পেটে ঢোকানোর ধান্দা।

অরিন্দম : ঠিক বলেছেন- এখানে এসে- দীপান্বিতার মাকে দেখে - রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে- বাগানে ঘুরে- এখন মনে হচ্ছে আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। আমি অনেকদিন কিছু খাইনি।

তনু : বিনে পয়সায় - ধান্দাবাজী-

অন্বেষা : আ: তনু-

তনু : থামো তো-। এই মাল নিজের নাম বলবি না ক্যালানি খাবি?

অরিন্দম : এ সব শব্দকে এক সময় আমার মনে হতো অশ্লীল।

তনু : এখন এটাই শ্লীল, এটাই চল- তাও তো চার অক্ষর ছ অক্ষর ঝাড়িনি।

অরিন্দম : মানে?

তনু : মানে একটাই হয় নিজের পরিচয় দাও- নয়তো গ্রিল খুলে দিচ্ছি- যেখান থেকে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও।

অরিন্দম : যাবো? কোথায়?

তনু : যেখানে খুশি। শালা বাড়িতে দু'জন মহিলা- একটামাত্র ছেলে সেও মায়ের আঁচলধরা। আজ রাতে তোমাকে এখানে ফেলে রেখে আমি ঘরে যেতে

পারবো ?

অরিন্দম : তাহলে ?

তনু : তাহলে আর কি- নিজের পথ দেখ।

অরিন্দম : ঐ পথটাই তো খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় কখোন যে কোন অন্ধ গলিতে আমার চেনা পথটা হারিয়ে গেল- কেন যে খুঁজে পাচ্ছি না - কেন পাচ্ছিনা বলো তো ?

তনু : আমি তোকে পথ দেখাচ্ছি চল্- ওঠ্-ওঠ্ [ ধাক্কা দিয়ে তোলার চেস্টা করে ]

অন্বেষা : তনু- কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্ ওকে ?

তনু : এভাবে সারারাত তো তোমাদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে চলে যেতে পারি না। এ মালটাকে আমার গাড়িতে চাপিয়ে রেল স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসি। মন চাইলে ট্রেন ধরে কোথাও না কোথাও চলে যাবে- না পারলে G.R.P তো আছেই- এই চল্—

অন্বেষা : না- না- এ হয় না- তনু এভাবে একজন মানুষের সাথে আমরা বিহেব করতে পারি না। একজন মানুষের সাথে- যে বিপন্ন- যে নিজের পথ হারিয়েছে।

তনু : তাহলে কি করবো ? আমার পক্ষে তো সারারাত ওকে পাহারা দেওয়া সম্ভব নয়।

অন্বেষা : ওকে পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব তো তোকে কেউ দেয়নি- আমি না - মাও না-

তনু : তাহলে আমি এখানে এলাম কেন, ছিঁড়তে ?

অন্বেষা : ত-নু- hold your toung.

তনু : তোমাদের এই উপর চালাকি মার্কা ভদ্রতাটাই আমার নাপসন্দ। ঠিক আছে- নিজে কাঠ খেলে আঙরা হাসবে- আলমারীতো হাতাতে পারবে না। সোহমকে বলে দিয়ো কেসটা আমার হাতের বাইরে- O.K. [ কলার তুলে চলে যায়]

অরিন্দম : খুঁজছি- খুঁজছি গো - বন্ধু খুঁজছি। বন্ধু চাই- মাঠটাকে বাড়াতে চাই- এতো বাইশ গজের লড়াই। এতো এগারো এগারো বাইশ জনের খেলা। একা হাতে কিভাবে ব্যাট করবো ? সঙ্গী তো খুঁজে পাচ্ছি না। শেষে কি শেষ ব্যাটস্ম্যানও আউট হয়ে গেল ? একা ক্রিজে আমি শুধু একটাই আত্মতৃপ্তি - আমি নট আউট ?

অন্বেষা : [ কাছে গিয়ে ] স্যার - । অরিন্দম দা—

অরিন্দম : কে- কে তুমি ?

অন্বেষা : আমি অন্বেষা। স্যার আপনার মনে পড়ে না - Hooghly Women's

College - আমি first year - হস্টেলে থাকতাম। এক সন্ধ্যায় আপনার কোয়ার্টারে অনুপস্থিত ক্লাসের নোট নিতে যাওয়ার সময় আপনি বলেছিলেন তুমি তো অন্বেষা নও - তুমি দীপান্বিতা- তোমরা সবাই আমার দীপান্বিতা। এ অন্ধকারে কতো কথা- স্যার থেকে অরিন্দমদা- তুমি-। কেন আমাকে ছেড়ে চলে গেলে অরিন্দম দা- কেন?

অরিন্দম : একটা বিশ্বাস - একটা উপলব্ধি - একটা স্বপ্ন - একটা সুস্থ জীবনের স্বপ্ন। পিছতে পিছতে - এক সময় খাদের কিনারায়- পড়ে যাইনি- কিন্তু হারিয়েছি - স্বপ্ন- আবেগ- দর্শন। আমি কি পাগোল হয়ে যাচ্ছি- [চিৎকার করে ] আমি কি পাগোল হয়ে যাচ্ছি দীপান্বিতা। আমাকে আলো দাও- আলো- আমার পথ যে ভীষণ অন্ধকার।

অন্বেষা : তুমি আলো চাইছো-? আমি তোমাকে আলো দেবো। হ্যা তোমার পথ আমি আলোয় ভরিয়ে দেবো। শুধু তুমি একবার বলো তুমিই অরিন্দম দা।

অরিন্দম : একটা সময় আসে যখন সব পেলব স্পর্শগুলো ম্লান হয়ে যায়। এই যে এই সময় কথা বলতে না পারার কস্ট— নিজেকে নিজের মতো ভাবতে চাওয়ার জন্যে পীড়ন-

অন্বেষা : আমি এতো কথা বুঝি না অরিন্দমদা— আমি জানি তুমি একজন সৎ মানুষ ভালো মানুষ- তোমাকে তোমার পথে ঠিক মতো পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আমি সব কিছু করবো। শুধু একবার বলো তুমি অরিন্দমদা। আমি যে অরিন্দমদাকে ভালোবাসি। আমি যে অরিন্দমদার মতো মানুষদের ভালোবাসি।

অরিন্দম : দীপান্বিতা!

অন্বেষা : না- আমি দীপান্বিতা নই- আমি অন্বেষা- রক্ত মজ্জার শরীর নিয়ে মানুষ অন্বেষা।

অরিন্দম : অন্বেষা- অন্বেষা-কিন্তু-

(খাবার নিয়ে মঞ্চে আসে অনিতা)

অনিতা : হ্যারে- তনু গেল কোথায়?

অন্বেষা : চলে গেছে-

অনিতা : বাঁচা গেছে- আমার গানের ভুবনে ও বড্ড বেসুরো বাজে। নাও বাবা তুমি খেয়ে নাও। রাতের খাবার কিন্তু আলাদা। গরম ভাত আর মাছের ঝোল।

অরিন্দম : গরম ভাত- মাছের ঝোল- আ- কখোন খাব মা?

অনিতা : পাগোল রে- সে তো রাতে- এখন তোমার পছন্দ মতো বাটার টোস্ট আর সকালের রান্না করা একটু চিকেন স্টু।

অরিন্দম : না- না চিকেন চাই না- মাটন চাই না- রুটি শুধু এক টুকরো রুটি- ‘ ক্ষুধার

রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি

[ ক্ষুধার্তের মতো রুটি চিবোতে থাকে- ইশারায় অন্বেষাকে পাশে ডেকে অনিতা বলে ]

অনিতা : সমু বলছিল - একটা ডাক্তার দেখালে হয় না?

অন্বেষা : সাইকিয়াট্রিস্ট?

অনিতা : ঐ আর কি পাগোলের ডাক্তার।

অন্বেষা : তারপর যদি ও সত্যিই সুস্থ হয়ে যায়। তখন তো ও আর দীপান্বিতাকে খুঁজবে না। আমার মধ্যেও দীপান্বিতাকে খুঁজতে চেস্টা করবে না। তখন তো আমাকে ও চিনতেও পারবে না। আবার চলে যাবে - হারিয়ে যাবে। না - না কোন ডাক্তার তুমি ডেকো না মা।

অনিতা : কিন্তু এভাবে একটা মানুষকে খবরের কাগজের মতো খাতায় ফেলে রাখা তো যায় না। ওর নিজের অবস্থানটা ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে তো। সে দায়িত্ব যে আমার - ও যে আমাকে মা বলে ডেকেছে।

অন্বেষা : তাহলে — ডাক্তার- তারপর Mental Hospital

অনিতা : ধুর পাগোল- আগে একবার কাল সকালে সত্য ডাক্তারকে খবর করি- উনি তোর বাবার বন্ধু - আমাদের family physician। কোথায় গেলে কি করলে তোর এই অরিন্দমের ভালো হবে সেটাতো সত্যদা বলে দিতে পারবে তাই না?

অন্বেষা : হ্যা-সত্যকে মানতে এখন সত্য ডাক্তারই আমাদের ভরোসা। ঠিক আছে মা- কাল সকালে তুমি সত্য কাকাকেই আসতে বলো।

অরিন্দম : আ: দারুণ খেলাম- কতোদিন যে এমন খাই নি।
[ গ্রিল ঠেলে মঞ্চে ঢোকে সোহম ]

অন্বেষা : কিরে কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

সোহম : পাড়ার মোরে আমাদের ঠেকে—

অন্বেষা : আড্ডা দিচ্ছিলি। সঙ্গে শুধু চা সিগারেট তো? নাকি—?

সোহম : কি যে বলো না—

অনিতা : এদিকে আমরা ভেবে অস্থির-

সোহম : আমার জন্যে—

অনিতা : না- আমার ঐ ভালো ছেলেটার জন্যে।

সোহম : মানে—?

অনিতা : ঐ যে বিকেলে ছেলেটা এলো না-

সোহম : ও মালটাকে তাড়াও নি? তনুদাও ফেল?

অন্বেষা : তনু খুব চেস্টা করেছিল- কিন্তু আমি যা—

সোহম : দুই পাগোল—

অন্বেষা : কিন্তু এই দুই পাগোলেই তোকে আজ এতোটা পথ এদিকে যেতে লড়ে গেছে- পাগোল ভালো রে- সেয়ানা পাগোলদের নিয়েই যতো গোলমাল—

সোহম : যেমন তোমাদের ঐ আজকের অতিথি। তা তিনি কি - আজ রাতে এ বাড়িতেই বডি দেবেন?

অনিতা : তো- যাবে কোথায়?

সোহম : যেখান থেকে এসেছে—

অনিতা : যতো বড় হচ্ছিস্- ততোই তুই আমাদের ভাবনার বাইরে চলে যাচ্ছিস্।

সোহম : যাচ্ছি- কারণ আমি তোমাদের মতো রবীন্দ্র প্রেমী হয়ে ভাবের ঘোরে চুরি করতে পারবো না। আমি reality বুঝি আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী মানুষের খবর রাখি মা।

অন্বেষা : হ্যা- রাখিস্- কিন্তু তোদের ঐ reality বা face book reality - ভার্চুয়াল রিয়ালিটি - যার বড় অংশটাই fake - মিথ্যে-।

সোহম : তার মানে ঐ অজানা- অচেনা লোকটাকে তোমরা আজ রাতে এখানে থাকতে দেবে?

অনিতা : শুধু আজ রাত নয়- দরকারে—
[ নেপথ্যে একটা মটর সাইকেল থামার শব্দ হয় ]

অনিতা : এত রাতে আবার কে? দেখতো সমু—
[ সমু গ্রিল গেটের সামনে যায় ]

সোহম : আরে গুরু তুমি? [ সেখানে তনুময় ]

তনু : গেটটা খোল রে ভাই [ সোহম গেট খোলে ]

সোহম : এই যে বস্ [ তনু ঢোকে সঙ্গে শীর্ণ খর্বকায় একটা ছেলে ]

সোহম : [ ছেলেটিকে দেখে ] এ-কে- তনুদা?

তনু : আগে ভিতরে ঢুকতে দে- তবে তো-
[ তনুময় মঞ্চে আসে- সঙ্গে কচি ]

তনু : মামী- তুমি ভাবের জগতে থাকো- তোমার মেয়ে আমাদের মেজদিও। কিন্তু আমরা তো এখনটা বুঝি- বুঝি বলেই ব্যবসা নিয়ে tension - তোমাদের নিয়ে tension। ঐ মালটাকে তো এখান থেকে ফোটাতে পারলাম না- মানে তোমরা ফোটাতে দিলে না - তাই-

অন্বেষা : তাই—?

তনু : আমার গোডাউন কিপার এই কচিটাকে রেখে যাচ্ছি। আমি তো পারবো না ঘর ছেড়ে এই ফড়েটাকে পাহারা দিতে। তাই তোমাদের প্রেমের অতিথি

যতদিন না নিজের পথ খুঁজে পাচ্ছেন - আমার কচি রোজ রাতে এ বাড়িতে পাহারা দেবে।

অনিতা : এতো কিছুর দরকার ছিল না রে তনু-

তনু : সে তুমি ভাবতেই পারো। কিন্তু আমারও তো একটা দায়িত্ব আছে। তোমাদের কিছু হয়ে গেলে মা আমাকে ছেড়ে দেবে? ঠিক আছে- কচি- তুই কাজটা বুঝে নে- আমি চলি- মামী- এখনও বহুৎ ঝামেলা পড়ে আছে।

[ তনুময় চলে যায়। নেপথ্যে মটর সাইকেলের শব্দ। ওরা কচিকে জানতে থাকে। ]

অনিতা : তোমার নাম যেন কি বাবা?

কচি : কচি-

অন্বেষা : শুধুই কচি? পদবী?

কচি : না- শুধুই কচি- প্রাইমরী ইস্কুলে যখন বাপ ভত্তি করেছিল তখন একটা নাম ছিল সুখেন বাসফোর। তারপর বাপটা একটা নতুন মাগীকে নিয়ে ফুটে গেল। যা কোনও রকমে এ বাড়ি ও বাড়ি বাসন মেজে ঘর মুছে আমার ক্ষিধে মেটাচ্ছিল। যে সময় দু'চারটে ফালতু কাজ করেছি- হ্যা করেছি— তারপর আমার স্যার এর চোখে পড়ে গেলাম। এখন স্যার এর গোলা পাহারা দিই- থাকি- স্যার এর গোলাতেই। খাই-খরচা সামলেও 'মা'কে দিই দু'চারশো—

অনিতা : খুব ভালো- খুব ভালো- তা বাবা আজ থেকে তুমি আমাদের এখানে থাকবে- তাইতো?

কচি : রাতটুকু- যতদিন না আপদ আপনাদের ঘাড় থেকে নামছে।

অনিতা : তাহলে তোমার রাতের খাবার - ব্যবস্থা করি গে।

কচি : ও সব মেরে এসেছি মামীনা। আমরা সিকিউরিটি গার্ড। রাত জেগে আমাদের এরিয়া সামলাতে হয়। বাইরের খাবার আমাদের চলে না।

আমরা বাড়ি থেকে খেয়েই বেড়োই।

সোহম : কিন্তু এ আমাদের পাহারা দেবে? এরকম-

কচি : পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির চল্লিশ কেজি ওজনের একটা মাল? হো: পাহারা দিতে এখন চেহারা লাগে না- লাগে— [পকেট থাবড়ায় ]

অনিতা : ওখানে কি?

সোহম : পিস্তল!

কচি : ছ ঘড়াটা আমার বসের কাছে। কিন্তু আমার কাছেও থাকে দিশি-। না থাকলে বসের কোটি কোটি টাকার কারবার তার দেখভাল- Night duty-

সামলাতে পারবো?

সোহম : তার মানে এর থাকারও একটা ব্যবস্থা তোমাদের এখন করতে হবে।

অন্বেষা : সবটাই তোর জন্যে। তনুটাকে না ডাকলে- এসব কিছুই হতো না।

কচি : ঘাবড়াবেন না- আমি সারারাত এক পায়ে খাড়া থেকেও আমার বসের সম্পত্তি পাহারা দিতে পারি- আমাকে খেতে দিতে হবে না- বিছানা দিতে হবে না - শুধু দেখিয়ে দিন কোন মালটাকে আমাকে সামাল দিতে হবে।

[ সেই মুহূর্তে হঠাৎ অরিন্দম চিৎকার করে ওঠে ]

অরিন্দম : এতো অন্ধকার কেন? কেন? আলো জ্বালাবার দায় কি একা আমার? আমার? পাশে কে?- কোথায়?

কচি : এই মালটা

সোহম : একদম ঠিক-

কচি : নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন- আমি রইলাম এটার পাশে।

অনিতা : কিন্তু ও ঘুমোতে যাবে তো- ঘরে-

কচি : দরজার পাশে আমি থাকবো সারা রাত। মামীমা- আপনি আমার বসের মামী। আপনার বিপদে আমি পুরো বডি দিয়ে দেবো- আমার বৌ এর কসম্। [ নেপথ্য আবহ। আলো নেভে ]

[ পরের দিন সকাল, টেপে যথারীতি রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজছে। ]

[ মঞ্চে আসেন অনিতা - হাতে ফুলের সাজি- মুখে রবীন্দ্রগানের অনুররণ]

অনিতা : অনু-অনু- এখনও বাথরুমে ঢুকলি না ? এরপর তো দেরী হয়ে গেছে- দেরী হয়ে গেছে বলে না খেয়ে খালি পেটেই ছুটবি- ও অনু— [ অন্বেষা আসে ]

অন্বেষা : মা- আমি আজ অফিস যাবো না।

অনিতা : কেন রে? শরীর খারাপ? চট্ করে তো তুই অফিস কামাই করিস্ না।

অন্বেষা : না - মা- শরীর নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। আসলে অরিন্দম স্যার আছেন তুমি আবার সত্যকাকুকে আসতে বলেছো।

অনিতা : ও আমি ঠিক সামলে নেবো।

অন্বেষা : কিন্তু ঘরটা সামলাতে পারলেও বাইরে টা?

অনিতা : মানে?

অন্বেষা : মনে নেই আজ ভোটের রেজাল্ট।

অনিতা : ছাড়তো - Local Body ইলেকশান।

অন্বেষা : Local Body নিয়েই তো সবচেয়ে বেশী ঝামেলা যা গতবার তুমি দাঁড়িয়েছিলে- হেরে যাওয়ার পর ওদের উল্লাস - তোমার মনে নেই?

অনিতা : কিন্তু এবার তো আমি ভোটে দাঁড়াইনি।

অন্বেষা : না দাঁড়ালেও ওরা জানে আমরা বিরোধী -ওদের আপত্তি সত্বেও তুমি আমি লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছি - তাই-

অনিতা : তাই

অন্বেষা : ওরা এবারেও জিতলে হুজ্জুতি একটা হতেই পারে।

অনিতা : তোদের সবেতেই বাড়াবাড়ি ? ছাড়তো- কিচ্ছু হবে না।
তবে তোর ইচ্ছে যখন হয়েছে- ছুটি নিয়েছিস্- খুব ভালো মা বেটিতে মিলে সারাদিন দারুণ কাটবে।

অন্বেষা : সমুকেও তো বলেছিলাম- থেকে যা। বাবুর গোঁ - আসলে অরিন্দমদাকে আমরা রেখে দিয়েছি- তাই এর সেটা পছন্দ হয়নি।

অনিতা : হ্যাঁ রে সে কোথায় ?

অন্বেষা : সকালে তোমার হাতে তৈরী লুচি আর বেগুন ভাজা খেয়ে সে এখন তোমার বই এর সেল্ফ ঘেঁটে রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতি পড়তে বসেছে।

অনিতা : ভাব- যে মানুষটা রবীন্দ্রনাথ পড়ছে- সে কি ধান্দাবাজ হতে পারে বল ?
[ নেপথ্যে কলিং বেল ]
[ গ্রিল গেটের সামনে দেখা যায় সত্য ডাক্তারকে ]

অনিতা : ঐ বোধহয় সত্য দা—

অন্বেষা : আমি নিয়ে আসছি । [ যেন গ্রীল গেট খুলে ডাকে]

অন্বেষা : আসুন কাকু—

সত্য : কি আপদ- হঠাৎ এতো ডাক পাড়াপাড়ি কেন ? কি হয়েছে- মায়ের শরীর খারাপ- নাকি সমু—

অন্বেষা : না- না - আমাদের কিছু হয়নি।

সত্য : তোমাদের কিছু হয়নি ? তাহলে ডাকলে কেন ? আরে বাবা লোকে চোখ না উল্টালে বিছানায় হেগে মুতে না ফেল্লে তো আমার মতো ডাক্তারকে কেউ কল্ দেয়না। অথচ তুমি বলছো তোমাদের —

অন্বেষা : একবার ঘরে আসুন না- মা আপনার সাথে কথা বলবে।

সত্য : বৌদি ডেকেছেন বলেই তো আসা। তুমি তো জানো তোমার বাবা ছিলেন আমার ন্যাংটো পোঁদের বন্ধু দুজনে হরিহর আত্মা। ও M.A. করে গেল L.I.Cতে আর আমি B.Sc.র পর DMS.-

অন্বেষা : আসুন- মায়ের সাথে—

সত্য : হ্যা-হ্যা- চলো- চলো- [ ওরা ঘরে আসে ]
[ এবার মঞ্চে অনিতা সত্য-অন্বেষা ]

সত্য : হ্যা, বৌদি- হঠাৎ কি হলো ? ছেলে মেয়ে বড় হবার পর আমাকে নিয়ে বেশী টানাটানি তো করেননি। তবে হ্যা- যখন এদুটো ছোট ছিল -

হাম-জ্বর- আমাশা- রোজই তো প্রায় ছুটতে হতো আমার চেম্বারে। আপনাকে সবচেয়ে ভুগিয়েছে ঐ সমুটা। কি ক্রিমি- কি ক্রিমি। কোলে করে চেম্বারে নিয়ে এসেছেন- আমি ওষুধ দিতে দিতে বলছি - প্রয়োজনে একটু বোরোলিন পিছনে গুঁজ্যে দেবেন- তাতেও স্বস্তি নেই। চেম্বারের মধ্যে সমুটা চিৎকার করছে "খাচ্ছে— খাচ্ছে—।"

অন্বেষা : সেই সমু এখন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ ফাইনাল ইয়ার। মাধ্যমিকে স্টার - হায়ার সেকেন্ডারীতে র‍্যাঙ্ক।

সত্য : জানি তো- কম মিষ্টি খেয়েছি এ বাড়ির? কিন্তু আমার বন্ধুটি চলে যাওয়ার পর — যাক্ গে - গেছে যে দিন সে তো গেছেই- এখন আজ সমস্যাটা কি?

অনিতা : কাল বিকেলে এক ভদ্রলোক হঠাৎ হাজির আমাদের বাড়িতে। তিনি দীপান্বিতা বলে একটি মেয়েকে খুঁজছেন। কিন্তু নিজের নাম বলতে পারছেন না— কোথায় থাকেন—কোথা থেকে আসছেন কিছুই বলতে পারছেন না — শুধু খুঁজছেন।

সত্য : এই সেরেছে। ওকে পাগলা গারোদে পাঠান- কেন ফালতু হ্যাপা ঘাড়ে নিচ্ছেন।

অনিতা : কিন্তু কোথায় ডাক্তার- কার কাছে যাবো- একটা পরামর্শ — জানেন তো - এসব ডাক্তারদের appointment পাওয়া মানে মাস কাবার-?

সত্য : হতেই পারে- এই যে আমি পাতি D.M.S হোমিওপ্যাথি। লোকে বলে যার নেই কোনও গতি সেই খায় হোমিওপ্যাথি। কিন্তু আসে তো- মানুষ আসে তো আমার চেম্বারে। আজ নেহাৎই ভোটের ফল বেরোবে তাই রাস্তা খালি- আমার চেম্বারও খালি। ভয় লাগে তো। আমারই লাগে। বোমা-গুলি— এদের আবার দু'চারটে লাঠি হাতে না পেলে খেল্টা জমে না। যাক্ গে বৌদি- আমি কিন্তু রুগী দেখবো- কিন্তু ভিজিট নেবো না। আগের মতো খাবো আপনার হাতে - লুটি আর আলুর দম। আহা অমৃত।

অনিতা : এ আর বেশী কথা কি? আপনি আপনার রুগী সামলান। আমি আপনার লুচির লেচি রেডি করি।

সত্য : দারুণ। তা হ্যা - মা - অনু- এখন সব ঠিক আছে- তো? তোমার তো সেই ইজের পড়া বয়েসে মাঝে মাঝেই হাগা আটকে যেতো - তোমার বাবার কথায় আমাকে ক্যালকেরিয়া ফস্ - না হলে গ্লিসারিন বাতি—

অন্বেষা : আ: কাকু —

সত্য : ঠিক আছে- ঠিক আছে- এখন যাক ওসব কথা- তোমরা সব বড় হয়েছো- ঠিক আছে, তা যা- তোমাদের নতুন অতিথিকে একবার নিয়ে এসো তো।

অনিতা : রান্না ঘরে যাবার আগে অরিন্দমকে আমিই ডেকে দিচ্ছি।
অনু তুই— [ মঞ্চে আসে অরিন্দম ]

অরিন্দম : যা- আপনার collection এ বঙ্কিম -শরৎ-রবীন্দ্রনাথ আছে- ঠিক- কিন্তু আপনি তো সুনীল-শক্তি-শীর্ষেন্দু-এদের অস্বীকার করতে পারেন না। - ভাবুন - শক্তি লিখছেন -

সত্য : যাক্ বাবা- কাব্য থাক-। এখন বলো তো বাবা তোমার নামটা কি? নিবাস?

অরিন্দম : নি-বা স? বা: শব্দটা দারুণ তো-

সত্য : আরে মরা থাকিস্ কোথায়?

অরিন্দম : [ কাব্য করে বলে ] ব্রাত্য যে হন- খুঁজে চলে নিবাস-
খুঁজে চলে ঠিকানা- যে খোঁজে আশ্রয়-
ভালবাসা- সে কোন গ্রাম- নাকি শহর-
বাস মানে কি নিবাস - কোথায় খুঁজি আশ্রয়?

সত্য : ধুস- এতো পাকা ফট্টি নাইন- ফিফ্‌টি মানেই কেস্ কাবার।
এই বাপ বলতো ক'টা আঙুল-

অরিন্দম : (মুচকি হেসে) তিনটে-

সত্য : সকালে কি খেয়েছিস্ বাপ? কাল রাতে?

অরিন্দম : কাল রাতে ভাত মাছের ঝোল- আজ সকালে লুটি আলুর দম আর কমলা ভোগ।

সত্য : সত্যিটা না জানতে পারা পর্যন্ত সবটাই ভোগে- হাতে হেরিকেন।দেখি জিভ দেখি- আ- অ- নাড়ি - [ দেখতে দেখতে ] হুঁ- মনে হচ্ছে বাবুর প্রকোপ ঘটেছে- পিত্তের দোষ আছে- সঙ্গো কফ্- ঠিক আছে শুরুতে বায়ুটাকে বার করতে হবে- নাক্স ভূমিকা থার্টি - আধঘন্টা অন্তর তিনবার পাঁচগুলি।
[ ব্যাগ থেকে ওষুধ বার ] করে হাঁ করো তো বাপ।

অরিন্দম : কেন?

সত্য : ওষুধ খাবে?

অরিন্দম : কেন?

সত্য : খুঁজে পেতে হবে তো- তোমার নাম - ঠিকানা-। তোমাকে পথে আনতে হবে তো। খাও- [ ওষুধ খাইয়ে ] কাজ হলে তিনবার ক্যালিফক্স -টু হান্ড্রেড-যদি একটুও উন্নতি হয় তখন—

অনিতা : কিন্তু ওর অসুখটা কি?

সত্য : আমি পাতি D.M.S. সবটাতো ঠিক মতো বলতে পারবো না। তবে এতো বছর রুগী চড়িয়ে এলাম- লক্ষণ দেখে যা মনে হচ্ছে তাতে আমি বলবো -

এটা temporary loss of memory - এই মুহূর্তে মানুষটা নিজের অতীতের কথা কিছুই বলতে পারছে না। কিন্তু পারবে - হয়তো একটা কোনও ধাক্কা - সক্ এ এমন হয়েছে - আবার নতুন করে এমন একটা সক্ পেলে - আরে বৌদি তোমার উত্তম -সুচিত্রার সেই সিনেমাটা কি যেন নাম - হ্যা - হারানো সুর- মনে নেই।

অন্বেষা : সে তো পাতি বাংলা সিনেমা-

সত্য : সিনেমা ঠিক - পাতি সিনেমা ঠিক -কিন্তু পারবে - হয়তো একটা কোনও ধাক্কা - সক্ এ এমন হয়েছে - আবার নতুন করে এমন একটা সক্ পেলে -আরে বৌদি তোমার উত্তম-সুচিত্রার সেই সিনেমাটা কি যেন নাম -হ্যা - হারানো সুর- মনে নেই।

অন্বেষা : সে তো -

সত্য : কিন্তু এ গল্পের পিছনে সামান্য একটু সত্যিও যদি না থাকতো তাহলে এতো যুগ ধরে এ সিনেমাটা চল্‌তো কি?
[ হঠাৎই নেপথ্যে আস্তে থেকে জোরে হতে থাকে উল্লাস। মাইকে গান - স্লোগান - অনেক মানুষের চিৎকার ]

অন্বেষা : ঐ শুরু হয়ে গেল—

অনিতা : বিজয় উল্লাস।

অরিন্দম : মানে — ? [ এরপর আর কারো কথা শোনা যায় না। DJর আওয়াজ - চিৎকার - বোমার শব্দ, কাঁচ ভেঙ্গে পড়ার শব্দ, অরিন্দম দেখতে যায়-]

অনিতা : যেয়ো না- সরে এসো- । যখন তখন ওরা ঢিল ছুঁড়তে পারে।

অরিন্দম : অদ্ভূত তো?

অন্বেষা : ভোটে জেতার আনন্দ-।

অরিন্দম : কিন্তু এটা গণতন্ত্র নয়। This is not Democracy

সত্য : আর গণতন্ত্র - সবটাই এখন গণ- ধ— (ইট পড়ে - কাঁচ ভাঙে ) ওরে বাবা - (সত্য টেবিলের তলায় ঢোকে ) পুলিশ থেকে ডাক্তার- সব টেবিলের তলায় - আহা- গ-ণ-ত-ন্ত্র—।
[ হুড়মুড় করে দু'চারজন ঘরে ঢুকে। আমি দু'জন লিখছি— প্রয়োজনে তিন বা চারও হতে পারে ] [লোকগুলোর ভূতের মতো পোষাক - নাকি সুরে চমকাতে শুরু করে ]

১ : বঁলে ছিলাম না - ঘঁরে বসে থাঁক- ভোঁট দিঁতে যেঁতে হবে না।

২ : এঁবার ঠেঁলা বোঁঝ—

১ : এঁই বুঁড়িটা - এঁটাকে নিঁয়ে চঁল— এই বয়েসেও এতো আঁঠা?

২ : ধঁর শাঁলীকে ধঁর— [ অনিতাকে ধরতে যায় ]

অন্বেষা : না- না- -কি- করছেন - আপনারা - এ কি ধরনের ভদ্রতা ?
১ : ভঁদ্রোতা ? হ্যাঁ- হ্যাঁ- হ্যাঁ—
২ : চঁল-চঁল- শাঁলী—
অন্বেষা : না— [ বাধা দেয় ]
১ : দুঁটো কেই নিঁয়ে চঁল- আবির মেখে বিজয় মিছিলে হাঁটবে। চঁল্ চঁল্-
[ দুজনকে ধরে টানাটানি করতে থাকে ]
অরিন্দম : না- এ হতে পারে না - এটা democracy নয়— democracy মানে—
১ : এঁ মাঁলটা আঁবার কেঁ- বেঁ- ?
২ : ডেঁ মো ক্রে সি মাঁরাচ্ছে ?
১ : মাঁর শাঁলাকে—
২ : এঁই নে তোর ডে মো ক্রে সির - এঁক সিঁপ— [ অরিন্দম কে মারে - অরিন্দম পাল্টা মারে ]
১ : শাঁলো- ইতনে হিঁম্মত—
২ : ফাঁটিয়ে দেঁ- শাঁলা কেঁ— [ এলো পাথারি মারতে থাকে অরিন্দমকে - অন্বেষা- অনিতা বাধা দিতে থাকে]
সত্য : [ টেবিলের তলা থেকে ] সমাজ বিরোধী hundred percent সমাজ বিরোধী—
এক জন : বাড়ি নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে ? সারা পাড়াটা ছানবিন করতে হবে তো- চলে আয়- চম্‌কাতে হবে তো-
[ ভূতগুলো অরিন্দমকে ধাক্কা মারে ]
১ : সঁর শাঁলা—
২ : মুঁখে রঁক্ত তুঁলে মঁর—
[ অরিন্দম পড়ে যায়। ] ওরা নাচতে নাচতে চলে যায়। ক্রমশ উল্লাস দূরে চলে যেতে থাকে। সত্য এদিক ওদিক দেখে টেবিলের তলা থেকে বেড়িয়ে আসে। অনিতা - অন্বেষা অরিন্দমকে তুলে ধরার চেস্টা করে।
সত্য : এভাবে কতোদিন যে বাঁচবো। মার না খেলেও মারের ভয়েই তো স্ট্রোক হয়ে যাবে।
অন্বেষা : অরিন্দমদা—
অরিন্দম : [ একটু সময় নিয়ে ] বলেছিলাম এ আজাদী ঝুটা হ্যায়— বলেছিলাম পার্লামেন্ট শুয়োরের খোঁয়ার। সেখান থেকে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব - পার্টি ভাগ- ক্ষমতার ভাগ চাওয়ার লোভ- কোথায় এলাম- ? শূন্য।
অন্বেষা : অরিন্দম দা;
অরিন্দম : হ্যা- আমি অরিন্দম। সাত বছরে আটবার ট্রান্সফার- কলেজ থেকে

কলেজে শুধুমাত্র বামপন্থী বলে। শেষে তমলুক কলেজে ফেলুদের পাশ করাতে চাইনি বলে স্টাফরুমে ঢুকে মার - লাঠি- বাঁশ-লোহার রড। হস্পিটালে যাওয়া পর্যন্ত কিছুটা মনে ছিল তারপর সবটাই অন্ধকার। হস্পিটাল থেকে ছাড়া পেলাম। কে আমি- কি আমি- কেন আমি সবই অন্ধকার। হঠাৎই পুরোনো ডাইরির পাতায় চোখ পড়লো — অন্বেষার ঠিকানা- তাই নিজেকে খুঁজতে - নিজেকে ফিরে পেতে শুরু হলো আমার অন্বেষণ- অন্বেষার ঠিকানায়।

অনিতা : তোমার সব মনে পড়ছে- ?

অরিন্দম : সব---

সত্য : বলেছিলাম না—

অরিন্দম : এবার আমি উঠবো। আর বৃহন্নলা সেজে লুকিয়ে থাকা নয়— এবার সব্যসাচীকে গান্ডীব তুলে নেবার সময় এসে গেছে।

অন্বেষা : আমিও আছি তোমার সঙ্গে—

অনিতা : বয়েস হয়েছে ঠিক তবু আমাকে তুমি পাবে।

সত্য : আমারও তো ইচ্ছে করে - কিন্তু ;

অরিন্দম : অনেক - অনেক মানুষ চাই- অনেক দীপান্বিতাকে চাই- চারিদিকে এতো অন্ধকার- তার মাঝে আমরা আলো জ্বালাতে চাই। ভয়ংকর এক হতাশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম- আজ অন্বেষার ঘরে এসে বুঝলাম- আমি একা নই- এখনও অনেক মানুষ আছে যারা আমার মতো শুধুমাত্র আদর্শকে - মতাদর্শকে বাঁচিয়ে রাখতে - লাঞ্ছিত হয়েও - অত্যাচারিত হয়েও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি জানি- এ বড় অন্ধকার - এ দেশ যেন হিটলারের কন্সেনট্রেশান ক্যাম্প- তবু- এই ভূমিতেই আমাকে বীজ বপন করতে হবে। নতুন ফসলের - আশায় লড়াই চালাতে হবে। আমাকে তো শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু আমি জানি আমি শূন্য নই— আমি একা নই— হ্যা শূন্য থেকেই আমাদের শুরু করতে হবে শূন্য থেকেই...

[ নেপথ্য আবহে সামবেদের সুর। পর্দা]

লেখক : **শিবংকর চক্রবর্তী,** পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট নাটককার।

# প্রজাপতি

মূলকাহিনী - অ্যান্টন চেকভ

নাট্যরূপ - **মৈনাক সেনগুপ্ত**

**(১ম দৃশ্য)**

[ দীমভের বাড়ি, রাত। দীমভের বাড়ির কাজের মেয়ে আরিনা দরজা খোলে। ক্লান্ত, বিদ্ধস্ত দীমভ প্রবেশ করে। আরিনা তার হাত থেকে ব্যাগটি নিয়ে নেয়। ]

আরিনা : আজও এতো রাত হল স্যার?

দীমভ : রোজ আরো বেশি বেশি করে রুগী আসছে।

আরিনা : কিন্তু আপনি সুস্থ না থাকলে, এই মানুষগুলি তো আরোই চিকিৎসা পাবে না।

দীমভ : যতদিন সুস্থ আছি ততদিন তো এই মানুষগুলো কে চোখের সামনে মরতে দেখতে পারি না। সারা শহরে দ্রুত এই রোগ ছড়িয়ে পড়ছে।
(আরিনা কিছু বলতে যায় দীমভ খেয়াল করে না)

দীমভ : হাসপাতালে রোজ এত মানুষ আসছেন তাদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। কতজনকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে আর যাদের পয়সাকড়ি নেই তাদেরতো আরো খারাপ অবস্থা।

আরিনা : (স্বগতোক্তি) কুকুর বেড়ালের মতো মরবে। আপনি তো তাও চেস্টা করছেন, আপনার খাবার টেবিলে দিয়ে দিয়েছি স্যার। আমার আজ একটু তাড়া আছে।

দীমভ : হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যাও। অনেক রাত হল। সাবধানে যেও ।

(আরিনার প্রস্থান)

**(২য় দৃশ্য)**

[ বেশ কিছু অসুস্থ মানুষ, কান্নার আওয়াজ, গোলমাল । আরিনার প্রবেশ। আরিনাকে দেখে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা পথ আটকায়। ]

মহিলা : আমরা কি এভাবেই পড়ে পড়ে মরব?

আরিনা : আগে বাড়ি গিয়ে দেখে আসি, আমার ছেলে আর বর বেঁচে আছে কিনা!

পুরুষ : তুমি তো ডাক্তারের বাড়ি কাজ করো তাই না? বর আর ছেলের ভর্তির ব্যবস্থা করতে পারলে না?

আরিনা : হাসপাতালে আমাদের মতো গরীবদের কোনো জায়গা নেই। ডাক্তারবাবু দিনরাত এক করে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন। জানি না আমি বললে হয়তো আমার বর আর ছেলের ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারত, কিন্তু তোমরা?

মহিলা : মরব।

আরিনা : বড়লোকরা আলাদা আলাদা বাঁচে আর মরেও, আমরা বাঁচি একসাথে আর মরিও।

পুরুষ : বাঁচার তো আর কোনো রাস্তা নেই।
(আরিনার ঘরের ভেতর থেকে এক বালকের আর্ত চিৎকার শোনা যায়-‘মা’ মাগো)

আরিনা : (কোনো ক্রমে কান্না থামিয়ে) বাঁচার উপায় একটা আছে।
(ছুটে বেরিয়ে যায়)

**(৩য় দৃশ্য)**

[ হসপিটালের মেডিসিন স্টোর রুম, রাত, অন্ধকারের মধ্যে একটা টর্চ জ্বলে ওঠে, আরিনার মুখে পড়ে, আরিনার হাত থেকে ঔষধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, দীমভকে দেখা যায়]

দীমভ : আরিনা ! তুমি ! এখানে ?

আরিনা : (ভয় কাঁপতে কাঁপতে) ওষুধ নিতে স্যার।

দীমভ : (দরজা বন্ধ করে এসে) তুমি জান না ? ওষুধের কি সংকট চলছে। এর মধ্যে সামান্য কটা টাকার লোভে তুমি ওষুধ চুরি করতে এসেছ ? কত মানুষের জীবনমৃত্যু নির্ভর করছে এর ওপর ?

আরিনা : আমিও কিছু মানুষের জীবন বাঁচানোর চেষ্টাই করছিলাম।

দীমভ : কাদের ?

আরিনা : আমাদের গোটা বস্তিতে অসুখটা ছড়িয়ে পড়েছে, আমার বর আর ছেলেরও খুব খারাপ অবস্থা।

দীমভ : আমায় আগে বলনি কেন ?

আরিনা : আপনি কেমন অমানুষিক পরিশ্রম করছেন আমি তো নিজের চোখে দেখছি স্যার। আর আপনি বড়জোর আমার বর ও ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারতেন, বাকিরা তো সেই বেঘোরেই মরত !

দীমভ : ভাগ্যিস জরুরি তলব পেয়ে আমাকে আবার হাসপাতালে আসতে হল, অন্য কারোর চোখে পড়ে গেলে বিপদে পড়তে। তোমায় কোথাও কেউ আটকায়নি ?

আরিনা : স্যার রোজ আপনার খাবার নিয়ে আসি যে, তাই সবাই চিনে গেছে। আর আজ এই ওষুধের স্টোরের দরজাটাও কপাল গুণে খোলা পেয়ে গেলাম। কিন্তু.....

দীমভ : ওষুধগুলো তুলে নাও।
(আরিনা অবাক হয়ে তাকায়)

দীমভ : আমি ওগুলোর দাম দিয়ে দেব। আর কাল একবার যাব তোমাদের বস্তিতে।

### (৪র্থ দৃশ্য)

ওলগার বাড়ি

[ওলগা নিজের টেবিলে দুহাতে মাথা ধরে মুখ নীচু করে বসে আছে, ইগর প্রবেশ করে]

মিগুয়েভ : বাবার জন্য মন খারাপ?

ওলগা : বাবা এখন সুস্থ হওয়ার মুখে।

ইগর : তাহলে এমন সুন্দর সকালে মুখ কালো করে বসে রয়েছ?

ওলগা : আমরা তো নিজেদের শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি বলে দাবি করি, তাই না ইগর?

ইগর : ভুলতো কিছু করি না।

ওলগা : তাহলে জোসেফ এর মতো একজন নামী শিল্পী মরতে বসেছে অথচ আমরা চুপ করে বসে আছি!

ইগর : রোগটা তো গোটা শহরে ভয়ংকর ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আর চিকিৎসা এতোটাই ব্যয়বহুল যে গরিবদের পক্ষে হাসপাতালে যাওয়াই সম্ভব হচ্ছে না।

ওলগা : কিন্তু জোসেফ এই বয়সে মারা গেলে গোটা রাশিয়া গরিব হয়ে যাবে ইগর। ওর মাপের একজন শিল্পী রোজ রোজ জন্মায় না।

ইগর : কিন্তু কী-ই বা করতে পারি আমরা?

ওলগা : মস্কোর সমস্ত কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের কাছে গিয়ে জোসেফের চিকিৎসার জন্য টাকা জোগাড় করতে পারি।

ইগর : সে তো বেশ কয়েকদিনের ব্যাপার, জোসেফ কি এতদিন সময় দেবে?

ওলগা : তাহলে ও স্রেফ মরে যাবে, এত সম্ভাবনাময় একজন শিল্পী!

ইগর : দাঁড়াও! দাঁড়াও! কোনো একজন খ্যাপাটে ডাক্তার নাকি হাসপাতাল সামলে জোসেফদের পাশের বস্তিতে গিয়ে চিকিৎসা করছে।

ওসদা : কি নাম তার ?

ইগর : কি যেন... ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, দীমভ।

ওলগা : দীমভ, আরে ওই মানুষটাই তো অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমার বাবাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এল। আমি এখুনি ওর সাথে যোগাযোগ করছি।

### (৫ম দৃশ্য)

(ওলগা আর দীমভের বিয়ে হয়েছে বেশ ক'বছর আগে। চাকরির কারণে তারা এতদিন মস্কোর বাইরে ছিল, ফিরে এসেছে কদিন আগে, আজ সেই উপলক্ষ্যে পার্টি। উপস্থিত অভিনেতা ক্লিমভ, ওপেরা গায়ক মিখাইল, বেহালা বাদক পেটস্কি, গল্পকার মিগুয়েভ এবং চিত্রশিল্পী রিয়াবোভস্কি। ওলগা সাজগোজ করে অতিথি আপ্যায়ন করছে। মঞ্চটি প্রাথমিকভাবে নিরাভরণ। অভিনেতা ক্লিমভের দিকে এগিয়ে আসে ওলগা।)

ক্লিমভ : (উদাত্তভাবে কবিতা বলে।)
ভালবাসতাম, তাই জেনেছি এ অসহায় মনে
কত ঈর্ষা, কত লজ্জা- বৃথাই কেঁদেছি নির্জনে-
গড়ে গেছে ভালবাসা কি চারু, কি চিরন্তন সত্য অনুরাগ
পুনর্বার প্রেমাসক্ত হও;
এইশুধু চাই আমি বিধাতার কাছে।

ওলগা : পুস্কিন?

ক্লিমভ : হ্যাঁ, আলেকজ্যান্ডার পুস্কিন। এমনভাবে পুরুষকে আর কজনই বা বুঝেছেন?

ওলগা : অপূর্ব, থেমে গেলে কেন ক্লিমভ?

ক্লিমভ : যদি মাঝের এই চার-বছর তুমি মস্কোর বাইরে না থাকতে।

ওলগা : কী হত ক্লিমভ?

ক্লিমভ : আবৃত্তি বা অভিনয় তুমি আমাকে ছাপিয়ে যেতে পারতে ওলগা।

ওলগা : এমন কথা বলো না ক্লিমভ, তুমি আমার শিক্ষক। তোমার কাছে আমি অভিনয়, আবৃত্তির পাঠ নিচ্ছিলাম কেবল।

ক্লিমভ : প্রতিভা ওলগা প্রতিভা, কি সাংঘাতিক ক্ষমতা লুকিয়ে আছে তোমার মধ্যে সে সন্ধান তুমি যদি নিজে জানতে, তাহলে মস্কো ছেড়ে ওই এঁদো শহরটায় পড়ে থাকতে না।
(ওলগা কিছু বলতে যায়, সেই সময় ওলগাকে কেউ ডাকে। ওলগা সে দিকে যেতে চায়, ক্লিমভ একটি সুদৃশ্য লণ্ঠন ওলগার হাতে তুলে দেয়)

ক্লিমভ : সবাইকে আলোকিত রেখো ওলগা।

ওলগা : ধন্যবাদ তোমায় দেব না ক্লিমভ, আবার নতুন করে শুরু করতে চাই সবকিছু। সঙ্গে থেকো।
(লণ্ঠনটা' নিয়ে দেয়ালের এক কোণে টাঙিয়ে দেয়। ওপেরা গায়ক মিখাইল গান গাইতে গাইতে ওলগার দিকে এগিয়ে আসে।)

মিখাইল : (গেয়ে) সেতুদের নিচে নদীগুলি বয়ে যায়,
পথপাশে ফুল সব করে রোশনাই
মাঠেদের কানে কানে
নুইয়ে নুইয়ে পড়ে যেন বন।
কিছু নেই উঁচু নিচু
কালো সাদা সব একাকার
যেদিন দেখেছি অন্যের বাহুডোরে
প্রেয়সী আমার।

ওলগা : অসাধারণ ! এডিথ, এডিথ স্যোদেরগ্রান, আমার খুব প্রিয়।

মিখাইল : হতে পারত, সত্যিই অসাধারণ হয়ে উঠতে পারত যদি তুমি আর একটু সংযত হতে, নিজেকে আর একটু সময় দিতে। ওলগা সবার মধ্যে কিন্তু সম্ভাবনা থাকে না, তোমার মধ্যে ছিল প্রবলভাবেই ছিল।
(স্বরলিপি লেখা একটা মস্ত কাগজ ওলগার হাতে তুলে দেয়। ওলগা গুন গুন করে ওঠে)

মিখাইল : (ওলগার গুন গুন এর মধ্যেই) দীর্ঘ অবহেলার পড়েও চারাগাছটিতে এখনো সবুজ পাতা ধরে। আর অযত্ন করো না। ওকে জল -হাওয়া দিয়ে বড় করে তোলো।
(ওলগা গুনগুন করতে করতেই কাগজটি দেওয়ালের আর এককোণে ঝুলিয়ে রাখে, এমন সময় বেহালা বাদক পেটস্কি একটি বেহালা তুলে দেয় ওলগার হাতে, ওলগা বাজাতে শুরু করে, প্রথমে আড়ষ্ট তারপর স্বচ্ছন্দ ।)

পেটস্কি : তুমি বাজালেই তারগুলো প্রাণ পাবে ওলগা।

ওলগা : তোমায় ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, তোমার মতো খ্যাতিমান বেহালাবাদক যে আমার ডাকে এই সামান্য ঘরোয়া অনুষ্ঠানে হাজির হলে এতেই আমি ধন্য।
(এগিয়ে আসে লেখক মিগুয়েভ)

পেটস্কি : এস এস মিগুয়েভ নতুন কি লিখলে গল্প, উপন্যাস নাকি নাটক?

মিগুয়েভ : আপাতত একটা দীর্ঘ না লেখা কবিতার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি।
(একটা সুদৃশ্য কলম উপহার দেয়)

মিগুয়েভ : লেখাটি তুমিই শেষ করো ওলগা।
(ওলগা বেহালা আর কলমটি নিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখে)

মিগুয়েভ : তোমাকে কেমন লাগছে জান ওলগা? বসন্তের ফুলের ভারে নুইয়ে পরা যুবতী চেরি গাছটির মতো।
(চিত্রশিল্পী রিয়াবোভস্কি আসে, হাতে একটি ক্যানভাস)

রিয়াবোভস্কি : ওলগা।
চুরুট সহ (ওলগা প্রায় দৌড়ে আসে, রিয়াব ক্যানভাসটি ওলগার হাতে তুলে দেয়)

রিয়াবোভস্কি : শুধু তোমার জন্যই এঁকেছি ওলগা।

ওলগা : কি অনবদ্য আঁকার হাত তোমার রিয়াবোভস্কি!

রিয়াবোভস্কি : তুলি হাতে তুমিও খুব স্বচ্ছন্দ ওলগা। জাস্ট লাইক আ ফ্রি বার্ড।

পেটস্কি : সত্যি কথা বলতে কী শিল্পের প্রতি শাখায় ওলগার অনায়াস যাতায়াত।

রিয়াব : ছিল। ফিরে আসতে পারে, যদি চায়।
(ওলগা হাত বাড়ায়)

রিয়াব : (মৃদু হেসে) আছি, সঙ্গে আছি, থাকবো।
(ওলগা ছবিটি নিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়, একমনে সেটি দেখতে থাকে)
(মঞ্চের একদিকে ক্লিমভ, পেটস্কি, মিখাইল, মিগুয়েভ ও রিয়াবোভস্কি)

ক্লিমভ : লোকটির নাম কি যেন?

পেটস্কি : কোন লোকটি?

ক্লিমভ : ওই যে যাকে ওলগা বিয়ে করল।

মিখাইল : দীমভ। ওসিপ স্তেপানিচ দীমভ। ডাক্তার।
(রিয়াবোভস্কি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নেয়)

ক্লিমভ : সে তো নালচিক না কোন শহরে যেন ডাক্তারি করতো। এখানে তো পসার চাকরি কোনোটাই জোটেনি, হঠাৎ আবার এতো দিন পর মস্কো ফিরে এল যে!

মিখাইল : যা শুনেছি ওলগার নাকি নালচিক আর ভাল লাগছিল না।

পেটস্কি : ভালো লাগার কথাও নয়, সেখানে আছে টা কি! গান, বাজনা, অপেরা, স্টুডিও কিচ্ছু না, এতো দিন যে কি করে ওখানে ছিল!

রিয়াবোভস্কি : আ.. মানে প্রশ্নটা করা উচিৎ হবে কিনা জানি না- সেকি এখানে কোনো চাকরি পেয়েছে নাকি?

মিখাইল : একটা সাধারণ হাসপাতালে।

পেটস্কি : প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার পরিকল্পনা আছে নাকি?

মিখাইল : সে ঠিক বলতে পারি না। কারণ -

রিয়াবোভস্কি : কারণ প্রাইভেট প্র্যাকটিস জমানোর মতো দক্ষতা বা সময় কোনোটাই তার নেই। মিখাইল তুমি কি নিশ্চিত, দীমভ ওই একটা হাসপাতলের সঙ্গেই যুক্ত?

মিখাইল : না- দুটি বোধহয়।

মিগুয়েভ : দ্বিতীয়টিতে জ্যান্ত রুগী দেখার সুযোগ পায় না। শব ব্যবচ্ছেদ করে। শুনেছি নাকি ওই ছোটো শহরে বেচারা কাটার জন্য যথেষ্ট মৃতদেহ পাচ্ছিল না! লাশের সন্ধানে তদ্বির করে মস্কোয় ফিরে এসেছে বলতে পারো।

পেটোস্কি : দুটি হাসপাতালের সাথে যুক্ত যখন রোজগারপাতি মন্দ হয় না নিশ্চয়?

মিখাইল : শুনেছি বছরে শ পাঁচেক রুবেলের মতো।

ক্লিমভ : পাঁচশ মাত্র? সারা বছরে! রিয়াবোভস্কির শেষ ছবিটাইতো পাঁচশ রুবেলে বিক্রি করল।

রিয়াবোভস্কি : থাক। থাক না, সে সব কথা।

মিগুয়েভ : না না শিল্পী নয়, সাহিত্যিক নয়, অভিনেতা নয় এমনকি টাকা পয়সারও জোর নেই, (হাসে) । মস্কো শহরে এতদিন একটা চাকরি পর্যন্ত জোটাতে

পারে নি। ওলগার মতো প্রতিভাময়ী, তার মধ্যে কি দেখল কে জানে? যে তার জন্য মস্কো ছেড়ে সংস্কৃতি জগৎ ছেড়ে, নিজের চর্চা ছেড়ে দূর নালচিক শহরে গিয়ে পরেছিল এতোদিন!

পেটস্কি : প্রেম বন্ধু প্রেম। শিল্পী সত্ত্বা ভুলে গিয়ে মানুষ যে কখন কার জন্যে কী কারণে সব ত্যাগ করে অনিশ্চয়তায় ডুব দেয় কে জানে?
(ওলগার প্রবেশ)

ওলগা : শিল্পের সম্বন্ধে অগাধ শ্রদ্ধা, শিল্পীদের জন্যে দরদ। তোমরা বোধহয় ভুলে গেছো গোটা মস্কো যখন মহামারিতে আক্রান্ত, আমাদের শিল্পী বন্ধু জোসেফ মরতে বসেছিল তখন আমি এই মানুষটার কাছে গিয়ে জোসেফের প্রাণ ভিক্ষা করেছিলাম। এই মানুষটিকে চিনতাম তারও কিছুদিন আগে থেকে। আমার বাবা আর দীমভ একই হাসপাতালে চাকরি করত, বাবা যখন অসুখে পড়লেন দিনরাত এক করে বাবার সেবা করেছে। প্রথমে আমার সাথে সহজ হতে পারে নি, বাবাকে বাঁচাতে পারে নি ঠিকই, কিন্তু জোসেফকে মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনে। আমি ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ-ই একদিন দীমভ আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমিও বোধহয় মনে মনে এই দিনটার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। একরাশ চাঁদের আলোয় যেন ভেসে গেলাম। আর এখন দেখতেই পাচ্ছো আমি একজন সুখী বিবাহিত নারী। এমন এক মানুষের সঙ্গে আবদ্ধ যে কিনা নিজের বিপদের কথা মাথায় না রেখে একজন শিল্পীর জীবন ফিরিয়ে দেয়। (দীমভ প্রবেশ করে)

দীমভ : আমি মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করি, সেটা আমার পেশা। (একটু হেসে) নৈশভোজ প্রস্তুত।

ওলগা : এই বিষয়টিতে দীমভ অসাধারণ। যে কোনো অভিজাত হোটেলের অভিজ্ঞ কুক কে টেক্কা দিতে পারে। সত্যি বলতে কি এতো নিখুঁতভাবে টেবিল সাজায় আর পরিবেশন করে...

দীমভ : পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

**(৬ষ্ঠ দৃশ্য)**

দীমভের বাড়ি

[রাত। দুজন মুখোমুখি বসে। দুজনের হাতেই পানীয়র গ্লাস।]

দীমভ : তোমায় না দিতে পারছি সময় না অর্থ।

ওলগা : আমি বেশ আছি দীমভ। অস্বীকার করছি না পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। কিন্তু চেষ্টা করছি।

দীমভ : আর কীই বা করতে পার তুমি।

ওলগা : বরাবরই আমি একটু দেরিতে বিছানা ছাড়ি, প্রায় এগারোটা। তুমি তো কোন সকালে কাজে বেরিয়ে যাও।

দীমভ : তারপর সারাদিন?
(ওলগা উঠে যায়, বেহালাটা তুলে নিয়ে একটু বাজায়। ক্যানভাসে তুলির টান দেয় দু'লাইন কবিতা বলে দু-কলি গায়।)

ওলগা : এভাবেই দুপুর গড়িয়ে যায়। তারপর যাই দর্জির কাছে।

দীমভ : দর্জির কাছে?

ওলগা : হুম। পুরোনো পোশাক, ছিটকাপড়, জরি, চুমকি নিয়ে যাই। তুমি ভাবতে পারবে না দীমভ ওর হাতের কাজ। সেসব মামুলি জিনিস দিয়ে স্বপ্নের মতো পোশাক তৈরি করে দেয়।

দীমভ : সত্যি, বিয়ের পর থেকে কটাই বা নতুন পোশাক কিনে দিতে পেরেছি?

ওলগা : (সে যেন কথা শুনতে পায় না) তারপর কোনোদিন যদি কোনো শিল্পীর স্টুডিওতে, কখনও কোনো আর্ট গ্যালারিতে, কখনও বা অপেরা হাউস বা থিয়েটারে।

দীমভ : সে সব টিকিটের তো অনেক...

ওলগা : একটু চেষ্টা চরিত্র করলে ওলগা ইভানভানা মস্কোয় যে কোনো শো-য়ের এক আধটা টিকিট পেয়ে যায়। ওসব জায়গাতেই কত নতুন মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় জানো। শুধু আলাপ কেনো বলছি? বন্ধুত্ব। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষই বড় একঘেয়ে। খুব বেশিদিন তাদের সঙ্গে গল্প করে যাওয়া যায় না।
(ওলগা দীমভকে জড়িয়ে ধরে)

দীমভ : কখনও আমাকেও...
(ওলগা দীমভকে জড়িয়ে ধরে)

ওলগা : তুমি সত্যি খুব ভালো দীমভ। উদার, জ্ঞানী, কর্মঠ, কিন্তু -

দীমভ : কিন্তু?

ওলগা : তুমি গান ভালোবাসো না, কবিতা পছন্দ করো না, চিত্রশিল্পী-কে অবহেলা কর।

দীমভ : না না, অবহেলা করি না, ওসব আমি ঠিক বুঝি না। সারাজীবন তো এই চিকিৎসা বিজ্ঞান আর ওষুধ নিয়েই কাটাচ্ছি।

ওলগা : সেটা আমার আক্ষেপ দীমভ।

দীমভ : তোমার শিল্পী বন্ধুরাতো চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেননা। তাতে কি হয়েছে? তারা নিজেদের কাজ করছেন। অনেক মানুষকে আনন্দ দিচ্ছেন। মানুষ অর্থের বিনিময়ে সেই শিল্প উপভোগ করছে। আমি বুঝিনা মানে তোমাদের শিল্পচর্চাকে অবহেলা করছি- তা নয়।

ওলগা : তোমার হাতটা আমায় একটু দেবে?
(দীমভের নিজের হাতটা বাড়ায়। ওলগা সেই হাতটা চেপে ধরে। দীমভের মুখ

থেকে একটা অস্ফুট যন্ত্রণার আওয়াজ আসে।)

ওলগা : কী হল দীমভ?

দীমভ : তেমন কিছু না। আজ আমাকে চারটি শব ব্যবচ্ছেদ করতে হয়েছে। তা করতে গিয়ে দুটো আঙুল একটু কেটে গিয়েছে।
(ওলগা নিজের হাতটা সরিয়ে নেয়)

দীমভ : অমন মাঝে মাঝেই হয়। দু-তিন দিনে সেরে যাবে। মলম লাগাচ্ছি।

ওলগা : একটা কথা বলব দীমভ? রাখবে তো?

দীমভ : নিশ্চয়ই।

ওলগা : আমি একটা দারুণ সুযোগ পেয়েছি। মস্কোর বেশ কয়েকজন দামী শিল্পী এই বসন্তে পল্লী ভ্রমণে যাচ্ছে। সেখানে গান - বাজনা - অভিনয়- ছবি আঁকা সব হবে প্রকৃতির মাঝখানে। আমিও তাদের সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। এটা সৌভাগ্য নয়। বলো?

দীমভ : নিশ্চয়ই (একটু থেমে) গোটা বসন্ত কালটাই কী তুমি ....

ওলগা : এপ্রিল, মে আর জুন তিনটে মাত্র মাস। তারপর

দীমভ : তারপর আবার আমরা একসাথে।

ওলগা : জুলাই থেকে অক্টোবরের শুরু পর্যন্ত গোটা মস্কোর সেরা শিল্পীদের ভোলগা পরিক্রমা। আমি অস্থায়ী সদস্য হিসাবে ডাক পেয়েছি। তুমি ভাবতে পারছ দীমভ?
(বাইরে থেকে রিয়াবভোস্কির কণ্ঠ শোনা যায় 'ওলগা')

ওলগা : রিয়াবভোস্কি এসেছে। (চঞ্চল হয়ে ওঠে) আমি যে নতুন যে ছবিটা আঁকতে শুরু করেছি, সেই ব্যাপারে ও আমাকে খুব সাহায্য করছে। আসছি রিয়াবভোস্কি।
(ওলগা দরজা খুলতে যায়। থমকে গিয়ে নিজের বেশভূষা ঠিক করে নেয়)

**(৭ম দৃশ্য)**

পল্লী অঞ্চলের একটি কুটীর ক্লিমভ, মিগুয়েভ বসে গল্প করছে। দীমভ খুব কুণ্ঠিতভাবে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়, হাত ভরতি খাবারের প্যাকেট।

ক্লিমভ : কাল রাতে যে গল্পটা শোনালে মিগুয়েভ সেটা এক কথায় অনবদ্য। এক্কেবারে অন্যরকম।

মিগুয়েভ : আমি চাই এই গল্পটার একটা নাট্যরূপ দিতে। যার মূল চরিত্রে অভিনয় করবে এই সময়ের অন্যতম সম্ভাবনাময় প্রতিভাশালী অভিনেতা ক্লিমভ।
(দীমভ একবার গলা খাঁকারি দেয়)

ক্লিমভ : কে? কে ওখানে?

দীমভ : মানে আমি বলছিলাম, ওলগা ইভেনভনার সাথে কি একবার দেখা হতে পারে?

মিগুয়েভ: কিন্তু আপনি?

মিখাইল : ওনাকে চিনতে পারছো না মিগুয়েভ? উনি দীমভ, ওলগার স্বামী।

ক্লিমভ : ও

দীমভ : ওলগা?

ক্লিমভ : একটু অপেক্ষা করুন। ওলগা একটা কাজে বেরিয়েছে।

মিখাইল : হয়তো এখুনি ফিরে আসবে। একটু চা খাবেন।

দীমভ : না, ধন্যবাদ।

মিগুয়েভ: আমাদের সঙ্গে বসে এক কাপ চা খেতে নিশ্চয় আপনার আপত্তি নেই।

দীমভ : না, না, তা নয়। আসলে সেই সকালে বেরিয়েছি। অনেকটা পথ তো!

মিখাইল : খিদে পেয়েছে নিশ্চয়? দেখছি কি করা যায়।
(মিখাইল উঠতে যায়)

দীমভ : ব্যস্ত হবেন না, ওলগা ফিরুক।

মিগুয়েভ: একসাথে মধ্যাহ্ন ভোজ করবেন ? স্বাভাবিক! দীর্ঘ বিরহ।

দীমভ : (একটু অপ্রস্তুত হয়ে) তেমনটা নয়।
(দরজা দিয়ে ওলগা প্রবেশ করে। তার পিছনে বিয়াবভোস্কি। ওলগা ছুটে এসে দীমভকে জড়িয়ে ধরে। দীমভও তাকে জড়িয়ে ধরে। উপস্থিত বাকিদের দেখে নিজেকে গুটিয়ে নেয়।)

ওলগা : দীমভ, দীমভ, আমার যে কি ভালো লাগছে তোমাকে দেখে। কেন আসোনি এতোদিন?

দীমভ : অনেকটা পথ, কাজের চাপ।

ওলগা : জানো কাল সারারাত তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। সারাটা রাত। তুমি, একমাত্র তুমিই পারো আমাকে বাঁচাতে।

দীমভ : কি হয়েছে ওলগা? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?

ওলগা : (দীমভের কথা না শুনেই দীমভের টাইটা বাঁধতে বাঁধতে) কাল এখানে একটা বিয়ে আছে। আমাদের সবার নেমতন্ন। এই যে ছোট্ট স্টেশনটায় নামলে, তার টেলিগ্রাফ অপারেটর, চিকেল দেয়েভ, তারই বিয়ে, কালই। আমি কথা দিয়েছি যাব। কিন্তু ....

ওলগা : মি কি পরে গির্জায় যাব দীমভ? এখানে তো তেমন কিছুই আনিনি। পোশাক না, দস্তানা না, স্কার্ফ না। স্বয়ং ভাগ্যদেবী আজ তোমায় এখানে নিয়ে এসেছেন, আমাকে বাঁচাতে।
(দীমভ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে)
(ওলগা তার হাতব্যাগ থেকে একটা চাবি বের করে)
(এই নাও ওয়ারড্রোবের চাবি। দেখবে মাঝের তাকের বাঁদিকে একটা

গোলাপি পোষাক আছে। আর নিচের ডান দিকের ড্রয়ারে জরির ফুলগুলো রয়েছে। সেগুলো নিয়ে এসো প্লিজ। দেখো ওগুলো যেন কুঁচকে না যায়। একটু যত্ন করে এনো প্লিজ।

দীমভ : যদি খুঁজে না পাই?

ওলগা : কিনে এনো প্লিজ। আর হ্যাঁ এক জোড়া দস্তানাও কিনতে হবে।

দীমভ : ঠিক আছে। আমি কাল ফিরে গিয়ে সব পাঠিয়ে দেব।

ওলগা : সেকি!! এতোক্ষণ তুমি কি শুনলে!! কালই তো বিয়ে। কাল সকাল ১১টায়। আর এখান থেকে মস্কো যাওয়ার প্রথম ট্রেনই তো সকাল ৯টায়। তুমি যাবেই বা কখন? তোমাকে আজই যেতে হবে। এক্ষুণি। একটু পরেই ট্রেন। কালতো আবার কাজের দিন। তুমি নিজে আসতে না পারলেও কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেও চলবে।

দীমভ : বেশ। আমি আসছি।

ওলগা : এতটা পথ পেরিয়ে এলে, তোমাকে এভাবে ফেরৎ পাঠাতে আমার বড় খারাপ লাগছে। কেন যে বিয়েতে যাব কথা দিতে গেলাম।
(দীমভ বেরিয়ে যেতে যায়।)

পরিচারিকা: আপনি বোধহয় ছাতাটা ফেলে যাচ্ছেন।

দীমভ : ওটা আর আমার নয়। আমার আর ছাতা লাগে না, রোদ, ঝড়, বৃষ্টিতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

**(৮ম দৃশ্য)**

(ক্লিমভ, পেটস্কি, মিগুয়েভ সকলেই নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত এবং একটা উৎসবের পরিবেশ।)

হাতে একটি ক্যানভাস নিয়ে রিয়াব মঞ্চে আসে।

ওলগা : ওয়াও! রিয়াব, ফ্যান্টাস্টিক। এই ফুলগুলো এত জীবন্ত যে আমার ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে।

রিয়াব : এক মিনিট। (রিয়াব ক্যাভাসের মধ্যে থেকে ম্যাজিকের মতো ফুলটা ওলগার হাতে দেয়।) ওনলি ফর ইউ। ওলগা আনন্দে লাফিয়ে ওঠে, মঞ্চের আরেক দিকে আসে।
(মিগুয়েভ বিষয়টি লক্ষ্য করছিল।)

ওলগা : আমি তোমাকেও ভালোবাসি মিগুয়েভ। যেমন ভালোবাসি ক্লিমভকে, মিখাইলকে বা পেটস্কিকে।

মিগুয়েভ: আর রিয়াবভস্কিকে?

ওলগা : আমি জানিনা তাকে ভালোবাসা বলে কিনা।

মিগুয়েভ: তোমার চোখে সে আমাদের সবার থেকে আলাদা?

ওলগা : আমার কাছে জীবন মানে নতুন কবিতা, সুরের ঝংকার।

মিগুয়েভ: আর?

ওলগা : তুলির টানে নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো। রিয়াবভস্কি বিবর্ণ ওলগাকে রঙীন ক্যানভাসে তুলে আনে মিগুয়েভ। ওর ক্যানভাসে আমি রোজ নতুন করে বেঁচে উঠে।

মিগুয়েভ: তাহলে আমরা সবাই --------?

ওলগা : কেউ মিথ্যে নয় মিগুয়েভ। কেবল রিয়াবভস্কি একটু বেশি সত্যি। কিংবা সত্যের চেয়ে বেশি কিছু।
(ওলগা একটু দূরে চলে যায়)

ওলগা : আমি অমরত্ব চাই মিগুয়েভ।

মিগুয়েভ: (দূর থেকে ) কলম ধরো, বেহালা তুলে নাও হাতে, কণ্ঠে বেজে উঠুক সুর, রক্তের সাগরে ডুব দাও ওলগা। যেকোনো একটা পথ ধরে এগিয়ে যাও ওলগা। যে কোনো একটা পথ।
(রিয়াব তুলি হাতে ছবি আঁকে, ওলগা আসে।)

রিয়াব : আ ট্রু আর্টিস্ট ইজ্ নট্ ওয়ান হু ইজ্ ইন্স্পায়ার্ড বাট্ ওয়ান হু ইন্সপায়ার্স আদার্স। পেন্টিং করতে হলে আগে নিজেকে সমর্পণ করতে হয় তার কাছে, যাকে তুমি ক্যানভাসে আনতে চাও। তাকে চোখ বন্ধ করে অনুভব করতে হয়। তাকে ভালোবাসতে হয়। (একটি ক্যানভাসের ঢাকা পর্দা সরিয়ে দেয়, দেখা যায় ওলগার ছবি) তোমার কাছে রঙ আছে, তুলি আছে, একটা ডেস্টিনেশান ঠিক করো আর এগিয়ে যাও!
(রিয়াব আর ওলগা কাছাকাছি আসতে থাকে) (করেস্তলিয়ভ আসে)

করেস্তলিয়ভ: (একটি খাম এগিয়ে দেয়) এতে টাকা আছে। দীমভ পাঠিয়েছে। (ওলগা প্রশ্নের চোখে তাকায়)

করেস্ত : করেস্তলিয়ভ।
(আলো নেভে)

**( ৯ম দৃশ্য )**

(দীমভের বাড়ি, সন্ধে, দীমভের কাজের পোষাকেই একটা ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে, আরিনা এসে দীমভকে দেখে বিস্মিত হয়ে যায়।)

আরিনা : কফি দেব?
(দীমভ খেয়াল করে না)

আরিনা : স্যার কিছু খাবেন না?

দীমভ : না না, পরে।

আরিনা : ক্লান্ত হয়ে হসপিটাল থেকে ফিরলেন। এসেই.....

দীমভ : তোমার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে, খাবারটা ঢাকা দিয়ে রেখে বাড়ি চলে যাও।

আরিনা : সে জন্য বলিনি।

দীমভ : তোমার পরিবারের সবাই কেমন আছে?

আরিনা : এখন সবাই সুস্থ আছে স্যার। যদি সেই সময় আপনি না থাকতেন।

দীমভ : সবাইকে বাঁচাতে পারলাম কোথায় আরিনা?

আরিনা : আপনি তো স্যার চেষ্টা করেছিলেন আপনার সবটুকু দিয়ে। আমার পাশের পাড়ার জোসেফ, যে ছবিটবি আঁকত, তার তো একদমই শেষ অবস্থা ছিল, আপনি না থাকলে-----

দীমভ : তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আরিনা।

আরিনা : খাবার সব রাখা আছে স্যার।

দীমভ : খাবার খেয়ে নেব।

(আরিনা বেরিয়ে যায়, দীমভ আঁকতে থাকে, করস্তেলিওভ প্রবেশ করে, তার পায়ের শব্দ পেয়ে দীমভ ক্যানভাসটা ঢাকা দেয়। করস্তেলিওভ ঢাকাটা সরিয়ে দেখে দীমভ একটা হৃদয় আঁকার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সে একটা হৃদপিন্ডের ছবি এঁকে ফেলেছে। করস্তেলিওভ হাসতে থাকে।

করস্তেলিওভ: শিল্পী হয়ে ওঠার চেষ্টা করছ। ওটা তোমার কাজ নয়। তুমি রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানী। নিজের কাজে মন দাও।

দীমভ : ওলগাকে কেমন দেখলেন?

(করস্তেলিওভ গান ধরে, তার গানের একটি শব্দও বোঝা যায় না।)

### ( ১০ম দৃশ্য )

(ওলগা ক্যানভাসে তুলি বোলাচ্ছে, পিছন থেকে বিয়াবভস্কি এসে ওলগার হাত চেপে ধরে তুলি বোলায়, ওলগা লজ্জায় হাত ছাড়িয়ে নেয়।)

রিয়াব : কী হল?

ওলগা : শীত। খুব শীত করছে।

(রিয়াব নিজের কোটটা খুলে ওলগাকে পরিয়ে দেয়।)

রিয়াব : ওম্যান ইজ্ দা বেস্ট ক্রিয়েশান ওফ নেচার। আমি এটা আজ অনুভব করছি। তোমার দুচোখ আমায় পাগল করে দিয়েছে। তোমার দুচোখে আমি হারিয়ে যাচ্ছি ওলগা। (ক্যানভাসের কাছে যায়) আমার তুলি আমার ক্যানভাস, আমার রঙ সব মিথ্যে ওলগা, শুধু তুমি সত্যি। আমার নিজেকে তোমার ক্রীতদাস বলে মনে হচ্ছে।

ওলগা : না না। এমন কথা বলো না রিয়াব। ইউ আর এন আর্টিস্ট। তুমি যখন তুলি

হাতে ক্যানভাসের সামনে দাঁড়াও তখন তোমাকে ঈশ্বর বলে মনে হয়। কিন্তু-

রিয়াব : কিন্তু ?

ওলগা : দীমভ।

রিয়াব : (রেগে) কে দীমভ ? তার সঙ্গে কি সম্পর্ক ?
(নিজেকে সামলে নিয়ে ) তুমি তোমার অতীতের চোখে একটা নিশ্চিদ্র কালো পর্দা টেনে দাও ওলগা। আমাকে একটি মুহূর্ত উপহার দাও।

**।। বিরতি ।।**

**( ১১তম দৃশ্য )**

দীমভের বাড়ি

[রিয়াব একটি ক্যানভাসের সামনে তুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে। বার বার আঁচড় কাটছে। কিছুতেই তার মনের মতো হচ্ছে না। সে বিরক্ত হয়ে তুলিটা ছুঁড়ে ফেলে।]

রিয়াব : পারছি না। পারছি না, আমি বোধহয় ফুরিয়ে গেছি। আমার ভেতরের শিল্পীটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কেবল একজন নারীর জন্য .....
(মঞ্চের অন্য প্রান্তে ওলগা, তার হাতে খোলা চিঠি)

ওলগা : (চিঠি পড়তে পড়তে) " কবে আসবে ওলগা ? অনেকদিন হয়ে গেল, ফাঁকা বাড়িতে একা একা আমার আর ভালো লাগে না। আমি জানি তুমিও খুব অসুবিধেয় আছো। বন্ধুদের কাছে ধার করে তোমায় চলতে হচ্ছে। যেমন পঁচাত্তর রুবেল পাঠাই তার সঙ্গে আরও একশ রুবেল পাঠালাম। সবার ধার গুলো শোধ করে দিও। দরকার হলেই জানিও, যেমন করে হোক পাঠাব।"
(চিঠিটা অবহেলা ভরে রেখে দেয়।)

ওলগা : এতদিন হয়ে গেল, একজন সুস্থ, স্বাভাবিক মানুষ তো এই সময় স্ত্রীর বিরহে দু-কলম কবিতা লেখে। দীমভের কাছে আমি যেন একটা অভ্যেস। নিছক অভ্যেস।
(একটু চুপ করে থাকে)

ওলগা : অনেকদিন আমি একটা গোটা কবিতা লিখিনি। একটা ছবি সম্পূর্ণ করতে পারিনি। কোনো নতুন গান তুলে নিতে পারিনি গলায়। এখুনি ইচ্ছে করছে স্টীমারটাকে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে নেমে পড়তে। মাটির গন্ধ মাখা মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। হয়ত তারাই আমায় আমার নতুন সৃষ্টির সন্ধান দেবে। এই মেঘের চাদরে ঢাকা নিঃশব্দ প্রকৃতির ছবি তুলে আনতে পারব আমাদের তুলিতে। রিয়াব, রিয়াবভস্কি...
(ওলগা হাঁটতে হাঁটতে মঞ্চের অন্য প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায় রিয়াবের কাছে। রিয়াবভস্কি তখন অসহায় ভাবে তার ক্যানভাসের মুখোমুখি। দাঁড়িয়ে)

রিয়াব : হে ভগবান, কখন সূর্য উঠবে? আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? সূর্য না উঠলে আমি কেমন করে রোদ ধোওয়া প্রকৃতির ছবি আঁকব?

ওলগা : মেঘে ঢাকা আকাশের একটা অসমাপ্ত ছবি আছে না তোমার কাছে? এমনদিনে তোমার সেই ছবিটিতে তুলির শেষ টান দিতে ইচ্ছে করছে না?

রিয়াব : তোমার কি মনে হয়? আমার কোন কাজটা কখন করা উচিত আমি সেটা জানি না?

ওলগা : তুমি এমনভাবে কথা বলছ কেন? আমার সঙ্গে আগে তো তুমি এমন ব্যবহার করোনি।

রিয়াব : এখন যে ব্যবহারটা করছি, এই মুহূর্তে সেটাই সত্যি।
(ওলগা একটু সরে যায়, দু হাতে মুখচাপা দিয়ে কাঁদতে থাকে।)

রিয়াব : কান্নাকাটি করার হাজারটা কারণ আমারও আছে, আমি তো কাঁদছি না।

ওলগা : তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণটা হল আমি তোমার কাছে একটা ক্লান্তিকর অভ্যেস এ পরিণত হয়েছি। তাই তো?
(রিয়াব মুখ ঘুরিয়ে নে।)

ওলগা : আমাদের সম্পর্কটা তোমার কাছে একটা লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুমি ভয় পাচ্ছ, আমাদের শিল্পী বন্ধুরা সব জেনে ফেলবে। এতদিনে জানতে কি কারও কিছু বাকি আছে?

রিয়াব : দোহাই ওলগা, আমাকে আর জ্বালিও না, আমাকে কাজটা শেষ করতে দাও।

ওলগা : আমি চলে যাচ্ছি। তবে তার আগে একবার বলো, তুমি আমায় ভালোবাসো। আমাকে একা থাকতে দাও ওলগা। নইলে আমি পাগল হয়ে যাব। এই ভলগায় ঝাঁপিয়ে পড়ব।

ওলগা : তার চেয়ে একটা কাজ করো না, আমাকেই ধাক্কা দিয়ে ফেলে দাও নদীর জলে। নদী আমাকে আশ্রয় দিক। তুমিও নিশ্চিন্ত হও।
(রিয়াব কোনো কথা না বলে তার ফেলে দেওয়া তুলিটা তুলে নেয়। ওলগা রেলিংয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। কোনোক্রমে কান্নাটা সামলায়। তারপর রিয়াবের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

ওলগা : কিছুদিন আমাদের আলাদা থাকা দরকার। বুঝতে পারছি তোমার হয়ত বড্ড একঘেয়ে লাগছে আমাকে। (একটু থেমে) হয়ত আমারও। আমি আজই এখান থেকে চলে যাব।

রিয়াব : (ব্যঙ্গ করে) হাওয়ায় উড়ে?

ওলগা : আজ বৃহস্পতিবার তো? বিকেলের দিকে মস্কো যাবার একটা স্টীমার আছে।

রিয়াব : বেশ তুমি যখন যেতেই চাইছ, আমি আটকাব না। আগামী ২৩ তারিখের

পরে আমাদের দেখা হবে।

ওলগা : আমার রঙ আর তুলি এখানেই রেখে গেলাম, তোমার জন্য। অকারণ আর সময় নষ্ট কোরো না। গভীর নীল রঙ দিয়ে একটা ছবি আঁকো। (একটু থেমে) আমায় মনে রেখো। (ওলগা বেরিয়ে যায়। রিয়াব পাশে রাখা একটা বন্দুক তুলে নেয়, গুলি করে একটা পাখি মারে।

**( ১২তম দৃশ্য )**

দীমভের বাড়ি। দীমভ খেতে বসেছে, একটা গোটা মুরগি রোস্ট করা। ওলগা বাড়িতে ঢোকে। দীমভের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে।

**( ত্রয়োদশ দৃশ্য )**

রিয়াবভস্কির স্টুডিও। একজন মহিলার সঙ্গো রিয়াব আলিঙ্গনরত। তখনি বাইরে পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। মহিলা রিয়াবের ইশারায় ক্যানভাসের পিছনে লুকায়। ওলগা ঢোকে, হাতে একটা আঁকা।

রিয়াব : আরে ওলগা, এসো এসো বেশ কিছুদিন দেখা হয়নি তোমার সাথে। বল কেমন আছ? (রিয়াবের অপ্রস্তুত অবস্থার কারণে ওলগা এদিক ওদিক তাকায় আর পা দুটো দেখতে পায়)। বল ওলগা কি মনে করে?

ওলগা : একটা স্কেচ এঁকেছিলাম তোমায় দেখাব বলে নিয়ে এসেছি।

রিয়াব : স্কেচ বেশ দেখি। (ছবিটা দেখ)। ছবিটা দেখেতো এর বিষয়বস্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

ওলগা : এটার নাম রেখেছি প্রকৃতির মৃত্যু।

রিয়াব : বড় ক্লান্ত লাগছে। কাজটা ভালোই মানে মন্দ নয়। আচ্ছা ওলগা তোমার বিরক্ত লাগে না । এই যে আজ একটা স্কেচ গত বছরেও এই এক স্কেচ, হয়তো আগামী মাসেও ----। আসলে তুমি বোধহয় তুলির জগতের মানুষ না। তুমি বেহালা বাজানোর কথা ভাবতে পার কিংবা গান অথবা অভিনয়। এককাপ চা দিতে বলি?

ওলগা : আমি আর্টিস্ট নই? ছবি আঁকতে জানিনা? তুমিও তো বছরের পর বছর একই ছবি একে যাচ্ছ। মাঝে তোমার ক্যানভাস জীবনের ছোঁয়া পেয়েছিলো, সে কেবল আমারই জন্য। আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থেকো রিয়াবভস্কি । তোমার ক্যানভাসে আজ ডাইনিদের কালো ছায়া এসে পড়েছে। তুমি ফুরিয়ে যাবে রিয়াবভস্কি। দ্রুত।

**( চতুর্দশ দৃশ্য )**

দীমভের বাড়ি। পুরানো সাজসজ্জা অনেকগুলিই আর নেই। দীমভ ও কস্তেলিয়ভ মুখোমুখি

বসে। ওলগা বাইরে থেকে আসে দীমভকে কিছু বলতে যায়। দীমভ সেটা খেয়াল করে বলে ওঠে-

দীমভ : কী যেন বলছিলে করোস্তেলিয়ভ? তোমার সেই রুগীটির কথা...

করেস্তেলিয়ভ: জটিলতা কমেছে খানিকটা। ভালোর দিকেই বলা যায়। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সময় লাগবে।

(ওলগা দাঁড়িয়ে থাকে, কিছু বলতে চায়)

দীমভ : রোগটা কী বুঝছ?

করো : তুমি কি কাল একবার যাবে?

দীমভ : কাল? না কাল কাজ আছে।

করো : তুমি গেলে একটু ভরসা পাই।

দীমভ : ও ঠিক আছে যাব। একটি গান কর না করোস্তেলিয়ভ।

করো : এই ভরা পেটে!

দীমভ : আমি শিল্পী নই, কিন্তু জানি যে সৃষ্টির কোন সময় হয় না। দুকূল ছাপিয়ে যাওয়া একটা দুঃখের গান গাও। এই বিবর্ণ সন্ধ্যেটায় একটু রং এনে দাও। দুঃখের গান বড় মধুর হয়।

(করোস্তেলিয়ভ গান ধরে)

ওলগা নিজের পোশাক খুলতে খুলতে আয়নার দিকে তাকিয়ে বলে

ওলগা : আজ তোমার স্টুডিওতে গিয়েছিলাম। আজও তোমার দেখা পেলাম না। তোমার সদ্য আঁকা ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আজ পর্যন্ত এমন ছবি তুমি একটাও আঁকোনি। কেন পেরেছো জান? আমার জন্য। অথচ আমাকেই তুমি অস্বীকার করছ?

একটা চিরকুট রেখে এসেছি তোমার টেবিলে। কালও রেখে এসেছি। পরশুও। জবাব দাও নি। হয়তো আজকেও উত্তরহীন হয়ে শেষে মারা যাবে চিঠিটা।

(একটা বোতল থেকে মদ ঢালে গলায় ঢালে)

ঐ যে, ঐ লোকটা দীমভ, উদারতা দেখায়। ভাবে আমি কিছু বুঝি না। আমায় এড়িয়ে চলে। রিয়াবভস্কি তোমার জন্য আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি।

(ওলগার গলা উঠতে থাকে)

(দীমভ দ্রুত আসে বলে।)

দীমভ : দোহাই ওলগা, একটু আস্তে।

ওলগা : কেন? আমার বাড়ীতে আমাকে গলা নামিয়ে কথা বলতে হবে কেন, তোমার বন্ধু ঐ আধবুড়ো করেস্তেলিয়ভের জন্য।

দীমভ : আমি সেকথা বলিনি। তোমার আবেগটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে অনুরোধ করছি।

ওলগা : কেন, কেন আমি মুখ বুজে সব সহ্য করবো? (কাঁদতে থাকে)

দীমভ : কেঁদো না ওলগা। কিছু যন্ত্রণা নিজের বুকের পাঁজরে পুষে রাখতে হয়। বাইরের লোক জানবে- কিন্তু বুঝবে না।। যা ঘটেছে তা বদলে ফেলাও যাবে না।

ওলগা : আবার তুমি তোমার উদারতা দেখাতে এসেছো? (দীমভ ঘর ছেড়ে বের হতে যায়)
তোমার কী আমাকে কিছুই বলার থাকে না?

দীমভ : আজই একটা কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আজ সকালে আমার থিসিস পেপারটা সাবমিট করে এলাম।

ওলগা : ও আমি থিয়েটারে যাচ্ছি। ফিরতে রাত হবে।

দীমভ : ( দীমভ দ্রুত নিজের থিসিস পেপারটা নিয়ে এসে ওলগাকে দেখাতে যায়।)

**( পঞ্চদশ দৃশ্য )**

ওলগা একলা

ওলগা : ভ্যালেন্তিনা, রিয়াব নিশ্চয় তোমার কাছে এসেছে? কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ওকে? বের করে দাও। তুমি জানো, ও আর আঁকতে পারছে না। ওর তুলি বোবা হয়ে গেছে। যার রঙের জাদুতে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যেত মস্কোর যাবতীয় সুধীজন। তাকে তুমি পোষা বেড়াল বানিয়ে দিয়েছ! হ্যাঁ, আমি এর আগেও অনেকের কাছে গেছি। খুঁজে বেড়িয়েছি আমার রিয়াবকে। না না নিজের জন্য নয়, আগামী পৃথিবীর দিব্যি। ভবিষ্যতের প্রতিটি ম্যাপেল গাছের জন্য রিয়াবভস্কির তুলির ডগায় রক্তের প্লাবন দরকার। হা হা হা আমি পাগল হয়ে গেছি! আমাকে পাগল সাব্যস্ত করতে পারলে তো রিয়াবভস্কিকে নিজের করে নিতে পার। ভলগার দোহাই, রিয়াবভস্কি গোটা রাশিয়ার, ভবিষ্যত দুনিয়ার। ওকে ছেড়ে দাও ভ্যালেন্তিনা।

**(ষষ্ঠদশ দৃশ্য)**

(দীমভের ঘরের সামনে করস্তেলিওভ উদ্বিগ্ন হয়ে পায়চারি করছে। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ওলগা এসে সামনে দাঁড়ায়। করস্তেলিওভ অত্যন্ত বিরক্ত হয়।)

করস্তেলিওভ: রাতে ঘুম হয়নি?
(ওলগা কী বলে বাঝা যায় না। সে করস্তেলিওভকে পাশ কাটিয়ে দীমভের ঘরের দিকে যাওয়ার চেস্টা করে। করস্তেলিওভ হাত বাড়িয়ে আটকায়।

করস্তেলিওভ: দুঃখিত।

(ওলগা অবাক হয়ে তাকায়)

করস্তে : আপনাকে দীমভের ঘরে যেতে দিতে পারি না।

(ওলগা কিছু বলতে যায়)

করস্তে : আপনার ছোঁয়া লাগতে পারে এবং ...

ওলগা : এবং?

করস্তে : মাঝরাত থেকে দেখছি ওর বিকার হয়েছে। কী বলতে কী বলে ফেলবে...

ওলগা : ওর কী সত্যিই ডিপথেরিয়া হয়েছে?

করস্তে : ওর জেল হওয়া উচিৎ ছিল।

ওলগা : জেল?

করস্তে : যারা বিপদকে ডেকে আনে তাদের জেল হওয়াই উচিৎ। আপনি জানেন দীমভ কী করে অসুখ বাঁধিয়েছে?

(ওলগা মাথা নেড়ে 'না' বলে)

করস্তে : একটা বাচ্চা ছেলে, ফুলের মত ফুটফুটে একটা শিশু ডিপথেরিয়া নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। মঙ্গালবার ও নল দিয়ে বাচ্চাটার গলা থেকে ডিপথেরিয়া ঝিল্লী টেনে বের করেছিল।

(ওলগা কিছু যেন বলতে যায়, করস্তেলিওভ খুব রুক্ষভাবে তাকে থামিয়ে দেয়।)

করস্তে : ওকে আমি কারুর থেকে কম চিনি না। ডাক্তার হিসেবে ওর কর্তব্যবোধ আমাদের সবার কাছে উদাহরণ হওয়া উচিৎ তাও জানি। কিন্তু এটা তো চরম বোকামি। ইদানীং দেখতাম ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা কোনো সাধারণ অসুখ-বিসুখ নিয়ে ভর্তি হলেও দীমভ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠত। বাচ্চারা ভাল থাকুক সে তো সবাই চায়। কিন্তু তাই বলে এইরকম পাগলামো।

(দীমভের বন্ধু আর একজন ডাক্তার আসে।)

ডাক্তার : করস্তেলিওভ তুমি কাল সারারাত দীমভের দেখাশোনা করেছো, বাড়ী যাও। বিশ্রাম নাও। আমি রয়েছি।

করস্তে : তুমি জানো ডক্টর আমি এখন বাড়ী গেলেও বিশ্রাম নিতে পারব না। মানে তুমি বিশ্রাম বলতে যা বোঝাতে চাইছ।

ডাক্তার : বেশ।

(ডাক্তার ভেতরে চলে যায়। আরিনা চা নিয়ে অসে, করস্তেলিভ কাপটা তুলে নেয়।)

আরিনা : স্যার কাল সারারাত আপনি, অসংখ্যবার চা খেয়েছেন। কিচ্ছু মুখে তোলেন

নি, একটু স্যান্ডউইচ এনে দিই ?

করস্তেলিওভ : না।

আরিনা : স্যুপ ?

করস্তেলিওভ: না বললাম তো।

(আরিনা মাথা নিচু করে ভেতরে চলে যায়। ওলগা ধপ করে সোফার ওপর বসে পড়ে বিড় বিড় করে কী যেন বলে।)

করস্তেলিওভ : আপনি কী আমাকে কিছু বলছেন ?

ওলগা : ঈশ্বরকে বলছি, আমার পাপের শাস্তি ঐ ভালো মানুষটাকে কেন দিচ্ছেন ?

(ওলগা দৌড়ে দীমভের ঘরের দিকে যেতে চায়)

করস্তেলিওভ: (পথ আটকায়) Oh sorry to make you sorry। আপনাকে তো একবার মানা করেছি।

ওলগা : আপনি তো প্রায় সবটাই জানেন করস্তেলিওভ। আমাকে একবার যেতে দিন। দীমভ ওর কষ্টের কথা আমাকে বলে যদি হালকা হতে পারে।

করস্তেলিওভ : বললাম যে ও বিকারের মধ্যে আছে।

ওলগা : বিকারের মধ্যে ভুলভাল বললে আমি শুনব, সহ্য করব।

করস্তেলিওভ: ও একা বিকারের মধ্যে নেই। আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন মানুষ একবার বিকারের মধ্যে চলে গেলে চট্ করে ফিরে আসে না।

(ওলগা দৌড়ে গিয়ে একটা তোয়ালে নিয়ে আসে, সেটা ভেজায়। সেই ভিজে তোয়ালে নিয়ে ঘষে ঘষে দু-হাত থেকে যেন ময়লা তোলার চেষ্টা করতে থাকে। খানিক পরে বিরক্ত হয়ে তোয়ালে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।)

### ( সপ্তদশ দৃশ্য )

(করস্তেলিওভ সোফায় বসেই নাক ডাকছে আধশোয়া হয়ে।)

ওলগা : (প্রার্থনার ভঙ্গিতে ) ভোলগা মিথ্যে, জ্যোৎস্না মিথ্যে, নদীর ঢেউ, রাতের সুর, রঙীন ক্যানভাস সব সব মিথ্যে। শুধু এই বাড়ির চার দেওয়াল সত্য। ঐ ঘরে যে মানুষটা কষ্ট পাচ্ছে সে সুস্থ হয়ে গেলে আমি আমার সবটুকু দিয়ে তাকে ভালবাসব। বোঝার চেষ্টা করব।

(আরিনা ঘরে ঢোকে। তার পায়ের শব্দে ওলগা চমকে যায়। আরিনা টেবিল থেকে খাবারগুলো তুলে নেয়।)

আরিনা : আপনি তো কিছুই খাননি।

ওলগা : (করস্তেলিওভ-কে দেখিয়ে) ওই লোকটাও কিছু খায়নি। কেবল ঢক ঢক করে মদ গিলে নিয়েছে।

(এদের কথাবার্তার মধ্যে করস্তেলিওভ উঠে যায়। ভেতরে ঢোকে। একটু পরেই বেরিয়ে আসে। একটা চুরুট ধরায়। )

ওলগা : কেমন আছে দীমভ?

করস্তে : ডিপথেরিয়া নাকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। হার্টের ওপরেও চাপ পড়ছে। খুব খারাপ মনে হচ্ছে । খুব।

ওলগা : শ্রেক-কে ডেকে পাঠানো হচ্ছে না কেন?

করস্তে : শ্রেক এসেছিল একটু আগেই। সেই দেখে গেছে। তাছাড়া শ্রেক কে? শ্রেক বলে কিছু নেই, কিচ্ছু না। শুধু ওর নাম শ্রেক আর আমার করস্তেলিওভ, ব্যস। রাত হল, যান একটু বিশ্রাম করুন।

**( অষ্টাদশ দৃশ্য )**

(দীমভ যেন নদীতে ডুবে যাচ্ছে। তার দু হাত ধরে শ্রেক আর করস্তেলিওভ তাকে পাড়ে আনার চেষ্টা করছেন। আর সেই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে ওলগা আর তার বন্ধুরা কেউ দুর্বোধ্য ভাষায় গান করছে, কেউ আবৃত্তি করছে, কেউ বিকট সুরে বেহালা বাজাচ্ছে আর রিয়াবভস্কি একটা ছোপ ছোপ ইতস্তত রঙে রাঙানো ক্যানভাস দু হাতে তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দূর থেকে যেন ওলগার গলা ভেসে আসে খুব মৃদু-“শ্রেক, করস্তেলিওভ..... শ্রেক, করস্তেলিওভ...।” হঠাৎ প্রবল জোরে সে দীমভ বলে চিৎকার করে ওঠে। ছবিটা ভেঙে যায়। ওলগা বিছানায় উঠে বসে। আরিনা ছুটে আসে। ওলগা জল চায়। আরিনা দেয়।)

ওলগা : কটা বাজে?

আরিনা : প্রায় তিনটে।

(করস্তেলিওভ প্রবেশ করে)

ওলগা : দীমভ?

করস্তে : কেমন আছে?

(ওলগা মাথা নেড়ে “হ্যাঁ” বলে)

করস্তে : আপনাকে খবর দিতে এলাম ও মারা যাচ্ছে।

(এই প্রথম করস্তেলিওভ কেঁদে ফেলে, পরে জামার হাতায় চোখ মোছে। করস্তেলিওভের কথা শুনে ওলগা বোধহয় বুঝতে পারেনি, কান্না দেখে উপলব্ধি করতে পারে। ক্রুশচিহ্ন আঁকতে থাকে- যেন যন্ত্রের মত।)

করস্তে : (কান্না চেপে) মারা যাচ্ছে কারণ দীমভ বোধহয় আর বাঁচতে চায়নি। জীবনটাকে স্রেফ আহুতি দিয়ে গেল। একবারও দীমভ ভাবল না যে, ও চলে গেলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। আমাদের সবার

থেকে ও অনেক এগিয়ে ছিল। সত্যি বলতে কী গোটা রাশিয়ায় এরকম প্রতিভা বলতে হাতে গোনা দু-একজন। আর সেইরকম বড় একটা মন, রুগীদের নিজের আত্মীয় ছাড়া কিছু মনে করত না। বিজ্ঞানের সেবা করতে করতে বিজ্ঞানের জন্য প্রাণ দিয়ে গেল। বিজ্ঞানের জন্য? দিনরাত গাধার খাটুনি খেটেছে, কেউ ওকে মায়া করেনি। ওর কথা ভাবেনি। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করে রাত জেগে অনুবাদের কাজ করত। কেন জানেন? আপনার এই হাবিজাবি পোশাকের খরচ জোগানোর জন্য। (ওলগা যে বিছানায় বসেছিল পাথরের মত, সেখান থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। করস্তেলিওভ একটানে সেই বিছানার চাদর তুলে ছুড়ে ফেলে। ভেতর থেকে সেই ডাক্তার বেরিয়ে আসে। চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে। ওলগা সেই পড়ে থাকা চাদরটিকে দীমভ ভেবে বুকে জড়িয়ে আদর করতে থাকে। আরিনা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। করস্তেলিওভ ডাক্তারকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয়।)

করস্তে : গির্জায় গিয়ে খবর নাও ভিখারিণীরা কোথায় থাকে? ওরাই মৃতদেহ স্নান করিয়ে সৎকারের যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবে।

(করস্তেলিওভ বেরিয়ে যায়।)

লেখক ঃ **মৈনাক সেনগুপ্ত,** কলকাতার বিশিষ্ট নাটককার।

স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

# এক অনন্তের খোঁজ

**সঞ্জয় কর**

**চরিত্র লিপি**

মন্দিরা : ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া একটি মেয়ে, বয়স ২২। শুভ : ওই বন্ধু। তপা : ওই বান্ধবী। শ্বেতা : ওই বান্ধবী। বিপ্র : ওই বন্ধু। দীপ : ওই বন্ধু। মা : মন্দিরার মা, বয়স ৪৮। মামা: বয়স ৫৫। প্রত্যুষ : মন্দিরাদের পুরণো বন্ধু। স্যানবর্ন : আমেরিকান মহিলা, বয়স ৫০। রাইট : অধ্যাপক, হাভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। লোক-১ : গ্যাং-এর মস্তান, বয়স-৩৫। লোক-২ : গ্যাং-এর মস্তান, বয়স-৩০। বিবেকানন্দ : বয়স ৩৫। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী : বয়স ৮০। কোরাস : চরিত্রাভিনেতা অভিনেত্রীরাই করবে।

(পর্দা উঠলে ধীরে ধীরে আলোকিত মঞ্চে কোরাসের গান ও সঙ্গে কোরিওগ্রাফি)

কোরাস :
চলো যাই চলো যাই সমুদ্র সন্ধানে
করি এক অনন্তের খোঁজ।।
সূর্য গেলো কবে অস্তাচলে
দিগন্ত ভাসে তবু অস্তরাগে,
সমুদ্র গর্ভেই শতাব্দী জোড়া
আলোক উজ্জ্বল এক জগৎ জাগে।
চলো যাই চলো যাই ।।
কেন বন্দি হয়ে আছ অন্ধকারে
চোখ মেলে দেখো ওই জগৎ হাসে,
গহন গহীনে অবগাহন কর
অমৃত পাত্র তব পূর্ণ কর,
অন্তরে বাজে কোন মধুর তান
সে তানে ভরিয়া লও জীবনের গান।
চলো যাই চলো যাই।।

অভিনেতা ১ : এক অনন্ত প্রেরণার উৎসের সন্ধানে চলেছি আমরা।

অভিনেতা ২ : সেই প্রেরণার নাম বিবেকানন্দ। তিনি বিবিদিষানন্দ, তিনি বীরেশ্বর, নরেন্দ্রনাথ, তিনি বিলে

অভিনেত্রী ১ : এক আশ্চর্য জীবনের নাম বিবেকানন্দ

অভিনেতা ৩ : এক আশ্চর্য আত্মোৎসর্গের নাম বিবেকানন্দ।

অভিনেতা ৪ : আধুনিক ভারতের রূপকারের নাম বিবেকানন্দ
অভিনেত্রী ২ : এ ইতিহাসের প্রারম্ভে মানুষ, অন্তে মানুষ।
অভিনেতা ৫ : দীনহীন মানুষ, নিপীড়িত নিরক্ষর মানুষ
অভিনেতা ৬ : ভারতের জাতীয়বোধ জাগরণের অগ্রদূত তিনি
অভিনেত্রী : তিনি এক বিপ্লবী সন্ন্যাসী
অভিনেতা ১ : তিনি স্বদেশ প্রেমিক, বিশ্বপ্রেমিক তিনি
অভিনেতা ৪ : তিনি ভারত আত্মার মূর্ত প্রতীক
অভিনেতা ২ : কিন্তু আজ কেন বিবেকানন্দের খোঁজ?
অভিনেত্রী ১ : মৃত্যুর প্রায় ১০০ বছর পরেও কেন তিনি প্রাসঙ্গিক?
সবাই : কেন ? কেন?
অভিনেতা ৩ : একবিংশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বর্তমান ভারত তো অনেক বদলে গেছে।
অভিনেতা ৬ : এই বদলের ভেতরেও কিভাবে তিনি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন তারই একটি রূপকথা তুলে ধরছি আপনাদের সামনে।

## দৃশ্য - ১

(মন্দিরা নামে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া মেয়ের শোবার ঘর। পড়ার টেবিল, বই। একপাশে টেডি বিয়ার। বালিশের পাশে রাখা মোবাইল ফোন বেজে ওঠে)

মন্দিরা : হ্যালো— (মঞ্চের একেবারে সামনে একটি আলোয় শুভ)
শুভ : হ্যালো— মন্দিরা
মন্দিরা : (আড়মোড় ভেঙে) হ্যাঁ, বল
শুভ : তোর কি এইমাত্র ঘুম ভাঙলো?
মন্দিরা : হুম— ক'টা বাজেরে?
শুভ : সাড় নয়।
মন্দিরা : কালকের থেকে আধ ঘন্টা আগে
শুভ : তুই কি পুরো রাত জেগে স্টাডি করছিস?
মন্দিরা : মাঝরাত পর্যন্ত ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে চ্যাটিং করছিলাম।
শুভ : ঢপ ছাড়িস না বস্
মন্দিরা : আরে ইয়ার— ঢপটা দিই বাবা মাকে। ওরা জানে আমি রাত জেগে পড়ি
শুভ : এসব দু'নম্বরি করেও তো তুই শালা এক্সাম টপার
মন্দিরা : টপার কা বাত ছোড় ইয়ার। মাল্টিপ্লেক্সে 'বরফি' লাগিয়েছে। যাবি আজ?

শুভ : তুই 'বরফি' দেখিস নি?
মন্দিরা : কোথায় দেখবো?
শুভ : কেন নেট থেকে লোড করে।
মন্দিরা : তোরা দেখে ফেলেছিস?
শুভ : কবে।
মন্দিরা : রণবীর কেমন করেছে রে? মাই হার্ট থ্রব?
শুভ : তোর হার্টথ্রব— পচা জঘন্য। কিন্তু প্রিয়াঙ্কা ইজ অ-সাম।
মন্দিরা : আর বলিস নারে— চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।
শুভ : চোখে জল কেন?
মন্দিরা : ওমা ভালো খাবার জিভে জল আর ভালো সিনেমার কথা শুনলে চোখে জল ।
শুভ : (হাসি) দারুণ বলেছিস। ছাড়ছিরে
মন্দিরা : কেন ফোন করেছিলি? বললি না তো?
শুভ : এ্যা্ দেখ, ভুলেই বসে আছি। হ্যাপি যুব দিবস।
মন্দিরা : মিন্স?
শুভ : হ্যাপি ইয়ুথ ডে। আজ বারো জানুয়ারি। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন।
মন্দিরা : আরে তাইতো। এ্যাই শোন না। একটা মজা করবো আজ।
শুভ : কী?
মন্দিরা : ফেসবুকে ইয়ুথ ডে উপলক্ষে স্বামীজির কিছু জম্পেশ কোটেশন পোস্ট করে দেবো। দে না ভাই স্বামীজির দু'একটা হট কোটেশন।
শুভ : আরে স্বামীজির একটা কোটেশনই তো হেভিভ পপুলার।
মন্দিরা : জীবে প্রেম করে যেইজন?
শুভ : ইয়েস।
মন্দিরা : ধুর, এটা তো পচে গেছে— সামথিং রেয়ায় ইয়ার
শুভ : তাহলে বাবা নেট খোঁজ।
মন্দিরা : গুড আইডিয়া।
শুভ : সন্ধ্যায় চলে আয় না সিটি সেন্টারে।
মন্দিরা : এনিথিং স্পেশাল?
শুভ : ইয়ুথ ডে সেলিব্রেট করবো।
মন্দিরা : রিয়েলি?
শুভ : হ্যাঁ। সবাইকে এস এম এস পাঠাচ্ছি। এ্যাটেন্ড ইয়ুথ ডে সেলিব্রেশন অ্যাট স্ট্যান্ডিং কর্ণার অব সিটি সেন্টার।
মন্দিরা : ও কে, বস্ **(আলো নেভে)**

**( দৃশ্যান্তর )**

(কোরাসের দল মঞ্চ তৈরি করে দেয়)

অভিনেতা : বারোই জানুয়ারিতে দু'জন যুবক-যুবতীর হালকা কথোপকথনের মধ্য দিয়ে শুরু হল এক খোঁজ।

অভিনেত্রী ২ : সে খোঁজ আমাদেরও

সবাই : এক অনন্তের খোঁজ

অভিনেতা ৫ : চলুন ফিরে যাই কাহিনিতে। মন্দিরার মাথায় ঢুকলো বিবেকানন্দের কোটেশন খোঁজার নেশা।

অভিনেতা : ল্যাপটপে শুরু হল সেই সার্চিং।

**দৃশ্য- ২**

(মন্দিরা চেয়ারে বসে ল্যাপটপ নিয়ে মগ্ন। মা ঢোকেন। হাতে হরলিক্সের গ্লাস)

মা : ইস্। কি অবস্থা ঘরটার! বলি, এভাবে মানুষ থাকতে পারে? যত বড়ো হচ্ছে তত আগোছালো হচ্ছে। আরে ঘরটা গোছানো থাকলে তো পড়াশুনাতেও মনটা বসে। (মন্দিরার কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে) দ্যাখো, আমি কোন উলুবনে মুক্তো ছড়াচ্ছি! (ঘর গোছাতে গোছাতে) বলি, কানে যাচ্ছে আমার কথা? সকাল থেকেই ল্যাপটপ। মনে হয়, ভেঙে ফেলি এই মাথা খাওয়া যন্ত্রটাকে।

মন্দিরা : মা একটু আস্তে

মা : আস্তে মানে? আমি তোকে বকছি

মন্দিরা : কেন? কি করেছি আমি?

মা : হায় ভগবান! এখন বলছে আমি কি করেছি!

মন্দিরা : চুপ করতো। কাজ করতে দাও।

মা : আমি আজই তোর বাবাকে জানাবো— আমি আর পারছি না! তোমার মেয়েকে এসে তুমি নিয়ে যাও। ও মেয়ে আউট অব কন্ট্রোল।

মন্দিরা : খুব ভালো হবে। শিলংয়ের শীতে দিনরাত আমি লেপের ভেতরে ল্যাপটপ নিয়ে পড়ে থাকবো।

মা : চোওপ্। হরলিক্সটা খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো।

মন্দিরা : দাও।

মা : হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা নিতে পারিস না?

মন্দিরা : দেখছো না কাজ করছি।

মা : ওফ্! আমাকে রি পেয়েছিস? (হরলিক্স খাইয়ে দেয়)
মন্দিরা : আজ বারো জানুয়ারি
মা : তো কী হয়েছে?
মন্দিরা : বারোই জানুয়ারি। মনে করে দেখ কী?
মা : (একটু ভেবে) বারোই জানুয়ারি— না আমাদের ম্যারেজ ডে নয়। উ হুঁ তোর জন্মদিনতো নয়ই। ও মনে পড়েছে—
মন্দিরা : কী?
মা : তোর ছোট মাসি এইদিনে কানাডা পাড়ি দিয়েছিল।
মন্দিরা : ধুৎ, বারোই জানুয়ারি— বিবেকানন্দের জন্মদিন।
মা : হে রা-ম। তাই তো। তোর পিছনে বকবক করতে করতে মাথায় আর কিছু থাকে!
মন্দিরা : যাঃ বিবেকানন্দের জন্মদিন ভুলে গেছ— তাও আমার দোষ!
মা : কত সুন্দর সুন্দর কথা বলে গেছেন স্বামীজি— 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর— বাঃ কী সুন্দর বাণী।
মন্দিরা : স্বামীজির আর কোন কোটেশন জানা আছে তোমার?
মা : আর- আর.....। কত কিছুইতো পড়েছি ছোটবেলায়, সংসারে ঢুকে সব গেল।
মন্দিরা : বাঃ আমাদের দু'দুটো জেনারেশনের বিবেকানন্দ সম্পর্কে জ্ঞান হচ্ছে— ওই জীবে প্রেম করে যেইজন—
মন্দিরা : শোনো স্বামী বিবেকানন্দের আরো কোটেশন— 'ফিল ফিল মাই চিলড্রেন, ফিল ফর দ্য পুওর, দ্য ইগনোরেন্ট, দ্য ডাউন-ট্রডেন'। আরেকটা 'এরাইজ, এ্যাওয়েক। এন্ড স্টপ নট টিল দ্য গোল ইজ রিচজড।' আরো শোন—
মা : তুই এখন বিবেকানন্দ নিয়ে পড়লি যে! সামনে তোর এক্সাম। আর রক্ষে নেই গো। এবার বিবেকানন্দের হদ্দমুদ্দ করে ছাড়বে আমার এই মেয়ে।

**( আলো নেভে )**

**( দৃশ্যান্তর )**

**(মঞ্চ তৈরি করতে করতে )**

অভিনেতা ১ : একটার পর একটা উদ্ধৃতি পড়ে চমকে উঠছিল মন্দিরা।
অভিনেতা ২ : এ তো শুধুমাত্র এক সন্ন্যাসীর কথা নয়। এ যে স্বাধীনতাকামী এক দেশপ্রেমিকের কথা, এ যে এক সমাজ দরদীর কথা।
অভিনেত্রী ১ : বিবেকানন্দকে গভীরভাবে জানার নেশা চেপে বসল ওর মাথায়।

অভিনেতা ১ : ছুটল লাইব্রেরিতে। একগাদা বই নিয়ে নাওয়া-খাওয়া ভুলে বসে পড়ল পড়তে।

অভিনেত্রী ২ : ফেসবুকে বিবেকানন্দের কোটেশন না দিয়ে / পোস্ট করল অন্য একটি লাইন—

## ( দৃশ্য - ৩ )

**(রাস্তার কোলাহল, যানবাহনের আওয়াজ। সিটি সেন্টারের স্ট্যান্ডিং কর্ণারে মন্দিরার বন্ধুরা)**

তপা : ‘বিবেকানন্দ হ্যাজ আ মিস্ট্রিয়াস ম্যাগনেটিক পাওয়ার — হি ইজ পুলিং মি লাইক এনিথিং— মন্দিরার এই পোস্টটা দেখেছিস তো শুভ?

শুভ : দেখেছি এবং খুব গিল্টি ফিল করছি।

দীপ : কেন?

শুভ : আরে, আজ সকালে আমিই তো ওকে ওই হাই পাওয়ার ম্যাগনেটিক ফিল্ডে ঠেলে দিয়েছি।

শ্বেতা : তাই? (হাসি) এ্যাই মেসেজ যে পাঠালি, যুব দিবস সেলিব্রেট করবি না?

বিপ্র : হ্যাঁ— কোথায় সেলিব্রেশন?

শুভ : কোথায় আবার? লাগাও গানা— একটু হই চই মস্তি করে নেই।

তপা : খালি মুখে যুবা দিবস? বোরিং—

শুভ : আমার পকেট ফাঁকা— দেনা ভাই ক-টা টাকা ধার।

দীপ : ফাঁকা পকেট নিয়ে সেলিব্রেশন— হোয়াট এ জোক ইয়ার।

শুভ : শালা, মন্দিরাটা এখনো এল না— এর কাছে সব সময়ই কিছু থাকে। বাকি তোরা সবগুলো শালা দুর্ভিক্ষের কাক।

দীপ : পেটপূজা নাই তো গানা নাই। চলো, এবার বাড়ি যাই। (মন্দিরা আসে)

সবাই : হাতে ওটা কী বস্?

মন্দিরা : চপ্। (সবাই প্রায় হামলে পড়ে) নো, নো টাচ।

বিপ্র : এটা কী ধরণের অত্যাচার?

মন্দিরা : আমার কিছু ইম্পোরটেন্ট কথা আছে।

শুভ : আমরা খেতে খেতে ইজিলি কথা বলতে পারি।

মন্দিরা : না।

দীপ : ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে তুই মাংসের থলি ঝুলিয়ে কনফারেন্স করতে চাস? (সবাই হাসি)

মন্দিরা : শোন, পহেলে গানা, দ্যান খানা। সেলিব্রেট যুব দিবস—

দীপ : ও সেই কথা এই ধর তাড়াতাড়ি গান ধর।
গান।। আমরা নতুন যৌবনের দূত।। (সবাই মিলে গানটি গায়) তপা, শ্বেতা : নে, এবার প্যাকেট খোল।

মন্দিরা : আরো একটু কথা আছে।

শ্বেতা : দিস ইজ সিম্পলি টর্চার।

সবাই : যা বলবি, এক মিনিটের মধ্যে শেষ কর।

মন্দিরা : জানিস, উই আর মিসিং হিম এ লট—

তপা : কাকে? ঐ রামু ফুচকা ওয়ালাকে?

মন্দিরা : ধ্যাৎ

সবাই : তবে?

মন্দিরা : বিবেকানন্দকে

সবাই : এ্যাঁ— কী বলছেরে?

বিপ্র : এ্যাই, বিবেকানন্দকে দিয়ে আমরা কী করব?

দীপ : আমি ভেবে পাই না, তাঁর জন্মদিন কেন যুব দিবস হল?

তপা : আমরা সবাই কী করব এই দিনে?

শুভ : কী আর করব? সবাই মিলে সন্ন্যাসী হয়ে যাব।

মন্দিরা : আমরা কী করব, আমরা কী করতে পারি সেজন্যে বিবেকানন্দকে জানা দরকার। তিনি কেবল একজন সন্ন্যাসী নন রে, তিনি একজন অসম্ভব সেন্সিটিভ মানুষ।

শ্বেতা : দ্যাখ বাবা, সামনে পরীক্ষা ওসব এখন মাথায় ঢুকবে না।

মন্দিরা : শ্বেতা, আজ সারাদিন ঝড়ের মতো আমি বিবেকানন্দের মধ্যে পাক খেয়েছি। তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু পেতে পারি। সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠার মন্ত্র, পেতে পারি মনের বল, অমিত শক্তি আর আত্মবিশ্বাস।

বিপ্র : ঠিক আছে— তুই জান লাগিয়ে পড়। এবার দে—

মন্দিরা : চল না, আমরা সবাই কিছু কিছু জানতে চেস্টা করি বিবেকানন্দ সম্পর্কে—

দীপ : ওসব আমার জানা আছে। বিশ্বনাথ দত্ত আর ভুবনেশ্বরী দেবীর ষষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্রনাথ দত্ত।

শুভ : যা ! এটা তুই ক্লাস ফোরের রচনা থেকে ঝাড়ছিস।

মন্দিরা : জানিস, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোমা রোঁলাকে বলেছিলেন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো ইন্ডিয়া, ইউ নো বিবেকানন্দ।

তপা : বাব্বা— এরকম বলেছেন।

মন্দিরা : হ্যাঁ। শোন, প্রত্যেককে আমি একটা করে বই দিচ্ছি— বিবেকানন্দের উপর লেখা — তোরা পড়ে দেখ— ভীষণ ইন্সপায়ারিং— সবাইকে বই দেয়)

শ্বেতা : কখন পড়বো রে? পড়ার এত সময় নেই এখন।

মন্দিরা : আমি বলছি— পড়বি সময় করে।

সবাই : এখন তো প্যাকেট খোল। (প্যাকেট থেকে সবাই চপ নেয়)

মন্দিরা : (ফোন আসে) হ্যালো, বল দেবায়ন। কী? প্রত্যুষকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে— আচ্ছা। আসছি আমরা।

সবাই : আবার?

মন্দিরা : থানায় যেতে হবে । চল।

বিপ্র : আমরা যাব কেন? ও তো একটা দাগি অ্যান্টি সোশ্যাল।

মন্দিরা : ও নাকি দেবায়নকে বলেছে আমাদের জানাতে।

তপা : তাহলে তো যাওয়া উচিত—

শুভ : কোনভাবেই উচিত নয়— ফালতু আমরা ঝামেলায় জড়াব কেন?

মন্দিরা : শুভ, ও একসময় আমাদের বন্ধু ছিল—

শুভ : চল, তাহলে।

**(সবাই বেড়িয়ে যায়। আলো নেভে)**

## দৃশ্য - ৪

**( মন্দিরার ঘর। মামাকে নিয়ে মা ঢোকেন)**

মা : আয় দাদা, এই হচ্ছে তোর আদরের তুনার ঘর।

মামা : বাঃ বিবেকানন্দের ছবিটাতো বেশ।

মা : কিছুদিন আগে লাগিয়েছে।

মামা : সারা ঘরে শুধু বই। খুব পড়াশুনা করছে।

মা : উল্টে দ্যাখ না, একটাও পড়ার বই নয়।

মামা : (কয়েকটা বই উল্টে) পড়ার বই নয় বলছিস কেন? সবই তো বিবেকানন্দের উপর লেখা বই।

মা : ওর ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বই নয় আর কী! এখন কি ওসব পড়ার সময় নাকি? আরে বাবা, চাকরি বাকরি হয়ে গেলে পর বিবেকানন্দকে নিয়ে—পড়ে থাক।

মামা : ভুল বলছিস বুড়ি— জীবনের এই সময়টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ভেতরের শক্তিটাকে চিনে নেবার এই তো সময়। সেজন্যে এখনই বিবেকানন্দ প্রয়োজন।

মা : পড়াশুনা বাদ দিয়ে?

মামা : শোন, বিবেকানন্দের জাগরণী মন্ত্র কাউকে পিছিয়ে পড়তে দেয় না? 'ওঠো জাগো, যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না।'

মা : আমার খুব ভয় করে শেষে না তোমার মতো—
মামা : (হাসি) আমার মতো কী? ঘরছাড়া বিবাগী?
মা : এম এসসিতে ফিজিক্সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এখন উত্তর কাশীতে প্রাইমারি স্কুলের টিচার।
মামা : শোন, ভালো থাকা, আনন্দে থাকাটাই বড় কথা।
মা : চাকরি করে, ঘর সংসার করে বুঝি ভালো থাকা যায় না? (মন্দিরা প্রবেশ করে)
মন্দিরা : হোয়াট এ সারপ্রাইজ বড় মামা?
মামা : হা-হা-হা— কেমন চমকে দিলাম?
মন্দিরা : আমি তো— মানে— আমি তো ভাবতেই পারছি না যে তুমি আর আসবে?
মামা : কেন আসবো না? আমি কি সাধুসন্ত হয়ে গেছি?
মন্দিরা : তুমি কিন্তু বেশ বুড়িয়ে গেছ বড় মামা।
মামা : মোটেই না। সুন্দরী মহিলারা এখনো যেভাবে আমার দিকে তাকায়, তাতে বুড়ো হয়ে গেছি এটা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না।
মন্দিরা : ওই মহিলাদের একজনকে ধরে আমাদের মামি বানিয়ে নাও না।
মামা : কিন্তু এরা যে সবাই বিবাহিত (সবাই হাসি)
মা : ইস্ — মামা-ভাগনির কথার কি ছিরি! দাদা, আমি তোমার খাবার রেডি করছি। (প্রস্থান)
মন্দিরা : এবার বল তোমার বাচ্চাদের স্কুল কেমন চলছে?
মামা : খুব ভালো। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলের প্রায় দুশো দুঃস্থ ছেলেমেয়ে আছে স্কুলে। এখন আবার পড়াশুনা ছেড়ে যাওয়া যুবক যুবতীদের জন্যে হাতের কাজ শেখার একটি ইনস্টিটিউট চালাচ্ছি।
মন্দিরা : (কলিং বেল বাজে) মা দেখবে? বড়মামা, আমার বন্ধুদের কাছে তোমার অনেক গল্প করেছি। একদিন নিয়ে আসব ওদের।
মামা : নিয়ে আয় না। দেখি শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে পারি কি না! (হাসি, মা আসেন)
মা : তুনা, একটি ছেলে— বলছে তোর বন্ধু।
মন্দিরা : দাঁড়াও, আমি দেখছি। (মন্দিরার প্রস্থান)
মামা : বন্ধু বলছে তো বাইরে দাঁড় করে রেখেছিস কেন?
মা : একটা উশকোখুশকো ছেলে— জীবনে দেখিনি। চল দাদা, আগে চান করে দুটো খেয়ে নাও।
মামা : চল। (দুজনে বেরিয়ে যায়, মন্দিরা একটি ছেলেকে নিয়ে ঢোকে)
মন্দিরা : কি ব্যাপার? হঠাৎ সোজা বাড়িতে? (ছেলেটি চুপ) চুপ করে আছিস যে, বল?

প্রত্যুষ : আমার কিছু টাকার দরকার।

মন্দিরা : কী?

প্রত্যুষ : হাজারখানেক টাকা।

মন্দিরা : কেন?

প্রত্যুষ : খুব দরকার।

মন্দিরা : দরকারটা কী? (চুপ) নেশা করার টাকা নেই হাতে? (চুপ) আর কত নীচে নামবি?

প্রত্যুষ : টাকাটা আমার খুব দরকার। ধার — ধার চাইছি—

মন্দিরা : কাকে ধার দেবো, পরতুষ গুন্ডাকে?

প্রত্যুষ : এ্যাই, তখন থেকে কিন্তু আজেবাজে বকছো।

মন্দিরা : চিৎকার করবি না। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে আমাদের ফোন করেছিলি কেন? হুঁ? আরে, তোর গ্যাং লিডাররা কোথায় ছিল তখন? আমরা বন্ধুরা তোকে থানা থেকে ছাড়িয়ে না আনলে তো এখনও হাজতে পচতিস—

প্রত্যুষ : কেন ছাড়িয়ে এনেছ— হাজতে না হয় পচতাম।

মন্দিরা : গিয়েছিলাম এ জন্যে যে তুই একদিন আমাদের বন্ধু ছিলি। আর আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। ক্লাসের সবচেয়ে ব্রাইট চ্যাপ ছিলি।

প্রত্যুষ : ওসব রাখ। নেশাটা বেশ হয়ে গিয়েছিল— হুশ ছিলনা বলে ওই শালা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেছি, নয়তো ওরা আমাকে ধরে!

মন্দিরা : তার মানে কৃতকর্মের জন্যে তোর কোনো অনুশোচনা নেই?

প্রত্যুষ : জানি না।

মন্দিরা : কী জানি না?

প্রত্যুষ : জানি না ব্যস্।

মন্দিরা : তাহলে ফোট এখান থেকে। যা (প্রত্যুষ বেরিয়ে যায়) এ্যাই প্রত্যুষ শোন, শোন। (ওর চলে যাবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মন্দিরা। তারপর হাত দিয়ে মুখ ঢেকে চেয়ারে বসে পড়ে। **(আলো নেভে)**

**( দৃশ্য - ৫ )**

**(মন্দিরা অস্থির। দরজা দিয়ে এক উজ্জ্বল আলো। সেই আলোতে যেন কেউ দাঁড়িয়ে)**

মন্দিরা : কে? কে ওখানে? (কোন উত্তর নেই) কে? প্রত্যুষ? কে? বিবেকানন্দ! আমি স্বপ্ন দেখছি।

বিবেকানন্দ : তুমি শান্ত হও।

মন্দিরা : কি বলছেন আপনি? আমার সমানে জলজ্যান্ত স্বামী বিবেকানন্দ আর আমি শান্ত হয়ে থাকবো? আমি কী করবো? চিৎকার করে সবাইকে ডেকে আনব?

বিবেকানন্দ : সবাইকে ডেকে কী হবে? আমি তো তোমার চিন্তার রাজ্যে। আমাকে তো কেউ দেখতে পাবে না?

মন্দিরা : এই যে আমি আপনাকে দেখছি?

বিবেকানন্দ : আমাকে তুমি তোমার অন্তরদৃষ্টিতে দেখছো।

মন্দিরা : স্বামীজি!

বিবেকানন্দ : হ্যাঁ।

মন্দিরা : গত দু'দিন ধরে আমি আপনার মধ্যেই ডুবে ছিলোম। আপনি যেন এক অন্তহীন জীবন— অনন্ত! এত সংক্ষিপ্ত জীবনেও আপনার কোন কূল কিনারা নেই।

বিবেকানন্দ : আমার জীবন আর কর্ম নিয়ে শুধু নাড়াচাড়া করবে? আমার জীবনে যদি ভালো কিছু পেয়ে থাকো— তা তোমাদের জীবনচর্চায় অন্তর্ভূক্ত করলে, তবেই না আমার জীবন সার্থক হবে।

মন্দিরা : সময় অনেক পাল্টে গেছে স্বামীজি। চারপাশে তাকানোর মতো ফুরসত আমাদের নেই। এই সময়, সমাজ, পরিবার আমাদের শুধু শেখাচ্ছে নিজের জন্যে বাঁচতে।

বিবেকানন্দ : স্বার্থপর হয়ে নিজে স্বর্গলাভ করার চেয়ে অপরের কল্যাণে নরকে যাওয়া ঢের ভালো।

মন্দিরা : আপনি তো সন্ন্যাসী হয়েও নিজের মুক্তির জন্যে এক মুহূর্তও ভাবেননি?

বিবেকানন্দ : যে শুধু নিজের মুক্তির কথা ভাবে সে কিসের সন্ন্যাসী, কিসের সাধু? জানো, পরাধীন ভারতবর্ষের দারিদ্র্য আর অশিক্ষা দেখে আমার ঘুম হত না। গুরুদেব বলতেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তখন আমি বুঝেছিলাম, যে পর্যন্ত আমার দেশে একটা কুকুরও অভূক্ত থাকবে, সে পর্যন্ত আমার ধর্ম হবে তাকে খাওয়ানো ও তার যত্ন করা।— তাছাড়া, বাকি সব কিছুই অধর্ম।

মন্দিরা : আজ আমার মনে একদম শান্তি নেই।

বিবেকানন্দ : জানি, তোমার এক বন্ধু—

মন্দিরা : আপনি জানেন? (বিবেকানন্দের হাসি) আমি ওকে টাকা দিইনি। ও একটা নিকৃষ্ট পাপী।

বিবেকানন্দ : তুমি ভুল করছো।

মন্দিরা : ভুল?

বিবেকানন্দ : হ্যাঁ। মানুষ অমৃতের সন্তান। পূর্ণ ও পবিত্র। মানুষকে পাপী বলাই মহা পাপ। মনুষ্যপ্রকৃতির উপর এক স্থায়ী কলঙ্ক।

মন্দিরা : তার মানে নেশাখোরকেও সাহায্য করব?

বিবেকানন্দ : দ্যাখ, ভারতবর্ষে পতিতদের কি অবস্থা, তাঁদের উঠে দাঁড়াবার কোন উপায় নেই। এদেশে, পাপীদের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নেই। তারা দিন দিন আরো অতলে ডুবে যায়। এক সময় তারা যে মানুষ— সেটাও তারা ভুলে যায়।

মন্দিরা : আমি এখন তবে কী করব?

বিবেকানন্দ : তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা করো।

মন্দিরা : হ্যাঁ, প্রত্যুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত। ওকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরাতে হবে।

বিবেকানন্দ : দ্যাখ, এবার তোমার মন শান্ত হল তো?

মন্দিরা : স্বামীজি, এই জটিল সময়ে আপনাকে আমাদের বড়ো প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ : তোমরা যদি আমাকে খোঁজ— তাহলেই আমাকে পাবে। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতের প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, ভারত আমার পূণ্যভূমি, আমার তীর্থস্থান।

মন্দিরা : আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন।

বিবেকানন্দ : মানুষ হও। তুমি এ যুগের নিবেদিতা হয়ে ওঠো। একশো বছর আগে আমার এক দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু পেরুমল আলাসিঙ্গাকে যা বলেছিলাম— আজ তার পুনরাবৃত্তি করছি। শিক্ষিত যুবক যুবতীদের মধ্যে কাজ কর। তাদের একত্র করে সংঘবদ্ধ করো। মনে রেখো, অনেকগুলো তৃণগুচ্ছ একত্র করে রজ্জু তৈরি করলে, তাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। (স্বামীজি অদৃশ্য হয়ে যান। শেষ কথাগুলি Off voice-এ আসবে। মন্দিরা অস্থির হয়ে মোবাইল রিং করে, বার বার কেটে যায়। মন্দিরা এবার ফোন করে শুভকে)

মন্দিরা : হ্যালো— হ্যালো—

শুভ : হুম্, মন্দিরা বল—

মন্দিরা : একটা বিশেষ ব্যাপারে—

শুভ : মেকানিক্স চাপ্টারের প্রবলেম তো?

মন্দিরা : আরে না, প্রত্যুষ—

শুভ : স্কাউন্ড্রেলটা কি এত রাত্তিরে উৎপাত করছে?

মন্দিরা : আমি এক্ষুনি প্রত্যুষের বাড়ি যেতে চাই।

শুভ : তোর মাথা খারাপ ? গোলচক্করের ওদিকটায় এত রাত্তিরে ওই স্কাউন্ড্রেলটার বাড়ি যাওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়।

মন্দিরা : একটা ঘটনা ঘটেছে। যেতে যেতে তোকে বলব। প্লিজ তুই বাইকটা নিয়ে

আয়

শুভ : ও কে। তুই রেডি হ। (মা এসে দাঁড়ান)

মা : কী হল? এত রাত্তিরে কোথায় যাচ্ছিস?

মন্দিরা : প্রত্যুষ— আজ যে এসেছিল আমার পুরনো বন্ধুটি— ওর বাড়িতে যাব।

মা : কী বলছিস কী?

মন্দিরা : আধ ঘন্টার মধ্যেই ফিরব। শুধু জেনে রাখ, তোমার মেয়ে কোন বাজে কাজে যাবে না।

মা : ওফ্, তোকে নিয়ে যে কী করি। (বাইকের শব্দ)

মন্দিরা : আমি যাচ্ছি মা। (মন্দিরা বেরিয়ে যায়। মা বিবেকানন্দের ছবিতে নমস্কার করেন)।

**(দৃশ্যান্তর)**

**(মঞ্চ তৈরি করতে করতে)**

অভি ১ : নিজের ব্যবহারে অনুতপ্ত মন্দিরা ছুটল প্রত্যুষের বাড়ি।

অভি ২ : মন্দিরার ক্রমশ মনে হতে লাগল, স্বামীজি যেন এখন সব সময় তার সঙ্গে আছেন—

অভি ৩ : তার অন্তর্লোকে ঘটে চলেছে এক দুরন্ত বিস্ফোরণ

অভি ১ : এদিকে দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যুষের ঘর—

অভি ২ : বিধ্বস্ত প্রত্যুষকে দেখুন— মেতেছে অন্য খেলায়।

**দৃশ্য - ৬**

**(মঞ্চের মাঝখানে একটি চেয়ার। এর সামনে একটি ছোট টেবিল। টেবিলের উপর জলের বোতল, ওষুধের স্ট্রিপ ও মোবাইল ফোন। চেয়ারে বসে প্রত্যুষ)**

প্রত্যুষ : কিছুক্ষণ পরেই যবনিকাপাত। প্রত্যুষ কর্মকার। তেইশটি বছর এই পৃথিবীতে কাটিয়েছো। বাট নো আউটপুট। শালা। বাবা মরলো— তোর কপালে আগুন লাগল। পড়াশুনা ছেড়ে নেমে পড়লি দু'নম্বরি পথে। রাতারাতি বড়লোক বনে যেতে চাইলি। (ফোন বাজে) আরে, কোন শালা ফোন করে রে? (ফোন কেটে দেয়) কত স্বপ্ন- স্কুলের ব্রাইট চ্যাপ! আরে লোচ্চা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে পড়া ছাড়লি, সঙ্গের বন্ধুরা সব কোথায় চলে গেল। আরে শুয়োর, বাইক ছুটিয়ে, দামি মোবাইল লাগিয়ে ভাবলি দুনিয়া তোর হাতের মুঠোয়। (ফোন বাজে) এ্যাই চোওপ— সাইলেন্ট। শালা শেষ কথাগুলোও বলতে দেবে না। (বন্ধ করে) যা

এবার মরে পড়ে থাক। আমাকে শান্তিতে এবার স্বপ্নের রাজ্যে ভাসতে দাও। (দীর্ঘশ্বাস)। দেখি বাছাধন— তুমি আমার সিরিঞ্জ, ড্রাগস পুশ করো প্রথমে বন্ধু। তারপর আমাকে স্বপ্নের নীল সমুদ্রে ভাসিয়ে দাও তো। (দরজায় টোকা) পুলিশ? নাকি গ্যাং-এর কোনো কুত্তা। (দরজা খুলতেই মন্দিরা ও শুভ ঢোকে) কি ব্যাপার? এত রাত্তিরে—

মন্দিরা : আমি ফোন করেছিলাম— ধরলি না যে—

প্রত্যুষ : আমি ব্যস্ত ছিলাম—

মন্দিরা : এত ব্যস্ত যে ফোন ধরা যায় না?

প্রত্যুষ : শুভ তোরা চলে যা, আমি একটা জরুরি কাজে ব্যস্ত।

শুভ : এত রাত্তিরে আমরা এলাম আর তুই—

প্রত্যুষ : এই জায়গাটা নিরাপদ নয়— তোরা চলে যা

মন্দিরা : আমরা জানি। তবুও এসেছি— আমার কথাটা শোন—

প্রত্যুষ : একবার যে বললাম শোন নি? কারো কোন কথা শোনার আর দরকার নেই

শুভ : মাথা ঠান্ডা কর তো। কী বলছিস আবোল তাবোল?

মন্দিরা : আমি টাকা নিয়ে এসেছি—

প্রত্যুষ : আমাকে কী ভেবেছ— কুত্তা, বেড়াল? শালা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এখন দরদ দেখাতে এসেছ?

মন্দিরা : আমার ভুল হয়েছে— তুই — টাকাটা রাখ।

প্রত্যুষ : তোমার টাকা তোমার কাছে রাখো।

মন্দিরা : (টেবিলে রাখা ওষুধ দেখে) এগুলি কিসের ওষুধ?

প্রত্যুষ : আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে— তোরা যা—

মন্দিরা : শুভ— দ্যাখ দ্যাখ, ওসব কী? (শুভ দেখে)

শুভ : মাই গড— প্রত্যুষ তুই কী করছিলি?

প্রত্যুষ : শুভ — এগুলো দে আমাকে— দে বলছি

মন্দিরা : (সামনে গিয়ে গালে উপর্যুপরি চড় লাগায়) এসব করে মরতে চাস্? বাহাদুরি? জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে শহিদ হতে চাস্?

শুভ : তুই এসব কী করছিস্? (প্রত্যুষ চুপ)

প্রত্যুষ : আমি হেরে গেছি—আমি শেষ হয়ে গেছি (কাঁদে)

মন্দিরা : কিচ্ছু হয়নি তোর— ওঠ ওঠ (তুলে চেয়ারে বসায়)

প্রত্যুষ : আমি বাজে— নিকৃষ্ট, আমার কিচ্ছু করার ক্ষমতা নেই।

মন্দিরা : শোন, একজন মহান মানুষের কথা বলি তোকে। তিনি বলেছেন তুমি যাকে নিকৃষ্ট, পাপ বলে মনে করছো, আসলে তা তোমার খারাপ দিকের প্রকাশ। কিন্তু তোমার মধ্যে উল্টোটাও আছে— বিশ্বাস কর এখনো আছে— নিজেকে

ভালো ভাবে প্রকাশের ক্ষমতা—

প্রত্যুষ : এখন সব কথা শুনতে একদম ভালো লাগছে না।

শুভ : মন্দিরার কথাগুলো শোন প্রত্যুষ।

মন্দিরা : তোকে আরেকটা জিনিষ দিতে এসেছিলাম— (একটি বই বের করে ব্যাগ থেকে) এই দ্যাখ, ছোট্ট একটা বই— স্বামী বিবেকানন্দের লেখা 'ওঠো, জাগো, এগিয়ে চল'। (স্বামীজি দূরে এসে দাঁড়ান) বইটা পড়— দেখবি চোখের সামনে সব অন্ধকার কেটে গেছে— নে ধর।

প্রত্যুষ : (বইটি নেয়) কি বলছো এসব তুমি?

শুভ : তুই ওসব নোংরা পথ ছেড়ে দে—

মন্দিরা : সব শক্তি তোর ভেতরে আছে। উঠে দাঁড়া। (বইটার পাতা উল্টে) বিবেকানন্দ! দ্যাখ, কেমন জেগে ওঠার মন্ত্র আছে এতে।নিজের উপর বিশ্বাস রাখো, প্রবল বিশ্বাসই বড়ো বড়ো কার্যের জনক। (ক্রমশ স্বামীজিক বলতে দেখা যায়) এগিয়ে যাও। এগিয়ে যাও। যাহা তোমার শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুর্বলতা আনয়ন করে তা বিষবৎ পরিহার কর।

**(মিউজিকে ডুবে যায় বিবেকানন্দের কণ্ঠ। আলো নেভে)**

## ( দৃশ্য - ৭ )

**(সিটি সেন্টারের সামনে। কোলাহল। যানবাহনের আওয়াজ)**

বিপ্র : কি রে ভাই— মন্দিরা কি শেষ অবধি সন্ন্যাসিনী হয়ে যাচ্ছে?

তপা : তোকে বলেছে নাকি?

দীপ : আরে বলবে আর কী? সারাদিন যেভাবে বিবেকানন্দ নিয়ে পড়ে আছে!

শ্বেতা : হায়রে ভালো মেয়েটা এবার এক্সামে ডুববে—

তপা : মন্দিরার দেওয়া বইগুলো পড়েছিস?

শ্বেতা : মাথা খারাপ? সামনে এক্সাম— এর আগে বিবেকানন্দ! এখন মরারও সময় নেই।

তপা : বিপ্র, দীপ তোরা?

বিপ্র-দীপ : পড়েছি।

শ্বেতা : কি পড়লি?

বিপ্র : তার জীবনের উপরই লেখা একটা বই।

দীপ : আমার অনেক প্রশ্ন আছে রে ভাই। (শুভ ঢোকে)

শুভ : মন্দিরা আসেনি?

তপা : তোর মাথায় কি মন্দিরা ছাড়া আর কিছু নেই?

শুভ : না বলছি, প্রত্যুষের ব্যাপারে ও খুব বেশি ইনভল্ভড হয়ে যাচ্ছে।

শ্বেতা : ছাড়তো এসব। দীপ কী প্রশ্ন বলছিলি?

দীপ : ঠিক প্রশ্ন নয়। মানে, আমার একটা অবজারভেশন—

বিপ্র : আরে বাবা বলনা—

দীপ : বিবেকানন্দের মধ্যে একটা দেখনদারী ব্যাপার ছিল— বিশেষ করে তার কথাবার্তায়—

শুভ : আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তিনি যা বলেছেন জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষা আর জ্ঞানের বিশ্বাস থেকেই তা বলেছেন।

তপা : আমি একটা কথা বলি? আমার কাছে তাঁর প্রতিটি চিঠিপত্র, লেখালেখি বা কথাবার্তাকে মনে হয়েছে তাঁর জীবনবোধের নির্যাস— মনে হয় সবই তাঁর বাণী।

শ্বেতা : এটা তোর অতিরিক্ত ভক্তি থেকে মনে হতে পারে।

তপা : শ্বেতা, তুই কিচ্ছু বলবি না— তুই কিন্তু কিচ্ছু পড়িসনি ফাঁকিবাজ।

বিপ্র : শ্বেতা ভুলটা কি বলেছে? সত্যিই তো, তার সমস্ত চিন্তা ভাবনা বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয় না—

দীপ : রাইট। প্রচুর কন্ট্রাডিকশন আছে।

শুভ : আছে। কিন্তু মাথায় রাখিস স্বামীজি একজন ভাববাদী। একজন সন্ন্যাসী হয়েও বস্তুবাদী চিন্তাভাবনা তার জীবনের এক বিশাল জায়গা জুড়ে ছিল। সে জন্যেই কন্ট্রাডিকশন।

তপা : তিনি তাঁর সময়ের স্রোতের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে ধর্মের যে উদার ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন— সেটা বিচার কর। তিনিই কিন্তু বলেছেন, ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই লক্ষ্য এক।

শুভ : তিনি কিন্তু গেরুয়া পোষাক পরে কোন চাতুরি করেননি। যা বলেছেন— পরিষ্কার, ক্লিয়ারকাট।

শ্বেতা : বই পড়িনি বলে কি কোন প্রশ্নই করা যাবে না? (তপা হাসে)

বিপ্র : হাজার বার যাবে, বল।

শ্বেতা : আচ্ছা, সন্ন্যাসী হিসেবে তাঁর তো গুহায় বসে তপস্যা করার কথা ছিল—

তপা : ম্যাডাম, এখানেই তো অন্য সন্ন্যাসীদের থেকে বিবেকানন্দ আলাদা।

দীপ : তবে এটা কিন্তু অদ্ভূত— সন্ন্যাসী হয়ে দামি চুরুটের প্রতি আকর্ষণ, রাজা, মহারাজা ধনীদের বাড়িতে দিনের পর দিন আতিথ্য গ্রহণ।

শুভ : সন্ন্যাসী হলেই যে অতি মানব হতে হবে এই ধারণাটাই ভেঙেছেন স্বামীজি।

শ্বেতা-বিপ্র : একটু পরিষ্কার করে বল।

শুভ : শোন, একটা ঘটনা বলি, গৃহীভক্ত বলরাম বসুর মৃত্যুতে যখন স্বামীজি কাঁদছিলেন তখন একজন বলেছিলেন— সন্ন্যাসীর এরকম শোক করা ঠিক নয়। উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন— সন্ন্যাসী হয়েছি বলে কি হৃদয় বিসর্জন দেবো? যে সন্ন্যাসীর হৃদয় পাষাণ করতে শিক্ষা দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না।

শ্বেতা : বাঃ চমৎকার।

শুভ : আচ্ছা দীপ, তুই বলছিলি না রাজা মহারাজাদের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের কথা— এ ব্যাপারে স্বামীজি কি বলেছেন শোন (বই খুলে)। যাদের হাতে ক্ষমতা,ঐশ্বর্য ও হাজার লোকের শাসন ভার রয়েছে আমি তাদের যদি নিজের ভাবে ভাবিত করতে পারি, একজন মহারাজাকেও স্বমতে আনতে পারি— তবে আমি সহস্র লোকের উপকার করতে পারব।

বিপ্র : আচ্ছা, ব্যাপারটা খেয়াল করছিস— আমরা আমাদের অজান্তেই কিন্তু বিবেকানন্দের গভীরে ঢুকে যাচ্ছি—

শুভ : এটাই তো ওই মহান মানুষটির ম্যাজিক। তোকে শুধু টানবে—

শ্বেতা : এ্যাই জিনিস আমি ভেবেছিলাম— স্বামীজির বইটা আজ ফেরত দিয়ে দেবো— এখন ভাবছি— না বাবা দেব না— পড়া উচিত—

দীপ : না - না - তোর এক্সাম সামনে, পড়ার ক্ষতি হবে। বইটা দে আমি পড়ব। (ওরা হাততালি দেয়)

মন্দিরা-তপা : মাই গড।

শ্বেতা : না না আমি পড়ব।

(মিউজিক। আলো নেভে )

### দৃশ্য - ৮

**(প্রত্যুষের ঘর। ঘরের মধ্যে প্রত্যুষ পায়চারি করছে। মাঝে মধ্যে বসছে চেয়ারে। একটি বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে। আবার উঠছে )**

বিবেকানন্দ (কণ্ঠ) : সব শক্তি তোমার ভিতর আছে। কিছুই হারায়নি। উঠে দাঁড়াও। তোমার ভিতর যে দেবত্ব লুক্কায়িত আছে তা প্রকাশ করো। (মন্দিরাকে দেখা যায়— ব্যাগ থেকে বই খুলে প্রত্যুষকে দেয়। প্রত্যুষ বই নিতে নিতে তাকিয়ে থাকে মন্দিরার দিকে)

বিবেকানন্দ (কণ্ঠ) : ছোটোখাটো কোন ভুল করে অনুশোচনা এলে মনে মনে নিজেকে বলো, ভুল করেছি, এক হিসেবে ভালোই হয়েছে, কারণ এখন আমার চোখ খুলে গেছে, এমন ভুল আর কখনো করবো না। (প্রত্যুষ বসে

আছে টুলের উপর। মন্দিরা পায়চারি করতে করতে তাকে একটা বই থেকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছে)।

বিবেকানন্দ (কণ্ঠ) : তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তুমি করতে পার। তুমি সর্বশক্তিমান। (মিউজিকের মধ্যে মন্দিরা মাইমে চলে যাওয়ার কথা বলে। মন্দিরা চলে গেলে টেবিলে একটি বই খুলে বসে প্রত্যুষ। পড়তে পড়তে টেবিলের উপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কয়েকে মুহূর্ত পর এক আমেরিকান মহিলা আসেন। কাছে গিয়ে প্রত্যুষকে ডাকেন)

মহিলা : প্রত্যুষ — মাই চাইল্ড (প্রত্যুষ ঘোরের মধ্যে)

প্রত্যুষ : কে—?

মহিলা : আমি। দেখতো চিনতে পার কি না?

প্রত্যুষ : আ-আপনি কে?

মহিলা : আমি মিল্ কেট স্যানবর্ন

প্রত্যুষ : আপনি?

স্যানবর্ন : হ্যাঁ। (বইটি তুলে) এই যে, বইয়ের পাতায় তুমি এক্ষুনি বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমার লেখা পড়ছিলে—

প্রত্যুষ : হ্যাঁ। আপনি তো লিখিছেন, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার থেকে শিকাগোগামী ট্রেনে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয় ভারত থেকে আগত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের।

স্যানবর্ন : ইয়েস। সেই সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসীকে দেখে আমি এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি তাঁকে বলেছিলাম, যদি কোনোদিন বোস্টনে আসেন— আমার খামার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

প্রত্যুষ : এবং স্বামীজি কিছুদিন পরেই গিয়েছিলেন আপনার খামার বাড়িতে।

স্যানবার্ন : তাঁকে অতিথি হিসেবে পাওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওনা—

প্রত্যুষ : আমার মনে হয়, আপনি স্বামীজির জীবনে না এলে সারা পৃথিবী স্বামী বিবেকানন্দকে পেত না।

স্যানবর্ন : সেই দিনটির কথা মনে হলে জান, আজও ভীষণ রোমাঞ্চ লাগে—

প্রত্যুষ : কোন দিনটির কথা বলছেন?

স্যানবর্ন : ওই যেদিন মি: হেনরি রাইট আমার বাড়িতে এসেছিলেন স্বামীজির সঙ্গে দেখা করতে।

প্রত্যুষ : হ্যাঁ, আমি পড়েছি। হেনরি রাইটের পরিচয় পত্রটি না পেলে তো স্বামীজির পক্ষে শিকাগোর ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দেওয়াই সম্ভব হত না।

স্যানবর্ন : রাইট। আমার চোখে আজও ভাসছে সেই ঘটনাটি। এই তো যেন এখানেই—

এই চেয়ারেই নীরবে বসে আছেন স্বামীজি— সন্ধ্যা হয় হয়। হয়তো তিনি ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন। আমি ঘরে ঢোকায় নীরবতা ভগ্ন হল— (প্রতুষের ঘরেই চেয়ারে এসে বসেন বিবেকানন্দ। একটি আসন খালি। দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছে প্রত্যুষ)।

স্যানবর্ন : ঠান্ডাটা আরো বেড়েছে আজ। ফায়ার প্লেসটা জ্বালিয়ে দেব মাস্টার?

বিবেকানন্দ : এখুনি নয় মিস কেট।

স্যানবর্ন : আপনি কি কোন বিশেষ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন মাস্টার?

বিবেকানন্দ : হুঁম্-হু। যে কারণে এসেছিলাম আমেরিকায় তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল। কত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এত দূর এসেছিলাম- কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

স্যানবর্ন : আপনি ভেঙে পড়বেন না স্বামীজি।

বিবেকানন্দ : শিকাগোতে পৌঁছে যখন জানলাম ধর্মমহাসভায় যোগ দেওয়ার সময় চলে গেছে তখন যে কি মহাসংকটের মধ্যে পড়েছিলাম।

স্যানবর্ন : কী সেই সংকট?

বিবেকানন্দ : আমার হাতে অর্থ ফুরিয়ে আসছিল। শিকাগোতে থাকা খাওয়ার খরচ সামলাতে পারছিলাম না। বাধ্য হয়ে ছুটে এলাম কম খরচের শহর বোস্টনে।

স্যানবর্ন : এখন ওসব ভুলে যান মাস্টার। দিন ফিরছে। দেখুন, কাল ওয়েস্ট উইন্ড ক্লাবে আপনার বক্তৃতায় প্রচন্ড আলাড়ন পড়েছে। কিন্তু আপনার নাম নিয়ে যা কাণ্ড হচ্ছে। কেউ লিখেছে বিবেকানন্দ, কেউ লিখেছে আনন্দ, আবার কেউ শুধু কানন্দ (হাসি)।

বিবেকানন্দ : এখানে আমি যা কিছু পাচ্ছি সবই সম্ভব হচ্ছে আপনার মহানুভবতায়।

স্যানবর্ন : আপনাকে অতিথি হিসাবে পেয়ে আমি ধন্য। আপনি এসেছেন বলেই আজ অধ্যাপক হেনরি রাইটের মতো সুপন্ডিত আমার বাড়ি আসছেন। (বেল বাজে) ওই বোধহয় তিনি এলেন। (স্যানবর্নের সঙ্গে হেনরি রাইট ঢোকেন)

বিবেকানন্দ : সুস্বাগতম মিঃ হেনরি রাইট—

রাইট : হ্যালো, মিস্টার বিবেকানন্দ— আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত।

বিবেকানন্দ : আমিও তাই। বসুন।

রাইট : আপনি ইতিমধ্যেই বোস্টন শহরের একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। সভাগুলোতে আপনার ধর্মীয় আলোচনা শোনার জন্য হুড়োহুড়ি।

বিবেকানন্দ : আপনি কি আমার আলোচনা শুনেছেন?

রাইট : শুনেছি বলেইতো, ছুটে এসেছি সাক্ষাৎ করতে—

স্যানবর্ন : (চা নিয়ে আসেন) মার্জনা চাইছি, আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটালাম বলে। আপনার

চা— (পট থেকে রাইটকে চা ঢেলে দেন এরপর বিবেকানন্দকে। নিজে নেন এক কাপ)

রাইট : ঠান্ডাতে এটা বড় জরুরি ছিল। (হাসি) যে কথা বলছিলাম, অদ্বৈতবাদ বিষয়ে আপনার আলোচনা শুনে ভারতের অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে গেছে।

বিবেকানন্দ : আপনার এই মতামত আমাকে উজ্জীবিত করেছে।

স্যানবার্ন : স্যার, আপনি কি জানেন, মিঃ বিবেকানন্দ শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন—

রাইট : অবশ্যই যোগ দেওয়া উচিত এবং তাতে প্রাচ্য ও ভারত সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাল্টাবে।

বিবেকানন্দ : কিন্তু ধর্মমহাসম্মেলনে আমার যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আর নেই মিঃ রাইট।

রাইট : কেন?

স্যানবর্ন : দু'টো কারণঃ প্রথমত তার কোনো পরিচয়পত্র নেই, দ্বিতীয়ত সম্মেলনে নাম নথিভূক্ত করার সময়ও চলে গেছে।

রাইট : কি বলছেন আপনি? এ হতে পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। তিনি যোগ না দিলে, মহাসম্মেলন শ্রেষ্ঠ আলোচনাটি শোনার সুযোগ হারাবে।

স্যানবর্ন : আপনি যদি কোনভাবে সাহার্য করতে পারেন।

রাইট : অবশ্যই। আপনি আমাকে কাগজ কলম দিন (স্যানবর্ন আনতে যান) মিঃ বিবেকানন্দ আমি ধর্মমহাসভার উদ্যোক্তা ড. জে. এইচ. ব্যাচরাজের কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি। এটি নিয়ে আপনি শিকাগো চলে যান।

বিবেকানন্দ : কিন্তু পরিচয়পত্র?

রাইট : আপনার পরিচয়পত্র চাওয়ার অর্থ হল সূর্যকে তার কিরণ দেওয়ার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করা।

বিবেকানন্দ : আপনার এই মহানুভবতার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। (স্যানবর্ন কাগজ কলম দেন। রাইট লিখতে থাকেন। নেপথ্যে রাইটের গলা)

রাইট : প্রিয় মিঃ ব্যাচরাজ, পত্রবাহক মিঃ বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মমহাসভায় যোগ দিতে সুদূর ভারত থেকে এসেছেন। তাঁকে সুযোগ দেওয়া উচিৎ। মিঃ বিবেকানন্দ সম্পর্কে আমি শুধু বলব, ইনি এমন একজন ব্যক্তি, যে আমেরিকার সমস্ত অধ্যাপকদের পান্ডিত্য এক করলেও তাঁর পান্ডিত্যের সমান হবে না। ইতি, আপনার বিশ্বস্ত হেনরি রাইট, অধ্যাপক, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

( পূর্বের দৃশ্য )

(স্যানবর্ন পাগলের মতো হাসতে থাকেন। প্রত্যুষ ছুটে এসে তাকে ধরে )

প্রত্যুষ : কী হলো আপনার?

স্যানবর্ন : সেদিনও আমি এমনি পাগলের মতো হেসেছিলাম। শিকাগোর ধর্ম সহাসভায় স্বামীজির যোগ দেওয়ার ছাড়পত্র মিলে যাওয়ায়— আনন্দে আমি প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রত্যুষ : স্বামীজি সেদিন আপনাকে 'মা' বলে সম্বোধন করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন।

স্যানবর্ন : হ্যাঁ, বলেছিলেন— ভারতে 'মা' সম্বোধনটি সবচেয়ে সম্মানের। হাঃ, মাই গ্রেট মাস্টার। শোন, সারাজীবন লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে স্বামীজি যে কঠোর সংগ্রাম করেছেন— এটাই তোমাদের জন্য শিক্ষা। (দরজায় টোকা) আমি চললাম। (চলে যান স্যানবর্ন। অদ্ভুত দর্শন দুজন লোক ঢোকে)

লোক ১ : শ্রীঘর থেকে জামিন পেয়ে ডুব মেরে আছিস কেন রে? শরীলে তেল হয়েছে বুঝি? এ্যাই ডিব্বা— চ্যাংড়া পুঁটিটা যে পাখনা নাড়ছে নারে— নিশ্চয় গড়বড় আছে।

লোক ২ : প্রত্যুষ— সোনা বাবা। তোমার মুখে কি কেউ তালা মেরে দিয়েছে? দাদা রেগে গেলে কি হতে পারে জানতো মনা—

লোক ১ : ওই শালা — ভ্যাল ভ্যাল করে মরা মাছের মতো তাকাচ্ছিস কী? ঘরে আরামে দিন কাটাচ্ছে— ওদিকে আমার কাজগুলো করে কে?

লোক ২ : প্রত্যুষ গুন্ডা— চারদিকে শালা 'খতরনাক' বলে নাম ফাটছিল— হঠাৎ তুই এমন করে নিজেই কেটে গেলি কেন রে সোনা?

লোক ১ : এ্যাই, চুপ মেরে থাকবি না। পকেটে কিন্তু ছোটো খোকাটা আছে— বের করব?

প্রত্যুষ : আমাকে ছেড়ে দাও দাদা।

লোক ১ : বলিস কী রে? তুই আমার পাগলা ঘোড়া— নিগোসিয়েশন থেকে শুরু করে ড্রাগস বিক্রি— তুই আমার লাকি নাম্বার— তোকে ফুঁকে দেবো— এ্যাই ডিব্বা কী বলেরে?

লোক ২ : ভালোয় ভালোয় ডিউটিতে লেগে যা, নয়তো মরবি রে—

লোক ১ : হই তোর এখানে নাকি একটা পাখি আসে। আজকাল ওইটার পাল্লায় পড়েছিস্?

লোক ২ : পাখির সঙ্গে উড়বি আকাশে?

লোক ১ : এর আগেই শালা হাত পা খু লে পাখিটার কাছে পার্সেল করে দেব — (প্রত্যুষ যেন ভয় পায়)

লোক ২ : আরে দাদা তোর সঙ্গে মজা করছে রে। চল ডিউটিতে (মঞ্চের সামনে দেখা যায় বানরের ভয়ে ছুটছেন স্বামীজি। বানরগুলি পিছন পিছন ছুটছে। এমন সময় একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আসেন)।

বৃদ্ধ : থামো (স্বামীজি থামেন)

বিবেকানন্দ : দেখছেন না। ওই বানরগুলি আমার পিছু নিয়েছে। (আবার দৌড়ান)।

বৃদ্ধ : থামো তুমি? দৌড়াচ্ছ কেন?

বিবেকানন্দ : আপনি জানেন না — ওগুলো ভয়ংকর হিংস্র।

বৃদ্ধ : বানরের ভয়ে পালাচ্ছ?

বিবেকানন্দ : না পালালে তো রক্ষে নেই।

বৃদ্ধ : ভুল। বানারগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াও—

বিবেকানন্দ : কী বলছেন সন্ন্যাসী?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ, সাহস নিয়ে দাঁড়াও মুখোমুখি

বিবেকানন্দ : কিন্তু বানরগুলো যদি

বৃদ্ধ : যা বলছি শোন। সাহস সঞ্চয় করে মুখোমুখি দাঁড়াও— (স্বামীজি বুখে দাঁড়াতেই বানরগুলো পালায়) বিঘ্ন বা বিপদ দেখে কখনো পালিয়ে যাবে না। নির্ভয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াও। দেখবে ঐ বানরগুলোর মতো তারাও পালিয়ে যাবে। (বেরিয়ে যান। প্রত্যুষের উপর আলো)

লোক ২ : প্রত্যুষ— চোখ বন্ধ করে ধ্যান করছিস রে? (প্রত্যুষ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়) পালাবি না বলছি— দাদা কিন্তু কলজেটা এঁফোড় ওফোঁড় করে দেব রে।

প্রত্যুষ : না, পালাচ্ছি না। মুখোমুখি দাঁড়াব এবার।

লোক ২ : এ্যাই— কী— কী— ব- ব- বলছিস এসব

প্রত্যুষ : যা বলছি কান খুলে শোন— আমি তোমাদের গ্যাং-এ কাজ করছি না—

লোক ২ : এটা কোন ধরনের ক্লাসিক্যাল শয়তানিরে?

প্রত্যুষ : আমি তোমাদের সঙ্গে নেই।

লোক ১ : শালা— গ্যাং থেকে বেরনোর পরিণাম জানিসতো

প্রত্যুষ : সব জানি। তোমরা যা খুশি কর। কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে আর নেই।

লোক ১ : ঠিক আছে। এ্যাই ডিব্বা— চল। শালাকে মজা দেখাচ্ছি। চব্বিশ ঘন্টা সময় পাচ্ছিস— এর পর তোর মা-ও তোকে চিনবে না— বলে গেলাম শালা। (ওরা চলে যায়। পিছ ন থেকে বিবেকানন্দ এসে দাঁড়ান। প্রত্যুষের কাঁধে

হাত দিয়ে ওকে সাহস যোগান)

( দৃশ্যান্তর )

অভি ১ : চব্বিশ ঘন্টা সময় দিচ্ছে গ্যাং লিডার—

অভি ২ : কিন্তু, প্রত্যুষ নির্বিকার— কোন ভয় তাকে আর স্পর্শ করতে পারছে না—

অভি ৩ : অপ্রতিহত এক শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করছে প্রত্যুষ নিজের ভিতর—

অভিনেত্রী ১ : এদিকে, পরের দিন সকাল থেকেই ঘটে গেছে আরেক কান্ড।

( দৃশ্য - ৯ )

(মন্দিরার ঘর। সারা ঘরে ছড়িয়ে বন্ধুরা। শুধু মন্দিরা আর প্রত্যুষ নেই। উদ্বিগ্ন সবাই )

মামা : (ফোনে কথা বলছে) হ্যাঁ, হ্যালো সুরজিৎ, ছেলেটার নাম প্রত্যুষ কর্মকার। হ্যাঁ জানি, তোদের খাতায় ও দাগি অ্যান্টি সোশ্যাল। কিন্তু ছেলেটি নর্মাল লাইফে ফিরতে চাইছে। কী? ওসব বোগাস্? না শোন, তুনা মানে মন্দিরা— আমার ভাগ্নি— শি মোটিভেটেড হিম। আজ সকাল থেকে বুঝলি, দুজনের কোন ট্রেস নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ— গত রাতেই গ্যাংম্যানরা চব্বিশ ঘন্টার সময় দিয়ে গেছে। কী বলছিস? অ্যান্টিসোশ্যালদের বিশ্বাস নেই।

মা : ওই ফোনের কথাটা বল—

মামা : আর শোন, ল্যান্ড ফোনে বারবারই একটা ফোন আসছে— কিন্তু লাইন কেটে যাচ্ছে। ঠিক আছে ভাই, তুই থানাগুলোতে একটু ইনফর্ম কর। কোন খবর পেলেই জানাবি, প্লিজ।। ওকে রাখছি।

মা : ফোনে যে দুজনকে পাওয়া যাচ্ছে না— সেটা বলেছ?

মামা : হুঁ— সুরজিৎ এ ব্যাপারটাতেই রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে।

শুভ : একটা ক্রিমিন্যালের সঙ্গে মন্দিরাকে ওভাবে মিশতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।

বিপ্র : আন্ডার ওয়ার্ল্ডের এলিমেন্টদের কে বিশ্বাস করে?

শ্বেতা : মন্দিরা আমাদের বলল, তাড়াতাড়ি চলে আয়— বড় মামা দারুণ আড্ডাবাজ— সবাই মিলে আড্ডা দেবে। অথচ—

মা : প্রত্যুষকে তার গ্যাংমাস্টাররা চব্বিশ ঘন্টা সময় দিয়েছে— এই খবরটা পেয়েই সাতসকালে মেয়েটা ছুটেছে ওর বাড়ি— তারপর থেকেই—

শুভ : আরে আন্ডার ওয়ার্ল্ড থেকে বেরোনো কী এত সোজা! লাশ ফেলে দেবে না।

তপা : শুভ তুই চুপ কর।

মামা : তোমরা খুব নেগেটিভলি ভাবছ। বুড়ি, শিলংয়ে প্রদীপকে খবরটা দেওয়া উচিত।

মা : না দাদা, ও নিজেকে সামলাতে পারবে না। (কেঁদে ফেলে)

মেয়েরা : আন্টি— কেঁদো না আন্টি —
মা : আমি জানি তুনা কোন খারাপ কাজ করতে পারে না— ওর ভিতরে বিবেকানন্দ আছেন। কিন্তু অন্যরা যদি— (ডোর বেল বাজে)
মামা : তুই দাঁড়া, আমি দেখছি। (মন্দিরা প্রত্যুষকে নিয়ে ঢোকে) কোথায় ছিলি তোরা? আমরা যে এদিকে—
মা : তুনা— কি হয়েছে — কোথায় ছিলি সারাদিন?
মন্দিরা : আমি প্রত্যুষকে নিয়ে একটা কাজে গিয়েছিলাম।
মামা : মোবাইলটা কী করতে সঙ্গে রেখেছো?
মন্দিরা : আমার মোবাইলে ব্যালেন্স নেই। প্রতুষের পুরোণো সিম সব ফেলে দিয়েছি— নতুন সিম নেওয়া হয়নি ।
শ্বেতা : আমাদের আসতে বলে তুই নিজেই বেপাত্তা— ?
মা : ছি - ছি থানা পুলিশ পর্যন্ত জানাজানি হয়েছে?
মন্দিরা : কী বলছো — কী? থানায় জানিয়েছ?
মামা : না মানে— আমার ঐ যে বন্ধু সুরজিৎ দাস— এস পি। আই ইনফরমড হিম ভেরি ইনফরম্যালি
মন্দিরা : আমার কি এমন দেরি হয়নি কোনদিন মা?
শুভ : কিন্তু এখন সিচুয়েশনটা অন্য রকম। ইউ ওয়ার আউট অব ট্রেস উইথ অ্যা— উইথ অ্যা—
প্রত্যুষ : আন্টি শোশ্যাল। সরি— আমার জন্যই এতসব। আসলে মন্দিরা আমাকে ডিসটান্স এডুকেশনে বি এ ক্লাসে ভর্তি করাতে গিয়েছিল—
বন্ধুরা : মন্দিরা—
প্রত্যুষ : সুন্দর জীবনটাকে আমিই তো হাতে ধরে নষ্ট করেছি।
শ্বেতা : চোখের সামনে দেখছিলাম— বখাটে হয়ে যাচ্ছে একটা বন্ধু। কিন্তু আমাদের কিচ্ছু করার ছিল না।
দীপা : আমি একদিন তোকে বলেছিলাম— কী করছিল এসব? উত্তরে তুই বলেছিলি—
প্রত্যুষ : মাস্তানি ইজ মাই প্যাশন (সবাই হাসি) সত্যি কীভাবে অধঃপাতে নেমেছি। এখন যখন উপরে উঠতে চাইছি।— পারছি না। বাধার পর বাধা (কাঁদতে থাকে)
মা : প্রত্যুষ— বাবা, চোখের জল ফেলবে না। তুমি যদি মনের থেকে চাও ভালো হতে, তবে কোনো শক্তিই তোমার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না।
প্রত্যুষ : জানি মাসিমা— তবু
মা : তোমার ভেতরের যন্ত্রণাটা বুঝতে পারি— বিবেকানন্দকে স্মরণ করো। তাঁর জীবন আর বাণীর অমৃত ধারায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করো—

মামা : স্বামীজি আর রবীন্দ্রনাথ দু'জনে হাত ধরাধরি করে আমাদের যে কোনো দুর্যোগ পার করে দিতে পারেন।

মা : এই গুমোট আর ভালো লাগছে না। ধর দেখি গান—

(মা গান ধরেন) প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।।
আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে প্রভু ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান ।।
(রবীন্দ্র সঙ্গীত)

মামা : ঠিক এখনই বিবেকানন্দের দুটো লাইন শোনা দরকার— (অন্য আলোতে)

বিবেকানন্দ : হে বীর হৃদয় যুবকবৃন্দ/ তোমরা বিশ্বাস কর / যে তোমরা বড় বড় কাজ করবার জন্য জন্মেছো / কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না / খাড়া হয়ে ওঠো / ওঠো / কাজ কর /

দীপ : স্বামীজির এই আহ্বান তো আমাদের জন্যই।

সবাই : হ্যাঁ, আমাদের জন্যে।

মন্দিরা : শোন, ভবিষ্যতে যে যেখানে থাকবো, মানুষের জন্য কিছু আমরা করব। বিবেকানন্দের স্বপ্ন এতটুকু হলেও সার্থক করব আমরা।

সবাই : হ্যাঁ, করবো।

মামা : তোমাদের এই অভিযানে আমিও কিন্তু আছি।

মা : আমাকে নেবে না তোমাদের সঙ্গে?

সবাই : একশোবার ( আলো নেভে )

**( দৃশ্যান্তর )**

অভি ১ : এই সন্ধ্যার পর তর তর করে কেটে গেল পাঁচটি বছর।

অভি ২ : মন্দিরাদের সিটি সেন্টারের স্ট্যান্ডিং কর্ণারের দলটি পড়াশুনার পাট চুকিয়ে ছিটকে পড়ল জীবন সংগ্রামে।

অভি ৩ : বিপ্র দিল্লিতে, তপা কোলকাতায়, শ্বেতা আমেদাবাদে। মন্দিরা ব্যাঙ্গালুরু, শুভ নিউজার্সি, দীপ আর প্রত্যুষ আগরতলায়।

অভি ৪ : হঠাৎ একদিন সকালে একটি সংবাদে চোখ আটকে গেল প্রত্যুষের।

**( দৃশ্য - ১০ )**

**( প্রত্যুষের হাতে নিউজ পেপার। মঞ্চ ফাঁকা। শুধু পেছনে একটি উঁচু বেদি। মঞ্চে প্রথমে মোবাইলে কথা বলতে বলতে ঢোকে প্রত্যুষ। পরে একে একে অন্যরা )**

প্রত্যুষ : হ্যালো— হ্যালো মন্দিরা (অন্য উইং দিয়ে মন্দিরা ঢোকে)

মন্দিরা : হ্যালো— ভেরি গুডমর্নিং ইয়ার

প্রত্যুষ : শোনো— একটা বিশেষ প্রয়োজনে—

মন্দিরা : আগে বল— তোর প্রাইভেট স্কুলের চাকরি কেমন চলছে?

প্রত্যুষ : খুব ভালো। শোন, যে জন্যে ফোন করেছি। এখানকার একটি পাহাড়ি গ্রামের বারো বছরের উপজাতি মেয়ে রূপমালা— ওর লিভার ক্যান্সার— এখানে মৃত্যুর জন্যে দিন গুনছে— ওর বাবা সবার সাহায্য চেয়েছেন— আমরা কিছু করতে পারিনা?

মন্দিরা : অবশ্যই। আমি এক্ষুনি বড় মামাকে ফোন করে লিভার ক্যান্সারের চিকিৎসা কোথায় ভালো হয় খোঁজ নিচ্ছি। আমি তোকে ফোন করছি, তুই অন্যদের সাথে যোগাযোগ কর। (মোবাইল নাম্বার টাইপ করে মামা ঢোকেন। ওদের মধ্যে কথা হয়— কিন্তু শোনা যায় না)

প্রত্যুষ : হ্যালো দীপ— শোন—

দীপ : হ্যাঁ, বল— (কথা শোনা যায় না, দীপ ডায়েল করে অন্য একজনকে। শ্বেতা প্রবেশ করে) হ্যালো শ্বেতা এখানকার একটি মেয়ে রূপমালা—

শ্বেতা : হ্যাঁ রূপমালা— কী হয়েছে বল (আর শোনা যায় না)

মামা হ্যালো তুনা শোন

মন্দিরা : বল

মামা : দেশের মধ্যে লিভার ক্যান্সারের সবচেয়ে ভলো চিকিৎসা হয় হায়দ্রাবাদে।

মন্দিরা : আচ্ছা—

মামা : আমার এক বন্ধু আছে হায়দ্রাবাদে— সাইন্টিস্ট— ত্রিপুরারই ছেলে— ও ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছে। তুই তাড়াতাড়ি মেয়েটির চিকিৎসার যাবতীয় কাগজ আমার বন্ধুটির কাছে মেইল কর। ওর মেইল এড্রেস আমি তোকে এস এম এস করছি।

শ্বেতা : হ্যালো বিপ্র, শোন রূপমালা নামে একটি ছোট্ট মেয়ে —
সারা মঞ্চে মন্দিরার বন্ধুরা মোবাইলে কথা বলছে, শুধু শোনা যায় কয়েকটি শব্দ। রূপমালা, লিভার ক্যান্সার, হায়দ্রাবাদ, আমি টাকা পাঠাচ্ছি। মিউজিক ছাপিয়ে মোবাইলের নানা রকম রিংটোন। আলো নেভে)

---

লেখক : **সঞ্জয় কর,** রাজ্যের বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট্য পরিচালক ও নাটককার।

# বাঘা যতীন এখনও বেঁচে

গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট

দৃশ্য : ১

নাতি : ছাদটা জ্যোৎস্নায় একেবারে থৈ থৈ করছে তাই না দাদান! আর দেখ, চাঁদটা কত ব্রাইট!

দাদু : এরচেয়েও ব্রাইট ছিল বাঘাযতীন এর চোখ

নাতি : তুমি এ কথাটাই লিখেছো তোমার বইতে?

দাদু : হ্যা দাদুভাই লিখেছি। লিখেছি তার সৌন্দর্যের কাছে চাঁদও লজ্জা পাবে।

নাতি : আর কি কি লিখেছ?

দাদু : ওর মতো বীর, ওর মতো মেধা, ওর মতো সংগঠক, ওর মত দেশপ্রেমিক, আর দ্বিতীয়টি নেই।

নাতি : তাহলে ওর কথা সবাই জানে না কেন?

দাদু : জানতে দেওয়া হয় না। জানলেই যে বিপদ। কিন্তু মনে রেখো দাদুভাই, না জানাটা আমাদেরই লজ্জার, গভীর লজ্জার, আমাদের বিপদ আসবে ওকে না জানলে-

নাতি : কি বিপদ?

দাদু : বা আরেকটু বড় হলে বুঝিয়ে দেবো দাদুভাই

নাতি : বাবা যে বলে এইসব বিপ্লবী টিপ্লবীর কথা ভেবে ভেবে তোর দাদানের মাথাটা গেছে।

দাদু : ও তো বলবেই! বন্ধক দেওয়া মাথারা সবাই এরকমই ভাবে।

নাতি : বন্ধক দেওয়া মাথা কি দাদান?

দাদু : আরেকটু বড় হলে বুঝবে তুমি-

নাতি : আমি তাড়াতাড়ি বড় হতে চাই দাদান

দাদু : বাঘা যতীন এর গল্প শুনলে তুমি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাবে..

নাতি : তাহলে বলো প্লিজ।

দাদু : সে তো অনেক বড় গল্প তোর যে ঘুম এসে যাবে

নাতি : দাদান দেখো- দেখো আমার চোখ,- দেখছো? ঘুম আছে?!!!

দাদু : না জ্বলছে।

নাতি : জ্বলছে?

দাদু : বাঘা যতীন এর মতো। দাদুভাই দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসছে তুমি শুনতে

পাচ্ছ?

বুবুন : হ্যা দাদা। একটা ঘোড়া ... একটা ক্ষেপে যাওয়া ঘোড়া ... বাতাসের বেগে এগিয়ে আসছে... ,

দাদু : তছনছ করে দিচ্ছে সব। সবাই পালাচ্ছে। eighteenth - century এর নয়ের দশক। কৃষ্ণনগরের একটা ঘোড়া আস্তাবলের দড়ি উপরে শহরকে বিদ্ধ করে, সব তছনছ করে দিচ্ছে। ভয়ার্ত জনগণ চিৎকার করছে আর খুঁজছে বাঁচবার আশ্রয়। সবাই পালাচ্ছে ফ্যাকাশে তাদের মুখ, গলা শুকিয়ে কাঠ।

### দৃশ্য : ২

(ত্রস্ত মানুষের হল্লা। কৃষ্ণনগর বাজার। ছুটছে পাগলা ঘোড়া।)

-। : সবাই ছুটছে কেন?

-। : ওরে পাগলা, পাগলা ঘোড়া-

-। : দোকান বন্ধ কর রে পটকা।

-। : রাস্তার মাঝে যাসনেরে কেউ; মরবি!

-। : একেবারে টেনে নিয়ে যাবে-

-। : পিশে মারবো!!

-। : এই যে ভাই মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন মরতে চাও?

-। : ওরে ছোড়া সরে দাঁড়া। বায়ুর বেগে ধেয়ে আসছে পাগলা গোড়া। এ ফাজলামির বিষয় নয়। পিশে ধুলো বানিয়ে ছেড়ে দেবে পলকে,

-। : এই ভাই তুমি পাগল নাকি? সরে দাঁড়াও ! মরতে চাও?

বাঘা : মরতে নয়, মারতে চাই।
(ঘোড়া এগিয়ে আসে। লাফ দিয়ে তার ঘাড়ে চেপে যায় যতীন। ঘোড়া তাকে নিয়েই দৌড়োয় খানিকক্ষণ। তারপর ধস্তাধস্তি বেঁধে যায়।)

-। : ওরে ওটা কেরে? কত বড় পাগলা?

-। : তুমি পাগলামোটা দেখলে, আর সাহসটা ?? ও আমাদের যতীন। বসন্তবাবুর ভাগ্নে।

-। : কোন বসন্ত?

-। : আরে আরে উকিলবাবু..

-। : ও চাটুয্যে বাড়ির ছেলে!! ঠিক ধরেছি! রক্তের ধারা বাবা...

-। : কি হলো রে, ছেলেটার?

-। : কাবু করে ফেলেছে।

-। : ছেলেটা বেঁচে আছে তো?

-। : ছো: !! বল, ঘোড়াটা বেঁচে আছে কিনা?

-। : বলিস কী!!

-। : ঘোড়াকে জব্দ করে, পুষ্যি বানিয়ে এখন জল খাওয়াচ্ছে, ওস্তাদ ছেলে বটে !!

-। : এত জটলা কিসের ??

-। : সবাই একেবারে ধন্যি ধন্যি করতে লেগেছে গো।

**দৃশ্য : ৩**

মা : ডালটা চুমুক দিয়ে খেলে ফেল বাবা।

বাঘা : আগে বড়িগুলো খাই

মা : হ্যাঁরে হরি বলছিল , তুই নাকি আজ বাজারে ঘোড়া ধরেছিস।

বাঘা : পাগলা ঘোড়া।

মা : পারলি?

বাঘা : তা পারবো না, কাউকে না কাউকে তো পারতেই হবে!

মা : বাবা আমার, তুই পারবি তোকে তো আর আতুপুতু করে মানুষ করিনি।

বাঘা : হরি কাকা বলে, তোর মা'র কেমন ধারা বুঝিনা! ছেলেকে বর্ষার ভরা গড়াইয়ের স্রোতে ছেড়ে দিয়ে বলতো, সাঁতরে চলে আয়!

বাঘা : তুমি আমায় ছেড়ে দিতে মা?

মা : দিতাম তো, যে দেখতো সেই বলতো, - বউ অতটুকু ছেলে , নদীর এমন টান.. আমি জানতাম তুমি ঠিক পারবি! স্রোতের টান কেটে আমার কাছে ঠিক চলে আসবি!

বাঘা : কত বড় সে স্রোত? যে মায়ের চেয়ে বড়? আচ্ছা মা, এই যে সেন্ট্রাল কলেজে এডমিশন নিয়ে কলকাতা চলে যাচ্ছি, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে?

মা : হলে হচ্ছে। তাই বলে কি ছেলে আমার নিজের জীবন গড়বে না? তবে যতু, যাবার আগে একবার ঘুরে আসিস কয়া। বাবার ভিটে, সবাই তোকে দেখতে চায়। পুজোতে যাস। বংশের পুজো বলে কথা। সবাই কত খুশি হবে ...

বাঘা : যাব মা। গড়াই যে আমায় ডাকে।

**দৃশ্য : ৪**

(কুষ্টিয়ার ঘাটে নৌকা ঠেকেছে। কয়া গ্রামের এক কাকা- ভাইপো যতীর সঙ্গী।)

কাকা : দেখে নামো কত্বা! ওদিকটায় কাদা, এদিকটায় এস, এ দিকটায় বালি! জুতো একেবারে ঘাটে গিয়ে পরো। জুত করে পা ধুয়ে।

যতী : সে আমি করছি। তুমি সামলে চলো কাকা। নিজে ঝাপসা দেখছ। ছানি কাটিয়ে

ফিরছ সবে। কাকা আমরা চাষাভূষা মানুষ, আমাদের আবার কাদা ধূলো! তোমরা সাহেব মানুষ!

যতী : না কাকা, সাহেব হতে যাব কেন? আর সাহেবরা কষ্ট করতে পারে না, তোমায়

কে বলল? অকর্মণ্য হলে কি তিন লাখ সাহেব ৩৬ কোটি ভারতবাসীর প্রভু হয়ে বসতে পারত? (একটা বুড়ির বিড় বিড়ানি ভেসে আসে ক্রমশ)

যতী : কি হয়েছে তোর?

বুড়ি : কাঠের বোঝাটা বড্ড ভারী। মাথায় না তুলে দিলে বাপ আমি কি আর পারি? কেউ শুনেও শোনে না এ বুড়ির কথা । তুই দেনা বাপ বোঝাটা তুলে!
(যতীন নিজের মাথাতেই বোঝাটা তুলে নেয়)

বুড়ি : ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, সাহেব আমার গুনাহ হবে। তুমি বইছ কেন?

যতী : তুই আমার সঙ্গে চল। কিছু গুনাহ হবে না আমার পুণ্যি হবে। জোয়ান লোক আরাম করছে, বুড়ি মা'রা খেটে মরছে, দেশের পূণ্য হবে তাতে? তোর বাড়ি কোথায়?
(ওদের আলাপচারিতা ক্রমশ মিলিয়ে যায়)

ভাইপো: ও কাকা! ও কাকা! চলে গেল! কখন ফিরবে? বড্ড বাড়াবাড়ি; একটা মুসলমানের বুড়ির জন্য!

কাকা : বাজে কথা কস না সুবলা, ওরা আছে বলে তো আমরা আছি। ওর মামা কলকাতায় থাকতে দিলে, অপারেশনের টাকা দিলে, তবে না ছানি কাটাতে পারলেম। নইলে আমার সাধ্যি ছিল? ওর তিন মামাই অবতার। কয়া গ্রামের কত মানুষ যে তাদের আশ্রয় পেয়েছে।

ভাইপো: সেকি আমি না কয়েছি ? কিন্তু কুষ্টিয়া ঘাট থেকে কতখানি পথ ভাবোতো-, দুপুর গড়িয়ে সাঁঝ নামছে। কখন ফিরবে সে কথাই তো কই!

জনৈক : আপনারা যতীন মুখুজ্জের জন্য দাঁড়ায়ে আছেন?.. উনি বললেন আপনাদের রওনা হয়ে যেতে। ওনার দেরি হবে।

ভাইপো: বুঝলে কাকা! কি করবে?

কাকা : অগত্যা চল পা চালাই...

**দৃশ্য : ৫**

বঙ্গভঙ্গ। ১৯০৫। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রাখিবন্ধন এর শোভাযাত্রা। ফুটপাত লোকারণ্য। শাঁখ বাজাচ্ছে মেয়েরা। খোল করতাল। এগোচ্ছে শোভাযাত্রা। সমস্বরে গাইছে —
বাংলার মাটি বাংলার জল/বাংলার বায়ু বাংলার ফল/পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য

হউক হে ভগবান।
(এ সংগীত ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়ার পর ..)

ললিত : ঘুমোবি না দাদা ? তুই নাকি কৃষ্ণনগরের বাড়িতে আগেই ঘুমোতিস। বাবা বলে, যতীনের এত রাত জাগা ঠিক নয়।

যতীন : ডাক্তাররা ওরকম বলে থাকে, শোনে কে ?

ললিত : ডাক্তারের কথা না শুনিস, মামার কথা শোন।

যতীন : এই তুই ঘুমোতো.. বাবার সুপুত্র হয়ে ঘুমিয়ে পড়। এই কলকাতায় পড়তে এসে আমার চোখ খুলে গেছে। আজ একটা এত বড় কান্ড ঘটে গেল... তোর ঘুম পাচ্ছে ? ! আমারতো উত্তেজনায় আজ রাতে ঘুম আসবে না।

ললিত : ঠাকুরবাড়ির শোভাযাত্রার কথা বলছিস ! জানিস, ওরা আমাদের সগান মালি কেও রাখি বেধেছে। মুসলমান গাড়োয়ানদেরও নাকি বেধেছে। রবি ঠাকুর কবি হলে কি হবে, সাহস আছে বল ?

যতীন : একটা নতুন যুগ শুরু হয়েছে। আজ তার আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। ললিত তুই জানিস ... আজকে শোভাযাত্রা শুধু ঠাকুরবড়ি ছিল না, এটা সারা বাংলার শোভাযাত্রা। বাংলাদেশের প্রাণ আজ নেচে উঠেছে। এবার ইংরেজ তুমি ঠেলা বুঝবে।

ললিত : এত সস্তা ! ইংরেজদের সঙ্গে লড়াইয়ে পারা মুশকিল !

যতীন : সস্তা মানুষদের মত কথা বলিস না। মানুষ চাইলে পারেনা কী ? আর আমরা তো অন্য কিছু চাইছি না। একটা জাতি স্বাধীনতা চায়। তোমরা কে হে ? সাত সমুদ্র তেরো নদী ছাড়িয়ে প্রভু হতে এসেছ ? প্রভু না নৃশংস লুঠেরার দল। .. ভাই, বইয়ের রেকে কি করছিস ? ? সর ওখান থেকে।

ললিত : এটা আনন্দমঠ ? এটা তোমাদের পড়তে হয় ?

যতীন : শুধু সিলেবাসের জিনিস পড়তে হয় বুঝি ?

ললিত : তুমি কি স্বদেশী ?

যতীন : তুই কি বিদেশী ভাই ? ? এইসব ভাবনার জন্যই তো এই কটা ইংরেজ আমাদের চাকর-বাকর বানিয়ে রেখেছে- কুকুরের মতো ট্রিট করছে।

ললিত: আচ্ছা ওই রবি ঠাকুরেরাও কি স্বদেশী ?

যতীন : স্বদেশী বৈকি ! আজ তো তার গান গাইছিলেন দীনু ঠাকুর।

ললিত : ওরাও চান ইংরেজরা দেশ ছাড়ুক।

যতীন : ওদের বাড়ির অনেকেই চান ।ইংরেজকে দেশছাড়া করার জন্য যত উদ্যোগ তাতে ঠাকুরবাড়ি থেকে চাঁদা যায়। বড় অঙ্কের চাঁদা।

ললিত : তুমি কি করে জানো ?

যতীন : আমি জানিরে। অবিনাশবাবু আর যতীনবাবুরা পালা করে নিয়ে আসেন গগন

ঠাকুরের থেকে। আর সুরেন ঠাকুর হলেন লিংক।

ললিত : লিঙ্ক?

যতীন : তুই বুঝবি না।

ললিত : তোর নাম তো যতীন। তুই যাস ঠুকুরবাড়ি?

যতীন : গাধা আমি বাবু হতে যাব কেন? উনি আরেকজন। যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। দারুণ মানুষ। তুই এবার ঘুমো। (যতীন গান ধরে)
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই/ দীন দুখিনি মা যে তোদের/ এর বেশি আর সাধ্য নাই। ...

**দৃশ্য : ৬**

(রাস্তার স্বাভাবিক হট্টগোলের মাঝেই গান গাইছে সম্মিলিত জনতা। উচ্চকিত হয়ে)
.. ভেঙে ফেল হাতের চুড়ি বঙ্গনারী..
(গান মিলিয়ে গেলে একটা গেট খোলার শব্দ হয়। ভেজানো দরজা খোলার শব্দ। ভেতরে বারীন ঘোষ)

বারীন : এসো

-। : নিয়ে এসেছি বারিন দা।

বারীন : যতীন বোসো।

যতীন : আপনি আমায় চেনেন?

বারীন : তোমার নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পিতার নাম : উমেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মায়ের নাম ইন্দুবালা দেবী। বড় মামা বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণনগরের উকলি, মেজমামা....

যতীন : আশ্চর্য!!

বারীন : আমাদের তো খবর রাখতেই হয়, নইলে এখানে প্রবেশাধিকার মেলেনা। তোমার সম্পর্কে আমি সব খবর নিয়েছি। এবার বল যতীন- দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তুমি কতদূর অগ্রসর হতে পারো?

যতীন : শেষ পর্যন্ত

বারীন : ভেরি নাইস! তুমি এখনই প্রস্তুত?

যতীন : না আমি পুরোপুরি প্রস্তুত নই এখনো।

বারীন : তোমার স্বীকারোক্তি শুনে ভালো লাগলো।

যতীন : আপনি নিশ্চয়ই জানেন পিতার অকাল প্রয়াণের পর আমি, মা, দিদি মামার বাড়িতে আশ্রিত। না সেই অর্থে আমাদের কোন সমস্যা নেই। তবুও মায়ের হাতে নিজের রোজগার তুলে দিতে চাই।

বারীন : এক্সেলেন্ট নিজের মাকে স্বাধীনতার স্বাদ দেওয়ার আকাঙ্খাই দেশমাতৃকার প্রথম নৈবেদ্য হোক। নিজেকে পূর্ণ প্রস্তুত করে এখানে এসো। তখন অনেক কথা জানবার আছে। অনেক কাজ অনেক দায়িত্ব অর্পণ করবার আছে।

যতীন : আসবো।

বারীন : আমি জানি। অরবিন্দ কে চেনো তুমি?

যতীন : চিনি। বন্দেমাতরম পত্রিকার ওপর সরকারি অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে আমরা ছাত্ররাও চিঠি পাঠিয়েছিলাম।

বারীন : গ্রেট! আর যুগান্তর ? পড়?

যতীন : যুগান্তর, নবশক্তি, কর্মযোগিন-- চেস্টা করি পড়বার।

বারীন : অসাধারণ! তুমি চাকরি করতে চাও তাহলে?

যতীন : কিছুদিন আপাতত। স্টেনোগ্রাফার হব। শিখে ফেলেছি। পড়া শেষ না করেই চাকরিতে জয়েন করব। কেননা বেশি সময় নেই। এরপর যাতে আপনাদের কাজে আসতে পারি।

বীরেন : তোমার কিছু চাই? মানে আত্মরক্ষার জন্য?

যতীন : হ্যাঁ।

বারীন : কি চাই যতীন?

যতীন : একটা গীতা।

বীরেন : (মুগ্ধতার হাসি) কাল পেয়ে যাবে।

যতীন : আজ আসি।

বীরেন : এসো, বন্দেমাতরম ।

যতীন : বন্দেমাতরম। (চলে যায়) (একটু পরে...)

বীরেন : ভূপেন বাবু, ভূপেন বাবু- একটা সোনার তাল পেয়ে গেছি!

ভূপেন : স্বদেশী ডাকাতদের এত বড় ভাগ্য? এ তো অবিশ্বাস্য!!

বারীন : এ ডাকাতি করা সোনা নয়। একটা ছেলে ভূপেন। একটা ছেলে!? হ্যাঁ তার নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সবাই বলে বাঘাযতীন।

### দৃশ্য : ৭

বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম একই লক্ষ্যে বাঁধিয়াছি.....

(গান এর রেশ ফুরোতেই....)

বক্তা। আজ আলফ্রেড থিয়েটার হলে দেশের মহান সন্তান বালগঙ্গাধর তিলক এর উপস্থিতিতে শিবাজী উৎসব এর আয়োজন করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রের এই উৎসব বাংলায় এই প্রথম। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উপাচার-অস্ত্র উপাসনা।

পুষ্পাঞ্জলি ও আরাধনার মধ্য দিয়ে কলকাতার এক নব্য যুবক দেশপ্রেমিক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাত দিয়ে- এ কাজের সূচনা হবে- (প্রবল হাততালি)

যতীন : উপস্থিত সবাইকে আমার নমস্কার জানিয়ে একটা কথাই বলবো। শক্তি, একমাত্র শক্তির উপাসনাই পারে দেশটাকে বিশ্বের কাছে মর্যাদাপূর্ণ করে তুলতে। (আবারো প্রবল হাততালি)

বারীন : ব্রেভো।

যতীন : ও আপনি, বারীন বাবু আমি লক্ষ্য করিনি ।

বারীন : আজ কিন্তু টিকটিকিরা সজাগ। ওদের মধ্যে ধীরে ধীরে একটা ভয় সঞ্চারিত হচ্ছে, যেটা আমাদের দরকার। তুমি একে চেনো?

যতীন : না

বারীন : আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হেমচন্দ্র দাস। বেশ কিছুদিন ইউরোপ বাস করে ফিরছেন।

যতীন : ইউরোপ?

বারীন : হ্যাঁ আমাদেরই কাজে। উল্লাসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

যতীন : উল্লাসকে চিনি আমি। আমি ওর ভক্ত।

বারীন : উল্লাসের ভক্ত ?!!

যতীন : উল্লাস কর দত্তের সাহসের।

বারীন : উল্লাসের উৎসাহ আমাকেও মুগ্ধ করে। তোমার হাতের ওই বইটা কি?

যতীন : প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, বিবেকানন্দের।

বারীন : তুমি ওকে চিনতে?

যতীন : হ্যাঁ সিস্টার নিবেদিতা আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

বারীন : বুঝেছি। ওই প্লেগ এর সময় সেবার কাজে তাইতো?

যতীন : হ্যাঁ বারীনদা।

বারীন : মৃত্যুর দিন ফোর্থ জুলাই তুমি বেলুড়ে গিয়েছিলে।

যতীন : আপনার নেটওয়ার্ক আমাকে মুগ্ধ করে

বারীন : তা মুরারিপুকুর আসছ কবে? আজ সময় আছে?

যতীন : আজ কৃষ্ণনগরে যাব। মায়ের শরীর নাকি বেশ খারাপ, খবর এসেছে।

বারীন : তবে তুমি এখানে কেন যতীন?

যতীন : আমাদের যে দুই মা বারীনবাবু। এক মায়ের সেবা করলাম, এবার জন্মদাত্রীর কাছে যাবো (যতীনের প্রস্থান)

**দৃশ্য : ৮**

যতীন : মামিমা আমায় খেতে দাও। আমি কৃষ্ণনগর যাব।

মেজমামা : যতীন শোন, আয় এদিকে আয়। এখানে বোস।

যতীন : কি হয়েছে বল মেজ মামা?

মেজ মামা : তাড়াতাড়ি বলো না, ঘরদোর সব শুনশান কেন?

যতীন : কোথায়?

মেজমামা : কৃষ্ণনগর।

যতীন : মা কি!?

মেজমামা : (হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) বোনটা আমার যাবার এত তাড়া ছিল কেন কে জানে?

যতীন : (চিৎকার করে) আমার ঘোড়া বার কর।

মেজমামা : আমরা সবাই যাব। একসঙ্গে যাই!?

যতীন : তোমরা এসো। আমাকে আলোর বেগে মায়ের কাছে পৌঁছে যেতে হবে। (হ্রেষা ধ্বনি। ঘোড়া দ্রুত থেকে দ্রুততর ছুটতে থাকে।)

**দৃশ্য : ৯**

(ভোলানাথ গিরির আশ্রম)

ভোলানাথ : আয়, আয় বাছা। অনেক দূর থেকে আসছিস?

যতীন : আজ্ঞে কলকাতা।

ভোলানাথ : দুচোখে দুটো সূর্য জ্বলছে রে, অথচ মুখমণ্ডল চন্দ্রের মত সুন্দর। এ স্থানকে কি তুই প্রদীপ্ত করতে এসেছিস? যে কর্মে উদ্দেশ্য থাক না কেন, ইতিহাসের স্থায়ী চিহ্ন রেখে যাবি তুই।

যতীন : আপনার কাছে কোনো কথা লুকাবো না। প্রভু, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে যে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে আমি তার একজন সৈনিক। এখানে এই বেনারসেও গুপ্ত সমিতির একটি শাখা আছে, ওখানেই উঠেছি।

ভোলানাথ : স্বভাবের সঙ্গে কর্ম উদ্যোগের গাঁটছড়া বেঁধে এগিয়ে যা। তুই পারবি, পারতেই হবে।

যতীন : কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর মন যে বড় অস্থির, চঞ্চল।

ভোলানাথ : মৃত্যু বিচ্ছেদ বিরহকে শান্ত মনে গ্রহণ করতে শেখো বৎস। গীতায় বলেছে " সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে' - সেই জ্ঞানে তোমায় পৌঁছতে হবে।

যতীন : আর সংসার মোহ?

ভোলানাথ : স্বধর্ম পালন কর। আত্মার কথা শুনে চল। ইন্দ্রিয় সংযম, আসক্তি ত্যাগ, প্রভৃতি অবশ্যকরণীয়- কিন্তু সেসব ভেতর থেকে ক্রমে ক্রমে আসবে। সেখানে বাছা জবরদস্তি চলে না। কর্মহীন জ্ঞানে থাকিস না। জ্ঞানহীন কর্মেও নয় তবে

ফলের আশায় থাকলে মুক্তি নেই।

যতীন : গুরুদেব আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই, দীক্ষা নিতে চাই।

ভোলানাথ : উষাকালে স্নান সেরে আসিস। আমি প্রসন্ন চিত্তে তোকে আশীর্বাদ করব। এ আমারও পরম সৌভাগ্য!

যতীন : একি বলছেন গুরুদেব?

ভোলানাথ : ঠিকই বলছি। আমি যে দেখতে পাচ্ছি।

যতীন : কি গুরুদেব?

ভোলানাথ : শক্তি, পরাক্রমী দুর্বার শক্তি, ভীষণ শপথ। মায়ের সন্তানেরা মরণপণ করে স্বাধীন করতে চলেছে তাদের মাতৃভূমিকে। তাদের দুচোখের ভেতরে আগুন। তোর চোখের ভেতরে সে শক্তির লীলা আমি দেখতে পাচ্ছিরে যতীন।

**দৃশ্য : ১০**

নরেন : আমরা সবাই ভারী চিন্তিত ছিলাম।
আমার কাছে চিঠি এলো, সুরেশকে দিয়ে খবর পাঠালাম; তবে শান্তি হলো!

বিনোদ : দিদি বোধহয় হপ্তা দুয়েক পর সেদিন ঘুমুলেন।

যতীন : এদিককার খবর কি? পুণা বম্বেতে তো অনেক কাজ হচ্ছে। আমরা কি করছি এখানে?? এখনো বলবার মতো কোনো বড় একশন.. উহ: হচ্ছে না!

নরেন : প্রফুল্লের খবরটা শুনেছো ?

যতীন : প্রফুল্ল চক্রবর্তী? কী হয়েছে তার?

নরেন : সে আর নেই। উল্লাস ভাগ্য জোরে বেঁচেছে। স্প্রিন্টার ছিটকে এসে জখম হয়েছে। কিন্তু বেঁচে আছে। প্রফুল্লের হাতের উপর ফাটল। তাই ও নেই।

যতীন : উফ্ একটা প্রাণ শুধু শুধু নষ্ট হল। কিংসফোর্ডের মতো কাউকে সঙ্গো নিয়ে যেতে পারতো যদি তবে দু:খ থাকত না।

নরেন : তার প্রস্তুতি চলছে, আস্তানায় গেলে সব খবর পাবে। কবে যাবে?

যতীন : যাব।

নরেন : আজ উঠি। একটু বিশ্রাম নাও তুমি।

(নরেন চলে যায়)

যতীন : দিদি ওখানে দাঁড়িয়ে যে... কিছু বলবে?

বিনোদ : এবার তোমাকে বিয়ে করতে হবে যতীন। সে তুমি যেখানে যত ইচ্ছে দীক্ষে নাও। বড় মামি মেয়ে দেখেছে। মিষ্টি নামখানা সে পোড়ারমুখীর।

যতীন : কি নাম?

বিনোদ : তুমি রাজি ভাই ? তার নাম ইন্দুবালা!

যতীন : তোমরা আমার আপনার জন। তোমরা চাইলে আমি রাজি।
বিনোদ : আহা কি আনন্দ!! কি আনন্দ! ইন্দুবালা- যতীন,
যতীন : ইন্দুবালা ...

(সানাই বেজে ওঠে ...)

## দৃশ্য : ১১

( ট্রেন থামলো। শিলিগুড়ি স্টেশন )

বুড়ি মা : বাবা তুমি কি এই স্টেশনে নেমে যাবে যতীন। কেন, কিছু বলবেন?
বুড়িমা : বড় তেস্টা পেয়েছিল একটু জল আনতে বলতাম, তুমি যাও বাবা।
যতীন : দিন না, আমি একছুট্টে নিয়ে আসব। আরে দিন দিন-- ছেলের কাছে এত লজ্জা কিসের?
বুড়িমা : সোনার টুকরো ছেলে গো তুমি...!
(যতীন নামে। স্টেশনের কোলাহল।সাহেবের সঙ্গে ধাক্কা।)
সাহেব : ড্যাম ইট
যতীন : আই এম সরি (জল ভরে বিদ্যুৎবেগে ফেরে)- এই নিন মাসিমা! জানলা থেকে নিয়ে নিন, ট্রেন ছেড়ে দেবে।
(সাহেব তখনও বিড়বিড় করতে থাকে)
Sorry? What sorry? You ruscle
যতীন : Excuse me! It's my mistake
সাহেব : You native uncivilized....
যতীন : সাহেব। Now you are crossing your limit
সাহেব : Oh really? Are you threatening me? Ruscle, how dare you!!
(যতীন এর ধৈর্য ভেঙে যায়। সটান সাহেবকে তুলে আছাড় দেয়। জনা আটেক মিলিটালি রে রে করে তেড়ে আসে।)
মিলিটারি : থামুন। Stop it.. Arrest him .. তার আগে ওকে ধোলাই লাগবো!!
(বাঘাযতীন এর সঙ্গে এবার ধস্তাধস্তি বেঁধে যায়। বাঘাযতীন ভয়ঙ্কর জখম হয়েও আটজন পুলিশকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে।)
মিলিটারি : ও গড। ড্যাম ইট।
যতীন : Now remember your God!!
(ধীরে ধীরে কোলাহল থামে। স্টেশন মাস্টার এর ঘরে)
স্টে. মাস্টার : আপনার নাম?

যতীন : যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

স্টে. মাস্টার : আপনি আমার আটজন পুলিশকে জখম করে দিয়েছেন।

যতীন : ওরা আটজন একজনের সঙ্গে পেরে উঠলো না, - আমার কি করবার আছে?

স্টে. মাস্টার : বাহ দারুণ!! তাই আপনি কি করেন?

যতীন : আমি বেঙ্গাল গভর্ণমেন্ট এর সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের স্টেনোগ্রাফার। সরকারি কাজে দার্জিলিং যাচ্ছি।

স্টে. মাস্টার : Oh I see! Write down your name and address here তা আপনি একা হাতে কজন কে শায়েস্তা করতে পারেন?

যতীন : ভাল মানুষ হলে একজনও না। তবে মানুষ মন্দ হলে যত খুশি।

## দৃশ্য : ১২

(দার্জিলিঙে বাঘা যতীনের কোয়ার্টার)

ইন্দু : পিয়ন চিঠি দিল। দেখ। আসছি বাবা... ভালো নাম রেখেছো তেজেন্দ্র। কান্নার তেজ দেখেছ?

যতীন : চিঠি! সুরেশের চিঠি...
(চিঠি পড়তে শুরু করে)
দাদা, মুরারী পুকুর এ পুলিশ আচমকা হানা। সবাই গ্রেফতার হয়ে গেছে। বীরেন দা থেকে অরবিন্দ পর্যন্ত, - সবাই গ্রেপ্তার! আমরা একেবারে অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছি। আর তুমি এই বিপদের সময় দার্জিলিঙে!! মোজাফফরপুর পৌঁছে বিপ্লবীরা কিংসফোর্ডকে খতম করতে পারে, এটা হয়তো ইংরেজ সরকারের কাছে অভাবনীয় ছিল। এবার ওরা কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে। কয়েকজনের না ফাঁসি হয়ে যায়! পি মিত্র, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় সবাই তোমার কথা বলছেন দাদা! তোমাকে চিঠি লিখতে বললেন সিস্টার নিবেদিতা। আমাদের অনুরোধ রক্ষা করো। আমরা এবার তোমার নির্দেশে চলতে চাই। তোমরা উত্তরের অপেক্ষায় সুরেশ-বীরেন এবং নরেন বন্দেমাতরম।

যতীন : মা তুই এই চাস তো? দেব আমি পরীক্ষা। আমি জিতব মা। কেননা আমি মরতে ভয় পাইনা!

## দৃশ্য : ১৩

(ট্রিগার সাহেব ও অধ:স্তন পুলিশ অফিসার। অফিসের বেল বাজে)

ট্রেগার : মিস্টার বিশ্বাসকে আসতে বলুন।

বিশ্বাস : May I come in Sir?

ট্রেগার : Yes ! be seated.. what I want to know Mr. Biswas.. Muraripukur Conspiracy Case এ total কতজনকে ঢোকানো গেছে?

বিশ্বাস : Nearly 60 Sir

ট্রেগার : অরবিন্দ বারীন উল্লাসকর,- আমি চাই এদের big caseএ দাও। বিপিনচন্দ্র পাল, The lawyer... is Bipin Pal also a Terrorist~

বিশ্বাস : He is not supposedly Terrorist
He is an extremist belongs to Congress.. ওকে নিয়েই ভয়।

ট্রেগার : Let's deal it carefully.. আর তোমাদের monk ভিভেকানন্দ, সিস্টার- I don't believe them ... এদের কাছে তো ওদের বুকস। Geeta also! Anyway আমার একজন রাজসাক্ষী চাই। At any cost! Without this we could not reach our goal ...

বিশ্বাস : একজন রাজি হয়েছে স্যার।

ট্রেগার : Is it !! Wonderful!! ও যা চাইছে দাও। Well done Mr. Biswas Well-done !!!

### দৃশ্য : ১৪

(একটি কক্ষে বাঘা যতীনের সঙ্গো বীরেন, সুরেশ এবং নরেন)

যতীন : আমাদের লক্ষ্য স্থির হয়েছে। মোটামুটি ভাবে প্ল্যান ও রেডি। এবার এক্সিকিউশন। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা মানিকতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ওরা যুগান্তরের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, সেটা ভুল প্রমাণ করতে হবে। কাজ করতে গেলে টাকার দরকার, তাই আমাদের কয়েকটা ডাকাতির মধ্যে যেতে হবে। But mind it, we should not forget our Mission, ethics and morality ... ইংরেজদের ব্যবসা আমাদের লক্ষ্য। জনগণের টাকা জনগণের জন্য ছিনিয়ে, আমরা জনগণের জন্য ব্যবহার করব। বাধা-বিপত্তি এলে বিপ্লবীরা মারতে এবং মরতে প্রস্তুত থাকে একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু নারী শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা যেন অসম্মানিত না হয়, খেয়াল রাখতে হবে। তোমরা রাজি?

সবাই : রাজি।

যতীন : অর্থ সংস্থানের কেন্দ্রস্থলগুলি আমি ভেবে ফেলেছি। ম্যাপও রেডি। অপসন এবিসি ধরে কাজ করতে হবে। ঠিক আছে?

সবাই : ঠিক আছে।

যতীন : এরমধ্যেই অমাদের প্রথম অ্যাকশন শুরু হবে। তোমরা জানো, বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী স্টেশনে নিজের ওপর গুলি কেন চাপিয়েছিলেন?

সবাই : জানি।

যতীন : নন্দলাল দারোগা ওকে ধরতে গেলে, প্রফুল্ল অভিমানভরা গলায় বলেছিল আপনি বাঙ্গালী কে ধরিয়ে দেবেন!?.. দেশে ভুরি ভুরি ইংরেজদের দালাল না থাকলে কি বঙ্গাজননীর এমন দুরবস্থা হতো! আমরা নন্দলাল কে রক্তাক্ত করে প্রফুল্লর বিদেহী আত্মাকে অর্ঘ্য পাঠাব। সবাই রাজি? (বন্দেমাতরম, বন্দেমাতরম ধ্বনি)

**দৃশ্য : ১৫**

(কয়েকটা বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ। ভয়ার্ত চিৎকার। লুণ্ঠনের পরের উল্লাস। আবার একটা গুলি। আরেকটা।) জনৈক বিপ্লবী। ওরে দেখে যা তোরা, তোদের নন্দের কি হলো রে?? (দৌড়ানোর শব্দ, খানিক্ষণ পর ...)

জনৈক : দাদা মিশন সাকসেসফুল। দোরগোড়ায় ফেলে মেরেছি। আর ঘরে ঢুকে বলে এসেছি তোমাদের নন্দের দশা দেখে যাও।

যতীন : গ্রেট! উল্লাস সত্যেনের নরেন গোস্বামী কে দৌড় করিয়ে মারা, আর তোর ঠিক সময়ে, ঠিক জায়গায় গুলি চালানো... আমাকে শান্তি দিচ্ছো।

জনৈক : নরেন কে মেরে ফেলেছে? কি শান্তি! কি করে??

যতীন : ওসব চন্দননগর লাইনের কাজ। ওরা সজাগ অনেকদিন। ওরা পিস্তল পাঠিয়েছে। শোন, আজ হ্যারিসন রোডের সন্ধ্যের আড্ডা চলতে চলতে যদি দেখিস আমি হঠাৎ উঠে যাচ্ছি, তাহলে কিছুক্ষণ থেকে তোরাও উঠে চলে আসবি শিয়ালদার দু'নম্বর এ।

জনৈক : এরকম ফলো করছে?

যতীন : সেটাই স্বাভাবিক। নরেন গোস্বামী ছিল তুরুপের তাস। ওদের হেফাজতে থাকা নরেন কে দৌড়িয়ে মেরেছি আমরা। - ওরা একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে।

জনৈক : ঠিক আছে দাদা।

যতীন : সকাল থেকে তুই কিছু খেয়েছিস?

জনৈক : আজ প্রফুল্লর জন্য নন্দলাল কে খেয়েছি। পেট মন দুই ভরে আছে দাদা।

যতীন : বন্দেমাতরম

জনৈক : বন্দেমাতরম।

**দৃশ্য : ১৬**

বিনোদ : ভাই তোর চাকরিটা থাকবে তো?

যতীন : কেন বলতো দিদি?

বিনোদ : অফিসে যাস কি? ? ছোট মামা আর তোর মতিগতি যেন কেমন ধারা...

যতীন : কেন আমরা কি করলাম?

বিনোদ : দেশের লোকের জন্য তোরা নাওয়া - খাওয়া ভুলেছিস, স্ত্রী-পুত্র ভুলেছিস, যাদের জন্য ভুলেছিস.. সেদেশের লোক কি স্বাধীনতা চায়?

যতীন : তোমার কি মনে হয় দিদি?

বিনোদ : আমার মনে হয় , চায় না। মেজমামা বলে কংগ্রেসও চায়না। চারটে বাড়তি সুযোগ-সুবিধা নিয়ে শান্ত থাকতে চায়। আর তোরা-

যতীন : আর আমরা?

বিনোদ : স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে একেবারে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো ... ওদের মায়ের কি পাপ বলতে পারিস? মায়ের কোল, একটার পর একটা খালি হতে থাকবে; আর সারাটা দেশ পড়ে পড়ে ঘুমোবো!!

যতীন : তুমি ঠিক বলেছো দিদি। মানুষ ঘুমন্ত, তন্দ্রাচ্ছন্ন। স্বাধীনতার স্বাদ তারা জানেনা। মেরুদন্ড সোজা রেখে বাঁচা কাকে বলে তা তাদের অজানা। আমরা তো সেই বোধটা জাগাতে চাই। কেমন করে যাবে, সেই রাস্তাটাই খুঁজছি। দেখছ না, কানাইলাল দত্ত, উল্লাস কর , সত্যেন কেমন হাসতে হাসতে বুক চিতিয়ে ফাঁসির মঞ্চের দিকে এগোল। এদেরই দৃপ্ত পদক্ষেপে ঘুমন্ত মানুষের চেতনায় আলো ফেলবে। আমরা যে পণ করেছি দিদি, আমরা মরবো জাতি জাগবে।

বিনোদ : সত্যি হবে এটা কোনদিন ভাই?

যতীন : হবে হবে। ফাইট ফাইট আনটু ডেথ। যেদিন আমি মরবো, সেদিন বুঝবে জাগা কাকে বলে?

বিনোদ : (আবেগ বিহ্বল হয়ে) ভাই ভাই আমার।

**দৃশ্য : ১৭**

(হন্তদন্ত হয়ে বীরেন যতীনের ঘরে আসে)

বীরেন : আচ্ছা দাদা, আমাকে কি তুমি বিপ্লবের কাজের যোগ্য মনে করো না?

যতীন : হঠাৎ?

বীরেন : কোনদিন কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তো দাওনা, তাই !!

যতীন : কেন, নরেন আর তোর নেতৃত্বে এতগুলো সফল ডাকাতি!? নেত্রকোনা খরদা, বিশেষ করে চিংড়িপোতা তে সরকারি টাকা লুঠ! যা আমাদের অনেক দিনের স্বপ্ন! তোরা ভাবছিস, আমি ঐসব খবর রাখি না!!

বীরেন : কিন্তু আমি তো- আমি তো আরো বড় অ্যাকশন চাই। নরাধম আশু বিশ্বাসকে খতম করতে তুমি চারুকে পাঠালে আমি ভেবেছিলাম এই দেশদ্রোহী নরাধমের বুকে পর পর তিনটে বুলেট গুজে দেবো আমি!!

যতীন : তোর অন্য কাজ আছে বীরেন। চারু তার কাজ সফলভাবে করেছে। ভরা কোর্ট চত্বরে আশু বিশ্বাস কে খতম করে শুধু ধরা পড়েনি, বিচারককে বলেছে- No sessions trial, But hang me tomorrow.. আমি আমার কাজ সম্পূর্ণ করেছি, তোমরা তোমাদের কাজ শেষ করো। এই তো চাই। জাতিকে জাগাতে এই আমাদের ব্রত। এই আমাদের মন্ত্র।

বীরেন : আমার জন্য কী কাজ আছে দাদা?

যতীন : অনেক বড় কাজ। অনেক বড় দায়িত্ব। পারবি?

বীরেন : তুমি আদেশ করলে আমি সব পারবো।

যতীন : একে হাতের নাগালে পাওয়া সহজ নয়। বুদ্ধি কৌশল সাহস এই তিন এক করে ওত পেতে থাকতে হবে। তবে শেষ হবে কাজটা। করা গেলে এতগুলো ফাঁসি, যাবৎজীবন দিয়েও ব্রিটিশ বুঝবে আর বেশিদিন এই ভারতে থাকতে পারবে না।

বীরেন : কে সে!?

যতীন : ট্রেগারের ডান হাত শামসুল আলম

বীরেন : শামসুল আলম!! পিশাচ শয়তান শামসুল? আমি পারব। আমাকে পারতেই হবে। আমার নাচতে ইচ্ছে করছে। নাচতে নাচতে গাইতে ইচ্ছে করছে বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম...

যতীন : আজ তুই আয়। বাকি সব সতীশ তোকে সব বুঝিয়ে দেবে।

## দৃশ্য : ১৮

(সামসুল আলমকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে চলেছে বীরেন। সঙ্গে সতীশ।)

বীরেন : কখন নামবে?

সতীশ : ঠিক দুটো থেকে আড়াইটা। প্রতিদিন নামে।

বীরেন : খবর পাক্কা

সতীশ : পাক্কা। আমি কিন্তু তোকে চিনিয়ে দিয়েই কেটে পড়ব। যতীনদা'র নির্দেশ। তোর কি ভয় হচ্ছে?

বীরেন : না

সতীশ : একটুও না? বাড়ির কথা মনে পড়ছে না?

বীরেন : না। তোমাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে। যতীনদা কে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে। যারা আমাকে বোঝে আমি যাদের বুঝি, কষ্ট তো তাদের জন্য হয়।

সতীশ : তুই পুনর্জন্ম তে বিশ্বাস করিস

বীরেন : স্বাধীন দেশে জন্মাতে বড় সাধ হয়। যে সাধ পেতে গেলে আগে মরতে হবে সতীশদা।

সতীশ : এই যে নামছে। মাঝের জন। একেবারে মধ্যমণি। আবার কখনও কোনোভাবে দেখা হবে বন্ধু। আমি আসি

বীরেন : এসো। বন্দেমাতরম।

(বীরেন দৃঢ় পদক্ষেপে এগোয়। একেবারে সামসুল আলমের মুখোমুখি দাঁড়ায়। আপনি সামসুল হক

সামসুল : কী চাই খোকা

বীরেন : দিতে চাই।

সামসুল : দিতে চাও! হা হা হা ... কী দিতে চাও?

বীরেন : গুলি। (মুহূর্তে তিনটে বুলেট। সামসুল লুটিয়ে পড়ে। চত্বরে ভয়ানক শোরগোল পড়ে যায়)

ওহে সামসুল/তুমি সরকারের শ্যাম আমাদের শূল।

কবে ভিটেয় তোমার চরবে ঘুঘু/ চোখে দেখবে সরষে ফুল।।

পেরেছি। আমি পেরেছি। দেশদ্রোহী ব্রিটিশদের দালাল সামসুল মরেছে । জয় ভারতের জয়। (শূন্য এ গুলি ছোঁড়ে আত্মহারা বীরেন।)

**দৃশ্য : ১৯**

যতীন : বিনোদ, বাবু এখন কেমন আছে, জ্বর বেড়েছে, মামা দেখে ওষুধ দিয়েছেন তো? কাল থেকে এমন জ্বরে পড়ল ছেলেটা...

ইন্দু : কাল নয় পরশু থেকে। আর তুমি হয়তো জানো না যে, খুকিও ভুগছে। পা মচকে গিয়েছিল মামা বলছেন সাত দিনে কমল না যখন, হাড়ের ডাক্তার দেখাতে হবে। হাত মুখ ধোও। খেতে দিচ্ছি।

যতীন : তোমার অভিমান আমি বুঝি ইন্দু।

ইন্দু : তোমাকে মামিমা খেতে ডাকছেন, যাও খেয়ে নাও।

যতীন : ইন্দু ইন্দু শোনো...

(ইন্দু চলে যায়। নরেন দ্রুতবেগে ঘরে প্রবেশ করে।)

নরেন : দাদা পিছন দিয়ে কি কোন পালাবার পথ আছে?

যতীন : মানে?

নরেন : পুলিশ ঘিরে ধরেছে তোমার বাড়ি।

যতীন : তুই কোথায় ছিলি? কেন ঘিরে ধরেছে? নরেন। । আমি মামার কাছে এসেছিলাম ডাক্তার দেখাতে। বোনকে নিয়ে।

যতীন : হিসাব মিলছে না যে! কোন আগাম খবর তো ছিল না !!

নরেন : অতিরিক্ত বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়। বীরেনকে তুমি বড্ড বেশি ভালোবাসো।

আজও সম্ভবত আরেক রাজসাক্ষী হতে চলেছে। ওই বলেছে তোমার নাম। সিঁড়ির উপর দিয়ে কোনো চোরাপথ টথ?

(মামা ঢোকেন)

মামা : সব পথ বন্ধ সারেন্ডার করো। জেলে গেলে ফিরিয়ে আনতে পারব। এনকাউন্টারে মরে যাও চাইনা।

বিনোদ: কি হয়েছে? কি হলো? কি হয়েছে মামা?

ইন্দু : পুলিশ কেন?

যতীন : ওরা আমাদের অ্যারেস্ট করে নিয়ে যেতে এসেছেন।

ইন্দু : কেন?

যতীন : কেননা আমরা স্বাধীনতা চাই।

**দৃশ্য : ২০**

(জেলের ভেতরে)

আইয়ে

আইয়ে আইয়ে

যতীন : কাহা যানা হোগা ইধার আইয়ে। সামঝা। স্রেফ আধা ঘন্টা মিটিং টাইম। উসসে জাদা নেহি। আপনার সোঙে দেখা বাবুর অন্তিম ইচ্ছা আছে।

যতীন : ও বীরেন?

বীরেন : ঘেন্না করছে আমাকে?

যতীন : না।

বীরেন : হচ্ছে না কেন?

যতীন : কেন হবে?

বীরেন : আমি তোমাদের ধরিয়ে দিয়েছি। গদ্দারি করেছি। আমাকেও নরেন গোসাই এর মত মেরে ফেলো। তোমার গায়ে তো হাতির শক্তি যতীনদা, আমার গলা টিপে মেরে দাও না।

যতীন : কাল তোর ফাঁসি?

বীরেন : হ্যাঁ

যতীন : আমায় চিনিয়ে দিলিনা কেন? বিপ্লবী যতীন আর এই যতীন এক বললেই তো তোর ছাড় হত।

বীরেন : না না কিছুতেই বলবো না।

যতীন : তাহলে বাকিটুকুই বা বললি কেন? বুঝেছি খুব নির্যাতন করেছে। থার্ড ডিগ্রি দিয়ে নার্ভগুলোকে শিথিল করে দিয়ে ওরা কথা বার করে নেয়।

বীরেন : না

যতীন : তবে?

বীরেন : আমাকে প্রতারিত করেছে এরা। আমায় ঠকিয়েছে। এরা নরকের কীট। এদেরকে কখনো ক্ষমা করো না। কাল সকালে যেন বীরের মতো ফাঁসিকাঠে গলাটা বাড়াতে পারি। বল তুমি এর প্রতিশোধ নেবে?

যতীন : বীরেন আমায় বল কী প্রতারণা?

বীরেন : যুগান্তরের নকল কপি বার করে আমায় দেখিয়েছে। বিপ্লবীরা আমায় ঘেন্না করে। তাতেও আমি ভাঙ্গিনি। এই আঙ্গুলগুলো দেখ;— চারটে হাড় বুট জুতো দিয়ে মেঝেতে ঘষে ভেঙ্গে দিয়েছে, তাতেও আমি ভাঙ্গিনি। পরে আরেকদিন পত্রিকায় তোমার লেখা দেখাল। তুমি আমাকে 'মীরজাফর' বলেছ! আমি পারলাম না, মুখ ফসকে বেরিয়ে এল 'যতীন দা, তুমিও' ওরা চেপে ধরল। যতীন কে? মারলো, মেরে মেরে মেরে মেরে নিস্তেজ করে দিল। আর কিছু বলি নি, তবুও তোমায় ওরা ধরল, ছোট মামাকেও।

যতীন : আমার ওপর এত অভিমান! কেন রে?

বীরেন : জগতে তোমাকে যে সবচেয়ে ভালোবাসি ।

দারোয়ান : টাইম হো গেয়া চলিয়ে জলদি

যতীন : বীরেন । কাছে আয়। একটিবার তোকে জড়িয়ে ধরি। বীরের মতো যাবি কাল ভোরে। একেবারে বীরের মতো, বুক উঁচু করে। কাজ মিটিয়ে আমিও যে আসবো তোর কাছে। তোর সঙ্গেই থাকব আমি। বন্দেমাতরম।

**দৃশ্য : ২১**

(জেলখানা)

নগেন : (ছোটমামা) তুই মনমরা হয়ে আছিস কেন?

যতীন : ছোট মামা, বীরেনটার কথা খুব মনে পড়ে। ছেলে মেয়ে দুটোর কথাও। আট মাস কেটে গেল, ওদের দেখিনি।

ছোটমামা : বড়দা এসেছিল। তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাও করেনি আমাকে । কেসটা এগোচ্ছে ভালোই। পজিটিভ রেজাল্ট আশা করছেন।

যতীন : এত হোফফুল হওয়ার কারণ?

ছোটমামা : বীরেন আমাদের বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। ও বলেছে, আমাকে যে যতীন দা পাঠিয়েছে। ইনি তিনি নন।

যতীন : অনেক অত্যাচার সয়েছে বীরেন। শুধু শারীরিক নয়, ভীষণ মানসিক যন্ত্রণা।

ছোটমামা : ইন্টারোগেট করার নামে তোকেও তো নিয়ে যায়। বুঝতে পারি, তোর ওপর দিয়ে কি চলছে।

যতীন : না মামা কষ্ট আমার অন্য জায়গায়
যখন পেটায় তখন শুধু দেশের কথা ভাবতে থাকি। মনে হয় এটা তো সইবারই কথা। কিন্তু যখন লোভ দেখায় টাকা কড়ি ক্ষমতা এমনকি নারীর,... ঘেন্না হয়, গা গুলিয়ে ওঠে।

ছোট মামা : রাষ্ট্রের চরিত্রই এই। আমাদের ভাবী স্বাধীন রাষ্ট্রকে কি আমরা এর বাইরে রাখতে পারব?

যতীন : কে জানে? তবে যে কাজে নেমেছি, তার শেষ দেখে ছাড়ব। আমাকে ফাঁসি দিলে ওরা বাঁচবে। নইলে ওদের আমি ছাড়বো না একটা রেডিক্যাল মুভমেন্ট চাই মামা। শুধু গুপ্ত সমিতি দিয়ে হবে না। ছাত্র-যুব-কৃষক -শ্রমিক দেশের সৈন্য বাহিনী এমনকি ইংরেজ বিরোধী বিদেশি শক্তিকে একজোট করা দরকার। সেই কাজ এগোচ্ছে। রাসবিহারী বসুর সঙ্গে কথা হয়েছে। বীরেনের মতো, চারু চিত্তের মতো আরও ছেলে চাই।

ছোটমামা : এবার তোকেই তো নেতৃত্ব দিতে হবে। অরবিন্দ সন্ন্যাস নিলেন । বাকিরা সবাই অলমোস্ট দ্বীপান্তরে। তুই আছিস । বিপ্লবীদের সাজানো সংসারও হবার কথা নয়।

যতীন : আমাদের বড় ক্ষতি হলো সিস্টার চলে গেলেন

ছোট মামা : নিবেদিতা নেই? স্বামীজীর শেষ চিহ্ন মুছে গেল?

যতীন : তবু রাসবিহারীসহ অনেকে লড়ছেন আমরাও লড়বো। সুযোগ আমাদেরও আসবে। নিষ্কাম কর্মে অটুট থাকলে, সে আপনি ধরা দেবে। (জেলের ঘন্টা! " সব লাইন লাগাও"।

## দৃশ্য: ২২

(দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ি, পঞ্চবটি)

যতীন : আরতি হচ্ছে। একটিবার মায়ের চরণ ছুঁয়ে এসে তারপর কথাবার্তা শুরু করি। এখানে এলে জানেন, স্বামীজি আর সিস্টারের কথা মনে পড়ে। এখানে এলে ওদের স্পর্শ করতে পারি।

রাসবিহারী : যান । প্রণাম করে আসুন। (যতীন চলে যান। মন্দির আরতির শব্দ বাড়ে। যতীন ফেরেন)

রাসবিহারী : মানুষটি আপনি বড় অদ্ভুত । এত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রেম এবং সাহস, নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা -- আমার মতে এমন দৈব মিশ্রণ দুর্লভ এ পৃথিবীতে।

যতীন : আমি তো মনে করি এসব গুণ আছে আপনার। তাই তো রাসবিহারী বসুর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়ে অমরেন্দ্রবাবুকে একেবারে পাগল করে দিয়েছি।

রাসবিহারী : কী যে বলেন! অমর বলছিল, যতীন অন্য ধাতুতে গড়া। অনেক মানুষই তো

দেখলাম- জেলে কী অত্যাচার ওর ওপরে। খুব অত্যাচারিত হয়েছে Physically very rudely tortured.. অথচ এই নিয়ে কথা তুলুন, বলবে ছাড়ুন কাজের কথায় আসা যাক!

যতীন : আমরা ওদের তাড়াতে চাইব। তা ওরা কি ফুল ছুড়বে? বলুন আপনি!

রাসবিহারী : (হাসি)

যতীন : তোমরা কি করছ আমি জানি। কিন্তু রাসবিহারী, নিন্দা-মন্দ,ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা এসব থেকে মুক্তি না পেলে স্বাধীনতার যুদ্ধে সৈন্য হবার ছাড়পত্র মেলার কথা নয়।

রাসবিহারী : আমি সম্পূর্ণ একমত দাদা।

যতীন : তুমি বাঙালী হয়ে সারা ভারতবর্ষে বেড়াচ্ছ যে তোমার মতো সংগঠক বিরল। তোমার যখন একই কথা মনে হয়, তখন মনে হয় আমি ভুল ব্যাখ্যা করছি না।

রাসবিহারী : আপনার সুনির্দিষ্ট ভাবনার কথা বলবেন লিখেছিলেন-

যতীন : সারা ভারতের গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলোর একটা নিশ্চিদ্র যোগযোগ চাই। আমি জানি, অনেক অনেক অসামঞ্জস্য, তবু তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনতে হবেই। সে কাজের চওড়া কাঁধ একজনেরই আছে। আর তার নাম রাসবিরহারী বসু।

রাসবিহারী : আপনি চাইলে নিজেকে উজাড় করে দেব।

যতীন : কংগ্রেস এখনো এই অঙ্ক কষতে ব্যস্ত, কতটা দাবি আদায় করলে মহারানীর মান রক্ষা থাকে।

রাসবিহারী : একদম তাই। সেইজন্যই তো কংগ্রেসের ভেতরেও এত প্রতিবাদ। লালা কিংবা চিত্তরঞ্জনের মতে মানুষেরা নিজেদের মতো করে পথ খুঁজছেন।

যতীন : রাইট অবজারভেশন। এক, গুপ্ত সমিতি গুলোকে এক করা দুই, কংগ্রেসের রেডিক্যাল অংশের সঙ্গো যোগাযোগ রাখা তিন; গণআন্দোলন ও সেবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া চার, সৈন্যবাহিনীর অভ্যন্তরে ফাটল ধরানো পাঁচ, ইংরেজ বিরোধী বিদেশী শক্তির সঙ্গো যোগাযোগ কে শক্তিশালী ও পরিণত করা, -- আমার ধারণা, আমরা অল্পবিস্তর এ কাজ শুরু করে দিয়েছি।

রাসবিহারী : দাদা আপনি জানেন নিশ্চয়ই জাঠ ব্যাটেলিয়ানে আমাদের সাপোর্টার ঢুকে পড়েছে এই সন্দেহে, ব্রিটিশরা পুরো ব্যাটেলিয়ান ভেঙে দিয়েছে।

যতীন : তাই? এই সুসংবাদ পাইনি।

রাসবিহারী : আপনার এই পাঁচ দফা কাজ আমরা করতে পারি। যদি অনেকটা পারি। ......

যতীন : তাহলে জেনো, রাসবিহারী, স্বাধীনতা আসন্ন, খুব দূরে আর সে দাঁড়িয়ে নেই।

**দৃশ্য : ২৩**

(বন্যার ত্রাণ শিবির। বঙ্গের নানা প্রান্তে বিপ্লবীরা জড়ো হয়েছেন।)

জনৈক : দাদা আসুন! সবাই আপনারই প্রতীক্ষায়!

যতীন : যাদের আসার কথা সবাই এসেছেন?

জনৈক : বন্যাত্রাণের কাজ চলছে চারদিন ধরে। সবাই আছেন। শুধু যশোর থেকে কেন যে কেউ এসে পৌঁছলেন না, সেটা ভাবনার। চন্দননগর মেদিনীপুর ঢাকা বরিশাল এমনকি উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিরাও আছেন।

যতীন : জ্যোতিষ তাহলে শুরু করা যাক। (সবাই সম্মতিসূচক বার্তা দেয়।) দেশ সেবক বিপ্লবীরা মিটিং দীর্ঘায়িত করে না। আমরা কাজের কথা বলি । দিনরাত মিটিং করে সময় নষ্ট করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে কংগ্রেস। ঠিক ঠিক সমাজসেবামূলক কাজের মধ্য দিয়েই জনগণের সঙ্গে একটা নিবিড় সম্পর্ক রচনা করতে হবে।

জ্যোতিষ : একেবারে ঠিক কথা

যতীন : কখনো বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্মের মধ্যে দিয়েও এই জনসংযোগ কাজে আসতে পারে। এখন খুব সংক্ষেপে বললে, এক ঘোর যুদ্ধ আসন্ন। এত বড় যুদ্ধ আগে কেউ দেখেনি। বিশ্ব যুদ্ধ। এই যুদ্ধে বিদেশি শক্তি ইংরেজ এক প্রধান প্রতিপক্ষ। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে গেলে ইংরেজদের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক শক্তি ভেঙ্গে পড়বে। আর তাকেই আমরা ব্যবহার করব। আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য। শত্রুর শত্রুদের সাহায্য নেব। রাসবিহারী বোস এবং সকলে। বন্দেমাতরম

যতীন : শুনুন। রাসবিহারী বাহাদুর ছেলে। ও দেখিয়েছে বোমা যদি ছুঁড়তেই হয় ওঠা কনস্টেবল এর ওপরে কেন? কেন বড়লাট হার্ডিঞ্জ এর ওপরে নয়?

সকলে : বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জিন্দাবাদ।

যতীন : আপনারা জানেন রাজাবাজার বোমা মামলায় আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ছেলে শশাঙ্ক ওরফে অমৃতলাল হাজরা সহ আরো তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে। ওদের সিগারেট-টিন বোমা মেদিনীপুর ঢাকা ও সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছিল। এখন কর্তব্য, অনেকগুলো ডাকাতি দরকার পর পর। অনেক টাকা দরকার । আর দরকার অস্ত্রাগার লুন্ঠন। সরকারি অস্ত্রাগার লুন্ঠন। এখন এই কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। গুপ্তচররা সজাগ। আমরাও গুপ্তচর সাজিয়ে পুলিশের মধ্যে ঢুকে পড়ে খবর পাচ্ছি। আপনাদের কাজ আশু কর্তব্য

সুনির্দিষ্টভাবে এখানে লেখা আছে। পড়ে ফেলুন। মগজস্থ করুন। তারপর কাগজ পুড়িয়ে ফেলুন। একটা কাগজও আস্ত রাখা যাবে না। ধন্যবাদ। বন্দেমাতরম।

**দৃশ্য : ২৪**

(পর পর কয়েকটি মালবাহী ট্রাক চলার শব্দ। হঠাৎই একটা ধাক্কা। ফুঁসতে ফুঁসতে আবার গতি বাড়িয়ে একটা ট্রাক দ্রুত উধাও হয়ে যায়)

সাহেব : ননসেন্স। মিডল লেন থেকে তিন নম্বর ট্রাক ভ্যানিস হয় কী করে! You are solely responsible for this mishap. I am going to report you to the Authority......

জনৈক : সার মরে যাব স্যার। সার আমি রেসপন্সিবল নেই সার। রঘু রেসপন্সিবল। ও লোডিং আনলোডিং এর দায়িত্বে ছিল ওকেই জবাবদিহি করতে।

সাহেব : কল হিম হিয়ার ইমিডিয়েডলি। এক লরি মাউজার পিস্তল revolutionary দের হাতে চলে গেলে তো potato truck ... ওকে ডাকো(চিৎকার করে)

জনৈক : রঘু রঘু রঘু ... সার রঘু নেই সার। রঘুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

সাহেব : স্ট্রেঞ্জ! ট্রাক হাওয়া, রঘু হাওয়া। এটা কি মগের মুল্লুক আছে!!

জনৈক : আচ্ছা সার। কয়েকটা দিন রঘু কেমন কেমন কথা বলছিল। রঘুই বিপ্লবী নয় তো!!

সাহেব : হোয়াট?? রডা কোম্পানিতে বিপ্লবীদের আস্তানা। ওয়াটার। আমার হার্ট ফেল করবে। ...

**দৃশ্য:২৫**

নরেন : এরকমটা হবে আমি ভাবতেও পারিনি। এটা সম্ভব যে হবে, কল্পনার বাইরে ছিল।

যতীন : আমি জানি, তুই এসব আদ্যন্ত অবাস্তব বলে মিটিং থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলি!

নরেন : আমার ধারণা ছিল, তুমিও একে বালখিল্য বলবে। কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি এরও মাস্টার মাইন্ড তুমি!!

যতীন : আসল হিরো তো রঘু। ইন হাউস সাপোটারটা কাজটাকে জলের মতো সহজ করে দেয়।

নরেন : সে জন্যই নানা কাজে নানা পেশায় আমাদের সমর্থক থাকা দরকার। এখনকার মিটিংগুলোতে প্রায়ই একথা বল তুমি আজকাল, আজ তবে উঠি।

যতীন : পাগল নাকি। আসল কথাটাই তো হল না।

নরেন : তাহলে বলো

যতীন : অমরদা, চিত্তপ্রিয়ও আসবে। ওরা এলে একসঙ্গো .. কথা হতো। আচ্ছা শোন.. প্রথম কথা, রাসবিহারী পিংলে কে নিয়ে বেনারসে ছিলেন। তবে পিংলেকে

নিয়ে মীরাটের যে হাই ভোল্টেজ অপারেশন, ওটা লাস্ট মিনিটে ওয়ার্ক আউট করেনি। তবে আশার আলো ম্যাভারিক আর এস. হেনরি হয়তো ঠিক সময়ে এসে পড়বে ব্যাংকক সাংহাই সিঙ্গাপুর জাভা এখনো পর্যন্ত পজিটিভ রিঅ্যাক্ট করছে।

নরেন : ওই দুটো জাহাজ সত্যিই যদি বাস্তবে এসে পড়ে, ব্রিটেনে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত ওদের রাতে আর ঘুমোতে দেবনা।

যতীন : আমাদের তৈরি থাকতে হবে। যদুগোপাল রায়মঙ্গাল এর ওই জমিদারের সঙ্গো যোগাযোগটা রেখে যাক। রডা কোম্পানি অত বড় সাকসেসফুল অপারেশনের

পর বিপিন তেতে রয়েছে। বিপিন গাঙ্গুলিকে ফোর্ট উইলিয়ামটা দেখতে বলেছি, যদি জাহাজ এসে পড়বার খবর পাকা হয়ে যায় তখনই তিনটে দলে ভাগ হয়ে আমাদের কলকাতা ছাড়তে হবে। যোগযোগ ব্যবস্থাকে আগে ওড়াবো। তারপর বাকি কাজ । বন্দেমাতরম।

## দৃশ্য : ২৬

নরেন : দাদা দুটো দিন তুমি এমন হয়ে আছো যে আমরা কিছু বুঝতে পারছিনা খুব কি খারাপ খবর?

যতীন : তীরে এসে তরী ডুবল রে নরেন!! আমাদের ভাগ্য আরও পরীক্ষা নেবে রে? আর কতো? আরো অত্যাচার কত নিপীড়ন কত রক্ত কত মৃত্যু পেলে ভাগ্য দেবী আমাদের সহায় হবো? বলতে পারিস।

নরেন : জাহাজ দুটো আর আসছে না তাইতো!?

যতীন : না। ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু এর জন্য অনেকটা বলিদান দিতে হল। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও আমাদের ভগবানের কথা নয়, প্রমাণ লোপাট করার কথা ভাবতে হয়। একটা আস্ত ডায়রি উফ.....

নরেন : কে যতীন দা

যতীন : বলবো। আগে অনেকগুলো কাজ আছে। অমরদার দোকানে রেড হয়েছিল অমরদা বুদ্ধিমান, কিছু পায়নি পুলিশ। তবে ট্রেগার একবার যখন ঢুকেছ অমরদাকে আন্ডারওয়ার্ল্ডে চলে যেতে হবে। সাময়িকভাবে বিপিন গাঙ্গুলিকেও। আর আমিও এমন একটা কান্ড করলাম। একটা স্পাই কে ধরে ঘাড় মটকে দিয়েছি হতভাগার। হয়তো এটাই নিয়তি।

নরেন : আমায় নির্দেশ দাও।

যতীন : উকিল কুমুদ নাথ মুখার্জি । প্রবাবলি he was the culprit...
যাগগে, আমাদের এই আস্তানাটাও সেভ নয় মনে হচ্ছে। এখন অ্যারেস্টেড হলে

সব বুমেরাং হয়ে যাবে। ভবানী মন্দির এর পুজো তে পর্যন্ত পুলিশ রেডকরছে।

নরেন : শুনেছি, মুক্তি কোন পথে? আর “বর্তমান রণনীতি” পুস্তিকা দুটিও টেগার্ড সাহেবের টেবিলে পৌঁছে গেছে।

যতীন : দেশটাতে দেশভক্তের সঙ্গো বেইমানদের ও সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, এটাই বোধহয় মা ভবানীর পরীক্ষা। বার্ড কোম্পানি আর বেলেঘাটা এর লুঠ এর টাকা রেডি। বিপিন দুরন্ত কাজ করছে।
ভাবতে পারিস নরেন, ত্রিশ হাজার রাইফেল, দু হাজার পিস্তল, কয়েক হাজার হাতবোমা!? আমরা ইতিহাস কে বদলে দিতে পারতাম।
এই তুমি কে!!? ওকে ধর। ধর ওকে। সর্বত্র নেংটি ইঁদুরে ভরে গেছে। জ্যোতিষ জ্যোতিষ, চিত্ত কোথায়? তৈরী হয়ে নাও সব। আমরা বেরোবো। কলকাতায় থাকলেই আবার শ্রীঘরে কাটাতে হবে অনন্তকাল। খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও।
(ট্রেনের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়)

**দৃশ্য : ২৭**

ট্রেগার : মিঃ বিশ্বাস আপনি শিওর বালেশ্বরের জঙ্গালে আছে যতীন্দ্রনাথ?

বিশ্বাস : Two hundred percent.. আমি ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম তল্লাশি করে কোপ্তিপোদার খবর পেয়েছি। এবং এটাও জেনেছি যতীন্দ্রনাথ খুব সুরক্ষিত অবস্থায় নেই। কোমাগাতামারু ইনসিডেন্ট এর পর মানসিকভাবেও কিছুটা বিধ্বস্ত হয়ে আছে। এই সুবর্ণ সুযোগ মি: টেগার্ট।

টেগার্ট : বেশ তাহলে বালেশ্বরের ডি এম কিলবি সাহেব, পাটনার গোয়েন্দা চিপ, ডি আই জি আইল্যান্ড এবং মিলিটারি লেফটেন্যান্ট রাদারফোর্ড-- আমি আপনিতো থাকছি, একটা কমিটিগঠন করুন। আমরা মিট করি। And we will make a plan.. a truthful historic plan!!

**দৃশ্য : ২৮**

চিত্ত : অনেকগুলো দিন কেটে যাচ্ছে। কিছুই তো হচ্ছে না। এখানে তো এসে পৌঁছানোর কথা ছিল আর একটা জাহাজের । তারই বা কি হলো? আমি আর বসে থাকতে পারি না।

নীরেন : সেজন্যই তো ইয়ার্কিছলে গুলি বেরিয়ে গেল। We need Actions..

যতীন : আমার সাধু বেশ কিন্তু এলাকার মানুষ মেনে নিয়েছে। অভিনয়টা ভালোই করছি তাহলে। কি বল? আমরা এখন নিরূপায় কখনো কখনো অপেক্ষাই সাধনা।

মনোরঞ্জন : জ্যোতিষ এর কী হবে? ও কিন্তু ভয়ংকর অসুস্থ। ওষুধ-পথ্য ছাড়া ওকে

বাঁচানো যাবে না।

জ্যোতিষ : দূর এমনি এমনি মরব নাকি আমি? আমি বিপ্লবী! দু চারটে কে নিয়ে মরব আমি যতীন। হ্যাঁ সেজন্যই তো শরীরটা একটু সারিয়ে তুলতে হবে ভাই, শোন।

নীরেন্দ্র তুই জ্যোতিষকে নিয়ে ঘন্টা দুয়েক পরে তালডিহিতে চলে যাবি। মাইল দশেকের পথ। ওখানে জ্যোতিষের চিকিৎসা হবে। কিছুটা হেঁটে কিছুটা বয়ে নিয়ে যাবি ওকে। বুঝেছিস? ওখানেই আপতত থাকবি তোরা। আমি খোঁজ রাখব।

নীরেন : তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়ি দাদা। সন্ধ্যে তো নামবো নামবো করছে, আসলে দশ মাইল বললে তো ! ওর গায়ে তো জোর নেই একটু সময় তো লাগবে।

যতীন : বেশ তাহলে বেরিয়ে পড়।

.... (মিউজিক)

চিত্ত : মন বড় চঞ্চল হয়ে উঠছে দাদা আর বসে থাকতে ইচ্ছে করে না

যতীন : হয়তো কিছছুটা স্থিতিতে রয়েছি এখানে বড় কোনো ঝঞ্ঝটের অপেক্ষায়? কে বলতে পারে, যেকোনো সময় যা কিছু ঘটে যেতে পারে আমরা যে আগুন নিয়ে খেলি রে ভাই!

চিত্ত : জান দাদা বাড়ি ঘুরে এলাম, এখানে আশার আগে। সবাইকে প্রাণ ভরে দেখে এলাম। মন বলছিল আর এ জন্মের মত নয়।

যতীন : আমাদের যে ঝাঁকে ঝাঁকে মরতে হবে- তবে দেশটা জাগবে। আমাদের তো ফিরে ফিরে জন্মাতে হবে। বিপ্লবীর ত মুক্তি নেই আবার ফিরতে হবে। অনেক কাজ। তোর কছে মিথ্যে বলব না আসার আগে আমরাও যে ছেলেমেয়েগুলোর মুখ দেখতে ইচ্ছে করেনি, তা নয় , করেছে। কিন্তু এই মায়াময়পৃথিবী থেকে নিজেকে উপড়ে ফেলাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ। জানিস, খুব ভালো লাগলো বাগনান স্টেশনে উল্টো ট্রেনে মা সারদার দেখা পেলাম। প্রণাম করে এলাম তো। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। মনটা বড় শান্ত তারপর। মাঝে আমারও বড় অস্থির অস্থির লাগছিল ওই ফেলিওরটার পর (একটা শিস ধ্বনি)

জনৈক : দাদা, দাদা দশ মাইল দূরে শয়ে শয়ে পুলিশ। হাতির পিঠে চড়ে সাহেবরা জঙ্গলে ঢোকার পরিকল্পনা করছে। তোমরা পালাও। আমি আসি।

যতীন : চিত্ত অ্যাকশন চেয়েছিলি তো? দৌড় শুরু কর! একেবারে সোজা। তালডিহি, ওদের নিয়ে গভীর অরণ্যে হারিয়ে যেতে পারবো।

চিত্ত : তুমি পালাও। আমি খবর দিচ্ছি, ওদের। আমি মরলে কিছু এসে যায় না। আমি

অনেক মানুষ মেরেছি তুমি জানো। আর কয়েকটা কে সঙ্গো নিয়ে চলে যাব। তোমার বেঁচে থাকা দরকার। বিপ্লবী আন্দোলন বাংলাদেশে তোমাকে ছাড়া অন্ধ হয়ে যাবে।

যতীন : না এটা হতে পারে না। জ্যোতিষ অসুস্থ। ওরা আমার ভাই। আমাদের তালডিহি পৌঁছতে হবে। এটা আমার নির্দেশ, কুইক।

(একটা বিশাল বাহিনী এর এগোনোর শব্দ। অন্যদিকে দৌড়োনোর। হাপ ধরে যাচ্ছে যতীন, চিত্তর। ওদিক থেকে নীরেন, অসুস্থ জ্যোতিষকে নিয়ে)

যতীন : তোরা?

নীরেন : গ্রামে পুলিশ সার্চ শুরু করেছে

জ্যোতিষ: আমাকে ফেলে তোমরা পালাও। আমাকে দুটো গুলি মারো পর পর। নইলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। চিত্ত। দাদা পালাক। আমরা লড়ি। লড়ে মরি।

যতীন : আমরা কেউ পালাব না। লড়ব। সামনা সামনি লড়ে মরব। গুপ্ত হত্যা তো অনেক হল। আজ লড়াই হবে। অসম লড়াই। লড়ে মরবো নীরেন। জ্যোতিষও লড়বে। সময় আসন্ন... (বেশ কিছুক্ষণ গোলাগুলির শব্দ)

## দৃশ্য: ২৯

ফিরে আসে ছাদে দাদু (অমলবাবু) আর নাতি (শানিত)

নাতি : দাদান দাদান খুব ভয় করছে। বাঘা যতীন কি মরে গেল?

দাদু : হ্যাঁ দাদুভাই, বাঘা যতীন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। রক্তাক্ত তিনি । একটি গুলি উরুতে। আর একটা গুলি পেটে। চিত্ত ওখানেই শেষ। পরের দিন হাসপাতালে মারা গেলেন যতীন্দ্রনাথ। নীরেন আর মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হলো। আর জ্যোতিষ এর হলো দ্বীপান্তর। জ্যোতিষ ওদের অত্যাচারে পাগল হয়ে গেল। জেলে কুঠুরি এর দেয়ালে ভাঙা ইট দিয়ে প্রতিদিন লিখত একটি শব্দ । কি জান?

নাতি : কি?

দাদু : বাঘা যতীন।

নাতি : বাঘা যতীন কে যে একবার চিনবে, সে ভুলতে পারবে না। কিছুতেই পারবে না।

দাদু : বাঘাযতীনকে কে কেমন লাগল দাদুভাই তোমার?

নাতি : প্রকাণ্ড

দাদু : আর আমরা দাদুভাই। ওদের রক্ত ঝরানো পূণ্য ভূমিতে, কী করছি বলতো!! পারছি কী ওদের যোগ্য হতে? আমার চাকরি জীবনের দুটো অপরাধের কথা স্বীকার করেছি এই বই এর ভূমিকায়। আমি মনে করি অনুতাপ অনুশোচনা ছাড়া আমরা ভালো মানুষ হতে পারব না।

নাতি : বাবা, এটাই চাইছে না?

দাদু : না। ওর স্ট্যাটাসে লাগছে। আমরা তো হিপোক্রিট হয়ে বাঁচি দাদুভাই। তোমাদের তো তেমন ভাবেই বাঁচতে শেখাই। বাঘাযতীনকে নিয়ে বক্তৃতা করে এসে এই আমরাই চূড়ান্ত স্বার্থপর, আত্মরতি নিয়ে বাঁচি। সময় এসেছে একথা গুলো বলার। আমি তো বাঘাযতীন হতে পারব না। ওর জীবন যাতে আমাকে কিছুটা সত্যের সন্ধানে নিয়ে যায়।

নাতি : তোমার বইয়ের নাম কি রেখেছো? দাদু। । আমার বইয়ের নাম "বাঘা যতীন এখনো বেঁচে"

নাতি : কিন্তু বাঘাযতীন তো হাসপাতালে মারা গেলেন?

দাদু : সে তো তার নশ্বর দেহটা। বাঘাযতীন বেঁচে আছেন বলেই তো গরিবের জন্য, দেশের ভালোর জন্য, এখনও মানুষ ঝুঁকি নেয়। এখনও মানুষ মরে। আর এই যে আমাদের তথাকথিত সুখের সংসারে আমি তোর বাবার সঙ্গে ঝগড়া করছি। কিছুতেই আমি আমার কনফেসন থেকে সরছি না! এসব কে করাচ্ছেন দাদুভাই!? বাঘাযতীন যদি বেঁচে না থাকতেন তাহলে এসব আমার ভেতরে থেকে কে করাতো? কে কান ধরে দোষ স্বীকার করতো? --- বাঘাযতীন এখনও বেঁচে আছে...

নাতি : আবার একটা ঘোড়ার শব্দ শুনছ দাদান। আকাশে ভোরের আলো।

দাদু : সেই আলোর পথ বেয়ে তিনি আসছেন... (ঘোড়ার টগবগ ধ্বনি ক্রমশ বাড়তে বাড়তে দূরে মিলিয়ে যায়।)

লেখক ঃ **গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট,** সহকারী অধ্যাপক, ড. এ.পি.জে. আব্দুল কালাম গভ: কলেজ।
সম্পাদক - "তান" (প্রয়োগ কলা বিষয়ক)

# আলোয় ঢাকা অন্ধকার

অনির্বাণ সেন

১ অভিনেতা : নমস্কার আমি (নিজের নাম)! ডানকুনি থিয়েটার শাইনের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা আর কৃতজ্ঞতা জানাই।

২ অভিনেতা : কৃতজ্ঞতা এই জন্যই যে আপনারা আপনাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের নাটক দেখতে এসেছেন। আমি (নিজের নাম)

৩ অভিনেতা : আমি (নিজের নাম ) রুমনা আমাদের বন্ধু। জে এন এউ-তে পড়বার জন্য চলে গেছে। দীর্ঘদিন ওর সাথে আমাদের কোন যোগাযোগ নেই।

৩ অভিনেতা : আজ আমরা আপনাদের রুমনার গল্প শোনাবো! রুমনার কাছ থেকে শোনা গল্প! আমি (নিজের নাম)

৪ অভিনেতা : আমি (নিজের নাম ) রুমনা যেদিন গল্পটা শোনায়; জানেন, সারা রাত কেউ ঘুমাতে পারিনি। ইতিহাস কি সেইটুকুই যা বইয়ের পাতায় পড়ি?

৫ অভিনেতা : ব্যক্তি বা রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ইতিহাসকে কোনদিন কালকুঠুরিতে, সকলের অলক্ষে আটকে রাখা হয়নি? আমি (নিজের নাম)

৬ অভিনেতা : আমি (নিজের নাম) পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যখন আমাদের কাছে একটা প্রযোজনার প্রস্তাব রাখলো... আমাদের সকলের মনে পড়েছিল রুমনার কথা। আমরা কৃতজ্ঞ, পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র আমাদের এমন একটা সুযোগ দিয়েছেন।

৭ অভিনেতা : শুধু রুমনার মুখে শোনা গল্প নয়, নাটককার অনির্বাণ সেন আর নির্দেশক (নাম) তথ্য সংগ্রহ করেছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, ওয়েবসাইট আর নীলগঞ্জের নেতাজী মিশনের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে। আমি (নিজের নাম)।

৮ অভিনেতা : আমি (নিজের নাম)! রুমনাকে আমরা অনেক খুঁজেছি। তবে আমরা জানি, রুমনা হারিয়ে যায়নি। সকলের অন্তরালে, নিষ্ঠা ভরে ও কিন্তু ওর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। পাথর সরিয়ে সত্যকে সামনে আনার কাজ।

৯ অভিনেতা : রুমনা সফল হবেই। আর সেই বিশ্বাসেই ডানকুনি থিয়েটার শাইনের স্পর্ধার প্রযোজনা- অনুচ্চারিত ইতিহাস! আমি (নিজের নাম)

১০ অভিনেতা : এই নাটকে সংগীত দান করেছেন (নাম), ধ্বনি প্রক্ষেপণ করেছেন (নাম) মঞ্চ পরিকল্পনা (নাম), আলোক পরিকল্পনা (নাম), এবং নির্দেশনা-(নাম)! আচ্ছা, আমরা সকলে অপেক্ষা করছি রুমনার জন্য, আপনারাও অপেক্ষা করবেন তো? আমি (নিজের নাম)।

১১ অভিনেতা: আমি (নিজের নাম)। নির্ভুল তথ্য, পরিসংখ্যান; যা হারিয়ে গেছে বা

হারিয়ে দেওয়া হয়েছে গোপন অভিসন্ধিতে- সে সব সামনে তুলে ধরবার দায়িত্ব রুমনার।

১২ অভিনেতা : তাহলে আজ আমরা আপনাদের সামনে কি তুলে ধরব? তেমন কিছুই না। কেবল উঁকি দিয়ে দেখে নেব রুমনা সবার অলখ্যে কি কাজে মত্ত ... অনুচ্চারিত ইতিহাস।

### দৃশ্য-১

বারাসাত থেকে নীলগঞ্জ যাবার পথে বা-দিকে অটোস্ট্যান্ড। সেখানে কোন অটো নেই। অটো স্ট্যান্ডের পিছনে একটি শহিদ বেদী। যার উপরে লেখা বিশ্বাস আর বা-দিকে একতা আর ডানদিকে বলিদান। নীচে একটি কালো ফলক। একটি মেয়ে হাতে মোবাইল নিয়ে একমনে কথা বলতে বলতে এসে বেদীর এক কোণে দাঁড়ায়।

রুমনা : না বস! অত সস্তা নয়। সলমন যা অভিনয় করেছে, উফ সুলতান... একদম বুঝিয়ে দিয়েছে আমির-টামির না, ইন্ডাস্ট্রির আসল বাপ কে? সলমন। কি ন্যাচারাল বলত! ভাবা যায়? আমি তো বলব এমন অভিনেতা আমাদের খুব কম এসেছে।... কি বললি? ধুস! তুই শালা অভিনয়ের কিস্যু বুঝিস না। (একজন বয়স্ক লোক সামনে এসে দাঁড়ায় আর ইংগিতে রুমনার পা-কে নির্দেশ করে যেটি শহিদ বেদীর উপরে অনবধানে চলে গিয়েছিল। রুমনা পা-টা সরিয়ে ইংগিতে সরি বলে আবার ফোনে ফিরে যায়।)

রুমনা : হ্যাঁ! দেখিস তো শালা জেমস বণ্ড আর ফালতু কিছু থ্রিলার! ভাল ফিল্মের তুই কি বুঝিস রে? ... ভাট বকবিনা পাভেল... এড়ে তর্ক করলে মারব এক কান চাপাটি...।

রুমনা দেখে তখনও লোকটি দাঁড়িয়ে।

রুমনা : এ্যাই রাখতো! আমি একটু পরে ফোন করছি। নারে শালা, পালাচ্ছি না। একটু পরে আমিই ফোন করব।

রুমনা ফোন নামিয়ে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে বলে-

রুমনা : কি ব্যাপার? কিছু বলবেন?

সত্য : আপনি কথা বলছেন, চিৎকার করছেন, কখনো বা পা-তুলে দিচ্ছেন... (শহিদ বেদীর দিকে নির্দ্দেশ করে)

রুমনা : পা দেবার জন্য সরি বললাম তো। এবার কি কথা বলবার জন্যও সরি বলতে হবে?

সত্য : (ঘাড় নাড়ে) আপনার পিছনে...

রুমনা : হ্যাঁ জুট রিসার্চ ইন্সস্টিটিউট ! তো?

সত্য : ১৯৫২ সালে তৈরী। আর ঐ ইন্সটিটিউটের ভিতরে রয়েছে স্বাধীন ভারতের

স্বপ্ন দেখা প্রায় ৩০০০ দেশপ্রেমিকের প্রাণ!

রুমনা : মানে? এর ভিতরে কবরস্থান ছিল? পরে জুট ইন্সটিটিউট তৈরী হয়েছে।

সত্য : না। গণহত্যার খবর চাপা দিতে জুট ইন্সটিটিউট তৈরী হয়েছে। ঐ মানুষগুলোর জন্য একটু যদি আস্তে কথা বলা যায়....

রুমনা : দাঁড়ান, দাঁড়ান! জালিয়ানওয়ালাবাগে ৩৭৯ জনের হত্যা এখানে ৩০০০ জন! কি বলছেন মশাই! জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রায় দশগুণ অথচ তার কথা আমি ... মানে আমরা কেউ পড়িনি?

সত্য : আমরা তো সেটুকুই পড়ি, সেটুকুই জানি, যেটুকু আমাদের জানানো হয়...

রুমনা : এক মিনিট! বয়েসে কম দেখে বোকা বানানোর চেস্টা করবেন না প্লিজ! ইতিহাস আমার প্রিয় বিষয় আর হায়ার সেকেন্ডারির পর সেটা নিয়েই পড়বার ইচ্ছে রয়েছে!

সত্য : বেশ তো! ইতিহাসপ্রিয় ছাত্রীকে ইতিহাসের কথা শোনাতে কিন্তু আমার খারাপ লাগবে না। কিন্তু ভাই, আপনি কি সত্যিই শুনতে চান?

রুমনা : যদি ইতিহাসটা ইতিহাসই হয় ! দুধে চোনা বা জল- কোনটাই কিন্তু আমার পছন্দ নয়।

সত্য : (হাসি) এইজন্য এই প্রজন্মকে আমি এতো ভালবাসি! কোন ভনিতা নেই, সবকিছু সোজা সরল। কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত কথা বলতে কিন্তু আমার হাফ লাগবে। তোমার অটো আসতে এখনো দেরী আছে। সামনে হরির দোকানে চা আর বেকারি বিস্কুট .. চলবে?

রুমনা : চলবে । বেশ চলুন!

উভয়ে কথা বলতে বলতে চায়ের দোকানের বাইরে বেঞ্চে এসে বসে-

সত্য : এই কাহিনী সেই; সেই গড়পরতা ভারতীয়দের উপর ব্রিটিশদের অত্যাচারের গল্প নয়; বরং এ' এক ঘৃণ্য রাজনীতির গল্প, যার কলঙ্ক ব্রিটিশদের থেকে অনেক বেশী আমাদের।

রুমনা : Interesting! কিরকম?

সত্য : স্বাধীন মাতৃভুমির যে স্বপ্ন নেতাজী দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন দুচোখে নিয়ে এই দেশের বহু তরুণতরুণী সব ছেড়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন... আর আমাদের পিছনে সেই আজাদ হিন্দ বাহিনীর সব থেকে বিশ্বস্ত ১৫০০ থেকে ৩০০০ মানুষের গণ কবরখানা, গণহত্যা কেন্দ্র। রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যানে যার সংখ্যা মাত্র ৫!

রুমনা : ৫!

সত্য : শুধু ৫, না। শ-ও না!

হরির চায়ের দোকান। থেকে দু-গ্লাসে চা আর দুটি বিস্কুট এনে সত্য

রুমনার হাতে একটি গ্লাস আর একটি বিস্কুট দেয়। পাশে বসে।

রুমনা : একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আচ্ছা, আপনি আমাকে বলছেন কেন? এমন ঘটনা তো কাগজের হেডলাইন, সেন্সেশন্যাল নিউজ!

সত্য : খবর করতে প্রমাণ লাগে। তা কই?

রুমনা : মানে?

সত্য : (হাসে) গল্পটা আগে বলি তারপর না হয় প্রশ্ন কোরো।

রুমনা : বেশ তাহলে শুরু হোক!

সত্য : কাহিনীর শুরু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। ৩০শে এপ্রিল হিটলার মারা গেলেন। মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করল নাতসীরা। সারা ভারত তখন উত্তাল; বঙ্গভঙ্গ, ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্লোগান উঠছে মুহুর্মুহু। ওদিকে আজাদ হিন্দ বাহিনী তখন কোহিমা, নাগাল্যান্ড, মণিপুর দখল করে ফেলেছে আর নেতাজী গেছেন অন্তর্ধানে। বিপুল এই আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভরণপোষণ অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। জাপান থেকে যে সাহায্য আজাদ হিন্দ বাহিনী মানে আই এন এ পেত- হিটলারের মৃত্যুর পর তা পুরো বন্ধ। সম্ভবত অন্তরাল থেকে নেতাজী আদেশ দিয়েছিলেন আই এন এ কে আত্মসমর্পণ করতে। কিন্তু এই ১৯০০০ মানুষের আজাদ হিন্দ ফৌজকে জেলে ভরবার জায়গা কোথায়? ইংরেজরা জেলে থাকা চোর-ডাকাত-খুনীদের প্যারোলে মুক্তি দিয়ে আসন সংখ্যার তিনগুণ বাড়িয়েও সবাইকে জেলে ভরতে পারল না। ফলে আসেপাশের মাঠ, পশুখামার ঘিরে এদের বন্দী রাখা হোল। সাথে চলল গ্রেডেশন!

রুমনা : গ্রেডেশন? সেটা আবার কি?

সত্য : যারা কট্টর দেশপ্রেমিক তারা ব্ল্যাক, যারা দেশপ্রেমিক কিন্তু ব্রিটিশদের কাছে তেমন ভয়ানক নয় তারা গ্রে আর যাদের দেশপ্রেম দোদুল্যমান তারা হোয়াইট।

রুমনা : বাপরে! কি ভয়ানক।

সত্য : সেই সময় বড়লাট থাকত ব্যারাকপুরের লাটবাগানে আর ছোটলাট থাকত এই যে জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এখনে! দেড় হাজার ব্ল্যাক মানে খাঁটি দেশপ্রেমিককে নিয়ে এসে ছোটলাটের আবাসস্থলের অদূরে খোলা মাঠে, বেড়া দিয়ে ঘিরে, ওয়াচটাওয়ার বানিয়ে বন্দী রাখা হোল। পশুদের মতো। রোদ, ঝড়বৃষ্টি, শীত ... অতগুলো মানুষ! শুধু আধপেটা খাবার নয়, পানীয় জলটুকুও ভালভাবে দেওয়া হোত না। কিন্তু খাদ্য-পানীয় আর কবে প্রেমের পথে কাঁটা হতে পেরেছে। ফলে খিদে-তৃষ্ণা ভুলে মাঝে মাঝেই এখানে ভেসে উঠত কদম কদম বাড়ায়ে যা বা নেতাজী জিন্দাবাদ বা আজাদ হিন্দ

ফৌজ জিন্দাবাদ স্লোগান। দিল্লীর লালকেল্লায় তখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর ধৃত সৈনিক যাদের prisoner of war বা সংক্ষেপে POW বলা হোত, তাদের বিচার হোত।

রুমনা : আচ্ছা! তাহলে এই ব্ল্যাক মানে চরম দেশপ্রেমিকদের আলাদা করে এখানে আনার দরকার কি ছিল?

সত্য : ব্রিটিশরা কোনদিন চায়নি এই ব্ল্যাকদের সর্বসমক্ষে লালকেল্লায় এনে বিচার করতে। তাতে দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র, সাধারণ মানুষ ... সবার সামনে মহিমা ক্ষুন্ন হোত যে।

রুমনা : তাহলে?

সত্য : নীলগঞ্জের এই জায়গাটা ছিল ব্রিটিশ বাহিনীর মাদ্রাজ রেজিমেন্টের আয়ত্ত্বে। আর এই রেজিমেন্টের প্রধান ছিল E.R.R. Menon! সেদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর, রাত প্রায় দশটা ....

## দৃশ্য-২

নেপথ্যে ক্ষীণভাবে শোনা যায় সমবেত কণ্ঠে কদম কদম বাড়ায়ে যা (https;//youtu.be/SC3xBMUBv8U) মঞ্চের এক কোণে রাখা একটি টেলিফোন বেজে ওঠে। রাতের পোশাকপরা ক্যাপ্টেন ই আর আর মেনন ঘুম চোখে এসে সাউথ ইন্ডিয়ান উচ্চারণে ফোন ধরে-

মেনন : Company Commander Captain Menon speaking! (সচকিত হয়ে) Yes Sir! All the Prisoners?!! Very right Sir! Ok Sir! First I'm going to start roll call and would start it after that? Ok Sir ! Good Night Sir! ... Yes Sir! Only one Question Sir ... খুশখবরি কেয়া কাল আপ কো শুনাউ ইয়া আজ রাত কো হি? .... Yes Sir! Very Right Sir!

মেনন ফোন রেখে দেয়। চিৎকার করে-

মেনন : Guards!

এদিকের আলো নেভে। সমবেত সঙ্গীতের আওয়াজ তীব্র হয়। মঞ্চের মাঝখানে অন্ধকার মাঠ। পাশাপাশি ঠেস দিয়ে শুয়ে থাকা কিছু শরীর।

গাঙ্গুলী : ইজাজ, পেটের ব্যথাটা কি কম বোধ হয়?

ইজাজ : হা! গায়েব হি হো গয়া লাগতা হ্যায়!

গাঙ্গুলী : সে কি রে! সকাল থেকে প্রায় তিরিশবার দাস্ত, সাথে বমি, অসহ্য যন্ত্রণা... হঠাৎ কি এমন হোল যে ব্যথা নিমেষে গায়েব?

ইজাজ : (হাসে) গাঙ্গুলীদা, গানা কাম কর গয়া! যব ভি ম্যায় এ গীত শুনতা না.. মেরা হর দর্দ উব যাতা হ্যায়! (এক লাইন গেয়ে উঠবার চেষ্টা করে কিন্তু

পেটের যন্ত্রনায় ককিয়ে উঠে ওয়াক তুলে বমি করতে যায়)

গাঙ্গুলী : কথা বলিস না ভাই! Acute dehydration, একটু জলও নেই ... (উচ্চকিত) কারো কাছে একটু জল হবে? পানি চাহিয়ে ইজাজকে লিয়ে! মুহূর্তে পানি, জল এই শব্দ দুটিকে নিয়ে বেশ কোলাহল শুরু হয়। এর মধ্যে কেউ একজন নারকেল মালায় একটু জল নিয়ে আসে-

১ বন্দী : লিজিয়ে জনাব, সাবধানিসে লিজিয়ে, আন্ধেরে মে কুছ দিখাই নেহি দেতা!

গাঙ্গুলী : নে ভাই! একটু চুমুক দে!

ইজাজ একটু চুমুক মেরে আবার বমি করতে থাকে আর বলে-

ইজাজ : বহুত দর্দ দাদা! মুঝে উধার লে চলো, জাগা গন্ধা হো জায়েগা!

গাঙ্গুলী : ভাইসব, ইজাজকে একটু ধরো। মাঠের ওদিকে দ্যাখো তো নিয়ে যাওয়া যায় কিনা!

দুজন লোক এসে ইজাজকে সরিয়ে নিয়ে যায়। প্যাটেল আসে-

প্যাটেল : মুঝে কুছ আচ্ছা নহি লাগ রাহা হ্যায়! dehydration বহুত হ্যায়! আভি ডক্টর বুলানা চাহিয়ে।

ঘোষ : কি যে কও প্যাটেলভাই! খাবারই দেয় না হালারা আবার ডাক্তার দেখাইবো! (মাঠের পাশে গিয়ে ঘাড় উঁচু করে টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে) হেই ডাক্তার বুলাও। আদমি বিমার ! হেই!

নেপথ্যে : (ওয়াচ টাওয়ার থেকে) কেয়া?

ঘোষ : আদমি বিমার! উল্টি করতাসে সাথে দাস্ত!

নেপথ্যে : চুপ রহো! হল্লা মত!

ঘোষ : এই হালার পো! হাল্লা দ্যাখছোস তুই? দেড় হাজার মানসে একসাথে যখন স্লোগান তুলুম না তগো ঐ ছুটলাটের ঘুম উইব্যা যাইবো।

নেপথ্যে : কা চাহিয়ে?

ঘোষ : ডাক্তার, পিনেকা জল, পানি! পানি বোঝস?

নেপথ্যে : হা সামঝে! আভি হামারা মুত নেহি লাগা, সবুর করো! লাগনে সে তুমকো জল, পানি সব মিল জায়েগা! (হাসি)

সকলে হই হই করে তেড়ে যায়। আজাদ হিন্দ বাহিনী জিন্দাবাদ! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! নেতাজী জিন্দাবাদ- স্লোগানে চারদিক ভরে ওঠে। বাইরে থেকে এক সেপাইয়ের চিৎকার ভেসে আসে-

সেপাই : তফাৎ যাও! কোম্পানি কম্যান্ডার ক্যাপ্টেন ই আর আর মেনন সাব পধার রাহে হ্যায়! (দুজন সেপাই হাতে লাঠি নিয়ে ভিতরে এসে সকলকে পেটাতে থাকে আর মুখে বলে।)

সেপাই : হাটো, হাটো সব। লাইন লাগাও!

ঘোষ : এতো রাতে লাইন কিসের? এই সেপাই, কিসের লাইন?

সেপাই : (ডান্ডা উঁচিয়ে) পুছো মত! লাইন লাগাও! (হুমড়ি খেয়ে ইজাজের উপর চলে আসে প্রায়)

গাঙ্গুলী : Halt! যাকে সামনে আনা হচ্ছে সে এই দেশের বীর সন্তান। তোমার আর তোমার বাচ্চাদের সুন্দর আগামীর জন্য জেল খাটছে। অসুস্থ! সাবধান! (ইজাজকে সামনে এনে শোয়ানো হয়। কোনরকমে একটা লাইন তৈরী হয়। ক্যাপ্টেন আর আর মেনন ঢোকেন। হাতে খাতা ধরা একজন লোক আর তারপাশে হ্যারিকেন হাতে এক সেপাই। বন্দীদের মধ্যে গুঞ্জন তৈরী হয়। সেপাই চিৎকার করে-)

সেপাই : সাবধান!

মেনন : আভি এক most important কাম শুরু হোগা। Roll Call! তুম start করো!

গাঙ্গুলী : তামাশা নাকি? এই যে ক্যাপ্টেন মেনন! আমরা কেউ পালাব না। আগে এর চিকিৎসার ব্যবস্থা করো! রোল কল তারপরে হবে।

সমস্বরে : চিকিৎসা... চিকিৎসা!

মেনন : খামোশ! হাম যো বলেগা, বহি হোগা, Roll Call First!

ঘোষ : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ!

সমস্বরে : নিপাত যাক!

ঘোষ : আজাদ হিন্দ বাহিনী....

সমস্বরে : জিন্দাবাদ!

একটা সেপাই লাঠি উঁচিয়ে যায়! বন্দীরা হই হই করে। মেনন ইজাজের সামনে আসে-

মেনন : মর গ্যায়া কেয়া? হেই কুত্তা... হেই! (বুটের লাথি মেরে দ্যাখো সাড়া দেয় কিনা)

গাঙ্গুলী ছুটে এসে এক ধাক্কা মারে মেননকে - এতবড় সাহস!
সেপাইরা ছুটে আসতে থাকে বন্দীরা স্লোগান তোলে আর ইট, বাঁশের টুকরো ইত্যাদি ছুড়তে থাকে। একটা ইট গিয়ে লাগে মেননের গায়ে। মেনন ব্যথায় বসে পরে-

সেপাই : (চিৎকার করে) কোম্পানি কম্যান্ডার কো মার ডালা রে!
(সাথে সাথে সেপাইরা পাগলের মতো লাঠি চালাতে থাকে। মুহুর্মুহু আজাদ হিন্দ বাহিনী জিন্দাবাদ ধ্বনি ওঠে। হাতে খাতা আর হ্যারিকেন ধরা দুজন লোক কোনক্রমে মেননকে বাইরে নিয়ে যায়। বাইরে এসে মেনন বলে )

মেনন : Hell with roll call হাম লোগ আসলি কাম শুরু কর দেতে হ্যায়!

ছোড়ো মুঝে... এই মেসিনগান লাও। Call the Quarter Guards শালে swain (মেনন বেরিয়ে যেতেই বন্দীদের মধ্যে উচ্ছাস দেখা দেয়। তারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে।)

প্যাটেল : আও বদমাশো, দেখকে যাও! ভুখা পেটমে দেশপ্রেম কি জোশ!

(আবার নেতাজী জিন্দাবাদ শোনা যায়। হঠাৎ গাঙ্গুলী চেঁচিয়ে ওঠে-)

গাঙ্গুলী : ইজাজ! আমাদের ইজাজ গেল কোথায়?

অন্ধকারে হুড়োহুড়ি পরে যায়। দেখা যায় ধস্তাধস্তির সময় পদপিষ্ঠ হয়ে ইজাজ মারা গছে। গাঙ্গুলী ইজাজের সামনে বসে। ঘোষ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

গাঙ্গুলী : কাঁদিস না ঘোষ! আমাদের ইজাজ শহিদ হয়েছে।! চোখের জল না বরং আমরা সেই গানটা গাইব যেটা ও সব থেকে বেশী ভালবাসত।

নেপথ্যে কেউ গান ধরে- তেরে লিয়ে তেরা বতনকে সাথ বেকরার হ্যায় গান চলতেই থাকে। সকলে ইজাজকে ঘিরে গান গাইতে থাকে। মেনন নিজে মেশিনগান হাতে সাথে কয়েকজন সেপাই সকলের হাতে বন্দুক নিয়ে ঢুকে বন্দীদের দিকে তাক করে । বন্দীরা মেননদের দিকে না তাকিয়েই গান গাইতে থাকে।

মেনন : সবহি সেপাই Take your position... Fire!

মেননের মেশিনগান আর সেপাইদের বন্দুক গর্জে ওঠে। আবার মেননের আওয়াজ শোনা যায়-

মেনন : Load and Fire... Fast! এক ভি আদমি বচনা নেহি চাহিয়ে! সবহি কুত্তাকো মার ডালো! হুকুম এইসা হি হ্যায়! Fire করো Fire!

মেশিনগান আর বন্দুকের গুলির আওয়াজ আর চিৎকার অন্ধকারে প্রকট হয়। আলো নিভে আসে, আলোকিত হয় সত্য আর রুমনা যে বেঞ্চটিতে বসে আছে কেবল সেই বেঞ্চটিই।

সত্য : আমি তখন কিশোর। এই অঞ্চল তখন কেবল মাঠ, পুকুর, চাষের ক্ষেত আর দু-একটা ঘর। আমরা সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে বাড়িতে। সারা রাত গুলি চলেছিল সেদিন। মাঠের পিছন দিকটায় সাত-তাল, মানে পাশাপাশি সাতটি তালগাছ। গুলির আওয়াজ আসছিল সেদিক থেকেই। ভোর হতেই ছুটলাম সাততালের দিকে। কি ভয়ঙ্কর! সাততালের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া নোয়াই খালের রঙ লাল। বেশ কিছু লাশ মুখ থুবড়ে ইতিউতি পরে আছে, দূরে মাঠে অগুন্তি লাশের সারি। ভিতর থেকে এক সেপাই চিৎকার করল-ভাগ হিয়াসে, বরনা গুলি চালায়াংগে। জানের দায় বড় দায়! কারো বাড়িতে সেদিন রান্না হোল না। সবাই ক্ষোভে ফুঁসছে। বাবা, কাকা আরো কিছু মানুষ

ছুটে গেছিলেন প্রতিবাদ জানাতে। তাদের লাঠির বাড়ি মেরে ভাগিয়ে দেওয়া হয়। ঐ নিস্পাপ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লাশ সেদিন বেলচা ঠেলে টেনে হিঁচড়ে ট্রাকে ফেলে ব্যারাকপুর থেকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল বা পুতে দেওয়া হয়েছিল। ব্যারাকপুর-বারাসাতের এই রাস্তা তখন মোড়ামের। বাবা বলেছিল লাশ লড়িতে করে নিয়ে যাবার সময় লাল মোড়ামের রাস্তা শহিদদের রক্তে লাল গোলাপের মতো ফুটে উঠেছিল।

রুমনা : কি ভয়ংকর !! আচ্ছা, এরপর আর কোন প্রতিবাদ হয়নি?

সত্য : মানুষ কিন্তু মনে মনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। বন্দীদের শিকল বেঁধে ঐ যে আমাদের পিছনে, ঐ যে পুকুরটা... ওখানে স্নান করাতে নিয়ে আসা হোত। গ্রামের লোক দূর থেকে ওদের প্রণাম করত। তাই কেউ চাক বা না চাক একটা স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ শুরু হোল।

রুমনা : ওফ! তারপর?

সত্য : এলাকার, আশেপাশের এলাকার... বাইরে থেকেও অনেক মানুষ এসে বিক্ষোভ জানাতে থাকলেন। কিন্তু ...

রুমনা : কিন্তু কি?

সত্য : আজাদ হিন্দ বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর কংগ্রেস তখন অন্যতম প্রধান ভারতীয় দল ... জহরলাল নেহরু কংগ্রেসের প্রধান বক্তা...মঞ্চের অপর এক কোণে আলো জ্বলে। সামনে মাইক। জহরলাল এসে দাঁড়ায়।

নেহেরু : It is reported to me that at a camp prison, situated in Nilgunj, near Calcutta where over one thousand Indian National Army prisoners are kept, firing took place on or about the 25th Sep tember by the guards of these prisoners. It is stated that a large number of rounds were fired and as a result five of the prisoners died on spot and many were wounded.....

সাংবাদিকদের মধ্যে কোলাহল এবং প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার জন্য Sir, Mr. Nehru, জনাব... ভেসে আসতে থাকে। নেহেরু তাদেরকে হাত তুলে থামায়-

নেহেরু : Firing on prisoners within the four walls of prison is always a dreadful thing!

সাংবাদিকদের অনেকে কিছু বলতে চায়। নেহরু আবার তাদের দিকে হাত তুলে থামিয়ে বলে -

নেহেরু : That's all for today gentlemen! Have a good dayl

নেহেরু চলে যায়। মঞ্চের ঐ অংশের আলো আবার ফেড হয়ে বিলীন হয়। সত্য-রুমনার অংশে তা প্রকট হয়।

রুমনা : নেহেরু মাত্র পাঁচজনের কথা বলেছিলেন!! কিন্তু কেন?

সত্য : জানি না ! কিন্তু আজ অবধি সরকারি খাতায় সেই পাঁচ জনের কথাই লেখা আছে।

রুমনা : তাদের নাম ? ঠিকানা ?

সত্য : (ঘাড় নাড়ে) ঐ বন্দীদের নাম সম্বলিত একটি ফাইল ছিল শুনেছি কিন্তু সেটাকেও পরে আর পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাতে কি? নেতাজীর রক্তবীজ .. তাদের পাঁচ বলো বা পনেরোশো বা তিন হাজার..আসলে তো সবাই এক !

রুমনা : তা ঠিক ! আচ্ছা, এই নিয়ে আর কিছু হয়নি ?

সত্য : অনেক কিছুই হয়েছে। কাছেই সাধন বসুর তত্ত্বাবধানে নেতাজী মিশন তৈরী হয়েছে। ওদের সাথে অনেক মানুষ, গবেষক... অনেকেই আছেন। নিরন্তর চেস্টা চলছে- এই হঠাৎ করে হারিয়ে যাওয়া লোকগুলোর বলিদান সকলের সামনে নিয়ে আসার। সরকার, রাস্ট্রপতি... সকলের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে...

রুমনা : রেজাল্ট ?

সত্য : (মাথা নাড়ে) নাহ ! তবে আমরা কেউ হতাশ নই ! সত্য একদিন প্রকাশ হবেই !
রুমনা চুপ করে থাকে। একটু পরে সত্য বলে ওঠে-

সত্য : তোমাকে বলছিলাম না এই ঘটনার কলঙ্ক যতটা ইংরেজদের তার থেকেও বেশী আমাদের। কেন বলো তো ?
রুমনা জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

সত্য : সেই সময়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ছিল মাত্র ২% ইংরেজ আর ৯৮% ভারতীয়। তার মানে সেদিন আমরা মানে ভারতীয়রাই গুলি চালিয়েছিলাম আমাদেরই স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা ঐ হাজার হাজার মানুষগুলোর উপরে। তাদের রক্ত বিছানো পথে যে স্বাধীনতা এলো, আজ তাড়িয়ে তাড়িয়ে তার স্বাদ ভোগ করছি আবার আমরাই !
রুমনা মাথা নীচু করে কিছু বলতে গিয়ে থমকে যায়। সত্য বলে-

সত্য : এমন কি মৃত্যুর পর শহিদ হিসেবে স্বীকৃতি... সেটা জানাতেও হাজারের সংখ্যা কখনো পাঁচে নেমে আসে আবার কখনো বা শহিদদের নামের ফাইলই হারিয়ে যায় ! সত্য কি সত্যিই সামনে আসে ?

রুমনা : আসে.. আসবেই...আচ্ছা, আপনিও তো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ?

সত্য : কৈশোরের ঘটনা... আজও চোখে জীবন্ত ভাসে।
রুমনার ফোন বাজে। রুমনা পকেট থেকে ফোন বের করে কথা বলে-

রুমনা : হ্যাঁ মা ! আমি একটু আটকে পড়েছিলাম নীলগঞ্জে... না না সব ঠিক আছে। আমি একটু পরেই আসছি।

সত্য : তোমায় অযথা দেরী করিয়ে দিলাম। আসলে প্রত্যক্ষদর্শীরা তো সকলে

| | | |
|---|---|---|
| | | একে একে চলে যাচ্ছেন। আমারও বয়েস হয়েছে... বড় লোভ হয়। |
| রুমনা | : | কিসের লোভ? |
| সত্য | : | (হাসে) যে কাজ আমরা পারলাম না সেই কাজে যদি আগামী প্রজন্ম এগিয়ে আসে। |
| রুমনা | : | হায়ার সেকেণ্ডারির পর আমার জে এন ইউতে ইতিহাস নিয়ে পড়বার ইচ্ছে আছে। আমি কিন্তু আসব ... পড়াশোনা শেষ করে, আরো তৈরী হয়ে আমি আসবই আপনার কাছে। |
| সত্য | : | (রুমনার মাথায় হাত দেয়) আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব মা। আর যদি বয়স সাহায্য না করে তবে আমাদের লেখা, বিবরণী, আরো যা কিছু প্রয়োজন... তুমি এখানে নেতাজী মিশনে এসে খোঁজ কোরো। ওরা মনে হয় এতো তাড়াতাড়ি রণে ভঙ্গ দেবে না। |
| রুমনা | : | আজ তাহলে যাই? |
| সত্য | : | এসো। তোমার অটো এলো বলে .... |

রুমনা এগিয়ে এসে শহিদ বেদীর সামনে দাঁড়ায়। শ্রদ্ধায় মাথা নীচু করে। মুহূর্তে যেন চারধারে সব কিছু থেমে যায়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর জাতীয় সংগীত (কবিগুরুর রচনার হিন্দী অনুবাদ) ভেসে আসে, দেখা যায় অগুণতি বন্দী মনের আনন্দে একত্রে গেয়ে চলেছে।

https://www.youtube.com/watch?v=DDv8VEPvg=8

**References**


https://zeenews india.com/video/india/deshhit-there-was-a-bigger-massacre-in-india-than-jalianwala-bagh-2337326html

https://www.myindiamyglory.com/2019/10/08/1945-nilganj-massacre-how-british-shot-2000-ina-soldiers-in-det-camps/

https:issuu.com/swamijyoti/docs/ina_pow_massacre_of-1945

https://www.netajisubhasbose.org/impact-of-ina-on-india-s-freedom

https://www/myindiamyglory.com/2019/10/08/1945-nilganj-massacre-how-british-shot-2000-ina-soldiers-in-det-campus/


লেখক ঃ **অনির্বাণ সেন**, পশ্চিমবঙ্গোর নব প্রজন্মের নাটককার।

## আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে
## নৃত্য-নাট্য-গীতি আলেখ্য

# অন্বেষণ

**পার্থ মজুমদার**

(শুরুতেই দেখা যাবে মঞ্চে কোন একটি চক্র। ঘূর্ণায়মান চক্রের মাঝখানে কোন মানুষের মুখ। আলো কেন্দ্রীভূত হবে চক্রে- মানুষের মুখ থেকে ভাষ্য চলবে। প্রয়োজনে যান্ত্রিকভাবে মানুষের মুখের ঠোঁট নাড়িয়ে রেকর্ডিং ভাষ্য হতে পারে। আনুষঙ্গিক আবহ।)

**ভাষ্য ঃ-** ভারতবর্ষ এক ঐতিহ্যের নাম- পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, সম্পদ, শিক্ষা, মানবসম্পদ-এর এক নাম। বৈদেশিক আগ্রাসনকারীদের কাছে এক ঈর্ষার নাম। তাই, সুদীর্ঘকাল ধরে চলে ভারতবর্ষের বুকে আগ্রাসন। আগ্রাসন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সামাজিক নানাহ ধরনের। সনাতনী সহিষ্ণু মানসিকতা সেই আগ্রাসন রুখতে হয় ব্যর্থ। সেই সহিষ্ণুতা এবং সরলতাকে পাখির চোখ করে ২৪শে আগস্ট ১৬০৮ ভারতবর্ষের মাটিতে ব্যবসার নামে পা রাখে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী- ব্যবসার ছদ্মবেশে শুরু হয় ব্রিটিশ আগ্রাসন-ভারতীয়দের উপর অত্যাচার-ভারতবাসীর জীবনযাত্রা হয়ে উঠে দুর্বিষহ। ধীরে ধীরে প্রতিবাদের ভাষা উচ্চারিত হতে থাকে। (নৃত্যের মাধ্যমে আনুষঙ্গিক আলো আবহ সহ ইংরেজদের অত্যাচার-এর দৃশ্য দৃশ্যায়িত হবে।)

**ভাষ্য ঃ-** প্রায় ২৫০ বছর - ভারতবাসী সহ্য করল এই অত্যাচার - শুরু হল শৃঙ্খলমুক্ত হবার অদম্য ইচ্ছা- বীর সেনানী মঙ্গালপান্ডের নেতৃত্ব আজ থেকে ১৬৫ বছর আগে ১৮৫৭ সালের ১০ মে উত্তর প্রদেশের মিরাট শহরে শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহ-বিচ্ছিন্নভাবে হলেও তার উত্তাপ এসে পৌঁছায় সমগ্র ভারতবর্ষে- অবিভক্ত বাংলাও বাদ যায়নি। চট্টগ্রাম থেকে আগত সিপাহীদের নেতৃত্ব দেন ত্রিপুরায় রাজ পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ভূপেন্দ্র নাথ সিং-এর পিতা - রাজকুমার নরেন্দ্রজিৎ সিং। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হেরে স্থান হয়- কালাপানি- বর্তমানে আন্দামানের সেলুলার জেলে (ভাষ্য চলাকালীন -মঞ্চে অভিনয় করে সিপাহী বিদ্রোহের দৃশ্য দেখানো হবে)

(গান) গুঞ্জ উঠি সংসত্তা বননে মঙ্গাল পান্ডে কী ললকার/যাও গৌর ভারত ছোড়, যাও আপনা দেশ কে পার/ রানী ঝাঁসী, তাঁতিয়া টোপী, নানাজী দিল্লী দরবার/ আংরেজোকে মার ভাগা সব নে মিলকর কিয়া কারার/ কাফির পল্টন আংরেজিকি দেখ বাগীও কি তলবার/ চলি তো চলে আও যেয়সে টোপে যেয়সী বারংবার/ লোহে সে লোহা বাজতা থা মচী হুয়ী থি

চিক পুকার/ সুনো কোম্পেনিবালে সমঝো নেই সহেঙ্গো অত্যাচার।

(মঞ্চে দৃশ্যায়িত হবে চম্পারণ সত্যাগ্রহ ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার দৃশ্য - চলবে ভাষ্য)

**ভাষ্য ঃ-** সিপাহী বিদ্রোহ সফলতার মুখ না দেখলেও ভারতবাসীকে জাগিয়ে দিয়ে যায়। যদিও বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ইংরেজদের মনে ন্যূনতম ভয় সঞ্চারে হয় ব্যর্থ। প্রায় ৬০ বছর পর ১৯১৭ সালে গান্ধীজির নেতৃত্বে শুরু হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত স্বাধীনতা আন্দোলন। চম্পারণ সত্যাগ্রহ ১৯১৯ -এ ডঃ কিচলু ও ডঃ সত্যপাল -এর নেতৃত্বে জালিয়ানওয়ালাবাগ বিদ্রোহ কেঁপে উঠে ইংরেজ প্রশাসন।

**গান ঃ-** পদ্মশ্রী মালিনী অবস্তী-র চম্পারণ সত্যাগ্রহের উপর গান সঙ্গে চলবে ছৌ/ভারতনাট্যম/কথক বা সমকালীন নৃত্য)

এক কাঠেরে লে গান্ধী বাবা/অরি ভারত মাইকে ললনা/আরে সত্যাগ্রহকে ভরে লে হুঙ্কার-রে চম্পারণ মে/ মাদরী হিন্দ কী -আঁখ কা তারা গান্ধী/চরক পর পর্ন কে পুরনো সিতারা গান্ধী/জেলখানে মে ভিজা করকে উঠানা পুরা/মুলকোকে বাস্তে করতে হে গহবারা গান্ধী/জো দিল মেরুবা হে দেশ কা তো/ কভি না গেহরো কামাল লেইঙ্গো/ মঝে মে মতিয়া হে দেশকা মালা/ স্বদেশ কা হম জবা করেঙ্গো/ হামারি কারিগরি কো চৌপট/ কিয়েহে পরবাস বিদেশ বালে/ গুলাম হামকো বানায়ে উনকে হুনর সে আপনে উজার দেঙ্গো/ স্বদেশ কা হব জবা করেঙ্গো।

**ভাষ্য ঃ-** (মঞ্চে দৃশ্যায়িত হবে অসহযোগ আন্দোলনের বা জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের দৃশ্য, চলবে ভাষ্য) ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃসংস হত্যাকান্ডে ভারতবাসী কেঁপে উঠে, আরও দৃপ্ত হয় স্বাধীনতার আকাঙ্খা। ১৯২০ সালে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন-অনেকাংশে সফল এই আন্দোলনে চলে ইংরেজদের সঙ্গে অসহযোগিতা। আসমুদ্র হিমাচলে ছড়িয়ে পরে এই সংঘবদ্ধ আন্দোলন।

**গান ও নাচ ঃ-** সরফোরসী কি তমন্না আজ হামারে দিলমে হে/ দেখনা এ জোর কিতনা বাজু-এ- কাতিল মে হে/ এক সে করতা নেহী কিউ দুসরী কুছ বাতচিত/ দেখতা হু মে জিসে ও চুপ তেরী মেহফিল মে হে/ ইয়ে এ শহীদ-এ -মুল্ক মিল্লত মে তেরে উপর নিসার/ আব তেরী হিম্মত কি চর্চা গের কি মেহফিল মে হে/ সরফোরসী কি তমন্না আজ হামারে দিল মে হে/ হাত জিসমে হে জুনুন, কাটতে নেহী তলবার সে/ সর জো উঠ জাতে হে ও ঝুকতে নেহী ললকারসে/ঔর ভরকেগা জো শোলা সা হামারে দিল মে হে/ সরফোরসী কি তমন্না আব হামারে দিল মে হে/ হাম তো ঘর সে হী নিকলে বাঁধকর সরপর কফন/ জো হাথেলী পর লিয়ে লো বড়/ চলে হে ইয়ে কদম/ জিন্দেগী মে আপনী মেহমা মৌত কে মেহফিল মে হে/ সরফোরসী কি তমন্না আব হামারে দিল মে হে।

**ভাষ্যঃ-** ১৯২১- ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হন— ভারতবর্ষের সর্বকালের অন্যতম বীর সেনানী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস- আন্দোলনের অভিমুখ দুই ধারায় বইতে শুরু করে। গান্ধিজীর নেতৃত্বে অহিংস আন্দোলন ও অন্যদিকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহিংস আন্দোলন। নেতাজীর শৌর্য্য, বীর্য কাঁপন ধরায় ইংরেজ প্রশাসনে।

**নাচ ও গান ঃ-** কদম কদম বাড়ায়ে যা/ খুশি কে গীত গায়ে যা/ ইয়ে জিন্দেগী হে কৌম কী/ তু কৌম পে লুটায়ে যা/ তু শের এ হিন্দ আগে বড়/ মরনে সে তু কভি না ডর/ উড়াকে দুশমনো কা শর/ জোশ-এ বতন বাচায়ে যা/চলো দিল্লী পুকারকে/কৌমিনিশান সমাহালকে/ লালকিলি পে গড়কে / লেহরায়ে যা / লেহরায়ে যা।

**ভাষ্য ঃ-** এর মধ্যে কেটে যায় প্রায় ১০টি বছর, ১৯৩০, সংঘটিত হয় আরেকটি সংঘবন্ধ সফল আন্দোলন ডান্ডি অভিযান। গান্ধিজীর নেতৃত্বে দীর্ঘ অহিংস পদযাত্রা রূপ নেয় এক সর্বভারতীয় আন্দোলনে। আবালবৃদ্ধবনিতা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে অংশ নেয় এই অভিযানে।

অন্যদিকে নেতাজী সুভাষের আদর্শে প্রাণিত হয়ে বিপ্লবীরা ইংরেজদের উপর আক্রমণ তীব্র করে তোলে। মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের চেস্টা এবং তার ফলশ্রুতিতে সূর্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী বিপ্লবীদের আন্দোলনে দেয় ঘৃতাহুতি। সারা ভারতবর্ষ সংঘবন্ধভাবে ধারাবাহিক আক্রমণ হানতে থাকে ইংরেজদের উপর।

**গান ও নাচ ঃ-** কারার ঐ লৌহকপাট/ ভেঙে ফেল কর রে লোপাট/ রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী/ ওরে ও তরুণ ঈশান/ বাজা তোর প্রলয় বিষান, ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী/ কারার ....

**ভাষ্যঃ-** সময় বয়ে যায় প্রায় এক যুগ। অহিংস ও সহিংস ধারার বিপ্লবীরা নিজেদের শান দিতে থাকে এক চূড়ান্ত আন্দোলনের জন্য। ১৯৪২-৪৩ ভারতবর্ষের ইতিহাসে যা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। একদিকে গান্ধিজীর নেতৃত্বে অহিংসবাদীরা শুরু করে ভারত ছাড়ো আন্দোলন যদিও পুরো আন্দোলনকে গান্ধিজী অহিংস রাখতে ব্যর্থ হন ভারতবাসীর স্বাধীনতার উগ্র বাসনার জন্য। অন্যদিকে নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনী মিত্র শক্তি জাপানের সহযোগিতায় আন্দামান দ্বীপে উত্তোলন করেন ভারতবর্ষের বুকে প্রথম স্বাধীন তিরঙ্গা পতাকা। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে ইংরেজ প্রশাসন। (ভাষ্য চলাকালীন পর্দায় ভারত ছাড়ো আন্দোলনের বিভিন্ন দৃশ্য দেখা যাবে সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ডে- এ চলবে গান—)

**নাচ ও গান ঃ-** আজ দেশ কি মিট্টি পেয়াসী/রক্ত দান দো- পেয়াস বুঝাও/ রঙ রূপ মে দের খেদ মে আত্ম জ্যোতিকে দীপ জ্বালাও/ আজ দেশকে মিট্টি পেয়াসি/ কর্মদ্বারা কি মিট্টি খিচো দানে ফেকো, বর্তমান কি পঙ্কুরি মো মধু ভবিষ্য কে ফুল খিলেঙ্গে আজ দেশ ...... নয়ে রাজকে নন্দনবন কি ডালি পর নব কলিয়া আয়ে যুগকে কাটো মে তাল হইয়া ডালে জন স্বপ্নে মুসকায়ে আজ দেশ কি ....

**ভাষ্য ঃ-** কি ন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির পরাজয় এক চরম আঘাত হয়ে নেমে আসে সহিংসবাদীদের কাছে — কিন্তু ততদিনে অধিকাংশ ভারতবাসী নেতাজী প্রদর্শিত পথে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ণ স্বরাজ- এর দাবী নিয়ে। ব্রিটিশরা উপলব্ধি করতে পারে তাদের বিদায় আসন্ন। চূড়ান্ত এক অভিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিয়ে অবশেষে বিদায় নেয় ইংরেজরা। ভারত ভাগের মত এক বুক ক্ষত নিয়ে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭—

**গান ও নাচ ঃ-** (এ . আর. রহমান -এর তৈরী বন্দেমাতরম গানের স্থায়ী অংশ)

মা-বন্দেমাতরম (৮বার)
ইহা-বাহা- সারা জাহা দেখ লিয়া
আব তক ভি তেরে জেয়সা কোই নেহী।
মে এ্যায়সি নেহী, শ দিন দুনিয়া ঘুমা হে
নেহী কাহে তেরে যেয়সা কৌই নেহী হে
মে গায় জাঁহা ভি
বাস তেরে ইয়াদ থি
যো মেরে সাথ থি
মুঝকো তরপা -বুলাতি
সব পে পেয়ারী তেরী সুরত
পোয়ার হে বাস তেরা, পেয়ার হি
মা তুঝে সেলাম—

(এই অংশে পদ্মশ্রী মালিনী অবস্তীর গাওয়া বন্দেমাতরম গানের অংশ যুক্ত হবে)
শুদ্ধ সুন্দর অতি মনোহর মন্ত্র বন্দেমাতরম/বিশ্ববিজয়ী, শত্রু বিজয়ী মন্ত্র বন্দেমাতরম/মন্ত্র ইহা হে, মন্ত্র ইহা হে, যন্ত্র বন্দেমাতরম/ বৌজমায়াপল কান্তি মায়াসু সুখশান্তি বন্দেমাতরম/ নারীওকে রক্তমে বহেতাও বন্দেমাতরম।

বি.দ্র : গানগুলি নেওয়া হয়েছে ইউটিউব থেকে।

লেখক : **পার্থ মজুমদার,** ত্রিপুরার বিশিষ্ট অভিনেতা, পরিচালক ও নাটককার।

## সত্যজিৎ রায়ের গল্প অবলম্বনে
# 'খগম'

নাট্য রূপান্তর ঃ **সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়**

চরিত্র ঃ সমরেশ, ঋত্বিক, বাবুরাম, বেয়ারা, ইমলিবাবা

(মঞ্চটা দু-ভাগে বিভক্ত। মঞ্চের পিছনে জঙ্গালঘেরা পাহাড়ের অবয়ব। এই অবয়ব ঘেঁষে বামদিকে তৃতীয় উইংস বরাবর একচালার কুঁড়েঘরের দাওয়া। তাতে কুঁড়েঘর আর পাহাড়ি জঙ্গালের মাঝে, ঐ উইংস বরাবর এক ফালি রাস্তা রয়েছে। আর সামনের দিকে ডানদিকে প্রথম-দ্বিতীয় উইংস-এর পরিসর জুড়ে গেস্ট হাউসের একটি ছিমছাম ঘরের প্রতীকী দৃশ্যপট। দ্বিতীয় উইংস -এ এই ঘরের প্রবেশ দরজা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের এই রেস্ট হাউসের একটি ঘর। সিঙ্গাল চৌকি চাদর ঢাকা। চৌকিতে বালিশ আছে, আর রয়েছে পাট করে রাখা কম্বল। ঘরের মাঝামাঝি অংশে ছোট টি-টেবিল সংলগ্ন বসার টুল, সুদৃশ্য কাপড়ে ঢাকা। টাইটেল মিউজিক শেষ হবার পর, পর্দা খুললে দেখা যায়- পঞ্চাশ উর্ধ্ব বয়সের সমরেশ চৌকিতে বসে ধূমপানে রত। আর টুলে বসে চল্লিশ উর্ধ্ব ঋত্বিক ব্যস্ত মদ্যপানে। )

সমরেশ : তুমি যাই বলো ঋত্বিক— জায়গাটা কিন্তু ভারী সুন্দর।

ঋত্বিক : আপনি কি অসুন্দরকে সুন্দর বলে, বিশেষ কোনো বাহবা পেতে চান?

সমরেশ : একথা কেন বলছো?

ঋত্বিক : কেন বলবো না? এতো দেখছি- মশা-মাছির ভাঁড়ার। যেদিকে তাকাচ্ছি, সেদিকেই ডাঁই করা ঝোপঝাড় যেমন রুক্ষ পাহাড়, তেমনি রুক্ষ জঙ্গাল। না আছে জনবসতি, না আছে নদী।

সমরেশ : তাতে কি?

ঋত্বিক : আরে মশাই— যে জঙ্গালে ফুল-ফল নেই, আর পাহাড়ে নেই ঝর্ণা, তার কোনো সৌন্দর্যও নেই।

সমরেশ : আছে ঋত্বিক আছে। সেটা আছে বলেই ত আমরা এখানে এসেছি।

ঋত্বিক : সেটা ত পেশাগত কারণ। আপনিও জানেন, আর আমিও — (ঢেঁকুর তোলে বিকট শব্দে, উঠে দাঁড়ায় ও পায়চারি করতে থাকে।) বুঝলেন সমরেশদা— চাকরির সুখ হল মেঘের ছায়া, তবুও দেখুন— সেটার জন্য আমাদের কতো মায়া।

সমরেশ : সে যাই হোক — জীবিকাই কিন্তু জীবনের আসল রক্ষা-কবচ।

ঋত্বিক : তা বটে। আর সেজন্যই দায়ে পড়ে এই দ্বীপান্তরে আসা। নইলে সাধ করে কেউ যে এখানে আসে না, তা এই হোটেলের ঘর দোরের ছিরিছাঁদ দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

সমরেশ : আসলে এই জাতীয় প্রান্তিক গ্রামগুলো, এমনই দুর্গম এলাকা— উন্নয়নের মানচিত্রে এখনো কোন প্রবেশ অধিকার পায়নি।

ঋত্বিক : পাবার কথাও নয়। ভাবতে পারেন সমরেশদা — বিশ কিলোমিটার দূরে বাজার?

সমরেশ : তবু দ্যাখো— বিদেশী ট্যুরিস্টদের কেমন আনাগোনা।

ঋত্বিক : ব্যাটাদের মাথায় নিশ্চই কোন ধান্দা রয়েছে।

সমরেশ : ধান্দা! আমার কিন্তু সেটা মনে হয় না।

ঋত্বিক : তাহলে কি আমাদের মতো দায়ে পড়ে?

সমরেশ : কি জানি। তবে এরা সত্তর কিলোমিটার আগে ডাকবাংলো ট্যুরিস্ট লজে ছিল। জঙ্গল দেখার জন্য এই রেস্ট হাউসে উঠেছে।

ঋত্বিক : বাব্বা— এতো খবর জেনে ফেলেছেন?

সমরেশ : ওদের সঙ্গে যে কুকুরটা আছে— জার্মান শেফার্ড। তাকে নিয়ে ওরা অলরেডি কয়েকটা কান্ট্রি ট্যুরও করে ফেলেছে।

ঋত্বিক : আপনার ত মশায় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে জার্মান শেফা— না-না, ওই জার্নালিস্ট অথবা টিকটিকি হওয়া উচিৎ ছিল।

সমরেশ : কি জানো ঋত্বিক — যখনই কোন পাহাড়, জঙ্গল কিংবা সমুদ্রের কাছে যাই— কেন জানি না - নিজেকে অন্যরকম মনে হয়।

ঋত্বিক : কিরকম?

সমরেশ : আমার রোজকার আমিটাকে আর আমার মধ্যে পাই না। একটা অন্য আমি-তে রূপান্তর ঘটে যায়।

ঋত্বিক : কৈ! আমার তো সেরকম কিছু হয় না।

সমরেশ : হয় - হয়। হতে বাধ্য।

ঋত্বিক : কিন্তু কেন?

সমরেশ : জন্মান্তর।

ঋত্বিক : জন্মান্তর?

সমরেশ : দ্যাট মিন্স বিবর্তন।

ঋত্বিক : যেমন?

সমরেশ : হয় লৌকিক, না হয় অলৌকিক রূপান্তর নাকি অনবরত ঘটে চলেছে। আর ওভাবেই পরেই জংলী জানোয়ার থেকে বনমানুষ—পরবর্তীকালে তোমার-আমার মতো মানুষের আকৃতি পেয়েছে।

ঋত্বিক : ওসব এখন ছাড়ুন। এবার কাজের কথায় আসুন।

সমরেশ : যা ইনফরমেশন— তাতে পাহাড়ের কাছাকাছি চত্বরটায়, ঐ খনিজ সম্পদের সন্ধান মিললেও মিলতে পারে।

| | | |
|---|---|---|
| ঋত্বিক | : | তাহলে আর দেরি কেন? চলুন বেড়িয়ে পড়া যাক।<br>(টেবিলে গিয়ে মদ্যপানে বসে পড়ে) |
| সমরেশ | : | ও কি! ফের বসে পড়লে যে! |
| ঋত্বিক | : | বাবুরামকে ডাকুন— ততোক্ষণে আর এক পেগ হয়ে যাবে। যা ঠান্ডা বেড়োবার আগে শরীরটা একেবারে চাঙ্গা।<br>(সমরেশ ঋত্বিকের কথার মাঝে কাউকে ফোন করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়।) |
| সমরেশ | : | আমার আবার উল্টো— ড্রিঙ্কস্ বেশি নিলেই শরীর মন বড্ড কাহিল হয়ে পড়ে। |
| ঋত্বিক | : | আসলে আপনি এ রসের রসিক নন। |
| সমরেশ | : | উফ্ নাঃ— |
| ঋত্বিক | : | কি হল? |
| সমরেশ | : | কোনো টাওয়ার নেই। |
| ঋত্বিক | : | তাহলে বুঝতে পারছেন— কোম্পানি আমাদের কোন ধরনের নির্বাসনে পাঠিয়েছে? |
| সমরেশ | : | দাঁড়াও! বেয়ারাকে ডাকি। (২য় উইংসের দরজায় কলিং বেল টেপে) |
| ঋত্বিক | : | (মদ্যপান করতে করতে) এখানে এসে যে পাল্লায় পড়েছি, শেষে না গোল্লায় যেতে হয়। হেড অফিস থেকে আমাকে ভিড়িয়ে দিল। আরে বাবা— আমি হলাম এ্যাকাউন্টসের লোক, হিসাব বুঝি — |
| সমরেশ | : | ঐ হিসেবটাই ত তোমায় এবার কশতে হবে। |
| ঋত্বিক | : | কিসের হিসেব? |
| সমরেশ | : | বুঝলে ভায়া— টাওয়ার না থাক— এখানে যে খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা অনুমান করছি— |
| ঋত্বিক | : | ধূর মশাই! রামের জন্মই হল না, অথচ তাকে নিয়ে সপ্তকান্ড ফেঁদে বসলেন। |
| সমরেশ | : | আমি কিন্তু ঐ খনিজ সম্পদের জন্য, চৌদ্দবছর এই বনবাসে থাকতে প্রস্তুত।<br>(বেয়ারার প্রবেশ) |
| বেয়ারা | : | হুঁজুর কিছু বলবেন? |
| সমরেশ | : | আমাদের গাইড, ওই বাবুরাম ড্রাইভার কে ডেকে দাও। |
| ঋত্বিক | : | আর শোনো— আজ রাতে চিকেন ও পরোটার ব্যবস্থা করবে, বুঝেছ?<br>(ঘাড় নেড়ে সেলাম জানিয়ে বেয়ারার প্রস্থান) |
| সমরেশ | : | তাহলে ঋত্বিক — তুমিও আমার সাথে বনবাসে থাকার প্রস্তুতি নিচ্ছ? |
| ঋত্বিক | : | ক্ষেপেছেন? |
| সমরেশ | : | সে কি? |

ঋত্বিক : আমায় মাফ করুন।

সমরেশ : কেন ভুলে যাচ্ছ— এখানে এই মাইনিং ইন্ডাস্ট্রির যে এ্যাসাইনমেন্ট, সেটাই এনে দিতে পারে তোমার লাইফের সবচেয়ে বড় প্রমোশন।

ঋত্বিক : বলুন ডিমোশন।

সমরেশ : তা কেন? জীবিকার জন্য জীবন কি না করে!

ঋত্বিক : তা বলে মানুষ থেকে ফের বনমানুষ?

সমরেশ : ( হা হা করে হেসে ওঠে )

ঋত্বিক : কি ? ঠিক বলেছি ত?

সমরেশ : দ্যাখো— আকৃতিতে তা সম্ভব না হলেও প্রকৃতিতে আমরা অনেকেই কী তা নই?

ঋত্বিক : তাহলে বলছেন — মানুষের মধ্যে বন্যপ্রাণী ঘাপটি মেরে লুকিয়ে রয়েছে?

সমরেশ : এক্সাক্টলি।

ঋত্বিক : বিষয়টা এভাবে কখনো ভাবিনি।

সমরেশ : ভাবো ঋত্বিক ভাবো। অফিস আর বাড়ি— এই খড়ির গন্ডি পেরিয়ে , একটু-আধটু ভাবার অভ্যাস যদি না থাকে—
(বাবুরামের প্রবেশ, কথায় হিন্দিভাষীর টান)

বাবুরাম : নমস্তে সাব্।

সমরেশ : শোনো বাবুরাম। আজ ওই পাহাড়ের কাছটায় যেতে চাই।

বাবুরাম : সেটা ত সম্ভব হোবে না।

সমরেশ : কেন?

বাবুরাম : গাড়িতে পুরোটা যেতে পারবেন না। ইম্‌লি বাবা ডেরা তক জিপে, তারপর হেঁটে।

ঋত্বিক : ইম্লিবাবা?

বাবুরাম : ইম্‌লি বাবার নাম শোনেন নি?

সমরেশ : কে তিনি?

বাবুরাম : খুব নাম করা সাধু।

ঋত্বিক : সাধু ? নাম করা?

বাবুরাম : জি হা। ওনার নামে কোতোরকোম যে গল্প গুজব—

সমরেশ : কি রকম?

বাবুরাম : উখানে আশপাশ জংলি জানোয়ার ছাড়া কোনো মানুষ নেই। অথচ তিনি সেখানে ইম্‌লি গাছের নীচে ছোট্ট কুটির মে দিব্যি আছেন।

ঋত্বিক : একা?

বাবুরাম : হ্যাঁ।

সমরেশ : আশ্চর্য।

ঋত্বিক : কোন বদ্ মতলব নিশ্চই আছে।

বাবুরাম : তা জানি না। তোবে উখানে উনি জঙ্গাল সাফ করে কিছু ফুল, ফলের গাছ পুঁতেছেন, গরু-ছাগল পুষছেন, আর —

ঋত্বিক : আর?

বাবুরাম : উনি নাকি একটা কেউটে সাপও পোষেন। (মিউজিক)

ঋত্বিক : (চমকে ওঠে) এ্যা!! সাপ?

বাবুরাম : হাঁ, বাবা নাকি তাকে গলায় জড়িয়ে ধ্যান করেন, দুধ খাওয়ান।

সমরেশ : (আগ্রহে বিস্ময়) তাই?

ঋত্বিক : সমরেশদা। মনে হচ্ছে — আমরা যে কারণে, উনিও সেই কারণেই ওখানে ঘাঁটি গেড়েছেন। কাজেই ঐ সাধুকে ঠিকঠাক পাকড়াও করতে পারলে, আপনার কাজটা সহজ হয়ে যাবে।

সমরেশ : দিনের পর দিন, ঐ পাহাড়ি জঙ্গালে একা থাকে? ওকে-ত স্বাভাবিক মানুষ মনে হচ্ছে না।

ঋত্বিক : এই? কতদিন ধরে আছে গো?

বাবুরাম : সেটা বলতে পারবো না। তোবে কয়েকসাল বন দপ্তরের বাবুরা আমার গাড়িতেই ওখানে গেছে।

সমরেশ : কি দেখলে?

বাবুরাম : সেরোকম কুছু না। আর পাঁচটা সাধু যেমোন হয়, সেটাও না। সাফ-সাফ কুছু বোলে না। তোবে উনি যে অনেকদিন ধরে উখানে আছেন, সিটা জানি।

ঋত্বিক : আর কি জানো?

বাবুরাম : উনাকে কেউ কুনোদিন কুছু খেতেও দেখেনি।

সমরেশ : এটা অসম্ভব। আরে বাবা, শুধুমাত্র হাওয়া খেয়ে ত কোন মানুষ এতোদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

বাবুরাম : না-না, যেটা শুনেছি — সাধুবাবা নাকি একবেলা ইমলি সেদ্ধ আর রাতে ছাগলের দুধ ছাড়া, অন্য কিছু খায় না।

ঋত্বিক : (চিৎকার করে ওঠে) বুজবুকি- বুজবুকি, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি — এই ধরনের ভন্ড সাধুরা খুবই বিপদজনক। কিছু একটা কু-মতলব না থাকলে ওভাবে কোন মানুষ থাকতে পারে?

সমরেশ : ঋত্বিক! তোমার - আমার চোখের যা কিছু অভিজ্ঞতা, সেটাই ত শেষ কথা নয়। তার বাইরেও তো কত অজানা-অচেনা বিষয়, এখনও শুধু রহস্যই থেকে গেছে।

ঋত্বিক : তার মানে আপনি বলতে চান—

সমরেশ : ক্ষুধিত পাষাণ।

ঋত্বিক : সেটা আবার কি?

সমরেশ : রবীন্দ্রনাথের গল্প। এই গল্পের শুরুতেই রয়েছে ঐ কথা।

ঋত্বিক : কোন কথা?

সমরেশ : সে কথা পরে হবে। এখন চলো— বেড়িয়ে পড়া যাক।
(সমরেশ ও বাবুরামের প্রস্থান) (প্রস্থানোদ্যত ঋত্বিক থমকে দাঁড়িয়ে—)

ঋত্বিক : চলুন- আমি আমার ঘর হয়ে যাচ্ছি। ইল্লি গাছের নীচে, ইল্লি পাতার রসে টইটম্বুর ইমলি বাবার যে চক্কর, তার সঙ্গো আগে টক্কর। (মিউজিক)

[ আলো নেভে। অন্ধকারে জিপগাড়ি চলার শব্দ। ভেসে আসে সঙ্গীত— 'কী সুর বাজে আমার প্রাণে, আমিই জানি, মনই জানে---'। আস্তে আস্তে 'দ্য হিল্স্ আর এ্যালাইভ উইদ দ্য সাউন্ড অব মিউজিক। ' আস্তে আস্তে মিউজিক মিলিয়ে যায়। জিপগাড়ির হর্ন শোনা যায়। জিপগাড়ি কোন স্থানে এসে থামার শব্দ। শোনা যায় পাখিদের কলরব। সাধুবাবার পরিসরে আলো। ডানদিকে তৃতীয় উইংস-এর কাছে আলোকবৃত্তে সমরেশ, ঋত্বিক ও বাবুরাম দৃশ্যমান হয়। ইতঃপূর্বে ওদের অস্পষ্ট টুকটাক কথোপকথন এবার স্পষ্ট হয়। ]

**।। ২য় দৃশ্য ।।**

ঋত্বিক : বাপুহে হাঁটাপথ ত কিছু কম নয়। এখান থেকে কদ্দুর?

বাবুরাম : ওই তো! [ হাল্কা আলোয় অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল সাধুর কুটিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে।]

ঋত্বিক : বাপ্‌রে! দু পাশে যা কাঁটাঝোপ!

সমরেশ : গোলাপের কাঁটা আছে, সেজন্যই সে সুন্দর। ইলিশেরও অতো স্বাদ ঐ কারণেই।
[ওরা আলোকবৃত্তে হাঁটে, দাঁড়ায়। কথা বলতে বলতে, চারপাশ দেখতে দেখতে পথ চলে মাইমে—]

ঋত্বিক : পরিহাস করছেন?

সমরেশ : না না, তা কেন? তুমিই বলো না— কথাটা সত্যি কিনা। তাছাড়া যে কাজে এসেছো , তাতে কাঁটা ত থাকবেই।

ঋত্বিক : কি হল? হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন যে!

সমরেশ : এদিকে একটু এসো। [একটু তফাতে অন্য আলোকবৃত্তে]

ঋত্বিক : কেন?

সমরেশ : আরে এসো না।

ঋত্বিক : দাঁড়ান। যা রাস্তা— [ সন্তর্পণে পা ফেলে এগোয়, হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে বাবুরামের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। সেই ধাক্কায় বাবুরামও টাল সামলাতে

সমরেশকে ভর দেয় ও ও ও- রে রে রে, বাবা গো— ]

সমরেশ : আরে তোমার হলটা কি?

ঋত্বিক : যা গড়ানে, টাল সামলাতে পারলাম না।

বাবুরাম : স্যার! একটু সাবধানে।

সমরেশ : ঐ দিকটা দ্যাখো।

ঋত্বিক : এ তো দেখছি — একটা পুকুর।

সমরেশ : পুকুর না, বলো ঝিল।

বাবুরাম : শুনেছি, ওটা খুব গভীর আছে।

ঋত্বিক : তাহলে নিশ্চই অনেক মাছ— বড় বড় পাকা পোনাও রয়েছে?

বাবুরাম : সেটা বলতে পারব না।

ঋত্বিক : কি ব্যাপার সমরেশদা? আপনিও দেখছি একেবারে স্ট্যাচু হয়ে গেলেন?

সমরেশ : ঝিলের চারপাশটা লক্ষ্য করো— কতোরকম পাখি — [গুনগুন করে গান গেয়ে ওঠে]

ঋত্বিক : ধুর মশায়! চলুন ত! পাখি দেখছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে—
চলুন, চলুন—

সমরেশ : এ তো অধৈর্য হচ্ছ কেন?

ঋত্বিক : আমার একটাই টার্গেট সাধুবাবা। তাকে যতোক্ষণ না যাচাই করতে পারছি—

সমরেশ : তার মানে সাধুবাবা সম্পর্কে তোমার কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছে।

ঋত্বিক : অবশ্যই। তবে বাবুরাম যেটা বললো —আমার বিশ্বাস হয় না।

বাবুরাম : কিউ?

ঋত্বিক : কেউটে কখনো কারো পোষ মানে না।

সমরেশ : তুমি ত দেখছি বড্ড সন্দেহবাতিক।

ঋত্বিক : হবো না! সাপ সম্পর্কে আমার যা এক্সপিরিয়েন্স , অনেকের তা নেই।

সমরেশ : তাই নাকি?

ঋত্বিক : অবশ্যই। শুনুন মশাই— আমি হলুন পাড়াগাঁয়ের ছেলে। নিজের হাতে কতো যে জাত সাপ মেরেছি, তার ইয়ত্তা নেই। এজন্য ডাকাবুকো সাহসী বলে গ্রামে আমার সুনাম ছিল।

সমরেশ : তুমি ত তাহলে রীতিমত সর্প বিশেষজ্ঞ।

ঋত্বিক : সেই কারণেই বলছি— কেউটে সাংঘাতিক বিষধর। ওকে পোষ মানানো অসম্ভব।

সমরেশ : কিন্তু আমরা যেটা অসম্ভব বলে মনে করছি, সেটা ত অন্য কেউ সম্ভব করতেও পারে।

ঋত্বিক : যেমন?

সমরেশ : যেমন ধরো হিমালয়ে। সেখানে কিছু সাধু ত বাঘের গুহায় বাঘের সঙ্গে বাস করে।

ঋত্বিক : দেখেছেন?

সমরেশ : শুনেছি।

ঋত্বিক : যত্তসব আষাঢ়ে গল্প।

সমরেশ : তাহলে রাবণের দশটা মাথা কিংবা হনুমানের ল্যাজের আগুনে লঙ্কাপুরী ছারখার হওয়া - এই জাতীয় পুরাণের যা সব কল্প কাহিনী- সেগুলো সম্পর্কে কি বলবে?

ঋত্বিক : ওসব হল গিয়ে পুরাণ যুগের পুরাণ কথা।

সমরেশ : তোমার ত তাতে খুবই বিশ্বাস। আর সেজন্যই সাধু সন্ন্যাসীদের উপর যথেষ্ট ভক্তি। অথচ এই সাধুর নাম শোনামাত্রই —

ঋত্বিক : শুনুন দাদা— যারা আসল সাধু, আমি তাদের ভক্ত। প্রকৃত সাধুসঙ্গ যে করেছে, সে এইসব নকল বাবাজিদের অসাধু সঙ্গ বরদাস্ত করে না।

সমরেশ : তা বলে সাধু-অসাধু যাচাই না করেই?

ঋত্বিক : যা শুনলাম — এ ব্যাটা না করে পূজা-অর্চনা, না পারে ভবিষ্যৎ গণনা। এ কোনমতেই সাধু হতে পারে না।

সমরেশ : সেজন্য লোকজনও এখানে তেমন আসে না।

বাবুরাম : কেন আসবে? কবচ, মাদুলি, টোটকা— কুছু মেলেনা।

ঋত্বিক : তাহলে বুঝতে পারছ কি মাল? শোনো বাবুলাল—

বাবুরাম : সাব— আমি লাল নই, রাম!

ঋত্বিক : ঐ হোলও। যা বলছি শোন— এই যে আমার হাতে আংটিগুলো দেখছো— এটা হলো হরিদ্বারের এক সাধুর— এটা কামাখ্যার— আর এইটে গঙ্গাসাগরের।

সমরেশ : কালীঘাটের কোনো স্টোন নেই?

ঋত্বিক : কালীঘাট? এনি স্পেশালিটি?

সমরেশ : একবার ধারণ করে দেখোই না। শুনেছি ধনবৃদ্ধির সহায়ক হয়।

ঋত্বিক : আপনার হাতে ত দেখছি— কিছুই নেই।

সমরেশ : সেজন্যই ত তোমার মতো ধার্মিক হয়ে উঠতে পারলাম কৈ?

ঋত্বিক : চেষ্টা করুন।

সমরেশ : আসলে সাধু সংসর্গর তেমন সুযোগ আমার জোটেনি। আজ যাও বা একজন জুটলো, সে নাকি আদৌ সাধু নয়, অসাধু।

ঋত্বিক : অবশ্যই। এই জাতীয় অসাধু সন্ন্যাসীরাই আজগুবি গল্পের ডিপো বানিয়ে ধর্মের মর্যাদা হানি করছে।

সমরেশ : কাজেই তোমাদের মতো ধার্মিক মানুষের, সেখানে একটা নৈতিক দায়িত্ব থাকে বৈ কি।

ঋত্বিক : কারেক্ট। তাহলে জেনে রাখুন — ঐ দায়িত্বটা পালন করার জন্যই এখানে এসেছি। আমি প্রমাণ করে দেবো—

বাবুরাম : সাব্! আমরা এসে গেছি।

[ ওরা মাইমে কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো হাঁটতে - হাঁটতে , কথা বলতে-বলতে বিভিন্ন আঙ্গিকে জঙ্গালের ভিতর রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কুটিরের কাছাকাছি এসে পৌঁছয় আলো নির্দিষ্ট হয় কুটির এবং সংলগ্ন পরিসরে। এই ৩য় দৃশ্যপটে দেখা যায় ধ্যানমগ্ন সাধুবাবা। তার সামনে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডর আলোয় কুটিরে আলোর উজ্জ্বলতা বাড়ে। ]

সমরেশ : এ জায়গাটা দেখছি — বেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন।

ঋত্বিক : কিন্তু কেমন যেন অন্ধকার।

বাবুরাম : ঐ ইমলি গাছের নীচেই ত বাবার কুটির।

সমরেশ : ঠিকই । মাথার উপর তেঁতুল পাতার ঘন ছাউনি।

বাবুরাম : এজন্যই ত লোকাল আদমি বাবার ঐ নাম রেখেছে।

ঋত্বিক : হ্যাঁ, ভালো কথা — ওর আসল নাম কি গো?

বাবুরাম : সেটা কেউ জানে না।

ঋত্বিক : ওখানেই রয়েছে আসল রহস্য।

বাবুরাম : সাব ! ঐ দেখুন কুটির-এর পাশে দড়িতে ঝুলছে।

সমরেশ : কি?

বাবুরাম : গামছা, পাশে কৌপিন, তারপর যে সাদা সাদা দড়ির মতো ঝুলছে— ওগুলোই ত সাপের খোলস।

ঋত্বিক : আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। এমনিতেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে।

বাবুরাম : একটা কথা বলবো?

ঋত্বিক : আবার কি বলবে? সকাল থেকেই ত বলে যাচ্ছ। ঠিক আছে বল।

বাবুরাম : আজ আর পাহাড়ের দিকে যাওয়া ঠিক হোবে না। এখনো বিকেল হয়নি। তাতেই দেখুন — চারদিক কেমন অন্ধকার - অন্ধকার।

ঋত্বিক : ঠিকই। গভীর জঙ্গাল, গাছের ছায়ায় এমনিতেই আলো খুবই কম।

সমরেশ : চারপাশটা বড্ড নিঝুম। ছায়া-ছায়া আবছায়া - গা ছমছম করে।

বাবুরাম : আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখুন । ঐ দেখুন কেমন মেঘ জমেছে। এই ঠান্ডার সময় বৃষ্টি নামলে বড্ড ঝুঁকি হয়ে যাবে। আশপাশ দাওয়াখানা ভি মিলবে না।

সমরেশ : কাল তাহলে ব্রেকফাস্ট করেই বেড়িয়ে পড়ব— কি বলো ঋত্বিক?

ঋত্বিক : কালকের কথা কাল ভাবা যাবে। আকাশ যদি পারমিট করে - দেখা যাক্ এখন আমাদের একটাই প্রজেক্ট — ইমলিবাবা ! বাবুরাম তোমার এই বাবাকে ডাকো। উনি ত দেখছি— এতো কথার পরেও, চক্ষু বুজেই রয়েছে।

বাবুরাম : ধ্যান করছেন।

ঋত্বিক : ধ্যান ? কাকে ধ্যান শেখাচ্ছ ? সাধুরা ধ্যান করে কাকভোরে আর সূর্যাস্তের পর। আমাদের দেখা মাত্রই ভণ্ডামি শুরু করে দিয়েছে।

সমরেশ : একটু আস্তে বলো, শুনতে পাবে।

ঋত্বিক : শুনুক। আমি মশাই বরাবর টট্টরে। একেবারে খাপ খোলা তলোয়ার। (বাবুলালকে) নাও ডাকো।

বাবুরাম : (সাধুর কাছে এগিয়ে) সাধুবাবা ! সাধুবাবা— এনারা বহুদূর থেকে এসেছেন। আপনার কাছে। আপনাকে দেখার জন্য। দয়া করুন। সাধুবাবা—

সমরেশ : এতো দেখছি — অন্যরকম সাধু। পরনে গেরুয়ার বদলে সাদা বসন। কিন্তু গলায় কোন মালা, তাবিজ বা রুদ্রাক্ষ নেই। হাতে নেই কোনো স্টোন, চুলে জটাও নেই।

ঋত্বিক : আমি তাহলে ঠিকই ধরেছি। ভেক ধরেছে। ভেক। সব পট্টিবাজি।

সমরেশ : আঃ ঋত্বিক !

বাবুরাম : বাবা ! বাবা ! এবার চোখ মেলুন বাবা ! (সাধুর মুখে মৃদু হাসি খেলে যায়) বাবা ! আমরা আপনার ভক্ত। আমাদের দর্শন দিন বাবা।
সাধু চোখ মেলে তাকায়। সমুখে স্মিত হাসি। হাত তুলে আশীর্বাদ বা প্রতি নমস্কার জানায়।

সমরেশ : নমস্কার ! আমরা আপনার কথা শুনেছি। তাই ভাবলাম—

ঋত্বিক : আসল কথাটা জেনে নিন। ঐ দুধ খাবার সময়টা। দরকার হলে —

সমরেশ : শুনেছি— আপনি কারো প্রণাম বা প্রণামী— কিছুই গ্রহণ করেন না। তবু একটা আবেদন আছে।

সাধু : আপনারা কি বাসুকির দর্শন চান ?

সমরেশ : বাসুকি ?

সাধু : সমুদ্র মন্থনের নাগরাজ। যার বিষক্রিয়ায় দেবতাদের নাভিশ্বাস এবং পাতাল বিজয়কালে যিনি রাবণ রাজার অন্যতম সহায়ক। ইনি মহর্ষি কাশ্যপের সন্তান। আর এনারই ভগিনী মা মনসা। (হাতজোড় করে কপালে ঠেকায়।)

ঋত্বিক : (ধমকে ওঠে) থামো— থামাও তোমার ঐ বুজরুকি গল্প। ওসব শোনার সময় নেই।

সাধু : সে কি ! যাকে দেখতে এসেছেন , তাকে চিনবেন না ! জানবেন না তার আদি পরিচয় ?

ঋত্বিক : তাহলে শুনে রাখো— আমিও জন্মজয়ের বংশধর।

সাধু : (মৃদু হাসি হেসে) তাতে কি বৎস! যে আস্তিক মুণির বরে সর্পকুল রক্ষা পেয়েছিল, পণ্ড হয়েছে জন্মজয়ের সর্পনিধন যজ্ঞ, তার বংশধররাও এখনো বিলুপ্ত হয়নি।

ঋত্বিক : তুমি কি আমাদের ভয় দেখাচ্ছ?

সাধু : (হা- হা - করে হাসতে থাকে)

ঋত্বিক : (কটমট করে তাকায়) কি হল? আমি কি তোমার হাসির পাত্র?

সমরেশ : ওসব কথা থাক না ঋত্বিক!

ঋত্বিক : কি বলছেন সমরেশদা! ও আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে। নিজেকে আস্তিক মুণির বংশধর বলে জাহির করছে। আর আমি চুপচাপ সেটা মেনে নেব, তেমন ভেড়ুয়া আমি নই। (উত্তেজিত হয়ে পড়ে)

সমরেশ : ঠিক আছে — ওটা ত জানি। তাহলে বার বার সেটা জানানোর কি দরকার? এবার শান্ত হও। আমরা যে কারণে এখানে এসেছি—

ঋত্বিক : সেটা দেখুন। তবে তাড়াতাড়ি। (একটু তফাতে সরে যায় ও সিগারেট ধরায়)

সমরেশ : (বিনীত - মোলায়েম স্বরে) সাধুজি!

সাধু : বৎস!

সমরেশ : (হাতজোর করে) কিছু মনে করবেন না।

সাধু : কখ্খোন না। আমি বুঝেছি— ওনার শুধু রামে ভক্তি, তাই শিবে অভক্তি।

সমরেশ : এই বাবুরামের কাছে আপনার ঐ সাপের কথা শুনেছি। আপনার পোষা সাপ।

সাধু : পোষা! না না — ও আমার ঘনিষ্ঠ সহচর।

সমরেশ : ঠিক। সহচর, সহচর।

বাবুরাম : আপনার ঐ সাপের দুধ খাওয়া দেখার জন্যই ওনারা এসেছেন।

সাধু : (মাথা নাড়তে থাকে)

সমরেশ : বিশ্বাস করুন— আমাদের খুব আগ্রহ, খুবই কৌতূহল।

সাধু : বুঝলাম। কিন্তু এই সময়টায় ও জেগে থাকে না।

সমরেশ : আপনি চাইলে জাগাতে পারেন।

সাধু : আমি নিরূপায়।

বাবুরাম : আমি ত এখানকার— তাই জানি— আপনি ডাকলে ও গর্ত থেকে বেড়িয়ে আসে। তারপর আপনার কুটিরে এসে দুধ খায়।

সাধু : যথার্থ।

বাবুরাম : তাহলে বলুন— আজ কখন আসবে?

সাধু : আসবে না।

বাবুরাম : সে কি!

সাধু : হ্যাঁ বেটা! আজ সকালেও আসেনি।

বাবুরাম : কেন?

সাধু : কাল সন্ধ্যে থেকেই আসছে না।

সমরেশ : কারণটা কি?

সাধু : মনে হচ্ছে — ওর শরীরটা ভাল নেই।

ঋত্বিক : কি বলেছিলাম সমরেশদা — এবার বিশ্বাস হল তো?
(সমরেশ হাত তুলে নিরস্ত করে)

বাবুরাম : সাধুজী! আজ একটু দয়া করুন।

সমরেশ : বড়ো আশা নিয়ে এখানে এসেছি।

সাধু : অসম্ভব। আজ পূর্ণিমা। তাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। আপনারা দু-তিনদিন পর আসুন।

ঋত্বিক : তাহলে? সাপের শরীর খারাপ হয়, এটাও মানতে হবে?

সাধু : জানি— এই সংবাদটা আপনাদের কাছে নতুন। কিন্তু সেও তো আপনাদের মতোই একটা প্রাণী। তাই তারও আহার-নিদ্রা- ব্যামো-সবই আছে।

বাবুরাম : (হঠাৎ হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে) বাবা! যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে। মার্জনা কর। প্রভু! ক্ষমা করে দাও। এরা আমার কথা শুনে অনেক দূর থেকে এসেছে। সাপের দুধ খাওয়া দেখার সুযোগ যদি না হয়, না হোক। কিন্তু বাবা! সাপটাকে একবার দেখাও। তাহলে আমার মান বাঁচে। বাবা! আমি তোমার ভক্ত আছি, তোমার সন্তান ।এই একটা আকার রাখো ।তোমার ক্ষমতার একটা নমুনা দেখাও।

সাধু : (দাঁড়িয়ে পড়ে) অসম্ভব। দ্যাখো বাছা— ক্ষমতার প্রদর্শন আমার ধর্ম নয়। নিতান্ত বাধ্য না হলে, অর্জিত ক্ষমতার আস্ফালন বাঞ্ছনীয় নয়, সেজন্য লোকালয় থেকে দূরে এই জঙ্গলে স্থায়ী আস্তানা করে নিয়েছি। জঙ্গালের পশুপাখি-গাছপালা আমার প্রতিবেশী, আমার আপন ছিল, এরাই আমার আত্মীয়-পরিজন। আমি যেমন ওদের ভাষা বুঝি, ওরাও তেমনি আমার কথা বোঝে আর এ তো আহামরি কিছু নয়। চেস্টা থাকলে তুমিও পারবে।

ঋত্বিক : সেটা ত পরের কথা। অন্তত পোষা সাপটা দেখাও। আমার সন্দেহটা ঘোচাও। দেখি— সাপ কেমন তোমার কথা শোনে।

সমরেশ : হ্যাঁ, একটা প্রমাণ দাও।

সাধু : আমি জানি— সন্দেহ যতো বাড়ে , একসময় তা ক্রোধ আর হিংসার আকার নেয়। ছড়ায় ঘৃণা- বিদ্বেষ। তাই সংশয়ে বিশ্বাস জোগাতে, প্রমাণ অপরিহার্য কর্তব্য। যাও— ঐ দিক দিয়ে ঘুরে ঐ গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়াও।

বাবুরাম : কেন বাবা?

সাধু : আমি বাসুকি কে ডাকছি। জানিনা ও আসবে কিনা। তবে চেষ্টা করছি। ওখানে গিয়ে অপেক্ষা কর। ও গর্ত থেকে বেড়িয়ে তোমাদের দেখা দেবে।

বাবুরাম : (খুবই উচ্ছ্বসিত) বাবা! (মাটিতে মাথা ঠুকে প্রণাম জানায়। তারপর এগিয়ে যায়। একবার তোমার পায়ের ধূলি দাও বাবা।

সাধু : (একটু পিছিয়ে যায়) কক্ষনো না। আমি যেমন কারুর পায়ের ধূলো নিই না, তেমনই কারোকে আমার পা ছুঁতে দিই না। অন্তরের শ্রদ্ধাই আসল ভক্তি, আসল প্রণামী।

সমরেশ : তাহলে তোমার যে ধর্ম অনুষ্ঠান, তাতে কী পূজো —

সাধু : ধর্মানুষ্ঠানের নামে কোন পূজা-পার্বণ এখানে অনুষ্ঠিত হয় না। তাই অর্থ বা ফুল ফলের ডালিও দিতে হয় না।

সমরেশ : তাহলে কি হয়?

সাধু : ধ্যান হয়, শুধু ধ্যান। ধ্যানের একটাই আয়োজন— মন। আর সে মনের উপকরণ হল ভালোবাসা। ওটাই চাও, তাহলেই হবে। যাও-যাও, ওখানে গিয়ে দাঁড়াও।

সমরেশ : চলুন। (একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা ঋত্বিকের কাছে গিয়ে)

ঋত্বিক : শুনলেন ত! এবার বুঝতে পারছেন কেমন সাধু ? বাবুরাম একজন প্রতারকের গাড্ডায় এনে ফেলেছে।

সমরেশ : সাপটাকে ত দেখাবে বলেছে।

ঋত্বিক : যেটা দেখাবে, সেটা সাপ না অন্য কিছু— সেটা আগে দেখুন।

সমরেশ : অন্য কিছু মানে?

ঋত্বিক : এরা ভোজবাজি জানে। পি. সি. সরকারের মতো নকল সাপের ম্যাজিক দেখাতে পারে। আমি নিশ্চিৎ — একটা সন্মোহন বিদ্যা জানে।

[সমরেশ আর ঋত্বিক যখন তফাতে আলোকবৃত্তে কথা বলছে, তখন বাবুরাম ও সাধুর জোনে অস্পষ্ট কথোপকথনের ভঙ্গিমা লক্ষ্য করা যায়। এই জোনে এবার কথা জোরালো হওয়া মাত্র, ঋত্বিকদের আলোকবৃত্তে কথাবার্তার ভঙ্গিমাই শুধু লক্ষ্য করা যায়, কথা শোনা যায় না।]

সাধু : যাও বাছা— এবার এই দুধের পাত্রটা ঐ কালো পাথরের উপর রেখে দাও। না-না, কোনো ভয় নেই। ও তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। যাও — ওদের নিয়ে ঐ পাশটায় গাছের আড়ালে দাঁড়াও। ও যদি বেড়িয়ে আসে, তাহলে নির্ঘাত ওখানে দুধ খাবে। আবারও বলছি ওর শরীর সুস্থ নয়। তাছাড়া আজ পূর্ণিমা। তবুও চেষ্টা করছি — তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি জানি না, কি হবে? যাও, বাটিটা রেখে দাও। তারপর ডাকছি—

[বাটিটা হাতে নিয়ে বাবুরাম এগিয়ে আসে সমরেশদের কাছে। 'চলুন'— বলে সে এগিয়ে বাঁ-দিকের ৩য় উইংস দিয়ে ডানদিকে সাধুর ঘরের ৩য় উইংস বরাবর রাস্তার মাঝামাঝি

স্থানে ঝোঁপের আড়ালে পাথরের উপর সে বাটিটা নিয়ে দাঁড়ায়। এবং যথাস্থানে বাটিটা রাখে। তারপর ডানদিকে তৃতীয় উইংস এর দিকে যায় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য রাখে। এদিকে সমরেশ ও ঋত্বিক ওদিকে যেতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খায় ঋত্বিক। পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে সমরেশকে দেখায়—]

ঋত্বিক : পাথরের কালারটা দেখুন। অনেকটা কেউটের গায়ের রং।

সমরেশ : (পাথরটা দেখে) হুঁ!

ঋত্বিক : সাইজটা দেখেছেন? বেশ বড়ো।

সমরেশ : সাবধানে এসো। এখানটায় এই পাথর প্রচুর।

সমরেশ এগিয়ে যায়, ঋত্বিক আরও একটা অমন পাথর কুড়িয়ে নেয়। জঙ্গাল ঘেরা রাস্তা বরাবর অংশে ঝোঁপে ঢাকা কেউটের গর্তর তফাতে প্রথমে বাবুরাম তারপর সমরেশ ও দু-হাতে পাথর নিয়ে একটু তফাতে ঋত্বিক । আলো এই অংশে বামে আসে। আলো-আঁধারে রহস্যময়তায় সাধুর মুখে আলো। সাধু শিস দিতে থাকে। তারপর বিশেষসুরে ডাকতে থাকে—

সাধু : 'বাসুকি' — আয়— আয় আমার বাসুকি— আয় ! আয়—

(ফের শিস দিতে থাকে। শিসের সুর ভেসে বেড়ায়— মিউজিক)

ঋত্বিক : (বিরক্তি ও ধৈর্যচ্যুতির অভিব্যক্তি) আরে— ও ইমলি বাবা! বলি— হলোটা কি? (অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে স্বগতোক্তি) এটা আমি চাইনি। তবু এরা বাধ্য করলো। এভাবেই শহুরে বাবুরা, তাদের সখের ভার বইতে অন্যকে বাধ্য করায়। না- না, এটা ঠিক নয়, মোটে ঠিক নয়। তা সত্বেও —

(ফের ডাকতে থাকে) বাসুকি— বাসুকি আয়— আয় বাসুকি— (শিস্ দিতে থাকে)

[ শিসের সুর চড়তে থাকে, সঙ্গে আয় বাসুকি আয় ]

বাবুরাম : ঐ শুনুন! শুনতে পাচ্ছেন?

সমরেশ : কি?

বাবুরাম : শব্দ।

ঋত্বিক : কিসের?

বাবুরাম : হিস্ হিস্ শব্দ! ঐ দেখুন গর্ত থেকে উঁকি মারছে সাপের মাথা। এবার টর্চটা জ্বালান।

সমরেশ : (টর্চ জ্বালে) ঋত্বিক! ঐ দ্যাখো সাপ। গর্ত থেকে বেড়িয়ে এসেছে।

ঋত্বিক : (এগিয়ে আসে) শুকনো পাতায় খস্‌খসানি শুনেই বুঝেছি—মালটা আসছে। ঐ ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। টর্চের আলোটা মুখে মারুন, মারুন। এবার দেখুন চোখটা কেমন জ্বল-জ্বল করছে।

বাবুরাম : জিভটা খেয়াল করুন। দু-ভাগে ভাগ, চেরা।

সমরেশ : ঠিক-ঠিক। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমাদের দিক ফণা তুলে কেমন চেয়ে আছে, দেখেছো?

বাবুরাম : মুখে আলোটা পড়েছে ত! তাই।

ঋত্বিক : মাঝে মাঝে জিভটা বার করছে।

সমরেশ : ভাল করে দ্যাখো ঋত্বিক — ওটা সাপ তো?

ঋত্বিক : সাপ। তবে আসল কী না, সে ব্যাপারে এখনও সন্দেহ রয়েছে।

সমরেশ : বলতে বাধ্য হচ্ছি— তোমার মতো বাতিকগ্রস্ত একবগ্গা কিন্তু ভারী ডেঞ্জারাস। (সাধুর শিস শোনা যায়)

বাবুরাম : দেখুন ! কেমন ভাবে চেয়ে আছে।

সমরেশ : এতো লম্বা কাল কেউটে কখনো দেখিনি।

ঋত্বিক : কেউটে যেমন ভয়ানক হিংস্র, তেমনই ক্ষিপ্র। অথচ কোনটাই এর মধ্যে নেই। এ যা দেখছি — ঢ্যামনারও অধম।

সমরেশ : তাই?

ঋত্বিক : তাছাড়া কি? চোখের সামনেই ত দেখছেন— আক্রমণ করার কোন চেষ্টা না করে, চুপচাপ লিক্‌লিকে ফণা তুলে , দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। আর আপনারা ঐ ম্যাজিসিয়ানের ম্যাজিক দেখছেন , ম্যাজিক।

সমরেশ : ম্যাজিক?

ঋত্বিক : ঐ যে শিস শুনছেন— ওর মধ্যেই রয়েছে ভানুমতীর খেল।

বাবুরাম : ঐ দেখুন— পাথরের ওপর উঠছে, মনে হচ্ছে এবার দুধ খাবে।

ঋত্বিক : দুধ খাবে? খাওয়াচ্ছি— (হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে, হাতের পাথরটা ধাঁ করে ছুঁড়ে দেয়, ধুপ করে শব্দ হয়। তারপর চোখের নিমেষে ফের আর একটা পাথর ছুঁড়ে মারে। পাথরের শব্দ মিলিয়ে যেতেই ঋত্বিক হর্ষধ্বনি করে ওঠে।)

বাবুরাম : (আঁৎকে ওঠে ) সাব!

সমরেশ : এটা কি করলে?

ঋত্বিক : অব্যর্থ নিশানা। সরাসরি মাথায় হিট। আমার লক্ষ্যভেদ সাক্‌সেসফুল। (জয়োল্লাসে হাত দুটো উপরে তুলে বিশেষ ভঙ্গিমায় গরিমা প্রকাশ করে।)

বাবুরাম : (কাঁদো কাঁদো স্বরে) সাপটাকে মেরে ফেললেন সাব?

ঋত্বিক : এখনো মরেনি। মাথাটা থেঁতলে গেছে। ঐ দ্যাখো - দেহ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় কেমন ছটফট করছে দেখুন। হ্যাঁ- হ্যাঁ এবার ছটপটানি থেমে গেছে। [ চেঁচিয়ে ওঠে ] খতম। কাল কেউটে খতম। সাধুর ভোজবাজির দফারফা করে দিয়েছি। সব ভেলকি শেষ। আরে হ্যাঁ করে কি দেখছেন মশায়? আমাকে শিরোপা দিন। সর্প শিকারী হীরের শিরোপা। [ উল্লাসে নেচে ওঠে, হতবাক সমরেশ, বিষন্ন বাবুরাম মাথা হেঁট করে নির্বাক। হতভম্ব সমরেশ

অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে শুধু বলে—]

সমরেশ : এটা কি বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?

ঋত্বিক : বাড়াবাড়ি?

সমরেশ : তাছাড়া কি! সাপটা তো সাধুবাবার পোষা। এছাড়া আমাদের ত কোন অনিষ্ট সে করেনি। তাহলে শুধু শুধু সাপটাকে মারতে গেলে কেন? না- না ঋত্বিক— এটা খুবই অন্যায় হল। [ ক্ষোভ ঝরে পড়ে]

বাবুরাম : (হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে) সাব! এ আপনি কি করলেন? কেন করলেন? সাপটাকে মেরে ফেললেন? পাপ- কতো বড়ো পাপ হয়ে গেল। এ পাপের দায় ত আমারও। (হাহাকার করে ওঠে)

[এর মধ্যে সাধু কখন যে ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে, তা এরা কেউ খেয়াল করে না। অর্থাৎ সাধুর কুটির বরাবর জঙ্গালের রাস্তায় সাপের গর্ত সংলগ্ন ঝোঁপে ঢাকা পাহাড়ের একপাশে এরা আর অন্যপাশে সাধু। সাধুবাবার কণ্ঠস্বরে এরা চমকে ওঠে ও ঐ দিকে তাকায়। দেখে সাধুর চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে ক্রোধের হল্কা।]

সাধু : (তীব্র দৃষ্টি হানে ঋত্বিকের দিকে) নিজেকে বীর ঠাওরেছ? বীর! তাহলে যাও— (হাত তুলে তর্জনী ঋত্বিকের দিকে ছুঁড়ে) এই মানব সমাজে আর নয়। এবার তোমার আস্তানা— এই জঙ্গাল।

ঋত্বিক : [ হো - হো- করে হাসতে থাকে ব্যঙ্গাত্মক হাসি]

সাধু : যতোই হাসো, এটা জেনে রাখো — বাসুকির মৃত্যু নেই। একটা বাসুকি যাবে, আর একটা আসবে। খগম-খগম- খগম- খগম।

[ওরা হতবাক। মিউজিক উচ্চগ্রামে পৌঁছয়। ধীরে ধীরে লাইট অফ হয়ে যায়। অন্ধকার চলমান জিপগাড়ির হর্ন। মেঘের গর্জন, বৃষ্টিপাতের শব্দ। রাতের আবহ। রেস্ট হাউসের ঘরে পূর্বের দৃশ্যপটে ধীরে ধীরে আলোর অনুপ্রবেশ ঘটে। দেখা যায়— পাজামা- পাঞ্জাবী পরিহিত সমরেশ ও পূর্ব পোশাকে বাবুরাম। দুজনেই চিন্তান্বিত ও বিমর্ষ।]

## ।। ৪র্থ দৃশ্য ।।

বাবুরাম : সাব! এজন্যই বলছি — আমার খুব ভয় করছে।

সমরেশ : তুমি যা বললে— সেটা তো খুবই চিন্তার।

বাবুরাম : লোকমুখে যা শুনেছি , তাই বললাম।

সমরেশ : এমনিতে সাধুজিকে খুব ভালো মানুষই মনে হল।

বাবুরাম : লোকে বলে দেবতুল্য। কারো কোন ক্ষতি কখনো করেছেন বলে শুনিনি। তবে খেপে গেলে নাকি দুর্বাসা মুণি। সেজন্যই বড্ড ফিকর হচ্ছে স্যার।

সমরেশ : যা হবার, তা যদি অনিবার্য হয়, তাহলে আগবাড়িয়ে সেটা নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করে

লাভ কি? কাল সকালেই সাধুবাবার কাছে যাব। সবাই মিলে ক্ষমা চাইব।

বাবুরাম : তাহলে ঐ কথাই রইল স্যার। (প্রস্থানদ্যোত)

সমরেশ : আচ্ছা বাবুরাম! ঋত্বিক তখন তোমাকে ওর ঘরে ডেকে নিয়ে কি বললো?

বাবুরাম : কি আর বলবেন। সব শুনে খুবই ভয় পেয়েছেন। এখন পস্তাচ্ছেন।

সমরেশ : তাতে কি লাভ?

বাবুরাম : সিটাই ওনাকে বললাম। দুম করে এমন একটা কাজ করে ফেললেন—

সমরেশ : ঝোঁকের বশে কাজটা উনি হঠাৎ করেন নি বাবুরাম।

বাবুরাম : তাহলে?

সমরেশ : প্ল্যান করে ভেবে চিন্তেই করেছেন।

বাবুরাম : তাই?

সমরেশ : সাধুজির আশ্রমের আশেপাশে যে পাথরের টুকরোগুলো পড়ে ছিল দু-হাতে দুটো কুড়িয়ে নিয়ে আমায় বলেছিল — ওগুলোই নাকি সর্প নিধন যজ্ঞের প্রধান অস্ত্র। তাই পাথরগুলোর স্নেক কালার। কিন্তু আমি ওর উদ্দেশ্যটা তখন বুঝতে পারিনি। সেজন্য এখন আমার বড্ড আপশোস হচ্ছে।

বাবুরাম : কুছু মনে করবেন না স্যাব—— ওনার স্বভাবটাই অমন। বড্ড ছিটেল। সব সময় হামবড়াভাব।

সমরেশ : ফলে যা হবার তাই হয়েছে। যার যেমন প্রবৃত্তি, তার তেমন নিয়তি।

বাবুরাম : ঠিক বলেছেন।

সমরেশ : সম্পূর্ণ অকারণে, অপ্রয়োজনে— কাউকে ওভাবে আঘাত করাটাই ত অধর্ম। এটা কি একজন সভ্য মানুষের বর্বর হত্যাকান্ড নয়? যারা কাপুরুষ, তারাই বীরত্ব জাহির করবার জন্য এই ধরনের নৃশংস ঘটনা ঘটায়। সেজন্য একসময় তারা শাস্তিও পায়।

বাবুরাম : সেটা বুঝতে পেরে এখন সামলাবার কোশিস করছে।

সমরেশ : দেখা যাক ! যাও! অনেক রাত হয়ে গেছে গিয়ে শুয়ে পড়।

বাবুরাম : হ্যাঁ, রাত যতো বাড়ছে, ঠান্ডাটাও জাঁকিয়ে পড়ছে।

সমরেশ : কয়েক পশলা বৃষ্টিতেই আবহাওয়াটা বড্ড ভারী হয়ে গেল।

বাবুরাম : জি! তাহলে সাব ঐ কথাই রইল, কাল সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়ব।

সমরেশ : ও.কে. গুড নাইট।

বাবুরাম : গুডনাইট। (বাবুরামের প্রস্থান)

[ বাবুরাম চলে যাবার পর, সমরেশ বিছানাটা পরিপাটি করে নেয়। টেবিলে রাখা গ্লাসে জল খেয়ে শুয়ে পড়ে। কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্পের আলোটা একটু কমিয়ে গায়ে টেনে নেয় কম্বল। প্রবেশ করে বেয়ারা—]

বেয়ারা : স্যার!

সমরেশ : কি ব্যাপার?

বেয়ারা : উনি ত ডিনারে চিকেন আর পরোটা খাবেন বলেছিলেন—

সমরেশ : হ্যাঁ, আমি ত সেটাই খেলাম।

বেয়ারা : উনি এখন বলছেন — ওসব খাবেন না।

সমরেশ : সে কি! খানিক আগে আমি তো দেখে এলাম, ওর টেবিলে সব ঢাকা দেওয়া আছে। আমাকে বললো— পরে খাবে।

বেয়ারা : কিন্তু এখনো সেভাবেই পড়ে রয়েছে।

সমরেশ : সেজন্য আমি কি করতে পারি?

বেয়ারা : এখন বলছেন— দুধ খাবেন।

সমরেশ : দুধ!

বেয়ারা : হ্যাঁ।

সমরেশ : তাহলে দুধই দিয়ে দাও।

বেয়ারা : এতো রাতে তো দুধ মিলবে না স্যার।

সমরেশ : হ্যাঁ-হ্যাঁ— যা আছে দিয়ে দাও। কি হল? দাঁড়িয়ে আছো কেন? আরে পয়সা নিয়ে ভেবো না। চিকেন -পরোটার পেমেন্ট পেয়ে যাবে।

বেয়ারা : সেজন্য নয় স্যার।

সমরেশ : তাহলে?

বেয়ারা : ওনাকে অন্যরকম মনে হল।

সমরেশ : কিরকম?

বেয়ারা : উনি আপনাকে একবার যেতে বললেন।

সমরেশ : ওকে বলে দাও - শুয়ে পড়েছি। যদি কিছু দরকার থাকে, এক্ষুনি এখানে আসতে।

বেয়ারা : ঠিক আছে স্যার! গুড নাইট। [বেয়ারার প্রস্থান]

সমরেশ : হ্যাঁ গুড নাইট।

[ বেয়ারা চলে যাবার পর, সমরেশ বালিশে ভর দিয়ে আধশোয়া অবস্থানে দরজার দিকে পিছন ফিরে, সামনের টেবিলে আলোর দিকে চেয়ে থাকে। হাল্কা মিউজিকের স্পর্শ। রাতের আবহ ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়। সমরেশকে খুবই গম্ভীর ও চিন্তান্বিত মনে হয়। পেছনের দরজার ঋত্বিকের প্রবেশ। পিছনের আলোকবৃত্তের ক্ষুব্ধ সাধুর অবয়ব সমরেশের চোখে ভাসে।]

ঋত্বিক : সমরেশদা ! (এগিয়ে সমরেশের পিছনে দাঁড়ায় ) সমরেশদা!

সমরেশ : যেন সম্বিৎ ফেরে ও ঋত্বিক! এসো এসো। শুনলাম ডিনার করোনি।

ঋত্বিক : একদম ইচ্ছা করছে না।

সমরেশ : শরীর খারাপ?

ঋত্বিক : না।

সমরেশ : তাহলে?

ঋত্বিক : আসলে সারাদিন বড্ড ধকল গেছে, তাই মাথাটা বড্ড ভার ভার লাগছে।
সমরেশ : তুমি কি সাপটার কথা ভাবছো।
ঋত্বিক : ঐ দৃশ্যটা। পাথরের গায়ে ছিটকে পড়লো রক্ত।
সমরেশ : ওসব এখন মাথা থেকে ঝেরে ফ্যালো।
ঋত্বিক : (সরু গলায় মোলায়েম সুরে ) সাপটা ফিস্‌ফিস্ করছিলো।
সমরেশ : ফিস্ ফিস্ না ফোঁস-ফোঁস?
ঋত্বিক : (আলোর দিকে চক্ষু স্থির রেখে) না, ফিস্ ফিস্। সাপের ভাষা, সাপের শিস্— ফিস্ ফিস্ ফিস্-ফিস্! (সাপের শিসের মতো শব্দ করে)
সমরেশ : তুমি দুধ খাবে বলেছো?
ঋত্বিক : হ্যাঁ, ছাগলের দুধ।
সমরেশ : কেন?
ঋত্বিক : সাধুজীর সাপ ত ছাগলেরই দুধ খায়।
সমরেশ : তাতে কি?
ঋত্বিক : (ছড়া কাটার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে) সাপের ভাষা, সাপের শিস—ফিস্‌ফিস্- ফিস্ ফিস্। কেউটে সাপের বিষম বিষ— ফিস্‌ফিস্- ফিস্‌ফিস্।
(হঠাৎ শরীরের বুকে, পিঠে, হাতে চুলকোতে শুরু করে, মৃদু আর্তনাদে)
সমরেশ : কি হল?
ঋত্বিক : মশা কামড়াচ্ছে।
সমরেশ : মশা? এতো ঠাণ্ডায় মশা আসবে কোথা থেকে? তাছাড়া ঘরের জানলা- দরজায় তো নেট দেওয়া আছে। আমি তো একটাও মশা পাইনি।
ঋত্বিক : তাহলে কি কামড়াচ্ছে বলুন তো?
সমরেশ : কামড়াচ্ছে? কোথায়?
ঋত্বিক : এই দেখুন না— হাতে-বুকে কেমন দাগ হয়ে গেছে।
সমরেশ : (লণ্ঠনটা তুলে দেখে) হুঁম! বরফির মতো কালশিটে দাগ। আগে কখনো এইরকম দাগ হয়েছে?
ঋত্বিক : না। (কুকুরের ডাক শোনা যায়)
সমরেশ : দাগটা কিন্তু মোটেই ভাল ঠেকছে না।
ঋত্বিক : বড্ড চুলকাচ্ছে।
সমরেশ : মনে হচ্ছে এলার্জি।
ঋত্বিক : সে ত মশায় বিদ্‌ঘুটে ব্যারাম। ওষুধ -ইনজেকশন ছাড়া আরাম পাওয়ার উপায় নেই।
সমরেশ : কাল সকালে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঋত্বিক : এখানে কোথায় পাবেন?

সমরেশ : এখানে না হোক, যেখানে পাওয়া যাবে, যেতে হবে। (কুকুরের ডাক) উঃ! (বিরক্তি প্রকাশ) কুকুরটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে।

ঋত্বিক : আচ্ছা— জঙ্গালের কোন বিষাক্ত পোকামাকড় নয় তো?

সমরেশ : পোকা কামড়ালে ত টের পেতে।

ঋত্বিক : অনেক সময় লালা জাতীয় কিছু পাতার গায়ে লেগে থাকে। ওগুলো সাপের বিষের চেয়েও মারাত্মক।

সমরেশ : আমার কোন আইডিয়া নেই। (কুকুরটা মাঝে মাঝে একটানা ডেকেই চলেছে—)

ঋত্বিক : (নিজের হাতের তালুতে চোখ রেখে—)
আচ্ছা পাথরের গায়ে কেউটের ছোবলের বিষ লুকিয়ে ছিল না ত?
(বেয়ারার প্রবেশ, কুকুরের ডাক শোনা যায়)

বেয়ারা : সাব! আপনার ঐ খাবারগুলো সরিয়ে নিয়েছি। হালুয়া টেবিলে ঢেকে রেখেছি।

সমরেশ : শোন ভাই! কুকুরটা তখন থেকে ডাকছে। বড্ড বিরক্তিকর। (ঋত্বিক সায় দেয়- বিরক্তিকর)

বেয়ারা : সাহেবরা খানিক আগেই ফিরেছে। ওদের বলা হয়েছে।

সমরেশ : একটু দ্যাখো— এভাবে তো রাতে ঘুমোতে পারবো না। (ঋত্বিক সায় দিয়ে মন্তব্য করে)

বেয়ারা : দেখছি সাব। ওকে খাবার দিলেই নাকি চুপ করে যাবে।

সমরেশ : ঠিক আছে। যাও। ওটা দ্যাখো— (বেয়ারার প্রস্থান)
ঋত্বিক! ঘরে গিয়ে এবার শুয়ে পড়ো। ঘুমাবার চেস্টা করো। (ঋত্বিকের প্রস্থান)
সমরেশ কম্বলে শরীর ঢেকে শুয়ে পড়ে। তার আগে লণ্ঠনের আলোটা কমিয়ে দেয়। টর্চটা রাখে বালিশের পাশে)

[নেপথ্যে কেউ কুকুরকে থামায়। 'ওঃ স্টপ জিমি, প্লিজ স্টপ, স্টপ! ডোন্ট শাউট! স্টপ! স্টপ! ও.কে.'। কুকুরের ডাক থেমে যায়। চারদিক নিস্তব্ধ- নিঝুম। ভেসে আসে ঝি-ঝি-র ডাক। রাতের নৈশব্দ ভেঙ্গে বেজে ওঠে ঘড়ির শব্দ। রাত বারোটার ঘোষণা। দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ। বার বার শব্দে তন্দ্রাচ্ছন্ন সমরেশ বিরক্ত। ]

সমরেশ : (খুবই বিরক্ত) উঃ! অসহ্য। এই লোকটা ত দেখছি— নিজেও ঘুমোবে না, আর আমাকেও ঘুমাতে দেবে না। ননসেন্স। (উঠে দরজা খোলে)।

নেপথ্যে

সমরেশ : কি ব্যাপার? (হাতের টর্চটা জ্বেলে রাখে। কারণ শোবার আগে সমরেশ লণ্ঠনের আলোটা প্রায় নিভু-নিভু অবস্থানে রাখে।)

নেপথ্যে বেয়ারা : খুব জরুরি।

সমরেশ : ঘরে প্রবেশ করতে করতে। এতো রাতে?

বেয়ারা : সরি স্যার! আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

সমরেশ : (হাই তোলে) যা বলার তাড়াতাড়ি বলো।

বেয়ারা : আপনার পাশের ঘরে। ঐ স্যারের মনে হয় কিছু একটা হয়েছে।

সমরেশ : কি হয়েছে?

বেয়ারা : উনি ঘরের আলো নিভিয়ে, ঘর জুড়ে হামাগুড়ি দিচ্ছেন।

সমরেশ : হামাগুড়ি!!

বেয়ারা : ইয়েস স্যার ! চাঁদের আলোয় খোলা জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাহেবদের ঘরে খাবার দেবার সময় লক্ষ্য করলাম — পায়চারি করছে। তারপর ছুটোছুটি , আর এখন নীচে আমার ঘরে যাবার সময় দেখছি— মেঝেতে শিশুর মতো হামাগুড়ি দিচ্ছেন।

সমরেশ : আশ্চর্য!

বেয়ারা : সকাল থেকে দেখছি— একটু রগচটা, কিন্তু কখনো পাগল বলে মনে হয়নি।

সমরেশ : না-না, উনি পাগল নয়। আমরা এখানে যে কাজে এসেছি— সেই কোম্পানীর একজন অফিসার।

বেয়ারা : কিন্তু উনি যেটা করছেন—

সমরেশ : কেন করছেন, বলতে পারবো না। তবে ওনার শরীরটা ভালো নেই। হয়তো সেই কারণেই ওরকম আচরণ করছেন। এক কাজ করো — ম্যানেজারকে বলে রাখো।

বেয়ারা : উনি তো শুতে চলে গছেন। আমাকে বললেন নজর রাখতে, আর আপনাকে জানাতে।

সমরেশ : তুমি শুতে যাবে না?

বেয়ারা : এবার যাব। আমি নিচেই আছি, দরকার হলে ডাকবেন।

সমরেশ : ঠিক আছে, তুমি যাও— আমি দেখছি। ওনার মাথায় একটু ছিট আছে।

বেয়ারা : আমারও তাই মনে হয়। ঠিক আছে স্যার— শুয়ে পড়ুন। (প্রস্থান)
(বেয়ারা চলে যাবার পর , বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে সমরেশ। বেশ চিন্তিত মনে হয় তাকে। আলো তার মুখে নির্দিষ্ট হয়।)

সমরেশ : ব্যাপারটা দেখছি অদ্ভুত, খুবই রহস্যময়। অন্ধকার ঘরে হামাগুড়ি দিচ্ছে । নাঃ — পাগলামোর কোনও লক্ষণ ত আগে দেখিনি। তাহলে কি আজকের ঘটনার জন্য মানসিক ভারসাম্য হারাল?
[হঠাৎ দরজার গোড়ায় শ্-শ্-শ্-শ্ শব্দ শুনে চমকে তাকায়, আৎকে ওঠে ছায়া দেখে। একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়ায়—]

সমরেশ : কে? কে ওখানে? (ঋত্বিকের প্রবেশ ) আপনি!!

ঋত্বিক : শ্‌-শ্‌-শ্‌-শ্‌!
সমরেশ : কি বলছেন?
ঋত্বিক : স-স-স!
সমরেশ : এতো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল।
ঋত্বিক : স-স-স!
সমরেশ : যা বলতে চাও, স্পষ্ট করে বলো।
ঋত্বিক : শ্‌-শ্‌-স— সাপ কি দন্ত্য স?
সমরেশ : হ্যাঁ কেন বলো তো?
ঋত্বিক : আর শ্‌-শ্‌ তালব্য শ?
সমরেশ : সেটা অন্য শাপ, অভিশাপ।
ঋত্বিক : যখন সাপ মানে সর্প, স্নেক, তখন দন্ত্যস। আর শাপ মানে অভিশাপ— তখন তালব্য শ, তাই ত?
সমরেশ : এটা জানার জন্য এতো রাতে এলে?
ঋত্বিক : এবার শ্‌-শ্‌— শুয়ে পড়ুন।
সমরেশ : হঠাৎ কি হল তোমার?
ঋত্বিক : কথাটা মিলে গেল।
সমরেশ : কোন কথাটা?
ঋত্বিক : সাপ আর অভিশাপ
সমরেশ : তার মানে?
ঋত্বিক : বলুন তো খগম কে? (মিউজিক)
সমরেশ : খগম (বিস্মিত)
ঋত্বিক : হ্যাঁ, খগম- খগম- (বিড়বিড় করতে থাকে)
সমরেশ : শোনো ঋত্বিক— তোমাকে একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে নাও।
ঋত্বিক : (ঘাড় নাড়ে) দরকার নেই। শ্‌-শ্‌-শ্‌ শীতকালে এমনিতেই ঘুমাই। শ্‌-শ্‌ শুধু স্‌-স্‌-সন্ধ্যায়, ঐ স্‌-স্‌ সূর্যাস্তের সময় জাগি।
সমরেশ : এসব কি বলছো?
ঋত্বিক : (মৃদু হাসে)
সমরেশ : তোমার কথা তো খুব আটকে যাচ্ছে। আর - জিভটা বার বার অমন করছো কেন? জিভে কিছু হয়েছে? দাঁড়াও— (টর্চ জ্বালায়) হা করো ত? মনে হচ্ছে— জিভে কিছু একটা হয়েছে— জিভটা বার করো— (টর্চের আলো হা - মুখে ফেলে) হুঁ! একটা সরু লাল দাগ, ডগা থেকে মাঝখান পর্যন্ত চলে গেছে। (টর্চটা নিভিয়ে) কোন ব্যথা আছে? যন্ত্রণা?
ঋত্বিক : না। (ঘাড় নেড়ে জানায় — 'না')

সমরেশ : কি যে গোলমেলে ব্যামো বাঁধিয়ে বসলে, কে জানে। এবার নিজে ঘুমানোর চেষ্টা করো। আর আমাকেও একটু ঘুমাতে দাও। সারাদিন অনেক ধকল গেছে। আগামীকালও যাবে। দয়া করে আর ডিসটার্ব কোরো না প্লিজ। (ঋত্বিক ঘাড় নেড়ে সায় দেয়) এই ঠান্ডায় সবাই থরথর করে কাঁপছে। আর তুমি একটা গেঞ্জি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ? এরপর তো কঠিন অসুখে পড়ে গেলে, আমাকে আরও বিপদে ফেলে দেবে। (ঋত্বিক হঠাৎ শিস দিতে থাকে। সমরেশ চমকে ওঠে, তাকায় ও বিস্ময়ে ওর কাছে এগোয়)। কি হল? দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও। ঘরে যাও। (ঋত্বিক নির্বিকার। হাঁটুতে ভর দিয়ে হঠাৎ বসে পড়ে) কি মুশ্‌কিল। চলো— আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি। ওঠো— (হাত ধরে টানতেই চমকে ওঠে। ভয়ে দু-পা পিছিয়ে যায়।) একি! (সভয়ে) তোমার শরীর ও দেখছি বরফের মতো ঠান্ডা। জীবিত মানুষের এমন হিমশীতল শরীর— কল্পনাও করা যায় না। (ঋত্বিকের ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা। মিচকি হাসে। চোখের উপর চোখ রেখে শিস দিতে থাকে—)

সমরেশ : এই! তোমার কি হয়েছে বলো তো? চোখের পলক পড়ছে না। জিভটা বার বার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ওভাবে বার করছো কেন? (আর্তস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে) বন্ধ করো— তোমার ঐ শিস দেওয়া প্লিজ বন্ধ করো।

ঋত্বিক : (ফিসফিসিয়ে বলে) সাপের ভাষা, সাপের শিস।

সমরেশ : তার মানে?

ঋত্বিক : শুনতে পাচ্ছেন?

সমরেশ : কি?

ঋত্বিক : ঐ যে — সাধুবাবা ডাকছে— আয় বাসুকি— আয়- আয়—

সমরেশ : (ধৈর্যচ্যুতি ঘটে) এসব কি বলছো তুমি?

ঋত্বিক : বাসুকি! আয়— আয়—আয়—
(বলতে- বলতে হাঁটুমুড়ে বসে পড়ে। তারপর শরীরটাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে — মাটিতে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ে এবং কনুই এর উপর ভর করে, নিজেকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে খাটের তলায় ঢুকে পড়ল।)

সমরেশ : (উদ্বিগ্ন) কি হল? খাটের তলায় ঢুকছো যে?

ঋত্বিক : (ফিস-ফিস করে বলে) আলোটা অসহ্য!

সমরেশ : (চমকে ওঠে) এ্যাঁ!!

ঋত্বিক : হ্যাঁ! (ফিস্ ফিস্ করে বলে) আমি অন্ধকারে আমার ঘরে এভাবেই চলে যাব।

সমরেশ : ঋত্বিক!! (অস্ফুট স্বরে)

ঋত্বিক : বাতিটা নিভিয়ে দিন। নিভিয়ে দিন আলোটা।

সমরেশ : (ভয়ার্ত চাহনি) কেন?

ঋত্বিক : খগম-খগম-খগম (মিউজিক)

(ভয়ে বিহ্বল সমরেশের চোখ বিস্ফারিত । আতঙ্কে কম্পমান শরীর থেকে খসে পড়ে যায় গায়েরই চাদর। বুকে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে ঋত্বিক এগিয়ে যায়। আলো ক্রমশ: কমে আসে। টিমটিমে আলোর বাতিটা ঋত্বিক যেই নিভিয়ে দেয়। পুরো মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। ভেসে আসে ঋত্বিকের কণ্ঠস্বর—

'বাসুকির বিষম বিষ— ফিস্-ফিস্-ফিস্। সাপের ভাষা সাপেব শিস'— মিউজিক উচ্চগ্রামে পৌঁছয় , তারপর মিলিয়ে যায়—কুকুরের ত্রাহি আর্তনাদ ও চিৎকার, তারপর গোঙানি থেমে যায়। ভোরের আবহে মঞ্চ মৃদু আলোকিত হলে দেখা যায়— ঘরে কেউ নেই। নেপথ্যে অস্পষ্ট কোলাহল ক্রমশ: জোরাল হয়। দরজায় মুহুর্মুহু করাঘাত। আলোর ঘনত্ব বাড়তে থাকে।

**।। ৫ম দৃশ্য ।।**

(সামনের দিকে ডানদিকের প্রথম উইংস -এর ভিতর বাথরুম থেকে অবসন্ন সমরেশ ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করে। হাতের টুথ ব্রাশ ও গামছা যথাস্থানে রেখে দ্বিতীয় উইংস সংলগ্ন দরজার দিকে এগোয়। দরজা খোলামাত্র হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে বাবুরাম ও বেয়ারা।)

বাবুরাম : সাব্! তবিয়ত ঠিক আছে ত? (ক্লান্ত বিষন্ন সমরেশকে দেখে থমকে যায়)

সমরেশ : কি ব্যপার? তোমরা? এতো সকালে ? (হাই তোলে)

বেয়ারা : স্যার! সর্বনাশ হয়ে গেছে।

সমরেশ : কার?

বাবুরাম : ঐ সাব কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সমরেশ : বাথরুমে গেছে হয়তো।

ঋত্বিক : আমরা সবখানে তালাশ করেছি, কিন্তু —

সমরেশ : বাইরে কোথাও যায় নি ত?

বাবুরাম : কি করে যাবে? বাইরে যাবার মেইন গেট এখনো খোলা হয় নি।

সমরেশ : তাহলে?

বেয়ারা : এদিকে আবার ঐ সাহেবদের কুকুরটা কাল রাতে মারা গেছে।

সমরেশ : মারা গেছে? সে কি! হঠাৎ কি হল?

বেয়ারা : সেটা তো এখনো জানা যায় নি?

বাবুরাম : তবে—

সমরেশ : তবে কি?

বাবুরাম : কুকুরটার গায়ে পাওয়া গেছে ছোবলের দাগ! (মিউজিক)

সমরেশ : ছোবলের দাগ? কীসের ছোবল?

বেয়ারা : সেটাই ত রহস্য! কেউ কিছুই বুঝতে পারছে না।

সমরেশ : ঋত্বিক কোথায়?

বেয়ারা : সেই খবরের জন্য এখানে এসেছি। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সমরেশ : কোথায় গেল?

বাবুরাম : আমি জঙ্গালে ঐ মুখ পর্যন্ত খুঁজে এলাম। কিন্তু কোথাও নেই ! শুধু এটাই পেলাম। (মুড়ে রাখা একটা গেঞ্জি দেখায়)

সমরেশ : একি! এটা পড়েই ত কাল রাতে আমার ঘরে ছিল।

বাবুরাম : তখন কেমন দেখলেন?

সমরেশ : চালচলন- কথাবার্তা— সবই এ্যাবনর্মাল।

বাবুরাম : তাহলে যেটা ভাবছিলাম—

সমরেশ : কি ভাবছিলে?

বাবুরাম : আমার ধারণা— সে এখন আর মানুষ নেই স্যার! (ককিয়ে ওঠে)

সমরেশ : তাহলে?

বাবুরাম : সে এখন — (কথা আটকে যায়) মনে হচ্ছে — সাধুজির ওখানে — আর দেরি করা ঠিক হবে না বাবুরাম। আমাদের এখুনি বেড়িয়ে পড়তে হবে। হ্যাঁ সাব, চলুন।

বেয়ারা : পুলিসেও একটা খবর দিতে হবে স্যার।

সমরেশ : সে ত বটেই। আমাকে অফিসেও জানাতে হবে।

বেয়ারা : আমি তাহলে ম্যানেজারকে জানিয়ে দিচ্ছি।

সমরেশ : ঠিক আছে। [ বেয়ারার প্রস্থান] বাবুরাম!

বাবুরাম : জি সাব্!

সমরেশ : আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হচ্ছে!

বাবুরাম : কিরকম?

সমরেশ : তুমি খগম কি জানো?

বাবুরাম : খো গো ম। না সাব। তবে সাধুজিও কাল বলছিল— খো গোম, খো গো ম। ওটা কি আছে স্যাব্?

সমরেশ : খগম ছিল পুরাণ যুগের এক মুণি। তাঁর অভিশাপে সহস্রপাদ মুণি কিভাবে সাপে পরিণত হয়ে গেল, মহাভারতে সে কাহিনি রয়েছে। তবে তিনি হয়েছিলেন ঢোঁড়া সাপ।

বাবুরাম : আমাদের সাব্ কী তাহলে—

সমরেশ : জানি না। কোন কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

বাবুরাম : চলুন সাব। জলদি চলুন। আর দেরি করা ঠিক হবে না।

সমরেশ : হ্যাঁ, চলো। আমি এক্ষুনি রেডি হয়ে আসছি। (বাবুরামের প্রস্থান) জানিনা, গিয়ে কি দেখবো— ঋত্বিক কি তাহলে— (খাটে বসে পড়ে, গভীর চিন্তামগ্ন মনে হয় তাকে) না- না, এ অসম্ভব। (স্বগতোক্তি করে—) কিন্তু শেষ রাতে ওরকম একটা স্বপ্ন কেন দেখলাম? আলোর রং— এ পরিবর্তন ঘটে। মঞ্চের পিছনে সাধুর কুটিরের পরিসরে আলোকবৃত্তে সাধুবাবার অবয়ব। মিউজিক মিলিয়ে যায়)

সাধু : আয় বাসুকি আয়। বাসুকি, বাসুকি , আয় বাসুকি— আয়— (শিস দিতে থাকে) আলোকবৃত্তের আলো সরে যায় সমরেশের মুখে—) (হাল্কা মিউজিকের স্পর্শ)

সমরেশ : (উঠে দাঁড়ায়, পায়চারি করতে থাকে) (মাঝামাঝি স্থানে চিন্তান্বিত সমরেশ থমকে দাঁড়ায়, অস্ফুটস্বরে বলে—) ক্ষুধিত পাষাণ ? ঐ গল্পের শুরুতেই যে কথা— তা কী—

নেপথ্য স্বরে ভেসে আসে—

"There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your Newspapers."

(সমরেশ বিশেষ ভঙ্গিমায় নিশ্চল হয়ে যায়। মিউজিক উচ্চগ্রামে পৌঁছয়। পর্দা)

---

লেখক ঃ **সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়,** পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট নাটককার।

# সেই হত্যাকারী

**সঞ্জয় আচার্য**

*(খাঁ খাঁ দুপুর। সূর্যের খুব তেজ, বাইরের প্রকৃতি যেন ঝলসে যাচ্ছে। প্রায় জনমানবহীন একটি গ্রাম-দিকশূন্যপুর। পর্দা খুললে দিকশূন্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির একটি অংশ দেখা যাচ্ছে- ইতি উতি টেবিল চেয়ার— পেছনের দেওয়ালে ক্রাইম চার্ট ঝোলানো— ক্রাইম রেট শূন্য। আউট পোস্টের আই. সি. চেয়ারে হেলান দিয়ে - দাত দুটো ছড়িয়ে - পা দুটো টান টান করে আরেকটা চেয়ারের ওপর রেখে দুপুরের খাওয়ার পর আধবোজা চোখে বিশ্রাম নিচ্ছে। আর হাবিলদার খাওয়ার পর হাত-মুখ ধুয়ে রুমাল দিয়ে হাত মুছতে মুছতে একটি টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আউটপোস্টে এই দু'জন পুলিশই পোস্টিং। হাবিলদারের সামনের টেবিলে লুডোর বোর্ড পাতা।*
*হাবিলদারের বৌ-এর দেওয়া খাবার চেটেপুটে খেয়ে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে ভেতরে আসে।)*

হাবিলদার ঃ (গান গাইতে গাইতে) গিন্নি তুমি কই - কই- কই। অঃ গিন্নি ইলিশ মাছের মাথা দিয়া কচুর শাকটা যা বানাইছিলা না গিন্নি- (ঢেকুর তোলে) ঐ দিয়াই পুরা ভাতখান সাঁটাইয়া দিলাম। স্যার - অ স্যার- অনেক বেলা হইয়া গ্যাছে - খাইয়া লন - ন্যান ওঠেন দেহি—

আই.সি ঃ আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

হাবিলদার ঃ মানে আমার লগে মস্করা করতাছেন? নির্ঘাৎ বৌদির লগে বাড়িতে ঝামেলা কইরা আইছেন। বৌদিও আইজগা খাবার দেয় নাই।

আই.সি ঃ গোপাল—

গোপাল ঃ বুঝঝি বুঝঝি, তা আগে কইলেই হইত— ভাত আছিল না, তাই ডুমা ডুমা ডুমুরের তরকারি হুদা হুদা খাইয়া মাইরা দিলাম। আগে জানলে আপনারে দিয়া দিতাম খন।

আই. সি ঃ ঐ তেল ঝালের রান্না খেয়ে মরি আরকি—

গোপাল ঃ মরতেন? আমার বৌয়ের হাতের রান্নাতো খান নাই— খাইলে এক্কেরে চাইটা পুইটা সাঁটাইতেন। হাতের গন্ধখান একবার শোকেন—

আই. সি ঃ গোপাল মন মেজাজ আমার ঠিক নেই- এইবার একটু চুপ করো।

গোপাল ঃ আমিতো তখন থিকা হেইডাই জানতে চাইতাছি— মন মেজাজ ভালো নাই ক্যান?

আই.সি ঃ তিন দিন ধরে শুধু সেদ্ধ খাওয়াচ্ছে তোমার বৌদি— পেঁপে সেদ্ধ- উচ্ছে

সেদ্ধ আর ভাত।

গোপাল ঃ ক্যান বৌদির বাড়িতে কেউ মরছে নাকি স্যার?

আই.সি ঃ তোমার গুষ্টির পিন্ডি— ঐ আমার প্রেসারটা আবার বেড়েছে, কোলেস্টরেল হাই— বুঝবে না গোপাল— এ জ্বালা বুঝবে না। আজ খাইনি। ওই দেখো ফেলে দিয়েছি।

গোপাল ঃ এ মা! এইডা কী করছেন স্যার, বারা ভাত এইভাবে ফ্যালতে নাই। ভাত হইল গিয়া লক্ষ্মী।

আই.সি ঃ ধুস আর ভালো লাগছে না। তার ওপর এই ধ্যারধ্যারে গোবিন্দপুর। এখানে না আছে কোন কাজ— না আছে কিছু। আচ্ছা এখানে কী কেউ চুরি চামারিও করে না?

গোপাল ঃ সুখে আছেন তো স্যার তাই ভূতে কিলাইতাছে— পরতেন পাশের থানায়— বর্ডার এলাকা— স্মাগলার সামলাইতেই হিমসিম খাইয়া যাইতেন।

আই.সি ঃ ওইখানে কিছু উপরিও তো হতো।

হাবিলদার ঃ ঐ উপরির লগেই তরতর কইরা প্রেসার বাইড়া এক্কেরে স্বর্গে চইলা যাইতেন।

আই.সি ঃ তোমার মুখ থেকে কি ভালো কথা বের হয় না কখনো গোপাল।

হাবিলদার ঃ আপনি ভালো কথা হোনবার মানুষ? কতবার কইছি হক্কাল-হন্ধ্যায় রামদেব বাবার প্রাণায়াম করে। প্রেসার ফেসার পালাইব— তো কে হোনে কার কথা—

আই.সি ঃ ঐ রাম বা দেব কাওকেই আমি বিশ্বাস করিনা। অন্য কোন উপায় থাকলে বলো।

হাবিলদার ঃ হা হইলে লাগাতার থোরের রস খাইয়া যায়। এইবেলা ঐবেলা দুইদিনে নাইমা যাইব— গ্যারান্টি।

আই.সি ঃ তুমি ডাক্তার হলে না কেন বলতো?

হাবিলদার ঃ হেইডা আমার বাপ জানে— তারে গিয়া শুধান— আমার কি হাবিলদার হওনের কথা আছিল—

আই.সি ঃ কেউ কিছু জানে না গোপাল— সবই কপাল।

হাবিলদার ঃ অহন আপনার কপাল কেমন যাইতাছে— চলেন দেহি একবার— আসেন একদান লুডো খেলি— টেবিলে পাতাই আছে—

আই.সি ঃ তুমি খেল— আমি এইটা শেষ করি— (পাশের থেকে একটা বই তুলে ধরে)

হাবিলদার ঃ অগাথা ক্রিস্টি। ডিটেকটিভ বই—

আই.সি ঃ মাঝে মাঝে মগজটাকেতো শান দিতে হয়—

হাবিলদার ঃ তাই বলে অগাথা ক্রিস্টি! না বাবা— আমার বৌ গোপালভাঁড় পড়ে— মালটার হেব্বি বুদ্ধি—

আই.সি ঃ তুমিও পড়ো - কে বারন করেছে তোমায়?

হাবিলদার ঃ চলেন না স্যার একদান— ঐ সাপ-মই খেলুম— বেশী টাইম লাগব না— ওই মইয়ে চইড়াই তো আপনি উপরে উইঠ্যা যাইবেন।

আই.সি ঃ ঠিক আছে। আমি এইখানে বসেই খেলছি। তুমি আমার হয়ে দান দিয়ে দাও।

হাবিলদার ঃ ঘট হইয়া এইখানেই বইয়া থাকব— আশ্চর্য একটা মাল— (স্বগতোক্তি)

আই.সি ঃ কিছু বললে?

হাবিলদার ঃ না না এই শুরু করতাছি— আমি শুরু করলাম— হালায় প্রথমেই পুট। ভাঙ্গা কপাল। স্যার আপনারটা চালতাছি - (চালে ছয় পড়ে)

হাবিলদার ঃ কেয়া বাত ছয়— আগাইয়া গ্যালেন স্যার।

আই.সি ঃ চালিয়ে যা, চালিয়ে যা—

হাবিলদার ঃ স্যার আমার ছয়— মই পাইছি— মইয়ে উঠুম—(মনে হয় চিটিং করে। আই.সি ধরে ফেলে)

আই.সি ঃ চিটিং করিস না গোপাল। আমার কিন্তু দশটা মাথা আর কুড়িটা চোখ।

হাবিলদার ঃ আমি হাড় হাড়ে আপনারে জানি— আপনি হইলেন রাইক্যস রাজা রাবণ— নিন আপনার তিন।

আই.সি ঃ তিন?

হাবিলদার ঃ আরে আপনিও মইয়ে চড়ছেন।

আই.সি ঃ ব্রাভো ক্যারি অন—

হাবিলদার ঃ আমার চার— এইবার আপনার চাল দিলাম—ছয় - স্যার ছয়—

আই.সি ঃ বাঃ -

হাবিলদার ঃ কিন্তু স্যার— একখান হেলে সাপ খাইয়া নিল আপনারে — হে হে— এক্কেরে নীচের তলায়—

আই.সি ঃ আমি দেখতে পারছিনা আর তুই চিটিং করেই যাচ্ছিস তাইতো?

হাবিলদার ঃ এই সত্যনারায়ণের কিরা কাইট্যা কইতাছি— চিটিং করলে য্যান আমার জিভ খইস্যা পড়ে। স্যার আমার দুই - আবার মই পাইছি - তরতর কইরা উপরে উইঠ্যা গেলাম— আপনি নীচে পইরা থাকেন—

আই.সি ঃ আমারটা ভালো করে চাল—

হাবিলদার ঃ এই যে স্যার অনেকবার ঝাকাইয়া ফ্যাললাম— ন্যান—পুট। একঘর আগাইলেন—স্যার আপনার লাকটাই খারাপ। বৌদি বোধহয় তেড়ে আপনারে গাইল পারতাছে, তাই আপনার এই অবস্থা—

আই.সি ঃ ধুস আমি আর খেলব না।

হাবিলদার ঃ এহন না কইলে হইব না স্যার। খেলনের তো একটা রুল আছে নাকি? তাতো

আপনারে মানতে হইব।

আই.সি ঃ ঐ রুল তোমার পেছনে ঢোকাব শূয়োর। শালা ফেরেববাজ— চিটার— (দুটো গরু নিয়ে রাস্তা দিয়ে কে যেন যাচ্ছে। নেপথ্যে শব্দ- এই হুট - হুট - হুরর হ্যাঁট - শব্দ শুনে হাবিলদার সেইদিকে তাকায়)

হাবিলদার ঃ এই জবাবটা আপনারে আমি পরে দিমু। এই কৌন হ্যায়—ঠ্যাহরো-ঠ্যাহরো-

আই.সি ঃ কাঠবাঙ্গাল থেকে এক্কেবারে বিহারি বনে গেলি— তোর কত রূপ যে দেখব গোপাল — মালটাকে ধর—

হাবিলদার ঃ এই ইধার আও— ইধার আও— ও গরু লেকর কাঁহা যা রাহা হো— বর্ডারকে উসপার?

জনৈক ঃ এ কী বলছেন স্যার— আমি দুধ বেচি— এই পাশের গাঁয়েই থাকি— আমার গোয়ালের জন্য দুটো গরু কিনলাম।

হাবিলদার ঃ পাকারনেসে সব লোগ ওহি কথাই কয়— তোর মুখ দেখ্যাই মালুম হইতাছে তুই একটা গরুচোর— কবের থিকা গরু পাচারের কাম করস?

জনৈক ঃ আমি গরীব মানুষ স্যার। গুধ বেচেই আমার সংসার চলে। আমার ঘরে ছোট ছোট বাচ্চা আছে— এই খারাপ কাজ আমি কেন করব?

হাবিলদার ঃ তুই হগলের চোক্ষে ধূলা দিতে পারবি— এই শর্মারে পারবি না— হত্যি কইরা ক— (জনৈক লোকটি হাবিলদারের পা ধরে)

জনৈক ঃ আমারে ছেড়ে দেন বাবু— আমি ওই সবের সাথে যুক্ত না।

হাবিলদার ঃ পা ছাড়— পা ছাড় কইতাছি— আরে সুরসুরি লাগে— স্যার এইটারে লইয়া কী করুম?

আই.সি ঃ আমি রহস্যের গভীরে পৌঁছে গেছি— তুই ই সামলে নে—

হাবিলদার ঃ আপনি তো সব সময় গা থিকা ধূলা ঝাইড়াই ফ্যালান।

জনৈক ঃ আমাকে ছেড়ে দ্যান বাবু— বাড়িতে আমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে— না খেয়ে মরে যাবে—

হাবিলদার ঃ ওঠ - ওঠ কইতাছি— এইদিকে আয়— ছাইড়া দিমু- (চুপিচুপি বলে)- পাঁচশ টাকা লাগবে—

জনৈক ঃ পাঁচশ!

হাবিলদার ঃ এ্যাই আস্তে আস্তে ক।

জনৈক ঃ মরে যাব স্যার— ঘটি বাটি সব বিক্রি করতে হবে—

হাবিলদার ঃ ছাড়- ছাড় - কত আছে বার কর দেখি—

জনৈক ঃ এই দেখুন স্যার সব মিলিয়ে ঝুলিয়ে পঞ্চাশ হবে—

হাবিলদার ঃ মারুম পাছায় এক লাথি— তুই গরু কিনতে গেছিলি না মুদি দোকানে নুন

কিনতে ?

জনৈক ঃ গরু কিনতেই সব টাকা শেষ হয়ে গেছে বাবু, আমার কাছে আর কিছু নেই—

হাবিলদার ঃ ঠিক আছে ওটাই দে— যা যা পালা— আবার গেলে এই দিক দিয়াই আসিস- (আই.সি চোখ ট্যারা করে দেখে হাবিলদারকে)

জনৈক ঃ আসব বাবু নমস্কার—

(জনৈক লোকটি বেরোতে যাওয়ার সময় হঠাৎ আর একজন লোকের সাথে মুখোমুখি হয়- একজন বেরোতে থাকে আর ঢুকতে থাকে- বাঁধার সৃষ্টি হয়- এই মজার খেলা কিছু ক্ষণ চলতে থাকে। তারপর অচেনা লোকটি ভেতরে প্রবেশ করে)

অচেনা লোক ঃ নিন দাঁড়িয়ে পরলাম। আপনি এবার বসুন— (জনৈক চলে যায়)

হাবিলদার ঃ আরে খাড়ান খাড়ানা মশাই— হুট কইরা ঢুইক্কা পড়লেন যে—

অচেনা লোক ঃ ক্যাপটেন নেমো (নিজের নাম বলে)

হাবিলদার ঃ কোথায় নামবো ? আর আমি ক্যাপটেন না উনি ক্যাপটেন—

অচেনা লোক ঃ ও আচ্ছা (আই.সি-র কাছে এগিয়ে যায়) আপনিও ক্যাপটেন— আমিও ক্যাপটেন— ক্যাপটেন নেমো।

আই.সি ঃ ক্যাপটেন নেমো অদ্ভূত নাম তো—

অচেনা লোক ঃ এটা কী পড়ছেন ? অগাথা কৃষ্টি- থ্রিলার- আপনি জুল ভের্নের "টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস আন্ডার দ্য সি"- পড়েছেন ?

আই.সি ঃ আজ্ঞে না-

অচেনা লোক ঃ পড়ে নেবেন— থ্রিলার আর সায়েন্স ফিকশনের এরকম ক্লাসিক মেলবন্ধন দুনিয়ায় খুব কমই আছে। ঐ বই-এরই পরের অংশ "দ্য মিস্টিরিয়াস আইল্যান্ডস"। ক্যাপ্টেন নেমোর আসল পরিচয় আপনারা ঐ বইতেই পাবেন-

হাবিলদার ঃ স্যার নামটা হুইনাই মনে হইছিল মালটা আমাগো দ্যাশের না।

অচেনা লোক ঃ আজ্ঞে না- ক্যাপ্টেন নেমো পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভারতীয়। ইংরেজ আমলে স্বাধীন রাজ্য ছিল বুন্দেলখণ্ড। তার যুবরাজ খুব উচ্চশিক্ষিত কিন্তু বিদ্রোহী। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিল- তারপর নিজের প্রাণ বাঁচাতে চলে যান প্রশান্ত সাগরের একটা নির্জন-নিরালা দ্বীপে— সেখানেই তিনি তৈরি করেন তার স্বপ্নের ডুবোজাহাজ- "নটিলাস"। যারা স্বাধীনতা চায়—তাদের লড়াইয়ে এই বিদ্রোহী মেধাবী বৈজ্ঞানিক নানাভাবে সাহায্য করে। বিশ্বের প্রথম ডুবোজাহাজ বানানোর কৃতিত্ব জুভের্ন কিন্তু দিয়ে গেছেন এক ভারতীয়কেই।

হাবিলদার ঃ সবইতো বুঝলাম কিন্তু এইগুলা শুইন্যা আমাগো কী লাভ হইব?

নেমো ঃ এই যে লুডো খেলছেন এতে কী লাভ হয় আপনার?

হাবিলদার ঃ কিছুই না—

নেমো ঃ হয়। ওই লাভ নয়— এল.ও.ভি.ই- লাভ। আরে মশাই আপনি তো খেলাটা খেলতে ভালোবাসেন— তাইতো খেলেন —

হাবিলদার ঃ হ- এইডা এক্কেরে ঠিক কইছেন—

আই.সি ঃ গোপাল তুই চুপ কর। ক্যাপ্টেন নেমো এইবার বলুন থানাতে আপনি কেন এসেছেন?

নেমো ঃ ক্যাপ্টেন নেমোর মত আমিওতো ঘুরে বেড়াই— তাই ঘুরতে ঘুরতেই ধরুন ঢুকে পড়লাম। তারপর দেখলাম আপনারা বেশ মজার মানুষ। একজন লুডো খেলছেন আর একজন বই পড়ছেন। আরো ইন্টারেস্ট জাগলো।

আই.সি ঃ আপনি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ান? তো আপনার ঘর-বাড়ি আছে না নেই?

নেমো ঃ এই যে পথই আমার ঘর। সুনীল গাঙ্গুলির কবিতা আছে না—
শামুকের মত আমি ঘর বাড়ি পিঠে নিয়ে ঘুরি
এই দুনিয়াদারি- পেয়ে গেছি অনন্ত আশ্রয়।
এই রৌদ্র-বৃষ্টি এই শতদল বৃক্ষের সংসার ।
একটু জল?

আই.সি ঃ গোপাল (গোপাল একটা জলের বোতল নিয়ে আসে। নেমো বোতল থেকে ঢকঢক করে জল খায়। তারপর কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা ডায়েরি বের করে)

আই.সি ঃ কি এটা?

নেমো ঃ আমার মায়ের ডায়েরি। এটা পড়েই আমি ক্যাপ্টেন নেমো সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। আমাকে দেখতে একদম আমার মায়ের মত। মায়ের প্রিয় চরিত্র ছিল- ক্যাপ্টেন নেমো। তিনি আমাকে নেমো বলেই ডাকতেন- খুব আদরের ছিল সেই ডাক।

আই.সি ঃ আপনার মা কি অনেকদিন আগেই মারা গেছেন?

নেমো ঃ মারা যান নি, আমি তাকে মেরে ফেলেছি।

আ.সি ঃ মানে?

নেমো ঃ আমি আমার মাকে খুন করেছি।

হাবিলদার ঃ স্যার কয় কি? (ভয় পেয়ে) এই ব্যাগে কি আছে আপনার? বন্দুক?

আই. সি. ঃ দেখি- ব্যাগটা দেখি-

নেমো ঃ (জোরে হেসে ওঠে) আরে অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

হাবিলদার ঃ ধইরা রাখুন স্যার- যাতে পালাইতে না পারে- আমি দড়ি খুইজ্যা আনি?

নেমো ঃ দড়ি আমার ব্যাগেই আছে। আমি একজন সৎ, নিষ্পাপ মানুষ—আমার যদি খারাপ অভিসন্ধি থাকত আমি এই পুলিশ ফাঁড়িতে আসতাম না। দেখুন এর আগে আমি অনেক থানাতে গেছি- তারা কেউ আমার কথা পাত্তা দেয়নি। আমাকে পাগল ভেবে পেছনে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের কত থানা যে ঘুরেছি তার হিসাব নেই। এই দিকশূন্যপুরে এসে আমার প্রথম মনে হয়েছে- হ্যাঁ, এদের কাছে সবটা বলা যায়। নিজের ভেতরটা সম্পূর্ণ খুলে দেওয়া যায়- এখন আপনি আমার ধর্মাবতার- মায় বাপ - আপনি বিচার করুন। একটা যন্ত্রণা, একটা অপরাধবোধ এতদিন কুঁড়ে কুঁড়ে শেষ হয়েছি- আপনি অন্তত বাঁচান।

আই. সি ঃ আপনি কী চান সেটাইতো বুঝতে পারছি না।

নেমো ঃ বিচার চাই- সব শুনে আপনি রায় দেবেন- আমি মাথা পেতে নেব।

হাবিলদার ঃ এর কথায় ভুলবেন না স্যার- এর অন্য কোন মতলব আছে নিশ্চয়- লক-আপে ঢোকান- থার্ড ডিগ্রি দিমু- বমির মত হর হর কইরা আসল কথা সব বার হইয়া আইব-

আই. সি ঃ এখন কোন দরকার নেই।

নেমো ঃ শুধু থার্ড ডিগ্রি কেন? আমার সাথে কি করা হয়েছিল জানেন? (দৃশ্যটি মঞ্চে চিত্রায়িত হবে) এইভাবে উল্টো করে ঝুলিয়েও রুলের বারি মেরেছে পুলিশ- এমনকি থানার মধ্যেই এইভাবে- আমাকে দুই হাতে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে দুই পায়ে তার পেঁচিয়ে দিয়ে ইলেকট্রিক শকও দেওয়া হয়েছে- তারপর তারাই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।

আই. সি ঃ আচ্ছা আমরা আপনাকে কিছু করব না- আপনি এই চেয়ারটায় বসুন- আর একটু জল খাবেন-
(নেমো মাথা নাড়ে) গোপাল (গোপাল আবার জল দেয়)

হাবিলদার ঃ স্যার জল কিন্তু এইবার শ্যাষ হইয়া যাইব।

আই. সি ঃ হোক শেষ। জল ছাড়া আর কিছু খাবেন আপনি?

নেমো ঃ আজ্ঞে না।

আই.সি ঃ এইবার বলুন-

নেমো ঃ আমাকে জনম দিয়েই মা মারা যায়। বাবা মাঝে মাঝেই আমাকে মামার বাড়ি রেখে আসত। দাদু-দিদা কিছুতেই ভুলতে পারত না যে আমাকে জনম দিতে গিয়েই আমার মায়ের শরীরে মৃত্যুর বীজ ঢুকেছিল। একদিন রাতে ওদের কথা বার্তা আমি শুনে ফেললাম। (একটা চেয়ার দেখিয়ে বলে) দাদু এরকম একটা চেয়ারে বসেছিল আর দিদা পাশে দাঁড়িয়ে- আমি দূরে পর্দার আড়াল থেকে

ওদের কথা শুনে ফেলেছিলাম- (এই দৃশ্যটিও চিত্রায়িত হবে)। দাদু বলেছিল - আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না ওকে জনম দিতে গিয়েই— দিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল - কিন্তু ওতো আর খুনী নয়, একটা নিস্পাপ শিশু। দাদু রেগে বলেছিল- আমি ঠিক জানি ও একদিন ঠিক খুনী হয়ে উঠবে — দিদা চমকে বলল - কেন?

ওটাই ওর নিয়তি তাই। ও নিজের মাকে হত্যা করেছে।

দিদা বলল- কিন্তু তার জন্য ওকে তো দায়ী করা যায় না—

দাদু বলল - তা অস্বীকার করাও যায় না। ওর যদি জনম না হতো আমার মেয়েটা হয়তো আজও বেঁচে থাকত।

কেন জানি আমার মনে হয় - এই শুরুও আরও অনেকেরই মৃত্যুর কারণ হবে।

আই. সি ঃ আপনার দাদু আপনার মাকে খুব ভালোবাসতেন - নিজের সন্তান তো।

নেমো ঃ মা বেঁচে থাকলে আমার জীবনটা অন্যরকম হতে পারত। তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাতে পারতেন। একটা সুন্দর আনন্দময় জীবন কে চায় না— কিন্তু আমি মাকে খুন করলাম- জরায়ুতে ফ্যালোপাইন টিউবকে আমি পচিয়ে দিয়ে ছিঁড়ে দিলাম—

হাবিলদার ঃ যা হইয়া গ্যাছে ছাড়ান দ্যান দেহি- এই নিয়া আর একদম আক্ষেপ করবেন না

আই. সি ঃ মা মরেই আপনার সর্বনাশ করে দিল। আপনার ভবিষ্যৎকে হত্যা করল- আসলে উনিই একজন হত্যাকারী - একজন খুনী হয়ে উঠতে উনিই আপনাকে প্রথম শিখিয়েছেন। আপনার দাদু-দিদা আপনাকে ভালোবাসত না?

নমো ঃ খুব ভালোবাসত। কিন্তু ওতে সন্দেহ মিশে থাকত।

হাবিলদার ঃ আপনি লোকটাই মশাই ঈর্ষাপরায়ণ-

নমো ঃ একবার আমার দিদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে- অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না। এই ঘটনা দাদুকে খুব একা করে দেয়। বোঝা যাচ্ছিল দাদুও আর বেশী দিন নেই। বাবা কানাঘুষায় শুনতে পেলেন - উনি তার সমস্ত সম্পত্তি তার গুরুর আশ্রমে দান করে যাবেন। বাবা জোর করে আমাকে দাদুর কাছে পাঠালো। (দৃশ্যটি চিত্রায়িত হবে)

- দাদু আমাকে কী তুমি কিছুই দিয়ে যাবে না?

- কী চাস তুই? দাদু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল।

তোমার সম্পত্তি।

এসব কথা তুই শিখলি কোথায়?

বাবা বলেছে-

তোর বাবার কী কিছু কম আছে নাকি - যা দূর হ।

দাদুর কথা শুনে আমার তেমন কিছু মনে হল না। কিন্তু ওনার কথা বলার ভঙ্গীটা আমার ভালো লাগেনি। মনে হল না দিলে না দেবে— আমি কী এসব চেয়েছি নাকি?

আই.সি ঃ তারপরও আপনি ওখানেই ছিলেন?

নেমো ঃ না, বাবা এসে ঝগড়া করে সেদিনই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। রাতে খবর পাই দাদু মারা গেছে- তখন আমার মনে হয়েছিল দাদুও আমার জন্যই মরল।

আই.সি ঃ তারপর?

নমো ঃ তারপর বাবার সাথে আমার দিনগুলো ভালোই কাটছিল। কিন্তু এই সময়ই একটা ঘটনা ঘটে- যা আমার জীবনটাকেই পাল্টে দেয়।

হাবিলদার ঃ তা হইলে তো ভালো কইরা শুনতে হইব, খাড়ান, একখান পান খাইয়া লই- স্যার এই ন্যান (সি.আই-কে দেয়) আপনি খাইবেন নাকি?

নেমো ঃ আজ্ঞে না-

হাবিলদার ঃ তা হইলে একটু জলই খাইয়া লন। শ্যাষ হইলে আমি লইয়া আসুম।

নেমো ঃ ঐ সময় থেকে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে একটি মেয়ের আনাগোনা শুরু হল। বাবা বলল - কিছুদিনের মধ্যেই ইনি তোমার নতুন মা হতে চলেছে। মেয়েটি ছিল খুবই সুন্দরী। আর ব্যবহারও ছিল খুব মিষ্টি। রোজ আমার জন্য চকোলেট নিয়ে আসত। আমি যখন আঁকার টিচারের কাছে বসে ছবি আঁকতাম- মেয়েটি তখন বাবার সঙ্গে ঘরের ভেতরে সময় কাটাত - ঘরের দরজা বন্ধ থাকত। মেয়েটির আমি একদম ফ্যান হয়ে গিয়েছিলাম। ভারী চমৎকার হাসত - সেই হাসি দিয়েই সে আমাকে জয় করে নিয়েছিল।

হাবিলদার ঃ বাঃ, বাপ-ছেলে দুজনাই সুন্দরী দেইখ্যা মইজ্যা গ্যালেন?

নেমো ঃ তারপর একদিন আমরা তিনজনে বেড়াতে গেলাম। আমি বাবার হাত ধরে হাঁটছিলাম - প্ল্যাট ফর্মে খুব ভীড় - একটা লোকাল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে - তার প্রতিটা কামরাতে ভীড় - মেয়েটি পেছনের লেডিস কামরায় উঠে পড়ল। তারপর চেঁচিয়ে বলল - আমি এটাতে আছি, তোমরা এগিয়ে যাও - ষ্টেশন এলে নেমে পোড়ো। সামনে আরো এগিয়ে গিয়ে আমরা একটা কামরায় উঠে পড়লাম- আর ট্রেনটাও ছেড়ে দিল। (ট্রেনের দৃশ্যটি চিত্রায়িত হবে)

নেমো ঃ কামড়ায় খুব ভীড়। আমাকে বাচ্চা দেখে একজন বৃদ্ধ একটু সরে বসে আমাকে বসার জয়গা করে দিলেন - বাবা আমার সামনে দাঁড়িয়ে - খুব ঘামছিলেন। খুব অস্থির দেখাচ্ছিল বাবাকে। কী একটা ভাবনায় ভেতর ভেতর যেন ছটফট করছিলেন। একের পর এক ষ্টেশন পেরিয়ে যেতে থাকল। দেখলাম বাবার ছটফটানি আরো বেড়ে গেল। আমাকে বলল তুই দিদিমার কাছে একটু থাক,

আমি দেখি নবনীতা বসার জায়গা পেল কিনা। একবার দেখেই চলে আসব।
বাবর কথা শুনে শিউরে উঠলাম - না বাবা তুমি যেও না।
বাবা আমার হাত ধরে বলল - কেন তোর ভয় করবে?
মাথা নাড়িয়ে বললাম - খুব

বাবা বলল ঃ ভয় কীসের - এই তো এত মানুষ। এই দাদু আছে- তোকে একটু দেখে রাখবেন। পারবেন না?

দাদু ঃ এই ভীড়ের মধ্যে আবার চিনে আসতে পারবে তো বাবা?

বাবা ঃ কেন পারব না? এইতো দু-তিনটে মাত্র কামরা - যাব আর আসব- তুই কিছু টেরই পাবি না

নেমো ঃ বাবা এমনভাবে আশ্বাস দিল - আমিও চুপ করে গেলাম। পাশ থেকে একটা লোক বলে উঠলো - হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক পারবে ও দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব সাহসী- কী নাম তোমার?
ক্যাপ্টেন নেমো-
আরে সে তো খুব সাহসী একজন মানুষ।

আমি বুঝলাম বাবার প্রয়োজন অনেক বেশী- তার জন্য একা - অসহায় এক জন নারী অপেক্ষা করে আছে। একের পর এক স্টেশন চলে যেতে থাকে - বাবা ফিরছে না। আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছে। দাদু বোঝাচ্ছেন - বাবা নিশ্চয় সঠিক কামরাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি ঠিকই আসবেন। আমি শেষ স্টেশনে নামব। চিন্তা করছ কেন? কামরা আরো ফাঁকা হতে থাকে - এক সময় শেষ স্টেশনও চলে আসে কিন্তু কোথাও বাবার চিহ্ন মাত্র নেই। বৃদ্ধ স্টেশনে নেমে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। এদিক-ওদিক তাকায় - প্রতি ফাঁকা কামরা উঁকি দিয়ে দেখতে থাকে - আমি চেঁচিয়ে ডাকি - বাবা - বাবা - কোথায় তুমি? আমাকে ছেড়ে যেওনা- তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না-
বাবাকে আমি চিরকালের মত হারালাম।

হাবিলদার ঃ এইরকম যদি আমার লগে ঘটত- আমিতো বাঁইচা থাকতে পারতাম না মশাই।

নেমো ঃ কিন্তু আমি তো খুনী। আমার হাতে মৃত মায়ের রক্ত - আমার কপালেই লেখা আছে আরো খুন করব আমি - আমাকে বাঁচতেই হবে—

আই.সি ঃ ঐ বৃদ্ধ আপনাকে ছেড়ে চলে গেল তাইতো?

নেমো ঃ না, ওনার বাড়িতে নিয়ে গেল- আমার কান্না ওনার চোখকেও ভিজিয়ে দিয়েছিল। আমি ওনাকে দাদু বলেই ডাকতে শুরু করলাম।
দাদু একটা দোতলা বাড়িতে থাকতেন। চারপাশে ফাঁকা জায়গা-মাঠ, পুকুর, বাঁশবন - খোলা আকাশ। জোছনা রাতে চাঁদটাকে ভারি সুন্দর লাগত। মুঠো মুঠো তারা ছড়িয়ে থাকত - ভেসে বেড়াত- ঝুকে পড়ত - আর আমি একটা

তারা থেকে আর একটা তারায় যেন ছুটে বেড়াতাম।

হাবিলদার ঃ ওইখানে খুব মজায় ছিলেন আপনি?

নেমো ঃ হ্যাঁ, মাঝে মাঝে শুধু বাবার কথা মনে পড়ত। পুরোনো জীবনের কিছুই ছিলনা আমার কাছে। শুধুমাত্র একটা জীর্ণ ডায়েরি পড়েই আমি প্রথম ক্যাপ্টেন নেমোর কথা জানতে পারি।

আই.সি ঃ আপনার ওই দাদু কি একাই ছিলেন? ওর পরিবারে আর কেউ ছিল না?

নেমো ঃ ওনার একটাই মাত্র মেয়ে ছিল। তার বিয়ে হয়ে গেছিল - দাদুর খুব ইচ্ছে- তাঁর মেয়েকে আমি মা ডাকি। নিঃসন্তান ছিল তো- তাই এনি আমাকে আপন করেই নিয়েছিল। নিজের ছেলের মত - নিজের হাতে সকাল বিকাল খাইয়ে দিত- জ্বর হলে সারা রাত মাথার কাছে বসে জলপট্টি দিত। আমার খুব মনের কথা বুঝত। আমি কী খেতে পছন্দ করি - কী করতে ভালোবাসি - এসব সে অনায়াসে বুঝে যেত। আমার জন্য সে সবরকম ত্যাগ করতে পারত।

হাবিলদার ঃ ওইহানে তো সবই ঠিকই আছিল- তা হইলে কি গন্ডগোল হইল আবার?

নেমো ঃ দাদুর মেয়েকে আমি প্রাণভরে মা বলে ডাকতাম কিন্তু যখন নিজের শ্বশুর বাড়ি ফিরে যেত তখন সে অন্য মানুষ। সে ওখানে আমাকে দূরে দূরে রাখত। সে সেখানে আমাকে মা বলে ডাকতে বারণ করত- কারণ ওখানে তাকে দখল করে রাখত তার জায়ের ছেলে। ভাসুর আর জা - কাজ করতে বেরিয়ে যেত - তাদের ছেলেটি মানুষ হচ্ছিল তার কাছে। আমাকে সেই ছেলেটি একচুলও জায়গা দিতে রাজি ছিল না- কিন্তু মায়ের পক্ষপাতিত্ব ছিল আমার দিকে।

আই.সি ঃ এই ব্যাপারটা নিয়ে তাহলে খুব জলঘোলা হয়েছিল?

হাবিলদার ঃ আপনি মশাই আজব মানুষ - আপনি যেইহানে, ঝামেলাও সেইহানে।

নেমো ঃ এটাই যে আমার নিয়তি। একদিন সকালের কথা বলি শুনুন- দাদুর বাড়িতে মা এসেছে- সঙ্গে ওর জা। মা আমাকে নিজের হাতে ভাত খাইয়ে দিচ্ছে - হঠাৎ ঐ জা-এ ঝড়ের বেগে ঢুকল আর আমাকে দেখে পাথরের মত থমকে দাঁড়ালো। মা যেই আমার মুখে ভাত তুলতে যাবে- জা তখন বলল- ও তো বেশ বড় হয়ে গেছে, তুমি ওকে খাইয়ে দিচ্ছ কেন? তুমি বরং আমার ছেলেকে খাইয়ে দাও, মা কথা না বাড়িয়ে বলল- তুই বাকীটা নিজের হাতেই খেয়ে নে বাবা। মা উঠে গেল, হাত ধুয়ে এল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। জা তারপর মাকে বলল- তোমার বাবা কী এটা ঠিক কাজ করেছেন?

মা বলল - কী কাজ?

জানা নেই- চেনা নেই- বাইরে থেকে একটা ছেলেকে উনি কুড়িয়ে আনলেন। তাও মেনে নিয়েছি। কিন্তু তাই বলে উনি জোর করে তোমাকে ছেলেটার মা

বানিয়ে দিল- এটা কেমন হচ্ছে?
মা কী তৈরী করা যায়? উনি তোমাকে এই ছেলেটার মা বানাতে চাইছেন।
গোটা দুনিয়া ছিঃ ছিঃ করছে- একবারও ভাবছেন উনি?
তোমাদের কেউ নেই, আমার ছেলে তোমাকে কত ভালোবাসে বলতো- (পুরো ঘটনাটা চিত্রায়িত হবে)
ওকে এক্ষুনি চলে যেতে বল-
মা কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল- তুমি এখন এখান থেকে চলে যাও বাবু।
আমি ওখান থেকে চলে গেলাম- তারপর হেঁটে হেঁটে ছাদে উঠে পড়লাম- নিজেকে আবার খুব একা লাগছিল- বুকের ভেতরটা হা হা করছিল- আকাশে অজস্র তারা জ্বল জ্বল করছিল। আমার মনে হল- ওই আকাশের তারারাই আমার একমাত্র বন্ধু- আমি হাত দিয়ে এক একটা তারাকে ছুঁয়ে দেখতে লাগলাম।

আই.সি ঃ কখন ছাঁদ থেকে নীচে নামলেন?

নেমো ঃ ঐ রাতে নামিনি। আমি ছাদে ওঠার পর - দেখতে পাচ্ছিলাম সারারাত নীচের ঘরে আলো জ্বলে আছে- মা-এর ঐ জা দাদুকে অকথ্য ভাষায় যা তা বলছে- হালকা শব্দ শুধু ভেসে আসছিল ওপরে- তাতে আমি বুঝতে পারছিলাম— ঐ ছাদেই তারা দেখতে দেখতে কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই।

আই.সি ঃ তারপর?

নেমো ঃ সকালে লোকজনের হৈ হট্টগোলে আমার ঘুম ভেঙ্গেছিল- নীচে নেমে দেখি আমার দাদুর বডিটা বাড়ির পেছনের পুকুরের জলে ভাসছে। আমি হতবাক হয়ে গেলাম- দাদুর জলে খুব ভয় ছিল- সাঁতার জানত না।

হাবিলদার ঃ তাহইলে কেউ পুকুর ধারে নিয়া ফালাইয়া দিছিল নাকি?

নেমো ঃ জানি না। পুলিশ বলেছিল আত্মহত্যা- কিন্তু অন্যরা বলছিল খুন

আই.সি ঃ কে খুন করেছিল?

নেমো ঃ ইঙ্গিতটা আমার দিকেই ছিল। আর সত্যি আমিই তো খুন করেছি- আমার দাদুর ফুলে যাওয়া দেহ- প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেন বিষের জ্বালায় ছটফট করছিল। দাদুর শরীরে- মনে সেই বিষ দিয়েছিলাম আমি।
আমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা সেই বিষধর সাপটাকে দেখতে পাচ্ছেন না আপনি?

আই.সি ঃ এটাও আপনার ভুল ভাবনা- বরং আপনার দাদু আপনাকে পেয়ে নতুন প্রাণ পেয়েছিল-

নেমো ঃ না - কোন ভুল নেই। আমি নিশ্চিত - দুধ কলা খাইয়ে আমাকে মানুষ করে তুলেছে দাদু আর আমি তার শরীর বিষে পচিয়ে দিয়েছি রোজ-

আই.সি ঃ আপনি কেন খুন করবেন ওনাকে? আপনার একমাত্র অবলম্বন ছিল সে - ওনারও তো কেউ ছিল না- আপনাকে নিয়েই ওনি বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেছিল। আপনিও ওনাকে খুব ভালোবাসতেন আপনি, নিজেকে কেন আপনি অপরাধী ভাবছেন? অপরাধ তো তারা করেছে- যারা আপনার মত নিষ্পাপ মানুষকে সন্দেহ করেছে- ওদের হিংসার বিষ সহ্য করতে না পেরে আপনার দাদু আত্মঘাতী হয়েছে-

নেমো ঃ আপনি ঠিক বলছেন না স্যার- এর ব কিছুর দায় আমার একার। নিজের অজান্তেই আমি হত্যা করেছি ওনাকে। আপনি অনেক ডিটেকটিভ বই পড়েন, আপনার কি মনে হয়- কেও কি নিজে নিজেই হত্যাকারী হয়ে ওঠে?

আই.সি ঃ না- হত্যাকারীকে তৈরী করা হয়- সমাজ তৈরী করে।

নেমো ঃ না - তিলে তিলে একটার পর একটা খুন করে গেছি- আপনি কি আমাকে ঠিক বুঝেছেন - কেউ বোঝেনি জানেন— কাউকে বোঝাতে পারিনি আমি। একটা অপরাধবোধ সারা জীবন শুধু খোঁচা দিয়ে গেছে- আপনি আমার নামে এফ.আই.আর করুন, চার্জশিট লাগান— কালই আমাকে কোর্টে চালান করুন—আমার ফাঁসি হোক। নিন স্যার এতগুলো খুন করার জন্য আমাকে এ্যারেস্ট করুন।

হাবলদার ঃ স্যার এ কয় কি? কোন রকম প্রমাণ ছাড়া ক্যামনে এ্যারেস্ট করুম এরে?

নেমো ঃ প্রমাণ না থাকলেই কি সকল খুনী ভালো মানুষ হয়ে যায়? সকল অপরাধী মুক্ত হয়ে যায়?

আই.সি ঃ আপনার শাস্তি বন্দীত্ব নয় মুক্তি। আপনাকে ছেড়ে দিলাম - এই দিকশূন্যপুরে, অচেনা জায়গায়, যত পারেন ঘুড়ে বেড়ান, এটাই আপনার শাস্তি।

নেমো ঃ এটা কেমন শাস্তি হল স্যার?

আই.সি ঃ আপনি তো ক্যাপ্টেন নেমো। ওনার মতই ডুবোজাহাজ - নটিলাস নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন- নতুন নতুন দেশে- নতুন মানুষের সন্ধানে। নিন দেরি করবেন না- শামুকের মত ঘর বাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পরুন। অমল বেরোতে পারেনি। আপনি তো অমলের মতই। ঘুরে আসুন না - সেই ক্রৌঞ্চ দ্বীপে।

নেমো ঃ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন তো।

আই.সি ঃ আর হ্যাঁ, আমাকেও সঙ্গে নিতে পারেন আপনার জাহাজে। আমরাতো পাপী, রোজ পাপ করছি, রোজ, এই থানাতে বসেই। কিন্তু আপনার মত এরকম অকপট স্বীকারোক্তি কখনো করতে পারিনি। ভয় পেয়েছি, সম্মানের, শাস্তির আরো অনেক কিছু— নেবেন আমাকে আপনার জাহাজে?

নেমো ঃ একি বলছেন স্যার - এই পুরো জাহাজটাইতো আপনার।

হাবিলদার ঃ স্যার আমিও আপনাগো সঙ্গো যামু। খাঁড়ান লুডোখানা নিয়া নিই।

নেমো ঃ দাঁড়ান আর একটা জিনিষ আছে (বের করে) হ্যাঁ, পেয়েছি এই যে সেই একসিডেন্ট গাড়ির ভাঙা স্টিয়ারিং, এটাই হবে আমাদের জাহাজের স্টিয়ারিং— নিন উঠে পড়ুন এবার জাহাজে—

*(নেমো জাহাজে বসে হাতে স্টিয়ারিং - পেছনে আই.সি ও হাবিলদার দাঁড়িয়ে থাকে - নেমো জাহাজ চালানোর ভঙ্গী করতে থাকে - জোরে জোর কবিতা আওড়ায়)*

আবার বাতাসে উড়ে ছাই
আমি চলে যাই দূরে - আমি তো যাবই
জন্ম ছাড়া আমি কোন সীমানা মেনেছি?
এ আকাশ আমারই নিজস্ব,
আমার ইচ্ছেয় তুঁতে
নারী ও নদীরা সব আমারই নিলয়ে এসে
পা ছড়িয়ে স্মৃতি কথা বলে
চমৎকার গোপন আরামে কাটে দিন
আর সব রাত্রিগুলি নিশীথ কুসুম
হয়ে ঝরে যায়—
আমি তো যাবই জন্ম ছাড়া আমি কোনো সীমানা মেনেছি?

------- ০ -------

---

লেখক ঃ **সঞ্জয় আচার্য,** পশ্চিমবঙ্গো নব প্রজন্মের নাটককার।

# THE LAST 6 DAYS OF DASHARATH

**Shomik Ray**

1

Kaushalya Who's there? Who is it?
(Dasharath enters the room)

Kaushalya Oh! You? What are you doing here?

Dasharath What sort of a strange question is that?

Kaushalya Why do you find it strange?

Dasharath Is it not strange? The king comes to his eldest queen? Why is a reason necessary?

Kaushalya King? What king? Whose king?

Dasharath The king. The premier of the Ikshvaku vangsh…

Kaushalya Vangsh! King by kinship to your clan? That's all? Why not? You hardly have anything else to hold on to.

Dasharath No. Why would you say that? It's not only my vangsh. The throne of Aryavarta is still mine. I rule this kingdom. The huge army, all my ministers owe allegiance…. Kaushalya!

Kaushalya Why did you stop? Carry on. This kingdom, the skies, rivers, oceans, forests, animals, birds… everything owes allegiance to you. The 350 wives in your inner chambers owe allegiance to you. But whom do you owe allegiance to Raja?

Dasharath Aah! Kaushalya. Why are you so harsh to me? A moment's weakness. Why do you make it appear so big? Don't you understand that my love has been taken advantage of ? Don't you see the pain that is shredding me into million pieces? Or is it that you do not want to see?
I have made amends. I have punished that scheming woman. I have abandoned her. I have taken away all her rights as a wife. She has to spend her life as a widow. Let her live her

life with all the riches and treasures that she has bargained for herself and her son – I have abandoned her. I have also abandoned her son Kaushalya. I have disowned him as a son. He will not even perform my last rites.

Kaushalya (laughs) It is so easy Raja! Isn't it? It's only the woman who can be accepted and rejected so easily! Sometimes in the name of Rajneeti, sometimes in the name of Dharma and sometimes in the name of Satya – it's only the woman who can be accepted and rejected at will. And all of it to satisfy your own perverted lust – isn't it Raja?

Dasharath Hold your tongue Kaushalya! Are you not aware of how the vile woman has tricked us all? She has schemed with Manthara against my Ram, against Ayodhya! She didn't think twice before insulting my Dharma, my Satya and all she cares about is her son and herself. You feel I have wronged her by rejecting her ?

Kaushalya How convenient! You put all the blame on her and claim compassion as the wronged, righteous, distressed man. Why? Easy path to greatness?

Dasharath What are you saying Kaushalya?

Kaushalya I know what I am saying.

Dasharath Even after knowing everything you refuse to see her faults? How can you blame me for this disaster!

Kaushalya Yes I can Raja! I can! Who is really responsible for this disaster that you keep talking about? Who is responsible for the deeds of the woman whom you very conveniently today condemn as vile and claim greatness by enactin theatrics of rejection? Who is responsible for my son's fate as a wandering homeless man in spite of being the eldest son of the Ikshvaku vangsh? You beloved is going to strangulate and suffocate all life out of Ayodhya like a massive hungry snake – who is responsible for that? Eldest consort Kaushalya has to spend the rest of her life as slave to your vile, beloved – who is responsible for that Raja Dasharath?

Dasharath My destiny, Kaushalya!

Kaushalya No Raja. Not your destiny. You are responsible. Do not try

to hide behind the veil of destiny. Whatever has happened, it has happened at your will. Because you wanted it to happen that way.

Dasharath — You are out of your mind. Look, I can understand your trauma. But, do have some sense. I wanted things to happen this way? I wanted Ram to abdicate the throne and go off to the forest? How could you even say this? Kaushalya, nothing has happened behind closed doors. It's for all to see. There are witnesses…

Kaushalya — Witnesses to what? What have people seen? They have seen what you have chosen to show them. They have seen what you wanted them to see.

Dasharath — What do you mean?

Kaushalya — Patience Raja! You know what actually is your destiny? Your being here today and having to listen to all that I say – that is your destiny. Imagine Raja – at this happy moment, when everything has happened as per plans. You should be celebrating with your beloved, instead…

Dasharath — Wrong. Very wrong Kaushalya. You have misunderstood me, completely. You know why I came to you. For some peace. I am mentally and physically pained – just the same way as you are. I have gone through the pain of losing a child, just like you. I couldn't have gone anywhere else today

Kaushalya. — That's why I am here. My dream – my dream of handing over the reins of this kingdom to Ram has been shattered today. It's only you who can comprehend how my heart bleeds – that's why I am here.

Kaushalya — Your dream? Did you ever want Ram to sit on the throne of Ayodhya? No Raja. I want the truth.

Dasharath — I don't know what you are saying Kaushalya.

Kaushalya — What don't you understand Raja Dasharath? I think my question is pretty simple. Or is that you are having problems remembering the past? Didn't you always want Kaikeyi's son to be the king?

Dasharath — No. Never. Not even in my wildest dreams… How could I

think of depriving Ram of…?

Kaushalya Ram? Where was Ram when you took this decision?

Dasharath What rubbish…

Kaushalya (laughs) What conditions did you agree to with Kaikieyee, Raja Dasharath?

Dasharath Condition? What conditions are you talking about?

Kaushalya Kaikieyee's son will be the king of Ayodhya. Isn't this the condition under which Kekayeraj Ashwapati agreed to give her daughter's hand in marriage with you?

Dasharath How did you know this?

Kaushalya Aah. This question does not suit the intellect of the emperor of Aryavart. Raja you seem to forget that while you are the king, I am the queen. And much before that I also have royal blood. My lessons in rajneeti may not match yours, but they are not inadequate either. There are ways to know.

Dasharath I understand.

Kaushalya How I got to know is not important Raja. What I know – is important. Now tell me Raja. If Ram is so close to your heart. If I am your eldest consort, how did you commit such a thing to Kekayeraj Ashwapati? Or is it that getting your work done through commitments is an old trick of yours?

Dasharath Kaushalya you are forgetting that at that point of time we did not have any children. That commitment is inconsequential today. The eldest son of the Ikshvaku vangsh is the heir to the throne. That's the law.

Kaushalya Exactly. You are absolutely right. Your most beloved is also aware of this. And that is exactly why she did not remind you of your commitment to her father. She only reminded you of the promises that you made to her. But again, that is not important Raja. What is important is that, did you not clearly mark your favourites even before your children were born?

Dasharath No Kaushalya. There was no favouritism. Do not smell a rat where there is none. The commitment was a diplomatic necessity. There was no other way that Kekaya kingdom

could be annexed to Ayodhya. It was the call of Rajneeti.

Kaushalya Rajneeti, rajneeti, rajneeti! Why is it always the woman who is thrown as the dice? The legal tender for men's transactions! Do not try to hide behind the façade of rajneeti ! Your commitment to Kekayaraj is not an evidence of your political acumen. It is evidence of your lust for women and your tendency to use women as objects of desire. I am not surprised Raja. Such evidence is strewn all over your life. Forcing yourself on your newly-wed wife Sumitra in open day light, on a moving chariot, and then letting the society prove Sumitra as unlucky as if she is the one who erred. The 350 women that you have in your inner chambers. Do you even remember the million promises that have strengthened the foundations of Ayodhya? And how soon have you forgotten all of them? That is exactly why the women have to remind you of the promises that you made to them. Do not hold them responsible for that.

Dasharath How can you even support what Kaikeyee did?

Kaushalya And if the promises made then were only diplomatic moves, why did you not invite Kekayeraj Ashwapati to Ram's c oronation ceremony?

Dasharath There was hardly any time to invite everyone. So many were missed. I couldn't even send an invite to Mithilaraj Janak.

Kaushalya How fine is your power of deception! I am really impressed! Truly becoming of the King of Ayodhya! Yes, it's true that the event was rushed. Hundreds of rulers and headmen of small hamlets from across the kingdom could be invited within the little time that you had but you did not have time for your beloved's father? No. Not for want of time Raja. For want of true courage. The person whose daughter you obtained in marriage and thereby marked on his empire, the stamp of authority of the Ikshvaku vangsh in exchange of a promise of his grandson as king. How could you stand in front of him and look him in the eye when you break the promise and declare Ram as the crown prince? It is better that he was not invited. To hide this deception you hid behind the veil of time. To make this deception look like an unintended omission you even chose to forget Mithila Raj

| | |
|---|---|
| | Janak. "Don't you see, I didn't even have the time to invite the father in law of the crown prince?" Or is it that you always knew that this event will never happen? That's why you left both of them out. I do not believe you anymore. |
| Dasharath | Why do you make everything so difficult Kaushalya? I know you are disturbed with Ram having to leave. And you hold me responsible for it. That is why today you find fault with whatever I do, whatever I say. |
| Kaushalya | No Raja. Not today. This is not a sudden emotional outburst in response to what has happened today. This is what I always felt. You didn't get to hear it before because I did not feel the need for it. But today you are destined to listen. |
| Dasharath | Destiny! Destiny! What is my destiny? I had to let go of the son who I love more than my own self – for whom? For a woman whom I unconditionally loved and was prepared to die for. Now that I have lost everything, the woman that I come to for solace, rejects me too alleging me as a conniving deceptor. That too on mere suspicion? |
| Kaushalya | Mere suspicion? You surely have an insatiable appetite for evidence. Don't worry! I have more. At the age of 15 years when Rishi Vishwamitra came to take Ram and Lakshmana away to kill the demons, you tried to replace them with Bharat and Shatrughna. If you really wanted to see Ram as the emperor of Aryavarta, then why did you do this? Tell me. |
| Dasharath | Don't you know why? I love Ram more than anything else in this world. I can't bear even the thought of harm to Ram. Both Ram and Lakshmana were just kids at that time. |
| Kaushalya | What about Bharat and Shatrughna? Weren't they kids also? They were even younger to Ram and Lakshman! Aren't they your children? No no – your reasoning does not hold Raja. Or is it that you were ready to sacrifice one of your children in order to prevent harm to your favourite one? So ruthless, are you? Did you do the same today? |
| Dasharath | Kaushalya. I warn you. You are insulting my love for my children. |
| Kaushalya | What about your Satyadharma, Raja! The trumpet of |

Satyadharma that you have been beating throughout your life, even today- what would have happened to it? Replacing Ram and Lakshman with Bharat – Shatrughna without the knowledge of rishi Vishwamitra – was that not Asatya?

Dasharath — But that did not happen! Did it? It was Ram and Lakhshman who went with Viswamitra.

Kaushalya — That is because your deception was exposed to Mahamuni. Your plans were thwarted. You are the king and that is why your failed attempt to falsify were locked in within the four walls of this palace. There were no tales created out of your misdemeanour. God knows what price had to be paid by whom to ensure that.

Dasharath — I am ready to pay any price to ensure the safety of Ram and Lakshman – then and even now.

Kaushalya — I would have believed you had it been a few days earlier. But not now. I know you too well Raja.

Dasharath — Aah! I can't believe this! What else do you think was the reason for wanting to send Bharat – Shatrughna in place of Ram and Lakshman? Tell me. Why?

Kaushalya — Raja that trip of the Kumars with Rishi Vishwamitra was no ordinary trip. That trip marked their transition from childhood to adolescence. Right on the threshold of adulthood. That trip was an important message to the entire Aryavarta. A trip that would establish the future crown prince of Ayodhya on very strong grounds. You knew very well that Rishi Viswamitra will not jeopardise the safety of the Kumars even in the most perilous of situations. There was no risk Raja. Exterminating Rakshasas or ensuring the security of Ashramas is child's play for Rishi Vishwamitra. He could have very well done it himself. Brahmatej and Kshatratej. He possesses ample amount of both. But accomplishing this along with the two kumars was a well calculated political decision.

Dasharath — No! That's not true. Don't you know Rishi Viswamitra? If he got even an inkling that I have tried to trick him, he would have cursed us, we would have been ruined by now. But he didn't do that. Because he understood that what I had done

was out of pure parental love, not to deceive.

Kaushalya At last you speak some truth! Yes- it is true that Viswamitra did not curse you. Had you tried to deceive, he definitely would have. You did not deceive,you tried a deal.

Dasharath Deal? What deal are you talking about?

Kaushalya You took Bharat and Shatrughna along with you and proposed that Rishi Viswamitra take them along with him instead of Ram and Lakshman. Actually you never had Ram in your mind for the seat of crown prince – you had Bharat there. That is why you wanted Bharat and Shatrughna for the trip. You knew that the stories of valour from the trip will help Bharat rise in the pedestal of the country men and pave his way as the future raja. Maybe, that was when your beloved one had reminded you of your promise to her father? Isn't it? Das This is nonsense. If that was the case why did Viswamitra not take Bharat and Shatrughna with him? His aim was to fight the Rakshashas and secure the ashramas. If choosing his company was part of my politics why would he get himself involved in it?

Kaushalya That is because his understanding of Satya Dharma is much more profound than yours. The Satya Dharma that you boast of is just a show of vanity for you, but Vishwamitra has embodied Satya in himself. That is why he is a Maharshi, you are not. He did not agree to your crooked means. The eldest of the Ikshavaku dynasty is the legal heir to the throne. He is well aware of that. That is why he did not agree to your deal. You were forced to send Ram and Lakshman with him. That is why Viswamitra did not curse you. That is the first time you feigned grief. Everybody thought that was for Ram. But that actually was for the lost opportunity for Bharat.

Dasharath How much you abhor me! This hatred, mistrust in your eyes! This blue venom all over your face – for me! Why did I never see this before? Kaushalya, did I never love you? Did I ever demean you? How did this happen Kaushalya?

Kaushalya Why bother Raja? Do you have time for all these frivolities? Do you remember when you last stepped out of your beloved's chambers? The entire country knows of your

weaknesses. You do not have time for the Royal court. Your ministers and officers have to go to kaikeyee's chambers to consult you on urgent matters. Do you even know enough about the kingdom you rule, let alone people's minds?

Dasharath — Do not drag me down to such demeaning levels Kaushalya!

Kaushalya — I do not need to Raja. You have done enough for yourself. Your lust for women is like folklore in the country. Your ministers and officers do all that is possible to keep the women of their houses away from your sight. You don't even spare women who are your daughter's age!

Dasharath — Stop! Do you even know what you are saying?

Kaushalya — Yes I do. You have probably forgotten Janaki's words while commenting on her husband's devotion to his wife! She said, her husband treats all women on whom his father has ever laid his eyes on as his mother. Do you think this was an attempt to praise Ram or describe her father-in-law's impeccable haracter? You have not even spared women who are fit to be your son's partners.

Dasharath — I don't believe this! You consider me to be such a despicable character. Why did I never realise before. Am I really so vile? You have nurtured such hatred against me! Is that why you conspired to kill me? I did not believe my informers. I always considered you as the Varanasi of my last years. Having lost everything, I could only think of you to come to. I was wrong. My informers were right.

Kaushalya — Your informers are wrong again Raja. I did not conspire to kill you. I did not even wish your death. No wife ever does that. Lakshman wanted to protest against your wrongful actions. He wanted to dethrone you and provide justice to Ram. And for that he was prepared to take your life. I merely consented.

Dasharath — Good Lord! Why did he not do it! My own son conspiring to kill me! Why didn't I die before knowing this!

Kaushalya — Because Ram did not allow him to do so. Do not forget that Lakshman also obeyed his elder brother without a second question.

Dasharath — Aaah! Deception! Treachery! Aaah!

Kaushalya — You are tired Raja. You need to sleep

(Kaushalya blows out the lamps, the audio gets stronger.)

**Scene 2**

(As lights come back, it is day break. Dasharath is sleeping and is uneasy in sleep as well.)

Kaushalya — Who's there?

Sumantra — Me Sumantra, Maharani.

Kaushalya — Sumantra! You are back. You have news from Ram Sumantra? Where did you leave them? Raja, look, Sumantra is back.

Dasharath — No! Ask him to leave. I don't want to meet him. I do not want to meet anyone. Leave me alone. Go away, leave.

Kaushalya — Wah! Raja Dasharath! Having conspired the entire deceit you now feign repentance! Or is it that you do not have the courage to face Sumantra?

Sumantra is witness to the suffering that you have pushed Ram, Lakshman and Janaki to – how can you look into his eyes and yet not be caught. Or is it that you are afraid. You are afraid that your talking to us about Ram will enrage your beloved! Do not worry. She is not here. Sumantra is our friend. I believe him.

Come in Sumantra.

( Sumantra comes in and bows to both ).

Kaushalya — Tell me about Ram. When did you come back?

Sumantra — Quite some time back Maharani. Early morning. But it took me time to get through the crowded streets of the town till the palace.

Dasharath — Why were you delayed?

Sum — The entire city is in mourning Maharaj. They are waiting on the streets for the last 4 days to get news of their favourite Ram. On seeing me, they couldn't hold themselves back. I had to answer all their questions before I could make my way to you.

| | |
|---|---|
| Kaushalya | Tell me about Ram Sumantra |
| Dasharath | No Sumantra, No. Answer me first. You are a friend of our family. There's nothing to hide from you. Do you also, like Kaushalya, feel that I have been wrong, unfair and unjust to Ram? Do you believe that I have taken away what was rightfully Ram's by deceit? Am I a vile conniver? Do you also feel the same Sumantra? |
| Sumantra | Maharaj. Who am I to judge between right and wrong? Who am I to judge the sinner? There's Vidatha for that. I am your chariot driver, your salaried employee. |
| Dasharath | No Sumantra, you are not just a salaried employee. You know that very well. You are our friend. The Kumars are like your own sons. You have nurtured and nourished them into able adults from childhood. Tell me the truth Sumantra. I need to know. I want to hear. Do the countrymen really feel that I am lustful, deceitful, useless…? |
| Sum | Maharaj. I shall tell you if you really want to hear. People of this country respect you, they love you. But they dislike the Raja Dasharath who moves at the finger tricks of Rani Kaikeyi. |
| Dasharath | I move at the finger tricks of Kaikeyi! |
| Sum | Yes you do. Everybody knows that. Her interference in every matter of state is disliked by all. Your ministers have tried to tell you that a number of times, in a number of ways. But you refuse to listen. You completely gave in to that treacherous woman. Rani Kaikeyi never loved you Maharaj. She simply used you. And you ignored your real friends and family and completely immersed yourself in the infatuative web that she spun around you. Of course, what more could one expect of her. Like mother like daughter. Didn't her mother force her husband to give out a secret knowing fully well that this will cause his death? Kekayeraj was intelligent. He disowned her, but you… |
| Kaushalya | Sumantra. Please do not talk ill of Rani Kaikeyi. Whatever she has done is for the wellbeing of her son. Am I also not worried for my son's well-being? It is very easy to malign a woman Sumantra. |

| | |
|---|---|
| Sumantra | But Maharani… |
| Kaushalya | Tell me about Ram, Sumantra. |
| Dasharath | Yes yes. Ram. Let us talk about Ram. Sumantra, do you feel that I never wanted Ram as the crown prince. All this arrangement for his coronation was just an eye wash. Do you have suspicions on my intent? |
| Sumantra | To some extent, yes. |
| Dasharath | Yes! You do have suspicions? Is that true? But why? Why do you suspect my intentions Sumantra? It has always been my earnest desire to see Ram on the throne of Ayodhya. Believe me. Why do you not believe me Sumantra? |
| Sumantra | Maharaj, if that is true, on the day you announced your decision to formally announce Ram as the crown prince and your ministers supported whole heartedly, why were you perturbed? You were not happy that your ministers supported your decision. |
| Dasharath | I was perturbed? Who said so? I was happy, very happy. |
| Sumantra | No you were not. You were not happy that your ministers supported your decision. You took that as a personal failure. You expected that your ministers will sing songs in your praise and say that Ram's coronation at this point is not necessary. You took that as an indication of the end of your useful life as a monarch. You even questioned them on their support to the decision. |
| Dasharath | Yes I did. But that was not in opposition of Ram. That was from my royal pride. I am still an able king Sumantra. I am still capable of upholding the rule of law, dharma and Satya in this country and shall do that for quite some time to come. I expected my ministers to at least make a mention of that once. What it wrong to expect that Sumantra? |
| Sumantra | I am no one to decide what is right or wrong. But Maharaj, it is not very usual to have a sense of Royal Pride interrupting the joy of your son's coronation. |
| Dasharath | No Sumantra. All of you are somehow misunderstanding me. Ram. I need him. Does he also have similar thoughts about me? I need to hear from Ram. |

Where is Ram?

Kaushalya Tell me about Ram Sumantra. Why are you wasting time in frivolous conversation? You are one who has last seen my Ram. Can you take me to him Sumantra?

Sumantra Maharani. Let me assure you, Ram is fine.

Kaushalya How can he be fine Sumantra? How can he be fine leaving his home, his family and friends? How can he be fine leaving his mother Sumantra? He is not one who can be fine staying alone.

Sumantra Maharani, Ram's exemplary sense of duty and Satyadharma allows him to find Ananda is all difficult situations.

Dasharath Where is he Sumantra?

Sumantra I went with him till the banks of Ganga. I returned once they crossed the river.

Kaushalya They crossed the Ganga. Do you know where they went from there?

Sumantra They first went to Muni Bharadwaj's Ashram at the confluence of Ganga and Yamuna. After resting they took directions and started for Chitrakoot Parvat.

Dasharath Chitrakoot? Why there? Why did they not stay with Muni Bharadwaj?

Sumantra Muni Bharadwaj did urge them to stay on at his Ashram. But that would not meet their commitment of 14 years exile in the forest. Ram's Pitrisatya Maharaj.

Kaushalya Pitrisatya! Whose satya! What is satya! History will be witness Raja. A son's penance to atone the sins of the father. Pitrisataya!

Sumantra, have they reached Chitrakoot? I am told that's one of the most treacherous routes.

Sumantra Don't worry Maharani. They took very clear directions and have safely reached Chitrakoot. I haven't seen them, but I have my informers trailing them. I am told they are resting at Maharshi Valmiki's Ashram.

Dasharath Maharshi Valmiki! Yes, need him. Need him now – badly.

Sumantra — Under Mahrshi Valmiki's instructions they have built a hutment on the top of Chitrakoot parvat. That's where they are staying after having done a ritualistic Grihapravesh. Lakshman is busy in ensuring the safety and comfort of Ram and Janaki. Janaki is busy setting up her new home and Ram is helping her. They are doing well Maharani. Just that…

Kaushalya — Just what? What Sumantra, tell me.

Sumantra — He is concerned about you and Maharaj. He suspects that Maharani Kaikeyi may harm the two of you. I have assured him that as long as I am alive nothing can harm the two of you.

Kaushalya — None can even attempt to gauge the harm that has already befallen me. It's only for Sumitra and me to live with. You are our friend. You are with us, which assures us. Living with a constant fear of evil for your children.

And Raja! Who can harm him? He has performed Satya Dharma. He has earned virtue for himself. Yes, in the process has insulted a few women.

When has that bothered men?

( Kaushalya gets up and prepares to leave.)

Dasharath — Why is it so dark? Get the lights. Why haven't the lamps been lit?

Sumantra — Maharaj. The lights have been lit. There is light.

Dasharath — Where are they? Why can't I see them? It is dark all around. Why can't I see anything? Get the lights. Sumantra get the lights.

Sumantra — Maharaj, you are tired. You need rest.

Kaushalya — Sumantra, he is not tired, he is delirious. Let him be.

Dasharath — Am I getting blind. I cannot see anything. Sumantra get more lights. Get the lights, go and get more lights.

Sumantra — I shall go right away, Maharaj. You have to calm down. Give me a few minutes, I shall be back.

( Sumantra Leaves )

Dasharath — No wait. Don’t leave me alone. I can’t see anything. Sumitra, Kaushalya – where are you? Hold me. No, no. Not Kaikeyee. I will not be able to stand her touch. Aah. This pain. Unbearable. Ram. Where are you? Comeback Ram. I know, you are my panacea. I know all my sufferings, all my pain will disappear as soon as you come and stand in front of me. Come back Ram. I do not believe anything that they said. Grief has driven them out of their minds. I know, they do not mean what they say. I do not believe what Kaushalya said. I have never wilfully wronged anyone in my life. I have followed the path of Satyadharma, have always upheld the rule of law. I am not unjust, I am not lustful, I know, I believe… Lights. Get the lights, more lights. It’s too dark here. I have always followed the path of truth – of Satya dharma. Then why am I alone today. The premier of the Ikshavaku Vangsh lies blind, helpless, alone … why?

( A voice is heard. This is Maharshi Valmiki )

Valmiki — don’t you know why?

Dasharath — who speaks? Who is there? How could you come in without my permission? How dare you? Answer me. I can’t see anything. You want to take advantage of my blindness and… you want to kill me. Who sends you here? Kaikeyi? No, why would she want to kill me? Lakshman. He wanted to kill me. Lakshman sends you here? You…

Valmiki — Shanti Raja. Shanti. I am not here to kill you. I am not here without your permission. In fact, it is me who is any way supposed to be here.

Dasharath — You are supposed to be here? What do you mean? Who are you? I know. I must be dying. You are the Yamdutas. You have come to take me.

Valmiki — Why are you so worried about death Raja. It will come when it has to. Stopping it or hastening it is not within anyone’s power. I am Valmiki.

Dasharath — Valmiki! Maharshi Valmik! Yes. You are supposed to be here. All this is your doing. Why did you do this? Was it necessary? The end of life in such disgrace, such shame. Was it necessary? Having let me live my entire life with the head

| | |
|---|---|
| | held high, why did you throw me into the abyss of darkness at the end of it? |
| Valmiki | I have not done anything Raja. You are blaming me for nothing. |
| Dasharath | No, you are to blame. You have done everything. If you wanted, you could have changed everything with a scratch of your pen. You could have. But you did not. Why? |
| Valmiki | How could I change? |
| Dasharath | Why not? It's your story. You can write the way you want, you can change the way you want. Change it Maharshi, I beg of you. Change it before it's too late. |
| Valmiki | No Raja. I cannot change it. I did not create this story Raja. I have just narrated it. I have simply followed you as you went along your life. I am also part of this commentary. If I change this narration, I too have to change, which is not possible. |
| Dasharath | Change it Maharshi. I beg of you. Don't paint such a horrific picture of Raja Dasharath. How will the coming generations know Dasharath? As a vile, deceitful, cruel, unjust, heartless ruler? No. That's not me. Believe me. I have tried to practice Satya Dharma in my own way. That Satya may not have matched with Kaushalya's Satya, may be different from Sumantra's Satya, but to me that is Satya. |
| Valmiki | Raja. Truth, Satya is not relative. Satya is absolute. It does not change with people and time. What are you really worried about – Defamation? Reputation? Don't worry. Aryavarta is not in the habit of listening to women's voices. Apart from that no one cares for some frailties in kings and emperors. You never know, your stories of Satyapalan may become folklore someday and you may be turned into a demi-god in the future. Who cares if your definition of Satya itself is skewed and a means for self-gratification. |
| Dasharath | Who is responsible for that Maharshi Valmiki? You are. You have created me this way. |
| Valmiki | You are wrong again Raja. I have not created you this way. It is you who have chosen to be this way. Yes, I created |

| | |
|---|---|
| | Dasharath. But it is you who lived your life the way you did. I had no role in that. Yes I have placed multiple paths in front of you at different points in your life to choose from. The choice of path has been entirely yours. |
| Dasharath | You have placed multiple paths in front of me at every crossroad. You knew what lay at the end of it. I did not. How am I responsible for the choices made in ignorance? |
| Valmiki | Choices made in ignorance? Are you serious Raja Dasharath? What about your education? What about the treasures of knowledge, learning, wisdom that you have acquired by the arduous training and reading that you have gone through. What about the association of the wisest men of Aryavarta that you had to take help from? Did you not have these with you? No Raja. Your decisions were not made in ignorance. Your decisions were made with full awareness of consequences. The emperor of Aryavarta does not take decisions in ignorance. That's a lie. |
| Dasharath | The emperor of Aryavarta. Yes. The emperor. The Maharaj. You have made me a king Valmiki. Can you deny that? |
| Valmik | Of course I did. I don't deny that. I did make you a Raja. But what you did as a Raja has been your choice. |
| Dasharath | A Raja, a king. Valmiki, I am a Maharaja. Do you know what it is to live the life of a Maharaja? You don't. A Raja has to make choices, take decisions that no other human being has to make. A Raja has to live a life that is very different from that of a common man and more different from wandering minstrels, mendicants and sages like you Valmiki. It is so easy for you to say, "I have made you a Raja. What you did as a Raja is your choice". Do you know what it takes a Raja to remain a Raja? You don't, Valmiki. You don't.<br>A Raja lives and feeds on power. It is power that sustains a king, maintains his kingdom and ensures prosperity of his subjects. It is power that a Raja has to constantly build upon. Itihas does not remember the Raja Valmiki, Itihas remembers the power of the Raja. It is the Parakram that makes stories. That is what I have strived to build throughout my life Valmiki. That is what has driven my choices Valmiki. |

Kaushalya blamed me to be lustful. I have 350 wives. Yes, I do. I could have lived with her for a lifetime. But I am Raja. Do not forget that each of them come with additions and annexations to Aryavarta. Thai is how a kingdom grows. Yes, many of them have been won in war, but also remember that many have come voluntarily or given as gifts as tokens of submission to the Maharaja. In reverence and recognition of my Parakram.

Valmiki So your wives have come to you as gifts Raja? Gifts?

Dasharath Valmiki a Raja has to demonstrate Parakram. Parakram in the battle field, parakram in the huge army that is maintained, parakram in the reverence that he commands, parakram in the riches in the palace and that includes women. Parakram in the seeds that I plant, the sons that they yield to me. That is my Dharma Valmiki, Rajdharma. It is not possible for you to understand a Raja, Valmiki. Because you have never lived as a Raja and never will. Rather you have hated Rajas. You have purposefully belittled me to out of personal revengefulness.

Valmiki Revenge? Against whom?

Dasharath Revenge against upper castes. You, the Valmikis are born to a low caste. You despise the upper castes. You always have. It gives you a vicarious pleasure in seeing me hurt, helpless, hated. It's nothing but your revenge.

Valmiki How thankless you are Raja! The Valmikis have from ages been the bearers of your legacy. They are the ones who have made you known to people as the emperor of Aryavarta, as Maharaj Dasharath. You should be grateful to me. But no. Your pride is too great to acknowledge others. You have blown yourself to such mammoth proportions that you hardly see anyone else. You are casteist. You have proven this earlier also. It is this casteist nature of yours that is the reason of your downfall Raja. You probably have forgotten your past.

Dasharath I am casteist! How could you say this Maharshi! Ayodhya is a haven of people from all castes, religion and trades. No one has pointed fingers at me for being casteist, and you…

Valmiki Have you forgotten the incident of Andhamuni and his son?

| | |
|---|---|
| Dasharath | Aah! How can I forget? The incident has haunted me every day in my life. A moment's misjudgement caused the death of Sravankumar. His blind father cursed me that I shall also die morning for my son. I remember every word of his. I am dying Valmiki. I can see it. But wat sort of a death is this. Alone in closed chamber. Do I deserve this death?<br>But Valmiki, why do you remind me of this incident today? That incident was an accident. I was not responsible for it. I did not intentionally kill the rishi kumar. Why did you say I am casteist? |
| Valmiki | Raja, you mistook Sravankumar to be an animal and shot at him. That was an accident. True. But did you try to save his life? |
| Dasharath | Try to save him? How was that possible? It was the densest part of the forest. He would have not survived the journey to the nearest hamlet. He was suffering Maharshi. He requested me to relieve him from his pain. |
| Valmiki | So many lies in one breath Raja! You have been repeating these since years.so long, that they are almost turning into truths. Then these truths turn into royal stories, folklores, and ballads – your version of Satya. |
| Dasharath | No, that is the truth. Yes it is. |
| Valmiki | What is the truth Raja. The emperor of Aryavarta Maharaj Dasharath goes for game hunting alone, without attendants, royal guards, without even a fast moving horse. The king had no way to return to the capital in case of an emergency – this is the truth?<br><br>Or is it that Maharaj Dasharath goes for game hunting in dense forests infested with wild animals and the Royal physician did not accompany – this is the truth? Raja, yes it is true that the munikumar could not be taken for treatment to the nearest hamlet. But could he not be treated there itself on the banks of the Sarayu? Yes, it was possible. But you did not consider it necessary. The moment you got to know that Sravanakumar is not of an upper caste parentage, but of a Shudra origin, his life was of no value to you. He was not worthy of being treated by the royal physician. You |

mercilessly pull the arrow out of his chest , knowing well he will soon bleed to death. You are casteist. You are a misogynist. You have repeatedly manipulated the falsehood to look like truth to further your narrow personal interests. Whatever you are going through now, is your Karma. Do not blame anyone else for it. You have never loved anyone. You have never befriended anyone. You have simply used people who love you and taken advantage of friends who trust you. That is why you lie here today - alone. You have always been blind Raja. You just lost your eyes today. I do not need to be here anymore. There will be more coming after me. They will also write your story. You can only hope that they are as blind to your failings as you yourself are.

( Valmiki leaves. Dasharath is alone) .

Dasharath Leave. Leave now. Go away. Everybody leave. I do not need anyone. No one. Maharaj Dasharath is dying. Alone. There is no one around. Not one of my 350 wives, not one of my 4 sons. A lonely death in the darkness behind closed doors. No one to perform my last rites also. I have taken away the rights from Bharat. What are they going to do with my dead body? Itihas – are you happy? The righteous benevolent Raja Dasharath is proven to be a demon. There is venom in every breath of mine, there is treachery in every step of mine. Remember to wipe clean every corner of this room after my death. Make sure there are no foot-steps seen. Foot-steps of deceit, footsteps of falsehood. I have never loved Ram. I have only conspired against him. Lustful, vile Raja Dasharath has connived with women to bring about the downfall of his children. I have no other children. Bharat is not my son, Shatrughna is not my son. Only Ram and Lakshman. I love them – no – I don't have the right to say so. Kaushalya – forgive me. Forgive me Sumitra.
Kaikeyi…

Dasharath dies. His friends and family come around him as shadows. Music gets louder.

---

Author : **Shomik Ray,** Theatre Scholar, Delhi.

# English Articles

## Reinscribing culture in performance

# Refugee sensibility and the rise of experimental Tripura Bangla Theatre of the 60s and 70s.

**Ashes Gupta**

Dark shadows of tall mango trees crisscrossed the moon-blanched courtyard in the minimalism of a Zen[1] painting. Somewhere from the neighboring houses the aroma of babbling rice cooking on slow firewood brought in hunger. A distant radio was tuned to the on-request Bangla songs[2] as nostalgic as diminishing mothballs stuffed into woolens from a long-forgotten winter. There was not even a whiff of air and the absence of electricity that deprived gloomy yellow prehistoric bulbs of the 60s of their life and glow was welcome, albeit for a change. As an owl twit-to-hood, my grandma cursed the poor bird for foretelling a supposed misfortune. A lone coconut dropped in the pond sinking with a lub-dub sound. In the background the distant radio, now stabilized on Radio Ceylone[3], emanated the ethereal voice of Sandhya Mukherjee crooning:

ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকি মিকি তারা, এই মাধবি রাত ..?[4]

(The sleepy moon, the twinkling stars and this night of fragrant madhabi flowers… Trans.mine)

A sluggish twinkling of richshaw light faded in and brought with it the smell of pomade[5] and astringent. Baba was back from a show and the sleepy household got back to business. I wondered with drowsy eyes at this theatrical transformation in the theatre of life. The clock ticked half passed eleven.

Theatricality is intertwined with the refugee destiny by a strange coincidence, largely political and cultural. That which results in displacement and dislocation, also causes a strong sense of cultural engagement, almost with a vengeance. This desperation for reviving and clinging to what seems to be gradually fading out of sight and or seems to have been left behind in the homeland lost forever, drives the refugee to transplant and reorganize the spatiality of the land of refuge in terms of the lost land, often metaphorically through performances and rituals. The refugee psyche is

tuned to this sense of endemic loss, a point of no return and a die-hard resolve of not getting assimilated, atleast in the initial years of dislocation and relocation, to the land of refuge and its culture. Theatre as an artform has always relied on simulating a simulacrum[6], a duplication of reality, either realistic or non-realistic, to generate the desired effect. And often in this strange play of reality that is ironically more theatrical than theatre, the refugee psyche seeks stability in locating in the land of refuge a cultural stasis, by re-enacting, performing and thus reasserting cultural forms from the lost homeland and its culture, either by adopting them totally or experimenting with them for effective communication of distinct cultural nuances, theatre being no exception. Otherwise, how could you possibly even attempt to explain the rising popularity of experimental Bangla theatre in the state of Tripura in the 50s, 60s& 70s?

My objective in this loose sally of thoughts is not to sum up a glossary of theatre performances in the state of Tripura from royal antiquity to the present, or to provide a descriptive history of such performances. On the contrary, I would attempt at critiquing the very reason for the rise of experimental Bangla theatre and the motives that led to its popularity in this state, that too from the refugee psyche's perspective. And my timeframe would be 1950's to the 70's, since it largely corresponds to the contextual variable of refugee influx that I am looking at. For instance, I would not indulge in detailing which Tagorean[7] play was first staged in Agartala, rather I would attempt at probing the link between staging a Tagorean play in Agartala in the 60s and the refugee Bengali psyche that located in such a performance a vantage point of cultural stability against alienation from the land of refuge and hence, a reassertion of its own cultural identity that was perceived to be threatened in the new land. At the same time, it has to be kept in mind that these were not the only conditions that resulted in the proliferation of Bangla theatre in Tripura in those days. Bangla as a language and its corresponding culture traditionally has two diasporic centers to draw from, one being Bangladesh (erstwhile East Pakistan) and the other Kolkata. With the post-partition (1947) refugee exodus across the border to India and the communal tension wrought with violence, trauma and terror, prioritising religion at that point of rupture (East Pakistan continued to be so till the Muktijuddha[8] of 1971, with the rise of Bengali racial and cultural consciousness vis-à-vis the state sponsored Urdu in the interim period) and with race taking a backseat, it was practically impossible for a Bengali refugee to Tripura to intellectually align with Bengali diasporic center of East Pakistan. I really doubt whether at that point of time for a Bengali

Hindu refugee fleeing home, it was the racial identity of being victimized by 'Bengali' Muslims that mattered or rather by 'Muslims' irrespective of race. My understanding of the historical and cultural context of partition and the resultant loss, trauma and terror as I could gather from first generation refugees like my grandmother, is that it was definitely a religious and communal rather than racial determiner that was used as identifier to locate the victim vis-à-vis the victimized. Curiously, I was made to understand in the numerous conversations that I had with my Mamma (my grandmother) that for them 'Bangali' (Bengali) automatically connoted a Hindu and a Muslim was invariably never a Bengali.

বাঙালি হিন্দু আবার কি? বাঙালি মানেই তো হিন্দু। (personal interview 1)

Such being the mindset of a Bengali Hindu refugee, it was obvious that the intellectual strata of this displaced populace would look for a cultural model away from East Pakistan, which had been blasphemed in all respects. And the obvious choice was Kolkata. Moreover, there is no denying the fact that my argument revolves around experimental Tripura Bangla theatre which was acultivated and urban phenomenon centered around the state capital of Agartala and some mufassil towns such as Belonia, Sonamura, Udaypur, Khowai and Dharmanagar[9] at the best. I am not indulging in folk forms such as Jatra, Krishnaleela, Palakirtan[10] etal. as they do not come within the purview of my research. My hypothesis is that the urbanity and cultivated nature of such theatrical performances relate to the rise of the middleclass and the lower middleclass among the displaced Bengali Hindu refugees, whose constant struggle to put down their roots in the new soil in terms of employment, education, cultivation and business had by then started showing signs of fruition. And hence, as I could see in the case of my father Late Bimal Bhusan Gupta and his contemporaries in the theatre scene of Tripura, it was an intellectual pursuit that defined the refugee intellect and intelligence as well as the refugee's urge to align with the cultural mainstream of Bangla theatrical performances in Kolkata. And this involved serious reading, imbibing, adapting and experimenting with the genre of theatre often following the models of Shambhu Mitra[11], Badal Sircar[12] and Ajitesh Bandopadhyay[13] of Nandikar. I still remember watching *Sher Afghan*[14] with my father and Badal Sircar's Third Theatre in Agartala's old Childrens' Park, of being awestruck with Tapas Sen's[15] lighting in *Angar*[16], when, onstage he simulated the illusion of water gradually flooding a coalmine and the character of Rabi Ghosh[17] drowning with his hand slowly getting submerged.

Moreover, any discussion of exodus, refugee perception and

performance have to take into account the fact that till recently, Tripura shared a very porous border with Bangladesh, facilitating to and fro movement. International border fencing has minimized this no doubt, but for the dexterous, where there is a will, there has always been a way. Hence my understanding of cross border migration is an ongoing process which has its own role to play in the shaping of the refugee's cultural identity in terms of performance, for I have seen a Dhuli[18] from Bangladesh taking part in my father's production of *Chak Bhanga Madhu*[19] in the 70's and negotiating the border within a matter of few hours pre- and post-performance. Such being the state of affairs in this tiny border state, to zero down on any specific historical time frame inorder to comprehend the nature and magnitude of such influences is next to impossible and I do not claim to do so either. My engagement with the area under scrutiny would definitely entail a negation of any such essentialist tendency. Rather I would like to keep my argument open for revaluation at any point of time being aware of my limitations as a researcher. Its also pertinent to point out here that my sensibility as a researcher has been fashioned by my refugee roots and hence my observations are also primarily subjective. Much of my hypothesis is also based on my own life, thus making this piece a life writing of sorts for me.

Its high time to wind up the narrative and tie back the loose ends together. But before signing off let me provide a praxis in substantiation of my hypothesis. My obvious choice would be the production of *Chak Bhanga Madhu (Honey from the Hive*, trans.mine) written by Manoj Mitra and staged by my father's troop 'Mukhosh' in the 1970s. My father had travelled all the way to Kolkata to see this production by Manoj Mitra himself and was highly influenced by the plot and the performance. The plot revolved around a community of 'Ojha', believed to be able to cure snake bite, from the Sunderban area of West Bengal who lived a hand to mouth existence by staking their lives in a jungle famed to be the home of the Royal Bengal tiger and poisonous snakes. The triad of Bonbibi[20], Dakhin Ray[21] and Ma Manasha[22] inscribed their lives with divine injustice while the village Jotdar Aghor Ghosh with his lecherous disposition and exploitative manoeuvers executed their decree of destruction on earth.When he is bitten by a snake and his body is brought to Matla's courtyard, Jatayu conspires not to cure him, though Matla and his wife Badami are in two minds in violating the ethics of their vocation. The result is almost a ritualistic playacting of apparently curing without actually doing so. My father experimented with the form and brought in *Manasa Mangal* recital as the background score.

And while playing the role of Jatayu to perfection, he introduced the hunch on his back. In addition, he also enhanced the theatricality of the ending by bringing in a freeze frame which became the hall mark of his production. His Jatayu and Matla are seen having their meagre morsel of food and Jatayu raises his hands on being summoned to the task of healing in a high- pitched wail:

দাঁড়াওগো খেইয়ে নি।

(Please wait till we have our meal. trans. mine)

And the curtain drops.

My take on the paradigm of production of this Bangla theatre in the 1970s Agartala, by a director-cum-actor who had been a part of the migrant populace with roots in erstwhile East Bengal, but was educated in the Jadavpur University of the 60s is that, he must have been driven by a plethora of influences ranging from his roots in his lost homeland that finds realization in using *Manasa Mangal* (known as *Padma Puran* in this part of the country), a choric recital with refrains, to the improvisation on Manoj Mitra's Jatayu and the freeze frame at the end that are definitely a result of his close familiarity with experimental theater forms in Kolkata. It was his avid interest in the contemporary Bangla theatre of Kolkata that propelled him to experiment with the form in his own way in Agartala. And in the latter, he was obviously looking for a model that was both urban and cultivated in its form, instead of the more likely folk theatre choices. His was a more evolved form that exhibited attributes of modern physical theatre, but also fused in folk performance traditions, a result of his constant experimentation with form. And if I am not wrong, all through his theatrical process, he was constantly being driven by the leftist ideology of resistance of the downtrodden against exploitation and unmasking of the exploiter. The reader should remember that the period of his education at Jadavpur coincided with the spread of Leftist movement in Kolkata in the refugee colonies of Jadavpur and Bijoygarh, the issue of possession of land of the colonies and that this university itself was the hub of academicians and intellectuals from the Bengali refugee background. This was roughly the time that Bangla cinema saw the emergence of the 'Cloud Eclipsed Star' ( মেঘে ঢাকা তারা )[23], the dusky refugee girl in cotton saree, cheap chappals and sling-bag, who found her place in the jostling buses of Kolkata city circumscribing a place of her own, courtesy Ritwik Ghatak. On the whole this was a different telling, that had been initiated and its reverberations

could be felt even in Agartala. The Bangla theatre scene of this tiny state was experiencing winds of change and the psyche of the refugee director-cum-actor was being fashioned to deliver that change in performance. In his attempts to align himself to the trends of contemporary Bangla experimental theater and prove his intellectual acumen as an artist, my father plunged headlong in this evolving spectre of modern, experimental theatre in Agartala. For me this is definitely a case of transplanting his Bengali Hindu refugee identity by reinscribing culture in performance. Theater for him was not just a cultural performance, it helped him relocate himself in the refugee ethos of his origin and at the sametime negotiate the demands of an ever-changing form- that of theatre in the diasporic centre of Bengali culture-Kolkata. It was for him definitely a labour of love that provided sustenance for his intellect and demanded constant engagement.

**NOTES**

1. A school of Buddhist philosophical thought popular in South East Asia esp. Japan that is embodied in a exquisitely minimalistic style of depiction approximating meditation.
2. অনুরোধের আসর - a music programme of the Golden Era where Bengali popular songs were played by the disc jockey on request.
3. The first radio station in Asia, it was based in Sri Lanka (formerly known as Ceylon.
4. A popular Bengali song from Uttam Kumar and Suchitra Sen starrer *Sobar Oparey,* (1995) directed by Agradoot, lyrics by Gauriprasanna Mazumder and put to tune by Robin Chatterjee.
5. An aromatic petroleum jelly compound translucent green in colour, used by my father esp. during winters and after removing make-up.
6. A hyperreality, a substitute.
7. A coinage for indicating authorship of Rabindranath Tagore.
8. Bangladesh's War of Independence from the rule of Pakistan's Military Junta of 1971 in which India supported Bangladesh.
9. Sub-divisional towns of Tripura.
10. Folk performances popular in the rural areas of Bengal and Tripura generally of a musical nature.
11. Born on 22nd August, 1915, was a stalwart of Indian theatre and a stage actor, director, playwright. He is also known for his unique style of recitation of Bengali verse. He 18 is considered a pioneer of Bengali theatre who was associated with the Indian People's Theatre Association (IPTA) for a few years

before founding the Bohurupee theatre group in Kolkata in 1948. He died on 19th May, 1997.

12. A pioneer of the Third Theatre movement, he took his plays outside the proscenium and the arena to the streets and the Aanganmanch, meaning the courtyard. His most famous play is *Ebam Indrajeet.*
13. Was an actor, playwright, activist and director who was closely associated with IPTA before joining the Nandikar group.
14. Ajitesh Bandopadhyay's Bengali adaptation of the original Italian play *Enrico IV (Henry IV)* was written by Luigi Pirandello (1921) and is based on Sher Afghan, highlighting the themes of madness and control.
15. A lighting designer of the Indian stage who pioneered the craft of modern lighting in Kolkata's Bengali theatre.
16. A famous Bengali play of the 1970s based on exploitation of the workers in the coal mines.
17. Indian actor known for his comic timing and also for his lesser known serious roles in Bengali cinema and theatre.
18. A percussionist who plays the conventional Bangla dhol.
19. A famous theatre production by playwright, actor and theatre and film director Manoj Mitra.
20. A guardian deity of the forest, mainly Sunderban, who is revered by both Hindus and Muslims.
21. The revered deity of the Sunderbans who rules over beasts and demons and is often identified with the Royal Bengal tiger.
22. Ketakadas Kshemananda or Kshemananda Das was a 17th or 18th-century Bengali poet who wrote *Manasar Bhasan*, a version of *Manasa Mangal Kavya,* that is an ode to the Goddess of Serpents 'Manasa Devi' and is ritualistically recited in the Bengali households of West Bengal and Tripura.
23. A 1960 film written and directed by Ritwik Ghatak (Bengali: মেঘে ঢাকা তারা meaning *The Cloud-Eclipsed Star*) is based on a novel by Shaktipada Rajguru with the same title and is a part of the trilogy: *Meghe Dhaka Tara* (1960), *Komal Gandhar* (1961), and *Subarnarekha* (1962), all dealing with the aftermath of the Partition of Bengal during the Partition of India in 1947 and the refugees coping with it.

**WORK CITED**

Bhalla, Alok. *Partition Dialogue: Memories of a Lost Home.* Oxford University Press, 2006.

Chakraborty, Bidyut. The Partition of Bengal and Assam: Contours of Freedom. Routledge 2004..

Chatterjee, Partha. Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. Oxford University Press. 1986.

Dasgupta, Subhoranjan and Jasodhara Bagchi, eds, The Trauma and the Triumph: Gender and *Partition in Eastern India. Stree, 2007.*

Datta, Ramaprasad. 'Nabanatya andolane Tripurar Lokshipi Sansad'. Tripurara Natya Andolaner Dhara, ed. Shakti Halder, Kolkata: Debkumar Basu. p. 20-21. 2008

------------------------. Shadhinottar Juge Tripurara Natya Andolan. *Tripura Theatre.* Vol-2, Issue-1, p.33-41, 2002.

Elias, Akhtaruzzaman. Khowabnama. Naya Udyog, 1996.

Gupta, Ashes. 'Living the dream: narrating a landscape lost and a land left behind.' Sengupta, Jayita ed. *Barbed Wire: Borders and Partitions in South Asia.* Routledge, 2012

Mitra, Manoj. *Narak Guljar-Chak Bhanga Madhu* (Bengali), Kolkata: Unison Empire Publications Private Limited, ebook. 2015. Goodreads, https://www.goodreads.com/en/book/show/24527969--

Roy Choudhury. Tapan, Bangalnama. Ananda, 2007.

Sengupta, Mihir. *Bishad Briksha.* Subarnarekha. 2004.

Author : **Ashes Gupta**, Professor, Department of English, Tripura University.

# Bengali Translations and Adaptations of Girish Karnad's Plays : A Survey of Performances in Kolkata

**Jolly Das**

**Abstract :** Girish Karnad's (1938-2019) tryst with Bengali theatre has been varied. Right from Yayati, his plays have been translated in Bengali, mainly as performance-texts. Interestingly, Karnad's translation of Badal Sircar's Ebong Indrajitto English from the Hindi translation by Pratibha Agarwal, way back in 1984, had an indelible influence on the formation of his sensibility as a playwright. He has been avidly interested in theatrical trends in Bengal, which is a hub of performance activities, both urban and folk. Bengal has also accommodated and received with accolades Karnad's plays in the acting-space. The article shall take stock of the performance of Karnad's plays in Bengali, looking at adaptations as well, leading to experimental ventures, mostly successful, sometimes not, with a specific focus on the Kolkata stage.

**Keywords :** Translation, performance,theatre groups, directors, actors, technical support

**Introduction :** The accidental theatrical journey which Girish Karnad (1938-2019) began in 1961 with ManoharaGrantha Mala, Dharwad, publishing his Kannada play, Yayati, became the most important turning point in his career. Till then he had carefully nurtured the aim of becoming a poet, writing in English, following the footprints of T.S. Eliot and W.H. Auden. Recovery from the shock of the shift in form and language took very little time, and Karnad never looked back while tracing his theatrical trajectory1which includes fifteen plays in Kannada, thirteen of them being also written by him in English. Excepting MaaNishada, they have all seen success as theatrical performances in the proscenium space in India and abroad, in Kannada and English, with his own writings, and in Bengali, Hindi, Marathi, Punjabi, and other languages, with the translations made by others.Karnad was generous in encouraging the performance of his plays in other languages. He often watched them and made pertinent observations.

Although Susan Bassnett has spoken about the difficulties of

translating plays 2 which, according to her, comprise the most challenging genre for translation, the success with which Karnad's plays have been translated from his Kannada and English versions and performed with equal success in other languages points towards the necessity of the endeavour, since the lifeline of a play-text is in its performance. In translations, the attempt to retain thesynchronization between the content and form of each play demands meaningful theatrical communication with audiences whose linguistic domain remains different from Kannada or English. It must be mentioned here that just as Bassnett's theory stands ground, so too, does the fact that the catch-phrase for India's culture is 'unity in diversity'. Therefore, overlapping factors in the diverse cultural traditions facilitate translation from one language to another for the performance of plays. Mini Chandranmakes an important observation when she points out that the word 'translation' (from 'trans' > across and 'latus' > carrying) falls short of the intent and outcome of the endeavour which could be better implied by Indian words like "Anuvad (speak after), bhashantar (linguistic transference), tarzuma (reproduction), roopantar (change of form), vivartanam (change), mozhimattam (change of script)-what P.Lal, one of India's well-known translators, has described as 'transcreation'"(web.). These terms accommodate 'retelling' which allows 'adaptation' and, therefore, new ways of cultural shifting of a narrative. With this in mind, the present brief survey shall take stock of the Bengali translations and performances of some of Girish Karnad's plays according to the chronology in which they first appeared in his career as a playwright.

**Yayati** : Bohurupee produced the play in Bengali as an adaptation of Girish Karnad?s Kannada play Yayati, opening its celebration of the completion of forty years in 1988. The story foregrounded the personal crisis of Yayati.The translation and adaptation was made by Om Prakash Rana and Salil Sarkar from the Hindi version.Important participants in the production included Khaled Chowdhury (Set), Dilip Ghosh (Light), Goutam Ghosh (sound), Deepa Dasgupta (Costume), Shakti Sen (Make Up), and Gautam Ghosh (Music). Directed by Kumar Roy, the play showcased actors likeKumar Roy (Sutradhar), SubrataGuha Roy (Bokasur), Shyamsundar Paul (Daitya), SumitaBasu(Debjani), SukritiLohori (Swarnalata), Namita Majumdar (Sharmistha), DebeshRaychowdhury (Yayati), Gautam Basu (Pooru) and Deepa Dasgupta (Chitralekha). The whole platform was designed as a chessboard, with two horses lying on their faces on both sides.

Of the two flats, one was grey and the other saffron-intending to identify the two conflicting poles of the play. There were three sculptures on the flats. A lamp was there, too, although it was not put to theatrical use.

**Tughlaq :** Natmancha Pratishtha Samity, an association of different theatre groups like Nandikar, Rupakar and Anamika, was formed for the performance of Chittaranjan Ghosh and Swapan Mazumdar's Bengali translation of Tughlaq from Karnad's English version, produced by Shombhu Mitra and Shyaman and Jalanin 1972, with the sole performance in Kala Mandir.Jalan (from Anamika) directed the play with Shambhu Mitra as Tughlaq and Keya Chakraborty as the Step Mother. Kumar Roy (Imamuddin/Imam-ul-Mulk), Ajitesh Bandyopadhyay (Aziz), ArijitGuha (Nazib), Sabitabrata Dutta (Shihabuddin), Santosh Datta (Giyazuddin) and Rudraprasad Sengupta (Barani) also acted in it. Support was provided by Tapas Sen (light), Khaled Chowdhury (set design), Suresh Dutta (set) and Zareen Chowdhury (costume). However, Shombhu Mitra was very upset with the production and he decided that it should never be performed. It has found a significant place in the history of Bengali theatre for the wrong reason.

Theatre Unit produced Tughlaq in Bengali using the translation by Shekhar Chattopadhyay, who directed the play and played the eponymous role, stealing the show. Other actors in this production included Alok Roychowdhury (Azaam), Uttiya Deb (Aziz), Sadhana Roychowdhury (Step Mother), Nabendu Gupta (Nazib), Arun Ghosh (Sheikh Imamuddin), Arabinda Bhattacharyya (Shihabuddin), Samar Bandyopadhyay (Ratan Singh), Mrinal Chattopadhyay (Sayid), Utpal Roy (Kasim), Shankar Mukhopadhyay (Ghiyazuddin). The set was brilliantly executed with a minimum of items to create an illusion of a magnificent palace.Tapas Sen devised such a blending of light and shade that the impression of the exodus from Delhi to Daulatabadcould bestaged with only fifteen actors, as mentioned by the review in Desh, 24 October 1971.

Theatron staged the Bengali translation of *Tughlaq* by Ghosh and Mazumdar during 1980-81. Salil Bandyopadhyay directed the play with Santu Mukhopadhyay as Tughlaq. Other facets of the production were provided by Kumar Roy (stage design), Rathin Dey (music), Shakti Sen(make-up) and Manu(costume design).It's success depended on its "Exceptional significance in the context of the events which dominated the political scenario of the 1970s- the birth of Bangladesh, the declaration of

emergency, Indira Gandhi's electoral defeat, the subsequent denunciation of her despotic regime, and the formation of the first non-Congress government at the centre." (Theatron 3)

Sanskriti produced Tughlaq, directed by Debesh Chattopadhyay, with Rajatabha Datta (Tughlaq), Kasturi Chattopadhyay (Step Mother), Gambhira Bhattacharyya (Aziz) and Korak Samanta (Azaam). Other participants in the production included Sanchayan Ghosh (stage-sets), Dron Acharya (sound) and Sudip Sanyal (light). The play-text was the one by Ghosh and Mazumdar. The reviewer for Anandabazar Patrika (22 Oct. 2016) observed that the set and costumes were representative of shifting theatre, used for communicating the movement from Delhi to Daulatabad, from uniformity to unevenness, followed by an attempt at unification.

**Hayavadana :** This play was translated by Sankha Ghosh, From Karnad's English translation published in Enact, in 1972 as a performance-text for the theatre-group Nakshatraon being requested by Shyamal Ghosh. Ghosh found that there were three different layers in the language of the play: the verbal, the physical and a smooth middle which serves as a bridge between the two, creating a passage from the first to the second and back without any fracture. Girish Karnad had requested the actors to be conscious about this smooth passage since the effect of the performance depended heavily on it. The performance by Nakshatra turned out to be abortive, with an extra character apart from the Bhagavata, who is the Adhikari in the Bengali play. The disaster was advanced by the discarding of the Dolls in this production. The reviewer for The Telegraph, Ananda Lal, commented that "one should not tamper with a perfect structure" (n.d.).

Abaiab presented Hayavadana for the first time in Bengali as Ghoramukho Pala, using Sankha Ghosh's translation, under thedirectionof Manju Bandyopadhyay, who played the role of Padmini. Shyamalbaran Ghosh played Kapila. DipanwitaRoy, performed the role of Goddess Kali, perfectly mingling loud performance with excellent body language, to give the character a memorable stage-life.

Padatik produced the play, using Ghosh's translation, under the direction of Janardan Ghosh in 2010. It had fifty-six shows with accolades from the audience. It incorporated different performance traditions. Padmini was played by two actors-Antara and Simran. Krishnendu played Devdutta and Ayan played Kapil. Joy played Hayavadana. The puppets were operated

by Narendra and Piyali. Avijan, Sushanta, Sankha and Arindam formed the chorus. Robin as Nata and Anuradha as Goddess Chinnamasta (not Kali) made a remarkable impact. Those who participated in this performance were Suman Das (choreographer trained in Kalaripayattu), Partho Mazumdar (set design), Shuvam Maitro (music) andUttio Jana (light).Shyamanand Jalan arranged a meeting between Karnad and Janardan Ghosh before the rehearsals began.

Dinajpur Theatre Company participated in the theatre festival of Pancham Baidik and performed Ghoramukho Pala for the first time in Kolkata3 on 3 January 2013 in Rabindra Sadan, using Sankha Ghosh's translation, replacing the folk form of Yakshagana with the Khon form of folk theatre endemic to the Alipurduar region of West Bengal. The play was directed by Arpita Ghosh. Debesh Chattopadhyay was the guardian-like supervisor of this large team of about thrity-eight actors from Dinajpur, in North Bengal. Improvisations were amply used for this production. Choreographed by Kasturi Chattopadhyay, the dances were excellent. The cast comprised amateurs from Dinajpur. Robin Roy, as the Nata, left an indelible impression. The folk-culture of Dinajpur was evident in the stage-design (use of Bamboo work of Mahishbathan of Kushmandi and mokha-art), songs (khon-gaan and halua-haluani) and the use of masks. It then moved to other proscenium spaces for another twenty-three shows.

Kathakriti put up Hayavadanaas Ghoramukho Pala, using the translation by Sankha Ghosh, directed by Sanjib Roy. It had its first show, after a false start on 11 April 2014, on 16 May 2015 in Minerva Theatre. Bindiya Ghosh played Padminiwith Dipankar Halder as Devadatta and Kinjal Nanda as Kapila. Nandini Bhowmick was very impressive as Goddess Kali as well the new character of the Sutrabhasini. Hayavadana was played by the Kajal-Shombhu duo,Nata by Ashok Ganguly and Ganesha and the child by Parijat Das. Support was provided by Debasish Roy (stage design), Madan Halder (set design), Sangeeta Pal (costume), Nabanita Mukherjee Das (choreography) and Mohammad Nur (make-up). In this production, instead of switching masks, costumes were switched, since the use of masks was eliminated. Joy Sen had designed the light for the first part before he succumbed to his illness. His follower, DipankarDey completed the work. SubhodipGuha's musical ensemble resorted to a mixture of instruments including the effective use of the saxophone, something unusual in theatrical performances.BingshatiBasu had made a significant contribution to the music

of this play.(Ananda Lal. The Telegraph.n.d.)This adaptation did away with folk elements. On watching the performance, Sankha Ghose had commented that it was the best among those versions he had seen till then.

**Anjumallige :** It has been translated to Bengali by Biswa Roy as Jamini (2007) from DevendrarajAnkur's Hindi translation (for performance by the students of the national School of Drama). The title draws upon the name of the lead woman in the play.However, Roy felt dissatisfied with certain parts of the Hindi translation. So, he sought the assistance of Ananda Kolekar and Parveen Ahmed (with whom he was connected by SudipBarua) for translating these sections from the original play in Kannada.

**Naga-Mandala :** Ballygunge Swapna Suchana produced this play under the direction of Abanti Chakraborty who also translated the play to Bengali. Anirban Bhattacharyya played the role of Appanna and Turna Das played Rani. Other roles were played by Tamali Kakkad, Shantanu Chanda, PiyaliBasu Chatterjee and Bijoy Kumar Mukhopadhyay. It was premiered at Madhusudan Mancha on 8 September 2014 with eleven actors and four musicians playing live on stage.

**Talé-Danda :** Manirath theatre group first performed Talé-Dandain 1992 under the direction of Shantanu Bose, using the translation, titled Raktakalyan, by Sankha Ghosh, made from the English version. The Bengali translation was first published in the Saas journal in 1994.

Rangrup performed Raktakalyanusing Sankha Ghosh's translation with a few references (wherever necessary) to the Hindi Rakt Kalyan. The director, Sima Mukhopadhyay, made necessary alterations in the play before the rehearsals were begun since she found that the play would take about three-and-a-half hours. So, she excised it bringing the duration down to two hours and twenty-five minutes, by joining scenes, bringing some scenes forward and leaving out the very brief scenes. The costume was designed by Tulika Das. (Ananda Lal. Review.The Telegraph. 24 February 2018)

**Agni Mattu Malé**

**The Fire and the Rain**

Translated asAgnijal by Bibhas Chakraborty, with the assistance of Bacchu Dasgupta, and published in Shudrak (vol. 14 1997),it was first performed on Madhusudan Mancha on 20 July 2007. Purba Paschim produced it under the direction of Bibhas Chakraborty, bringing together theatre personalities

like Bhaskar Chandravarkar (music direction), DilipTamule (stage picturization), Kriti B. Sharma (costume design), Sudip Sanyal (lamp design), Madhumita Pal (choreography), Sridas (make-up), Soumik-Piyali (set design) and Chau artistes from Purulia.The actors included Prabir Datta (Yavakri), Babu Datta Roy (Paravasu), Devdut Ghosh (Arvasu), Runa Bandyopadhyay (Vishakha), Madhumita Pal (Nittilai), Soumitra Mitra (Raibhya) and Subhabrata Dey (Adhikari).

**Odakalu Bimba**
**A Heap of Broken Images**

The title Bhanga Bhanga Chobi (2018) was suggested by Shankha Ghosh himself when the translator of A Heap of Broken Images, Srotoswini Dey, approached him. The production by Kolkata Bohuswarwas directed by Tulika Das. SukritiLohori played Manjula, transformed to a Bengali lady with Bengaluru becoming Kolkata. Piyali Guha Roy and Tulika Das also acted in the play. Although the primary discussions about producing the play were held in Bohurupee, it was eventually brought to the stage by Kolkata Bohuswar, which was born out of the departure of seven persons from Bohurupee. The production was made stage-worthy by Kalyan Sen Barat (music direction),Gagandeep(stage-design and light), Mayukh Dutta, MonomitaChaudhury, Rashmi Natua, Sampreeti Chakraborty, and others. It was first performed on 13 May 2018 in Padatik Studio Theatre.

**Hoovu**
**Flowers**

Chetana produced KusumKusumas one of two plays performed on the occasion of its 49th anniversary on 22 November 2021. It is an adaptation of Flowers in Bengali by Ujjwal Chattopadhyay, directed by Avanti Chakraborty. The Shiva-linga in the original play has been replaced by Goddess Abhaya whose image is absent in the performance. Flower garlands hanging from the sets symbolically represent her sanctum sanctorum.The theatre is filled with the fragrance of incense throughout the performance, which relies on the collective of factory memory of the audience for correlating it with the ritual of pooja. This is associated with playing of the dhak and devotional songs. The priest, Abhay, is played by Sujan Mukhopadhyay. Here the priest's wife, Kusum, is played by Nibedita Mukhopadhyay.

**Conclusion :** The response of the Kolkata stage to Girish Karnad's plays,

by way of performances of translations/adaptations in Bengali, has been almost at par with the reception of his plays in Kannada, English, Hindi, Marathi and other languages in other parts of the country. Although some of his plays like Yayati, Tughlaq, Hayavadana, Nagamandala, The Fire and the Rain, Talé-Danda, Broken Images and Flowers have been translated and performed successfully on the Kolkata stage, others like The Dreams of Tipu Sultan, Bali: The Sacrifice, Wedding Album, Boiled Beans on Toast and Crossing to Talikota are waiting by the wings for entry to the proscenium space. Anjumallige has been translated, but not performed. Yayatihas been translated and performed long before Karnad's own translation of the play to English. We can, therefore, understand that translation from one Indian language to another may often use English versions as an easy solution to the problem of linguistic barrier, but Hindi and the assistance of intermediary translators can serve as an equally effective means. This has also been the case for Karnad's English translation of EvamIndrajit. MaaNishada is one play which the playwright and critics talk very little about, becoming a curio in the gamut of Karnad's theatrical oeuvre.

## End Notes

1 Jolly Das."Formation of the Creative Sensibility" (Tracing Karnad's Theatrical Trajectory. 1-20).

2Susan Bassnett. "Still Trapped in the Labyrinth: Further Reflections on Translation and Theatre" (Constructing Cultures 90-108).

3The first ever show was in Kushmandi, before a large gathering.

### Works Cited

Bassnett, Susan and André Lefevere.Constructing Cultures: Essays on LiteraryTranslation.Multilingual Matters, 1998.

Chandran, Mini."The Practice of Translation in India".Literature and Languages. Sahapedia.01 November 2016. The Practice of Translation in India | Sahapedia .Acessed 4.7.2022.

Chatterjee, Madhuchhanda. Girish Karnad in Quest.Prima Dona, 2017.

Chattopadhyay, Shekhar, director and translator. Tughlaq. By Girish Karnad. Anonymous review. Desh. 24 Oct. 1971.

Das, Jolly. Tracing Karnad's Theatrical Trajectory. Paragon, 2015.

Das, Prabhat kumar. Banga Rangamanche Girish Karnad. Ekush Shatak, 2022.

Ghosh, Janardan, director.Hayavadana.https://culturemonks.in/2016/05/23/the-making-of-hayavadana-by-janardan-ghosh/.Accessed 4.7.2022.

Dey, Srotoswini, translator.Bhanga BhangaChobi. Broken Images.By Girish Karnad,Papyrus, 2013.

Ghosh, Sankha, translator. Hayavadan. Hayavadana. By Girish Karnad, Papyrus,1975.

- - -. Raktakalyan. Talé-Danda. By Girish Karnad, Papyrus, 1995.

Kathakriti. Ghoramukho Pala. Ananda Lal, reviewer.The Telegraph.n.d.NSS Archives.

Nakshatra. Hayavadana. Ananda Lal, reviewer. The Telegraph, n.d. NSS Archives.

Rangrup. Raktakalyan.Ananda Lal, reviewer. The Telegraph, 24 February 2018.

Sanskriti.Tughlaq.Directed by Debesh Chattopadhyay. Anonymous review. Anandabazar Patrika, 22 Oct, 2016.

Theatre Unit. Tughlaq. Directed by Shekhar Chattopadhyay.Anonymous review. Desh, 24 Oct. 1971.

Theatron.Tughlaq.Directed by Salil Bandyopadhyay. Anonymous review. Theatron 3.

**Acknowledgement**

I am indebted to Natya Shodh Sansthan, Kolkata, for the archival material, comprising reviews of different performances, which I have accessed during June 2022 for writing this article.

Author: **Dr. Jolly Das**, Associate Professor, Dept. of English,Vidyasagar University,

# Pan - Indian Reception of Badal Sircar A Brief Study

**Tapu Biswas**

Badal Sircar (1925-2011), born in Calcutta in a middle-class Bengali family, started his career as a lecturer in Civil Engineering at the Jadavpur University Engineering College. Owing to his innate exceptional abilities, Sircar soon got himself recognized and duly acknowledged as a successful and influential town planner. In course of time, however, he was inspired by the 'Muse' to give expression to some of his latent leanings and yearnings for theatre which had remained dormant right from the early years of his life. Thus 'bitten by the bug', Sircar eventually resolved to turn himself into a playwright and theatre worker. Soon, with his indomitable spirit and untiring efforts he came to revolutionise the concept of Indian theatre as well as the content of Indian drama. He first made a name for himself with his play *Evam Indrajit* a text that began as a series of poems he wrote between 1957 and 1963. *Evam Indrajit* at once hit the headlines of the theatre circles in the 1960s, marking its author as an avant-garde dramatist of the first rank. With his 'existentialist' exploration of alienation and the human psyche in this play, Sircar charted out a new path that attracted theatre workers even from outside Bengal. It was soon translated into various other languages of India - Hindi, Manipuri, Marathi, Kannada, Gujrati, Tamil, Kannada, and of course English.

However, this was not his first play as Sircar had been earlier involved in theatre from the early 1950s and started writing career in 1956, when he wrote a short play called *Solution X* (1956). This was first published in a periodical titled Khapchhara in 1957. Thereafter, during his two years stay in London, Sircar wrote his first full length comedy *Bara Pisima* [Elder Paternal Aunt] in 1957. The play was first performed upon Sircar's return to Kolkata at the ABTA (All Bengal Teachers' Association) Hall on 11 September 1960 by the theatre group Chakra.

Having established himself as a man of the theatre, Sircar, during his stay in France over the next two years (1963-64), authored four more plays - two of them of a serious nature like *Saaraa Raattir* [The Whole Night] (1963) and *Bichitra Anushthan* [Variegated Programme] (1964), and two comedies *Ballabhpurer Rupkatha* [The Fairy Tale of Ballabhpur] (1963)

and *Kabi Kahini* [The Story of a Poet] (1963). Thereafter, Sircar continued to pursue his theatre work, and slowly turned this hobby into his profession, finally going on to form his own theatre group 'Satabdi' in 1967.

Incidentally, it was through an experimental production of Gour Kishore Ghosh's play *Sagina Mahato* (1971) in an ordinary theatre hall belonging to the All-Bengal Teachers' Association, that Sircar took his first step towards discovering a new form of theatre that gave full recognition to the audience. He evolved a theatrical form whereby the audiences and performers both could share the same space. To give a concrete embodiment to his new mode, Sircar founded a platform, 'Aangan Manch' [1] as he called it, on the second floor of the Academy of Fine Arts building in Calcutta. The first productions of Aangan Manch were performed at this venue. Later, in March 1985, Sircar and his group launched yet another new concept, 'parikrama', with shows being held in remote villages. Badal Sircar's next experiment on theatre is Open Theatre Movement and Third Theatre Movement. According to him, the Open Theatre movement had the potential of touching upon and transforming the lives of the poor, the illiterate and the marginalized populace of India.

Throughout his career as a dramaturge, Sircar continued to write plays, and the epoch-making texts include Spartacus (1972), Bhoma (1975), *Manushe Manushe,* [Amongst Human Being] *Khat Mat Kring* (1983), *Janma Bhumi Ajj* [Mother Land Today]. In total Badal Sircar wrote more than fifty plays originally in Bengali and five books of essays. Here it is relevant to note that Badal Sircar's first play *Solution X* written in 1956 was first performed by the theatre group 'Chakra' under the direction of Badal Sircar himself in 1961. Most of his plays were performed by the theatre groups Satabdi, Natuke Dal, Ranganiketan, and Bohurupee.

Apart from authoring essays on theatre, Sircar also penned a number of stories in Bengali which were inspired workings or transcreations. These stories were occasionally published in contemporary Bengali journals but they were finally collected together and printed in a separate book entitled *Abar Galper Khonchay* in 2009. Yet another collection of tales which Sircar himself described as part 'rasas' or sketches were published along with four original stories in a later book in 2008 under the title *Panchmisali Galpo* (Mixed Tales). Then from 2005 when Sircar turned 79 his pen took on a reminiscent turn. In May that year he published the first of many of his autobiographical narratives, a reminiscence of his travels in Southeast Asia, especially of Cambodia, Thailand, Burma, Sri Lanka and Vietnam. This volume was entitled *Bismaykar Shyamdesh.* The next year in December

2006 was published another book detailing Sircar's experiences while travelling and residing outside India. The inspiration of publishing this volume entitled *Prabasher Hijibiji* (Scribbling Abroad) had come to Sircar in 1989 when he read some of his own letters to his sister Manu (Anjali Basu) and her husband Kanu (Asit Basu) together with the notes he had kept during his stay in London from 1957 to 1959, in France for nine months in 1963 to 1964, and in Nigeria over 1964 to 1967. But this was not all, for the volume also included poems written by Badal Sircar from the 1950s onwards.

Next, in May 2006, May 2007 and October 2008, Badal Sircar published the three volumes of his autobiographical recollections in Bengali which he entitled *Purono Kasundi*. In the two parts of the first volume Sircar speaks of his memories of his childhood, of his family, his education and his work up to his departure for London in 1957. In the second volume of *Purono Kasundi* Sircar provided details about his work, both theatrical and professional, in various countries. In the third volume Sircar brings the reader up to date about his subsequent life to the point of his 82nd year.

Coming straight to the subject of the present paper viz. "Pan - Indian response to Badal Sircar" the initial part of my paper focuses on the Hindi (the national language of India) versions and productions of Sircar's plays in theatres in Calcutta and all over India. It will be relevant to mention here the name of 'Anamika', a society registered in Calcutta for propagation of theatre and other such arts. This society was started with the intention of presenting plays primarily in Hindi and had an initial membership of around 1100, with an audience of 3000. It is noticeable that the Hindi translations and productions of Badal Sircar's plays contributed to the arousing of interest in his plays amongst even Bengali theatre persons and theatre-goers. This is because the originals of the translated versions of several of Badal Sircar's plays had till then neither been published nor produced in West Bengal. The flourishing of Hindi theatre thus contributed to the consolidation of the reputation of Badal Sircar even in the State of his birth.

Indeed, it may be said that Badal Sircar found a home in the Hindi speaking population, not only in Bengal but also in various other parts of India where there is a sizeable Hindi speaking community. Many believe that the first translation of the plays of Badal Sircar into Hindi was done by Dr. Pratibha Agrawal who was to subsequently become the Director of Natya Shodh Sansthan located in Kolkata. My research however indicates that the first translation of Evam Indrajit was done in 1967 by Ram Gopal Bajaj, a noted Hindi-speaking scholar, theatre director, academician and a Hindi

film actor. The distinguished Hindi poet and translator Bharat Bhushan Agarwal (1919-1975) helped him to translate the poetic part of the text. This Hindi version by Ram Gopal Bajaj formed the basis for the first ever Hindi production of the play under the ditection of the noted theatre director, actor and playwright Mohan Maharishi (a recipient of Sangeet Natak Akademi award). This maiden production of Evam Indrajit in Hindi was staged (only about a fortnight after the original Bengali version was staged in Calcutta), at Manzar Theatre, Pragati Maidan, New Delhi and at Defence Pavilion Mathura Road, New Delhi on 23, 24, 29, 30 September and on 1, 6, 7, 8 October 1967 under the aegis of the Delhi theatre group 'Yatrik'. The production received notice at the national level but was caught up in a controversy because the producer-director changed the ending of the play.

Bajaj's translation was however not published, as Badal Sircar has already assigned the translation rights to Pratibha Agrawal whose translation is thus deemed to be the first ever, though this is not technically correct. Later Dr. Pratibha Agrawal went on to translate *Ballabhpurer Rupkatha* [*Ballabhpur Ki Roopkatha*], *Ram Shyam Jadu, Pagla Ghora [Pagla Ghoda], Abu Hossain, Sara Rat [Sari Rat], Bara Pisima [Badi Buaaji], Jadi ar Ekbar [Yadi ek bar Phirse], Gondi [Ghera], Natyakarer Sandhane Tinti Charitra [Natak Ki Khojme Tin Charitra], Prabaser Hijibiji [Pravasi Ki Kalam Se]* in Hindi. A comment of Dr. Pratibha Agrawal in her essay "The Pleasures and Troubles of Creation" may be quoted in this context. "The success of *Evam Indrajit*" she writes, "was only the first in establishing Badal Babu on an all-India level… Thereafter all his plays began to be translated into Hindi one after another making Badal Sircar an established name in the Hindi theatre world" (my trans.; 263) [3].

Dr. Pratibha Agrawal also observes that since there was a great dearth of good translators capable enough to translate the plays of Badal Sircar into the other Indian languages, the translation in Hindi served as sort of a clearing house. Many translations done into languages other than Hindi often used the Hindi version as their basic source text.[4] Here it may be mentioned that the first English translation of *Evam Indrajit* was done by the famous theatre personality and director, Girish Karnad (1938-2019). Karnad's translated text was published by Oxford University Press, New Delhi in 1974. Here the source text was the Hindi version of Pratibha Agrawal. But Girish Karnad has not acknowleged this fact.

Dr. Agrawal also observes that right from the beginnings of the seventies of the 20$^{th}$ century till today the plays of Badal Sircar have been staged most frequently. Apart from Dr. Pratibha Agrawal's translations many

of Sircar's plays were translated into Hindi and produced on the stage by such well-known figures as Satyadev Dubey (1966-2011), Amrish Lal Puri (1932-2005), Shyamanand Jalan (1934 - 2010), M. K. Raina (b.1948), Amol Palekar (b.1944). In one of the early Hindi productions of Evam Indrajit staged in Calcutta in 1971, the main role was played by Satyadev Dubey himself. The role of Manasi, the crucial female character of the play, was performed by Yama Sroff, daughter of Dr. Pratibha Agrawal. Apart from acting, Yama Sroff also translated into Hindi several of Sircar's plays including *Solution X, Beej* [Seeds], *Michhil* [The Procession- Hindi : *Julus]*, *Sagina Mahato* and *Basi Khabar* [Stale News]. *Evam Indrajit* was also produced in Hindi under the direction of Shyamanand Jalan, while Satyadev Dubey produced in Hindi three plays of Badal Sircar - *Evam Indrajit, Pagla Ghoda* [The Wild Horse] and *Sara Rat* [*Sari Rat*]. The popularity of Badal Sircar's plays among Hindi speaking theatre goers in Calcutta can be seen from the fact that Anamika theatre group alone produced no less than eight plays of Badal Sircar between the years 1968 and 1975.

The play *Michhil* [The Procession - Hindi: *Julus*] by Badal Sircar was produced in Hindi in New Delhi for the first time by the director M. K. Raina in 1977. Research information collected shows that M. K. Raina staged this play in open spaces on various streets, street crossings and parks of Delhi. Performances were held for instance in places like Turkman Gate, Connaught Place, Central Park, Mandi House Crossing, Kasturba Marg, India Gate, Seema Puri, Lodhi Colony, West Patel Nagar, Nehru Place, etc. About the production and performances M. K. Raina noted that the whole process involved a learning experience for the actors, for they had never staged 'open theatre' before.

In 15 to 19 July 2009 Natya Shodh Sansthan, Kolkata, organized a five-day programme on the life and works of Badal Sircar. This event which was entitled 'Badal Utsav' was inaugurated by famous Bengali theatre director Mohit Chattopadhyaya. Other well-known personalities who attended included the likes of Girish Karnad, Amol Palekar, Satyadev Dubey, Shyamand Jalan, Debendra Ray, Ankur, Rohini Hattangdi, Baharul Islam, Kumar Roy, Samik Bandhyopadhyay and Shyamal Ghosh. The programme was attended by Badal Sircar himself who declared that one should not associate oneself with the theatrical medium unless one had the urge to do well to others. Appealing to the audience Sircar requested them not to turn him into a myth. Sircar stressed that theatre is a medium which demands not only full dedication but also involvement and devotion. According to the playwright, human life is motley coloured; nobody knows what it can get

done for the people.

The next point of this paper looks into Badal Sircar in English. It has already been stated that the first English translation of Evam Indrajit was done by the famous theatre personality and director, Girish Karnad. Karnad's translated text was published by Oxford University Press, New Delhi in 1974. This *Evam Indrajit* in English language was first performed by the oldest English (established in 1955) theatre group 'Madras Players' at Museum Theatre in April 1970, under the direction of Girsih Karnad and Ammu Mathew.

Three other plays of Badal Sircar namely Procession *[Michil], Bhoma [Bhoma], Basi Khabar [Stale News]* were also translated into English a few years after this by Samik Bandyopadhyay and published by Seagull in Kolkata in 1983. Yet two other of Badal Sircar's plays that have been translated into English are *Beyond the Land of Hattamala [Original Hattomelar Opare] & Scandal in Fairyland [Original Rupkathar Kelenkhari].* These have been translated by Suchandra Sarkar and these were published by Seagull Books in 2008. Badal Sircar himself translated into English his own play Sara Rattir in 1964. Apart from this, Badal Sircar's Shesh Nei [There Is No End] has been translated into English by K. Raha, and this version was published in *Enact,* no. 59 in November 1971. Badal Sircar's *Baki Itihas* [The Remaining History] was translated into English by Vinod. L. Doshi and published in Enact (Ed. Rajinder Paul) no. 123-124 March-April 1977. Amar Mudi (b.1954), Bengali short story writer, playwright, poet and translator, and former Deputy Secretary at Central Vigilance Commission has translated Badal Sircar's short play *Beej* into English as *Seeds.* This translation has been published into English in Indian Literature (Sahitya Akademi's Bi-Monthly Journal) vol. LV No. 5. September-October 2011. Sircar's two plays *Sukhopattha Bharater Itihas & Bagla Charitra* were translated into English by Subhendu Sarkar as *Indian History Made Easy and Life of Bagla.* These translations were published by Oxford University Press, New Delhi in 2010.

What is remarkable is that the plays of Badal Sircar travelled with speed and alacrity to many different linguistic cultures across India within a few years. Indeed, as one of Badal Siracr's researchers has noted, it was most unusual for a play in a regional language to be translated into different languages like Hindi, English, Manipuri, Marathi, Gujarati, Kannada etc. in such a short period of time. Thus, Anjum Katyal notes:

It is unusual for the leading directors of the time to respond to it almost

unanimously and seek to stage it. Clearly, there was something about this text that spoke to the need of the hour, both in terms of form and content.

The Marathi response to the plays of Badal Sircar is also very interesting. There are two Marathi translations of Badal Sircar's *Evam Indrajit* - one by Shrikanta Kulkarni and another by Arvinda Deshpande. Shrikanta Kulkarni's version was published by Dhara Prakashan in 1977. Arvind Deshpande has also translated Sircar's *Baki Itihas* and *Pagla Ghoda*. The famous Indian film actor Amol Palekar has also translated Sircar's *Ballavpurer Rupkatha* as *Ballavapurchi Dant Katha.* It was produced in Martahi under the direction of Satyadev Dubey in 1969 by the thetre group 'Theatre Unit'. Chitra Palekar has translated *Michhil* as *Julus* while P. L. Deshpande has translated *Saaraa Raattir* as *Sari Raat*. *Julus* was performed in Marathi by the theatre group "Aniket" under the direction of Amol Palekar in 1975. Amol Palekar also translated the *Pagla Ghora* in Marathi and was second time performed under the direction of Amol Palekar. *Sari Raat* was performed under the direction of Ashok Sethe, and Satyadev Dubey was the producer.

Also, it is not a well-known fact that Badal Sircar visited Manipur for the first time as early as October 1972 to participate in the theatre festival organized by the Manipur State Kala Akademi. On 30 October 1972 *Evam Indrajit* was produced in Manipur by the theatre group 'Satabdi' under the direction of Sircar himself. Badal Sircar himself played the role of the protagonist Lekhak in this historic presentation. In this production the other different roles were played by Dilip Bhattacharjee (Kamal), Pankaj Munsi (Indrajit), Putul Sarkar (Masima), Bharati Sarkar (Manasi), Rajat Sircar (Bimal), Samar Bhowmik (Amal).

Sircar was very impressed by the maturity of the Manipuri theatre of which he had a taste. He suggested that the organizer should arrange a workshop. The orginizer accepted the proposal gladly and arranged a workshop from 30 April 1973. Shri Heisnam Kanhailal of Manipur was made the Assistant Director and he helped Sircar immensely in every respect, including interpretation. A shorter version of *Spartacus* was selected for the workshop. Smt. M. K. Binodini Devi translated the text into Manipuri. The wokshop was held for 17 days and the final production based on this workshop was held on 17 May 1973. Badal Sircar has pointed out that he was very much enriched by discussions with the participants in the workshop and with other theatre personalities of Manipur and of watching Manipri 'Jatra' Basanta Ras', and the folk dances of the 'Laiharaoba' festival.

To conclude it may be pointed out that through translations, performances in different Indian languages in different culture and different states Badal Sicar has crossed the social, polititical and lingual boundary of Bengal.

*Acknowledgement: Meterials in this paper were researched and included in my D. Litt Thesis titled "Badal Sircar (Bengali Playwright, Actor, Director,

Producer, Intellectual) Across Indian Languages, Culture and Adaptation: An Exploratory Study" submitted and awarded by Manipur University 2020.

**Works consulted:**

Sircar, Badal. Complete Works of Badal Sircar. Vol. I. Kolkata: Mitra & Ghosh Publishers 2010.

---. Complete Works of Badal Sircar. Vol. II. Kolkata: Mitra & Ghosh Publishers, 2011.

---. Complete Works of Badal Sircar. Vol. III. Kolkata: Mitra & Ghosh Publishers, 2013.

---. Tritiya Dharar Natak. Kolkata: Das Printers, 1998.

---. The Changing Language of Theatre (Azad memorial lectures). Indian Council for Cultural Relations (ICCR), Delhi: 1982.

---. The Language of Theatre. Opera, 1983.

---. On Theatre: Selected Essays. Kolkata: Seagull Books, 2009.

Chaudhury, Darshan. Natya Baktitya Badal Sircar. Kolkata: Gita Printers, 2009.

Jain, Nemichandra. Indian Theatre: Tradition, Continuty and Change. Delhi: National School of Drama, 2005.

Sarkar, Subhendu. Badal Sircar: Bikalpo Natak Bikalpo Manch. Kolkata: Indus Prakashani, 2007.

Roy, Bikash, editor. Ebong Indrajit: Bikshay - Anubhabey. Kolkata: Utthak Prakashan, 2004.

Bandhopadhyay, Samik, editor. Parikrama. Kolkata: Grija Bhaban, 1986.

Dhawan, R. K., editor. Three Indian Playwrights: Rabindranath Tagore, Badal Sircar & Mahasweta Devi. Delhi: Prestige Books, 2005.

Sircar, Badal. Evam Indrajit: Three-act Play. Translated into English by Girish Karnad, Oxford UP, 1975.

---. Three plays : Procession, Bhoma, Stale news. Translated into English by Samik Bandyopadhyay, Kolkata: Seagull, 1983.

---. Two Plays: Indian History Made Easy, Life of Bagala. Translated into English by Subhendu Sarkar, Oxford UP, 2009.

---. Seeds. Indian Literature (Sahitya - Akamedi's Bi-Monthly Journal), vol. 55, no. 5, translated by Amar Mudi, New Delhi: Sept.-Oct. 2011.

Sircar, Badal. Abu Hassan. Translated by Pratibha Agrawal, Delhi: Radhakrihna Prakashan, 1974. Original Aabu Hossain by Girish Chandra Ghosh.

---. Pravasi Ki Kalam Se. Translated by Pratibha Agrawal, Delhi: Rastriya Natya Vidyalaya, 2009. (Original Prabasher Hiji Biji).

1. Aanganmanch is a name given to our Theatre Space. It is not the name of the group. 'Aangan' means enclosed space, and when we perform in a small room doing theatre on the floor, sharing it with the audience intimately, that theatre we call 'Aanganmancha', ninety to a hundred and twenty people are usually in that space. By that logic, when we do it outdoors, we should call it "Muktamancha". We do both. [Shri Ram Memorial Lecture: IV. 1992. Printed: BITBLTTS, p.53.]

2. Sircar, Badal. Evam Indrajit. Translated by Pratibha Agrawal. New Delhi: Rajkamal Prakashan, 1969. Price: Rs. 3.75 Subsequent imprint available is dated 2014, as published in Rajkamal Paperbacks.

3. Agrawal, Pratibha. "Hindi Anubade Badal Sircar-er Natak O Manchayan." Bohurupee, no. 117, edited by Probhatkumar Das, May 2012, p. 263.

4. Three Modern Indian Plays (Girish Karnad: Tughlaq, Badal Sircar: Evam Indrajit, Vijay Tendulkar: Silence! The Court is in Session). Kolkata: Oxford University Press. 2004.

Subsequently, this version was also included in other anthology published in nd 2010.

a) "Three Modern Indian Plays: Girish Karnad: 'Tughlaq', Badal Sircar: 'Evam Indrajit' Vijay Tendulkar: 'Silence the Court is in Session' in an Oxford India Paperback, published in 1989, pp.87-60.

b) Deshpande, G.P., Editor. Modern Indian Drama. 2000. Sahitya Akademi, 2010, pp. 195-205

---

Author : **Tapu Biswas,** M.A, M.Phil, Ph.D, D.Litt. is currently Assistant Professor, Department of English, Visva-Bharati, Shantiniketan, West Bengal, India. Jt. Secretary, Shakespeare Society of Eastern India.

# Ritualling and Storytelling in Heishnam Kanhailal's Play Tamnalai

(Haunting Spirit)

**Kshetrimayum Premchandra**

**Abstract :** Heisnam Kanhailal is a celebrated dramatist from the Indian state of Manipur. His stages and props are minimalist compared to his contemporaries, who use extravagant sets and exotic costumes. He is among the few Indian dramatists who use local resources to theorise theatre to suit the local taste and sensitivity. His theory of 'ritual theatre', which later came to be known as 'theatre of the earth' is widely accepted as a home-grown theatre style where the focus is on the significance of 'ritual' in staging and presenting plays. Kanhailal usesan unorthodox stage set-up and storytelling rooted in his culture. In this paper, the researcher discusses one of his short plays, Tamnalai, from the perspectives of performance space, storytelling, and 'ritualling'. Tamnalai is a term that denotes malevolent spirits. However, the term is translated as 'haunting spirit' as there is an element of scaring or haunting innocent people. Kanhailal highlights the plight of the poor innocent people and how they become victims of their destinies and destitution. The paper closes with the play's reception by a renowned Manipur poet who responded to the play with a poem.

**Keywords:** Manipur, play, stage, storytelling, ritualling

It is somewhat problematic to call the theatre of Kanhailal a 'modernist theatre' because he appeared in the theatre scene in the latter part of the last century, and the term 'modernist theatre' is a western template that he ostensibly was so against. Nevertheless, without a doubt, Kanhailal is one of the makers of 'modern Manipuri theatre'. The modernism in his plays is his art that is "associated with startling novelty" and that "which socks or which deliberately - even joyfully - breaks conventions" (Leach, 1). The challenging and contentious play like the Tamnalai can sometimes be mistaken as incoherent and fragmented. But, it can be Kanhailal's aim to achieve practical enlightenment in stagecraft.

The magnitude of Heisnam Kanhailal (1941-2016) as one of the most outstanding theatre personalities of Manipur can not be measured through one or two of his plays. However, Draupadi, Pebet, Memoirs of Africa, and Dakghadh have long been regarded as Kanhailal's most

outstanding achievements. Draupadi is his most widely acclaimed play Kanhailal,adapted from Kamala Das's short story of the same name. Pebet is based on an old Manipuri folktale. Memoirs of Africa is based on a Manipuri poem and is rather psychological and explores the 'animality' in human beings. And, Dakghadh is adapted from Rabindranath Tagore's play of the same name. These plays are no mean achievements. Each play has its own dramatic excellence. However, there is one short play that speaks volumes about Kanhailal's vision and construct of theatre. And that play is Tamnalai. Without a doubt, in Tamnalai, one can witness Heisnam Kanhailal's grand scheme of theatre and production, which is now famously known as the 'theatre of the earth'.

Kanhailal adopts a minimalist stage for Tamnalai. At the left centre, there is a one-step five by three feet platform with a wooden door attached to it. A bamboo pole of roughly seven feet in height is fixed on the left end of the platform. A smaller three-foot-long bamboo is tied to the top end of the pole, representing a thatched hut. At the right centre, a wooden pestle and mortar are kept for pounding rice. A fence at the upstagealmost touches the left and right wings with two bamboo poles about four feet apart as the gate to the homestead. Smaller bamboos inserted in the holes made on the poles can be slid in and out to open and close. A typical Manipuri gate and fence prevented cattle and other livestock from entering and destroying vegetables grown in the compound. There is a banyan tree cut-out on the extreme right upstage, which is big enough to hide three persons. No music is used throughout the performance except for the sound of a Dakota plane booming in the sky at the very beginning of the play. The stage is illuminated throughout the play with occasional dimming to focus on specific characters, spots, and activities.

The play, set in the chaotic Manipur of the 1960s, was first performed in 1972. People could connect to the play on two counts; one, it is loosely based on a popular story already on the lips of every Manipuri. And, two, the play depicted the frustration and anguish of the ordinary people vis-à-vis the state of lawlessness in the land. And the word tamnalai evokes a sense of fear and loathing because itis a term Manipuris use while describing evil/malevolent spirits which scare and haunt people. They are believed to dwell in isolated spaces, thick bushes, bamboo groves, trees, or areas one finds odd/gothic or out of place.

Tamnalai tells the story of a bright young student called Chandrakangnal and his widowed mother, who live with modest means. Lukhrabi (widow in Manipuri) envisionsher son staining outstanding

academic achievements. Chandrakangnal is a disciplined young man who is studious and loved by everyone. Ngangbiton, a young girl from a wealthy family in the neighbourhood, has her eyes on Chandrakangnal. Ngangbiton coerced her mother, Keirakpi, to impart private tuition to her by Chandrakangnal. However, Chandrakangnal shows his reluctance because his M. A. examination is approaching, and he knows the true intention of Ngangbiton. After much persuasion from his mother, Chandrakangnal finally agrees, only to encounter Ngangbiton'samorous advances. He does not see love or affection in the eyes of the girl. In the vicinity, there is a banyan tree which the villagers feared as they believed that haunting spirits resided in that particular spot. Now, the space is occupied by a group of goondas/ gangsters who harass, tease, and terrorise anyone who passes by. They are an eyesore for everyone, including the poor and hapless Chandrakangnal and his widowed mother.

However, his mother persuades him to not pay attention to these lumpens. Ngangbiton bribes them to spread the news of her and Chandrakangnal's love affair and stand witness to it. On the day Chandrakangnal gets his Master's result, he returns home to share the good news with his mother. His mother is ecstatic to hear the news and thanks tothe gods who have listened to her prayers. Chandrakangnal keeps on hearing the very irritating giggles of the goondas. He remembers how they tease him with the fake love affair between him and Ngangbiton. In a momentary lapse of reason, he gets snapped and kills the three goondas with a dao. On hearing the unfortunate and improbable news, Chandrakangnal's three teachers (Ojas) visit his house to learn more about the incident.

The play begins with the three teachers entering the courtyard of the house of Chandrakangnal, where his mother is seen pounding rice.

Kanhailal presents the events leading to the murder of the goondas by Chandrakangnal in flashback. However, the play begins in the current time and ends in the current time. However, the story narrated happened in the time past. Further more, the three Ojas (teachers) do not leave the stage at any point in time. There is only one act that spreads across different timelines. Kanhailal here experiments with his idea of the 'ritual theatre' in which any space can be used to stage a performance irrespective of the time-lapses. Also, the way the story is enacted shows how Kanhailal maintains the Manipuri storytelling technique in which the narrator is more of a performer than a narrator. It is also a one such tradition purposefully used by Ratan Thiyam in many of his plays, including Chakravyuha. In the

Manipuri phunga wari tradition, the narrator sings, delivers dialogues in different voices, mimics animal antics and plants, and uses the body parts to instil the story's characters and events in the listeners' minds. Sometimes, the narrator stands up, in a fit, to dance and laugh and cry. Like Manipuri folktales which have stories within stories Tamnalai, as conceived by Kanhailal, is a play within a play.

Kanhailal's stagecraft is so powerful that his Tamnalai captures the audience's attention like the storyteller mesmerises the listeners at the family hearth. This feat is achieved because Kanhailal never bothered to divide it into acts and scenes. He only presents it as an old grandma would narrate it to her grandchildren. Once the mechanical/technical hindrances are removed, he moves on to the ways and means of integrating the past with the present without using a narrator who informs the audience about what happened in the past to the play's protagonist. It would have called for multiple exits and entries of the characters, which would disturb the integrity of the play.

It is natural to ask how Kanhailal executessuch a feat without disturbing the flow of the play. The answer lies in his idea of theatre. Kanhailal's vision of theatre is 'alternative theatre' or 'theatre of transition' based on 'ethno-social traditions' passed down to the new by the old generations ("Ritual Theatre" 29). Kanhailal never had the 'orientation' or formal/ training in the craft of theatre. It is a fact that Kanhailal was terminated from the National School of Drama, New Delhi,at the beginning of the session in 1968 due to language issues. It came as a blessing in disguise because he started exploring traditional performance styles available to him in Manipur. He began to conceptualise the notion of actor-performer and the significance of being one. He writes in thetheatre for the Ritual Suffering, "The actor-performer is a cultural worker who could identify with the integrated skill and spirit ofthe martial artist, a shaman, a dancer, a singer, a clown, a storyteller, a tribal and folk charmer, a sportsman, and so on. He should have the capacity to play with his body in satisfying the defined art of impersonation at both representational and presentational levels." (53) So, for him, the actor-performer must follow the 'actor-character-text' trajectory in theatre instead of the institutionalised Western practice of 'actor-text-character'.

Kanhailal's sharp focus on cultural resources andbody-performance based theatre finds its calling in Tamnalai.The play was conceived and executed before he met Badal Sircar, who introduced the psycho-physical exercises of the Western theatre popular in the 60s to Kanhailal. Later on,

Kanhailal abandons the psycho-physical activities because he firmly believes in the physical energies of Manipuris, who possess certain innate flexibility and agility. Quite unconsciously, that physical energy is what he implants in the three goondas and the three Ojas (teachers). "In the non-individualistic approach", Kanhailal informs us, "I use to look at the teachers as a whole because of their sensitivity and are normally sympathetic in attitude because of their sensitive and sensible temperament. Even then, they are helpless in coming out and confronting hand except commenting upon." (Theatre for the Ritual Suffering 41) Kanhailal must show compassion, abject helplessness, and empathy in the three characters. Contrary to these three positive characters, the three goondas must emit disgust, shame, and loathing. He can transfer these feelings and emotions to the audience through a series of movements, sounds, gestures, and activities.

Kanhailal's theatre is local and rooted in the land and its traditions. While looking at the whole production of Tamnalai,one can not but be reminded of the Haoba-Nurabi episode in the Meitei Lai Haraoba festival (propitiating tutelary deities). On the concluding day of Lai Haraoba, the episode of Haoba (Meitei God Nongpok Ningthou) and Nurabi (Meitei Goddess Panthoibi) is enacted without causing any disturbance to the rituals or persons involved in the procession. After the day's ceremonies are over, this episode is enacted at the circular laipung (space for gods/sacred space). Khelchandra defines a laipung as 'a place for festivities offered to deities' (296). At the same time, all the participants in the daily ceremonial rites sit in the sacred spaceor the laipung. So, we have two layers of spectators. One, the primary spectators who are also participants of the daily rites and rituals and already inside the sanctum sanctorum of the laipung. And two, the secondary spectators watching the propitiating ceremony from beyond the unmarked/imaginary boundary of the laipung. While the enactment takes place, other characters who portray different characters sit at their designated spots and wait for their turn to perform. The three goondas and the teachers who remain present on the stage throughout the play operate like the participants who remain inside the sacred space of a laipung in the propitiating ceremony.

Here, I am reminded of Shcechner's graphic configuration of performance as either a fan or a web (Schechner 18). If we look at the open fan diagram of performance, we get to see 'ritualization' on one hand through the 'performance of everyday life' in the centre to 'rites and ceremonies' at the other end. Schechner reminds us that 'ritualization' is an ethological term.Kanhailal exploits the innate aspects of human behaviour and

movements displayed at lai haraoba and the flexibility of a laipung to conceptualise and stage the play. Seen from this perspective Kanhailal's 'ritualling' and Schechner's 'ritualization' are fundamentally very similar. As stated above, there is a reason for Kanhaila's stage functioning like a laipung (sacred ground). That is because the space provided by the laipung or the sacred ground is accommodative.It is the place where the sacred and mundane can happen simultaneously, where the sacredness of the trance gets extended beyond its perimeters, where the therapeutic and reinvigorating proclamations are both for the believers and non-believers. Here in this space, the overlordship of the deity concerned is exhibited through a series of ritual activities such as dance, chants, and music by the shamans and the participants. Kanhailal had an archetype for his stage production in his own culture. Perhaps he was never bothered by the theatre traditions imported from the West.Another fascinating aspect of the play is how the teachers (Ojas) walk. At a closer look, their walk resembles the lairen mathek or the serpentine walk found in the Lai Haraoba.

The weight of the play rests on Sabitri, who portrays the role of Lukhrabi. Sabitri is Kanhailal's wife and collaborator.Supported by the other characters, Sabitri wields her acting prowess in her gaze, silence, movements, and dialogues. Regarding the goondas Kanhailal says that "The three goondas are also designed to live in a single entity of a character as we find in the case of the teachers. In respect of the creative point of characterisation, goondas is worked out vocally." (Ritual Suffering 42) The goondas are hollow but loud. The irresponsible nagging and violence are emitted through orchestrated laughter and irritating walking style. Kanhailal and his actors could achieve it because "They learned how to shape a text through collaboration, focusing on problems like the editing of action and the juxtaposition of time sequences." (Bharucha 68); the statement holds true for Tamnalai and every other play Kanhailal designs.

Here, I am convinced that Kanhailal would agree with Stanislavski when he contends that, "In order to express a most delicate and largely subconsciouslife it is necessary to have control of an unusually responsive,excellently prepared vocal and physical apparatus." (16) The physical-vocal combination must be put to use to achieve maximum emotional and psychological reach to the audience. Very much like the experience of the sacred and the feeling of being sanctified during and after a ritual. His vision of the body to body communication functions as catharsis in a tragedy because through Sabriti's excellent acting skills, the pain and anguish of the distraught mother get transferred to the spectators. Like how

Stanislavki prepared his actors, Kanhailal also readied his actors through a complex process which he called 'ritualling'. Through this process, Kanhailal aims to bring all the elements of the play/performance under one ritual process where every element, including the actors and the spectators, collectively share the experience of suffering. In Kanhailal's own words, the actor (Sabitri in this case) initiates "the intimate release of a vibrated body directly striking at the body of the spectator in a body to body communication, which receives it as shock in its naturalness exciting all the senses from within."(Ritual of Suffering 44). The sense of ritual or ritualling is vital here because the ritualling he talks about has the functions and elements of healing. If the stage is a site for dissent and protest, it must also provide a space for healing and reconciliation. That is what Kanhailal saw in the three old teachers or Ojas.

The impact of Tamnalaion the theatre-goers of Manipur was swift and far-reaching. They could identify with the plight of the Lukhrabi, the divide between the haves and havenots, the anarchy like socio-political situation of Manipur, dangers of the lawless streets, innocents forced to take matters in their own hands, the helplessness of the common masses, etc. What they saw on the stage was what they experienced on the daily basis.

After watching it, Laishram Samarendra, whose poem Africagee Wakhaldagi inspired the play Memoirs of Africa, wrote the following poem which I have translated into English.

**Three Old Men**

The three old men in one evening
Reached unexpectedly
At the residence of the widowed Ngangbiton
"How did such a skirmish take place
He was a good boy
It isinconceivable."
The mischievous tamnalais of the locality
Destroyed Ngangbiton's son
The widow's son Chandrakangnal
Was made into a criminal.

The three old men were distraught
At the corner of the stage
At the centre of the stage
At the front of the stage

At the far end of the stage
Near the wings of the stage.
The three old men
Judicious and empathetic
Were devastated.

At the far end of the night
The tamnalais took flight
They ran helter skelter,
With sticks in their hands
The three old men chased them
At my veranda, plinth, room
At the sky of dead night
Among the white clouds
When I am alone. (Thangjam etal. 53)

Throughout the play, the three old men present on the stageare the silent observers who feel disabled due to their inability to do anything about the situation. Moreover, it appears to me that Kanhailal conceived the three old teachers as time past, time present, and time future. Interestingly, Kanhailal sets his stage as a site for protest and resistance but fails to provide poetic justice, which Laishram Samarendra did with his imagination. That is exactly what Kanhailal wants the spectators to 'feel'through telling and staging the story of pain and injustice caused by the tamnalais.

**Works Cited :**

Bharucha, Rustom. The Theatre of Kanhailal: Pebet and Memoirs of Africa. Seagull Books, 1998.

Kanhailal, Heisnam. "Ritual Theatre: Theatre Transitions and Theatre That Encounters", Theatre of the Earth: Essays and Interviews. Seagull, 2016.

--- Theatre for the Ritual Suffering. Heisnam Publications, 1997.

Khelchandra, Ningthoukhongjam. Ariba Manipuri Longei: An Archaic Manipuri to Modern Manipuri Dictionary. Dr. N. Debendra Singh, 1978.

Leach, Robert. Makers of Modern Theatre: An Introduction. Routledge, 2004.

Schechner, Richard. Performance Studies: An Introduction. Routledge, 2013.

Stanislavski, Constantin. An Actor Prepares. Tr. Elizabeth ReynoldsHapgood. Theatre Arts Books, 1964.

Thangjam, Ibopishak and Yumlembam Ibomcha (eds.) Laishram Samarendragee Apunba Lairik. Poknapham Publications, 2012.

---

Writer : **Kshetrimayum Premchandra** (Ph.D.) teaches at the Dept of English, Tripura University.

# Rasa' in Classical Sanskrit Theatre An Analytical Introspection

**Sib Sankar Majumder**

It is popularly believed that the earliest references to aesthetics of dramatic representation, in the Indian classical tradition, are recorded in Bharata Muni's treatise titled *Natyasastra.* Anecdote has it that once a group of disciples of Sage Bharata led by Sage Atreya approaches their learned master and requests him to elaborate the story about the origin of *Natyaveda* or *Natyasastra*.

> O Brahman, how did the Natyaveda, so similar to the Vedas, which you have properly composed originate? And for whom it is meant, how many parts does it possess, what is its scope and how is it to be applied? Pleaseexplain all these details to us. (Sharma 2000: 253)

In his elaborate reply to the query of his disciples, Bharata informs that with the passage of the Golden Age *(krtayuga)* people became addicted to sensual pleasures. It is at that time when Indra, the King God with some of his followers approached Brahma and entreated him to invent "an object of diversion, which must be audible as well as visible". (Sharma 2000: 254) He also reminds Brahma that since the *sudras* are not allowed to listen to the four Vedas so Brahma may create another Veda which would belong to the people of all the 'varanas'. Brahma assures the gods and begins the task of composing the Fifth Veda, which would eventually be known as *Natyaveda.* It is a treatise on the natya (i.e. dramatic representation), the objective of which is to impart lessons on duty *(dharma)*, wealth *(artha)* scriptures *(sastra)* and arts. *(silpa)* (Sharma 2000: 254). So, in essence, Natyaveda or *Natyasastra* (Treatise on Drama) contains the gist of the four Vedas - it draws the resources of recitation from Rigveda, music from Samaveda, art of representation from *Yajurveda*, and sentiments from *Atharvaveda*. *Natyaveda* (alternatively known as Treatise on Drama) a veritable "encyclopedia of knowledge concerning Sanskrit drama and theatre", most possibly composed (or compiled) between 200 B.C. to 200 A.D, has acquired the most privileged status in any discourse on Classical Indian dramatic as well as theatrical tradition (Sharma 2000: 254).

As a foundational treatise on the aesthetics of dramatic performance,

*Natyasastra* presents a comprehensive account of the various aspects of theatrical performance - acting, music, dance, stage design, language, gestures, facial expressions, costume and makeup etc. The 'text' identifies ten major types of plays or dramatic genres - nataka, prakarana, anka, vyayoga, bhana, samvakara, vithi, prahasana, dima and ihamrga; eight basic human sentiments or stable emotions - erotic *(shringara)*, comic (hasya), pathetic *(karuna)*, furious *(raudra)*, heroic *(vira)*, terrible *(bhayanaka)*, odious *(bibhatsa)*, and marvelous *(adbhuta);* and as many as thirty-three transitory feelings like despondency, agitation, stupor, arrogance, despair, impatience weakness, apprehension, envy, intoxication, inconstancy, joy, agitation, stupor, weariness, indolence, depression, anxiety, distraction, recollection, contentment, shame, arrogance, despair, impatience, sleep, epilepsy, dreaming, awakening, indignation, dissimulation, cruelty, assurance, sickness, insanity, death, fright, and deliberation. There are also eight *sattvika* states - paralysis, perspiration, horripilation, change of voice, trembling, change of colour, weeping and fainting. The principal objective of a classical Sanskrit dramatic performance, however, is to arouse *'rasa'* as Bharata Muni himself enunciates, "no part of the enterprise (i.e. a dramatic performance) will succeed without attention to rasa". (Jani 1980: 11) Now, the question arises as to what does rasa actually mean? It is a complicated question. Literally 'rasa' means 'sap' or 'taste' and at the same time it is also the principle which holds disparate parts of a dramatic representation together. In The Oxford Companion to Theatre and Performance, Dennis Kennedy defines *'rasa'* as, pleasure involved in 'tasting' a performance througha heightened experience that transcends temporal, spatial, and personal conditions and constraints…the rasa is produced through the exploration of dominant states of emotion, supported by determinant, consequent, and transitory states of emotion. (Kennedy 2011: 494)

Sheldon Pollock argues that '*rasa'* is so called because "it is something savoured". (Pollock 2018: 51) He further elaborates that …just as discerning people relish tastes when eating food prepared with various condiments and in doing so find pleasure, so discerning viewers relish the stable emotions when they are manifested by the acting out of various transitory emotions and reactions and accompanied by the other acting registers (the verbal, physical and psychophysical), and they find pleasure in doing so. (Pollock 2018: 51)

It is pretty interesting to note that Bharata himself uses the metaphor of 'consumption', the very act of relishing something through the taste-buds while explaining the notion of *'rasa*' to his disciples in *Natyasastra:*

Just as connoisseurs eat and savour their fare when prepared with many condiments and substances, so the learned fully savour in their heart the stable emotions when conjoined with the factors, transitory emotions, and reactions. That is why they are called dramatic rasas… (Pollock 2018: 51)

Bharata initiates a comprehensive discussion on the significance of *'rasa'* in Chapter Six of *Natyasastra* where his primary hypothesis is that that, Rasa arises from the conjunction of factors, reactions and transitory emotions. (Jani 1980: 131)

Answering the question of his disciples on the nature of *'rasa'*, Bharata replies that 'stable emotions' of spectators (i.e. erotic, comic, pathetic, furious, heroic, terrible, odious, and marvelous) turn into *'rasas'* as an impact of an interplay of various factors during a theatrical performance. During a performance event one or multiple aspects of performance i.e. spectacle, music, dialogue, gestures made by the actors etc. may give rise to certain emotion or *'bhava'* in the mind of the spectator, in that state the spectator experiences *rasas'*. So, basically Bharata emphasizes on the fact that "eight generally existing dominant states (i.e.stahayibhava) correspond to the eight rasas". (Dalmia 2006: 236) Pollock argues that during the performance of a dramatic spectacle "rasas are produced by the emotions and other elements and not the reverse". (Pollock 2018: 51)

Bhavas are so called by the creators of drama because when conjoined with the various registers of acting they bring into being (bhavayanti) the rasas. Just as various substances bring a new flavour into existence, so the emotions with the aid of the registers of acting bring the rasas into being. (Pollock 2018: 51)

In the Sixth chapter of Natyasastrathere appears the rhetorical question "Rasa, what does this word mean?" (i.e. why *rasas'* is called *'rasas'* ?), it is suitably followed with an answer "It is so called because it is worthy of being tasted" (Jani 1980: 141). In the context of dramatic or theatrical performance 'rasa' is an extract. Bharat Gupt explains,

It is one element out of the eleven elements that natyaconsists of. But it is extracted from ten other elements *(bhava, abhinaya, dharmis, vrtti, pravrttis, siddhis, svara, atodya, gana, and ranga)* of natya. It is perhaps called rasa or extract because it cannot exist by itself, but, as it were, only in other elements. (Gupt 2006: 261)

The "other elements", which Bharat Gupt is possibly hinting at, are commonly presumed to be *bhava, vibhava,* and *anubhava*. Rasa emerges

through a union of various bhavas (in a suitable proportion), or to put it in other words, a combination of different bhavas will transform the sthayi bhavas in the mind of the spectator into rasa.

[A] ppreciativespectators' taste sthayi bhavas laced with verbal, gestural and sattvika abhinayas of various bhavas and thus experiences joy. (Gupt 2006: 261)

In the *Natyasastra*, there is yet another anecdote which relates the circumstances under which *'natya'* (the dramatic performance art) was brought to earth. Once Bharat's sons indulged in a mock performance wherein, they caricatured the sages. In a state of fury, on being insulted by own sons, Bharata cursed them and their future generations to be 'sudras', the lowliest of the caste-line. Concerned by the fact that the curse might result in extinction of dramatic art (since Bharata's sons were the sole custodian and only divinely ordained performers of dramatic art in Heaven) certain gods led by Indra approach Brahma with a request for intervention. The situation becomes further complicated when the accursed sons of Bharata threatens to commit suicide. Coincidentally, at that precise moment a king requests Bharata and his sons to descend to earth and perform a play. It is thus drama was brought to earth from the heavenly realms. Bharata's sons get married to women on earth and their descendants continue the practice of dramatic representation as connoisseurs, as performers. This anecdote, notwithstanding, one may still ask a set of question like - what is the end/ objective of a dramatic/theatrical performance?How does rasa 'manifest' itself during a dramatic performance? Does it originate in the character (in a dramatic text), in the actor or in the spectator? Answers to all these questions are inseparably linked with Bharata's exposition of the idea of 'rasa' in Natyasastra and its subsequent interpretations down the age. According to Natyasastrathe body of an actor, a performer, is the most significant vehicle for transmission of rasa. It is an actor who "produces an emotion" or "causes a sentiment to be perceived through the union of the determinants". (Richmond et al 2007: 82) There are ample textual evidences about the fact that at least till the time of Abhinavagupta rasa was conceived as a textual object. Lollata,Abhinavagupta's predecessor argued that rasa exists in the character 'literally' and in the actor only 'figuratively' and never in the spectator. It is important to note in this context that that though Lollata confirmed most of the propositions of Bharata Muni but he accorded primacy to character over actor as far as the question of 'agency' of rasa is concerned. His argument being that since "the fundamental concern of Natyasastra is performance" its analytical concern should be primarily focused "on the

performative event, in the actors and the characters they represent". (Pollock 2018: 9)

In Classical Sanskrit plays, usually, we encounter 'type' characters. The primary reason for it can be traced in the deep traditionalism and rigid caste hierarchy of the milieu.

The ritual of social behavior seems to have stemmed from the original separation of men into occupation groups - priests, warriors, tradesmen, and peasants. Each group had particular duties to fulfill and a particular behavior pattern was expected of men in these categories. (Richmond et al 2007: 76)

Here characters performing roles of individual types represent "part of a larger universal order". (Richmond et al 2007: 78) Roles played by individual characters attained significance when they threatened the notion of duty or the hierarchy of the social system. For example,when Sage Durvasa visits the hermitage of Sage Kanva in Kalidasa'sShakuntala the eponymous female protagonist commits a serious mistake by neglecting her duty as a hospitable host. Her heart is completely preoccupied with thoughts of Dushyanta. In a fit of anger Durvasa curses Shakuntala that the person about whom she was thinking would completely forget her. As a consequence of the curse Shakuntala faces lot of hardships. Fate and duty are two important principles in Sanskrit plays, both of which are governed by the wheel of fortune. Be it a king or a commoner, everyone must uphold their dharma. "The plays seem to have been written" observes Richmond "to demonstrate the virtue of performing one's duty properly. (Richmond et al 2007: 78) Slightest disruption or infringement from duty could invite unfortunate consequences. One will be briefly reminded here about the opinion of Abhnivagupta whose argument is that in Classical Sanskrit theatre pleasure is as important as knowledge (mentioned above), in fact both are inseparable from each other. Natyasastraemphasizes that the principal objective of the plot of a play is to show the struggles of a righteous protagonist through suffering to a gradual progression which ends at the attainment of the object of his desire. Since, characters for most of the plays were chosen from the epics, Ramayana and Mahabharata, there would very little possibility for alteration or radical departure from the conventional narrative. As a result of this the responsibility of the actors was to enliven the performance through their performative skills, almost to the point of bringing 'alive' divinities to stage:

Like a yogi who is said to possess the power to transfer his soul from

his body into that of a person who has recently died, the actor was supposed to think of himself (Richmond et al 2007: 37)

According to Natyasastra, during the performance of a play, an actor's body becomes the most prominent vehicle for the transmission of rasa. Naturally then, an actor had to acquire numerous accomplishments for justifying his inclusion in the cast. Bharata enunciates that an accomplished actor must avoid unnaturalness in acting, incorrect movement, forgetfulness, improper gesture, improper or defective costume, excessive laughter or weeping. In such rule-bound system where characters were chosen from classical mythology, with very little opportunity for alteration or deviation, how could the practitioners of Sanskrit drama exercise creative license? It is not difficult to understand. In Kalidasa'sShakuntala, during the encounter of Dushyanta with Shakuntala in Act i, Kalidasa employs 'bhramaravrittanta yojana' (i.e. trope of the honey-bee) to provide an excuse to the king to approach a maiden in the midst of a forest. Whereas, Dushyanta can clearly witness the discomfiture of Shakuntala who is being disturbed and terrified by the bee, it provokes a secret jealousy at the heart of the king:

As the bee about her flies,
Swiftly her bewitching eyes
Turn to watch his flight.
She is practicing to-day
Coquetry and glances' play
Not from love, but fright.

(Jealously)Eager bee, you lightly skim
O'er the eyelid's trembling rim
Toward the cheek a-quiver.
Gently buzzing round her cheek,
Whispering in her ear, you seek
Secrets to deliver.
While her hands that way and this
Strike at you, you steal a kiss,
Love's all, honey-maker.
I know nothing but her name,
Not her caste, nor whence she came-
You, my rival, take her. (Ryder 1999: 11)

The approach of the stricken lover for his beloved is shown through the medium of the bee. Dushyanta, who has all the while been secretly

watching Shakuntala, now comes out from hiding and presents himself before her. According to certain scholars, Kalidasa intended to show that Sakuntala was equally smitten by the appearance of Dushyanta. This view is based on the ancient Indian belief that since women are inferior to men so they are gripped by emotions faster than men. According to the notion of love in Sahityadarpana:

adauvacyahstriyaragahpunsahpascattadingitaih

(The first signs of passion are expressed in the female; it is thereafter indicated in the male) (Pandey 1996: 118)

In the previous context, Dushyanta's contrastive emotions of jealousy and love on seeing Shakuntala pursued by a bee, can be justified following the precepts of Bhavaprakasan, where it is written that -

Sneho yatra bhayantatrayatrersyamadnastatah

(where there is love, there is jealousy; and emotion of Kama is present) (Pandey 1996: 118)

It would be not only be convenient but also appropriate to draw a conclusion to this discussion on the concept of 'rasa', especially its creation and transmission in Classical Sanskrit dramaturgy through a reference to Bhattanayaka. His intervention in the epistemology of 'rasa' theory, apropos dramatic representation and its reception, is particularly significant for two reasons, i.e. (a) ontological - how (and where) does rasa exist, whether in the character, the actor, or the poet) and (b) epistemological - how rasa is known i.e. whether through perception, inference or manifestation. (Pollock 2018: 17) In fact, since Bhattanayaka'selaboration on the principles of rasa "the focal point in the analysis" shifts from "what happened on the stage to what is felt by the audience." (Gupt2006: 266) Whereas, Lollata and Sankuka located rasaemergence in the actor, with Bhattanayaka the spectator's psychology became "a contributing factor in the emergence of Rasa" (Gupt 2006: 266). In this sense, one could say that Bhattanayaka ushered a paradigm shift about the notion of rasa and its emergence through his innovative ideas. The question 'where does rasa originate?' has been answered by Bhattanayaka:

The physical reactions that are effects of emotion in the character…are causes for rasa in the viewer [spectator]…Rasa thus became entirely a matter of response… (Pollock 2018: 18)

When the followers and successors of Bhattanayaka realized that the

most significant thing about rasa "is the reader's or viewer's experience" questions about whether "rasa is engendered, inferred, or manifested in character" became less important. (Pollock 2018: 19) Inhis treatise titled The New Dramatic Art, Abhinavagupta expounds that a while watching a dramatic performance a spectator's response undergoes tremendous transformation. He explains that during the performance of a dramatic spectacle a spectator is exposed to various manifestations of emotions of different degree and scale,

When senders and receivers accomplish the process of sadharanikaran, they attain saharidayata and become sahridayas. In other words, communicating parties, for e.g., actor and audience, become sahridayas when they are engaged in a communicative relation leading to the attainment of saharidayata. (Adhikary2007: 70)

The primary condition for experiencing 'rasa' for a spectator, according Abhinavagupta, is 'saharidaya'. In other words, since "dramatic emotion is impersonal" and could be felt only "in a special way" the response of the spectator to the spectacle should be channelized in an appropriate manner. (Gupt2006: 268) Experience of an individual spectator "is influenced by the experience of the whole watching community" argues Abhinavagupta, "because every spectator's consciousness is coloured by the same primordial desire and because there is a consonance among spectators in experiencing that primordial desire as rasa". (Gupt 2006: 268-69)

Now, is it appropriate to say, following Bharata that the ultimate objective of Classical Sanskrit theatre is to provide pleasure or joy to spectators? The answer could be both yes and no. Whereas, it is not wholly incorrect to say that the one of the principal objectives of Classical Sanskrit theatre is to arouse the feeling of pleasure, noted Kashmiri Shaivite scholar of 10th century A.D., Abhinavagupta observes that

Pleasure is constitutive of rasa, and rasa is simply drama, and drama simply knowledge. (Pollock 2018: 33)

Providing a significant intervention into the debate regarding the essence and efficacy of rasa in dramatic performancein a treatise titled The New Dramatic Art, Abhinavagupta, further explains that pleasure is an important component of art (drama is just an example among similar others) but it cannot be regarded as an end in itself. Rather, it is knowledge which is the supreme essence of performance. Rasa, in his opinion, arises through a combination of different aesthetic elements which are "themselves

inseparable from instruction in the four ends of man" - love, wealth, morality and liberation. (Pollock 2018: 33-34) Since, in Natyasastra, Bharata's primary concern is the analysis of aspects of dramatic art, he extensively focuses on the performative event. Its greatest preoccupation is on showing the emotional states of characters and its transfusion on the spectators.

The principle of rasa, around which Classical Sanskrit literature/ theatre revolves, is pretty vast in its scope. During the seventeenth and the eighteenth-century rasa aesthetics were increasingly linked with religion. As a result of this notions of rasa and its emergence of rasa in dramatic context has undergone categorical transformation. However, its fundamental principles have remained unchanged during the last millennium.

**Work Cited**

Adhikary, N.M. 2007. Aristotle and the Sadharanikaran Models of Communication: A Comparative Study. Unpublished M.Phil. Dissertation.Kathmandu University, Dhulikhel.

Dalmia, Vasudha. 2006. Poetics, Plays and Performance: The Politics of Modern Indian Theatre. New Delhi: OUP.

Das, Sisir Kumar. 1991. A History of Indian Literature 1800-1910: Western Impact: Indian Response. New Delhi: Sahitya Akademi.

Gupt, Bharat. 2006 (1994). Dramatic Concepts: Greek and Indian: A Study of Poetics and Natyasastra. New Delhi: D.K. Printworld.

Jani, A.N. Ed. 1980. Natyasastram. Baroda: Oriental Institute.

Kennedy, Dennis ed. 2011. Oxford Companion to Theatre and Performance(First Edn.). New York: OUP.

Pandey, Shobhana Devi. 1996. A Critical Appraisal of Kalidasa's Abhijnana sakuntalam in the Light of the Rasa Theory. Unpublished PhD Dissertation, University of Durban, Westville.

Pollock, Sheldon Ed. 2018. A Rasa Reader: Classical Indian Aesthetics. New York: Columbia University Press.

Richmond, Farley P, Swann, Darius L and Zarrilli, Phillip B eds. 2007 (1993) Indian Theatre: Traditions of Performance (Vol. I). Delhi: Motilal B Publishers.

Ryder, W.D. Ed. 1999. Kalidasa's Shakuntala. Cambridge: CUP.

Sharma, T.R.S. Ed. 2000. Ancient Indian Literature: An Anthology (Vol. II). New Delhi: Sahitya Akademi.

---

Author: **Dr. Sib Sankar Majumder,** Assistant Professor, Department of English, Assam University.

# The connectivity and relevance of Brecht's aesthetics in Bengali Theatre

**Bratin Roy**

*" We need a type of theatre which not only releases the feelings, insights and impulses possible within the particular historical field of human relations in which the action takes place, but employs and encourages those thoughts and feelings which help transform the field itself ".*

-- Bertolt Brecht

Born on 10th February, 1898 at the city of Augsburg in Germany this prolific thinker despised the thought of compromise, even with himself. His life, ideology and it's underlying philosophical impetus saw him overcome the shackles of political and social jargon. So the contemporary German with a bout of fascism under its belt did not let him settle in his motherland. It drove him away from one corner to another in search of new language and new vision of protest against any kind of injustice that was a threat to social equilibrium and human dignity, be it the hegemony of institution or the materialisation of women. He raised his voice against the imposed theory of Aryan Supremacy, proposed by Nazi Hitler. Naturally he was blacklisted in the list of NSDAP from 1923 to 1933 which eventually led to his escape. His pen and thought always fountained to depict the expand of doom and destruction hovering over the life and living of all the progressive people across the world. He used his cerebral self to create the aesthetics of theatre and laid down the principals of dramaturgy. It was obvious that he resorted to theatre as it's the most powerful and lively medium to express life and has the ambit to hold complete gamut of human feeling, emotion and expression ( evident in the introductory quotation of this article also).

Our next prerogative should be to judge what prompted Brecht to deviate from the theatrical form of Aristotle who put more stress on symbolism and create a new language of theatre, which he fondly named 'Epic Theatre'. In order to understand this aesthetic vision we need to browse a cursory look at political and economical turmoils of Germany which then lay battered between two World Wars. Neither could the social democrates evaluate the situation with their conservative outlook nor did the Right Wing

force bring any positive approach but to instill fear and terror. The assassination of Rosa Luxemburg in 1919 finally gave birth to his undying faith in communism which in turn helped him beget an altogether new dramatic philosophy. The world was no more a happier and tranquil habitat for the sea of humanity which could find ethos of their pain and pleasure in destiny. Rather it should have been looked upon more like a bivouac which must be studded with every possible means of progressive thought so that man could reform and fight against all odds. Without cultural upliftment and restoration that reformation would not have been possible. Hence his means was theatre which he considered to be the laboratory of philosophy and a convergence of philosophers who would out of debate and discourse definitely pave a new dimension. That was the basic of dialectial materialism or dialectices which formed the core of his theatre aesthetics and manufactured a novelty through the intersection of two contradictory or opposite idea or dialect standing against the ' Great Man Theory ' propounded by Freud. Brecht raked different theatre forms all over the globe. The world famous Chinese actor Min Lung Fung equipped him with the knowledge of Chinese opera and he found striking semblance of Marxism with the doctrine of the great Chinese philosopher Mo- Tzu. Eventually he had cultivated the theory of ' Verfremdungs' or ' The distancing effect which prevents the audience from losing itself completely in the narrative instead of making it a conscious critical observer '.

Epic theatre is the literary extension of socialistic realism which stands against the naturalistic theatre of Stainslavski. Brecht always wanted his audience not to mingle with the theatre , but to remain impartial to the happiness, pain and suffering of the characters. The audience came to have that aura of bliss that surely went missing in the struggle of everyday life that offered nothing but war, fear, worry, stress and suffering. The turbulent time he represented numbed the mind of common people, it made them --- in his words----" a cowed credulous hypnotised mass incapable of political action". And the function of bourgeois theatre was to reduce mankind into it. The role of theatre is to provide that auspicious glee that we experience when we go through an epic, or wave our head with the stroke of classical song or dance. Like an epic, theatre too insinuates the unforeseen future by taking a cue in history which connects the present time by means of analysis. Man learns to look upon things with rationality and intelligence, and his tool to smoothen his vision according to Brecht was Marxism. So the aesthetics of his theatre had its ascent in Marxist ideology which tends to analyse the suffering of man on the ground of class struggle. The creative

genius inside him bloomed with seven colours of rainbow from the seed of Marxist culture. It made him to rouse emotion for the sake of igniting a critic's alacrity, which would help the audience transcend the mere pleasure of watching. Hence , he was in favour of directness, using minimal props and simple posters, masks, background scores and so on.

The greatest gift of civilisation to strengthen sharing among people is theatre which embodies visual, song, dance, poem, light and darkness and even the spectator or ' spect- actor' ( a term used by Augusto Boal ). So we call theatre to be the greatest, purest and the most complex of all art forms. We again take refuge in the clairvoyance of Brecht who expounded that theatre is for those intelligent people who do not put on their heads outside along with their hats and not for those who do not want to inspire themselves with their watching a theatre. The prevalent socio-political unrest in his country following its defeat in the World War 1 was a humiliation and penance to the German people. They were in dire need of introspection. To Brecht theatre was the means of self- analysis. There emerged his theory of alienation. He wanted theatre to explore human beings at large with the time, country and society they represented. He was akin to using songs which he opined would serve as a welcome break to audience and give them a chance to make them alienate from the dramatic proceeding and let them analyse rationally. This broader perspective of theatre lies captured in the coinage 'Epic Theatre ' which is not meant to refer to the scale or the scope of work, but rather to the form it takes. Epic Theatre emphasises the audience perspective and reaction to the piece through a variety of techniques that deliberately cause them to individually engage in different way. The purpose of Epic Theatre is not to encourage the audience to suspend their disbelief, but force them to see their world as it is. So he manoeuvered his own language of theatre which was nothing but a revolution to him. It was more like a holy place where every kind of discourse and critique merge like tributaries to form a new stream of idea having its root in Marxism. Quite naturally his Epic Theatre does not tread on a linear way to climax, rather every scene of it is complete. Brecht formed his language first by ransacking the Chinese theory of drama---it also needs a detailed study which would definitely be an aberration to the current topic --- and thereby deeply studying and imbibing the core essence of Sanskrit plays.

Before entering the periphery of the adaptations of Brecht in Indian , to be more precise, in Bengali theatre zone, this meticulous yet brief focus on the philosophy and language of Brechtian theatre was essential not only to succour the inspirational flight of the great ideologue, but also to acquire

the desired ability to extrapolate the necessity and relevance of Brecht in Bengali theatre. Throughout Asia, many dramatists and theatre groups were attracted to Brecht's work as they found the techniques of 'dialectical theatre ' useful in articulating a criticism of the existing power structure. It shifted it's epicentre from the western theatre of 1940s and 1950s to Asia by the beginning of 1960s. Though from early 1930s Brecht's plays like 'Drums in the Night' and 'The Three Penny Opera' were staged in Japan and in China and the eminent theatre director Huang Zuoline played a significant role in popularizing Brecht, the fundamental ideas were known to a small group of Chinese and Japanese artists. It got its momentum after the Second World War( 1939- 45) under the inspiration of Tian Han, the chairman of Chinese Theatre Association, when a number of notable texts of Brecht ( both dramatic and theoretical)were translated in Chinese. After the Chinese cultural revolution (1966-76) Chinese theatre artists endeavoured to reinvent Brecht by adopting a presentational acting style, episodic structure, the dialectical juxtaposition of disparate ideas and elements, with an objective to present ' theatre as theatre'. Taking a cue from the popularity of Epic Theatre in South- East Asia , Brecht reputation grew in the Indian subcontinent too. Friz Bennewitz (1923-95), the noted German artist practicing Brechtian theatre in India for over a decade( we will again discuss his role later in this article) has identified three distinct phases in the growth of Brecht 's popularity in India. The first phase ensued with K.R. Weiler's lucid exposition of the fundamental concept of Epic Theatre which she presented as a conference paper in a theatre forum organised by the IIT Delhi in 1960. The second phase coincided with nationwide tour programme of the artists of NSD in 1971 and the third phase began from 1975 when Brecht's plays proliferated into the vernacular theatre apparatus of the country. The theatre directors of Sangeet Natak Academy in the likes of Habib Tanvir and other theatre artists, to name a few of them were MS Saathya, M.K. Raina --aimed to create a new theatre 'idiolect', ' a new form' by mingling the 'foreign with the native'. After India's independence the pattern of oppression unleashed on the sub-alterns changed. Society began to experience social injustice where rulers altered, but no alternation was noticed in the agony and plight of the people. So a cultural renaissance was intended to be aroused in the psyche of the common people all over the country with the help of a new theatrical language and expression. The necessity of delving deep into the root therefore seemed inevitable. Habib Tanvir firmly believed if Indian playwrights evolved a truly indigenous theatre it would be very close to Brechtian theatre since it imbibed the folk and classical tradition of a race and nation.

The advent of Brecht's play in Bengal particularly in Kolkata did not also take place abruptly. Rather it was dated back to as early as 1940 when Arani, a Kolkata based little magazine, published translations of a couple of scenes from Brecht's 'Fear and Misery of the third Reich'. But the earliest production of a Brecht play in Bengal might possibly be alluded to an adaptation of 'The Exception and the Rule' in way back 1930. It was also the first of Brechtian play translated in bengali by the theatre and film maestro Soumitra Chattopadhyay. It was staged by the Class Theatre in 1979 in Kolkata. During the last five decades of twentieth century altogether thirty three plays of Brecht were performed under the aegis of Group Theatre in Bengal and half of them were adaptations. Some noteworthy Brecht's plays that were staged in Bengal were 'Life of Galileo ', 'The Good Person of Szechwan', 'The Resistible Rise of Arturo Ui', 'The Caucasian Chalk Circle', 'Pantu Laha'( Herr Puntila and His Hired Man Matti), 'The Last Seven Days of Julius Caesar'( based on a short story Caesar und Sein Legionar), 'Vision of Simon Machard', 'The Seven Deadly Sins of Petty Bourgeoisie'. Some major Brecht adaptations in Bengali like Bibhas Chakraborty's 'Panchu O Mashi' (1972) and Shekhar Chatterjee's 'Pontu Laha' (1975) were appreciated for incorporating ' local touches, without obscuring the storyline '. In an impressive review published in The Statesman on 19th January, 1975 about the Theatre Unit Production ' Pantu Laha', it was opined that "Mr. Chatterjee appreciates the dialectics of Brecht's artistry. Had he not consulted the 'Theaterarbeit' account of the 1949 Berliner Ensemble production, the script would have driven him towards symbolism. The ' in vino veritas' theme (which propounds that a person is more truthful when inebriated) reinforces the Marxist thesis that no man can be good under the present social order. But Brecht, the director knew that theatre had no use for abstractions and that laughter could be more serious than tears. He brought back the earthy, bawdy humour of the ' Volksstueck (folk play)". About another Brechtian classic 'Three Penny Opera' which was produced by Nandikar in 1969 and adapted and directed by Ajitesh Bandopadhyay, the reviewer Ashish Barman wrote in a periodic magazine named Link that, "The task of transforming 'Three Penny Opera' into 'Tin Poisar Pala' in a way is no less difficult....it stems largely from two sources ; one the strange operatic style and the other the strength and lyricism of its verse.....the dancing and singing in this play are not elements of relief and entertainment by themselves. They are a part of unfolding of the drama and it's significance...... Ajitesh, who has adapted, acted and directed the play has brilliantly resolved this problem of retaining the vitality of the verse and its integrated structural quality by seeking the help of Bengali folk sources. He has retained and blended , it seems, the

forms of Khemta and Alkap, both musical and dramatic simultaneously and has distilled out of their blended structure in sophisticated half- operatic form for himself ". On the other hand certain critics like Dharami Ghosh came down heavily on this production calling it a 'travesty of Brecht'. He said, "Ajitesh Bandopadhyay deviated so much from Pirandello (Natyakarer Sandhane Chati Charitra) and Brecht (Tin Poisar Pala) that his version became originals in a derogatory sense".

In December 1986, Theatre Unit's Production of Pantu Laha was staged in Hongkong during a symposium of International Brecht Society under the direction of Shekhar Chatterjee. His maiden Brecht Brecht production 'Arturo Ui' in 1972 had a dismal production record. He confessed that although the maiden productions of the play were well received by the city spectators, it failed to generate any response among the rural spectators. As a play it rose from the sheer economic crisis and internal feud among the rich countries brought about by fascism and spoke firmly against the classical form of fascism which only imposed a heavy obstacle on the lives of common people. "The ironic didactism and ideological clarity that Brecht had also shaped neatly into the productional design". Still Chatterjee preferred dropping such a relevant and significant production because he thought, "it was no use doing it for the city elites who are conscious of these facts but will do nothing. At best they will praise my play, discuss the aesthetics, discuss alienation and snore at home".

According to aesthetics of Brecht dramaturgy, " the culture and society in which a theatrical event occurs always need to be considered. What kind of plays are most likely to get produced and why? Who is making this decision? Are certain segments of society overlooked because their concerns are not addressed?" asked Jaffrey Leptak Moreau, the Director of Education, Educational Theatre Association. The philosophy of Brecht's theatre apart from its stem in Marxism, had its foundation in Expressionism which emphasizes the role of emotions in theatre. In this school of thought, the theory became a prominent visual arts movement in Germany during the time of the First World War(1914-18). German expressionism basically asserted that the intention is not to reproduce a subject accurately, but instead to portray it in such a way as to express the inner state of the artist and awaken his creativity with a vision of novelty. So Arun Mukherjee, the Bengali Thespian, got his much needed ideological incentive which he expressed during an interview with Seagull Theatre Quarterly : "All my plays -- whether adaptations or originals -- have not been directly political. But the more experience I have accumulated, the more I have realised that

a rich political insight is an essential condition for a good play. How the political dimension will come through is of course another matter. Brecht brings it in, in a certain manner". His 'Mareech Sambad' (1973), 'Jagannath' (1977), Asit Bose's 'Kolkatar Hamlet (1973), Utpal Dutt's 'Barricade' (1972), 'Duswapner Nagari' (1974) are some important plays which borrow heavily from Brecht. Let's take a very brief pause to the discussion of Brecht's production details in the arena of Bengali Theatre just to reaffirm the influence of music and its aesthetics on Brecht's play. Brecht infused musical elements --where we already put our light before -- in the play 'Mutter' (1932) which was adapted from Maksim Gorki's novel with Eisler composing the musical lyrics. 'The Rise and Fall of the City of Mahogony', like 'The Three Penny Opera', too made in cooperation with the famous composer Kurt Weil turned out to be a very successful musical. The jazz elements and the rebellion music used in both of the plays concretised his thoughts and created a negative Utopia of the capitalistic public. Keeping the above feature of Brecht's Theatre aesthetic in mind we now come back to our present discussion. Arun Mukhopadhyay translated and directed 'Maa' (Mother) in 1982 under his production house Chetana. This play had a very important role in rousing consciousness of the working class people and taught them to rise above the obstacles they faced in organising their movement. In that sense it could be reckoned as a 'didactic play' , an elementary lesson on class struggle. As it was an immensely popular and widely read story of Maksim Gorky, bengali theatre groups like Ritwik, Rangakarmi and Chhandik staged it's Brechtian version along with Chetana. In its Rangakarmi version, directed by M.K. Raina, one of the chief exponent of Brechtian Theatre in our country, this play flowered with all the components of copy book Brecht. In a comprehensive review published in the Business Standard in 1983, it was penned that, " Raina's treatment of this production, true to form is direct and earthy. The choreography is so organized that there is not one unnecessary movement. The set is Spartan. The songs set to tune by him become an intrinsic, desirable part of the play. The production stands out in its simplicity. The free-flowing rhythm is relentless and never veers from its objective. The rapport with the audience is immediate". This was what the book of Brecht's theatre aesthetics would have liked ; the music and song carrying forward the proceedings, a prominent political ideology flowing under the Brechtian oeuvre, and an instantaneous participation of the audience which helped them alienate in the next moment with the profundity of self-awareness.

Another significant Brecht's classic was 'The Caucasian Chalk Circle'

(the Bengali adaptation by Rudraprasad Sengupta under the banner of Nandikar in 1978 was named Khadir Gandi) which upheld the true fervour of Bengali theatre directors for Brechtian dramas. Brecht here adopted the oriental tale of the Chalk Circle to mediaval Georgia. An army rebellion banishes the governor of a city whose wife escapes in fear forsaking her baby son behind. Her maid, looks after the child, finds a father for it and disputes possession of it with its mother who now returned to power after the revolt is quelled. The judge rightly gives the child to the maid as Brecht believed that each thing belongs to one who can do it the most good. But the improvisation in the final scene was a master stroke of the director Sengupta who quite effectively and with relevance merged it with the slogan : Land belongs to him who ploughs it with his labour. Sounds familiar, isn't it, even in the modern perspective of Indian polity and economy? Then we had Badal Sarkar, the legendary proponent of 'Third Theatre', who in his production has decided not to follow the Berliner Ensemble and the textbooks. He said, "There is nothing Brechtian about my production. I have respected to text, but the production is mine own". What follows is a quote from a review ( published in Debonair in 1978) which aptly champions one of the best expositions of Brecht's theatre aesthetics in Bengali theatre. "And so it is. A bare arena in the Theosophical Society Hall , no lighting effect, not more than a 100 spectators allowed. He has made full use of loose poems, body language and superb timing to carry the rhythms of the play.......His greatest triumph lies in the use of musicians/ singers who in the play have the role of chorus/ narrator/ sutradhar. A long established tradition of the Brecht theatre makes this a distancing device to cut the cord of empathy.... The singers magically fuse into the texture of the play, they establish a special kind of empathy both with the players and the audience. This is enhanced by the frequent change over between the roles of players and musicians".

During the last phase of Brecht's encounter with Bengali theatre, a few prominent theatre personalities like Fritz Bennewitz, Carl Weber, Gunter Grass performed Brecht's plays in Kolkata. The most significant of these productions were 'Biplober Mahada'( The rehearsal of revolution) in 1987 under the direction of Gunter Grass and an adaptation of one of his short stories titled 'Julius Caesar and his Ligonier' as 'Julius Ceaserer Sesh Sat Din' (1983). Such productions incorporated essential ardour and aplomb in the minds of the theatre loving youth to interpret Brecht and his theatre from an entirely new perspective. Whereas during 1960s Kolkata witnessed the premise of as many as Eight Brecht's plays, during 1970s the number

rose to sixteen. Again the last phase of Brecht's craze during 1980s and 1990s that we are discussing right now witnessed the birth of another fourteen plays in Kolkata. Apart from eight different adaptations of the Caucasian Chalk Circle by different groups starting from the year 1968---We have already had a brief discourse about two of them ---( 'Caucasian Chalk Circle', produced by Sandhyanid, directed by Ashok Sen, 'Adalat theke', produced by Sayantani, directed by Mihir Chattopadhyay, 'Khodir Gondi', produced by Nandikar, directed by Rudraprasad Sengupta, 'Khodimatir Gondi', produced by Theatre Front, directed by Subrata Nandi, 'Gondi', produced by Satabdi, directed by Badal Sarkar, 'Muskil Asan', produced by Masquerade, translated by Pranab Ghosh, 'Gondir Khel', produced by Minarva Repertoire Theatre, directed by Arun Mukhopadhyay), six different adaptations of 'Life of Galileo and as many as sixteen adaptations of the 'Exception and the Rule' and eleven adaptations of 'The Three Penny Opera' were performed during the period of 1960s and 2020s. Those popular adaptations together with Bibhas Chakraborty's 'Schweik Gelo Juddhe(1981) and Rudraprasad Sengupta's 'Sankhapurer Sukanya' (1990) that went on for more than one hundred performances across the city, conferred a 'cult' status on Brecht in Bengali theatre in 1980s and 90s. An article published in the magazine Enact in 1979 declared Bertolt Brecht to be "the epitome, test and symbol of progressive culture" for Bengali theatre practitioners. Under this radius of the sparkle of Brecht came those luminaries like Bennewitz, Weber and Grass. Besides giving a new perspective to the interpretation of Brecht, it also helped in providing the insight that could be sought in Brecht even without using the tinted glass of leftist politics. Nilkantha Sengupta's 'Julius Ceaserer Sesh Sat Din', produced by Theatre Commune in 1983,is one of such ingenious experimentation where Sengupta scampered through many other famed texts including Shakespeare's 'Julius Ceaser' to considerably transform the accounts of Ceaser incorporated by Brecht in his short story from where he adapted it. It was a conscious deviation from conventional Bengali history play. In this play, the playwright attempted to conform to the fundamental notion of Epic Theatre adhering to subjective reality. In a typical Brechtian fashion, Sengupta used commentary, drum beats, lights, stage crafts and hand-held posters with almost naked simplicity to indicate the difference between shifting scenes. But what seemed very interesting was Sengupta's considerable departure from Brecht in creating an atmosphere full of dramatic intensity which set the movement of the play in order leading up to Ceaser's assassination.

On 27th July, 1997 Nandikar produced a play titled 'Brechter Khonje'

(In search of Brecht) in Kolkata as a part of its Brecht Centenary Celebration. Rather than staging a play by Brecht, the group attempted a documentary drama on Brecht, the man and his work to "encapsulate historically, humanistically and dramatically the journey of a great man", says Rudraprasad Sengupta, the director. He also said "We have tried to discover the organic and wholesome Brecht instead of continuing to perpetuate the Myth of a three-some Brecht consisting of an anarchist, a Marxist and a mellow humanist". Thus 'Brechter Khonje' becomes a dramatic montage comprising his songs, excerpts enacted from the playwright's significant plays such as 'The Life of Galileo' and 'The Good Woman of Szechwan', recitations of his poems, letters and other writings with a view to exploring the aesthetics of the great man which ran through his veins and built his philosophy of theatre. The performance began with Arun Mukherjee's production of 'Maa'(1982), but the momentum of the play was erected around the enactment of a series of excerpts from other Bengali production of Brecht's plays like 'Tin Poisar Pala' (1969), 'The Life of Galileo' (1980), 'Sankhapurer Sukanya'(1990), etc. However, the most interesting aspect of Nandikar's 'Brechter Khonje' was it's excellent dramatisation of the famous inquisition of Bertolt Brecht by the officials of House Un-American Activities Committee. Infact, it was the 'inquisition' episode which placed the production into its proper socio-political context. A theatre critic in a review on this production for The Statesman said, 'Brechter Khonje' was an " excellent introduction for the new generation of theatre goers. For a generation of theatre spectators which was born after the war, and whose ideas about Nazi extremism, the socialist reconstruction of Europe, the cold war and the volatile Naxalite Movements of the 1970s were formed largely through reading of books, the dramatic representation of Brecht's 'inquisition'had been a stark reminder of the strained socio-political circumstances in which Brecht lived and practiced his art. But more importantly, 'Brechter Khonje' was also an elaborate reminder to the spectators of Group Theatre of the circumstances in which Brecht appeared so relevant to Bengali Theatre".

And he remained so even after many years passed by from the time which he encaptured in his creations. World War might be over, Naxalite movement might not frown at us menacingly any more, but the imprint of time on the present ages bears the same agony of oppression and socio-political injustice. Life has changed by dint of technological advancement, yet the crisis of not understanding each other deepens. In one of his famous poem, Chilian poet Pablo Neruda introspected,

"If we are not so single-minded
About keeping our lives moving
And for once could do nothing,
perhaps a huge silence
might interrupt this sadness
Of never understanding ourselves
and of threatening ourselves with death".

The aesthetics of Brecht's philosophy, the driving force of his passion for theatre do enable us to overcome that sadness which befalls largely on humanity today. The practice of his plays, the discourse on his theatre prodigy in Bengal too is a mere continuation of his journey which will definitely curve a niche to reveal the cultural layers involved in the process of adaptation of foreign plays for the native spectators. Here lies the relevance of this legendary artist who keeps providing us the moral, ethical and intellectual incitation for a better tomorrow.

--------o--------

**Reference :**


1) Brechtian Adaptations in Bengali Group Theatre : Nuances and Controversies Sibsankar Majumdar
2) Brecht's 'Epic Theatre' : Representation in Bengal and Beyond. Sibsankar Majumdar
3) Bengali Theatre (200 years) Utpal K. Banerjee
4) Bangla Natya Samolochonay Brecht --- Dr. Ashish Goswami
5) Selected Essay --- Buddhadeb Bhattacharya
6) Poems and Songs of Brecht -- translated by Alok Ranjan Dasgupta
7) Theatre Organum of Bertolt Brecht -- translated by Niharranjan Bag
8) Collection of Prose ( Godyo Sangroho) -- Ajitesh Bandopadhyay


Author : **Bratin Roy,** Theatre Personality, Kolkata.

# Propaganda, Crisis, and Catastrophe in Dawn King's Dystopian Play "Foxfinder"

**Anik Sarkar**

**Abstract:** The paper analyses Dawn King's 2011 play *Foxfinder* as dystopic by identifying it with tropes commonly associated with the genre. It explores the concepts of propaganda, repression of identity, and state-induced oppression through the "otherization" of foxes. Through the study of the characters, the paper also discusses how the mass propaganda affects the livelihood and sustainability of people thrusted towards an ecological and socio-political catastrophe. Additionally, the allegorical undertone of the play is explored by looking at the agenda of training and employing state-inducted agents called Foxfinders.
**Keywords:** Propaganda, Catastrophe, Ecology, Identity, Dystopia

Although a large body of fictional work is associated with the notion of dystopia, very little has beenproduced on the idea of the dystopian theatre- be it as performance or as a discourse for research. Dystopia is the conjoiningof two words, "Dys" meaning bad and "topos" meaning place,which refers to the imagining of a world gone wrong.Dystopian societies reflect the overturned, radicalised utopias that enforce and subjugate individuals so that an adherence to dictated forms of behaviour, homogenised patterns and docile livelihood is maintained. Dystopias paint a bleak picture of human societies and are often overblown outcomes of measures that went haywire. They are zones of reflections for understanding how unrestrained science, biopower and control-politics distort human cultures and violate freedom, being the blueprint of authoritarian societies that conserve the asymmetrical structures of power. Recently there have been a number of plays dedicated to what could be identified as "dystopian" with tropes such as gradual annihilation of society, extreme governmental control, total surveillance societies, dehumanising oligarchy, human-induced disasters including climate catastrophe, and on unrestrained science.

In the 20th century, the devastating world wars, crashing economies, authoritarian societies, turbulent phase shifts and mass genocides facilitated the inception of dystopic ideas as part of an increasing socio-political consciousness. Zamyatin's *We*, Huxley's *Brave New World*, Orwell's *Nineteen*

*Eighty-Four* were some of the earliest works that represented the bent and twisted forms of societies that although were catering tomass populations but wereunready and too deeply ideologized in their convictions to notice the shifting grounds, underneath. In recent times, there has been a spike in the "performance" of dystopias on screens-a number of films and TV shows that centre around societies that. Shows like *Black Mirror, Altered Carbon, Westworld* have become immensely popular while films series such as *Blade Runner, The Hunger Games*, and *Mad Max* have received cult status. In novels too, we find a surge of popular dystopian titles that have been racking the bookshelves: Cormac McCarthy's *The Road*, and Emily St. John Mandel's *Station Eleven* and SamitBasu'sChosen Spirits. Dystopian architecture with fallout images, skeletal remains in the sand, old, desolated buildings and monuments in the middle of arid wastelands are abundant in the digital Artscape. A strange fascination has arisen for post-apocalyptic aesthetic in our collective cultural spaces, as when in the 1960s there had been a cultural boom surrounding space-tech and NASA.

In Dawn King's 2011 play *Foxfinder*, we find disillusioned characters striving to survive in what appears to be England's battle with climate change and food deprivation. The play describes a state-induced agent called Foxfinder whose task is to examine the causes of poor harvest amongst the farmers and report anomalies. The Foxfinders are said to be trained at a young age by priests, and their entire lives are to be devoted to the nation's well-being, while abstaining from having proper families, drinking andtemptation. The play is about a countryside plagued with crisis and shortages: food is not plentiful; lives aren't safe and the future isn't bright. The farmers are having bad harvests, while they are also battling personal and familial shortcomings. Performing dystopias at a time of ecological crisis especially after the advent of global contagions adds newer paradigms on how we look at what is termed as "eco-drama", although *Foxfinder* combines political sub-texts that also aligns it with the classics of the dystopian genre. As Meisel observes, "King's play is determined not to be a genre piece, but rather a serious investigation of mass hysteria and its impact on individual autonomy, though she respects the form enough to be careful not to violate it. Her manipulation of symbols is intelligently handled, and her political and psychological points are neither overly muted nor overtly preached" (Meisel).

**The Tropes of Dystopia**

One of the most well-known dystopian novels is George Orwell's *Nineteen-Eighty Four.* In the novel, we find several tropes that could be identified as signifiers of dystopias: surveillance, propaganda, political oppression and censorship. Similar tropes can also be found in *Foxfinder.* The state agent called William is himself, the figure of surveillance: through a detailed survey of the fields and homes of those under suspicion, a report is to be framed. The fact that the state already knows details regarding the status of the families prove that they are under a state-induced surveillance, even though they live far away from the mainland. The Foxfinder Samuel, asks uncomfortable questions to the family who are pressurised to give away information, confirming the suspicion. He also scans their homes thoroughly, like a detective, pondering over objects and assessing the fields through a detailed scrutiny. The surveillance trope is best realised when William produces the anti-state pamphlet that Sarah had given Judith, which he acquired by searching in the pockets of her dress.

We also see the layers of propaganda that has been inducted in the society through a well-dispersedbrainwashing. The propaganda is a powerful tool used to sabotage reasoning through absurd hypothesis that has little or no basis in reality. The superficial layer of propaganda begins to crumble as the characters begin to question their reality, although the faith in their system is so sturdy that it is hard to completely eradicate. Political oppression is also witnessed in the play as we see that the characters have to follow strict orders from the government-they are threated to work in a dehumanising factory if their lands are seized which is sought to drastically reduce the lifespan of Sarah's husband. June Xuandung Phamin "Dramaturgies of Contagion in Contemporary British Speculative Theatre" states that both, Dawn King's 2011 play *Foxfinder* and the 2016 play *Human Animals* by Stef Smith explores the common mechanism between immunity and contagion as well as the immunitary paradigm that proceeds to "violent excess", asthe two plays show the permeable borders that separate categories such as presence and absence, the human and the non-human, cause and symptom-boundaries that serve as justification for injustice and violence-by breaking the audience's expectation in a classic outbreak story (Pham).Political oppression and censorship go hand-in-hand as one revitalises the other, as in, through the ideology of the state there are things that the people can and cannot do. There is a censorship on sympathy towards foxes and this strengthens the oppression on the masses when their lands are seized on a suspected contamination.

**The Deeper Implications of Propaganda**

The foxes are portrayed to be malignant and evil, carrying out deadly work unseen at night. They are also said to have influence over weather and can induce blights and droughts to ruin crops. Along with that, foxes are thought to cause fires, carry parasites, dangerous diseases, has the ability to confuse and "send visions to the mentally unstable and disturb the dreams of the weak" (King 38). It is also said to influence good people into becoming fat, lazy alcoholics or sexual perverts.The ideology of using foxes as a source of evil could have multifarious reasons in the play. Firstly, as Sarah pointed out, foxes were nearly extinct in England, and as per the evidence produced by all the characters, no one had seen the foxes anywhere around the county. The only evidence of having seen foxes were given by the trainers of William, who themselves were the sources of ideological implementation. The near extinction of an important animal also sheds light on the mismanagement of the state as well as drastic shifts in the ecological cycle since species extinction affects the food chain. The widespread agricultural crises also point to severe shortages of food, such that the state has to sponsor agents to seize agricultural lands. This is so that they become part of the state and not the individual properties of farmers, whose lands can be seized and run by those in power. Since independent farming is a sustainable way of living wherein individuals are not dependent on the state for their livelihood, the control over food at a time of severe crises is one way to assert dominance and supremacy over people's lives. The foxes as a sign of corruption can also be used to coverup the administrative and bureaucratic failure, or in other terms the failure of the state-this way a politics of distraction is fabricated and invoked by displacing it on the evil doings of the mythologised animal.

Similarly, the play incorporates speciesism to create a divide between the human and the non-human, staging the anthropocentric bias that has been a core concern for how related actions have accelerated species endangerment and extinction across the $20^{th}$ and 21 centuries. Leila Michelle Vaziri states that the staging of disgust is used as a means to demonstrate how humans bring down nature and animals to something infectious and inferior: one specific animal is transformed into a repulsive object, acting as a stand-in for the divide between humans and nature and, in doing so, it creates a rift between these relations, redrawing the lines that divide and, in that process,increasing the feeling of human isolation (Vaziri 232).The otherization of the fox in that manner induces a feeling of disgust, intolerance

and blindness, which paves way towards hatred for the species as first denoted by William, through this routinised revision of the doctrine that he summons time and again, treating it like a holy book. Later, the disgust and hatred for the animal passes on to Sameul, like a contagious practice-a propaganda that latches on to people as they begin to see the signs when they start to believe in the doctrine. William also convinces Samuel that the foxes were the reason for their son's demise as they have a telepathic ability to be able to lure people to their death. Interestingly, it is through the aid of propaganda that the Covey family is able to upturn the grave murder of a state appointed Foxfinder, to an act of treachery-by labelling the Foxfinder as a collaborator: "I'll tell them all right. How he didn't want to search the farm properly. Kept making excuses. Didn't want to go to the woods, because he knew where they were hiding" (King74). Propaganda then, becomes a tool for political suppression as well as a defence against the very forces which birthed it.

**Repressed Identities**

The dystopic circumstances reduce people to subjects, as their freedom is supressed through totalitarian ideologies and their fuller selves are not realised under political subjugation. All the characters undergo a form of repression when it comes to their identities. Repression is defined as "the unconscious blocking of unpleasant emotions, impulses, memories, and thoughts from your conscious mind. First described by Sigmund Freud, the purpose of this defence mechanism is to try to minimize feelings of guilt and anxiety" (Cherry). Under the fear of losing their land to the state, the Covey family is not welcoming enough to William. The husband, Samuel, is seen to be a "rude" and serious figure, not allowing a sense of comfort to settle within William. Judith on the other hand is seen to be fostering a softer side, although she too is afraid of the consequences of getting their land seized and believes that foxes are evil. When Sarah shares a pamphlet which states that foxes are almost extinct in England, she replies "That's wonderful!" (King 22). Sarah too, in confrontation with William portrays a two-faced role: she appears to have respect for William, while on the other hand, she is also warningSarah about the danger that prevails if a Foxfinder is suspicious. William is a deeply repressed character, who even though is smart to note the facts and deduce connections, fails miserably to shed off his deep ideology. Much later in the play, he is able to realise that foxes are a part of collective indoctrination, and just like the character of Samuel, the society had been taught to imagine their presence even if no one can see them. This also cracks his long-held morality, which he safeguarded using

the whip as a form of purgation. When William's reason starts to get better of him, his urges and desires which had been long supressed, is also unleashed on Judith as he makes a pact with her. The theme of nature versus civilization is brought at loggerheads at this point since his untamed animal nature breaks free from the civilized, crudely tamed, and deeply ideologized self, although this violent repercussion is met with an equally violent deed from Samuel's end who shoots him in the chest.

Samuel's identity is the most severely affected one in the play as he undergoes a radical transformation, once he starts believing that foxes are evil, and they were the reason why his son had died. Samuel starts hallucinating foxes on his field and starts shooting and chasing after them. At the end of the play, the defiling act undertaken by the repressed character of William gives way to Samuel's outburst and misidentification. His shooting of William culminates into an act of vengeance and the eventual resolution- both for his wife and departed son.

**Catastrophe and Crisis**

Climate change is a serious concern for the times that we are living in. There are multifarious reasons that affects climate change, and many dystopian narratives of today be it in the written format or through performance have depicted the interconnected forces that result in climate change. Similarly, there are several instances of an impending catastrophe and crises that surround the play. Being thematically classified as a dystopian play, the sense of foreboding and crisis is invoked right in the onset, as both the characters, Samuel and Judith discuss the terrible harvest and bad weather that had been adding misfortune to their table. The atmosphere is similarly developed, to demonstrate an unsettling, catastrophic setting ruining many aspects of their day-to-day lives:

> *The rain batters against the windows.*
> Listen to it. It's stupid travelling on a day like this.
> JUDITH. He'll be soaked. And frozen(King 7).

Catastrophe is built into the heart of the play, as there are various forms of it that underlie its allegorical tone: firstly, the climate catastrophe is hinted at time and again through the characters' disgust with untimely weather change and damaging of crops elsewhere in the nation, signalled by a mass food crises. Secondly, the catastrophe is on the level of extinction of species hinted by the invisibility of foxes, which is only explained through the notion of foxes being "sly" to avoid notice. As Leila Michelle Vaziri observes:

> The fox stands for the degradation of nature to something fearful, contagious, and disgusting, and it opens a binary structure that separates humans from nature and that sends William into a war-like state in which his life is restricted to fighting and killing a hallucinated enemy, set up to assure that he neither questions the Institute that "educated" him, nor the government that employs him (Vaziri 2022).

Thirdly, the catastrophe is at a political level, demonstrated by the state-sponsored propaganda, the seizing of land, the training of Foxfinders like William and equally naïve citizens who support their ideology. Fourthly, through the characters of Samuel and William, we see the presence of mass psychosis and breakdown of morality persistent in the system: Samuel loses his mind at the end of the play, haunted by a consuming grief and equally lured into the propaganda which makes him commit a crime. On the other hand, William who was supposed to be a state-representative and upholder of morality, takes advantage of Judith and her familial crisis.Additionally, the play hints towards the culmination of catastrophes towards an annihilation as all of these factors bring into focus an impending crisis of sustainability in the Capitalocene.

**Works Cited**

Cherry, Kendra. "How Does Repression Work in Our Unconscious Mind?" Verywell Mind, 2022. www.verywellmind.com/repression-as-a-defense-mechanism-4586642.

King, Dawn. Foxfinder. Nick Hern Books, 2011.

Meisel, Myron. "Foxfinder: Theater Review." The Hollywood Reporter, The Hollywood Reporter, 14 Jan. 2014, www.hollywoodreporter.com/lifestyle/lifestyle-news/foxfinder-theater-review-671065/.

Pham, June Xuandung. "Dramaturgies of Contagion in Contemporary British Speculative Theatre." Sillages Critiques, no. 30, 2021, doi:10.4000/sillagescritiques.11483.

Vaziri, Leila Michelle. "Alienation, Abjection, and Disgust: Encountering the Capitalocene in Contemporary Eco-Drama." Journal of Contemporary Drama in English, vol. 10, no. 1, 2022, pp. 231-246., doi:10.1515/jcde-2022-0015.

Author : **Anik Sarkar,** Assistant Professor at Salesian College, Siliguri.

# Anger of a Partisan : Reading Sarah Kahn's Political Practice as a Counterpoint to Jimmy Porter's 'Apolitical' Tirades

**Srutayu Bhattacharya**

Entry number one of Merriam-Webster defines 'anger' as "a strong feeling of displeasure and usually of antagonism". Post-Second World War British plays often use the expression of anger as a theatrical tool to provide a general depiction of the gradual disillusionment of their contemporary society. In John Osborne's play *Look Back in Anger* (1956), the protagonist Jimmy Porter, a first generation youth of war years, makes an eruptive appearance on the stage with his capricious outrage.In Arnold Wesker's play *Chicken Soup with Barley* (1958), Sarah Kahn, the female protagonist, too appears to be angry, however from a radically different political position. This paper aims to investigate the fundamental dissimilitude in how anger functions as a constituent of their politics. While Jimmy has been portrayed as a non-activist individual with a working class past, Sarah Kahn is a working class activist with affiliation to a communist party. There is lack of study comparing these two texts vis-à-vis the politics of anger. Anger has often been explained in forms of sociological, psychological as well as behavioural expression of emotions where the 'political' remains uncultivated. The present paper will focus on a frameworkcombining a certain politicized sociology of anger proposed by Mary Holmes (210) and the discourse of partisanship of the communist parties. This theoretical understanding will attempt to situate the characters within definite political positionswhile analysing their anger.

'Anger', according to Holmes is not necessarily "emancipatory" but "ambivalent" as it "is part of a politics of struggle that takes place in/ between and through space/time and bodies" (211). Also, ambivalence of anger can be analysed in terms of socio-economic contexts (Holmes 212). Anger's involvement as "situated actions" in relation to "specifically located power relations" (Holmes 211-212) can also offer significant light on the political struggle between the individual and the society. Thus anger, just

like politics, always remains in movement (Holmes 212).

Ambivalence of anger is clearly manifested in Jimmy Porter's pent up outbursts throughout the play. His fulminations against the contemporary society, its law, various establishments like religion, education system, morality etc situate him within a political spectrum of negotiation. Jimmy's conscious yet emotional tirades also locate him within another ambit of rationality whereas his inaction turns him into a modern middle class Hamlet-like figure (Dyson 125). Although Raymond Williams perfectly points out the "social criticism" especially staged through the tool of Jimmy's anger, he notices the general setting of irresolution there- Jimmy Porter is raging at himself, through the raging at others and at an intolerable general condition. The sickness of a society is re-enacted in this particular enclosed form, as the sickness of available relationships of this sick man at their centre" (Williams 130)

In this regard anger cannot be emancipatory at all. Jimmy's anger is also built upon misogyny. While trying to trace the root of his misogynistic abuses towards Alison,Roy Hussproposes a psychoanalytical model that diagnoses a certain "pre-Oedipal neurosis"-it stimulates Jimmy's vexation in relation to his past, i.e., his traumatic relationship with his mother (Huss 139).Holmes's comment in this regard is effective in understanding Jimmy's political fallacy-

Neurotic anger is a misrecognition of the origins of the emotion brought about by mythologizing the past. It cannot be transformed into effective political action because it is directed at an essentialized enemy 'other'. (Holmes 217)

The political quotient of Jimmy's anger can further be measured in the backdrop of the bigger political circumstances of the time. In 1951 the Conservative Party returns to power and retains the Labourites' reform policies towards a welfare state. However, the claim of effectuating an affluent and prosperous society appears to be fictitious. Jimmy Porter, a youth of this period, embodies the political disillusionment of his generation. Despite getting benefit from the free Education Act of 1944, the educated youth from the working class background suffer to procure a steady respectable job. Jimmy's rhetoric comes out as an expression of a man in a political void-he feels that there are "No beliefs, no convictions and no enthusiasm" (Osborne 14) as "there aren't any good, brave causes left"

(Osborne 73)to fight for. This tendency suggests a leap of political class consciousness-despite belonging to the working class, the university education has situated Jimmy within a different class fraction, precisely within the radical post-war intelligentsia that belongs to "no social group which might lend him stability" (6) as put by Kingsley Amis in his *Socialism and the Intellectuals*. Amis feels "How agreeable it must be to have a respectable motive for being politically active" (13) though they are aware of the exploitative conditions of the society. Here comes the question of forming the nexus between theory and political practice which according to Antonio Gramsci can be established within the structure of a party, as a historical process by unifying the mass and the intellectuals. Jimmy being a part of such a clueless intelligentsia can't relate to the collective cause. Jimmy Porter's tirades towards different sects of society and abusive behaviour towards the women (including his wife Alison) definitely stem from a philosophy but again it lacks the 'critical labour' as described by Gramsci. Gramsci says in his 'Study of Philosphy'-

How is it possible to consider the present, and quite specific present, with a mode of thought elaborated for a past which is often remote and superseded? When someone does this, it means that he is a walking anachronism, a fossil, and not living in the modern world, or at the least that he is strangely composite. (Gramsci 324)

Helena notices Jimmy's out of place existence as she tells Alison "he was born out of his time" (Osborne 79). This is the root of Jimmy's futile 'political' anger that according to Michelene Wandor, is "displaced" -

…firstly, his energies are expended totally on his interpersonal relationships; and secondly, his sense of class hatred is sublimated into sexual hatred and venomous attacks on women in general and his wife Alison in particular. (Wandor 144)

This 'hatred' is problematic as Ernst Bloch explains in a conversation titled as "Hate or Anger?"-

Hate is a corrupt affect when it does not transform into the clarity of anger. Hatred loses its clear head and for that reason does not belong in the class struggle. It never finds its correct addressee.

Anger also can be politically instrumental in "enabling resistance" (Holmes 223). The female protagonist of Wesker's play, Sarah Kahn's anger offers

such resistance to certain political deviations of her comrades and family members. Being a working class activist and a participant in different movements under the leadership of acommunist party,Sarah Kahn's rhetoric throughout the play evolves out of her political faith in practising ideology of the party. The play covers a period of two decades, precisely 1936-56 and depicts significant political situations and varying reactions from party members though Sarah remains faithful towards her party commitment.

To analyse the nature of Sarah's political anger her position as a partisan can be seen in the light of Lenin's concept of "partijnost'". Assen Ignatow in his article "The Principle of Partijnost' and the Development of Soviet Philosophy" observes that the word partijnost' meaning "party minded-ness, partisanship" is an exclusive feature of Leninism (63). Although Lenin's works do not link this notion of philosophical partisanship directly to the organisational notion of political parties, Ignatow by referring to Lenin's "Party Organisation and Party Literature" derives that partisanship in philosophy can be exercised "when the position of the party is taken" (Ignatow 65). Ignatow also observes certain complexities in defining Lenin's partijnost'-it is the "theoretical expression of class conflict", emphatic reaction against the "ancient" ideas and opposition, an "objective state of affairs" but also a "norm" or "militant ought" (65). Thus Lenin contributes in connecting the objectivity of the partisanship to the "emotional overlay" (Ignatow 66). That explanation gives rise to two associated notions like "conviction" and "commitment"those are paradoxical to the practice of communism, especially in the way these two disrupts objectivity (Ignatow 67-68).Inspite of being paradoxical aspects, commitment to the party and conviction in partisanship historically have become two essential features ofcommunist or socialist political organisations. Sarah Kahn's political anger is a construct of this notion of partisanship.

Sarah's politics of anger can be placed against the shifting political expressions of most of the other characters in Chicken Soup with Barley. The play begins when the Kahn family (from Jew community of East End London) along with other members of communist party are preparing to take part in resisting the anti-Semitist Blackshirts of Oswald Mosley.In Act I, Dave's advocacy of pacifism has been denounced by Sarah and her husband Harry as they think in times of fascism, pacifism offers no solution (Wesker 21).Ada, Sarah's daughter and previously an active party organizer, announces in Scene One of Act II, that she and Dave (her husband and a

participant in the International brigade in Spain) will renounce their political activity completely once Dave returns from the war (Wesker 40).This Scene has been played at the backdrop of 1946 when the objective and political condition of the society has changedto some extent. The condition of the working class has become better after the Labour Party has come to the power; also two of the communist party members have been elected (Wesker 40). However the first hand war experience and the constant struggle both in and outside (inside struggle in the sense of politically and ideologically combatting Trotskyists and social democrats) have made the political youth disillusioned as it has not been clear ideologically to them why such factions must be segregated (Wesker 41). Ada being unable to get rid of such political bafflement resorts to accusing the progress of the industrial society (Wesker 42). Both Sarah and Harry oppose such perspective and Sarah asks Ada whether the working class party members should stop at this point of history by complaining about the material progress (42). Ada leaves the discussion and Sarah's wrath goes over Harry, her unemployed husband who has been portrayed as a procrastinator who always wants to avoid works (43); despite being an active party member he often refuses to join the branch meeting (38). This shift of Sarah's anger stems from her partisan self as she identifies her daughter's political degeneration. Also, Harry's lack of commitment towards party activities and familial duties make her enraged; she always negotiates between the personal and the political.

The growing tendency of a general detachment of the youth from the Communist Party of Great Britain (hereafter CPGB), can be analysed in terms of organizational failure. In 1950, the preparatory meeting and conversation on the "British Road to Socialism" shows, when Joseph Stalin asks Harry Pollitt of CPGB about the political position of the party, Pollitt demonstrates that after experiencing a boom in employment under the Labour Party regime, workers get detached from the Communist party in order to resist the conservatives under whom people experienced massive unemployment. A large section of working class youth votes for the Labour Party while the middle class gathers their votes in Conservative Party. Stalin makes it clear that CPGB has failed to capture the historical situation from the perspective of socialism and urges Pollitt to prepare a socialist counterpoint to the capitalist Labourites' narrative of nationalization as the latter are following America's directives. Also to retain the faith of the working class CPGB must produce a long term plan regarding the communist movement in England.

In Wesker's play in Act III, Scene I, Sarah's old comrade Monty expresses his revulsion towards Soviet as a result of the learned information regarding the assassination of

the Jewish Anti-Fascist League members (Wesker 61). Sarah doesn't want to believe it but also retorts with a question whether that supposed incident should provoke the communists to move backward (62). She can clearly discern the difference between the past and the present and judges the betterment as a result of their movement. Also she knows that "Politics is living… everything that happens in the world has got to do with politics" (61). Despite not having a bookish knowledge of ideology, she knows her way of life, always advocates for socialism. When she receives bad behaviour from one of the employees of National Health offices, she answers angrily, "when you were still peeing all over the floor I was on strike for better conditions" (67).

Sarah's son Ronnie almost resembles the Jimmies although his transformation has been traced much better in this play. Living in the family of partisans and aspiring to become a socialist poet, Ronnie by the end of the play turns to be sceptic on the party and Communists in general. In the final scene, an exasperating conversation takes place as Ronnie indirectly accuses her mother for disintegrating the family by imposing party-like discipline, takes side for his paralysed father and also wants Sarah to comment on 1956 Hungarian Revolution. Sarah becomes agitated and clarifies her position as a communist-

All right!So, I'm still a communist! … I've always been one - since the time when all the world was a communist…When you were a baby and there was unemployment and everybody was thinking so - all the world was a communist... Now the people have forgotten. I sometimes think they're not worth fighting for because they forget so easily. You give them a few shillings in the bank and they can buy a television so they think it's all over, there's nothing more to be got, they don't have to think any more! Is that what you want? A world where people don't think any more? Is that what you want me to be satisfied with - a television set? Look at him! My son! He wants to die! (Wesker 74)

Sarah also protests against Ronnie's absurdist narrative that negates the class struggles by neglecting the historical context. She has learnt from her life that socialism is a way of life, the party is all about "glory and

freedom and brotherhood" (Wesker 75) and the fight against capitalism must go on. Anger becomes her means of political resistance towards the narratives that take kind of an escapist route often in favour of political pessimism.

Sarah's anger is a political mode of expression that resists any narrative against her practising political ideology. The elements of her anger can therefore be traced in Lenin's model of partijnost'. The "vivacity of reactions" against "one's opponents" along with the "emotional overlay" (Ignatow 65) constitute the basis of Sarah's vehement opposition against all the political deviations of her party members and family. While Jimmy Porter's anger with its ambivalent characteristic proves to be a futile response without any politically motivated actionsandturns out to be reactionary at times, Sarah's anger offers political motivation as she vows to continue struggle. Although its emotional quotientoften resorts to some determinism her political belief doesn't necessarily depend on any finalism.

**Works Cited**

"Anger". Merriam-Webster, Merriam-Webster,

https://www.merriam-webster.com/dictionary/anger.Accessed 10 July 2022.

Amis, Kingsley. Socialism and the Intellectuals. Fabian Tract 304. Fabian Society, 1957.

Bloch, Ernst. "Hate or Anger?" Versobooks.com, Verso, 19 Apr. 2018,

https://www.versobooks.com/blogs/3752-hate-or-anger. Accessed 10 July 2022.

Dyson, A. E. "Look back in anger".Critical Quarterly,vol.1, no.4, 1959, pp. 318-326.

Reprinted in Look Back in Anger, Edited by Neeraj Malik, Worldview Publications, 2008, pp. 119-128.

Gramsci, Antonio. "The Study of Philosophy". Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci.Edited and translated by Quinton Hoare and Geoffrey Nowell Smith. International Publishers, 1971, pp.323-377.

Holmes, Mary. "Feeling beyond rules: Politicizing the sociology of emotion and anger in feminist politics."European Journal of Social Theory, vol.7, no.2,1 May 2004, pp. 209-227, doi:10.1177/1368431004041752.

Huss, Roy. "Social drama as veiled neurosis: the unacknowledged sadomasochism of John Osborne's Look back in anger". The mindscapes of art: Dimensions of the

psyche in fiction, drama, and film.Fairleigh Dickinson Univ Press, 1986, pp. 121-134. Reprinted in Look Back in Anger, Edited by Neeraj Malik,Worldview Publications, 2008, pp. 134-144.

Ignatow, Assen."The principle of partijnost'and the development of Soviet philosophy".

Studies in Soviet Thought, vol. 36, no. 1/2, 1988, pp. 63-78.

"On the British Road to Socialism". Translated by Jaweed Ashraf. Marxists Internet Archive,

marxists.org, https://www.marxists.org/history/erol/uk.postww2/stalin-pollitt.pdf. Accessed on 7 July 2022. Pdf file.

Osborne, John. Look Back in Anger. Edited by Neeraj Malik,Worldview Publications, 2008.

Wandor, Michelene. "Radical plays before 1968: the crisis of virility, the 'feminine' and the 'female'". Carry on understudies: Theatre and sexual politics. Routledge, 2004, pp. 142-151.

Wesker, Arnold. Chicken Soup with Barley. The Wesker Trilogy. Random House, 1960.

Williams, Raymond. "Look Back in Anger: John Osborne". Drama from Ibsen to Brecht,

1968, pp. 25-27. Reprinted in Look Back in Anger, Edited by Neeraj Malik,Worldview Publications, 2008, pp. 129-133.

Author : **Srutayu Bhattacharya**, Ph.D Scholar, English Department, Jadavpur University.

# Lighting design and its importance in a creative stage performance A Designer's process

**Murali Basa**

**Abstract:** This paper illustrates the lighting design process in a creative performance and its importance to increase the complexity for a visual performance. Lighting Designers must accommodate themselves to be part of the performance while executing the design by playing different roles, like an artist, actor, director, coordinator, and the administrator. The responsibility of a lighting designer has a tremendous impact for a visual treatment of a 'text'. He emulates the Director's ideas by constructing the design, executing the design, and treating the design for an extraordinary creative performance by adopting the internal and external elements of Lights.

Stage Lighting design evidently developed in unique inventions, from the natural light to the DMX Light equipment system. We observed stage performances across the globe to be performed in natural light, oil lamps, candle light, petromax light and electricity bulbs in different time periods. The electricity invention has provided an opportunity to explore the light to create an illusion on stage. Thus, lighting designers have created so many opportunities over the years.

Basic elements of lighting design, such as visibility, intensity, colour, movement and direction, are being discussed in the present paper with my well-established works as a designer. My practice as a lighting designer and as an academician often gives opportunities to use the advanced technologies for reaching out the directors' creative ideas, and executing them for a creative stage performance. This paper discusses such elements by exploring those ideas and processes as a lighting designer.

**keywords:** Lighting Design, Design Process, Stage Performance, Theatre lighting, Emotions

**Introduction :**

Stage Performances are embedded with lighting design. The Lighting design for a design performance includes the psychological and physical properties

of the performance. The visibility is the primary function of the lighting design when started. But later on, the technological advancements in lighting design equipment have opened scope to create spectacular illusions on stage. These illusions created through the design have affected the spectators' psychology during the performance. In India and abroad, the traditional performance used to take place in natural light. The traditional performance in India later adopted the 'oil lamps' during the performance. The makeup of the artists through the oil lamp lighting elevated the facial feature when they performed different Rasas. Later, in India, the stage performance adopted the western scripts, and western technology for stage design, light design and costume design. The Parsi theatre in India used petromax lights, colour wheels, and electric bulbs to elevate the curtain design. The lighting design in a theatrical performance, however, is as an integral part of the performance, for a visibility of the scene and actors. Lighting designers create a separation of space, time of the performance, the mood of the situation and highlighting the stage parts by using a unique lighting system based on the properties and behaviour of light. This behaviour and property of lighting design involves the Directors' thought process and audience reception. Most of the lighting designers aim to provide such unique lighting that affects the eye and brain of the audience that processes feelings and emotions during the performance.

**The Lighting Design as an integral part of the performance**

Light's physical properties depend on several factors. The operation analog dimmers are tough when comparative DMX (Digital Multiplex) control. The lighting design execution is much easier and creative in a DMX control environment. Lighting designers understand the laws and principles of lighting travel of refractions, reflections and absorption, and the same may be applied while designing the lights. These science laws help to understand the placements of lights in a stage performance. The candle, luminous, fixtures and Irish are also technological features where the designers should accommodate in their design. It's always important to look after the basic qualities of light viz. Colour, form, intensity, movement and Directions which are essential elements for a lighting design, or we may say lighting designers' tools. Visual images Pro lighting design can be analyzed and discussed both physically and psychologically. The designer himself understands a clear image which has to be executed on the stage towards the orange reception. The designer merges the colour, direction, distribution, brightness and movement of the light to create the qualitative visual picture

which is being on the stage during the performance. Unlike the painting lighting, the stage lighting is a live phenomenon and has been separated to understand unique qualities regarding the impact in the spectator's mind. Style, composition, mode, emotional content and other qualities involved in production were to be done on the stage. It is the designer's choice how he can combine and elevate the objects of the stage during the Performance by combining with other design elements like costume, music, projection, and stage design. Designers' ideas also concentrate on the actors' visibility and gestures, which can improve to be produced on the stage, while decreasing the intensity of light are increasing the shadows intensity are sometimes using the designers' new equipment to create such images.

**Designer's process**

Lighting designer discusses his ideas and relies on lights qualities for his concept of lighting in a scene. In recent times, 'Scenographer' plays all these vital roles in creating the superficial design that emulates the performance. The designer conceptual design the lights with different colour gels, and highlights the objects related to a scene. Sometimes these colour gels are associated with the emotions of the audience. For example, in a red LED wash, a gobo of jail on the actor's performance area it shows the seriousness of the situation. And the red colour shows the danger of the man in the prison. This kind of combination of colour and the gobo creates a physical and psychological association between the actor and spectators. The next fade-in scene with music deviates from the emotion existed.

The basic purpose of a lighting design is to be understood for a creative lighting design via visibility, relevance of form, focus, location and time, mood, composition and last thought. We can say separation, shadow and fill are the basic functions of lighting design. They can achieve these functions of lighting design by understanding the colour, visibility, intensity, movement and direction.

**COLOUR**

During the stage performance, we experience colours. When all visible wavelengths of light mixture, we observe white light. The absence of these wavelengths is a blackout. Yellow and green are the most sensitive colours are observed through the human eye, and red and blue are they followed. The combination of red, yellow and green creates different secondary and tertiary colour on stage. further, the mix in different variants to produce the secondary and tertiary colours. The territory colours Magenta,

Cyan and yellow are the rarest colours which can be artificially created during the Performance. This combination of colour gels is much associated with human feelings and that connects to emotion Chroma, hue and value can influence the colour pigment of stage light. Chroma shows the saturation of colour while the value shows the intensity of colour. Hue is the classification of a colour that is caught in a human eye.

In Bharata's Natyashastra, it has connected the emotions with the colours. Lighting designers follow certain colour schemes for each emotion that is performed by the actors/performers. Changing of these colours during the performance often merged with the music will work on the different combinations of colours to produce the emotional attachment identified and performed by the actor. It has mentioned those emotions and its connected colours as follows.

| S.No. | Eotions/Rasa | Associated Colour |
|---|---|---|
| 1 | Shringara | Green |
| 2 | Hasya | White |
| 3 | Karuna | Gray |
| 4 | Rudra | Red |
| 5 | Veera | Orange |
| 6 | Bhayanaka | Black |
| 7 | Bheebhatsa | Blue |
| 8 | Adbhuta | Yellow |
| 9 | Shanta | White |

Table-1: Emotions associated colours

Figure-1:
Bharata Natyam Performance, Pic Courtesy Mudra Dance Academy, Hyderabad

## VISIBILITY

Visibility is the one of the major factors of the lighting design is not just intensity and other sources of the brightness of an object visibility depends on the colour is being used and the contrast of the colour, and the

distance, movement and the conditions of the eye, these all plays important roles towards for the visibility of light.

Lighting designers adjust the intensity towards the visibility of the objects on the stage designed as part of the set and costumes or in the makeup design, is also to be elevated by the intensity of the light controlled by the dimmer. The designer challenges are to make the audience awake by designing certain elements in the lighting design. The fade in and fae outs in a stage performances always disturbs performances in fade off the lighting in an auditorium situation, but at such times, the designers have multiple challenges to keep the audience awake to the scenes happening on the stage. Sometimes it is also a challenge for a designer how to create a visible impact on the stage by fading off light. Focus of the light sometimes helps the designers' view towards the text and its interpretations of the ideas. It is very challenging for the designer to execute such a focus on the stage performances.

Figure-2:BaakiItihas Directed by M.K Raina, Light Design by Murali Basa, Pic Courtesy Three Arts theatre Group Delhi

**INTENSITY**

The intensity of light depends on the distance from the place and the strength of the source light. Intensity is proportional to the emotions that are created through music and actor's performance on the stage. The lighting designer has to bring out the emotions correctly on stage through the light operation by increasing or decreasing the intensity through the faders. Most of the intensity design goes with music fade in and fade out. The intensity of a colour also resembles the time of the scene on stage.

Brightness is one of the major visible sensations caused by the source of light that depends on the intensity of the source and on the distance

that the object has been connected and it reflects the object.

Figure - 3:
Missile Man Choreography Lights Design by Murali Basa, pic courtesy Suveen M

**MOVEMENT**

Actors' movement depends on the blocking, but the form, direction, colour and the intensity understand light movement. We observe distinct movements of light in natural sunlight or moonlight as the light travels from the east to west and west to east. Light movement includes the physical movement of a source light, intensity, and set design. Lighting design movement depends on the lights used in the design, for example refractive

olour wheel and special effect lights, projection,
ll.
e light movement to create a different space in a
ke the shift of the time the audience may not notice
experience the design purpose and it affects the
audience. Special nights like cloud light are the
rise or sunset. Such kinds of lights have been used
ovement which results from the designers' ideas to
ce.

Figure-4: play directed by M.K Raina Pic Courtesy Three Arts theatre group New Delhi

distance **DIRECTION**

While designing the stage lighting design different lights have a different purpose and their radii different light directions, the most important thing is that all lights have a different direction were candle radiate lights in all directions but whereas a profile spotlight or spotlight will generate on a focused places does very impact for creating such kind of environment where the light has to be a focused in the lighting design. This is also understanding that positions of the audience and positions of the light are to contribute to the lighting design that the lighting designers of in uses the lights' direction in creating design it is more evidently understanding that the audience Auditorium lights are also part of the lighting designs sometimes.

Theatre performances spaces consists the hanged lights. The designers' challenge is to move them in such a direction where he wants to focus the lights. Also, changes there as for the part of the form of the. They often considered low front light to be flat; sometimes the lighting from over one direction can add plasticity. The distance matters when we use western lights and it is also sometimes in a choreography or other traditional performance there should be a highlighted light which follows the actors and the scenery which is win adopted as part of the stage design these back drops sometimes elevate such things as a combination of the actors who are the part of the stage design in 3D or 2D.

Floor lights in an Auditorium create an impact of shadow of an actor these light all also used in a kind of choreography where the foot movements have been to be highlighted the designer challenges are the choice the lights' direction carefully and present them in such a scene where sometimes the only some part of the bodies of an actor choreograph for has to be highlighted. Position of light, angle of light, distance of flight have affected the lights' direction. In Dance performances, the lights Place over all the distance from the gallery, follow spot, it is designers ideas that whether he deliberately created such a kind of design or asked to be created so that to change those lighting spread among other places to follow the dancer's moment.

**Conclusion**

From the ancient times, light design from natural light to LED light played a key role in a creative stage performance. Many designers have explored the physical properties of lights for a psychological presentation on a stage. The combination of colours, texture and smooth operations created wonderful performances. Lighting Designers through the process executed spectacular

visuals on stage. The impact of lighting design is discussed but whereas the lighting design is not an individual design item. It has its own impact in a creative performance. In recent times, 'scenographers' emerged from the lighting designers to create the illusion and make a perfect image by combining all the design elements. The designers' role in a creative performance and their contribution to the performance should be appreciable. We should always remember the eminent designers across the globe for their creative representation in creating an emotional performance. The designers have challenges to transform the traditional elements to contemporary performance styles where the combinations of lights features standalone in the designer's support's process. The advanced technology provides such an environment where endless experiments can be done through the lighting design in a creative performance.

**Bibliography**

https://www.onstagelighting.co.uk/stage-lighting-basics/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780240811413000071

https://archive.org/details/methodoflighting00mcca/page/50/mode/2up

Charles I Swift, Introduction to Stage Lighting: The Fundamentals of Theatre Lighting Design Hardcover, Merw, 2004.

Gillette, J.M., & McNamara, M. Designing with Light: An Introduction to Stage Lighting 7thEdnRoutledge, 2019.

Moran, Nick. Performance Lighting Design. 2nd ed. Bloomsbury Publishing, 2018. Web. 25 Sept. 2021.

McCandless, Stanley Russell, A method of lighting the stage, New York, Theatre arts,1947.

Reid, F. The Stage Lighting Handbook (6th ed.). Routledge. 2001). https://doi.org/10.4324/9781315059860

Steven Louis Shelley, Chapter 7 - The Light Plot, Section, and Support Paperwork Packet,

Editor(s): Steven Louis Shelley,A Practical Guide to Stage Lighting (Second Edition),Focal Press,2009,Pages 199-225,ISBN 9780240811413,https://doi.org/10.1016/B978-0-240-81141-3.00007-1.

Susan Winchip, Fundamentals of Lighting, 2nd edition,Fairchild Publications, 2011

Image courtesy

Three Arts group, New Delhi; Suveen M, New Delhi; Mudra Academy, Hyderabad; IfraMustaq, Theatre student, University of Hyderabad.

Author: **Murali Basa**,Assistant Professor, Dept.of Performing Arts, Assam University.

# Classical Reception and Derek Walcott: The Odyssey: A Stage Version

**Sourav Singha**

**Abstract**

The introduction of the classical tradition in the Caribbean archipelago had systematically marginalized black values and therefore, re-assessments as well as appropriations of the classics in the post-colonial Caribbean context become an essential component of writing back to the empire. Illustrating Hellenic allusions in some of their major works, the Caribbean authors including Aimé Césaire, Edward Kamau Brathwaite and Derek Walcott critiqued racism and the cultural politics of the West.This article will address the ambivalent relationship as well as differencebetween the ancient European classics and Derek Walcott's oeuvre with special reference to The Odyssey: A Stage Version. By interrogating the political role that the classical tradition had played in the Antillean cultural and literary context, this critical readingwill bring into focus Derek Walcott's idea of a fusion of poetry and play. Taking into account these critical debates, this article would like to examine the classical reception in Derek Walcott's works.

**Keywords:** Classical tradition, racism, cultural politics, Hellenic allusions, classical reception etc.

The interactions between ancient European classics and postcolonial Caribbean theatre owed enormously to the colonial education system in the archipelago. In his Growing up Stupid under Union Jack the Bajan (Barbadian Creole) author Austin Clarkementioned the tragic predicament of the young black pupils who were taught to appreciate classics as the most elitist subject but in reality,it was the most useless onein the contemporary context. Ancient European classics occupied the topmost position in the educational hierarchy and it is needless to say that classical education bypassed the British colonial authority in the Caribbean archipelago. Hence affiliating to the British cultural tradition via classical Greek and Latin, the island school students had made the utmost effort to imitatethe legacy of their masters but every imitation is repetition and each repetition, not just repeats but also createsa potential for cultural differences.According to Emily

Greenwood, the author of Afro-Greeks: Dialogues between Anglophone Caribbean Literature and Classics in the Twentieth Century (2010), the tyranny of imposing the European cultural model in the Caribbean was an imperial design to circulate racial prejudice among the black pupils and therefore, the curriculum was quantified with a huge number of classical texts. The St. Lucian Nobel Prize-winning poet and playwright, Derek Walcott mocked the incongruity of classical education in the local environment because the cultural elitism that Classic was to develop in the archipelago was in sharp contrast with the poverty of their surroundings.

Although Derek Walcott has criticized and sometimes mocked the classical education of the Anglophone Caribbean colonies, ancient Greek literature resonates throughout his oeuvre. As Helen Eastman has proclaimed "From his 1990 epic poem, Omeros, to his Odyssey: A Stage Version (1992/93) and his directing of Seamus Heaney's Burial at Thebes at London's Globe Theatrein 2008, ancient epic (including Homer and Virgil) and Greek tragedy have been fundamental to his work". (Eastman, 1)Classical literature provided him with a framework to rectify the colonial misrepresentations of the natives in western literature. Apart from Derek Walcott, globally recognized black authors including Wole Soyinka, Athol Fugard, Toni Morrison and Ralph Ellison to name a few, have used the ancient European classics as the source of their re-imagination and revision. Whereas English literature was always "claimed by the colonizing powers, Greek and Latin were as much the property of pupils in the Caribbean as they were of pupils in Britain and represented a greater degree of cultural exclusivity." (Greenwood, 101) In claiming classics as their cultural heritagethe blacks in the Anglophone Caribbean countries used creole language as the medium of decoding the mythical past of Europe and the endeavour to localizeclassics must be looked upon after Clarke as theprocess of "creolizing the classics".

In an interview with Helen Eastman, when Derek Walcott was asked to illustrate the relationship between the Caribbean and the Aegean, he affirms that not just the sea but also the island connects both the archipelagoes and particularly when someone sees "a single sailor out in the ocean, out in the sea (you don'tsay "the ocean"), then that represents Odysseus, that's a great iconic symbol ofthe expedition and return." (Eastman, 3) He further argues that though the islanders had no acquaintance with Homer or classical literature, it is just the history of American slavery that even the slaves in the plantocracy were given "epic classical names" like Caesar, Pompey,

Hector etc. On the other hand, the British Victorian Historian, James Anthony Froude's The English in West Indies or the Bow of Ulysses (1887)has frequently used Hellenic analogies to impose the status of the meta-archipelago on the Caribbean countries and hence the archipelago in western imagination transformed to the New World Aegean. The geographical and topographical parallels between the New World Caribbean and the Old World Greece,that Froude had used recurrently in his records,have fixed a standard and an approach to describe the archipelago and as a result, subsequent narratives like Patrick Leigh Fermor's The Traveller's Tree: A Journey through the Caribbean Island reverberate Froude's method of analogy.

However, as per the Greek tragedy is concerned, Walcott mentioned that it has become "so academic" and "it has such an aura of the school room and the classroom and the lectern that I'm not instantly attracted to it." (Eastman, 9) Neither had he shown any interest to translate Greek drama directly from the original one to become one more translator playwright. Rather his interest includes both the poetry and the play which subsequently found a form in verse-play that T. S. Eliot had tried in The Cocktail Party but it, according to Walcott, had failed to become a successful example like Sweeney Agonistics. Walcott further argued that the Royal Shakespeare Company commissioned major poets to write plays but most of their productions appeared in prose which Derek Walcott does not approve and in the interview, he mentioned that the American poets must practice writing plays.

The theatrical adaptation of the classical plays is abundantly found in the history of contemporary world literature but the stage versions of Homeric epics are comparatively less frequent. Although Wole Soyinka's The Bacchae of Euripides: A Communion Rite (based on The Bacchae by Euripides), Athol Fugard's The Island(used Antigone by Sophocles), Edward Kamau Brathwaite's Odala's Choice(used Antigone by Sophocles) are some of the notable instances of plays that had used classical outlines as the source of their adaptations on the African and the Caribbean stages,Derek Walcott's The Odyssey: A Stage Version neither imitates classical Greek play nor does it classically delineate an overwhelming tragic sense; rather the play brings into light the correspondence as well as differences between the classical version of Homeric Odyssey and the contemporary Caribbean cultural and literary environments. The verse play projects the Homeric narrative of the expedition and return in the Anglophone Caribbean context

and it also brings out the difficulties of dramatizing an ancient classic. The western saga of "nostos", the Greek word for "return", has already been used as the major motif by the Martinique poetAimé Césaire in his French poem Cahier d'un retour au pays natal(Notebook of a Return to My Native Land) but Derek Walcott's stage version of The Odyssey captures the vast Caribbean experiences "of intense uprooting, separation and isolation from tradition, home and the voices of past" (Savory, 711). Even Brathwaite's Odala's Choice is a Caribbean version of the classical Greek play Antigone and his TheArrivant: A New World Trilogy (Rights of Passage, Island and Masks) also resonateswith the motif of homecoming that Homer's The Odyssey encapsulates.

Derek Walcott's reputation rests primarily as a poet across the globe but his theatrical productions are comparatively well received within the Caribbean and the premier versions of some of his major performances were composed for the American and British audiences.Omeros and The Odyssey: A Stage Versionare his major involvements with the classical reception. While the former is the reworking of the Homeric epic in a long narrative poem, the latter shows Walcott's preoccupation with the classical reception through stage performance. Irene Martyniuk in his "Playing with Europe: Derek Walcott's Retelling of Homer's Odyssey" argues that though the playwright openly retells the western epic, he had been successful to move beyond the critical European binary. He further exclaims that though Walcott's play does not seem to change the original Homeric framework, he introduced postcolonial perspectives that were already present in the ancient text. Homer's Odysseus as an epic hero was a man of outstanding ability but Walcott has demystified the Homeric hero and introduced Caribbean flavour to the stage version of the ancient epic.

Derek Walcott'sThe Odyssey: A Stage Version begins with a blind narrator singer Billy-Blue who has replaced the absent Homeric storyteller and Billy's primary responsibility is to connect all the scenes (fourteen in Act I and six in Act II) in the play. Walcott's Odysseus does not share the classical heroism of the Homeric counterpart, rather the Royal Shakespeare Odyssey, according to Robert Hamner, "is a natural extension of the trickster figurefrom Walcott's favoured African and Caribbean lore." (Hamner, 102) The council of Olympian gods and goddesses are not found in Walcott's play; rather, Athena is present in the form of a household servant to warn Telemachus from the suitors. Athena further instructs him to fetch information

about Odysseus from Nestor and Menelaus. However, at the end of scene iv when the focus shifted from Telemachus to Odysseus, Walcott significantly used mimeto introduce local touch to the stage version.Scene v is set on the beach of Scheria where Odysseus is lying unconsciously naked and in the subsequent scene, Nausicaa appeared. Then Odysseus was taken to the palace of Alcinous and there he reads the story of his expedition after the fall of Troy. Robert Hamner here observes that though Walcott has replaced Demodocus and Phemius with the Blind Billy Blue, the former two were present in the scene to emphasis the social function of the poets in the archipelago.

V. S. Naipaul's accounts in The Middle Passage,"History is built around achievement and creation; and nothing was created in the West Indies" (Naipaul, 29) is deliberately rejectedby Walcott and in his essay "The Muse of History" he proclaims that western version of history is absolutely unnecessary in the Caribbean and therefore, such version should be rejected. What Walcott explains in his poem "The Sea Is History" should be mentioned here:

Where are your monuments, your battles, martyrs?
Where is your tribal memory? Sirs,
in that grey vault. The sea. The sea
has locked them up. The sea is History.

(Walcott, 364)

He has deliberately rejected history in the archipelago by claiming that their share of history is "locked up" in the sea and in the stage version, the sea significantly plays an important role because Odysseus's major expeditions had primarily taken place on the surface of the sea. The accounts of the historians like Froud or Fermore arefull of classical allusiveness and intertextual networks but such motif disrupts the Caribbean engagement with the history of their own. Citing James Joyce's statements that "History is a nightmare from which I am trying to awake" Walcott in "The Muse of History" argues "That amnesia is the true history of the New World." (Walcott, 39)The role of the New World poets from Whitman to Neruda that of Adam naming the worldbecome very significant and inThe Odyssey: A Stage Version, Walcott's Billy Blue and Demodocus represent the poetic as well as the prophetic voice of the New World. The Bacchanalian carnival, whichdistantly resonates with the land of Hellas, found exquisite expression in the Caribbean vernacular. Odysseus's interactions with Domodocus

areworth mentioning here

Odysseus: That's a strange dialect. What island are you from?
Demodocus: A far archipelago. Blue Seas. Just like yours.
Odysseus: So you pick up various stories and you stitch them?
Demodocus: The sea speaks the same language around the world's stories.

(Walcott, 122)

Picking up stories from the experiences in the New World, the poets stitch them to give a literary structure. Before Odysseus proceeds to relate his own story to Alcinous, Walcott introduces dramatic mode to reinforce the relationship between dramatic and poetic in this play. In scene viii, the Cyclopes were introduced and the scene is marked by Walcott's use of the I/ eye or Sea/she combination. Such coded language, according to Hamner, refers to the "Rastafarian culture to the social dialectic of an oppressive government." (Hamner, 104) The rest of the scenes in Act I are devoted to Odysseus's experiences in the land of Circe and with the aid of Athena, the protagonist-wanderer had been able to overcome the magical spell of the goddess and ultimately his true love for Penelope had drawn him homeward. Here in the underworld scene, Walcott dramatized the Afro-Caribbean Shango ceremony and Odysseus encountered many of his old companions including Ajax, Agamemnon etc.

The Act II of the play comprises Odysseus's voyage to the land of his birth and on the way he received several passengers. Finally, with the help of Nausicaa's sailors, Odysseus made landfall on the shore of Ithaca and he was lulled to sleep by his old nurse Eurycleia and Billy Blue. After he woke up, he realized that he was in his native Ithaca and Athena in the guise of a shepherd advised him to disguise himself as "Nobody". Thus he would be able to find out trustworthy persons in his household and this would help him to punish the suitors who had been illegally and unofficially residing in his household since his absence. However, discovering the unique scar on his thigh, the old nurse Eurycleia recognized that the strange beggar is Odysseus and in the meantime, Telemachus has returned from Sparta. Jointly they fought against the suitors of Penelope and both the lovers accepted one another.

Although substantially very close to the original Homeric counterpart, Walcott's The Odyssey is intentionally made different from the source text.

In Baugh's words, Odysseus "alone is able tostring the great bow and shoot the arrow through the tunnel of axesand cut down the throng of suitors" (Baugh, 196) but he was never projected as the superman in Walcott's play. Rather even when Eumaus, Odysseus's faithful swineherd, was completely ignorant about the latter's true identity, the former considers the latter as the "natural man".Further, Penelope's suitorsare metaphorically projected as the usurper-colonizers in Walcott's dramatization. As Walcott's native landSt. Lucia had aroused violent conflict between the French and the British, Penelope's suitors who were aggressively waiting for a betrothal with her caused a violent clash not only among themselves but also with Odysseus. St. Lucia, the land of Walcott's birth, occupies a significant position in both the works, Omeros and The Odyssey. While in the former work, Helenstands for his native land, in the later play Penelope symbolizes St. Lucia and rescuing Penelope from the suitors is one of the primary themes of Derek Walcott's stage version. Rescuing his wife metaphorically symbolizes the freedom of his native land is the driving force behind Odysseus's 'nostos' or homecoming expedition.

The changes that Walcott has made for the dramatic effect become essential characteristics of The Odyssey: A Stage Version. As Edward Baugh has mentioned that the lesser-known characters of the ancient epic including Eurycleia and Eumaeus become overwhelmingly vibrant in the play. Walcott introduced Carnival and Shango rituala as part of popular West Indian culture. Whereas the Homeric epics retrospectheroic age, Walcott's play contemplates contemporary issues and therefore, his treatment of Penelope is also significantly different. Penelope has been allowed independent space that the traditionally masculine epic had denied. According to Hamner, not only Walcott's Penelope has deliberately undermined the accepted values of contemporary society, Tiresias asserts that Helen is not the only cause of the Trojan War.Such observation made by Tiresias signifies the victimization of Helen by ancient patriarchal society has not been followed by Walcott.

Walcott's The Odyssey is a faithful adaptation of the Homeric counterpart but the question that naturally arises is why the dramatic and not the poetic adaptation have been made. Since he had already made a poetic reworking of Homer's The Iliad, his next attempt was perhaps the dramatic rendition of the ancient text. Further the stage performance "provides the vivid immediacy of live sound and color" (Hamner, 107) but it is equally true that the printed text allows its readers critical scrutiny of

the verbal and philosophical details. In an interview when Walcott was asked to comment on the relationship between poetry and play, he responsed that "A poet for whom metaphor is the source andbeing of poetry, he sees a play as poetry in that it is metaphoric inconception and staging, in the action and in the characters no lessthan in the quality of its language" (Baugh, 2)He further argues that in poems he speaks for his characters but in the plays, he allows them to speak for themselves and thus play for him is more democratic than poetry. As Edward Baugh has mentioned that" 'The theatre', Walcott tells David Montenegro in 1987, 'gives yousatisfactions that poetry might not, or allows certain parts of yourvoice to express themselves that poetry does not'" (Baugh, 3) Baugh also commented that once Walcott explored that poetry reflects interior life and quite contrarily he again argued that poetry reflects public life. Such contradictory statements reflect Walcott's idea of fusing poetry and drama and there is no doubt that The Odyssey: A Stage Version is a perfect example where poetry and play merge to introduce a type of drama that he was not writing for Trinidad Theatre Workshop. Does Shakespeare have any influence on Walcott while he was trying to practically apply his idea of fusion? Though there is no straightforward explanation behind such an argument, such fact can hardly be denied because he was writing plays for the Royal Shakespeare Company. Unlike his Omeros, The Odyssey closely follows the Homeric outline because the playwright wanted his European audiences to rethink Homer and his epic poems from Caribbean perspectives. While Omeros has already reached his message to his global readers as he is more famous as a poet than a playwright, he had fully used his opportunity to reach the global audiences through the British stage by adapting Homeric epic for the stage.

**Work Cited:**

Baugh, Edward. Derek Walcott. London: Cambridge University Press. 2006. Print.

Clark, Austin.Growing up Stupid under Union Jack. Kingston: Ian Randle Publishers. 2003. Print

Eastman,Helen. "Talking Greek with Derek Walcott". The Oxford Handbook of Greek Drama in the Americas. Ed. by Kathryn Bosher, Fiona Macintosh, Justine McConnel and Partice Rankine. Oxford: Oxford University Press. 2015. Print.

Froude , James Anthony. The English in West Indies, or the Bow of Ulysses. London: Longman, Green and Co.1888. Print.

Greenwood, Emily. Afro-Greeks:Dialogues between Anglophone Caribbean Literature and Classics in the Twentieth Century. Oxford: Oxford University Press.

2009. Print.

Naipaul, V. S. The Middle Passage.London: Andre Deutsch. 1962. Print.

Walcott, Derek. "The Muse of History". What the Twilight Says: Essays. New York: Farrar, Straus and Giroux. 1998. Print.

Walcott, Derek. The Odyssey: A Stage Version. New York: Farrar Straus Giroux. 1993. Print.

Walcott, Derek. "The Sea Is History". Derek Walcott: Collected Poems 1948-1984. London: Faber and Faber Limited. 1992. Print.

Savory, Elaine. "Anglophone Caribbean Literature". The Cambridge History of African and Caribbean Literature. Vol. I. Ed by F. Abiola Irela and Simon Gikandi. Cambridge: Cambridge University Press. 2004. Print.

E-resources:

Hamner, Robert." "The Odyssey": Derek Walcott's Dramatization of Homer". Ariel: A Review of International English Literature, 24:4" pp101-108 https://www.scribd.com. Web October, 1993.

Martyniuk, Irene. "Playing with Europe: Derek Walcott's Retelling of Homer's Odyssey".Callaloo, Vol. 28, No. 1, Derek Walcott: A Special Issue (Winter, 2005), pp 188-199http://www.jstor.org/stable/3805544. Web 13th June, 2014

Author: **Sourav Singha,** Assistant Professor, Netaji Subhas Ashram Mahavidyalaya.